মাদারিজুন্ নুবুওয়াত

[নুবুওয়াতের মর্যাদা]

প্রথম খণ্ড

আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র)

মাদারিজুন্ নুবুওয়াত

[নুবুওয়াতের মর্যাদা]

প্রথম খণ্ড

মূল ঃ আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)

অনুবাদ ঃ মাওলানা শিবলী ফুরকানী ও মাওলানা মাহমূদ জাকির

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মাদারিজুন্ নুবুওয়াত (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০৪
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৩২২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৪৩৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-1157-7

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৭
রমযান ১৪২৮
আশ্বিন ১৪১৪

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রুফ রীডার ঃ মাওলানা হাসান রহমতী

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২২০.০০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র।

MADARIJUN NUBUOAT (1st volume) : Written by Allama Abdul Haque Muhaddeshe Dehlovi in Urdu and translated into Bangla by Maulana Shiblee Furqani and Maulana Hayat Mahmud Jakir and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

September 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 220.00 ; US Dollar : 7.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১২
উপক্রমণিকা ১৬
নবী (সা) প্রথম হওয়ার কারণ ১৬
আখির বা সর্বশেষ ১৭
যাহির ও বাতিন ১৮
সর্বজ্ঞানী ও সর্বোজ্ঞ ১৮

প্রথম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ্ (সা-এর সুন্দর গঠন ও সৌন্দর্যময় অবয়বের বর্ণনা ২১
নূরানী চেহারা মুবারক ২১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক গণ্ডদ্বয়ের বর্ণনা ২৩
মুবারক চক্ষু ২৬
পবিত্র কর্ণদ্বয় ২৯
কপাল মুবারক ৩০
পবিত্র ভ্রূ-যুগল ৩০
পবিত্র নাক ৩১
পবিত্র মুখ ৩১
মুবারক দাঁত ৩২
পবিত্র মুখের লালা ৩২
পবিত্র হাসি ৩৩
মুবারক আওয়ায ৩৪
বিশুদ্ধ বয়ান ৩৫
জাওয়ামিউল কালিমের বর্ণনা ৩৬
পবিত্র শির ৪০
পবিত্র কেশ ৪১
ফাইদা ৪২
খিযাব লাগানো সম্পর্কে আলোচনা ৪২
পবিত্র দাড়ি ৪৫
আনা শরীফ ৪৬
পবিত্র গ্রীবা ৪৭
পবিত্র স্কন্ধ ৪৮
পবিত্র বক্ষ ৪৮

www.pathagar.com

পবিত্র কাল্‌ব	৪৮
পবিত্র পেট	৪৯
বক্ষের পবিত্র কেশ	৪৯
পবিত্র বগল.	৫০
পবিত্র পৃষ্ঠদেশ	৫০
মোহরে নুবুওয়াত	৫০
পবিত্র হস্তদ্বয়	৫৩
পবিত্র পদযুগল	৫৫
পবিত্র পায়ের নলা	৫৭
সুন্দর তনু দেহ	৫৮
ছায়াহীন তনু	৫৯
মুবারক রং	৫৯
মুবারক চাল-চলন	৬১
পদচালনার প্রকারভেদ	৬২
সুগন্ধিযুক্ত ঘর্ম	৬৩
পবিত্র হাতের খোশবু	৬৫
ফাইদা	৬৫
কাযায়ে হাজাত অর্থাৎ মল ত্যাগকালে মাটি বিদীর্ণ হওয়া	৬৬
পবিত্র প্রস্রাব	৬৬
পবিত্র বৈবাহিক জীবন	৬৮
স্বপ্নদোষ হইতে নিরাপদ হওয়া	৬৯
পরিশিষ্ট	৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল (সা)-এর সর্বোত্তম চরিত্র ও স্নেহময় গুণাবলীর বর্ণনা	৭৫
কতিপয় নবীর শৈশব কালের বর্ণনা	৭৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চরিত্রের এক পশ্‌লা	৭৯
রিসালতের ব্যাপকতা	৮৪
ইল্‌ম এবং আক্‌ল (বুদ্ধি) মুবারক	৮৬
ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা	৮৮
ফাইদা	৮৯
সতর্কতা	৯৬
বিনয়, ভদ্রতা ও সৎ জীবন যাপন	৯৭
পবিত্র স্ত্রীগণের সহিত সুন্দর আচরণ	১০৪
ঠাট্টা ও খেল-তামাশা	১০৭

www.pathagar.com

নবী (সা) প্রথম সালামকারী ছিলেন	১০৯
দানশীলতা ও বদান্যতা	১০৯
বীরত্ব, শক্তি ও বাহুবল	১১৬
নবী (সা)-এর লজ্জা	১১৮
রাসূলে পাক (সা)-এর লজ্জা সম্পর্কে মতামত বা মাযহাব	১১৯
স্নেহ, মমতা ও দয়া	১২১
নবী (সা)-এর পূর্ণ বিশ্বাস, সুন্দর অঙ্গীকার, আত্মীয়তা রক্ষা ও আর্তের সেবা	১২৩
নবী (সা)-এর সুবিচার, আমানতদারী, পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা	১২৫
ইফ্ফাত বা পবিত্রতা	১২৮
সুবিচার	১২৮
সতর্কতা	১৩৩
ত্যাগ ও তিতিক্ষা	১৩৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়, ভীতি এবং ইবাদতে দৃঢ়তা	১৩৭
আল-কুরআনের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় স্বভাব ও গুণের বর্ণনা	১৪০

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনা	১৪২
ফাইদা	১৪৫
নূর এবং প্রদীপ-এর বর্ণনা	১৪৬
গুণাবলীর উল্লেখপূর্বক আহ্বান	১৪৯
আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মরতবার শপথ করা সম্পর্কে বর্ণনা	১৫০
সম্মানিত শহরের শপথ	১৫১
কালের শপথ	১৫২
ফাইদা	১৫৪
মর্যাদা-পবিত্রতা, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও নিআমতের প্রতিশ্রুতি	১৫৫
ফাইদা	১৫৬
সূরা নাজ্ম	১৫৮
ফাইদা	১৬০
সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন'	১৬০
দরূদ ও সালাম	২৬৩
সূরা ফাত্হ	১৬৪
সূরা কাওছার	১৭১
ফাইদা	১৭২
মীছাক বা প্রতিশ্রুতি বিষয়ক আয়াত	১৭৫

www.pathagar.com

রাসূলগণের পারস্পরিক মর্যাদাগত অবস্থান ১৭৮
ফাইদা ১৮১
ফেরেশ্‌তার উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ১৮৩
ফায়দা ১৮৪
বিশেষ মর্যাদা-সম্মান ১৮৫
ফাইদা ১৮৭
কিছু আয়াতের প্রতি সন্দেহ ও তাহার নিরসন ১৯১
প্রথম কারণ ১৯৩
দ্বিতীয় কারণ ১৯৪
তৃতীয় কারণ ১৯৪
চতুর্থ কারণ ১৯৫
পঞ্চম কারণ ১৯৫
ষষ্ঠ কারণ ১৯৫
সপ্তম কারণ ১৯৫
অষ্টম কারণ ১৯৬
নবম কারণ ১৯৬
দশম কারণ ১৯৬
বোঝা হালকাকরণ ১৯৭
কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য না করার প্রসঙ্গ ১৯৯
কুরআন নাযিলের উপর সন্দেহ-সংশয় প্রসঙ্গ ২০০
অজ্ঞতার সম্বন্ধ প্রসঙ্গ ২০৪
তিলাওয়াতে শয়তানের অনধিকার চর্চা প্রসঙ্গ ২০৬
অন্ধ সাহাবী হযরত ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের ঘটনা ২০৭
মুনাফিকদিগকে অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গ ২০৮
মুনাফিকদের প্রতি ঝুঁকিয়া যাওয়া প্রসঙ্গ ২০৯
বদরের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ প্রসঙ্গ ২১০
শান-শওকতের প্রকাশ ও প্রভুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ২১৩
বিস্তারিত ইল্‌মের প্রসঙ্গ ২১৪

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং অতীতের উম্মতগণ সম্পর্কে বর্ণনা ২১৫
এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ)-এর আকাঙ্ক্ষা ২২০
তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদিতে সুসংবাদ ২২৩
তাওরাতের দ্বিতীয় সুসংবাদ ২২৪
ইনজীলের সুসংবাদ ২২৫

www.pathagar.com

যাবূরের সুসংবাদ ২২৯
নবীগণের সহীফাসমূহে মনোমুগ্ধকর আলোচনা ২৩০
ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় মনোমুগ্ধকর আলোচনা ২৩১
হাবকুকের গ্রন্থে প্রাঞ্জল আলোচনা ২৩১
শা'ইয়া' (আ)-এর সহীফায় প্রাঞ্জল আলোচনা ২৩৩
সুসংবাদ সম্বলিত কিছু বর্ণনা ২৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

নবী (সা) ও অন্য নবীগণের মধ্যে যৌথ ও বিশেষ মর্যাদার আলোচনা ২৪৩
হযরত ইদরীস (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৪৪
হযরত নূহ (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৪৪
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৪৫
খিল্লাত ও মহব্বতের মর্যাদাগত অবস্থান ২৪৫
মূর্তি ভাংচুর ২৪৬
কা'বাঘর নির্মাণ ২৪৬
হযরত মূসা (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৪৬
ফাইদা ২৪৭
দু'আ কবূল হওয়া ২৪৮
পানি প্রবাহিত করা ২৪৮
কথোপকথন করা ২৪৮
ভাষাগত স্পষ্টতা ২৪৯
হযরত ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ও আমাদের নবী (সা) ২৪৯
হযরত দাঊদ (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৪৯
হযরত সুলায়মান (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৫০
হযরত ঈসা (আ) ও আমাদের নবী (সা) ২৫১
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মু'জিযা ও মর্যাদা ২৫২
ফাইদা ২৫৪
গুণাবলী ও বিভিন্ন অবস্থার বিশেষত্ব ২৫৬
ফাইদা ২৬১
সতর্কতা ২৮৪
পবিত্র নামে নামকরণ করা ২৮৪
নবীর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ ২৮৫
উম্মতে মুহাম্মদরি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩০৫
বন্দেগীতে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য ৩০৯
কর্মসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ৩১২

www.pathagar.com

ওলী আল্লাহ্ ও গায়েবী মানুষ ৩১৯
কবরে ও হাশরে উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩২১
ইসালে সাওয়াবের প্রমাণ ৩২৩
পবিত্র মি'রাজের বর্ণনা ৩২৭
পবিত্র মি'রাজের প্রমাণ ৩৩১
বুরাকের বর্ণনা ৩৩৩
সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পৌছানো ৩৪০
আল্লাহ্‌র দীদার ৩৪৭
সতর্কতা ৩৪৯
পবিত্র মি'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন ৩৫২
আল্লাহ্‌র দীদার লাভ সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণের মধ্যকার মতদ্বৈধতা ৩৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐ সকল মু'জিযা যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের শুদ্ধতা এবং
রিসালতের সত্যতার দলীল ও নিদর্শন ৩৫৮
উম্মী হওয়া মু'জিযা ৩৬০
পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা ৩৬১
কুরআনের অলৌকিকতার কারণসমূহ ৩৬১
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতের অলৌকিকত্ব ৩৭৩
সূর্যের প্রত্যাবর্তন ৩৭৫
পবিত্র অঙ্গুলি হইতে পানির ঝরনা প্রবাহিত করা ৩৭৬
অল্প পানিকে বর্ধিত করা ৩৭৮
আহার্য বস্তু প্রভৃতির মধ্রে অলৌকিকতা প্রদর্শন ৩৮১
হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস ৩৮১
হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস ৩৮২
হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস ৩৮৩
হযরত আনাস (রা)-এর অন্য হাদীস ৩৮৪
হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর হাদীস ৩৮৫
সামুরা ইব্‌ন জুন্দাব (রা)-এর হাদীস ৩৮৫
আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর হাদীস ৩৮৫
আবূ হুরায়রা অন্য এক হাদীস ৩৮৫
হযরত আলী মুরতাযা (কা)-এর হাদীস ৩৮৬
হাদীসে জাবির (রা) ৩৮৬
হযরত জাবির (রা)-এর অন্য এক হাদীস ৩৮৭
হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর অন্য হাদীস ৩৮৮

www.pathagar.com

জীবজন্তুর কথা বলা এবং আনুগত্য করা	৩৮৯
পশুসমূহের কথা বলা	৩৮৯
নেকড়ে বাঘের কথা বলা	৩৯১
হরিণের বাক্যালাপ	৩৯৩
গর্দভের কথা বলা	৩৯৪
ব্যাঘ্রের বশ্যতা স্বীকার	৩৯৪
বৃক্ষ তরুলতার আনুগত্য	৩৯৫
জড় পদার্থসমূহের আনুগত্য প্রদর্শন	৩৯৮
উস্তুনায়ে হান্নানার বর্ণনা	৪০০
পাহাড়ের কথা বলা	৪০১
কংকরসমূহের তাসবীহ পাঠ করা	৪০২
আহার্য বস্তুর তাসবীহ পাঠ	৪০৪
দুগ্ধপায়ী শিশুর কথা বলা ও সাক্ষ্য দান করা	৪০৫
রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করা	৪০৫
মৃতকে জীবিতকরণ	৪০৭
দু'আ কবূল হওয়া	৪১০
রাসূল (সা)-এর কারামত ও বরকতসমূহ	৪১৪
অদৃশ্য জ্ঞানের সংবাদ দান করা	৪১৭
বিশ্বনেতা নবী (সা)-এর হিফাযত ও নিরাপত্তা	৪৩৪
হযরত মুস্তাফা (সা)-এর উলূম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৩৯
মু'জিযা বর্ণনার উপসংহার	৪৪২
রোগীর দর্শন	৪৪৫
বিচ্ছুর বিষ	৪৫৩
হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ	৪৫৮
বদনযর	৪৫৮
একটি ঘটনা	৪৬১
জাদুর কথা	৪৬৩
বদনযর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধিকর দু'আ	৪৬৮
চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশার দু'আ	৪৭০
লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা-এর আমল	৪৭০
আয়াতাল কুরসী-এর আমল	৪৭১
ব্যাপক দু'আ	৪৭১
দারিদ্র্য মোচনের দু'আ	৪৭১
কিমিয়ায়ে মাশায়েখ	৪৭২

www.pathagar.com

অগ্নি নির্বাণের দু'আ	৪৭২
মৃগী রোগের দু'আ	৪৭২
মাথা ব্যথার দু'আ	৪৭৩
দাঁত ব্যথার দু'আ	৪৭৩
পেশাব বন্ধ বা পাথরী রোগের দু'আ	৪৭৪
জ্বরের দু'আ	৪৭৪
খুজলি ও পাঁচড়ার দু'আ	৪৭৫
প্রসব কষ্ট দূর করার দু'আ	৪৭৫
নাকসীরের (নাক দিয়া রক্ত বাহির হওয়ার) দু'আ	৪৭৬
সকল ব্যথা-বেদনা ও বিপদের দু'আ	৪৭৬
লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-এর যিকির	৪৭৭
খাওয়ার সময়ের দু'আ	৪৭৮
উম্মুস সিবয়ানের দু'আ	৪৭৮
হাফীযে রমযানের দু'আ	৪৭৮
ঔষধ দ্বারা নবী করীম (সা)-এর চিকিৎসা	৪৭৯
স্বপ্ন ব্যাখ্যা	৪৮১
সত্য স্বপ্নের সময়	৪৮৪
ব্যাখ্যাদাতাগণের প্রতি নবী করীম (সা)-এর উপদেশ	৪৮৬
ব্যাখ্যাদাতাদের নিয়ম-পদ্ধতি	৪৮৬
স্বপ্ন দর্শকের নিয়মাবলী	৪৮৭
নবী করীম (সা)-এর স্বপ্ন এবং তাঁহার ব্যাখ্যাদান	৪৮৯
সাহাবাগণের স্বপ্ন ও নবী করীম (সা) কর্তৃক ব্যাখ্যাদান	৪৯৬
স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করার কারণ	৫০২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের ইল্‌মে হাদীসের পথিকৃৎ আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) প্রণীত 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' একটি প্রামাণ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বৃহদাকারের সীরাত গ্রন্থ। মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক দীনে ইলাহী নামে একটি ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস ভারতীয় সাধারণ মুসলমানের মনে যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল, বরেণ্য আলিম হিসেবে আল্লামা দেহলবী (র) এ প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থটিসহ শতাধিক কিতাব রচনা করে তার অনেকটাই নিরসন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' গ্রন্থটি দিল্লী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৬৯ হিজরীতে। এরপর বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থখানা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে শ্রদ্ধার সাথে পঠিত হয়ে আসছে। গ্রন্থখানি অনেক আগে অনুবাদ করানো হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের আংশিক পাণ্ডুলিপি নষ্ট হওয়ায় প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে বিলম্ব হয়। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

বাংলাভাষী পাঠকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক বিলম্বে হলেও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ মল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূল দুইখণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাভাষায় মোট তিনখণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং বর্তমানে এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হলো।

'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা শিবলী ফুরকানী ও মাওলানা হায়াত মাহমূদ জাকির। সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবদুল আউয়াল, মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার ও মাওলানা হাসান রহমতী এবং অনেক পরিশ্রম করে প্রুফ দেখেছেন মাওলানা হাসান রহমতী। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম মর্যাদা দান করুন।

গ্রন্থটিকে সুন্দর ও নির্ভুল করে মুদ্রণের জন্য আমরা যথাযথ চেষ্টা করেছি। মুদ্রণজনিত প্রমাদ পরিহারে চেষ্টারও ত্রুটি করা হয়নি। এর পরেও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য পাঠক ও গবেষকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ সীরাত গ্রন্থখানি কবূল করুন এবং তাঁর হাবীবের শাফায়াত আমাদের নসীব করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই সুবৃহৎ কিতাব "মাদারিজুন্ নুবুওয়াত"-এর লেখক জ্ঞানতাপস বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের শিরোমণি, সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণের যোগসূত্র ও শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লবী (র)-এর জীবন চরিতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপসের সম্মানিত নাম মুহাম্মদ আবদুল হক ইব্‌ন সায়ফুদ্দীন ইব্‌ন সা'দুল্লাহ্ তুরকী দেহলবী ও বুখারী। "আবুল মাজ্‌দ্" তাঁহার কুনিয়াত ছিল। তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রকৃত পক্ষে বুখারার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা পরে দিল্লিতে আগমন করেন এবং তথায় বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ৯৫৮ সনে দিল্লী নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তদানীন্তন কালের ইসলামী শাস্ত্র বিশারদ, সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক, হাদীস বিশেষজ্ঞ, পূর্ববর্তিগণের শেষ পণ্ডিত, পরবর্তিগণের দলীল, ইতিহাসের সুপণ্ডিত, বাংলা, ভারত ও পাক উপমহাদেশের মুসলমানদের গৌরব এবং যাহিরী ও বাতিনী ইলমের আধার ছিলেন।

তিনিই সেই পুণ্যতম জ্ঞানতাপস যিনি আরব হইতে হাদীস শাস্ত্র আনয়ন করতঃ এই দেশকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিয়াছেন এবং নুবুওয়াতের জ্যোতি দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতর ও উন্নততর কিতাব রচনার মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্র সমগ্র উপমহাদেশের প্রত্যেক স্থানে প্রসার লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার পুস্তক রচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা নাই। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান ও বিবেকহীন করিয়াছেন অথবা যাহারা চক্ষুদ্বয়ের উপর প্রতিহিংসার পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

তিনি বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে ধর্ম, বিজ্ঞান, ও রিওয়ায়াত (বর্ণনা) শাস্ত্রসমূহের অধিকাংশই অধ্যয়ন করিবার পর পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। অতঃপর মানবের কল্যাণ সাধনে নিজকে নিয়োজিত করেন। পূর্ণ যৌবনকালে আল্লাহ্‌র আকর্ষণ তাঁহাকে এইরূপ উন্মাদ করিয়া তুলে যে, অকস্মাৎ তাঁহার অন্তর বন্ধু-বান্ধব ও স্বদেশ হইতে উঠিয়া যায় এবং তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনার দিকে রওয়ানা হইয়া যান। তথায় সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত অবস্থান করতঃ তথাকার শ্রেষ্ঠ আওলিয়া এবং যুগশ্রেষ্ঠ কুতুবগণের বিশেষতঃ শায়খ আলী মুত্তাকীর সুযোগ্য খলীফা শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুত্তাকীর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তাহার নিকট হাদীস শাস্ত্র সমাপ্ত করেন এবং সকল কল্যাণকর বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রিয় দেশ (দিল্লীতে) প্রত্যাবর্তন করেন এবং বায়ান্ন বৎসর বয়সের সময় যাহিরী ও বাতিনীভাবে একাগ্রতা অবলম্বন করতঃ সন্তান-সন্ততি ও শিষ্যদিগের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। হিজরী ১৩০৯ সনে দিল্লীস্থ মুজতবাযী প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত "আখবারুল আখইয়ার" কিতাবের ২৮৯ পৃষ্ঠার শেষ দিকে 'শায়খ' স্বীয় অবস্থা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

www.pathagar.com

"আমি যখন তিন বৎসর বয়সের শিশু, ঐ সময় আমার শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ওয়ালীদ এই অধমের হৃদয়ের নিভৃত কোণে তত্ত্বকথা প্রবেশ করাইয়া দেন। তন্মধ্য হইতে কোন কোন কথা যাহা ঐ সময় আমার সতর্ক কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এখনও স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত রহিয়াছে। যাহা অতীব বিরল ও আশ্চর্য বটে। আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা হইল, যখন আমার দুগ্ধ ছাড়ান হয় ঐ সময় আমার বয়স দুই বৎসর কি আড়াই বৎসর ছিল। সেই সময়কার কথা আমার স্মৃতিপটে এইরূপ জাগরূক আছে যেন ঐগুলি গতকালকার কথা ছিল। শ্রদ্ধাভাজন পিতা এক সবক এক সবক করিয়া কুরআনুল কারীম লিখিয়া দিতেন, আর আমি উহা পাঠ করিতাম। এই ভাবে দুই-তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম আমি পাঠ করিয়া লইয়াছিলাম। এক মাসের মধ্যেই লিখা ও লিখন পদ্ধতি রপ্ত করিয়া লইয়াছিলাম। আর কবিতা ও গযলের কিতাব হইতে বিশেষ ও বাছাইকৃত উপদেশা ও নীতিকথাসমূহ পাঠ করিয়াছিলাম। যখন বার বৎসর বয়স, তখন আমি শরহে শামসিয়া এবং শরহে আকাঈদ অধ্যয়ন করিতাম এবং পনের বৎসর বয়সের সময় ছোট-বড় সকল কিতাবের পাঠ সমাপ্ত করি। অতঃপর পবিত্র কুরআন হিফ্‌য করি এবং অনুরূপ অবশিষ্ট সকল কিতাবের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। সাত-আট বৎসর পর্যন্ত এশিয়া মাইনরের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের খিদমতে অধ্যয়নরত ছিলাম। তাঁহারা বলিতেন যে, আমরা তোমার নিকট হইতে উপকৃত হইয়াছি, তোমার উপর আমাদের কোন অবদান নাই। শৈশবকাল হইতেই আমি জানিতাম না যে, খেলাধুলা এবং ঘুম ও আরাম কি বস্তু! বিদ্যার্জনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার দরুন না কখনও সময় মত আহার করিয়াছি, না সময় মত শয়ন করিয়াছি। গ্রীষ্মকাল হউক চাই শীতকাল, দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিদিন দিল্লী মাদ্‌রাসায় যাতায়াত করিতাম এবং প্রদীপের আলোয় প্রত্যহ এক অংশ করিয়া লিখিতাম। নির্ধারিত রূপে সময় বিভক্ত থাকা সত্যেও আমি কিতাব অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার মধ্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতাম এবং আধুনিক বিদ্যার চাহিদা অনুযায়ী ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী ও বিস্তারিত আলোচনা, লিখনের বন্ধনীতে বন্দী করিয়া রাখিতাম। যেমন প্রবাদ আছে যে, اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ وَالتعلم التعلم অর্থাৎ বিদ্যা হইল শিকার, লেখা হইল বন্দীত্ব এবং শিক্ষা দান করা হইল শিক্ষা গ্রহণ।

বিভিন্ন প্রকার কিতাব পাঠরত থাকা অবস্থায় কয়েক বার আমার পাগড়ী ও চুলে প্রদীপ শিখা হইতে আগুন লাগিয়া যায় এবং আমি উহা অনুভব করি তখন, যখন ইহার গরম তাপ আমার মাথায় অনুভূত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও শৈশবকাল হইতেই দরূদ, সালাম, ওযীফা, রাত্র জাগরণ এবং মুনাজাতের মধ্যে আমার এত বেশী স্পৃহা ও প্রচেষ্টা থাকিত যে, লোকেরা অবাক হইয়া যাইত। তখনও শিক্ষাগ্রহণ ও মঙ্গল অন্বেষণের মধ্যে আমার সময় অতিবাহিত হইতেছিল এবং হৃদয়ের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা আমার কষ্ট-সাধনার উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং আরবী গ্রামার নাহুর তরকীবের মধ্যে যে যায়দ ও উমর নাম উল্লেখ করা হয় উহাতে আমার দুঃখ হইত। সর্বোপরি শ্রদ্ধাস্পদ পিতার উপদেশ ও অন্তিম বাণী যে, "সাবধান শুষ্ক মোল্লা সাজিও না, সর্বক্ষণ রাসূলের প্রেম ও ভালবাসার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিও।" ইহার উপর থাকিবার চেষ্টা করিতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি আহ্বান করেন এবং স্বীয় পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে লইয়া যান। অতঃপর নবী আকরাম (সা) হইতে যে সকল সুসংবাদসমূহ প্রাপ্ত হই, উহার বর্ণনা দান করা এখানে সম্ভবপর নহে।"

www.pathagar.com

ইহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, তাঁহার ভক্তিভাজন পিতা যাহার মুবারক নাম হইল সায়ফুদ্দীন, এবং কাব্যে ব্যবহৃত নাম (تخلص) হইল সায়ফী। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সুখ্যাত আলিমগণের একজন ছিলেন। তিনি শান্ত-সমাহিত ও বিশুদ্ধ বাক্যবাগিশ ছিলেন। হযরত শায়খ মুহাক্কিক (র) বলিতেন যে, বুযুর্গ পিতার প্রকাশ্য ছায়া আমার মাথার উপর হইতে উঠিয়া যাওয়া, হযরত আমীর খসরু (র)-এর ঐ শোকগাথার অনুরূপ ছিল, যাহা তিনি তাঁহার পিতার তিরোধানের সময় বলিয়াছিলেন–

سیف ازسرم گذشت ودل من دونیم مانده * دریائ رواں شد ودرّ یتیم مانده

সায়ফ (তরবারি) আমার মাথার উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং আমার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। দরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, আর মুক্তা একাকী পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহার কিতাব ও পুস্তকের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সূফী মতবাদ, একত্ববাদ এবং কবিতা সম্পর্কে লিখিত ছিল। হযরত শায়খ আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর পুস্তক পুস্তিকার ছোট বড় একশত খণ্ড রহিয়াছে। এবং গণনা অনুযায়ী কবিতার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত পৌছিয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধতম কিতাব হইল ঃ

(১) লামআতুত্তানকীহ ফী শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ্। আরবী ভাষায় লিখিত এই কিতাবে প্রায় আশি সহস্র কবিতা রহিয়াছে। কিতাবখানা এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি বাঁকীপুর, রামপুর, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী এবং আলীগড়ে বিদ্যমান আছে।

(২) আশিয়্যাতুল লামআত শারহে মিশকাত, কিতাবটি ফারসী ভাষায় লিখিত। আফসোস! কোন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি উভয় কিতাবের মধ্যে পার্থক্য মনে করিয়া থাকেন না এবং উভয় কিতাবকে এক কিতাব ধারণা করিয়া থাকেন। অথচ লামআতুত্ তান্‌কীহ্ এখন পর্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই, শুধু হস্তলিখিত খণ্ড পাওয়া যায়।

(৩) শারহে সাফরিস্ সাআদাত্ অথবা তরীকুল কাবীম ফী শারহে সিরাতে মুস্তাকীম, অথবা তরীকুল ইফাদা ফী শারহে সিফরুস্ সা আদাহ।

(৪) আখবারুল আখইয়ার, (৫) জাযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, (৬) জামিউল বারাকাত, (৭) মারজুল বাহরায়ন ফী জামই বায়নাত্ তারীকায়ন (শরীআত ও তরীকতকে একত্রিতকরণ সম্পর্কে), (৮) যুবদাতুল আছার মুনতাখাবু বাহ্‌জাতিল আসরার (গাওছে আ'যম (র)-এর গুণাবলী সম্পর্কে) (৯) যাদুল মুত্তাকীন, (১০) ফাত্‌হুল মান্নান ফী মানাকিবিন্ নু'মান, (১১) তাহ্‌সীলুত্তাআররুফ ফী মাআরিফাতিল ফিক্‌হে ওয়াত্ তাসাওউফ, (১২) তাওসীলুল মুরীদ ইলাল মুরাদ (আহকাম, আযরাব, আওরাদ ইত্যাদি বর্ণনায়), (১৩) শারহু ফুতুহুল গায়ব, (১৪) তাকমীলুল ঈমান ওয়া তাকভিয়াতুল ঈকান, (১৫) মা-ছাবাতা মিনাস্ সুন্নাহ ফী আয়্যামিস্ সানাহ, আরবী ভাষায় লিখিত। (১৬) মাদারিজুন্ নুবুওয়াত ওয়া মারাতিবুল ফুতুওয়াত, ফারসী ভাষায় লিখিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আত্‌হার নাঈমীর ইংগিতক্রমে আলহাজ্জ মুফতী গোলাম মুঈন উদ্দীন নাঈমী আল মুরাদাবাদী উর্দু ভাষায় উহার অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত উর্দু কিতাবই বাংলায় অনুবাদ করিয়া ইস্‌লামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' নামে প্রকাশ করার প্রয়াস পাইয়াছে।

www.pathagar.com

হযরত শায়খ মুহাক্কিক (র)-এর লিখিত পুস্তক ও সংকলনসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা "হাদাইকুল হানাফিয়্যা" এবং "আত্তালীফ কালবিল আনীফ" বি-কিতাবাতি ফিহ্‌রিসিত্ তাওয়ালীফ-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করুন। হযরত আল্লামার কিতাবসমূহ বাংলাদেশ, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি সকলের নিকট সাধারণভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিতাবগুলি কল্যাণে পরিপূর্ণ এবং তত্ত্বপূর্ণ। তিনি নবী আকরাম সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় ৬০ বয়তের এক কাসীদা লিখেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করিয়া নবী আকরাম (সা)-এর দরবারে উহা পাঠ করেন। যাহার প্রথম কলি হইল এই ঃ

بیا ائے دل دمے ازیشی خود ترك دعوی کن * میفگن چشم برصورت نظردر عین مفتی کن

তাঁহার জন্ম তারিখ হইল "শায়খে আওলিয়া" ৯৫৮ হিজরী মুতাবিক ১৫৫১ খৃস্টাব্দ, এবং অন্তর্ধানের তারিখ "ফাখরুল উলামা" ১০৫২ হিজরী অথবা "ফাখরুল আলম" ১০৫২ হিজরী সাল। তাঁহার কবর হযরত কুতুব সাহেব (র) দিল্লীস্থ মহরে ওলীর হাউযে শামসীর কিনারে অবস্থিত। (এখন হিন্দু সরকারের শাসনামলে উহার অবস্থা কি আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

সন্তানাদি ঃ তাঁহার এক সাহেবযাদা হযরত মাওলানা নূরুল হক বড় ফকীহ, মুহাদ্দিস, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ এবং বিদ্যার সাগর এবং বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, যিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতার (র) ছাত্র ও মুরীদ, সুযোগ্য উত্তরাধিকারী এবং যুগের একচ্ছত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যেহেতু কুরআনের অনুরক্ত বাদশাহ শাহজাহান শাহযাদা থাকাকালীন তাঁহার মহান যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাই যখন তিনি দক্ষিণাত্যে গমন করেন, তখন তাঁহাকে আকবরাবাদে কাজী (বিচারপতি) নিয়োগ করিয়া যান। বস্তুতঃ তিনি কিছুকাল পর্যন্ত অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে কাযী পদে কর্ম পরিচালনা করেন। তিনি বহু কিতাবপত্রও লিখিয়াছেন। যেরূপ তাহার বুযুর্গ পিতা (র) মিশকাত শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার মুবারক হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। তদ্রূপ তিনিও ফারসী ভাষায় সহীহ্ শুদ্ধ অনুবাদ করিয়া সাধারণের ব্যাপক উপকার সাধনকল্পে তায়সীরুল কারী ফী শারহিল বুখারী এবং মুসলিম শরীফের শারাহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নব্বই বৎসর বয়সে ১০৭৩ হিজরী সালে দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। "শায়খুল ইস্‌লাম" ১০৭৩ হিজরী সন তাঁহার জন্ম তারিখ হয়। (হাদাইকে হানাফিয়্যা)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফয়েয ও বরকত মুদ্রাকর, প্রকাশক, অনুবাদক এবং সমস্ত মুসলমানের উপর পরিপূর্ণরূপে দান করুন। সহজ ও সরল পথের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকিহী মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আত্‌বাইহী আজমাঈন ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। আমীন!

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মাদারিজুন নুবুওয়াত

প্রথম খণ্ড

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شى عليم

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন– 'তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি গোপন এবং তিনিই প্রকাশ্য। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

এই প্রথম, শেষ, গোপন, প্রকাশ্য সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি প্রশংসা এবং ছানা হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্‌সঙ্গে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসায়ও উক্ত প্রশংসা বাক্যগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নবী (সা)-এর প্রশংসায় উক্ত বাক্যগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও এইগুলি 'আসমায়ে হুসনা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সুন্দর পবিত্র নামসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ ওহীয়ে মাতলূ[১] এবং গাইরে মাতলূ[২] উভয় প্রকারের ওহীর মাধ্যমেই তিনি তাঁহার প্রিয় হাবীব (সা)-এর শানে উল্লিখিত নামগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দরতম এবং উজ্জ্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রশংসিত করিয়াছেন গুণবাচক নামের দ্বারা। এ নামের সংখ্যাও অনেক। কতিপয় যেমন– নূর, আলীম, হাকীম, মু'মিন, মুহায়মিন, ওলী, হাদী, রাউফ, রাহীম ইত্যাদি। ঐ নাম চতুষ্ট অর্থাৎ প্রকাশ্য, গোপন, প্রথম এবং শেষ এইগুলিরই অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষণে উক্ত গুণবাচক প্রধান নাম চতুষ্টয়ের এক এক করিয়া বিশ্লেষণ করা হইবে।

নবী আকরাম (সা)-এর প্রথম হওয়ার কারণ

নবী আকরাম (সা)-কে প্রথম বা আওয়াল (اول) বলা হয়। ইহার কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এই প্রমাণাদি দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহ্‌মদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রথম বা আওয়াল গুণে-গুণান্বিত ছিলেন। কারণগুলি এইরূপ–

১. ওহীয়ে মাতলূ– যাহা তিলাওয়াত করা হয় এবং যাহা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিয়াছেন। অর্থাৎ কুরআন মজীদ।

২. ওহীয়ে গায়ইর মাতলূ– যাহা তিলাওয়াতের নির্দেশ নাই; ইলহাম, স্বপ্ন কিংবা সরাসরি নবী (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত কালাম অর্থাৎ হাদীস।

www.pathagar.com

এক. হাদীস শরীফে নবী (সা)-এর উক্তি- اول ما خلق الله نورى 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় পৃথিবী এবং ইহার সংশ্লিষ্ট ও মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির পূর্বে নবী (সা)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার নূরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

দুই. নবী হিসাবেও তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম। উদাহরণ স্বরূপ হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে- كنت نبيا وان ادم لمنجدل فى طينته অর্থাৎ নবী আকরাম (সা) বলিয়াছেন- 'যখন আদম (আ) কাদা-মাটির মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তখনও আমি নবীই ছিলাম।' ইহা দ্বারা প্রামাণিত হয়, তিনি নবী হিসাবেও সর্বপ্রথম ছিলেন।

তিন. রূহসমূহের স্বীকারোক্তি গ্রহণের দিন নবী (সা) সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমুদয় রূহের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন- الست بربكم। 'আমি কি তোমাদের রব নহি ?' قالوا بلى। তাহারা বলিল, 'হ্যাঁ'। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সর্বপ্রথম স্বীকৃতিদাতা।

চার. নবী (সা)-ই সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন (আল্লাহ্র উপর)। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আছে। নবী আকরাম (সা) বলিয়াছেন-

واول من امن بالله وبذلك امرت اول المؤمنين অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও আমিই সর্বপ্রথম।

পাঁচ. শেষ বিচারের উদ্দেশ্যে যখন মাটি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং মানুষ দলে দলে বাহির হইতে থাকিবে সেদিনও নবী (সা) সর্বপ্রথম বাহির হইবেন বলিয়া হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে।

ছয়. নবী (সা) বলেন- হাশরের ময়দানে (কিয়ামতের দিন) আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সিজদা করার অনুমতি লাভ করিব।

সাত. নবী (সা)-এর জন্যই সর্বপ্রথম শাফাআতের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে বলিয়া তিনি ইরশাদ করিয়াছেন।

আট. নবী (সা) বলেন- আমিই সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম বেহেশ্তে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 'আওয়াল বা সর্বপ্রথম' গুণবাচক নামটি যথার্থ।

আখির বা সর্বশেষ

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি বলে যদিও আমরা তাঁহাকে প্রথম বলিয়াই বুঝিতে পারি, তথাপিও নবী (সা)-এর দুনিয়ায় আগমন এবং রিসালাতের ব্যাপারে তাঁহাকে আখির (اخر) বা শেষ হিসাবেও প্রমাণ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ولكن رسول الله وخاتم النبيين 'কিন্তু আপনি (হে মুহাম্মদ (সা)!) আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'

www.pathagar.com

দুই. সকল আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআনুল কারীম শেষে নাযিল হইয়াছে এবং দীন হিসাবে দীনে মুহাম্মদী (সা) অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সর্বশেষে এ পৃথিবীতে আসিয়াছে। এদিক দিয়া আমাদের নবী (সা) সর্বশেষ নবী বলিয়া প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ এই জন্যেই নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন– نحن الاخرون السابقون 'সকল দিক দিয়া অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও আমি সর্বশেষে আসিয়াছি।' এ দিক দিয়া বিচার করিলে সকলের শেষে আগমনের ফলেই তিনি সর্ব দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিবার ব্যাপারে অগ্রসর ছিলেন। কেননা, তাঁহার দ্বারাই পূর্ববর্তী দীন, শরীআত এবং কিতাবের যাবতীয় শরীআতী হুকুম পরিবর্তিত কিংবা রদ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক।

যাহির ও বাতিন

এবারে তাঁহার যাহির (ظاهر) বা প্রকাশ্য এবং বাতিন (باطن) বা গোপন-এর বিষয়ে আলোচনা করা যায়। তাঁহার নূর সমগ্র নভোমণ্ডলকে নূরান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে সমস্ত আকাশকে। এ নূর, এর বিকাশ এতই প্রবল এবং এতই প্রোজ্জ্বল যে ইহার সহিত আর কোন কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার বাতিন উপাধির দ্বারা উক্ত প্রকারের গুণাবলীর প্রতিই দিক-নির্দেশ করা হইয়াছে যে, তাঁহার নূরের প্রভাব ও বিস্তৃতির গূঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না।

তাঁহার সৌন্দর্য এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে, দর্শনকারীদের চক্ষে নিকট ও দূরের কোন জিনিসই উক্ত সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করার মতো ছিল না।

সর্বজ্ঞানী বা সর্বোজ্ঞ

وهو بكل شئ عليم 'তিনিই সর্বজ্ঞ'-এ গুণটি বিশেষত আল্লাহ্র গুণ। অথচ এ গুণটিও নবী আকরাম (সা)-এর জন্যও প্রযোজ্য। নবী (সা)-এর সকল বস্তুর উপর জ্ঞান রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে তিনিও সর্বজ্ঞ উপাধিতে বিভূষিত হওয়ার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁহার গুণসমূহ বিষেশতঃ আওয়াল-আখির, যাহির-বাতিন-এর জ্ঞান একমাত্র নবী (সা)-কেই দান করা হইয়াছিল। অতএব, এ ইরশাদও নিঃসন্দেহে নবী (সা)-এর জন্যই করা হইয়াছে। কেননা, فوق كل ذى علم عليم প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। সুতরাং সকল ধরন এবং প্রকারের যাবতীয় জ্ঞানের জ্ঞানী ব্যক্তির উপরও মুহাম্মদ (সা)-এর জ্ঞানের আধিক্য অবশ্য স্বীকৃতব্য। অতএব সমস্ত দরূদ ও সালাম একমাত্র তাঁহারই জন্য।

অতঃপর মহান আল্লাহ্র প্রশংসা এবং নবী পাকের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করিয়া এই অধম মিসকীন বান্দা আবদুল হক ইব্ন সায়ফুদ্দীন দেহলবী কাদেরী আরয করিতেছে যে, এ অধম ঈমান এবং পূর্ণ আবেগের তাকীদে সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূত-পবিত্র জীবন চরিত পবিত্র হাদীস সমর্থিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা সমৃদ্ধ করিয়া লিখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ দিন যাবত অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিল।

সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হিসাবে এই "মাদারিজুন্ নুবুওয়াত ওয়া দারাজাতুল ফুতুওয়াত" নামক কিতাবটি রচনা করিয়া এ অধম নবী (সা)-এর গোলামীর হক আদায় করিতে

www.pathagar.com

চাহিতেছিল। অতঃপর আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান নয়নমণি (মাওলানা) নূরুল হকের এ ব্যাপারে বারংবার তাকীদ আমার উপর আসিতেই ছিল। কিন্তু হয়ত বা সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুম ও নুসরাত আসিয়া পৌছে নাই এবং মাখলূকের প্রতি খালিক প্রদত্ত নিআমতও তখন পর্যন্ত পাইতেছিলাম না। যদ্দরুন মনের আশা মনেই গুমরাইয়া মরিতেছিল। ফলে নূর-ই-মুহাম্মাদী (সা)-এর বিমলিন আভা বিলম্বিত হইতেছিল।

সমকালীন মাযহাবী কোন্দল ও বিশৃঙ্খলার দরুন কিছু সংখ্যক ওলী-দরবেশের মধ্যে অহংকারসূচক পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা দেখা দিতেছিল। যোগ্যতার আয়নায় অহংকারের কালিমা পড়িয়া ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল। নবী আকরাম (সা)-এর সুউচ্চ ও মহিমামণ্ডিত মর্যাদাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আত্মা সংকীর্ণ ও অনীহা প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার ইযযত, বিশাল জ্ঞান ও মারিফাতকে অনুধাবন করা ঐ দরবেশদের প্রতি কঠিনতর হইয়া পড়িয়াছিল। আকীদা-বিশ্বাসেও দীনতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাহারা যেন দীনে হক্-এর সহজ সরল পথ হইতে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া পড়িতেছিল। ফলে এই ধরনের অজ্ঞ কিংবা জ্ঞানপাপী মুসলমানদিগকে সঠিক পথ-নির্দেশ দানের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সায়্যিদুল মুরসালীন (সা)-এর পবিত্র গুণাবলীর যথাযথ বর্ণনা করার সাহস কাহার আছে ? তবু অজ্ঞদিগকে প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে, গাফিলকে গাফলতির নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে, সত্য পথের দিশারীদিগকে রাহে হকের দিশা দেখাইয়া দিতে নবীপ্রেমিকদিগকে প্রকৃত আবেগ ও উন্মাদনায় মশগুল রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুভূত হইতেছিল। এবংবিধ তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এ অধম এ মহা কিতাব রচনার দুঃসাহস করিয়াছে। এ কিতাবে নবী (সা)-এর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং পাক জীবনের শুরু হইতে তিরোধান পর্যন্ত সকল অবস্থার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেহেতু দীনী প্রেরণা, ভালবাসা ও বিবদমানদিগের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ সৃষ্টিই এ কিতাব রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এতই দ্রুতগতিতে পাণ্ডুলিপি রচিত হইয়াছে যে, এ মিসকীন জানিতেও পারে নাই কখন শুরু হইল এবং কখন শেষ হইল।

والله ولى الرشاد واليه المبدأ والمعاد

www.pathagar.com

সম্পাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার
২. মাওলানা আবদুল আউয়াল
৩. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা শিবলী ফুরকানী
২. মাওলানা আবদুল বাতেন
৩. মাওলানা হায়াত মাহমুদ জাকির
৪. মাওলানা কামালউদ্দীন শামী

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্দর গঠন ও সৌন্দর্যময় অবয়বের বর্ণনা

নূরানী চেহারা মুবারক

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী চেহারা আল্লাহ্ তা'আলার সৌন্দর্যের আয়না সদৃশ এবং জ্যোতির বিকাশ-স্থল ছিল। এ প্রসঙ্গে হাদীস পেশ করা যায়।

১. বুখারী-মুসলিম হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে সুন্দর এবং উত্তম কোন বস্তুই দেখি নাই।' এই হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কোন ব্যক্তি বলেন নাই। বলিয়াছেন, "কোন বস্তু দেখি নাই"—উহার কারণ এই যে, ব্যক্তি ছাড়াও পৃথিবীতে মনোহরণকারী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক মাধুর্য অনেক বস্তুর মধ্যেও রহিয়াছে যাহাকে মানুষ সুন্দরতম বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য যাবতীয় সুন্দরতম মনোলোভা জিনিসের চাইতে উত্তম ছিল—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মোটকথা, এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্যের প্রাচুর্য এবং সকল বস্তুর উপর ইহার প্রাধান্য স্বীকৃতির এক অন্যতম নযীর।

তিনি আরো বলিয়াছেন, নবী পাকের চেহারা এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল যে, (পূর্ণিমার) চাঁদ যেন সে চেহারার উপর ঝলসাইয়া পড়িত।

ফারসী কবির মতে —

تا شب نیست روز هستی زاد

افتابے چوتو ندارد یاد

www.pathagar.com

'রাত্রির পর এমন কোন দিবসের উদয় হয় নাই, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকের চাইতে উজ্জ্বল ও ঝলমলে ছিল।'

এই বর্ণনার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক যে যাবতীয় সুন্দর বস্তু অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, তাহা প্রকাশ করা।

সহীহ্ বুখারী শরীফে উক্ত হইয়াছে, হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তাঁহার চেহারা কি তরবারির ন্যায় উজ্জ্বল ছিল ? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় ছিল। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক গোলাকৃতি ছিল। কেননা, তরবারি যত ঝকঝকেই হউক না কেন, উহা লম্বাকৃতির। পক্ষান্তরে চাঁদ (পূর্ণিমার) সম্পূর্ণ গোলাকৃতির।

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী বারা' ইব্ন আযিব (রা) বলিয়াছিলেন–"না, বরং সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায়।"–ইহাও কেবল গোলাকৃতির অর্থ প্রকাশের নিমিত্তই বলিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

চন্দ্রের তুলনায় সূর্যের তাপ অতিশয় প্রখর এবং উহাতে দহনশক্তি বিদ্যমান। ফলে, কেবলমাত্র আকৃতির মিল ছাড়া চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য কিংবা সৌন্দর্যের কোন মিল নাই। সুতরাং সাহাবী হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা)-গোলাকৃতির অর্থ জ্ঞাপন করিতেই উক্ত উদাহরণ পেশ করিয়াছেন–ইহাই সত্য।

কমনীয়তা ও মাধুর্য–যাহা দর্শকের মনকে হরণ করিয়া লয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহা কেবল সমঝদার ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারে।

কবি বলেন—

شاهد آن نیست که موئے ومیانے دارد

بنده طلعت آن باش کـــه آنے دارد

শুভ্রতা এবং লাবণ্য দুইটি পৃথক জিনিস। জীবনচরিত লেখকগণ তাহা দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাসূলে আকদাস (সা)-এর চেহারা মুবারককে শুভ্র না বলিয়া লেখকগণ লাবণ্যময় বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শুভ্রতাও সেখানে লাবণ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শুধুমাত্র শুভ্রতা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর গুণ-বিশেষ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই ফরমাইয়াছেন – انا املح واخى اصبح 'আমার মধ্যে আছে লাবণ্য (ঔজ্জ্বল্য) এবং ভ্রাতা ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে ছিল শুভ্রতা বিরাজিত।'

গোলাকার অর্থে মুখমণ্ডল সত্যিকার বৃত্তের ন্যায় অনুমান করাও অনুচিত। কেননা, সম্পূর্ণ গোলাকার মুখমণ্ডলকে সৌন্দর্যময় বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত উদাহরণের অর্থ ধরিয়া লইতে হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল লম্বাটে ছিল না এবং গোলাকৃতির সহিত কমনীয়তা ও মোহনীয় ছিল। আরবী অভিধান অনুযায়ী তাঁহার (সা) মুখমণ্ডল না মুকালছাম ছিল আর না ছিল মুত্হাম। বৃত্তের ন্যায় গোলাকৃতির মুখমণ্ডলকে বলা হয় মুকালছাম। আরবী অভিধান কামূসে লিখা হইয়াছে বৃত্তাকার ও সংযুক্ত মুখমণ্ডলকে বলা হয় মুকালছাম। আল্লামা কাযী আয়ায তাঁর কিতাবুশ্ শিফায় বলেন, যে মুখমণ্ডলে চিবুক ছোট, সেই ধরনের মুখমণ্ডলকে মুকালছাম বলা হয়।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক গণ্ডদ্বয়ের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক গণ্ডদ্বয় সম্বন্ধে কয়েকটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। প্রথমত বলা হইয়াছে "সাহ্লুল খাদ্দায়ন।" সাহ্ল শব্দের অর্থ নরম এবং সমতল ভূমি। অতএব, এখানে মুবারক গণ্ডদ্বয় কোমল ও মোলায়েম ছিল বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত বলা হইয়াছে–সায়লুল খাদ্দায়ন। সায়লুন অর্থ প্রবহমান বা গতিশীল। এ অর্থ গ্রহণ করিলে মুবারক গণ্ডদ্বয় উঁচু-নীচুর ক্ষেত্রে যে স্থলে যেমনটি হইলে সুন্দরতম দেখাইবে, তাহাই ধরিতে হইবে।

তৃতীয়ত মাওয়াহিবে লুদ্নিয়া কিতাবে ইব্ন আছীর বলেন, 'ইসালা দর খাদ্দায়ন' অর্থাৎ লম্বাটে চেহারা। এ ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহার চেহারা বিশ্রী ধরনের গোলাকার ছিল না।

শায়খ ইব্ন হাজর আসকালানী এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এই যে, উপরিউক্ত বর্ণনা মতে সবকিছু মিলাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক চেহারা কি তবে তলোয়ারের মতো ছিল ? বস্তুত ইহা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

এ ক্ষেত্রে আমরা উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিব। বিভিন্ন বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারককে পূর্ণ-চন্দ্র, খণ্ডিত চন্দ্র, চন্দ্রের টুকরার ইত্যাকারে বহু উপমার দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন! بر دیده جائے آن ماه پاره نیست অর্থাৎ প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে সেই চন্দ্রের টুকরা পাওয়া যায় না। চন্দ্রের সর্বপ্রকার সুষমা ও মাধুর্যের তুলনা সুন্দর মুখমণ্ডলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সকল সৌন্দর্যের আধার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারায় উহা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আড়চোখে তাকাইতেন, তখন খণ্ডিত চন্দ্র এবং পুরাপুরি তাকাইলে পূর্ণ চন্দ্রের নমুনা তাঁহার চেহারায় পরিস্ফুটিত হইত। এ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নের উদাহরণগুলি পেশ করিতে পারি ঃ

১. সাহাবী কা'ব ইব্ন মালিক (রা)–যিনি সর্বাধিক প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতা লিখিতেন বলিয়া খ্যাতি আছে, তিনি সহীহ বুখারীতে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বক্রভাবে আমাদের দিকে তাকাইতেন, তখন পবিত্র মুখমণ্ডল খণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় মনে হইত। তিনি বলেন ঃ

كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر

'রাসূলুল্লাহ্র পেশানী-তে যখন ভাঁজ পড়িত, তখন তাঁহার নূরানী চেহারা চাঁদের টুকরার ন্যায় আলোকোজ্জ্বল দেখাইত।'

২. তাবারানীর হাদীসে হযরত জুবায়র ইব্ন মুত্ইম (রা) উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন মনে হইত তাঁহার চেহারা যেন অর্ধচন্দ্রাকার।

এ রিওয়ায়াতটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপালের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।

৩. কবি বলেন—

کسیکه تشنه لبِ تست باز میداند * که عین موج حیات است چین پیشانی

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'হে প্রিয় নবী (সা)! যে তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত সে ভাল করিয়াই জানে তোমার কপাল তাহার জীবন।'

অভিধানের কিতাব 'সুরাহ'-তে কপালের ভাঁজকে সারার (سرار) বলা হইয়াছে, যাহার বহুবচন আসারীর। পবিত্র হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, كَانَ تَبْرِقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী কপালের ভাঁজ ফুটিয়া উঠিত।

এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন চাঁদের মধ্যে যে কলঙ্ক অর্থাৎ কালো কালো দাগ আছে সেগুলিকে বর্ণনায় বাদ রাখার জন্য চাঁদের সহিত তুলনা না করিয়া চাঁদের টুকরার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেন কালো দাগগুলির কথা কাহারও কল্পনায় না আসে। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। কেননা, যে কোন সুন্দর জিনিসকে চাঁদের সহিত তুলনা করা হইলে উক্ত কালো দাগ সে তুলনার আওতাভুক্ত হয় না। বরং চাঁদের স্নিগ্ধতা এবং ঔজ্জ্বল্যের সহিতই তুলনা করা হইয়া থাকে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল চন্দ্রের বৃত্তের ন্যায় ছিল। আরবীতে চন্দ্রের বৃত্তকে 'হালা' এবং ফারসীতে 'খেরমানে মাহ্' বলা হয়।

এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, রাসূলে আকদাস (সা)-এর চেহারার নূর যেন চেহারা মুবারককে বেষ্টন করিয়া রাখিত। বস্তুত এ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকের বর্ণনা হইলেও তাঁহার কামালিয়াতের মহিমা ইহা দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা একজন আশেকে রাসূল (সা)-এর বহির্চক্ষু অপেক্ষা অন্তর্চক্ষুতেই বেশী প্রতিভাত হইত। কেননা, কোন আশেক তার মাশূকের প্রতি কেবল বহির্চক্ষু দ্বারাই দৃষ্টিপাত করে না। বরং অন্তর্চক্ষু দ্বারা তদপেক্ষা অনেক বেশী অবলোকন করে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এ বর্ণনা দ্বারা রাসূলে পাকের চেহারার ভিতর এবং বাহিরের সার্বিক তাজাল্লী দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা তাঁহাকে মোহিত এবং বিহ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যিকারভাবে বলিতে গেলে রাসূলে পাকের এ সৌন্দর্যের তুলনা করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর হাদীসেও এরূপ বৃত্তের বর্ণনা উল্লিখিত আছে। ইহা দ্বারা পূর্ণিমা রজনীর পূর্ণ চাঁদ অর্থ বুঝানো হইয়াছে। যেমন বায়হাকী আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এক হামদানী মহিলা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত হজ্জব্রত পালন করিয়াছি। আমি তাঁকে বলিলাম, তাঁহার নূরানী চেহারা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তখন মহিলাটি বলিলেন –

كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمْ اَرَقَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ

অর্থাৎ 'তাঁহার চেহারা ছিল চতুর্দশতম রাত্রির চাঁদের ন্যায়। আমি এর পূর্বে কিংবা পরে আর কোন দিন এরূপ চেহারা দেখি নাই।'

প্রিয় নবীর প্রেম পিপাসুগণ যাঁহারা তাঁহার মোহনীয় সৌন্দর্যের ধ্যানে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকেন, তাঁহারা যেন পূর্ণিমা রজনীগুলিতে গাফেল না থাকেন। কেননা, পূর্ণ চন্দ্রের রজনীগুলিতে এই সৌন্দর্যের মুশাহিদা করিলে নগদ দীদার লাভ হয়।

www.pathagar.com

আবূ হালা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُّفَخَّمًا يَتَلأْلأُ وَجْهُهُ تَلاَ لُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

প্রত্যক্ষকারীদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রেষ্ঠতম সম্মানী ও ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল যেন চতুর্দশতম রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও আলোকময় ছিল।

ভুবন উজ্জ্বলকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্যের যতটা উপমা কেবল চাঁদের সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে, সূর্যের সঙ্গে ততটা নয়। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার কারণ স্বরূপ জীবনী-রচনাকারিগণ বলেন, যেহেতু চাঁদ স্বীয় স্নিগ্ধ আলোর দ্বারা দর্শকের মনে পরিপূর্ণতা আনয়ন করিতে সক্ষম। চাঁদের দর্শনে অন্তরে ভালবাসা ও প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু চাঁদের স্নিগ্ধকিরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ সম্ভব। পক্ষান্তরে সূর্যের মধ্যে এ গুণাবলীর কোনটিই নাই। সূর্যের দিকে তাকাইলে চোখ ঝলসাইয়া যায়। ইহার কিরণও মানসিক প্রশান্তি এবং ভালবাসার উদ্রেক করিতে অক্ষম।

অবশ্য সার্বিক দিক দিয়া বিচার করিলে যেমন তাঁহার অসংখ্য গুণের বর্ণনা, মহান সত্তা, তাঁহার নূর, তাঁহার সার্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির বিবেচনায় তাঁহাকে সূর্যের সহিতও তুলনা করা যায়। কেননা, সূর্য যেমন দূর হইতেও চক্ষুকে ম্লান করিয়া দেয়, সূর্যের শক্তি, ইহার বিশালতা এবং ইহার প্রখর তেজকে মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না; তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁহার পবিত্র নূর ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম।

যেমন কবিতায় বলা হইয়াছে –

اعلى الورى فهم معناه فليس يرى * للقرب والبعد فيه غير منفحم

كالشمس تظهر العينين من بعد * صغيرة وكل الطرف من امم

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকৃত সত্তা বিবেক ও বুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে, নিকট ও দূরের কেহই তাঁহাকে পূর্ণভাবে অনুধাবন করিতে পারে না। সূর্যের রশ্মি যেমন দূর হইতেও চক্ষুকে ম্লান করিয়া দেয়, ঠিক তেমনি তাঁহার প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বুদ্ধি অক্ষম, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।'

বস্তুতঃ এই উপমা অবস্থা অনুযায়ী যথার্থ হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক দর্শন এবং অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী চেহারাকে চাঁদের সহিত তুলনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা গেল –

১. 'মাওয়াহেবে লুদুনিয়া'-তে নিহায়া হইতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আনন্দিত হইতেন, তখন তাঁহার নূরানী চেহারা আয়নার মতো পরিষ্কার হইয়া উঠিত এবং উহার মধ্যে তাঁহার পবিত্র চেহারার মতই দালানকোঠা এবং মানুষের ছবি ভাসিয়া উঠিত।

২. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চাঁদনী রাতে দেখিয়াছি। সেই সময় তাহার পবিত্র দেহে একজোড়া লাল

www.pathagar.com

জামা ছিল।[১] আমি একবার চাঁদের দিকে এবং একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকের দিকে দেখিতেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, চাঁদের চাইতে আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক বেশী উজ্জ্বল মনে হইতেছিল।

হযরত জাবিরের বক্তব্য 'আমার কাছে' বাক্যের দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য এবং মাধুর্য হইতে যে স্বাদ উপভোগ করিয়াছিলেন উহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে। ইহা তাঁহার নিজস্ব স্বাদ-উপভোগের ব্যাপার এবং প্রকৃতপক্ষেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য ছিল পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল সুন্দরতম বস্তুর সৌন্দর্য অপেক্ষা বেশী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান গুণাবলীকে কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় রূপক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুত ইহা কবিদের স্বভাব ও প্রকৃতিগত। নতুবা দুনিয়ার কোন বস্তুর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলীর কোন তুলনাই হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চারিত্রিক গুণাবলী ও দৈহিক সৌন্দর্য আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত। যাহার তুলনা পৃথিবীর কোন জিনিসের সাথে কোনকালেই হয় নাই; হইবেও না। সুবহানাল্লাহ্!

মুবারক চক্ষু

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক চক্ষুর দুইটি দিক বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম, চক্ষুর কোটর, ইহার আকৃতি ও অবস্থান ইত্যাদির বর্ণনা এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিশক্তি এবং কিভাবে দর্শন করিতেন তাহার বর্ণনা। আমরা এবারে প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ চক্ষুর কোটর, আকৃতি ও অবস্থানের বর্ণনা করিব।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষু মুবারক বড় এবং ভ্রূ লম্বা ছিল। এখানে চক্ষু বড় বলতে বুঝিতে হইবে যে, চক্ষু বেমানান ছোট ছিল না। আবার এতো বড়ও ছিল না যে, দেখিতে কদাকার মনে হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার ব্যাপারে সর্বসম্মত পদ্ধতি হইল মধ্যম ও সমতার পথ অবলম্বন করা। উল্লেখ্য যে, কোন সৌন্দর্যের মাপকাঠিই হইল মাঝামাঝি ধরন অর্থাৎ খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয়।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'আশকালুল আয়নায়ন' অর্থাৎ তাঁহার মুবারক চক্ষু শুভ্রের সহিত লালিমাযুক্ত ছিল। চক্ষুর শ্বেতাংশের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলি রগ থাকে। উল্লিখিত আশকালুল আয়নায়ন-এর অর্থ হইল উক্ত রগগুলি ছিল লাল বর্ণের।

আবার কোন কোন স্থলে 'শুহলা' শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে–যাহার অর্থ কালো এবং লালের মিশ্রণ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষু মুবারকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে এ বর্ণনা খুবই স্বল্পার্থ-বোধক। যেমন নিহায়াতে বর্ণিত হইয়াছে–

كَانَ اَشْهَلُ الْعَيْنَيْنِ اَشْهَلُ حُمْرَةٌ فِى سَوَادٍ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক চক্ষুদ্বয় আশহাল অর্থাৎ কালোর সহিত লালিমা মিশ্রিত ছিল।

---

১. একজোড়া কাপড় বলিতে চাদর এবং তহবন্দ বুঝায়। আরবীতে যাহাকে 'হুল্লা' বলা হয়। আর 'হামরা' বলা হয় লাল পাড় বিশিষ্ট কাপড়কে। ইহাই মুহাদ্দিসগণের অভিমত। পক্ষান্তরে যাঁহারা হুল্লা বলিতে রেশমী কাপড় ও হামরা বলিতে পূর্ণ লাল কাপড় মনে করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করিতেছেন।

www.pathagar.com

প্রিয়তমদের চোখের সৌন্দর্য বর্ণনায় 'আশহাল' নিঃসন্দেহে একটি উপমা বিশেষ। কিন্তু সবচাইতে বড় বর্ণনা হইল 'আশকালুল আইনাইন' অর্থাৎ সাদার মধ্যে লালিমা-মিশ্রিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষু মুবারকের বর্ণনার জন্য ইহাই যথাযথ বাক্য। কেননা, প্রতিযোগিতাকারী যুবকদের বর্ণনায় অনেক সময় 'আশকাল' শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

অবশ্য আরবী অভিধান কামূস-এ বর্ণিত আছে–আশকাল অর্থ লাল ও সাদা মিশ্রিত বর্ণ। যাহার মধ্যে লালিমা বিকশিত হয়। শুক্লা এবং এই ওজনে সুহ্রা সুন্দর চোখের একটি বিশিষ্ট উপমা। এই জন্য শুকলাকে অনেক সময় সুহ্রাও বলা হয়। সুহরা শব্দের অর্থ জাদুভরা চক্ষু, যে চক্ষু মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ আশকালুল আয়নায়ন বলিতে লম্বাটে ধরনের চিরল চিরল চক্ষুও বুঝাইয়াছেন। কামূস, শামায়েলে তিরমিযী এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কাযী আয়ায মালিকীর অভিমতও ইহাই। আর সায়্যিদুনা হযরত আলী মুরতযা (রা)-এর বর্ণনা বড়চক্ষু বলিতেও বাহ্যতঃ ইহাই বুঝানো হইয়াছে। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

রাসূলে পাকের মুবারক চক্ষুর বর্ণনায় উপরোল্লিখিত মতামত ছাড়াও 'আদআজুল আয়নায়ন' অর্থাৎ ঘোরকৃষ্ণ চক্ষু এবং 'আকহালুল আয়নায়ন বা সুরমামণ্ডিত চক্ষুও বলা হইয়াছে। ঘোর কৃষ্ণ বর্ণকে বলা হয় 'আদহাজ'। কামূসে অবশ্য আদআজ শব্দের অর্থ প্রশস্ত এবং বিস্ফারিতও করা হইয়াছে।

আর আকহালের বর্ণনার উদাহরণ কবির বর্ণনা –

بسان سرمه سیاه کرده خانه مردم * دوچشم توکه سیاه هند سرمه نا کرده

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষুদ্বয় সুরমা লাগানো ছাড়াই সুরমামণ্ডিত দেখাইত। মুবারক চক্ষুর দ্বিতীয় দিকের বর্ণনা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দর্শনের ধরন এবং দৃষ্টিশক্তির বর্ণনা।

সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্ধকার রাতেও তেমনি দেখিতেন ঠিক দিনের আলোতে যেমনটি দেখিতেন (বুখারী)। বায়হাকীতেও হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর বরাত দিয়া এই ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

কাযী আয়ায রচিত কিতাবে শিফাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূল (সা) সুরাইয়ার মধ্যে একাদশ নক্ষত্ররাজি পরিদর্শন করিতেন। সুহায়লী বলিয়াছেন–দ্বাদশ নক্ষত্র।

নবী (সা) আসমান অপেক্ষা যমীনের দিকে অধিক তাকাইতেন। বস্তুত ইহা তাঁহার লজ্জা ও শরমের পরিচায়ক। কোন কোন হাদীসে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি আসমানের দিকে কখনও কম কখনও বেশী সময় তাকাইয়া থাকিতেন। বস্তুতঃ ইহা তাঁহার নিকট ওহী নাযিলের সময়ই করিতেন। নচেত তিনি সব সময় দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া নবী (সা) অধিকাংশ সময় চোখের কোণা দ্বারা দর্শন করিতেন। ইহা তাঁহার অত্যধিক লাজুক স্বভাব ছিল বলিয়াই করিতেন। নতুবা কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইলে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া যাইতেন। ডানে-বাঁয়ে কিংবা পাশ ফিরাইয়া দেখিতেন না। এরূপ সোজাসুজি তাকানোকে জোকওমাক বলা হয়। এহেন পাশ ফিরিয়া শুধু ঘাড় ঘুরাইয়া দেখা অহংকারী কিংবা অলস লোকের কাজ।

www.pathagar.com

নবী (সা) সামনে এবং পিছন উভয় দিক দিয়া সমানভাবে দেখিতেন। যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সা) মুকতাদীদিগকে বলিতেন ঃ তোমরা আমার পূর্বে রুকূ ও সিজদায় যাইও না। কেননা, আমি তোমাদিগকে অগ্র ও পশ্চাৎ দিক হইতে একই সমান দেখিয়া থাকি। অতএব, আমার নিকট তোমাদের রুকূ ও সিজদা কোনটাই গোপন নাই। এরূপ দর্শন এবং তাঁহার দর্শনের আসল তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্ পাকই জানেন। অনুরূপভাবে এই গুণ কেবল তাঁহার চক্ষু মুবারকের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই এরূপ অবস্থা ছিল। কেননা, তার ভেদ-রহস্য পর্যন্ত পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার ভেদ-রহস্য জানার দাবী করা কুরআন মজীদের মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরই বিধান তুল্য। যুক্তি-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে এটা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রশ্ন হইল নবী পাক (সা)-এর এই দর্শন গুণ কি বাহ্যিক চক্ষুর না অন্তর্চক্ষুর ছিল ?

ইহা এরূপও হইতে পারে যে, তাঁহার সামনে ও পিছনে একই সঙ্গে একই রূপ দর্শন করা কেবল নামাযের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কেননা, নামায-কালীন সময়ে বান্দার সকল অবস্থা পূরা বিকশিত হয় এবং আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত হইয়া উঠে। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, তিনি সব সময়ই এইরূপ দেখিতেন এবং বহির্চক্ষু দ্বারাই তাহা দেখিতেন। বস্তুতঃ যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। অথবা ইহা ছিল নবী পাক (সা)-এর অলৌকিক গুণাবলীর একটি অন্যতম গুণ।

সামনে-পিছনে সমান দেখার ব্যাপারে আরো দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন কেহ কেহ বলিয়াছেন, নবী পাক (সা)-এর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে সূঁচের ছিদ্রের ন্যায় দুইটি চক্ষু ছিল, যাহা তিনি কোন সময়ই বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতেন না এবং উক্ত চক্ষুদ্বয় দ্বারাই তিনি পশ্চাতে অবস্থিত সকলের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেন। অথবা নামাযের সময় তাঁহার সম্মুখবর্তী কেবলার দেয়ালে আয়নার ন্যায় কিছু দেখিতে পাইতেন এবং সেখানে তাঁহার পশ্চাদবর্তীদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইত। ফলে তিনি তাহাদের কার্যাবলী অবলোকন করিতে সক্ষম হইতেন। বস্তুত কথা দুইটি বড়ই অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হয়। অতএব যদি কোন শুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়, তবেই শুধু ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অন্যথায় চিন্তার বিষয়। কেননা, জীবন চরিতবিদগণের নিকট কোন শুদ্ধ রিওয়ায়াতের মাধ্যমে ইহা প্রমাণিত নয়।

আর যদি ইহা 'রুইয়াতে কালবী' অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দর্শন বুঝানো হইয়া থাকে, তবে এ মতের সহিত জীবন চরিতবিদগণ একমত। কেননা, ইহা ঐ ইলম যাহা ওহী, ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে নবী পাক (সা) লাভ করিতেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কাল্‌বকে যেরূপ 'ইলমে আকলী' অর্থাৎ অনুভূতি ও বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁহার বাহ্যন্দ্রিয়ের মধ্যেও বিশ্বকে বুঝার জন্য জ্ঞানের প্রশস্ততা ও পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন। আর ছয় দিককে একই দিকে পরিণত করিয়াছিলেন।

এ ক্ষেত্রে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ হইল, কোন কোন রিওয়ায়াত মতে নবী (সা) বলিয়াছেন–"আমি একজন আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। এই প্রাচীরের পশ্চাতে কি আছে তাহাও আমি জানি না।" অতএব ইলমে আকলী কিংবা পিছনে দেখা তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে যে, এই রিওয়ায়াতের কোন ভিত্তি নাই আর এরূপ কোন বিশুদ্ধ বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তবু যদি তর্কের খাতিরে ইহার সত্যতা মানিয়াও লওয়া যায়, তবে আমরা বলিব, এই পিছনের বস্তু-দর্শনের কর্মকাণ্ডটি নামাযের অবস্থার সহিত খাস ছিল। কিংবা উহা যদি শুধু নামাযের অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত না ধরিয়া ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ অর্থে ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এ গুণটি যথাসময়ে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর কালবে পয়দা করিয়া দিতেন। যেমন সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর ইলম তাঁহার ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে উটনী হারানোর হাদীসটি হইতে বিরুদ্ধবাদীরা প্রমাণ আনয়ন করিয়া থাকেন। হাদীসটি হইতেছে, কোন কোন মুনাফিকের উক্তি ঃ 'মুহাম্মদ (সা) আকাশের খবর দিতে পারেন কিন্তু তিনি কি এইটুকু বলিতে পারেন না যে, তাঁহার উটনী কোথায় আছে ?" যখন এই অপবাদ রটনা নবী (সা)-এর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি নিজে কিছুই জানি না এবং নিজের মধ্য হইতে কিছুই প্রাপ্ত হই না; বরং যতটুকু আল্লাহ্ আমাকে জানান এবং যতটুকু পথ প্রদর্শন করেন কেবল ততটুকুই আমি জানি।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অবহিত করিয়াছেন যে, অমুক স্থানে উটনী আছে এবং একটি বৃক্ষের সহিত এইরূপভাবে উহার রশি জড়াইয়া আছে।" এই বক্তব্য অনুযায়ী সেখানে লোক পৌঁছিল এবং রাসূল (সা) কর্তৃক বর্ণিত অবস্থায় উটনীটিকে পাইল।

হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী (সা) নিজ হইতে কিছুই বলিতেন না; বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাহা তাঁহাকে অবগত করাইতেন কেবল ততটুকুই তিনি বলিতেন। চাই তাহা নামাযের মধ্যেই হউক কিংবা অন্য সময়েই হউক। অতএব, ইহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই।

পবিত্র কর্ণদ্বয়

নবী (সা)-এর কর্ণ সম্বন্ধে সীরাতে বেশী বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র জামে সগীরের বর্ণনায় এইটুকু পাওয়া যায় যে, তাঁহার কর্ণ মুবারক নিখুঁত ও সুন্দর ছিল।

নবী পাক (সা)-এর শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে এক হাদীসে নবী (সা) ফরমাইয়াছেন, আমি ঐ সকল বস্তু দেখিয়া থাকি যাহা তোমরা দেখ না এবং ঐ সমস্ত আওয়ায শুনিতে পাই যাহা তোমরা শোন না। এমনকি আমি আকাশের 'আতীত[১]'-ও শুনিতে পাই।

তিনি আরও বলেন যে, আকাশেরও এক ধরনের আওয়ায করার ক্ষমতা আছে। কেননা, আকাশে এক হাত কোন কোন রিওয়ায়াত মতে চারি আঙ্গুল স্থানও এমন নাই যেখানে কোনও ফেরেশতা সিজদা করে নাই।

কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, আকাশে বিপুল পরিমাণ ফেরেশতা দণ্ডায়মান অথবা সিজদার অবস্থায় আছে।

---

১. আতীত এক বিশেষ ধরনের মৃদু শব্দকে বলা হয়। আকাশের শব্দ, উষ্ট্রের (দুগ্ধ-দোহনের) পালানের শব্দ, খালি পেটের শব্দ, ব্যথা-বেদনায় উষ্ট্রের গোঙানীর শব্দ অথবা যে কোন প্রকারের মৃদু শব্দকে আতীত বলা হইয়াছে। নবী (সা) এ ধরনের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেন।

www.pathagar.com

কপাল মুবারক

নবী পাক (সা)-এর কপাল মুবারক সম্বন্ধে হযরত আলী (ক) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, তাঁহার কপাল واضح الجبين বা সুপ্রশস্ত ছিল। ইহা ছাড়া আরো কতিপয় বর্ণিত হাদীসে صلت الجبين ، واسع الجبين এবং واسع الجبهه উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ ধরনের সকল বর্ণনায় প্রশস্ত কপালই প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্ব বর্ণিত হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উক্তি হইল নবী (সা)-এর পেশানী মুবারকে যখন ভাঁজ পড়িত, তখন চাঁদের টুকরার ন্যায় তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় জানা যায়, সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং নূর ফুটিয়া উঠিত। সৌভাগ্যের চিহ্ন বা লিখন যাহা মাতৃগর্ভে লিখা হইয়া থাকে, তাহা কপালেই লিখিত হইয়া থাকে।

অনেক সময় কা'বাগৃহের দরওয়াযায় ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষ যখন কা'বাঘরের দরওয়াযায় কপাল মর্দন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কপালের রেখাগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ সৌভাগ্যের চিহ্নপ্রতিভাত হইয়া উঠে।

পবিত্র ভ্রূ-যুগল

নবী (সা)-এর মুবারক ভ্রূ-যুগল সম্বন্ধে হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে–তাঁহার পেশানী প্রশস্ত এবং ভ্রূ-যুগল মিলিত ছিল। قرن جبين বলা হয় যুগল মিলিত ভ্রূকে। পক্ষান্তরে নবী (সা)-এর দেহের গড়নের প্রশংসাকারী ইব্‌ন আবী হালা (রা) তাঁহার হাদীসে من غير قرن অর্থাৎ ভ্রূ-যুগলের লোম মিলিত ছিল না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সীরাতবিদগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত এই যে, নবী আকরাম (সা)-এর অসম্মিলিত ভ্রূ ছিল এবং বাহ্যত এই সম্মিলন বেশী ঘন ছিল না। যদ্দরুন উভয় ভ্রূর চুল পরস্পরে খুব বেশী জড়াইয়া গিয়াছিল এবং দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে এতটুকু খালি জায়গা ছিল না যাহাকে অসম্মিলিত বলা যাইতে পারে। বরং কতিপয় পাতলা চুলের সংমিশ্রণ ছিল। এই কারণে সম্মিলিত এবং অসম্মিলিত আখ্যা দেওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে ও ধারণায় শুদ্ধ মনে হইতে পারে।

সীরাতবিদগণ বলেন যে, দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে এক রগ ছিল যাহা ক্রোধান্বিত অবস্থায় দৃশ্যমান হইয়া উঠিত। এতদ্ব্যতীত ইব্‌ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসে أَزَجُّ الْحَوَاجِبْ আযুজ্জুল হাওয়াজিব আসিয়াছে। আযুজ্জু এর অর্থ হইল লম্বা কামান, অধিক চুল এবং প্রশস্ত ভ্রূ। অন্য এক রিওয়ায়াতে "আযুজ্জুল হওয়াজিবে সাওয়ায়েগ" আসিয়াছে। অর্থাৎ প্রশস্ত ভ্রূ ও ঘন চুল। কামূস ও সিহাহ্ কিতাবে "যুজ্জ'-এর অর্থ সরু ভ্রূ অথবা লম্বা ভ্রূ আসিয়াছে। ফারসীতে যাহাকে কামানে আবরু অর্থাৎ কামানের ন্যায় ভ্রূ বলা হয়। কিতাব বায়হাকীতে কোন কোন সাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে أَحْسَنُ الْوَجْهِ عَظِيْمُ الْجَبْهِ دَقِيْقُلْ حَاجِبَيْنِ দেখিয়াছি। অর্থাৎ রাসূলে পাকের চেহারা মুবারক অতীব সুশ্রী, সুপ্রশস্ত কপাল এবং ভ্রূ চিকন বা সরু ছিল। চিকন হওয়ার উদ্দেশ্য হইল ভ্রূর চুলের মধ্যে জটলা ছিল না আর চুল অধিক হওয়ার উদ্দেশ্য হইল, চুল কম ছিল এবং কোথাও কোথাও ছিল না এবং এইগুলি না বিক্ষিপ্ত ছিল, না উসকো-খুসকো ছিল। যদ্দরুন বেশী বেশী দেখা যাইত।

www.pathagar.com

পবিত্র নাক

নবী পাক (সা)-এর পবিত্র নাক সম্পর্কে হাদীসে আকনাল আন্‌ফ ও আকনাল ইরনীন আসিয়াছে। অর্থ উঁচুতা, যে চুল ভ্রূ সংলগ্ন নিম্নভাগে থাকে এবং 'আকনার' ব্যাখ্যায় 'সায়েলুল হাজেবায়ন "سائل الحاجبين" অর্থাৎ মধ্যম উচ্চতা করা হইয়াছে। সায়েল (سائل) সায়লান ধাতু হইতে উদগত। যাহার অর্থ নাকের উঁচুতা ও সরুতার মধ্যে এক প্রকার সমতা। এবং دِقَّتْ দিক্কাৎ শব্দ سيلان সায়লানের সমার্থেও আসে, যাহার অর্থ নাক মোটা না হওয়া।

নবী আকরাম (সা)-এর নাক মুবারক জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল ছিল। দর্শনার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত গভীরভাবে না দেখিত ধারণা করিত যে, তাঁহার (সা)-এর নাক মুবারক উঁচু ছিল। অথচ উঁচু ছিল না বরং এই উচ্চতা নূরের ছিল, ফলে প্রত্যেক বস্তুকে সুদৃশ্যমান দেখাইত। পক্ষান্তরে এই সৌন্দর্যতার মধ্যে সৌভাগ্যের ও নেক বখতিরও চিহ্ন নিহিত ছিল।

পবিত্র মুখ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক মুখ সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিম শরীফে সায়্যিদুনা জাবির (রা)-এর হাদীসে আছে ঃ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعُ الْفَمِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট ছিলেন। অনুরূপ হযরত ইব্‌ন আবী হালা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা শামায়েলে তিরমিযীর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারকের দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবের অধিবাসীরা প্রশস্ত মুখকে প্রশংসার যোগ্য মনে করিত এবং সংকীর্ণ মুখকে নিন্দনীয় জ্ঞান করিত। আরবের কবিগণ ছোট মুখকে মাশূক, প্রেমিক ও মাহবুব অর্থাৎ প্রিয়জনদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিত। যেন ইহা তাহাদের নিকট মেয়েদের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন ইহা কথা কম বলা এবং সুপ্রিয়তার প্রতি ইঙ্গিতবহ ছিল। অন্য এক হাদীসে ضَلِيْعُ الْفَمِ (প্রশস্ত মুখ)-এর উপর এই শব্দগুলি বর্ধিত করা হইয়াছে যদ্দারা প্রশস্ত মুখ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। يَفْتَحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَمُهُ بِاَشْدَاقِهِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশস্ত মুখে কথা বলা আরম্ভ করিতেন এবং সংকুচিত মুখের মধ্য দিয়া শেষ করিতেন। شِدْقُ শীনের যের দিয়া পাঠ করিলে অর্থ হইবে সংকীর্ণ মুখ। আর شَدْقُ যবর দ্বারা হইলে অর্থ হইবে প্রশস্ত মুখ । প্রশস্ত তালুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আরবে খতীবে আশ্‌দাক خَطِيْبُ اَشْدَقَ বলা হয়। এবং বিশুদ্ধভাষীকে মুতাশাদ্দিক مُتَشَدِّقُ বলা হয়; উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে বাক্য পরিপূর্ণরূপে বাহির হইত। ভাঙ্গা বা অসম্পূর্ণ শব্দ বাহির হইত না। সুতরাং এই বর্ণনা দ্বারা ভাষার বিশুদ্ধতা এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার প্রমাণ উভয়টাই এই স্থলে একত্রিত হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধভাষী ছিলেন এবং এই ধরনের দারায যবান নিন্দনীয় ও মন্দ যাহা কষ্টকল্প ও বানোয়াট এবং অসত্য হয়। সীরাতবিদগণ প্রশস্ত মুখ দ্বারা ঠোটদ্বয়ের সন্নিকটতা বুঝাইয়াছেন।

www.pathagar.com

মুবারক দাঁত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) مُفْلِجُ الْاَسْنَانِ ছিলেন। অর্থাৎ সম্মুখের দাঁত প্রশস্ত ছিল। সুরাহ অভিধানে মুফলিজ (مُفْلِجْ) -এর অর্থ সম্মুখের দাঁতসমূহের প্রশস্ততা করা হইয়াছে। অপর এক হাদীসে اَشْنَبُ مُفْلِجُ الثَّنَايَا অর্থাৎ সম্মুখের দাঁত অতীব উজ্জ্বল, চাকচিক্যময় এবং প্রশস্ত ছিল বর্ণিত হইয়াছে। اَشْنَبْ আশনাব-এর অর্থ হইল দাঁতের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যময়তা। কামূসে اَشْنَبْ বা অক্ষরে হরকত দিয়া অর্থ করা হইয়াছে ধবধবে, উজ্জ্বলতা ও দাঁতের মধুরতা। হযরত আলী (রা)-এর হাদীসে مُبْلِجُ الثَّنَايَا অর্থাৎ সম্মুখের দাঁত রৌশন ও চমকদার ছিল আসিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক ঠোঁটদ্বয় প্রশস্ত ছিল। যখন কথা বলিতেন, তখন এমন দেখা যাইত যেন সম্মুখের দাঁতগুলির প্রশস্ততার মধ্য হইতে নূর বাহির হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বুসাইরীর উপর রহম করুন তিনি কি সুন্দর কবিতাই না লিখিয়াছেন ঃ

كَاَنَّهَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِىْ صَدَفٍ + مِنْ مَعْدَنِهِ مَنْطِقُ مِنْهُ وَمُتَبَسِمٍ

যেন তাঁহার মুবারক দাঁতগুলি মুক্তার কৌটার মধ্যে লুক্কায়িত আছে।
যাহা নিজ খনির মধ্য হইতে বলেন এবং হাসি দেন।

তাবারানী আওসাত কিতাবে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র ঠোঁটকদ্বয় এবং পবিত্র মুখের মুহরা মাঢ়ী সকল লোকের চাইতে বেশী সুন্দর এবং সূক্ষ্ম ছিল। অন্য এক বর্ণনায় عَظِيْمُ الْاَسْنَانِ অর্থাৎ মুবারক দাঁতসমূহ বড় ছিল বলিয়াও আসিয়াছে। এই সকল বর্ণনার মর্ম ইহাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ সৌন্দর্য ও সুশ্রী অনুযায়ী সঠিক ও শুদ্ধ ছিল।

পবিত্র মুখের লালা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখের লালা বা পানি যাবতীয় অসুখ-রোগের এবং নবীপ্রেমিক হৃদয়বানদের জন্য পূর্ণ রোগ নিরাময় ছিল। যেমন ঐ হাদীসের কথাই উল্লেখ করা যায়, যে হাদীসে খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা)-এর চোখ উঠে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখের লালা লাগানো এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষু ঠিক হওয়া ও রোগমুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে এক বালতি পানি আনয়ন করা হয় এবং তিনি (সা) এক কুল্লি পরিমাণ পানি লইয়া উহাতে কুল্লি করেন। অতঃপর যখন ঐ বালতির পানি কূপের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন ঐ কূপ হইতে মৃগনাভির সুগন্ধির ন্যায় সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনাও সুপ্রসিদ্ধ যে, হযরত আনাস (রা)-এর গৃহের কূপের মধ্যে যখন তিনি (সা) মুখের লালা বা পানি ফেলেন, তখন পবিত্র মদীনার কোন কূপই উক্ত কূপের পানি হইতে অতি সুমধুর ছিল না। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একবার কিছু দুগ্ধপায়ী বাচ্চাকে আনা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ শিশু বাচ্চাদের মুখে তাঁহার পবিত্র মুখের লালা/পানি দিয়া দেন। ইহার পর তো ঐ বাচ্চারা এমন তৃপ্ত হইয়া যায় যে, ঐদিন তাহারা আর দুগ্ধই পান করে নাই। একদিন হযরত ইমাম হাসান মুজতবা (রা) ভীষণ তৃষ্ণার্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার পবিত্র জিহ্বা তাহার মুখে দিয়া দেন, তিনি উহা চুষিতে থাকেন। ইহার পর তিনি সারা দিন তৃপ্ত থাকেন। এই ধরনের অগণিত মু'জিযার কথা বর্ণিত আছে।

পবিত্র হাসি

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমনভাবে অট্টহাসি হাসিতে দেখি নাই যাহাতে ভিতরের সর্বশেষ গোশতের টুকরা দেখা যায় (উর্দূতে কাউয়া এবং বাংলাতে আলা জিহ্বা বলে)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ মুচকি হাসিমুখ থাকিতেন। কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি এমনভাবে হাসিতেন যে, তাঁহার নাওয়াজিয অর্থাৎ মাঢ়ীর সর্বশেষ দাঁত প্রকাশ হইয়া যাইত। 'নাওয়াজিয' সর্বশেষ দাঁতকে বলা হয় যাহাকে আক্কেল দাঁত বলা হয় এবং ইহা পূর্ণ বালিগ এবং পরিপূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইলে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাসির বর্ণনায় ইহা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ পায় নাই। কেননা, অধিক হাসির বর্ণনার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। কেহ আবার বলেন যে, এই ক্ষেত্রে "নাওয়াজিয"-এর অর্থ হইল সাধারণ মাঢ়ী এবং দাঁত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাসি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুচকি হাসি পর্যন্ত ছিল। (ضحك) হাসির প্রাথমিক স্তর হইল মুচকি হাসি, যেখানে আনন্দাতিশয্যে দাঁত দৃশ্যমান হইয়া উঠে। হাসির এই শব্দ যদি গলার ভিতরের হুলকুম বা কালকালা হইতে শোনা যায়, তবে উহাকে কাহকাহা বা অট্টহাসি বলা হইবে। নতুবা ইহাকে যিহেক বা খিলখিল হাসি বলা হইবে। আর যদি কোন প্রকার শব্দই না হয়, তাহা হইলে ইহাকে তাবাস্সোম বা মুচকি হাসি বলা হইবে। আরবী অভিধান সুরাহতে দুই ঠোঁট সম্মিলিত করাকে 'তাবাস্সোম' (মুচকি হাসি) বলা হইয়াছে। কিন্তু দাঁতসমূহের শুভ্রতা প্রকাশ হওয়াকে তাবাস্সোম বলা হইয়া থাকে ইহাই সুপ্রসিদ্ধ।

হযরত শায়খ ইব্ন হাজর (রা) বলেন, সকল হাদীস হইতে প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) বড় বড় অবস্থাসমূহে এবং অধিকাংশ সময় তাবাস্সোম বা মুচকি হাসির উর্ধ্বে অগ্রসর হইতেন না। হইতে পারে কখনও হয়ত ইহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকিবেন, তবে উহা ضحك খিলখিল হাসির সীমানা অতিক্রম করিয়া থাকিবে না। কিন্তু ইহা কখনও কাহকাহা (قهقه) অট্টহাসি হইতে পারে না। কেননা, ইহা মাকরূহ বা অপসন্দনীয়। অধিক হাসি এবং উচ্চস্বরে হাসিতে মানুষের গাম্ভীর্য লোপ পাইতে থাকে। বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন রাসূলে করীম (সা) হাসিতেন, তখন প্রাচীরসমূহ রৌশন হইয়া যাইত এবং দেয়ালের বা প্রাচীরের উপর মুবারক দাঁতসমূহের নূর (জ্যোতি) সূর্যের আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রন্দনের অবস্থাও এই রকমই ছিল। ক্রন্দনের শব্দ কখনও উঁচু হইত না, অবশ্য মুবারক চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইত এবং পবিত্র বক্ষ হইতে বিশেষ ধরনের এক আওয়ায শোনা যাইত। এমন আওয়ায যেন তামার ডেকচীতে জোশ বা বলক আসিয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় ইহাকে চাক্কি চলার শব্দের ন্যায় বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রন্দন করা আল্লাহ্ তা'আলার জালালী সিফাতের তাজাল্লী (বিকিরণ) অথবা অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের উপর ভালবাসা দান অথবা মৃত ব্যক্তির উপর রহমত প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করিয়া হইত। এই অবস্থা অধিকাংশ সময় পবিত্র কুরআন শ্রবণকালে অথবা কোন

www.pathagar.com

কোন সময় রাত্রিকালীন নামাযে জারি হইত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হাই উঠা হইতে নিরাপদে রাখিয়াছিলেন। কেননা, হাই তোলা আলস্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তিহীনতার আলামত। তারীখে বুখারী এবং মুসান্নাফে ইব্ন আবী শায়বাতে বর্ণিত আছে যে, لَمْ تَثَاوَبَ النَّبِيُّ قَطُّ। নবী করীম (সা) কখনও হাই তুলেন নাই। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে مَا تَثَاوَبَ نَبِيٌّ قَطُّ অর্থাৎ কোন নবী কখনও হাই তুলেন নাই। এক হাদীসে আসিয়াছে যে, হাই তোলা শয়তানের তরফ হইতে হইয়া থাকে। যদি হাই তোলা প্রাধান্য পায়, তখন উচিত যেন বাঁ হাত মুখের উপর রাখে অথবা ঠোঁটদ্বয় দ্বারা দাঁতের উপর চাপ দেয়। যাহারা হা, হা, হা অথবা আহ, আহ শব্দ প্রকাশ করে তাহারা অতিশয় মন্দ কর্ম করিয়া থাকে। এক রিওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, যে এই রকম করে, শয়তান তাহার মুখের মধ্যে হাসে।

মুবারক আওয়ায

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আওয়ায মুবারক অতীব প্রিয় ছিল। তাঁহার আওয়া-এর মাধূর্যতা সকল আওয়ায হইতে অতীব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল এবং কোন ব্যক্তিরই তাঁহার চেয়ে বেশী সুন্দর আওয়ায সুমধুর বাক্য ছিল না। তাঁহার (সা) বাক্যের প্রশংসায় আসিয়াছে اَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً। অর্থাৎ তাঁহার ভাষা ছিল অতীব বিশুদ্ধ এবং শব্দের উৎপত্তিস্থল (مخارج) হইতে অতীব সঠিকরূপে তিনি কথা বলিতেন। কেননা, তাহার মুবারক জিহ্বা দ্বারা অক্ষরসমূহের উৎপত্তি স্থান হইতে সঠিকরূপে আদায় করিয়া বাক্যালাপ করিতেন যাহা সর্বাপেক্ষা সঠিক ও শুদ্ধ ও উত্তম ছিল। অদ্যাবধি কোন এক ব্যক্তিও ঐরূপ সক্ষম হয় নাই। বিশুদ্ধতার সহিত কথা বলাকে আরবী ভাষায় সাদকে লাহজা (صِدْقِ لَهْجه) বলা হয়।

সায়্যিদুনা হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবীকেই সুন্দর আওয়ায ও সুন্দর চেহারা ব্যতীত প্রেরণ করেন নাই। এমনকি আমাদের নবী (সা) এই গুণাবলীতে সকল নবীর উর্ধ্বে ছিলেন। এই ক্ষেত্রেই কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

دردل براقر گرحق مزهاست + روئےاوازپیغمبر معخبره است

'প্রত্যেক উম্মতের হৃদয়ে যদি হকের মযা থাকে। তবে পয়গম্বরের চেহারা এবং আওয়াযও এক মু'জিযা বটে।'

যতদূর পর্যন্ত কাহারও শব্দ পৌঁছতে সক্ষম হইত না অতদূর পর্যন্ত তাঁহার মুবারক শব্দ বিনা কায় ক্লেশে পৌঁছিয়া যাইত। বিশেষ করিয়া ঐ সকল খুতবার (ভাষণ) আওয়ায যেগুলিতে উপদেশ, ভয়-ভীতি এবং আল্লাহ্কে ভয় করার উদ্দেশ্য থাকিত। বস্তুতঃ পর্দার ভিতরে বসিয়া থাকা পর্দানশীন মহিলারাও তাঁহার আওয়ায শ্রবণ করিতেন। তিনি হজ্জের দিনগুলিতে মিনায় যে ভাষণ (খুতবা) দিয়াছিলেন উক্ত ভাষণ সকল লোকের কান খুলিয়া দিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনযিলসমূহ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। (মিনায় অবস্থিত দূর ও নিকটের সকলেই শ্রবণ করেন)।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় ভাষণ দিতে থাকিতেন আর হযরত আলী মুরতাযা (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অগ্রে উহার ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করিয়া যাইতে থাকিতেন। ইহার মর্ম হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত কালামের (বাক্যের) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিত বর্ণনা করা। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ দূর করা, আওয়ায শোনানো নয়।

বিশুদ্ধ বয়ান

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক ভাষার বিশুদ্ধতা, একই বাক্যে বহু বাক্যের সমাবেশ (جَوَامِعُ الْكَلِمِ), অভূতপূর্ব বর্ণনাভঙ্গি, অদ্ভুত ও অমূল্য নির্দেশ ও সমাধান এত অধিক থাকিত যাহা কোন গবেষক ও চিন্তাবিদ হিসাব নিরীক্ষাকারীদের সীমানা ও গণনার বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে এমন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা এবং তাঁহার বয়ানের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে অধিক শুদ্ধ ও সুমধুর মিষ্টিভাষী দ্বিতীয় কাহাকেও সৃষ্টিই করেন নাই। একবার হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! না আপনি বাহিরে ভিন দেশে কোথায়ও গিয়াছেন, না আপনি বিভিন্ন লোকজনের সহিত উঠা-বসা করিয়াছেন, তবু আপনি এত সুন্দর শুদ্ধভাষা কোথা হইতে পাইলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ভাষা ও পরিভাষা যাহা দুষ্প্রাপ্য ও বিলীন হইয়া গিয়াছিল উহা আমার নিকট জিবরাঈল (আ) লইয়া আসেন, যাহা আমি মুখস্থ করিয়া লইয়াছি। উপরন্তু তিনি বলেন যে, اَدَّبَنِى رَبِّى فَاَحْسَنَ تَادِيْبِى আমার প্রভু আমাকে ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন, ফলে আমার ভাষাকে অতি উত্তম করিয়া দিয়াছেন।

আরবীয়দের যে শিক্ষা, যাহাদের ভাষা আরবী, উহার শুদ্ধতা, অলংকার, সৌন্দর্যের সহিত সম্পৃক্ত যে শিক্ষা উহাকে আরবী ভাষায় 'আদব' বলা হয়। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, বনী সা'দ ইবন বকর গোত্রে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধাত্রীমাতা সা'দিয়ার গোত্র। বনী সা'দের লোক সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী ছিল। এই কথা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি দোয়াদ (ض) অক্ষরকে উৎপত্তিস্থল (মাখরাজ) হইতে আদায়কারীদের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ আদায়কারী যাহারা দোয়াদ আদায় করিয়া থাকে। যদিও এই হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে কেহ কেহ স্বীয় নির্ধারিত হাদীসের পরিভাষার অধীন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অর্থের দিক হইতে ইহা সঠিক। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলিয়াছেন, আমি সমগ্র আরবের মধ্যে শুদ্ধভাষী ইহাই অগ্রগণ্য। কেননা, দোয়াদ অক্ষর আরবের সাথেই সম্পৃক্ত। দুনিয়ার আর কোন ভাষায় এই অক্ষর নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কোন এক ব্যক্তিও এমন নাই যে, যথাযথরূপে এই অক্ষর আদায় করিতে পারিবে। এই দোয়াদ (ض) অক্ষরের উৎপত্তিস্থল হইল ডানে-বায়ে اضراس। অর্থাৎ আকল দাঁতের মাঢ়ী। বলা হইয়া থাকে যে, বাঁ দিক হইতে এই অক্ষর আদায় করা অতি সহজ। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হইতে কোন কোন সাহাবী উভয় দিক হইতে এই অক্ষর আদায় করিয়া থাকিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতীব পরিষ্কার সুস্পষ্ট বাক্যে কথা বলিতেন। আলাদা আলাদাভাবে ঐ সকল বাক্যকে গণনা করা যাইত। তিনি একই বাক্যকে তিন তিন বার করিয়া বলিতেন

www.pathagar.com

যাহাতে উত্তমরূপে বুঝা যায়। এই বারবার বলা কথোপকথনে অনুল্লেখ্য কথা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীকরণের জন্য হয়ত হইয়া থাকিবে। নতুবা তিনি প্রত্যেক কথায় ও বাক্যে এই রকম করিতেন না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহ্ ভাল জানেন।

জাওয়ামিউল কালিমের বর্ণনা

খাতিমুল আম্বিয়া আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুবারক বাক্যসমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে তাঁহার ইরশাদ হইল, তিনি বলিয়াছেন ঃ اُوْتِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لِى الْكَلَامُ আমাকে জাওয়ামিউল কালিম দান করা হইয়াছে এবং আমার জন্য বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। জাওয়ামিউল কালিম ঐ সকল বাক্যকে বলা হয় যাহা খুবই সংক্ষিপ্ত হইবে এবং বহু অর্থের অধিকারী হইবে। আলিমগণ স্বীয় শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কতিপয় ঐ রূপ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া ঐ সকল পত্র ও পয়গাম বা বার্তা যেগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন বাদশাহ, শাসনকর্তা, তৎকালীন বড় বড় আমীর-উমারার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের ভাষায় সম্বোধন করিয়াছিলেন। আলিমগণ ঐগুলি একত্রিত করিয়া উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কিছু বাক্য যেগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক ও সৌন্দর্য ও জামালের পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। চিন্তা ও ধারণার মাধ্যমে উহার বর্ণনা দান করিব। কেননা, এই সকল বাক্য তাঁহার মুবারক জবান হইতে প্রকাশ পাইয়াছে।

حرف ازدهان دوست شنيدن چه خوش بوء + بازدهان آنلے شنيد ازدهان دوست

বন্ধুর মুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করা কতই না আনন্দের।

(১) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'প্রত্যেক কর্মের ভিত্তি তাহার নিয়্যতের উপর।'

এই হাদীস দীনের মূল। উসূলে দীনের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ উসূল এবং সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমৃদ্ধ অর্থ সম্পন্ন এবং অতীব কল্যাণকর। কোন কোন মহাত্মন ব্যক্তি ইহাকে দীনী ইলমের তৃতীয়াংশ বলিয়াছেন। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, দীন কথা, কর্ম ও নিয়তের সমষ্টির উপর নির্ভরশীল। কেহ আবার ইহাকে ইলমে দীনের অর্ধেকাংশ সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই দৃষ্টিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত আমল বা কর্ম দুই প্রকারের। এক আমল হইল ক্বালবের সহিত সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় হইল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সম্পৃক্ত। ক্বালবের আমলসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ত হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে আমল উক্ত অর্ধেক ইলমের (নিয়ত) সহিত সম্পৃক্ত হইবে। বরং দুই অংশের মধ্যে অতি বড় অংশ। প্রকৃতপক্ষে নিয়তই হইল ক্বালবী ও জিসমানী বা দৈহিক আমল এবং সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগীর মূল বুনিয়াদ।

এই প্রেক্ষিতে যদি ইহাকে সমস্ত ইলম বলা হয়, তবে এই আতিশয্য সঠিক হইবে।

(২) مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

'যে ব্যক্তি উত্তম পন্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে সে প্রত্যেক বাহুল্য কর্ম হইতে নিজকে গুটাইয়া রাখিয়াছে।'

www.pathagar.com

(৩) اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ

'মুসলমান সেই যাহার হাত এবং জিহ্বা হইতে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

(৪) لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের মধ্য হইতে কেহই ঐ সময় পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আপন ভাইদের জন্য উহাই পসন্দ করে যাহা নিজের জন্য পসন্দ করে।'

(৫) اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ كُلُّهُ

'দীনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নসীহত ও মঙ্গল (অর্থাৎ আপাদমস্তক) ।'

(৬) اَلْبَلاَءُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ

'কথা বলা বিপদের সৃষ্টিকারী।'

(৭) اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ

'মজলিসের বাক্যালাপসমূহ এক আমানত।'

(৮) اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ

'পরামর্শদাতা উক্ত কথার আমানতদার।'

(৯) تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ

'মন্দকর্ম ত্যাগ করা সাদকাস্বরূপ।'

(১০) اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

'লজ্জাশীলতা পুরোটাই মঙ্গল।'

(১১) فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

'ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ইবাদতের শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে উত্তম।'

(১২) اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنَتَانِ فِيْهِمَا اَكْثَرُ النَّاسِ

'সুস্থতা ও অবসরতা দুইটি ধ্বংসের নিআমত অথচ অধিকাংশ মানুষ ইহাতে লিপ্ত থাকে।'

(১৩) مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

প্রতারণাকারী আমাদিগের দলভুক্ত নহে।

(১৪) اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

সৎকর্মের পথ প্রদর্শনকারী সৎকর্মশীলের ন্যায়।

(১৫) حُبُّ الشَّيْءِ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ

কোন বস্তুর প্রতি ভালবাসা সে ব্যক্তিকে অন্ধ ও বধির বানাইয়া দেয়।

(১৬) اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

মানুষ আপন প্রিয়জনের (বা বস্তুর) সাথী হইবে।

www.pathagar.com

(১৭) لاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ اَهْلِكَ

আপন পরিজন হইতে স্বীয় যষ্ঠি উঠাইয়া লইও না।

(১৮) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهٖ

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে স্বীয় পরিজনের নিকট উত্তম।

(১৯) مَنْ اَبْطَا بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ

যে কার্যে অলস তাহার বংশ তাকে উন্নত করবে না।

(২০) زُرْغِبًّا تَزْدُدْ حُبًّا

সাক্ষাৎ কর বিরতির সহিত, পুঁজি কর মহব্বতের সহিত।

(২১) لَنْ يَشَاءَ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهٗ

কখনো কেহ দীনকে গ্রহণ করে নাই; যতক্ষণ না উহা তাহার উপর জয়ী হইয়াছে।

(২২) اِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءُ الدِّمَنِ

ডাষ্টবিনের শাক-সবজি হইতে তুমি নিজেকে রক্ষা কর।

(২৩) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

যে ব্যক্তি নিজেকে ধর্মপরায়ণ করিয়া তৈরী করিয়াছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য কাজ করিয়াছে সেই ব্যক্তিই উত্তম পুঁজি প্রস্তুতকারী ।

(২৪) اَلْفَاجِرُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهٗ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথচ আল্লাহ্‌র নিকট (অনুগ্রহের) আশা পোষণ করে, সেই ব্যক্তিই দুষ্কৃতিকারী।

(২৫) لَيْسَ الشَّدِيْدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهٗ

মানুষের উপর জয়ী হওয়া কঠিন কার্য নহে; বরং স্বীয় প্রবৃত্তির উপর জয়ী হওয়াই সুকঠিন।

(২৬) اَلثَّنَاءُ رَبِيْعُ الْمُؤْمِنِ

হাম্‌দ ও ছানা মু'মিনের বসন্তকাল।

(২৭) اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لاَ يَفْنٰى

অল্পে তুষ্ট হওয়া এমন ধন, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

(২৮) اَلْاِقْتِصَادُ فِى النَّفْقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ

ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবিকার অর্ধাংশ।

(২৯) اَلتَّوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ

মানুষের প্রতি ভালবাসা বুদ্ধির অর্ধাংশ।

www.pathagar.com

(৩০) حُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

উত্তম প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধাংশ।

(৩১) لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ

চেষ্টার ন্যায় কোন বুদ্ধি নাই।

(৩২) لاَ حُبَّ كَحُسْنِ الْخُلْقِ

উত্তম চরিত্রের ন্যায় কোন ভাল বস্তু নাই।

(৩৩) اَلرِّضَاعُ بِغَيْرِ الطِّبَاعِ

দুগ্ধ পান করানো অস্বাভাবিক।

(৩৪) لاَ وَرْعَ كَالْكَفِّ

জিহ্বা সংযত রাখার ন্যায় পরহেযগারী নাই।

(৩৫) اَلاِيْمَانُ يَمَانٌ

ঈমানই সব চাইতে বড় নিরাপত্তা।

(৩৬) لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَه

যে আমানতদার নহে, সে ঈমানদারও নহে।

(৩৭) لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

যে ওয়াদা পালন করে না, সে দীনদার নহে।

(৩৮) جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِه

ভাষার বিশুদ্ধতা মানুষের সৌন্দর্যের পরিচায়ক।

(৩৯) لاَ فَقْرَ اَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ

মূর্খতার চেয়ে অধিক দারিদ্র্য আর নাই।

(৪০) لاَ مَالَ اَعَزُّ مِنَ الْعَقْلِ

বুদ্ধির চেয়ে সম্মানজনক ঐশ্বর্য আর নাই।

(৪১) مَا جَمَعَ شَيْءٍ اَحْسَنَ مِنْ عِلْمٍ اِلٰى عِلْمٍ

কোন বস্তুকে কোন বস্তুর সহিত জমা করা কোন বিদ্যার সহিত কোন বিদ্যাকে জমা করা অপেক্ষা অধিক উত্তম নহে।

(৪২) كُنْ فِى الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبُ اَوْ كَعَابِرِىْ سَبِيْلٍ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ

পৃথিবীতে অপরিচিত অথবা মুসাফিরের ন্যায় বাস কর এবং নিজেকে কবরের বাসিন্দারূপে গণ্য কর।

www.pathagar.com

(৪৩) اَلْعَفْوُ لاَ يَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلاَّ عِزًّا

ক্ষমাশীলতা বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করে।

(৪৪) اَلتَّوَضُعُ لاَ يَزِيْدُ اِلاَّ رِفْعَتَه

বিনয় মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

(৪৫) مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَتِه

দান করিলে ধন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

(৪৬) كُنُوْزُ الْبِرِّكِتْمَانُ الْمَصَائِبِ

মুসীবত গোপন করার মধ্যে নেকীর ভাণ্ডার নিহিত।

(৪৭) لاَ تَظْهَرَ الشَّمَاتَةَ بِاَخِيْكَ فَيُعَاقِبُهُ اللّٰهُ وَيَبْلِيْكَ

আপন ভ্রাতার দোষত্রুটি প্রকাশ করিও না। হইতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।

এই বাক্যসমূহের সবগুলিই অদ্ভুদ ও বিস্ময়কর। দীন ও দুনিয়ার আচার-পদ্ধতি সম্বলিত। এই কায়দা-কানুনগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এই ধরনের অজস্র বাক্য রহিয়াছে। এইস্থলে মোটামুটি কয়েকটি মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বাক্যগুলির যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে বিরাট বিরাট দফতর লিখা সত্ত্বেও বর্ণনা শেষ হইবে না।

হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ كُلُّهُ। দীনের সবকিছুই উপদেশময় ও কল্যাণকর। প্রাচীন ও আধুনিক সর্বকালের ইলমই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। দুনিয়ার সমস্ত আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি একত্রিত হইয়াও যদি এইগুলির গুণাবলীর ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হন, তাহা হইলেও তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বর্ণনার এক ভাগও তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। কেননা, তাঁহারা যাহাই বর্ণনা করিবেন, তাহা নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ফসলমাত্র হইবে। বস্তুত দীনের মর্ম তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে। মূল ফারসী কিতাবে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতমাত্র প্রদান করা হইয়াছে।

পবিত্র শির

নবী (সা)-এর পবিত্র শির সম্বন্ধে ইব্ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মুবারক শির বড় ছিল। শির বড় হওয়া পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, বিবেকবান, তীক্ষ্ণ চিন্তার ও অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। কারণ, চিন্তার প্রক্রিয়ার প্রতিফলন মস্তিষ্কের উপর ঘটিয়া থাকে। হাদীসটিতে শির বড় বলার অর্থ তাঁহার মুবারক শির ছোট কিংবা বেমানান ছিল না; বরং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ছিল। মূলতঃ তাঁহার (সা) প্রতিটি অঙ্গের গঠন-প্রণালীতে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনায়ও এই মূলনীতি স্মরণ রাখিতে হইবে।

www.pathagar.com

পবিত্র কেশ

হযরত কাতাদা (র) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে নবী (সা)-এর কেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার কেশ রাজিল অর্থাৎ নরম ছিল। অপরাপর বর্ণনায় 'রাজাল', 'সাব্ত' ও 'কাতাত' শব্দও বর্ণিত হইয়াছে। সাবত ও সাবাত নরম এবং ঝুলন্ত চুল। আর 'কাতাত' ও 'কাতত' বলা হয় শক্ত ও কোঁকড়ানো চুলকে–যেমন হাবশীদের চুলকে বলা হয়। কোন কোন হাদীসে 'জা'দ' শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'জা'দ' শব্দের অর্থ শক্ত ও কোঁকড়ানো চুল। যাকে উর্দুতে ঘুঙ্গরওয়ালে বাল' বলা হয়।

বস্তুতঃ রাসূলে পাকের কেশ মুবারকের বর্ণনায় 'জা'দ' শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হইবে না। এবারে 'সাব্ত' ও 'কাতা'ত শব্দদ্বয় বিবেচনা করা আবশ্যক। আরবী অভিধানে সুরাহ্-এর বর্ণনা মতে কোঁকড়ানো চুলকে 'জা'দ', শক্ত ও কোঁকড়ানো চুলকে 'কাতা'ত এবং লম্বা ঝুলন্ত চুলকে 'সাব্ত' বলা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নবী (সা)-এর চুলকে সাব্ত ও কাতাত কোনটাই বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না; বরং উভয় প্রকারের মাঝখানে ধরিয়া লইতে হইবে। যাহাকে রাজিল এবং জা'দ অর্থাৎ কোঁকড়ানো চুল বলা হয়।

নবী পাক (সা)-এর চুলের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় দুই কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত, কোন বর্ণনায় কান পর্যন্ত আবার কোন বর্ণনায় কানের লতি পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কাঁধ পর্যন্ত ও কাঁধের নিকট পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ছিল বলিয়াও কোন কোন বর্ণনায় দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত মত-পার্থক্যগুলার সমন্বয় সাধন শুধু এভাবেই সম্ভব যে, ইহা অবস্থাভেদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ দৈর্ঘ্য হইয়া থাকিবে। কেননা, হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার পবিত্র কেশদামে তৈল মর্দন করিতেন ও চিরুনি দ্বারা আঁচড়াইতেন, তখন উহা দীর্ঘ দেখাইত অন্যথায় কুঞ্চিত হইয়া থাকিত। অথবা ছাঁটার পূর্বে লম্বা থাকিত এবং ছাঁটিলে ছোট হইয়া যাইত। উল্লিখিত মতের সমর্থন মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া এবং মাজমাউল বিহারে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বলা হইয়াছে– যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘদিন চুল কাটাইতেন না, তখন তাহা বেশ বড় হইয়া যাইত এবং ক্ষৌরী করানোর সময় ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া লইতেন। আবার এ কিতাবদ্বয়ের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব সময় চুল ছাঁটাইতেন– মুণ্ডন করাইতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং বলিয়াছেন, হজ্জ ও উমরাহ-র সময় তিনি সম্পূর্ণ মুণ্ডন করিতেন। হযরত উম্মে হানী (রা) বলিয়াছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা মুয়াযযমায় শুভাগমন করেন, তখন তাঁহার চুলে চারিটি বিনুনী ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মাথার চুল ছাড়িয়া রাখাই সুন্নাত। প্রাচীনকাল হইতে আরবদের মধ্যেও ইহাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু চুলের যত্ন লওয়া আবশ্যক। চুলে পর্যাপ্ত তৈল মর্দন এবং আঁচড়ানো কর্তব্য। নবী করীম (সা)-ও চুলের যত্ন লইতেন। চুলে তৈল মর্দন করিতেন এবং আঁচড়াইতেন। এমনকি কাহারও এলোমেলো চুল দেখিলে তিনি অপসন্দ করিতেন। এলোমেলো চুলধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া (অনেক সময়) বলিতেন যে, তোমরা উহাকে (শয়তানকে) দেখিয়াছ কি? অনুরূপভাবে তিনি কেতাদুরস্ত লম্বা চুলওয়ালাকেও পসন্দ করিতেন না।

www.pathagar.com

মোটকথা, তিনি (সা) সর্বাবস্থায় মধ্যম ধরনের সবকিছু পসন্দ করিতেন এবং এ কথা চুলের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ যাহাদের চিরুনি দিয়া আঁচড়াইয়া এবং পর্যাপ্ত তৈল ব্যবহার করিয়া চুল রাখিবার সামর্থ্য ও সঙ্গতি নাই, তাহাদের জন্য চুল ছোট করিয়া রাখাই উত্তম। অধিকন্তু আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) বলেন, আমি সেইদিন হইতে চুলকে শত্রু মনে করিয়া আসিতেছি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় জানাবাত বা নাপাকী রহিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। কেননা, আমরা দেখিতে পাই পূর্ববর্তী যামানা হইতে আজ পর্যন্ত যাহিদ, আবিদ ও পরহেযগার লোকদিগকে আমরা মুণ্ডিতমস্তক কিংবা ক্ষুদ্রাকৃতির কেশ বিশিষ্ট দেখিতে পাই। ইহার কারণ উক্ত হাদীসটি হইতে পারে। অন্যথায় ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহাদের চুলের যত্ন লইবার সামর্থ কিংবা অবকাশ অথবা এতদুভয়ের কোনটিই ছিল না।

ফাইদা

কেশ সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত নিয়ম-পদ্ধতিই সুন্নাত। অতঃপর কেশ বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে- রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুলে 'সাদল' করিতেন অর্থাৎ সাধারণভাবে আঁচড়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন যাহাতে কপালের উপরিভাগের চুলে কোন বিভক্তি থাকিত না। পক্ষান্তরে মুশরিকগণ চুল ফারক অর্থাৎ সিঁথির মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত করিত। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও চুলে ফার্‌ক করিতেন অর্থাৎ মধ্যবর্তীস্থলে সিঁথি তুলিতেন।

এই দুই ধরনের বক্তব্যের সমাধান নিম্নরূপ হইতে পারে-

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতেন না। তাই প্রথমে চুল সোজাসুজি আঁচড়াইতেন এবং পরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সিঁথি তুলিতে শুরু করেন।

২. সিঁথি আহ্‌লি কিতাবগণও তুলিত। প্রথমতঃ হয়ত রাসূলে করীম (সা) প্রথমে সাদল বা সোজাসুজি আঁচড়াইতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ফার্‌ক করাটাকে ভাল মনে করিলেন এজন্যে যে, আহ্‌লি কিতাবদের সম্মতি ও সন্তুষ্টি তাঁর উপরে থাকুক।

৩. হয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এ ধরনের কোন আল্লাহ্‌র হুকুম নাযিলই হয় নাই। তিনি যে সকল ব্যাপারে কোন ওহী না পাইতেন, সে সকল ব্যাপার পরবর্তী পর্যায়ে আহ্‌লি কিতাবগণের অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। এই কারণে ফারক বা সিঁথি তুলিতে শুরু করিয়াছিলেন। আলিমগণও এই জন্যেই ফার্‌ক করা সুন্নাত বলিয়া অভিহিত করেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, 'সাদল' এবং 'ফার্‌ক' উভয়ই শরীআতসম্মত। তবে ফার্‌ক করাই উত্তম বিধায় স্বাভাবিকভাবে যদি সিঁথি পড়ে, তবে তাহা রাখাই বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় চুলকে স্বীয় অবস্থায় (আঁচড়ানোর পর) ছাড়িয়া দেয়া কর্তব্য।

খিযাব লাগানো সম্পর্কে আলোচনা

খিযাব লাগানো সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে অধিকাংশ আলিম বিশেষতঃ মুহাদ্দিসীনের মতে ইহা মাকরূহ। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিযাব লাগাইয়াছেন কিনা সে বিষয়েও বিপুল মতপার্থক্য বিদ্যমান। কিছুসংখ্যক বর্ণনাকারীর অভিমত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত বার্ধক্যে উপনীত হন নাই যে, তাঁহার চুলে খিযাব লাগানোর প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

দেখা দিয়াছিল। কেননা, তাঁহার মাথায় ও দাড়িতে চৌদ্দ, সতের কিংবা আঠারটি চুলমাত্র শুভ্র হইয়াছিল। যখন চুলে তৈল মর্দন করা হইত, তখন উহার শুভ্রতা ঢাকা পড়িয়া যাইত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মাথা ও দাড়িতে কয়েকটি মাত্র পাকা চুল ছিল যাহা ইচ্ছা করিলে আমি গণনা করিতে পারিতাম। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও খিযাব ব্যবহার করেন নাই।

বিপরীতদিকে হযরত আনাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে চুল রক্ষিত ছিল তাহা ছিল খিযাব মাখানো। এতদসম্পর্কে আলিমদের অভিমত হইল যে,

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চুলে কোন খিযাব লাগানো ছিল না, বরং হয়ত কোন সুগন্ধি, খোশবু ইত্যাদি উহাতে সংমিশ্রিত ছিল, ফলে খেযাবযুক্ত মনে হইত। অথবা হযরত আনাস (রা) উহাকে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে খিযাবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর হাদীসেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

৩. মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়া হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (কেশ মুবারক) হলুদ রঙে রঞ্জিত দেখিয়াছেন। এ প্রেক্ষিতে আলিমগণ বলেন, (হয়ত) উহা খিযাব ছিল না; বরং যাফরান ছিল।

আমি আমার শায়খ শ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী (র)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, উহা খিযাব ছিল না। কেননা, কালো রং-এর উপর আর কোন রং-এর মিশ্রণ চলে না। হয়ত কোন হলুদ রং-এর দ্রব্য দ্বারা তিনি (সা) কেশ পরিষ্কার করিয়া থাকিবেন এবং তদ্দরুন কয়েকটি চুলে রং লাগিয়া থাকিবে। অতঃপর আমার শায়খ ইমাম নববী (রহ) হইতে একথাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, গ্রহণযোগ্য মত হইল, কোন কোন সময়ে প্রয়োজন বোধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুলে ও দাড়িতে রং বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করিতেন। তবে সাধারণত ইহা করিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে যিনি যে অবস্থায় দেখিয়াছেন তিনি সেই অবস্থারই বর্ণনা দিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই সত্য বর্ণনাকারী হইয়াছেন। ইহার এই ব্যাখ্যাই ঠিক বলে উক্তি করা হইয়াছে। কেননা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি বুখারী, মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে যেমন পরিহার করা যায় না, তেমনি ইহার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না।

রাসূল (সা) পরিণত বয়সে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বৃদ্ধ না হওয়া এবং তাঁহার কেশ রাশিতে পক্বতা না আসার ব্যাপারেও আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক পক্ব কেশ অপসন্দ করিয়া থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন অবস্থা কিংবা বস্তুকে অপসন্দ করিলে অপসন্দকারী কাফির হইয়া যাইবে।

যেমন বলা হইয়াছে–

هرکه مکروه پندارد از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزیرا کافر شود -

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন বস্তুকে মাকরূহ জানিবে, সে কাফির হইয়া যাইবে।'

ইহা ছাড়া হযরত আনাস (রা) বর্ণিত কতিপয় হাদীসে বলা হইয়াছে, مَا شَانَهُ اللّٰهُ بِالشَّيْبِ 'আল্লাহ্পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বার্ধক্য দান করেন নাই।' এই বাক্যে আলিমগণ

www.pathagar.com

আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পবিত্র হাদীসে বৃদ্ধকালকে সম্মানের ও আলোর কাল হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এমনকি নবী করীম (সা)-এর ভাষায় বৃদ্ধকালের ও বৃদ্ধ ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে।

ইহার সমাধান হিসাবে তাঁহারা মনে করেন হযরত আনাস (রা) সম্ভবতঃ হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা হযরত আবূ কুহাফার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ কুহাফার দাড়ি ও কেশরাজি যখন শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধাবস্থাকে যৌবনে পরিবর্তিত করিয়া লও। অর্থাৎ চুলের শুভ্রতাকে কৃষ্ণতায় পরিবর্তিত করিয়া লও।– ইহার ফলে হযরত আনাস (রা) মনে করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার্ধক্যকে পসন্দ করিতেন না। এতদসঙ্গে এই রিওয়ায়াতের বিপরীত কোন হাদীস তিনি শ্রবণও করেন নাই। কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, অন্যান্য রিওয়ায়াতগুলি হযরত আবূ কুহাফা সংক্রান্ত হাদীসটির দ্বারা মানসুখ বা বাতিল হইয়া গিয়াছে।

হযরত শায়খ শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যৌবনকাল শক্তি, ক্ষমতা ও ভীতি সঞ্চার করার উপযুক্ত সময়। দীনের শত্রুদের চক্ষে এক প্রবল শক্তি। কেননা, দীনের প্রকাশ এবং অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে যুবকের শক্তি ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়াছিল। তখন কাফির ও বেদীনের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া দ্বীনের বুনিয়াদকে মযবুত করার পিছনে যুব শক্তির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলে করীম (সা) তাই মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে যুবকদের ন্যায় দেখাইবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধদিগকেও খিযাব ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন।"

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বার্ধক্যের বিকাশ মাত্র গুটিকয়েক চুলের শুভ্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহাও হইয়াছিল অত্যধিক আল্লাহ্-ভীতির দরুন। যেমন তিনি বলিয়াছেন–

شَيَّبَتْنِىْ سُوْرَةُ هُوْدٍ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتِ وَعَمَّ يَتَسَاَلُوْنَ وَاِذَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ

আমাকে সূরা হূদ, ওয়াকিয়াহ্, মুরসালাত, 'আম্মা ইতাসাআলুন এবং ইযাশ্‌শামসু কুব্বিরাত- বৃদ্ধ করিয়াছে।

তবু বার্ধক্য যৌবনাবস্থার উপর পরিবর্তন ও হীনতার সৃষ্টি করিবে এমনটি নহে। বরং বার্ধক্যের সম্মান ও শ্রদ্ধা ঠিকই রহিয়াছে।

যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) এবং তদীয় পুত্র ইসহাক (আ)-এর মধ্যে বয়সের ব্যবধানের দরুন ইবরাহীম (আ)-কে বৃদ্ধ মনে হইত। এতদ্দর্শনে তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ يَارَبِّ مَا هٰذَا 'হে প্রভু ইহা কি?' জবাবে আল্লাহ্ বলিলেন, هٰذَا وَقَارٌ 'ইহা মর্যাদা'। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, رَبِّ زِدْنِىْ وَقَارًا 'হে আমার রব, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দাও।'

আল্লাহ্ আমাদিগকে অধিক বুঝবার শক্তি দান করুন।

www.pathagar.com

পবিত্র দাড়ি

রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র দাড়ি সম্পর্কে ইব্‌ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসে আছেঃ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلعم كَثُّ اللّحْيَةِ 'রাসূলে আকরাম (সা)-এর দাড়ি মুবারক অনেক বা ঘন ছিল।' كَثٌّ শব্দটির অর্থ অভিধানে বলা হইয়াছে كثيف অর্থাৎ মোটা বা ঘন এবং ইহার বিপরীত শব্দ হইতেছে لطيف সূক্ষ্ম বা মিহি। আরবী প্রবাদ আছে যে, ঘন দাঁড়ি কিংবা মোটা ও বেশী পরিমাণ দাড়িবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আরবীতে كث كثيف اللحية - رجل كث اللحية কিংবা الكث لحية বলা হয়। আল্লামা কাযী আয়ায (র) তাঁহার কিতাবুশ্ শিফা-তে যাহার দাড়ি বুক ভরিয়া যায় তাহাকে كث اللحية বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, রাসূলে আকরাম (সা)-এর দাড়ি মুবারক ঘন এবং বেশী ছিল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়ি মুবারক কি পরিমাণ লম্বা ছিল এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট তথ্য কিতাবসমূহে পরিলক্ষিত হয় নাই। ওয়াযায়েফুন্নবী নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দাড়ি স্বাভাবিকভাবে চারি আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা ছিল। ইহার চাইতে খাটো কখনো রাখিতেন না। তবে ইহার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ দাড়ি লম্বা করিয়া রাখাকে সৌন্দর্য বর্ধনের কারণ বলিয়া সাধারণত মনে করা হয়। বিশেষতঃ যখন উহা ঘন এবং অধিক বা বুক ভরিয়া থাকার মত হয়।

শিফা কিতাবের উদ্ধৃতি তিরমিযী শরীফের হাদীসের বিপরীত। তিরমিযী শরীফে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ দাড়িকে মুঠির মধ্যে লইতেন এব গোঁফ কর্তন করিতেন। বলিতেন– যে গোঁফ কাটিবে না, সে আমার দলভুক্ত নহে।

পক্ষান্তরে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে– মুশরিকদের বিরোধিতা কর– অপর এক বর্ণনা মতে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর এবং বেশী করিয়া বিরোধিতা কর। নিজ দাড়িকে লম্বা কর এবং ঠোঁটের চুলকে অর্থাৎ গোঁফকে ছোট রাখো।

আবার ঠোঁটের চুল অর্থাৎ গোঁফকে ছোট করার মধ্যেও আলিম সমাজের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কমপক্ষে ঠোঁটের কিনারা দেখা যায় এভাবে ছাঁটা উচিত। একদম কর্তন করা বিদআত। আবার কাহারও নিকট একেবারে ছোট করাই সুন্নাত এবং উপড়াইয়া ফেলা বিদআত। ইহা হানাফী মাযহাবের মত। কিন্তু হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় ঠোঁটের চুলকে মিসওয়াক দ্বারা উঠাইতেন। আমাদের মনে হয় ইহা কোন বিশেষ সময়ের জন্য হইয়া থাকিবে। অন্যথায় গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলাই হয়ত সুন্নাত। এই ছোটর পরিমাণ হানাফী মাযহাব মতে ভ্রূর চুলের সমান করিয়া রাখা।

সৈনিকগণের জন্য এই মতবাদ প্রযোজ্য নহে। সৈনিকগণের জন্য প্রযোজ্য মতবাদ হইল গোঁফের দুই প্রান্তকে বর্ধিত করা এবং মধ্যবর্তী অংশ ছাঁটিয়া ফেলা। কেননা, দুই প্রান্তের গোঁফ দীর্ঘ হইলে সে চেহারা শত্রুপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং ইহার দ্বারা সৈনিকের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ পায়। আলিমগণ বলেন– আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ ঠোঁটের দুই প্রান্তের গোঁফকে বর্ধিত করিতেন। কেননা, এই দুই প্রান্ত বর্ধিতকরণে মুখ ঢাকিয়া যায় না এবং খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার সময়ে গোঁফের সংস্পর্শে আসে না।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের (থুতনীর) চুলকে কর্তন করা কিংবা রাখা সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্তন না করাই উত্তম। তবে দুই পার্শ্বের অংশ কর্তনে কোন আপত্তি নাই।

এক্ষণে আমরা পুনরায় দাড়ি বৃদ্ধির সীমা সম্পর্কে আলোচনা করিব। হানাফী মতানুযায়ী বলা হইয়াছে চারি অঙ্গুলি পরিমাণের কথা। আমাদের মনে হয় ইহা সর্বনিম্ন পর্যায় বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ রাখিতে হইবে। ইহার কম করা চলিবে না। উলামায়ে দীন বলেন, যদি উলামা ও মাশায়খ উক্ত পরিমাণের চাইতে বর্ধিত রাখেন, তাহা হইলে ইহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু কতিপয় আলিম আবার বলিয়াছেন চারি অঙ্গুলির চাইতে বেশী হইলে ইহা কর্তন করা ওয়াজিব। সহীহ্ বুখারী শরীফের বাবুল লিবাস অধ্যায়ের শেষের একটি হাদীসও এই কথার সমর্থন যোগায়। হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) স্বীয় দাড়িকে মুষ্ঠির মধ্যে ধারণ করিতেন এবং উহার অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিতেন। হাদীসটির ইবারাত নিম্নরূপ ঃ

كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه -

'হযরত ইব্ন উমর (রা) যখন হজ্জ অথবা উমরা করিতেন, তখন তিনি স্বীয় দাড়িকে মুঠির মধ্যে লইতেন এবং উহার অতিরিক্ত অংশ কর্তন করাইতেন।' পক্ষান্তরে হযরত নাফি' হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'গোঁফকে খুব ছোট করিয়া ছাঁট এবং দাড়িকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও।'

এক্ষণে প্রশ্ন হইল, যখন দাড়িকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়ার নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন হযরত ইব্ন উমর (রা) স্বয়ং দাড়ি ছাঁটাইতেন কেন? অথচ তিনিই এই হাদীসটির বর্ণনাকারী। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এই হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এইভাবে জওয়াব দিয়াছেন যে, কর্তন সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি হজ্জ এবং উমরাহ্-র সহিত সম্পৃক্ত ছিল এবং অনারবদের ন্যায় কার্য করাকেও এই কার্য দ্বারা নিষেধ করা উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় দাড়িকে স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হইতে দেওয়াই ছিল সাহাবায়ে কিরাম ও মাশায়খ কিরামের অভ্যাস। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হযরত আলী (ক)-এর দাড়িতে তাঁহার বক্ষদেশ ভরিয়া যাইত। হযরত উমর ফারুক (রা) এবং যিন্নূরায়ন হযরত উসমান (রা)-এর দাড়ির কথাও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কথিত আছে, শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর দাড়িও লম্বা এবং চওড়া ছিল।

আনা শরীফ

নাভির নিম্নদেশে যে লোম উদ্গত হয় উহাকে 'আনা' বলা হয়। নাভির নীচের চুল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন হাদীসে রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা কর্তন করিতেন। কোন হাদীসে আসিয়াছে তিনি উক্ত লোম পরিষ্কার করার জন্য 'নাওরা' ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ উভয় রিওয়ায়াতের কোনটিই শক্তিশালী নহে। কেননা, এমত কার্যের জন্য

www.pathagar.com

নির্জন স্থানের আবশ্যক হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো হাম্মামখানায় (গোসলখানা) গমন করেন নাই। এমনকি তখন ইহার প্রচলন আরবে ছিল না বলিয়া তিনি ইহা দর্শনও করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরে আরবগণ কর্তৃক বাহিরের অনারব দেশসমূহ বিজয়কালে উক্ত হাম্মামখানার প্রচলন ঘটে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাম্মাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মহিলাদিগকে বিশেষ আবশ্যক না হইলে হাম্মামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনা মুবারক সম্বন্ধে কোন ধারণা অর্থাৎ কর্তন করিতেন কিংবা উপড়াইয়া ফেলিতেন অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন নিশ্চয় করিয়া করিতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমআর দিনে এবং কোন কোন বর্ণনায় বৃহস্পতিবার গোঁফ ও পবিত্র নখসমূহ কর্তন করিতেন। তবে নখ কর্তনের সময় তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি ডান হাতের তর্জনী অঙ্গুলি হইতে নখ কর্তন শুরু করিতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে সমাপ্ত করিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুল আঁচড়ান এবং তৈল মর্দন করানও পৃথকভাবে করিতেন না। বরং যখনই তৈল মর্দন করিতেন, তখনই চুল ও দাড়ি আঁচড়াইতেন। এবং স্বীয় পবিত্র নূরানী চেহারা আয়নায় দর্শন করিতেন। বস্তুতঃ আয়না দেখা তাঁহার পক্ষেই ছিল শোভনীয়। কেননা তাঁহার ভুবন উজ্জ্বলকারী রূপ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতির উৎস এবং সীমাহীন তত্ত্বরাজির বিকাশ-স্থল ছিল। যেমন কবি বলিয়াছেন–

ز آئینه حسن ترا جدائی نیست * غرض تجلیٔ حسن است خود نمائی نیست

আয়না হইতে (ইয়া হাবীব!) তোমার রূপ মাধুরী পৃথক নহে; আসল কথা হইল, তোমার চেহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই রূপের রশ্মি।

পবিত্র গ্রীবা

রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র গ্রীবার প্রশংসা ইব্ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসে বলা হইয়াছে, كان عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র গ্রীবা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং 'দুমিয়া'র ন্যায় সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য ছিল।

নিহায়া কিতাবের মতে হাতির দাঁতের প্রতিমাকে 'দুমিয়া' বলা হয়। পক্ষান্তরে আরবী অভিধান কামূসের মতে, শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত মূর্তিকে 'দুমিয়া' বলা হইয়াছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র গ্রীবার সাথে ঘৃণ্য মূর্তি বা প্রতিমার তুলনা করা তাঁহার ইয্যতের পরিপন্থী, তথাপি যেহেতু ঐ ধরনের মূর্তি তৈরী করিতে যথেষ্ট কারুকার্য করা হয় এবং উহা যথেষ্ট সৌন্দর্যমণ্ডিতও হইয়া থাকে, সেহেতু কেবল সৌন্দর্যের তুলনার খাতিরেই উক্তরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শামাইলে তিরমিযী কিতাবের টীকাতে অবশ্য এক স্থানে হরিণকে 'দুমিয়াতুল গাযাল' এবং অপর স্থানে দুমিয়া অর্থে হরিণ শাবক বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন অভিধানের পুস্তকেই এ ধরনের অর্থ পাওয়া যায় না।

হাদীসে বর্ণিত صفاء الفضة (রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল) বলিতে তাঁহার পবিত্র গ্রীবা বা ঘাড়ের বহিরাংশের বর্ণনাই অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে জটিল কোন অর্থ নাই। কেননা, উক্ত

www.pathagar.com

হাদীসটির অনুরূপ আরেকটি হাদীস 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' নামক কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি হইল–

قال ابو هريرة رضى الله عنه كان جيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صُغ من فضة ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গলা ও গর্দান মুবারক এমনি সাদা ছিল যেন উহা রৌপ্য নির্মিত ছিল।

অতএব অনুমিত হয় ইহা ছিল তাঁহার একটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র স্কন্ধ

منكب ـ م অক্ষরে যবর এবং ك অক্ষরে যের দিলে ইহার অর্থ হয় স্কন্ধ বা দুই বাহুর সংযোগ স্থল। আরবী অভিধান সুরাহ্-তেও অনুরূপ অর্থই করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, দুই বাহুর মূলস্থলকে মানাকিব বলা হয়।.

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র স্কন্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দুই স্কন্ধের মধ্যে দূরত্ব ছিল। بعيدا ما بين المنكبين দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানকে তাসগীরের সীগা بُعَيْد -এ রূপান্তরিত করিয়াও পাঠ করা হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা প্রশস্ত বক্ষ অর্থ ধরা হইয়া থাকে। অথচ বক্ষের প্রশস্ততা ও স্কন্ধের প্রশস্ততা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যেমন বলা হয়, প্রশস্ত বক্ষ স্কন্ধদ্বয় হইতে দূরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে বক্ষের বর্ণনা এবং স্কন্ধের বর্ণনা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই জন্য যে, ইহারা একে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তজ্জন্য স্কন্ধ এবং বক্ষের বর্ণনা একই সঙ্গে আসিতে পারে। কিন্তু এই বক্ষ বলিতে প্রকাশ্য অর্থবহ বক্ষই বুঝানো হইয়াছে। আর অপ্রকাশ্য বক্ষ– যাহার সম্বন্ধে কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে الم نشرح لك صدرك আমি কি তোমার বক্ষকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেই নাই?– এ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোট কথা হইল– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্কন্ধদেশ চওড়া ছিল– ইহাই প্রকৃত বর্ণনা।

পবিত্র বক্ষ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র বক্ষ বাহ্যিক দিক হইতে প্রশস্ত এবং স্ফীত ছিল। নতুবা বাতেনী বক্ষ সম্বন্ধে কালামুল্লাহ্ শরীফে উক্ত হইয়াছে الم نشرح لك صدرك (হে বন্ধু!) আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই। এই আয়াত দ্বারা তাঁহার বুলন্দ মরতবার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেননা, যাবতীয় ইয্যত ও মরতবার দিক দিয়া সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা একমাত্র সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই ছিল।

পবিত্র কাল্‌ব

পবিত্র কাল্‌ব সম্বন্ধেও মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে যেহেতু ইহা একটি বাতেনী অঙ্গ, সেহেতু ইহার প্রকাশ্য কোন বর্ণনার অবকাশ নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার। এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে শুধুমাত্র একটি ধারণাই করা সম্ভব। তবে কোন কোন রিওয়ায়াত মতে দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে কাল্‌বের অবস্থান কিংবা কাতাদ এবং মাথার খুলির কথাও উক্ত হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে عظيم مشاش المنكبين

www.pathagar.com

والكتد এখানে كتد অর্থ দুই কাঁধের মিলন-স্থল এবং مشاش বলিতে মাথার খুলিকে বুঝানো হইয়াছে।

পবিত্র পেট

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেট ও বক্ষ মুবারকের মধ্যে কোন উঁচু-নীচু ছিল না। বরং এ দুইটি অঙ্গ সমান্তরাল ছিল। যেমন একটি রিওয়ায়তে বলা হইয়াছে- مفاض البطن অর্থাৎ পবিত্র বক্ষ ও শেকেম এক সমান ছিল। বক্ষ হইতে পেট কিংবা পেট হইতে বক্ষ উঁচু কিংবা নীচু ছিল না।

পবিত্র পেট সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর একটি বর্ণনায় مفاض البطن উক্ত হইয়াছে। যাহার অর্থ ব্যাখ্যাকারিগণ واسع البطن শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। বাংলায় আমরা ইহাকে প্রশস্ত পেট বলিতে পারি।

এই বর্ণনার দ্বারা শুধু পেটের প্রশস্ততা বুঝানোর ফলে একই সঙ্গে তাঁহার বক্ষ মুবারকের প্রশস্ততাও বুঝানো হইয়াছে। তবে বেশীর ভাগ বর্ণনাকারী مستوى البطن والصدر বর্ণনা করিয়াছেন- যাহা দ্বারা পেট এবং বক্ষের সমান্তরাল হওয়াই বুঝানো হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পেটের বর্ণনা দান করিতে গিয়া বলিয়াছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেট মুবারক দেখিয়াছি। উহা কাগযের পরতের ন্যায় একটির পর একটি ভাঁজ করিয়া রাখা ছিল।

বক্ষের পবিত্র কেশ

হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষের পবিত্র কেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ذو مسربة বলিয়াছেন। সরু চুলের রেখাকে مسربة বলা হয়। ফলে নাভি হইতে বক্ষদেশ পর্যন্ত একটি রেখার ন্যায় বিস্তৃত থাকে। সরু ও মিহি সূত্রের বা রেখার ন্যায় চুলকে خيط বা রেখার সাথেও তুলনা করা হইয়া থাকে। ইব্‌ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসেও উক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি دقيق المسربة শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আরবী অভিধান সুরাহ-তে বলা হইয়াছে- বক্ষ ও নাভীর মধ্যে অবস্থিত রেখার ন্যায় সরু কেশরাজিকে مسربه বলা হয়। শব্দটি سرب মূলধাতু হইতে উদ্‌গত। যাহার অর্থ সড়ক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষ ও পেট মুবারকের বর্ণিত চুল ছাড়া উক্ত দুই স্থলের আর কোথাও চুল ছিল না। ইব্‌ন আবী হালা (রা)-এর উক্ত হাদীসে এ বিষয়ে বলা হইয়াছে- عارى الثديين والبطن سواء ذالك। অর্থাৎ তাঁহার বক্ষের দুই পার্শ্বে এবং পেটের সরু রেখার ন্যায় চুল ছাড়া উক্ত দুই স্থলে আর কোন প্রকার চুল ছিল না। ইহা ছাড়া অপরাপর স্থানের সম্বন্ধেও উক্ত হাদীসেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনাটিতে বলা হইয়াছে ঃ

اشعر الذراعين والساعدين والمنكبين واعالى الصدر والساقين -

অর্থাৎ তাঁহার দুই বাহু, বাজুদ্বয়, দুই কাঁধ, পবিত্র বক্ষের উপরিভাগ ও দুই হাঁটু চুল বিশিষ্ট ছিল।

এই সকল বর্ণনা ব্যতীত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় اجرد। অর্থাৎ কেশ শূন্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা একেবারে কেশশূন্য বুঝানোর জন্য বলা হয় নাই। বরং

www.pathagar.com

اشعر।-এর বিপরীতার্থক বর্ণনা হিসাবে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আশআর বলিতে সারা শরীরে বাহুল্য চুলধারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। যাহা দৃষ্টিকটুও বটে। এইজন্য ইহার বিপরীত اجرد। শব্দ দ্বারা তাঁহার পবিত্র দেহে যে চুলের বাহুল্য ছিল না– ইহাই বুঝানো হইয়াছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক চুলশূন্য ছিল না, বরং সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতে যতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন তাহাই ছিল। অতিরিক্ত বা বাহুল্য চুল ছিল না।

পবিত্র বগল

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র বগলদ্বয়ের রং দেহের রঙের ন্যায় সাদা ছিল। তাবারী বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কেননা, সাধারণ মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রং হইতে বগলের রং ভিন্নতর হইয়া থাকে এবং ইহা কাল্‌চে ধরনের হইয়া থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বগলও শরীরের সাধারণ শুভ্রতার সহিত মিশানো ছিল।

আল্লামা কুরতুবীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি কিছুটা অতিরিক্ত বলিয়াছেন। তাহা হইল– তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বগলে চুলই ছিল না। অবশ্য কেহ কেহ ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা, শুভ্রতা বুঝাইতে চুলই ছিল না এইরূপ বলা ভুল। শুভ্র হইলেও তাহাতে চুল থাকিতে পারে এবং যদি দু-বগলে চুল না-ই থাকিত, তাহা হইলে সে চুল উপড়ানোর হাদীস থাকা না থাকার কোন প্রশ্নই আসিত না।

বগলের চুল পরিষ্কার করার ব্যাপারে কোন হাদীসে نَتَفَ اِبْطَيْه। এবং কোন হাদীসে عفر ابطيه। আসিয়াছে– যাহার অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) বগলের চুল উপড়াইয়া ফেলিতেন।

বগলের চুলের রঙ সম্বন্ধে কোন হাদীসে عفر শব্দ আসিয়াছে। পুরাপুরি সাদা নহে এরূপ রঙকে عفر বলা হয়। হারাবীও এরূপই বলিয়াছেন। আরবী অভিধান সুরাহ্‌তে বলা হইয়াছে– লালচে আভাযুক্ত সাদাকে عفر। বলা হয়। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বগলের চুরের রং কালোও ছিল না আবার সাদাও ছিল না। এইরূপ এক প্রকার মিশ্র রং ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সাধারণত মানুষের বগলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র বগলের গন্ধ কস্তুরীর ন্যায় ছিল। হাদীসে আসিয়াছে জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জড়াইয়া ধরেন। তখন তাঁহার পবিত্র বগল হইতে কস্তুরীর ন্যায় সুঘ্রাণ বাহির হইতেছিল।

পবিত্র পৃষ্ঠদেশ

তাঁহার পবিত্র পৃষ্ঠদেশের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় ছিল। ইহা দ্বারা পবিত্র পৃষ্ঠদেশ পরিচ্ছন্ন, শুভ্র এবং সমতল ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মোহরে নুবুওয়াত

নবী করীম (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নুবুওয়াত ছিল। বলা হইয়াছে ঃ

بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين

www.pathagar.com

অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থলে মোহরে নুবুওয়াত ছিল এবং তিনি (সা) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ছিলেন। উহা শরীরের চেয়ে কিঞ্চিৎ স্ফীত, শরীরের ন্যায় রং বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল ছিল।

خَاتَمُ শব্দটি خَتْمِ শব্দের কর্তৃবাচক ক্রিয়া যাহার অর্থ সর্বশেষে আগমনকারী। আর خاتم শব্দের অর্থ সীলমোহর অথবা আংটি। অর্থাৎ উক্ত মোহর সেই বস্তু যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পর আর কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা নাই।

এই উপাধি তাঁহাকে নিম্নরূপ কারণে দেওয়া হইয়াছিল ঃ

১. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই নামে তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা এই পরিচয় লাভ করা সম্ভব যে, ইনিই সেই বহু ঘোষিত সর্বশেষ নবী– যাঁহার সম্বন্ধে সুসংবাদ যুগে যুগে দেওয়া হইয়াছে।

২. উক্ত উপাধির দ্বারা তাঁহাকে যাবতীয় কুৎসা ও অপবাদ হইতে নিরাপদ রাখা হইয়াছে। যেমন কোনও বস্তুর মোড়কে সীলমোহর করা থাকিলে সেই মোড়কের অভ্যন্তরীণ বস্তুর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ঠিক তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্ত মোহর তাঁহাকে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে সন্দোহীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছিল।

৩. বস্তুতঃ মোহরে নুবুওয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট রহমতের নিদর্শন। যাহা দান করিয়া তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হইয়াছে। মুস্তাদরাকে হাকিম প্রণেতা হাকিম হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই– যাঁহার দক্ষিণ হস্তে নুবুওয়াতের কোন নিদর্শন ছিল না। কিন্তু আমাদের নবী পাক (সা)-এর তাহা ছিল দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থলে। যেমন কবি বলিয়াছেন–

نبوت راتوان آں نامه درمشت * كه ازتعظيم دارد مهر پشت

সকল নবীর নুবুওয়াতের পরিচয়স্থল হইল তাঁহাদের হস্ত আর শেষ নবীর সম্মানে তাঁহার নিদর্শন হইল পৃষ্ঠদেশে।

হযরত শায়খ ইব্‌ন হাজর মক্কী (র) মিশকাত শরীফের শরাহ-তে বলেন, মোহ্‌রে নুবুওয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বাক্য লিখিত ছিল–

الله وحده لا شريك له توجه حيث كنت فانك منصور

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আপনার দৃষ্টি যেদিকেই পতিত হইবে আপনিই সাহায্যপ্রাপ্ত হইবেন।'

সকল রিওয়ায়াতই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মোহরে নুবুওয়াত নূরের তৈরী ছিল এবং উহা হইতে নূর বিকিরিত হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বদাই ইহা লোকচক্ষু হইতে পর্দা করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার ওফাতের পর ইহা গায়েব হইয়া যায়। এই গায়েব হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। (ক) কেহ কেহ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ কিংবা মতবিরোধ উপস্থিত হইলে এই মোহরে নুবুওয়াত গায়েব হওয়াকেই ওফাতের নিদর্শন বলিয়া ধরা হইবে। (খ) অথবা ইহাও হওয়া সম্ভব যে, যেহেতু ইহা ছিল তাঁহার নুবুওয়াতের দলীল বিশেষ এবং যতদিন পর্যন্ত এ দলীলের প্রয়োজন

www.pathagar.com

ছিল, ততদিন পর্যন্তই ইহা ছিল এবং ওফাতের দরুন ইহার প্রয়োজনীয়তা খতম হইয়া গিয়াছিল। (গ) অথবা ইহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কোন রহস্য মিশ্রিত ছিল যাহা একমাত্র তিনিই ভাল জানেন। কোন নবীর ওফাতের সাথে সাথে তাঁহার নুবুওয়াত খতম হইয়া যায় এই ধারণা ঠিক নহে। কেননা, নুবুওয়াত ও রিসালত মরণের পরেও স্থায়ী থাকে।

মোহরে নুবুওয়াত দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া অধিকাংশ রিওয়ায়াতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু কিছু কিছু রিওয়ায়াতে ইহার ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। যেমন একটি রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে عند ناغض كتفه اليسرى অর্থাৎ ইহা বাম কাঁধের হাড়ের সন্নিকটবর্তী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই রিওয়ায়াত অধিকাংশ রিওয়ায়াতের বিপরীত মনে হইলেও আসলে তাহা নহে। আল্লামা তোরপশ্তী বলেন, ইহা দ্বারাও ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতই বুঝায়। কেননা, বাম পার্শ্বের হাড়ের সন্নিকটবর্তী স্থল ও মধ্যবর্তী স্থল প্রায় একই জায়গা। নাগিয বলা হয় নরম হাড়কে যাহা বাহুর শেষপ্রান্তে বা পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানের সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকে। নাগিযকে কোন কোন স্থলে গাযরূফও বলা হয়। অতএব আমরা এ সিদ্ধান্ত আসিতে পারি যে, ডাইনে হউক কিংবা বামেই হউক, প্রকৃতপক্ষে উহা পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানেই ছিল।

রাবীগণ মোহরে নুবুওয়াতের আকৃতি ও গঠন সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়াছেন এবং যাহাতে সহজে বোধগম্য হয় তজ্জন্য বস্তুর সহিত উঁহার উপমাও প্রদান করিয়াছেন। যেমন কেহ কেহ উহাকে কবুতরের ডিমের সাথে তুলনা করিয়াছেন। দেহে সাধারণত লাল লাল যে সকল স্ফোটক জাতীয় গোশতের শক্ত গুটি হয়, তাহার সহিতও কেহ কেহ ইহার উপমা দিয়াছেন। আরবীতে ইহাকে 'গুদ্দাতে আহমার' বলা হয়। আরবী অভিধান সুরাহ-তেও অনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে। অর্থাৎ স্ফীত ও উঁচু লাল বর্ণের গোশ্তপিণ্ডকে গুদ্দাত এবং ইহার বহুবচন গুদূদ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও কেহ কেহ বলিয়াছেন উহার রং কালো অথবা সবুজ ছিল। যেমন ইব্ন হাজর মাক্কী শামাইলে তিরমিযীতে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার মোহরে নুবুওয়াতকে 'যের্রে্ হাজালা' বলিয়াও কোন কোন রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে। 'যেররে হাজালা' শব্দটি আসলে রূপক অর্থবহ এবং ইহার দ্বিবিধ অর্থ পাওয়া যায়। প্রথমত, যেব্র্ বলা হয় জামার গলায় ব্যবহৃত গোলাকার বোতামকে এবং হাজালা বলা হয়–বাসরঘরে বধূকে সুসজ্জিতাবস্থায় উপবেশনের নিমিত্ত প্রস্তুত উচ্চস্থানকে। দ্বিতীয়ত হাজালা এক প্রকারের পাখীর নাম এবং যের্র্ বলিতে উহার ডিমকে বোঝানো হইয়াছে। বস্তুত উহা কবুতরের ডিমের উপমার সহিতও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার 'রেযাইয়াত' শব্দও কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে এবং উহার অর্থও ডিম। তবে যের্র্ শব্দের অর্থ কোন অভিধানেই ডিম বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে মোহরে নুবুওয়াতের বর্ণনায় شعرات مجتمعات অর্থাৎ 'একগুচ্ছ কেশ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুমিত হয় উক্ত মোহরে নুবুওয়াতের উপরিভাগে একগুচ্ছ কেশও ছিল, যাহা দেখিয়া কোন রাবী মোহরে নুবওয়াতকে একগুচ্ছ কেশ অনুমান করিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত, পৃষ্ঠদেশে উঁচু-গোশতের পিণ্ড, মুষ্ঠির ন্যায় এবং পার্শ্বে তিলের চিহ্ন বিশিষ্ট ইত্যাদি বর্ণনাও পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা সর্বদা কিংবা অধিকাংশ সময়ই বস্ত্রাবৃত থাকিত। কাজেই যিনি যতটুকু এবং যে অবস্থায় চাক্ষুষ দেখিয়াছেন ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার পিছনের বিরাট রহস্য কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই জানেন। কেননা, এ মোহরে নুবুওয়াত কেবলমাত্র নবী পাক (সা)-এর জন্যই খাস ছিল। অপরাপর নবী-রাসূলগণ এ ধরনের মোহারপ্রাপ্ত হন নাই। والله اعلم।

পবিত্র হস্তদ্বয়

শামাইলে তিরমিযী কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তদ্বয় সম্পর্কে طويل الزندين অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্রশস্ত পাঞ্জা বিশিষ্ট ছিল বলা হইয়াছে। 'যানদ' অর্থ কব্জা। যেমন কামূস অভিধানে বলা হইয়াছে– মুষ্ঠি ও বাহুর মিলনস্থলকে যান্দ বলা হয় এবং ইহার দ্বিবচনে 'যানদানে' শব্দ আসিয়াছে। হাতের পাঞ্জা মুবারকের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। কিন্তু তবু উক্ত হাদীসটির মাধ্যমে অনুমিত অপর এক বর্ণনায় 'আবলুযযিরাআয়ন' এবং আর একটি বর্ণনায় 'আবলুল আযুদায়ন' বলা হইয়াছে– যাহার অর্থ তাঁহার দুই বাজু ও হস্ত মোটা এবং প্রশস্ত ছিল। হাতের কবজি হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত অংশকে 'যিরা' বলা হয়। অভিধান সুরাহ্‌তে যিরা অর্থ রাহ্‌বুর রাহাত অর্থাৎ প্রশস্ত পাঞ্জা লিখা হইয়াছে। অন্য এক রিওয়ায়াতে 'বাসতুল কাফ্‌ফায়ন আসিয়াছে। এর অর্থও 'রাহ্‌বুর রাহাত'-এর অনুরূপ। অর্থাৎ প্রশস্ত হাত।

হযরত আবদুল্লাহ্‌র কিরআত অনুসারে পবিত্র আয়াত بَلْ يَدَاهُ بِسْطَانِ (ب অক্ষরে যের দিয়া) এবং অনুরূপ একটি হাদীসে বর্ণিত 'সাবতুল কাফ্‌ফায়ন' একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালূ ছিল নরম। বস্তুতঃ 'সাবাত' শব্দটি নরম বুঝাইবার জন্য একটি বিশিষ্ট শব্দ। কেননা, আমরা ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কেশরাশি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে নরম বুঝাইবার জন্য এ শব্দটির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা ছাড়া সুন্দর গঠন ও সুষম শরীরের বর্ণনায় 'সাবতুল জিসম' শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার অভিধান কামূস-এ 'সাবতুল ইয়াদায়ন' বলিতে দানশীল ও প্রশস্ত হাতকে বুঝানো হইয়াছে। বস্তুত দানশীল হাতকে প্রশস্ত হাত বলা অযৌক্তিক নহে।

অতএব বলা যাইতে পারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্ত নরম ছিল। এ প্রসঙ্গে আরো দুইটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১. তাবারানী মুসতাওয়াদি ইব্‌ন শাদ্দাদ হইতে রিওয়ায়াত করিতেছেন, তিনি তাঁহার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহার সহিত করমর্দন করি। সে সময়ে তাঁহার হস্ত রেশম হইতেও অধিক নরম এবং বরফ অপেক্ষা শীতল মনে হইতেছিল।

২. বুখারী শরীফের হাদীসে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত মুবারক হইতে নরম 'হারীর' এবং ''দীবা'ও দেখিতে পাই নাই। উক্ত নামদ্বয় উন্নতমানের রেশমী বস্ত্রের– যাহা সর্বাধিক নরম হইয়া থাকে। অপরপক্ষে কোন কোন ব্যাখ্যাকারী 'শাছনুল কাফফায়ন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'শাছনু' অর্থ শক্ত এবং কঠিন। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তের তালু শক্ত ও কঠিন

www.pathagar.com

ছিল। ইহা উপরোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমন্বয়কারিগণ বলিয়াছেন, উভয় বর্ণনাই সত্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত মুবারক সাধারণ অবস্থায় নরম ছিল। কিন্তু সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং জিহাদের ময়দানে অস্ত্রধারণকালে শক্ত এবং বলিষ্ঠ তথা কঠিন বলিয়া অনুমিত হইত।

বর্ণিত আছে যে, অভিধানের ইমাম আসমাঈ যখন شثن শব্দের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তকে শক্ত ও কঠিন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল- যেখানে সেই মুবারক হস্তদ্বয়ের শানে নরম ও মোলায়েম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে আপনি কিরূপে শক্ত ও কঠিন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তখন তিনি অঙ্গীকার করিলেন যে, সাবধানতা ও দূরদৃষ্টি ছাড়া কখনই তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা দান করিবেন না। আসমাঈ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলের শানে কথা বলিতে নম্রতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক যত্নবান থাকিতেন।

এক সময়ে লোকজন তাঁহাকে ليغان على قلبى (কোন কোন সময়ে আমার অন্তরে পর্দা পড়িয়া থাকে।) এই পবিত্র হাদীসটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রশ্ন করিল পর্দা কি ? ইহার প্রকৃত তত্ত্বই বা কি ? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন–যদি তোমরা রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র কলবের পর্দা ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির অন্তরের পর্দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো, তাহা হইলে আমি ইহার জবাব দানে সমর্থ হইব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার কোন কিছু বলার সামর্থ্য ও সাহস নাই। কেননা, উহার প্রকৃত তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) বলিয়াছেন شثن অর্থ মোটা এবং ছোট। কাযী আয়ায বলেন, এহেন প্রশংসা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– মহিলাদের ক্ষেত্রে নহে। এ ধরনের বর্ণনা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা, ইহা নবী (সা) সম্পর্কীয় অধিকাংশ বর্ণনার বিপরীত। কেননা, তাঁহার পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 'সাইলুল আতরাফ' অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ছিল। অতএব তাঁহার পবিত্র অঙ্গুলির ক্ষেত্রেও, এই বিধান প্রযোজ্য। 'শিফা' নামক কিতাবে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান। শিফা-তে অঙ্গুলি সম্পর্কে বলা হইয়াছে طويل الاصابع (লম্বাকৃতি বিশিষ্ট অঙ্গুলি) যাহা 'শাইলুল আতরাফ'-এর কাছাকাছি। 'শাইলুল আতরাফ'-এর শাব্দিক অর্থ পাথর ও বোঝা উঠানো কিংবা উটনীর সামর্থ্যানুযায়ী বোঝা উঠানো।

কোন কোন বর্ণনায় শাইনুল আতরাফও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ লাম স্থলে নূন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইমাম ইবনুল আম্বারী এই মতের একজন বিশিষ্ট বর্ণনাকারী। বস্তুতঃ শাইনুল আতরাফ বলাতে বেঁটের বিপরীত বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মোটা এবং সুসমঞ্জস লম্বা অঙ্গুলিই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে সিহাহ্ ও কামূসের বর্ণনায় অঙ্গুলি মোটা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা পবিত্র অঙ্গুলিসমূহের বাহ্যিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত এবং অঙ্গুলি মুবারকের ফযীলত এবং বরকত অর্থাৎ মুবারক হস্ত যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিল তাহার বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রকৃতপক্ষে সে গুণাবলী এতই

www.pathagar.com

বিস্তৃত, ফযীলত ও বরকত এতই অধিক যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আমরা কিছু কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করিলাম।

মুসলিম শরীফের একটি রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-এর মুখের উপর হাত বুলাইয়াছিলেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, সেই মুবারক হস্ত এতই ঠাণ্ডা এবং সুগন্ধিযুক্ত ছিল যেন (আমার মনে হইতেছিল) এইমাত্র তিনি আতর বিক্রেতার কৌটা হইতে পবিত্র হস্ত বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

বায়হাকী ও তাবারানী বর্ণিত হাদীসে উক্ত হইয়াছে, হযরত ওয়াইল ইব্‌ন হাজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মুসাফাহা করিলাম। আমার হস্ত তাঁহার পবিত্র হস্তের স্পর্শে এতই সুগন্ধিযুক্ত হইল যে, আমি সমস্ত দিবস আমার হস্ত শুঁকিতে ছিলাম। তাহা হইতে মৃগনাভি অপেক্ষা উত্তম সুগন্ধ পাইতেছিলাম।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাতের উপর স্বীয় হস্ত মুবারক রাখেন। আমি তাঁহার হাতকে বরফের চাইতে ঠাণ্ডা এবং মৃগনাভি হইতে অধিক সুগন্ধিযুক্ত পাইয়াছি।

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার রোগশয্যায় তাশরীফ আনেন এবং তাঁহার পবিত্র হাত আমার কপালে রাখেন। অতঃপর মুখমণ্ডলে, বক্ষে এবং পেটের উপর রাখেন। ইহার পর হইতে অদ্যাবধি আমার বক্ষে তাঁহার পবিত্র হস্তের স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া থাকি।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক সম্পূর্ণই সুঘ্রাণযুক্ত ছিল। এমনকি তাঁহার শরীরের ঘামও প্রস্রাব পর্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এতদসম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত মুবারক সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোন কোন বর্ণনায় ইহার স্পর্শ শীতল এমনকি বরফ হইতে শীতল বলা হইয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে শৈত্য সুস্থতার পরিচায়ক নহে এবং উহা জীবিত ব্যক্তির জন্য অবাস্তবও বটে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সুন্দরতম স্বাস্থ্য এবং সুস্থ দেহের অধিকারী। অতএব, তাঁহার শরীর স্বাভাবিক উষ্ণ হইবে ইহাই তো যুক্তিসঙ্গত।

জবাবে বলা যায় যে, এই শীতল বলিতে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত অবস্থাকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র স্পর্শেই যে প্রশান্তি ও লযযত লাভ হইত তাহা ছিল বরফের চাইতে অধিক শীতল। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ হওয়াকেই শীতল বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও অপরাপর রাবীগণের বর্ণিত হাদীস।

পবিত্র পদযুগল

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদযুগল সম্পর্কে شثن القدمين। বা মোটা পদযুগল বর্ণিত হইয়াছে যেরূপ হস্ত মুবারক সম্পর্কে شثن الكفين। বা পবিত্র হস্তদ্বয় নরম ও মোটা ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাওয়াহব নামক কিতাবের বর্ণনায় غلظ الاصابع। বা নরম ও মোটা (পায়ের) অঙ্গুলি এবং মাশারিক-এ উভয় ক্ষেত্রেই মোটা অর্থ করা হইয়াছে। অপর একটি বর্ণনায় خمصان الاخمصين। শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কামস (خمص) শব্দের অর্থ পায়ের মধ্যভাগ

মাটিতে স্পর্শ না করা। যদিও সূরাহ্ অভিধান গ্রন্থে শব্দটির অর্থ সুচারু ও নিখুঁত বলা হইয়াছে– তথাপি আমরা পূর্ব বর্ণিত অর্থই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করি। বস্তুতঃ ইবনুল আছীরও তাহাই বলিয়াছেন।

একটি বর্ণনায় مسيح القدمين বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছ। যাহার অর্থ হইল নিখুঁত, সুচারু এবং যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত পদযুগল। যাহাতে কোনরূপ সমালোচনা করার অবকাশ বিন্দুমাত্র ছিল না। কেননা, ينبو عنهما الماء বাক্য দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। বাক্যটির অর্থ হইল। পবিত্র পদযুগলের উপরিভাগে পানি দেওয়া মাত্রই তাহা ত্বরিত গড়াইয়া পড়িয়া যাইত, ইব্ন আবী হালা (র)-এর হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য আসিয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মাটির উপরে চলিতেন, তখন পূর্ণ পা মাটিতে রাখিতেন এবং তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় اخمص বা মধ্যস্থলে উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল না। ইহা বায়হাকী শরীফের রিওয়ায়াত। অনুরূপভাবে হযরত আবূ উমামা (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীসই বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আসাকিরও ইহার সমর্থনে হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে مسيح القدمين অর্থাৎ সমতল পদদ্বয় শব্দও আসিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় বর্ণনাই সমার্থবোধক। কথিত আছে, হযরত ঈসা (আ)-কে মাসীহ এ জন্যই বলা হইত যে, তাঁহার পদতলদ্বয় اخمص বা অসমতল ছিল না; বরং مسيح বা সমতল ছিল। والله اعلم পক্ষান্তরে কোন কোন বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদযুগলে পানি স্থির থাকিত না; বরং দ্রুত গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। বস্তুতঃ 'সমতল হওয়া' এবং 'দ্রুত পানি গড়াইয়া পড়া' এ দুইটি বর্ণনার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বৈপরীত্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের মনে হয় প্রকৃতপক্ষে পবিত্র পদদ্বয় এতদুভয় বর্ণনার মাঝামাঝি পর্যায়ের ছিল। উহা না পূরা সমতল ছিল আর না খুব উঁচু ছিল। বরং কিঞ্চিত উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল কিন্তু চলাকালে সম্পূর্ণ পদতল মৃত্তিকা স্পর্শ করিত।

পক্ষান্তরে যাঁহারা اخمص অর্থাৎ অধিক উঁচু বলিয়াছেন তাঁহাদের বর্ণনা সঠিক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن البشر قدما অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদ মুবারক সকল মানুষের পায়ের চাইতে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, তাঁহার (সা) পায়ের গোড়ালি কম গোশ্ত বিশিষ্ট ছিল। আরবী ভাষায় ইহাকে مشهوس العقب বলা হয়। কোন কোন স্থলে مشهوس-এর ش স্থলে س ও ব্যবহার করা হইয়াছে। বাহ্রায়ন গ্রন্থের প্রণেতাও ইবনুল আছীর শব্দটি ش ও س উভয় হরফ দিয়া লিখিয়াছেন। 'মাশারেক' কিতাবেও س এবং ش উভয় বর্ণনাই লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার অর্থ উঁচু গোড়ালি লিখিয়াছেন। কিন্তু সুরাহতে منهوس অর্থ অল্প মাংস বিশিষ্ট গোড়ালি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অত্র কিতাবের লিখক শায়খ মুহাক্কিক শাহ্ আবদুল হক দেহলবী (র) বলেন, 'আমার পীর মুরশিদ শায়খ মূসা (পাক শহীদ মুলতানী) আল-জীলানী (র)-এর পাদ্বয়ের গোড়ালি এমন পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার ছিল যে, কোন পরমা সুন্দরী সুশ্রী রমণীর মুখমণ্ডলও এমন সুন্দর হয় না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র বদনের সহিত তাঁহার বদনের অনেক বেশী সাদৃশ্য ছিল।

www.pathagar.com

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, সাইয়্যিদা মায়মুনা বিনতে কুরযুম হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি। আমি তাঁহার পবিত্র পায়ের মধ্যমা অঙ্গুলির দৈর্ঘের কথা কখনই ভুলিতে পারিব না। উহা পায়ের সমুদয় অঙ্গুলি হইতে দীর্ঘ ছিল। হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তিনি মধ্যমা অঙ্গুলির স্থলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, এই কথা সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি হইতে শাহাদত অঙ্গুলি দীর্ঘ ছিল। পক্ষান্তরে এই প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার মক্কী (রা) বলিয়াছেন– এই কথা যিনিই বলিয়া থাকুন না কেন, আসলে ইহা সম্পূর্ণ ভুল বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহার পায়ের সাব্বাবাহ্ (বৃদ্ধাঙ্গুলের পরবর্তী অঙ্গুলি) অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে দীর্ঘ ছিল।

মাকাসদে হাসানা কিতাবে উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের সমাধান হিসাবে বলিয়াছেন, বস্তুতঃ এই ভ্রম হযরত মায়মুনা বিনতে কুরযুম (রা)-এর হাদীসকে বিনা বিচার-বিশ্লেষণে গ্রহণ করার ফলেই ঘটিয়া থাকিবে। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অঙ্গুলিকে এরূপ দেখিয়াছি।" কিন্তু মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনায় পায়ের অঙ্গুলির কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম বায়হাকীও অনুরূপ উক্তিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হযরত শায়খ আবদুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, পবিত্র হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, রাসূল (সা) স্বীয় শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে একত্রিত করিয়া বলিয়াছেন, আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্বারা তিনি তাঁহার আগমন এবং কিয়ামতের মধ্যকার দূরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাব এবং কিয়ামতের মধ্যে উক্ত অঙ্গুলিদ্বয়ের ব্যবধানের ন্যায় ব্যবধান রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কিয়ামতের নিকটবর্তিতার কথা বুঝানো হইয়াছে। নচেৎ অঙ্গুলিদ্বয়ের একত্রিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সমাধান হিসাবে বলা যাইতে পারে– এই অঙ্গুলিদ্বয়ের একত্রিতকরণের মাধ্যমে অগ্র-পশ্চাতের ব্যবধান প্রকাশ করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথিত পবিত্র অঙ্গুলিদ্বয় এক সমান ছিল। ইহাও কিয়ামত সন্নিকট অর্থে প্রকাশমান উপমা বলা যায়। আবার এক সম্প্রদায়ের মতে কিয়ামতের নিকটবর্তিতার কথা বুঝাইবার সময় উক্ত দুই অঙ্গুলি সমান হইয়া যাইত। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত আছেন।

পবিত্র পায়ের নলা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নলা সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে, كان فى ساقيه خموشة তাঁহার পবিত্র নলা পাতলা ও সহজ ছিল অর্থাৎ মাংসল ও মোটা ছিল না। অপর এক হাদীসে উক্ত হইয়াছে– نظرت الى ساقيه كانما جُمَّارَةَ –আমি তাঁহার পায়ের নলাদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহা খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় দেখিতে পাইলাম, ج অক্ষরে পেশ ও م অক্ষরে (ّ) তাশদীদ দিয়া جُمَّارَةَ উচ্চারিত হইলে উহার অর্থ হয় شحم

www.pathagar.com

النخل। বা খর্জুর বৃক্ষ। যাহা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। অর্থাৎ খর্জুর বৃক্ষের পরিষ্কৃত অংশই বুঝানো হয়।

কোন কোন বর্ণনায় ضخم القراديس বা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত গিরা বলা হইয়াছে। শরীরের সংযোগস্থলসমূহের যে হাড় গ্রন্থি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাহা কারদূস নামে অভিহিত হয়। দৃঢ় বন্ধনযুক্ত শব্দের দ্বারা শক্তিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সুন্দর তনু দেহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র তনু দেহ সৌন্দর্যের আকর ছিল। তাহা ছিল নরম, কমনীয়, সবল, সুঠাম এবং মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট। তিনি অধিক দীর্ঘ কিংবা খর্ব কোনটাই ছিলেন না। তবে মানানসই লম্বা ছিলেন। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে– كان ربعة من القوم –তিনি কওমের মধ্যে মধ্যম তনু বিশিষ্ট ছিলেন। ربع শব্দের অর্থ মধ্যম তনু। অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে– اطول من المربوع واقصر من المشذب অর্থাৎ খর্বাকৃতির চাইতে দীর্ঘ কিন্তু দীর্ঘাকৃতি অপেক্ষা ঈষৎ খর্বকায় ছিলেন। মোট কথা, আমরা বলিতে পারি যে, তিনি (সা) বেমানান খর্বও ছিলেন না আবার অধিক দীর্ঘও ছিলেন না। বরং ছিলেন পূর্ণ মানান সই। مشذب م অক্ষরে (ُ) পেশ ش অক্ষরে (َ) যবর এবং ذ অক্ষরে (ّ) তাশদীদ দিয়া উচ্চারণ করিলে উহার দ্বারা লম্বাকৃতির বুঝা যায়। এমন লম্বা যে, দাঁড়াইলে দর্শক-মনে ভীতি ও অস্থিরতার উদ্ভব হয়। ইব্‌ন আবী হালা (রা)-র হাদীসে আছে لم يكن الطويل الممغط অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গঠন দীর্ঘ ছিল না। الممغط। -এর প্রথম م এ-পেশ, দ্বিতীয় م -এ যবর এবং غ অক্ষরে তাশদীদযুক্ত যবর কিংবা যের উভয় বানানই আসিয়াছে এবং কোন কোন স্থলে غ স্থলে ع ও ط স্থলে ظ দ্বারা اسم مفعول -এর নিয়মে تفعيل বাব হইতেও গঠিত হইয়া থাকে। যাহার অর্থ অসম্ভব দীর্ঘ। পক্ষান্তরে খর্ব গঠনকে متردد (মুতারাদ্দাদ) বলা হয়। কোন কোন স্থলে متردد শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শরীরের কোন কোন অংশ স্ফীত হইয়া বাহির হইয়া আসা। যেমন কুঁজ, বার্ধক্যের দরুন পৃষ্ঠদেশের বক্রতা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এতদুভয় বর্ণনার কোনটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহের সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল না। বরং মধ্যম এবং সুসমঞ্জস দেহ মুবারক বিশিষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসদ্বয় প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. لم يكن بالطويل البائن يعنى مفرط তাঁহার তনু অতিরিক্ত লম্বা ছিল না।

২. হযরত আলী (রা) বলেন, ليس بالذهب طولا وفوق الربعة اذا جاء مع القوم غمرهم তিনি অত্যধিক লম্বা ছিলেন না। তবে মধ্যমের চাইতে কিঞ্চিৎ লম্বা ছিলেন। যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে গমন করিতেন তখন সকলের চাইতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ অনুমিত হইতে এবং অন্যান্যদিগকে তাঁহার চাইতে বেঁটে দেখাইত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলিয়াছেন– যখন তিনি একাকী থাকিতেন, তখন মধ্যম কদ বিশিষ্ট দেখাইত। যখন লোকের মাঝে যাইতেন, তখন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দেখা যাইত এবং ঐ সময় তাঁহাকে দীর্ঘ তনুধারী বলিয়া সম্বোধন করা হইত। আর যখন তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই ব্যক্তি থাকিত, তখন ঐ দুইজনের চাইতে উঁচু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন।

www.pathagar.com

আবার যখন পৃথক হইয়া যাইতেন, তখন মধ্যম কদবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইত। অবশ্য জন-সমাবেশে তাঁহাকে সকলের চাইতে দীর্ঘ দেখাইত।

ছায়াহীন তনু

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের কোন ছায়া ছিল না। রৌদ্রের প্রচণ্ড কিরণে কিংবা চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোতে তাহার পবিত্র কায়ার কোন ছায়া পড়িত না। হাকিম ও তিরমিযী যাকওয়ান হইতে 'নাওয়াদিরুল উসূল'-এ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ কেবলমাত্র চন্দ্র এবং সূর্যের রশ্মির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রদীপের কথা উল্লেখ করেন নাই! অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি নাম হইল নূর বা আলো। হাবীব পাকের এই গুণটি সম্বন্ধে মাওলানা জামী বলেন—

امی ودقیقه دان عالم * بے سایه وسائبان عالم

অর্থাৎ 'উম্মী নবী (সা) জগতের সূক্ষ্ম জ্ঞানসমূহের অধিকারী। তিনি ছায়াহীন কিন্তু সমগ্র জগতের ছায়া দানকারী।'

মুবারক রং

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের মুবারক রং উজ্জ্বল ও নূর বিশিষ্ট ছিল। সকল সাহাবাই তাঁহার পবিত্র রং শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন কেহ কেহ বলিয়াছেন ابیض ملیحا। অর্থাৎ লাবণ্যময় শুভ্র। অপর এক বর্ণনায় ابیضُ ملیح الوجه। অর্থাৎ 'শুভ্র লাবণ্যময় মুখমণ্ডল' বলা হইয়াছে।

উক্ত বর্ণনাসমূহের প্রথম উদ্দেশ্য হইল তাঁহার শুভ্র রংয়ের পরিচয় দান করা। কিন্তু এতদসঙ্গে লাবণ্যময় শব্দযুক্ত করিয়া বর্ণনা করায় ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল তাঁহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য আনন্দ দানকারী মনোমুগ্ধকর চাহীনর প্রশংসা করা। বস্তুতঃ ইহা শুভ্রতার সহিত একটি বিশেষ গুণের সংযোগ। অথবা ইহা দ্বারা এরূপ বুঝানোর চেষ্টা করা হইয়া থাকিতে পারে যে, ابیض। শব্দের দ্বারা দুগ্ধ ধবল কিংবা প্রস্তরবৎ ধবল যেন অনুমান না করা হয়। কেননা, ফ্যাকাসে সাদা কোনকালেই সৌন্দর্যের প্রতীক নহে। আরবী ভাষায় এরূপ সাদাকে 'আবহাক' বলে। যাহা ধবলকুষ্ঠের ন্যায় অসুন্দর সাদা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অপর একটি বর্ণনায় তাঁহার (সা) শরীরের রং ফর্সা এবং কেশরাজি ভ্রমরের ন্যায় কালো ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলিয়াছেন, তাহাতেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আবূ তালিব বলিয়াছেন—

ابیض یستسقی الغمام بوجهه - ثمال الیتامی عصمة للارامل

অর্থাৎ 'তাঁহার নূরানী চেহারার ওসীলায় বর্ষণকারী সাদা বাদলের ভিক্ষা চাহিতেছি। আর যিনি হইলেন সকল ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতিপালনকারী।'

হযরত আলী (কঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে— ابیض مشرب وانه شراب خلط لون بلون অর্থাৎ তাঁহার রং 'মাশরাবী' সাদা ছিল। এক রংয়ের সহিত অন্য রংয়ের মিশ্রিত শরাবকে মাশরাব বলা হয়। এক রংয়ের শরাব পান করার পর অপর রং পান করা শুরু হইয়াছে— এখানে مشرب অর্থ লাল রং। যেমন একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। সেখানে বলা

www.pathagar.com

হইয়াছে ابيض مشرب بحمرة। অর্থাৎ তাঁহার রং লালিমাযুক্ত সাদা ছিল। আবার কেহ বলিয়াছেন, ازهر اللون। তাঁহার রং বড়ই উজ্জ্বল ছিল। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীসেও অনুরূপ বলা হইয়াছে।

নাসাঈ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জামাআত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে জনৈক যাযাবর দূতরূপে তথায় আগমন করেন এবং নিতান্ত সাদাসিধাভাবে মহব্বত ও বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, اين ابن عبد المطلب। আবদুল মুত্তালিব পুত্র কোথায়? এবং তোমাদিগের মধ্যে কে তিনি? তাঁহার বিস্ময় এবং ভক্তির কারণ ইহাই ছিল যে, যাঁহার সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র জাহানে প্রসিদ্ধ, যাঁহার সম্মান আজ বিশ্বব্যাপী গুঞ্জরিত, সেই মহিমান্বিত মহা গৌরবান্বিত আবদুল মুত্তালিব পুত্র কোথায়? সাহাবাগণ জবাব দিলেন, هذا الامغر المرفق –এই যে রক্তিমাভাযুক্ত শুভ্র সৌম্য দর্শনধারী ব্যক্তি– কনুই-এ ভর দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন ইনিই তিনি।

اللهم صلى على سيدنا محمد واله قدر حسنه وجماله

অভিধান গ্রন্থ কামূসে امغر। -এর অর্থ বলা হইয়াছে কোন ব্যক্তির মুখমণ্ডলের রং লাল মিশ্রিত সাদা রং বিশিষ্ট। আর কনুই-এ ঠেস দিয়া বসাকে বলা হইয়াছে المرفق। –বুখারীতে হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে– ليس بابيض امهق অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক ধবল কুষ্ঠের ন্যায় বেমানান সাদা ছিল না। امهق। শব্দটির অর্থ ইতোপূর্বে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কামূসেও অনুরূপ বর্ণনা অর্থাৎ শ্বেতীর ন্যায় অসুন্দর সাদাকে بهق। বলা হয়। অপর একটি বর্ণনায় اسمر। (আসমার) শব্দ দ্বারা রাসূল (সা)-এর শরীরের রংকে বুঝানো হইয়াছে। আসমার অর্থ কালো ও সাদা মিশ্রিত রং। এই রংদারীকে اسمر। বলা হয়। কামূসে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুরাহ্‌তে বলা হইয়াছে, সুমরা অর্থ গমের রং সদৃশ রং। যাহা উজ্জ্বল হলুদ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। কথিত আছে আরবগণ শুভ্রতার সহিত 'মাশরাব'-এর সংমিশ্রণকেও সামরা বলিয়া থাকে। আর মাশরাব যখন মাবশা' (مبشع) অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন ও অসুন্দর হয়, তখন ইহা আনসার নামে আখ্যায়িত হয়। যাহা লাল এবং কালোর মাঝামাঝি একটি রং। কিন্তু ইহা আফসাহ কখনও হয় না।

গাঢ় কাল রং-কে ادمه। বলা হয়, যেমন তিরমিযী শরীফে বলা হইয়াছে ليس بالابيض لابهق ولا بالادم। তাঁহার শরীরের রং না ধবলকুষ্ঠের ন্যায় ছিল, না কৃষ্ণবর্ণ। অভিধান গ্রন্থ কামূস ও সুরাহ অনুসারে আদমাহ সামরা অর্থে এবং আদম আসমার অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। এই কথা অনুসারে لا بالادم -এর অর্থ ادمة। অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে অর্থ বুঝিতে হইবে।

অতএব বলা যাইতে পারে, কালো মিশ্রিত শুভ্রই এ বর্ণনার প্রকৃত অর্থ। অর্থাৎ যাঁহারা কালোপনা উক্তি করিয়াছেন এবং যাঁহারা সাদা বলিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সহীহ্। আর যাঁহারা লাল মিশ্রিত সাদা বলিয়াছন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে নিরেট সাদা মনে না করা হয়। ইবনুল জাওযী বলিয়াছেন– كان اسمر গমের রং সদৃশ ছিল– এ বর্ণনা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, ইহা পূর্ববর্তী বর্ণনাদ্বয়ের পরিপন্থী। অবশ্য ইবনুল জাওযী স্বীয় বক্তব্যের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা হিসাবে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের যে অংশগুলি উন্মুক্ত থাকিত উহা সূর্য কিরণ এবং বায়ুর প্রভাবে গমের রং বিশিষ্ট এবং যে অঙ্গসমূহ জামা-কাপড়ে আবৃত থাকিত, তাহা শুভ্র ছিল– কিন্তু আলিমগণ ইবনুল জাওযীর এ বর্ণনার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন– সূর্যরশ্মি এবং বায়ু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র রং পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহে। নূরানী দেহ মুবারক কোন সময়ই বায়ু এবং সূর্যরশ্মির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

বস্তুতঃ ইব্‌ন আবী হালার হাদীসেও এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে পবিত্র দেহের উন্মুক্ত অঙ্গ এবং বস্ত্রাবৃত অঙ্গাদি একইরূপ উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় ছিল। সাধারণ মানুষের শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কেহ আবার বলিয়াছেন, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রং ক্রমে পক্ব গমসদৃশ হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহের রং সম্পর্কে তাঁহার সার্বক্ষণিক খাদিম হযরত আনাস (রা)-এর উক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিব। যাহা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। والله اعلم

মুবারক চাল-চলন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চালচলন সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفاء كانما ينحط من صلب

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাঁটিতেন তখন সম্মুখ পানে ঝুঁকিয়া হাঁটিতেন। মনে হইত তিনি যেন উপর হইতে নীচে অবতরণ করিতেছেন।

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলাকে تكفو বলা হয়, যেমন ফুলভারে বৃক্ষ শাখা নত হইয়া পড়ে ঠিক তদ্রূপ। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবল, শক্তি ও দ্রুততার সাথে পদচালনা করিতেন। উহাতে দুর্বলতা ও অলসতার নামগন্ধও থাকিত না।

আল্লামা বাযযার (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাঁটিতেন, তখন প্রতি পদক্ষেপেই পা পুরাপুরি মাটিতে রাখিতেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে– তিনি যখন হাঁটিতেন, তখন পূর্ণ শক্তির সহিত হাঁটিতেন। উহাতে কোনরূপ দুর্বলতা কিংবা অলসতার চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইত না। হযরত আলী (কঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, তিনি (সা) পা উঠাইবার সময়ও পূর্ণরূপে উঠাইতেন এবং ফাঁক ফাঁক পা ফেলিয়া অর্থাৎ দীর্ঘ পদক্ষেপে অক্লেশে এবং অপরাপর অঙ্গ সঞ্চালন ব্যতীত দ্রুত হাঁটিতেন। বস্তুতঃ এ হাদীসেও كانما ينحط من صبب (যেন ভূমির উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেন) কথাটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

صبب-এর ص এবং মধ্যস্থলের ب অক্ষরে যবর দিলে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে অবতরণ অর্থ বুঝায়। বস্তুতঃ পূর্ণ পদভারে সাবলীল গতিতে দ্রুত চলাকে বুঝাইবার উপমা হিসাবে এ বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে তিনি বলিয়াছেন– "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে দ্রুত চলিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। মনে হইত তাঁহার পবিত্র পায়ের নীচের মৃত্তিকা যেন দ্রুত পিছনে সরিয়া যাইতেছে। তাঁহার সহিত আমাদিগকে (প্রায়) দৌড়াইয়া

www.pathagar.com

চলিতে হইত। ফলে আমরা তাঁহার সহিত চলিতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। অথচ তিনি স্বাভাবিক গতিতেই চলিতেন এবং আদৌ পরিশ্রান্ত হইতেন না।

নবী করীম (সা)-এর চলার মধ্যে সাহসিকতা এবং শৌর্য-বীর্যের প্রমাণ পাওয়া যাইত। সর্বপ্রকার চাল-চলনের মধ্যে এই মধ্যম ধরনের অথচ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। যদ্দরুন তিনি পথশ্রান্তি অনুভব করিতেন না; বরং পূর্ণ প্রশান্তি এবং আরামের সঙ্গেই চলিতেন।

তিনি কখনও জুতা পরিধান করিয়া চলিতেন, কখনও বা নগ্নপদে চলিতেন। কখনও পদব্রজে চলিতেন, কখনো যানবাহনে সওয়ার হইয়া চলিতেন। বিশেষত যুদ্ধের সময়ে তিনি সওয়ারীতে সওয়ার হইয়া চলিতেন।

কবি বলেন–

سرو پیاده خوش بود اندرچمن بناز * آن سرو من پیاده خوش است وسوار خوش

'পুষ্প কাননে নগ্নপদে ঝাউবৃক্ষ অভিমান ভরে দাঁড়াইয়া আছে। আর আমার সেই প্রিয়তমের নগ্নপদ যুগল কি সুন্দর আর তাঁহার বাহনও কত চমৎকার!'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে কিরাম সমভিব্যাহারে চলিতেন, তখন তাঁহাদিগকে অগ্রে চলিতে দিতেন আর নিজেপশ্চাতে থাকিতেন এবং বলিতেন– "আমার পৃষ্ঠদেশকে ফেরেশতাদের জন্য উন্মুক্ত ছাড়িয়া দাও।" হাদীসে উদ্ধৃত বাক্যটি হইল كان يسوق اصحابه –তিনি সাহাবাগণকে সম্মুখে রাখিতেন) سوق শব্দের অর্থ হইল গবাদিপশুকে পশ্চাদদিক হইতে ধাবন করা। ইহার বিপরীত শব্দ قود অর্থাৎ সম্মুখভাগ হইতে গবাদিপশুকে চালনা করা।

সফরকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া নিজে শেষে রওয়ানা হইতেন এবং অসহায় ও দুর্বলদের সহায়তা করিতেন। যাঁহারা বাহন অভাবে যাইতে পারিতেন না, তাঁহাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করিতেন, এমনকি প্রয়োজনবোধে স্বীয় বাহনের পশ্চাতেও বসাইয়া লইতেন।

পদচালনার প্রকারভেদ

পদচালনাকে দশ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

১. তাহাদত (تحادت) ভাঙ্গা ও দুর্বল এক খণ্ড শুষ্ক লাকড়ীতে ভর করিয়া মৃদুতালে চলাকে তাহাদত বলা হয়।

২. ইয'আজ (ازعاج) অস্থিরভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুত ও চঞ্চলভাবে চলাকে ইয'আজ বলা হয়। এই দুই প্রকার চলাই নিন্দনীয় ও দৃষ্টিকটু। ইহা মৃত অন্তঃকরণের নিদর্শন।

৩. হাওন (هون) পরিপূর্ণ পদ সঞ্চালনসহ কিঞ্চিৎ দ্রুত তালে চলাকে হাওন বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপভাবেই চলিতেন। যাহা শান্ত, গাম্ভীর্য, নিরহংকার ও নম্রতার পরিচায়ক।

৪. সাঈ (سعی) দ্রুতবেগে চলাকে সাঈ বলা হয়।

www.pathagar.com

৫. রমল (رمل) দ্রুত পদক্ষেপে হেলিয়া-দুলিয়া চলাকে রমল বলে। যেমন সৈন্যবাহিনী চলিয়া থাকে।

৬. নাসলান (نسلان) সা'ঈ হইতেও দ্রুত পদক্ষেপে প্রায় দৌড়াইয়া চলাকে 'নাসলান' বলে।

৭. খাওরা (خورى) পায়ের অগ্রভাগে ভর করিয়া চলাকে 'খাওরা' বলে।

৮. কাহ্কারী (قهقرى) পিছনের দিকে উল্টাভাবে চলাকে 'কাহ্কারী' বলে।

৯. জামরা (جمرى) নতন কুর্দন করিয়া চলাকে 'জামরা' বলা হয়। উষ্ট্রী এইভাবে চলে বলিয়া উষ্ট্রীকেও জামারাহ্ বলা হয়।

১০. তাবাখ্তুর (تبختر) গর্বভরে, উন্নত শিরে গদাইলশকরী চালে চলাকে 'তাবাখ্তুর' বলা হয়।

এই দশ প্রকারের চলার মধ্যে হাওন সর্বোৎকৃষ্ট চলা। কুরআনুল করীমেও এইরূপ চলার প্রশংসা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا "আল্লাহ্র ঐ সকল বান্দা (কামিয়াব) যাহারা যমীনের উপরে হাওনের চালে চলিয়া থাকে।"

সুগন্ধিযুক্ত ঘর্ম

মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশ্চর্য গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ ছিল এই যে, কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতিরেকেই তাঁহার পবিত্র দেহ সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধিযুক্ত ছিল। এমনকি কোন সুগন্ধিই উহার সমপর্যায়ে পৌঁছিতে সক্ষম হইত না। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন– "আমি সকল প্রকারের সুগন্ধিই– উহা মেশ্কই হউক কিংবা আম্বরই হউক– শু'কিয়াছি। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহের সুগন্ধির ন্যায় কোন সুগন্ধিই আমি শুঁকি নাই।

উত্বা ইব্ন ফারকাদ সুলামী (রা)-র স্ত্রী উম্মু আসিম বলেন– আমিসহ উত্বার মোট চারজন স্ত্রী ছিলেন। আমরা প্রত্যেকেই এই চেষ্টা করিতাম যাহাতে তাঁহার নিকট আপন সুগন্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতীয়মান হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই সর্বপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহারই উত্বার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। অথচ তিনি সামান্য একটু সুগন্ধি আঙ্গুলে লাগাইতেন এবং স্বীয় দাড়িতে স্পর্শ করিতেন। ইহা ছাড়া যখন উত্বা বাহিরে যাইতেন, তখন লোকেরাও পরস্পর বলাবলি করিত, "আমরাও তো সুগন্ধি ব্যবহার করি, কিন্তু উত্বার ন্যায় এত উত্তম সুগন্ধি পাই না কেন?"

উম্মু আসিম বলেন, এ ব্যাপারে আমি উত্বাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, আমরাও প্রতিযোগিতা করিয়া সুগন্ধি ব্যবহার করি। অন্যান্য মানুষও সুগন্ধি ব্যবহার করে। অথচ আমাদের সুগন্ধি তোমার সুগন্ধির নিকটে মূল্যহীন হইয়া পড়ে ইহার কারণ কি?

জওয়াবে উত্বা বলিলেন– নবী করীম (সা)-এর জীবিতাবস্থায় একবার আমার শরীরে গরমের দরুন ছোট ছোট ফোস্কা পড়ে এবং উহা আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগার ন্যায় জ্বালা-যন্ত্রণা করিতে থাকে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে এই ব্যাপারটি আরয করি। তিনি

www.pathagar.com

আমার জামা খুলিতে বলেন এবং আমি তাহা খুলিয়া ফেলি ও তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করি। তিনি পবিত্র হস্ত দ্বারা আমার পেট ও পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেন। উক্ত দিবস হইতেই আমার পেট এবং পৃষ্ঠদেশে এইরূপ সুগন্ধির উৎপত্তি হইয়াছে। তাবারানী মাজমু'আয়ে সগীরে এই বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিবার সময়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও সুগন্ধি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইহা আরয করিলেন। সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটেও কোন সুগন্ধি ছিল না। তিনি একটি শিশি আনাইলেন এবং উহাতে স্বীয় পবিত্র শরীর হইতে ঘর্ম ভরিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, "যাও, তোমার কন্যাকে বলো, সে যেন ইহা হইতে সুগন্ধি ব্যবহার করে।"

অতঃপর সেই কন্যা যখন এই সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছিল, তখন সমগ্র মদীনা ইহার খোশবুতে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমনকি উক্ত গৃহকে 'খোশবু ঘর' নামকরণ করা হইয়াছিল।

হযরত আনাস (রা) বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের গৃহে আগমন করেন এবং দ্বিপ্রহরে কিঞ্চিত বিশ্রাম, আহার অন্তে নিদ্রা, করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নিদ্রা যাইতেন, তখন তাঁহার ঘর্ম নির্গত হইত। আমার মাতা উম্মু সুলায়ম একটি শিশি লইয়া উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র ঘর্ম ভরিতেছিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি করিতেছ? জবাবে তিনি আরয করিলেন– আপনার ঘর্ম মুবারক সংগ্রহ করিতেছি– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা আমি সুগন্ধির ন্যায় ব্যবহার করিব।" মুসলিম শরীফ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে আরও বর্ণিত আছে, যখন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করিয়া তাঁহাকে না পাইতেন, তখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোশবু অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা শরীফের যে সকল গলি দিয়া গমন করিতেন ঐ সকল গলি খোশবুময় হইয়া পড়িত। সাহাবীগণ উক্ত খোশবু অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে তালাশ করিতেন। তাঁহারা যে কোন গলিতে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারিতেন এই পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গমন করিয়াছেন কিনা।

উল্লেখযোগ্য যে, আজও পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি গৃহ ও প্রাচীর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রাণহারী সুগন্ধি প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহা দ্বারা আশেকীনে রাসূলের মস্তিষ্কসমূহ সুরভিত হইতেছে। আফসোস, যদি উক্ত সুগন্ধির একটি কণাও এই অধম হীন লিখকের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইত!

আবূ আবদুল্লাহ আত্তার পবিত্র মদীনার প্রশংসায় লিখিয়াছেন–

بطيب رسول الله طاب نسيمها * فما المشك والكافور المندل الرطب

'রাসূলে পাকের সুঘ্রাণে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত। মৃগনাভি, কর্পূর ও আতর ইহার কাছে মূল্যহীন– এইগুলির ন্যায় সুগন্ধি তো মদীনার খেজুরের মধ্যেই রহিয়াছে।'

www.pathagar.com

হযরত শুবায়লী (র) যিনি একজন উচ্চস্তরের ভাবুক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন– তিনি বলিয়াছেন– মদীনা মুনাওয়ারার মাটির মধ্যেও বিশেষ এক ধরনের সুবাস রহিয়াছে, যাহা মৃগনাভিতেও নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই সুঘ্রাণ বড়ই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। বলিয়াছেন–

دران ز مین که نسیمے دررزد ز طره دوست * چه جائےدم زدن نافهائے تاتاریست

'তাতারী মৃগনাভির কি ক্ষমতা আছে যে, উহা মদীনা মুনাওয়ারার মৃত্তিকার সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে? প্রাতঃ সমীরণ যে মাটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বারতা বহন করিয়া বেড়ায়?'

আবূ নাঈমে হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক চেহারার উপর ঘর্ম মোতির ন্যায় চকচক করিত এবং উহার খোশবু মেশ্ক-আম্বর হইতেও উৎকৃষ্ট ছিল।

পবিত্র হাতের খোশবু

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তদ্বয়ের প্রশংসায় বর্ণিত হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মুখমণ্ডলে তাঁহার পবিত্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন। সেই স্পর্শে আমি এমন ঠাণ্ডা এবং সুঘ্রাণ অনুভব করি মনে হইল যেন এইমাত্র তিনি আতরের ডিব্বা হইতে তাঁহার পবিত্র হস্ত বাহির করিয়া আনিয়াছেন। কেহ যদি তাঁহার সহিত মুসাফোহা (করমর্দন) করিত, তাহা হইলে সমস্ত দিবসব্যাপী উক্ত হস্ত হইতে সুগন্ধি নিঃসৃত হইত। তিনি যদি স্নেহভরে কোন শিশুর মস্তকে হাত রাখিতেন, তাহা হইলে সেই পবিত্র হস্তের সুগন্ধির দরুন সেই শিশু অপরাপর সকল শিশু হইতে স্বতন্ত্ররূপে পরিগণিত হইত।

ফাইদা

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র ঘর্ম দ্বারা গোলাপ ফুল সৃষ্টি হইয়াছে। অপর এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন– মি'রাজের রাত্রে আমার ঘর্ম হইতে সাদা ফুল অর্থাৎ চামেলী, জিবরাঈল (আ)-এর ঘর্ম হইতে লাল ফুল অর্থাৎ গোলাপ এবং বুররাকের ঘর্ম হইতে হলুদ ফুল অর্থাৎ চম্পা সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরন্তু বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমার শরীরের ঘর্মের ফোঁটা মাটিতে পতিত হইলে উহা হইতে গোলাপের সৃষ্টি হয়। যে কেহ আমার খোশবু/সুঘ্রাণ শুঁকতে চায় সে যেন গোলাপ শোঁকে। অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, যখন আমার ঘর্মের ফোঁটা মাটির উপর পতিত হয়, তখন মাটি হাসিয়া উঠে এবং গোলাপ ফুলকে উদগত করে। কিন্তু হাদীসবিদগণ এই সকল হাদীস সম্পর্কে তাহাদের প্রণীত হাদীসের পরিভাষা মুতাবেক সমালোচনা করিয়াছেন।

মাওয়াহিবে লাদুনিয়ায় আবুল ফারাহ নাহরাওয়ানী হইতে বর্ণিত আছে যে, এই সকল হাদীসে যাহা কিছু আসিয়াছে উহা নবীয়ে মুখতার (সা)-এর ফযল ও করমের সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র এবং পরওয়ারদিগার তাঁহার হাবীবকে যে সকল গুণে সম্মানিত করিয়াছেন উহার আধিক্যের তুলনায় অতি নগণ্য। মুহাদ্দিসীন কিরামের এতদসম্পর্কে কথা বলা উহা তাঁহাদের নিজস্ব পরিভাষা ও পদ্ধতি মুতাবেক ছিল যদ্দারা তাঁহারা হাদীসের সূত্রসমূহের তাহকীক ও

www.pathagar.com

শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ইহা এমন নয় যে, বহু দূরের মনে করিয়া অসম্ভব হওয়ার প্রেক্ষিতে ছিল।

কাযায়ে হাজাত অর্থাৎ মল ত্যাগকালে মাটি বিদীর্ণ হওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মল ত্যাগ করার জন্য ইরাদা করিতেন, তখন মাটি বিদীর্ণ হইয়া যাইত এবং মাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র প্রস্রাব ও পবিত্র মলকে নিজের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিত এবং উক্ত স্থানে সুগন্ধ ছড়াইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মল কেহই দেখে নাই। হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়খানা করিয়া বায়তুল খালা বা পায়খানা হইতে বাহিরে তাশরীফ আনয়নের পর উক্ত স্থানে আমি যাইয়া মল জাতীয় কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আইশা! তুমি কি জান না যে, সম্মানিত নবীগণের পবিত্র পেট হইতে যা কিছু বাহির হয়, মাটি ঐগুলিকে গিলিয়া ফেলে। সুতরাং উহা দেখা যায় না।

এক সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি এক সফরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। নবী (সা) জরুরী কার্য সমাধার জন্য কোন এক স্থানে তাশরীফ লইয়া যান। যখন তিনি হাজতের কাজ শেষে ফিরিয়া আসেন, তখন আমি যেস্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গমন করিয়াছিলেন তথায় গমন করি। আমি সেই স্থানে মল-মূত্রের কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। অবশ্য কয়েকটি ঢিলা ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। আমি উহা তুলিয়া লইলাম। তখন উহা হইতে সূক্ষ্ম ও পবিত্র খোশবু বা সুগন্ধ আসিতেছিল। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

কাযী ইয়ায মালেকী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শিফা'-তে বলিয়াছেন, বিজ্ঞ আলিমদের এক দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদ্‌ছায়ন অর্থাৎ মল ও মূত্র ত্যাগের পর উযূ করার পক্ষপাতী এবং ইমাম শাফেঈ (র)-এর কোন কোন অনুসারী আলিমের উক্তিও তাই।

পবিত্র প্রস্রাব

এখন রহিল পবিত্র প্রস্রাবের অবস্থার প্রসঙ্গ। বহু সংখ্যক সাহাবা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং হযরত উম্মে আয়মন (রা) যিনি রাসূলে পাক (সা)-এর খিদমতে থাকিতেন, তিনি উহা পানও করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ণিত আছে যে, রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তখত মুবারকের নিচে এক পিয়ালা রাখিয়া দেওয়া হইত যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাতে প্রস্রাব করিতে পারেন। এক রাত্রে তিনি উক্ত পাত্রে প্রস্রাব করেন, সকাল হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উম্মে আয়মন (রা)-কে বলেন যে, এই খাটের নিচে এক পিয়ালা আছে উহা মাটিতে ফেলিয়া দাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাটের নিচে কিছু পাইলেন না। উম্মে আয়মন (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাত্রে আমার পিপাসা লাগিয়াছিল, তাই উহা আমি পান করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) না তাকে মুখ ধৌত করার হুকুম করেন এবং না দ্বিতীয়বার এইরূপ কর্ম করা হইতে বারণ করেন। বরং এই কথা বলেন, এখন তোমার আর কখনও পেটের ব্যথা দেখা দিবে না। খোশ নসীব।

এক মহিলার নাম ছিল উম্মে বারাকাত (রা)। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে থাকিতেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র প্রস্রাব পান করিয়াছিলেন। ইহারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اَصِحَّتْ يَا اُمَّ يُوْسُفَ হে উম্মে ইউসুফ! (উম্মু ইউসুফ বারাকাতের কুনিয়াত

www.pathagar.com

ছিল) তুমি সর্বদার জন্যে স্বাস্থ্যবতী হইয়া গিয়াছ। কখনও তুমি অসুস্থ হইবে না। ফলে উক্ত মহিলা কখনও রোগগ্রস্ত হন নাই। একমাত্র ঐ অসুখ ব্যতীত, যে অসুখে তিনি দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোন এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁহার পবিত্র প্রস্রাব পান করিয়াছিলেন, ফলে তাহার শরীর হইতে সর্বদা খোশবু ছড়াইতে থাকিত। এমনকি তাহার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কয়েক বংশ পর্যন্ত এই খোশবু ছিল। মাওয়াহিব এবং শিফা কিতাবে এই দুই রিওয়ায়াতের উল্লেখ নাই।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র প্রস্রাব এবং পবিত্র রক্তকে তাবাররুক জ্ঞান করা হইত। পবিত্র রক্তপানের ঘটনা সাহাবাগণ হইতে কয়েকবার সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ শিঙ্গা লাগানেওয়ালা (হাজ্জাম) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে শিঙ্গা লাগাইয়াছিল, সে তার চুঙ্গার (চুসনী) মাধ্যমে যত পবিত্র রক্ত বাহির হইত উহা গলার ভিতর দিয়া নিজ পেটের মধ্যে ফেলিয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রক্তের ব্যবস্থা কি করিতেছ ? সে নিবেদন করিল, আমি রক্ত বাহির করিয়া স্বীয় পেটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছি। আমি চাই না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র রক্ত মাটির উপর প্রবাহিত হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিঃসন্দেহে তুমি নিজ আশ্রয় সন্ধান করিয়া লইয়াছ এবং নিজ আত্মাকে নিরাপদ করিয়া লইয়াছ। অর্থাৎ রোগ-বালাই হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।

উহুদ যুদ্ধের দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখমপ্রাপ্ত হন, সেই সময় হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা মালিক ইব্ন সিনান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যখম (আঘাত) প্রাপ্ত স্থান মুখ দ্বারা চুষিয়া জিহ্বা দ্বারা যখমের স্থান পাক ও পরিষ্কার করেন। লোকেরা তাঁহাকে বলিল যে, নিজ মুখ হইতে রক্ত বাহিরে ফেলিয়া দাও। তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র রক্ত আমি কখনও মাটিতে পতিত হইতে দিব না। তিনি রক্ত গিলিয়া ফেলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখিবে, তবে সে ইহাকে দেখিয়া লউক।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিঙ্গা লাগাইলেন এবং তিনি স্বীয় পবিত্র রক্ত আমার নিকট দিয়া বলিলেন যে, ইহাকে এমন কোন স্থানে উধাও করিয়া দাও, যেখানে কাহারও দৃষ্টি না পড়ে। আমি উহা পান করিয়া ফেলিলাম। কেননা, ইহা অপেক্ষা অধিক গোপন স্থান আমি পাইতেছিলাম না। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ وائے لوگوں کو تم سے وائے لوگوں سے تمہیں ইহা তাঁহার শৌর্য–বীর্য, শক্তি ও বাহাদুরীর প্রতি ইঙ্গিত ছিল, যা তাহার এই পবিত্র রক্ত পান করার দরুন অর্জিত হয়। ইনি সেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র যিনি নাপাক ও অপবিত্র ইয়াযীদের বায়আত গ্রহণ করেন নাই। এবং পরবর্তীতে মক্কা মুকাররামাতে বসবাস আরম্ভ করেন। আর তাঁর দলে হিজায, ইয়ামন এবং ইরাক ও খুরাসানের লোকেরা আসিয়া সমবেত হন। কিন্তু আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের ইমারতের (বাদশাহী) সময় হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাঁহাকে শহীদ করেন এবং গৃহের উপর লটকাইয়া রাখেন। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) কর্তৃক পবিত্র রক্ত পান করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, لَا تَمَسُّكَ النَّارُ اِلاَّ قَسَمَ الْيَمِيْنَ অর্থাৎ দোযখের আগুন তোমাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু কসম খাওয়ার দরুন যে আল্লাহ্ জাল্লা ও আলা কসম খাইয়াছেন وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

www.pathagar.com

প্রস্রাব ও রক্ত পাক ও পবিত্র ছিল এবং ইহার উপর কিয়াস করিয়া নবী আকরাম (সা)-এর যাবতীয় বর্জসমূহের হুকুম। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আয়নী বলেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবও ইহাই। আর শায়খ ইব্‌ন হাজার মাক্কী (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাবতীয় পরিত্যক্ত বস্তুর উপর অধিক এবং অনেক সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি বিদ্যমান আছে এবং আমাদের সম্মানিত বুযুর্গ ইমামগণ এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

পবিত্র বৈবাহিক জীবন

এখন রহিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপন পবিত্রা স্ত্রীগণের সহিত মুবাশারাত অর্থাৎ সহবাস সম্পর্কিত বর্ণনা। যদিও এই গুণের বর্ণনা বাহ্যত পবিত্র পিঠ, পবিত্র বক্ষ এবং পবিত্র উদরের বর্ণনার পর যথোপযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ণনার ধারা বাক্য পরম্পরা এবং বিষয়বস্তুসমূহের শৃংখলা ও বিন্যাসের কারণে এবং কতিপয় ঐ সকল স্থানের কারণেও যাহা এই বর্ণনাকে সর্বশেষ পর্যায়ে লইয়া যায়। কিন্তু আমার নিকট ইহার এই স্থানই উত্তম স্থান। বিবাহের উপকারিতাসমূহের মধ্য হইতে প্রথম উপকারিতা হইল বংশ সংরক্ষণ। মানব গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের পরেই হইল স্বাদ অর্জন করা, নিআমত উপভোগ করা এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা। এই কারণে যে সন্তান জন্মদানের ধাতু অর্থাৎ বীর্যকে বহু সময় পর্যন্ত বাধা দিয়া রাখা এবং সহবাস না করার দরুন কঠিন রোগসমূহের সৃষ্টি হওয়া এবং শক্তি ও দেহের অঙ্গসমূহের দুর্বল করার এবং কৃত্রিম বন্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মহিলাদের সহিত মহব্বত বা প্রেম করা এবং একাধিক বিবাহ করা ইহা এক প্রকার পরিপূর্ণতা এবং ইহা ঐ সকল স্তরসমূহের বা মাকামসমূহের এক মকাম যেখানে সংকীর্ণ চিন্তা বুদ্ধিসম্পন্নদের বিবেকে উক্ত মাকামের কামালিয়াতের পূর্ণতার প্রকৃত জ্ঞানের উপর আবরণ বা পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। বিবিগণের সহিত মিলিত হওয়া, সহবাস করাকে ভবিষ্যত চিন্তাহীন লোক ইহাকে ক্ষতিকর, দোষণীয় এবং খেলা-তামাশা ধরনের মধ্যে গণ্য করেন। অথচ ইহা বুদ্ধির দারিদ্র্য এবং বৈরাগ্যতার প্রতি স্বভাব উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে হয়। প্রকৃত দৃষ্টিতে জমাতবদ্ধতা, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব ও প্রভাবান্বিত হওয়া যাহা জগতের বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কারণ, যতটুকু পরিমাণ ইহাতে বিদ্যমান আছে আর অন্য কোন কর্মে তা নাই। সায়্যিদে আম্বিয়া, সায়্যিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কর্ম ইহার, সনদ ও দলীল হিসাবে যথেষ্ট। এই বিষয়ের বাদবাকী অংশ ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা অত্র কিতাবের শেষের দিকে পবিত্র স্ত্রীগণের বর্ণনার অধীন বর্ণনা করা হইবে।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাত্রিতে তাঁহার এগারজন পবিত্রা বিবিগণের নিকট গমন করিতেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী এত শক্তি রাখিতেন ? হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমরা পরস্পরে গল্প করিতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশ পুরুষের শক্তি দান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অপর বর্ণনায় ৪০ জন পুরুষের শক্তি বলা হইয়াছে এবং আরও বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক জান্নাতী পুরুষের শক্তি দুনিয়ার ১০০ (একশত) ব্যক্তির শক্তির সমান হইবে। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) এক ডেকচি খাবার লইয়া আসেন, উহা হইতে আমি কিছু ভক্ষণ করি, ইহাতে আমার মধ্যে চল্লিশ পুরুষের সমান সঙ্গমশক্তি আসিয়া যায়।

www.pathagar.com

কাযী ইয়ায (র) শিফা কিতাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লজ্জার স্থান কখনও দেখি নাই। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) না হযরত আইশা (রা)-এর লজ্জাস্থান দেখিয়াছেন আর না হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লজ্জাস্থান দেখিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী মুরতাযা (রা)-কে ওসিয়ত করেন যে, তুমি ব্যতীত আমাকে যেন কেহ গোসল না করায় এবং কাহারও দৃষ্টি যেন আমার লজ্জাস্থানের প্রতি না পড়ে। কেননা, যাহারই দৃষ্টি আমার লজ্জাস্থানের উপর পড়িবে, তাহার দুই চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইতে থাকিবে। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক শক্তির পূর্ণতা বটে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রূহানী শক্তি এমন ছিল যে, আকাশকে উহার ঘূর্ণায়মান হইতে বিরত রাখিত। বরং উহা স্বীয় ঘূর্ণায়মানের বিপরীত চলিত। যেমন অস্তমিত যাওয়ার পর সূর্যকে পূর্ণ উদিত করা সম্পর্কে হাদীসে আসিয়াছে। ইহা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের স্থান। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরাম-আয়েশ ও নিআমত গ্রহণ এবং পানাহারের এই অবস্থা ছিল যে, তিনি কখনও পেট ভরিয়া আহার করেন নাই এবং যবের রুটির উপর খাবার সংক্ষেপ করিতেন। এই মরতবা ও অবস্থা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র শরীরের শক্তি ও সামর্থ্যের উল্লিখিত সমুদয়ই তাঁহার মু'জিযাসমূহের মধ্যে গণ্য।

স্বপ্নদোষ হইতে নিরাপদ হওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নদোষ হইতে নিরাপদ ছিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন। কোন নবীরই কখনও স্বপ্নদোষ ছিল না। কেননা, স্বপ্নদোষ শয়তানের প্রভাব হইতে হয়। তাবারানী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের (মুত্তাফিকুন আলাইহি) হাদীসে আছে, পবিত্র রমযানে ফজরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নদোষ ব্যতীত (জুনুবী) অপবিত্র হইতেন। ইহার পর তিনি গোসল করিতেন এবং রোযা রাখিতেন। বিবির সহিত রাত্রি যাপনের পর গোসল ওয়াজিব হওয়াকে জুনুবী বলে। এইখানে (بغير । احتلام) স্বপ্নদোষ ব্যতীত এই শর্ত আরোপ করায় এই ধারণার উদ্ভব হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ইহতিলাম বা স্বপ্নদোষের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হইবে। নতুবা ব্যতীত (اِسْتِثْنَاء।) বলার কি ফায়দা ? ইহার উত্তর হইল এই যে, استثناء। বা ব্যতীত বলার বুনিয়াদ হইল নাজায়েয হওয়ার উপর এবং এই শর্ত তাৎক্ষণিক। এই বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল সহবাসের দরুন ছিল— স্বপ্নদোষের কারণে ছিল না। কেননা, (ইহতিলাম) স্বপ্নদোষ হওয়া তাঁহার উপর জাইয নহে। যদি ইহার এই অর্থ না হয় (যাহা বর্ণিত হইল) তাহা হইলে আবশ্যক হইবে যে, স্বপ্নদোষের (احتلام।) সহিত (জানাবত) স্ত্রী-সহবাসের গোসল ফরয হইবে না। অথচ এই ধারণা ফাসিদ ও অশুদ্ধ। ইমাম কুরতুবী বলেন, সহীহ্ ও শুদ্ধ ইহাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর (احتلام।) স্বপ্নদোষ জাইয নহে। কেননা, ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) শয়তানের কাজ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা হইতে মাসূম বা নিষ্পাপ ছিলেন। উপরে উল্লিখিত রোযাওয়ালা হাদীসে ইহতিলামের (স্বপ্নদোষের) উদ্দেশ্য এই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নে কিছু না দেখিয়া এমনিতে বীর্যপাত হইয়া যাওয়া আর যদি স্বপ্নে কোন কিছু দেখার পর হয় তবে উহা শয়তানের কর্ম। কাযী ইয়ায (র) বলেন যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল করা সহবাসের পর বিলম্বে হইয়াছিল, যাহা নিজ লোকজনের অধিক সমাবেশের কারণে হইয়াছিল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

এ সুদীর্ঘ হাদীসে যাহা আহ্‌লে বায়তে নুবুওয়াতের ইমামগণের সূত্রে বর্ণিত এবং যে হাদীস সম্মানিত দুই ইমাম সায়্যিদেনা ইমাম হাসান এবং সায়্যিদেনা ইমাম হুসায়ন শহীদে কারবালা (রা)-এর উপর শেষ হইয়াছে এবং যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক এবং কতিপয় স্বভাব ও চরিত্রের সমষ্টি, উহাতে আসিয়াছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রা) বলেন যে, আমি আমার ফুফু হিন্দ বিন্‌ত আবী হালার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম এবং আমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম যে, তিনি ঐ সকল জিনিসেরও বর্ণনা দান করিবেন যাহা আমার সহিত সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি জানিতাম, যে সকল জিনিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারকে আছে উহা আমার মধ্যেও থাকিবে। কেননা, হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর পবিত্র হুলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারকের এতটুকু পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে, যদি কেহ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যিয়ারত লাভে ধন্য হইত, তবে লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন্ চেহারা-সূরতে দেখিয়াছ। যদি সে হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর চেহারা-সূরতে দেখিত, তো বলা হইত তুমি ঠিকই দেখিয়াছ। বস্তুত হিন্দ বিন্‌ত আবী হালাহ্ বলেন ঃ -

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ -

'দর্শনধারীদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী চেহারা অতি শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাবান, শান-শওকতওয়ালা ছিল। তাঁহার চেহারা এমন চমকাইত যেমন পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদ চমকাইয়া থাকে।'

ইমাম হাসান (রা) বলেন, অতঃপর আমি হিন্দ বিন্‌ত আবী হালার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথোপকথন, নীরবতা এবং বাকশক্তি যেমন ছিল তৎসম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ চিন্তাযুক্ত ও যিকিরের মধ্যে থাকিতেন। অনাবশ্যক কথা বলিতেন না। তাঁহার নীরবতা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হইত। কথার শুরু ও শেষ মুখাবয়বে করিতেন। অর্থাৎ বাক্যের শব্দগুলি মুবারক মুখের মাধ্যমে সমাপ্ত ও পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং সঠিকভাবে প্রকাশ করিতেন এবং খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ বাক্য বলিতেন না এবং তাঁহার কথাবার্তা সকল কথার সমষ্টি হইত। جَوَامِعُ الْكَلِمِ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং অর্থ অধিক হইত। যেমন হাদীসে আসিয়াছে اُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لِىَ الْكَلَامَ আমাকে বাক্যসমূহের সমষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং আমার জন্য বাক্যকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে এবং তিনি সুস্পষ্ট, সাবলীল, সবিস্তার কথা বলিতেন, যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি ও বাহুল্যতা থাকিত না। তিনি নম্র স্বভাব এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শক্ত বাক্য সম্পন্ন এবং উগ্র স্বভাবের ছিলেন না। নিআমতের মূল্যায়ন করিতেন যদিও সামান্য হইত এবং কোন বস্তুর দোষ দিতেন না। যে ধরনের খাবার হইত উহা প্রত্যক্ষ করিতেন, যদি খারাপ না বলিতেন তো প্রশংসাও করিতেন না। যেমন বেফাশ মুখওয়ালাদের স্বভাব হয়। কেহ তাঁহার গোস্‌সার সম্মুখে না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, না উহার চোট সামলাইতে সক্ষম হইত। তিনি ঐ সময় রাগান্বিত হইতেন যখন কেহ সীমা অতিক্রম করিত। এমনকি সত্যের বদলা লইয়া ছাড়িতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি কখনও নিজস্ব হক আদায়ের জন্য রাগ করিতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করিতেন না। তবে শর্ত হইল উহা পার্থিব দুনিয়া সম্পর্কিত যদি হইত। কোন বস্তুর প্রতি যদি ইশারা-ইঙ্গিত করিতেন, তবে পূর্ণ হস্ত দ্বারা ইশারা করিতেন শুধু আংগুল দ্বারা করিতেন না। আশ্চর্যান্বিত হওয়ার সময় হাতের তালুকে ঐ গঠনের উপর বাহির করিতেন যে অবয়বে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ব্যাক্যালাপকালে ডান হাতের আঙ্গুলকে বাঁ হস্তের তালুর উপর মারিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই সকল স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বড়ই পসন্দনীয় ছিল। নিশ্চয়ই এই পবিত্র স্বভাবসমূহের মধ্যে কোন না কোন রহস্য বা ভেদ নিহিত ছিল যাহার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে বুদ্ধি অক্ষম ও নিরুপায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইতেন, তখন তাঁহার নূরানী চেহারা এবং পার্শ্ব মুবারক তাহার দিক হইতে ফিরাইয়া নিতেন এবং যখন খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং কোন বস্তুর প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন, তখন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অধিকাংশ হাসি তাবাস্‌সোম অর্থাৎ মুচকি হাসি হইত এবং মুচকি হাসির সময় দাঁত মুবারক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বলতায় বরফের মত চমকাইতে থাকিত।

সায়্যেদেনা ইমাম হাসান মুজতাবা (রা) বলেন যে, আমি এই পবিত্র হাদীস ইব্‌ন হালার নিকট হইতে শ্রবণ করতঃ এক যুগ পর্যন্ত আপন ভাই ইমাম হুসায়ন (রা) হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু যখন এই হাদীস তাহার নিকট বর্ণনা করি তখন জানিতে পারিলাম যে, তিনি এই হাদীসটি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন এবং স্বীয় বুযুর্গ পিতা সায়্যিদেনা আলী মুরতাযা (কাররামাল্লাহু) হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন, প্রস্থান, আকৃতি, অবয়ব, উঠা-বসা সব কিছুই অবগত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইমাম হুসায়ন (রা) বলেন যে, আমি স্বীয় বুযুর্গ পিতা আলী মুরতাযা (রা) হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে প্রবেশ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে তাশরীফ আনয়ন করিতেন। তখন কি করিতেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র আবাসস্থলে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার অবকাশকালীন সময়কে তিন অংশে ভাগ করিতেন। তন্মধ্য হইতে এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য হইত। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী করিতেন। যদিও তিনি সকল সময় ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে থাকিতেন। কিন্তু এই স্থানে উদ্দেশ্য হইল একমাত্র খালিসাতান লিল্লাহ এই অংশ রক্ষিত থাকিত। সময়ের এই অংশে না নিজ পরিজনের অধিকার থাকিত, না স্বীয় সত্তার এবং না অন্যান্য লোকের হকসমূহের ব্যাপারে অধিকার থাকিত। আর দ্বিতীয় অংশ পরিবার-পরিজনদের জন্য সংরক্ষিত থাকিত। এই সময় তাহাদের দাবী-দাওয়া আদায় করা হইত। তাহাদের সহিত আলাপচারিতা করিতেন, তাঁহাদের আবশ্যকীয় বিষয়াদি পূরণ করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত সহবাস ইত্যাদি করিতেন এবং তৃতীয় অংশ স্বীয় পবিত্র সত্তার জন্য হইত। তখন নিজ সত্তার হক আদায় করিতেন। উদাহরণত তিনি আরাম করিতেন, শয়ন করিতেন এবং আরও এই ধরনের কর্ম করিতেন। অতঃপর তাঁহার জন্য বরাদ্দকৃত এই তৃতীয় অংশকেও নিজের এবং অপরাপর লোকদের মধ্যে বণ্টন করিতেন এবং ইহাতে তাহাদিগকেও শরীক করিতেন। ইহার ধরন এইরূপ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ সাহাবীগণ সাধারণ লোকদের প্রয়োজনাদি এবং তাহাদের আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্ঞাত করাইতেন। অতঃপর খাস সাহাবীগণ তাঁহার মুবারক মজলিসের ফাইদাসমূহ আম সাধারণ লোকদিগের নিকট পৌঁছাইতেন। উদ্দেশ্য হইল যে, সর্বপ্রথম মাধ্যম ব্যতীত ফাইদাসমূহ এই বিশেষ সাহাবীদের নিকট পৌঁছিত। অতঃপর পুনরায় ঐ খাস সাহাবীদের মাধ্যমে সাধারণ লোকদের নিকট পৌঁছিত। যাবতীয় ফাইদা ও নসীহতের মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য

www.pathagar.com

লোকের হক হইতে বাঁচাইয়া নিজের জন্য জমা করিয়া রাখিতেন না। অর্থাৎ মজলিসে আগত লোকদের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যাহা সমীচীন মনে করিতেন, উহা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চরিত্র ও স্নেহময় স্বভাবসমূহের মধ্যে ত্যাগ ছিল অন্যতম। শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানবান, সত্যনিষ্ঠ এবং মর্যাদাবান ব্যক্তিগণের অনুমতি সাপেক্ষে ঘরের ভিতরে প্রবেশের ইখতিয়ার ছিল। তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দান করিতেন। এবং তাঁহার পবিত্র মজলিসে তাঁহাদের উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিতেন এবং তাহাদের বুযুর্গী ও মরতবা বা স্তর অনুযায়ী দীনের কর্মসমূহ তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিতেন। উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি তাঁহার মজলিসে অথবা দীনদারীর ক্ষেত্রে যত বেশী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং উন্নতমানের হইতেন তিনি তাহার ভাগ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগ্রহ ও রেয়ায়াতের ক্ষেত্রে অত্যধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সমাধান করিতেন এবং সাহাবা বা সাথীদের মাকসূদসমূহ নিরূপণে ব্যস্ত থাকিতেন। এবং তাঁহাদিগকে তাহাদের নিজ অবস্থার সংশোধন ও পরিশুদ্ধকর্মে মশগুল রাখিতেন বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই মজলিসে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু শ্রবণ করে সে যেন অন্য অনুপস্থিত লোকদের মধ্যে উহা পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি বলিতেন যে, তোমাদের সকলের উপর অবশ্য কর্তব্য হইল আমার নিকট ঐ সকল লোকের সমস্যাসমূহ পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহারা আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উহা পৌঁছাইতে পারে না।

ফাইদা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে কেহ এমন কোন ব্যক্তির সমস্যা, সমস্যা সমাধানকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, যে তাহার নিজস্ব সমস্যা তাঁহার সম্মুখে পৌঁছাইতে সক্ষম নয়, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার পদদ্বয়কে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। এই বয়ানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বীয় খিদমতে পেশ করার কথা উল্লেখ করেন নাই। কেননা, যেহেতু তাঁহার খিদমতে এই ধরনেরই সমস্যা ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উপস্থাপন করা হইত যেগুলি পার্থিব দুনিয়া এবং দীনের ক্ষেত্রে আবশ্যক হইত। ইহা ব্যতীত তাঁহার পবিত্র মজলিসে অন্য কোন বিষয় আলোচনা হইত না। বিশেষ করিয়া বাহুল্য ও অনর্থক কথা। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দরবার হইতে ইল্ম, খায়র ও বরকতে অংশগ্রহণ করতঃ অপরাপর লোকদের মধ্যে গমন করিত এবং তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিত।

সায়্যিদুনা ইমাম হুসায়ন (রা) স্বীয় পিতা হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর নিকট পবিত্র গৃহ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিরে তাশরীফ আনয়ন করা এবং সাহাবায়ে কিরামের সহিত বৈঠক করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন যে, كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَخْزُنُ لِسَانَه الا فِيْمَا يَعْنِيْه। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক জিহ্বাকে বন্ধ রাখিতেন এবং উহা সংরক্ষণ করিতেন কিন্তু ঐ সকল জিনিস এবং ঐ সকল কথা যাহা কল্যাণকর ও উপকারী হইত। يَخْزُنُ ইয়াখযুনু ইহার উৎপত্তিস্থল হইল, খাযনুন (خَزْنُ)। অর্থাৎ যাহার অর্থ হয় ভাণ্ডারে মাল বা ধন-সম্পদ রাখা। ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যবান মুবারক (জিহ্বা মুবারক) ঐ হৃদয়ের জন্য যাহা যাবতীয় হক ও মা'রিফাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল চাবি ছিল। অর্থাৎ উম্মতের জন্য যাহা কল্যাণকর ও উপকারী হইত, তজ্জন্য তিনি যবান মুবারক খুলিতেন। নতুবা স্বীয় পবিত্র জিহ্বা (যবান) বন্ধ রাখিতেন। তিনি উম্মতের হৃদয় তুষ্ট রাখিতেন এবং স্বীয় নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া না যায় উহা সংরক্ষণ করিতেন। প্রকৃত অর্থে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার কাজের মধ্যে শামিল। যেমন কুরআন পাকে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ হক তা'আলা এমন করুণাময় মেহেরবান যে, তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহে মহব্বত ও ভালবাসা দান করিয়াছেন। তিনি দুর্বল ঈমান লোকদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ ও দান করিতেন। যাহাদিগকে 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব' বলা হইত। এমনভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি ইয্যত ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাহাদিগকে ঐ গোত্রের প্রশাসক নিয়োগ করিতেন। লোকদের হইতে বাঁচিয়া চলিতেন ও নিজের নিরাপত্তার বিধান করিতেন। শত্রুদের হইতে নিজ রক্ষা ব্যবস্থা করিতেন। যাহাতে শত্রুগণ কোন প্রকার কষ্ট না পৌঁছাইতে পারে। এই আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা এই আয়াত وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগ হইতে আপনাকে হিফাযত রাখিবেন" নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিল। এই দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া যদি দেখা যায় তবে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে ইল্ম, হিকমত অর্থাৎ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় ও হিদায়াত রহিয়াছে। আসলে ইহা স্বীয় গাম্ভীর্য ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করা এবং লোকদের সহিত মেলামেশা না করা এবং খুলামেলা না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যাহাতে লোকেরা নির্ভয় ও দুঃসাহসী না হইয়া যায়। স্বীয় রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রশস্ত মুখ ভদ্র ও সুন্দর ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং নিজ সাহাবীদের মনোরঞ্জন ও প্রশ্নাদি করিতেন। লোকদের মধ্য হইতে একে অপরের অবস্থা অবগত হইতেন। যাহাতে প্রত্যেকেই ভাল অবস্থায় থাকে। পরস্পরে সুন্দর আচরণ করিতে থাকে। উত্তম কর্ম ও ভাল অবস্থায় থাকার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং শক্তি ও সমর্থন দান করিতেন। যদি এইরূপ না হইত, তবে অন্তত সংশোধন করিতেন এবং খারাপ ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা করিতেন এবং উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। তাঁহার স্বভাব শরীফই এইরূপ ছিল যে, ভাল কর্মের প্রশংসা করিতেন এবং মন্দ কর্মের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিতেন। যাহার পক্ষ হইতেই কোন খারাপ কর্ম অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করিতেন। সেই কুকর্মশীল ব্যক্তির কোন পরওয়া করিতেন না। এবং তাহাকে ভয়ও করিতেন না বাহ্যত: সে যত বড় উঁচু মরতবার এবং বিরাট শক্তিশালী হইত তবু।

লোকদের একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, গুপ্ত বিষয় জানা যাহাকে তাজাস্সুস (تَجَسُّسْ) বলা হয় এই ধরনের ছিল না। কেননা, تَجَسُّسْ তাজাস্সুস উহাকে বলা হয় যে, কাহার গোপন দোষসমূহ লোক সম্মুখে হেয় ও মন্দ প্রতিপন্ন করার জন্য প্রচার-প্রসার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করা হয়। আর অবস্থা সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসা করা, পরস্পরে একে অপরের বাহ্যিক অবস্থার প্রশিক্ষণ ও সংশোধন উদ্দেশ্যে ছিল এবং তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যমপন্থী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সকল এবং মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী মধ্যম ও ন্যায়পন্থী, সাবলীল সুদৃঢ় ও স্থায়ী ছিল। তাঁহার কর্মসমূহে উত্থান ও পতন ছিল না। আর না মতানৈক্য এবং না উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের পথ সৃষ্টি হইত এবং তিনি উম্মতের প্রশিক্ষণ এবং শিষ্টাচার ও সভ্যতা শিক্ষা দান হইতে বিমুখ থাকিতেন না। সর্বদা তাহাদের শাসন, পথ-নির্দেশনা ও কর্ম পরিচালনার মধ্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এবং ভয় রাখিতেন কখনও যেন তাহারা গাফিল না হইয়া যায়। তিনি খুব কঠোর ও কষ্টকর ইবাদত সার্বক্ষণিকরূপে নিজের উপর এই ভয়ে বাধ্যতামূলক করিতেন না, যাহাতে ইহা উম্মতের উপর ফরয করিয়া না দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক কাজের

www.pathagar.com

জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। যথা যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি। আর তাঁহার প্রয়োজনীয় কর্মের জন্য যে জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিত উহা প্রস্তুত রাখিতেন। সত্য কর্মে অলসতা করিতেন না এবং উহার সীমা লংঘন করিতেন না। সর্বদা সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং সত্য প্রমাণে ব্যস্ত সমস্ত থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল নৈকট্যশীল, সহবৈঠকী সকল সাথিগণ, আখইয়ার ও আবরার ছিলেন অর্থাৎ নেককার ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তিনি অধিক মর্যাদাবান ও নৈকট্যশীল হইতেন, যিনি লোকদের জন্য অধিক উপদেশ দানকারী ও বেশী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতেন। সায়্যিদুনা ইমাম হুসায়ন (রা) বলেন যে, আমি আমার বুযুর্গ পিতা সায়্যেদুনা আলী মুরতাযা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক মজলিসের আদব ও নিয়ম-পদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং মজলিসে আগত অতিথিদের সহিত কি ধরনের বৈঠক হইত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র স্মরণ ব্যতীত না বসিতেন, না উঠিতেন। অর্থাৎ উঠা-বসা অবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকর (স্মরণ) করিতেন। যখন পবিত্র মজলিসে তাশরীফ আনয়ন করিতেন, তো যেখানেই স্থান হইত উপবেশন করিতেন। কোন উঁচু এবং বিশেষ মর্যাদাপূর্ণস্থানে উপবেশন করার চেষ্টা করিতেন না। এবং তাঁহার জন্য পূর্ব হইতে কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত না। এবং তিনি উম্মতদিগকে এই শিক্ষাই দিতেন। উঁচু ও মরতবাপূর্ণ স্থানের আকাংখা হইতে বারণ করিতেন। তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এবং তাওয়াজ্জোহ ও দৃষ্টিদানের অংশ মজলিসের সকলের জন্য সমভাবে দান করিতেন, কোন একজনও যেন এই ধারণা পোষণ করিতে না পারে যে, অমুক ব্যক্তি মজলিসের সকলের মধ্যে বেশী সম্মানী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটতম। প্রত্যেকের সহিত তাহার মর্যাদা ও যোগ্যতা এবং তাহার অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যে কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কোন সমস্যা, জরুরী বিষয় লইয়া আসিত তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে ব্যক্তি নিজ হইতে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। মজলিস হইতে রাসূল (সা) স্বয়ং ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়া যাইতেন না যতক্ষণ না সে উঠিয়া করিয়া যাইত। তাঁহার নিকট কেহ যদি কিছু ভিক্ষা চাহিত অথবা কোন সমস্যা ও জরুরী বিষয় পেশ করিত তো তিনি তাহাকে নিষেধও করিতেন না এবং প্রত্যাখ্যানও করিতেন না। বরং তাহার সমস্যার সমাধান করিতেন এবং যদি তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ার মত কিছু মওজুদ না থাকিত তো ভাল ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মিষ্টি কথায় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেন। (এই পবিত্র স্বভাবের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র চরিত্রের অধ্যায়ে তাঁহার বখশিশ ও দানের আওতায় আসিবে।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল মানুষের জন্য পিতৃতুল্য ছিলেন এবং হকের ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট সকলেই সমান ছিলেন। তাঁহার মজলিস বা দরবার শরীফ, ইলম, হিলম, উদারতা, লজ্জা (হায়া) এবং ধৈর্য ও আমানতের মজলিস ছিল। যেস্থানে না উচ্চৈঃস্বরে কথা হইত আর না তথায় অবৈধ অশ্লীল অশোভনীয় কথা হইত। মজলিসে আগমনকারীদের মধ্য হইতে কাহারও নিন্দনীয় কার্য না প্রকাশ করা হইত, না প্রচার-প্রসার করা হইত। ইহার উদ্দেশ্য হইল মানবীয় কোন প্রেক্ষাপটে যদি কাহারও পক্ষ হইতে অশোভনীয় কোন কর্ম সংঘটিত হইয়াও যাইত তো উহা দৃষ্টির অগোচরে রাখা হইত বা ক্ষমা সুন্দর চক্ষে দেখা হইত। পবিত্র মজলিসের সকলেই এক সমান সমভাবাপন্ন ও একবরাবর হইতেন। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পরস্পরের তাকওয়া বা পরহেযগারিতা অনুযায়ী ছিল। তাহারা একে অপরকে পরস্পরের সম্মান ও ইয্যত করিতেন। বড় ছোটদের স্নেহ ও আদর করিতেন এবং ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করিত এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি দান করিতেন এবং গরীব দরিদ্র এবং মুসাফিরদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া রাযিআল্লাহু তা'আলা আন্হুম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল (সা)-এর মহোত্তম চরিত্র ও স্নেহময় গুণাবলীর বর্ণনা

আখলাক (أَخْلَاق) খুলুকুন (خُلُق)-এর বহুবচন। খুলুকুন খা অক্ষরে পেশ দিয়া হইলে বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ চরিত্র অর্থ হয়। এবং খালক-এর খা অক্ষরে যবর দিয়া হইলে যাহেরী বা বাহ্যিক চেহারা অর্থ হয়। কামূস অভিধানে খা ও লাম-এ পেশ বা সাকিন দিয়া হইলে উহার অর্থ স্বভাব ও প্রকৃতি করা হইয়াছে। সুরাহ অভিধানে খুলুক-এর অর্থ উত্তম বা সুন্দর চরিত্র বা স্বভাব এবং কখনও শৌর্যবীর্য, হাসিমুখ এবং মানুষের সহিত সুন্দর আচরণ অর্থ আসিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ ইহার চাইতেও বেশী ব্যাপক আরও সুবিস্তৃত এবং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র চরিত্র এই সকল অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যেখানে তিনি মুসলমানদের সহিত রহীম (দয়ালু) রফীক বিনম্র ছিলেন, মেহেরবান ও পরম বন্ধু ছিলেন, সেস্থলে তিনি আবার কাফিরদের উপর সত্য প্রতিষ্ঠার দলীল হিসাবে অধিক কঠোর ও শক্ত ছিলেন। আর জ্ঞানবানদের নিকট 'খুলুক'-এর অর্থ এমন ধীশক্তি, যাহার কারণে অতিসহজে অনায়াসে কর্মসমূহ প্রকাশ পায়। 'খুলুক'-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দর্শন ও বিজ্ঞান পুস্তকগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, খুলুক (গরীযী) অর্থাৎ প্রকৃতিগত ও জন্মগত স্বভাব, না ইক্‌তিসাবী অর্থাৎ কর্মগত স্বভাব যাহা বান্দা সাধনা, মুজাহাদা, কর্ম ও কৌশল দ্বারা অর্জন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কোন কোন আলেমের মাযহাব হইল, খুলুক স্বভাবগত ও জন্মগত। তাহাদের প্রমাণ হইল হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এই হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রকে (স্বভাব) ঐরূপ নিরূপণ বা নির্দিষ্ট করিয়াছেন যেরূপ তোমাদের রিযিককে নিরূপণ বা নির্দিষ্ট করিয়াছেন (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত) এবং বলেন যে, যদি তোমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যে, পর্বত নিজ স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া গিয়াছে, তবে তোমরা এই সংবাদ সত্য জানিবা এবং যদি এই সংবাদ প্রাপ্ত হও যে, অমুক ব্যক্তি তাহার নিজ স্বভাব-চরিত্রকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে, তবে ইহা কবুল করিও না, মানিয়া লইও না। কিন্তু তবু আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় সকল কিছু হয়।

ইহা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কিছু লোক তো আছে যাহাদের কোন কোন স্বভাব-চরিত্র এমন বদ্ধমূল এবং পরিপক্ব যে উহাতে পরিবর্তন সাধন বা বদল করা সুকঠিন ব্যাপার। বরং উহা ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়। নতুবা সে মুজাহাদা রিয়াযত-এর সহিত আদিষ্ট। সাধনা দ্বারা যদি ঐ সকল অবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় এবং ঐ গুলিকে প্রশংসিত স্বভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়, তবে উহা সম্ভব। কোন কোন স্বভাব বলহীন ও দুর্বল থাকে যাহা সাধনা ও রিয়াযতের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। আবার কোন কোন স্বভাব শক্তিশালী হইতে শক্তিহীন দুর্বল পর্যায়ে চলিয়া আসে। শরীআতে চরিত্রকে উত্তমরূপে গড়িয়া তুলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামকে তো চরিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য এবং মানুষের হিদায়াতের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে। যদি

www.pathagar.com

স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন, পরিমার্জিতকরণ সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে উহা উত্তম করিতে এবং লোকদিগকে উত্তমরূপে গড়িয়া তুলিতে নবীগণকে প্রেরণে কি ফাইদা ও উপকারিতা থাকে। দু'আয়ে মাছুরাতে বর্ণিত হইয়াছে اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلْقِي। আয় আল্লাহ্! যে ভাবে তুমি আমার গঠনকে সুন্দর বানাইয়াছ, তদ্রূপ আমার স্বভাবকে সুন্দর বানাও। অন্য এক হাদীসে আছে–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাকে উত্তম চরিত্র গঠনে পথ প্রদর্শন কর। তুমি ব্যতীত কেহ উত্তম চরিত্রের তাওফীক দান করিতে পারে না এবং আমাকে মন্দ স্বভাব হইতে ফিরাইয়া রাখো। তুমি ব্যতীত মন্দ স্বভাব হইতে কেহই ফিরাইতে পারিবে না।' ইহা সকলই তা'লীম ও তালকীন-এর জন্য অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য।

শায়খ আবদুল কায়স-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ فِيْكَ الْخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاءَةُ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হে আবদুল কায়স! তোমার মধ্যে দুইটি স্বভাব আছে যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। এক সহনশীলতা দ্বিতীয় গাম্ভীর্য। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার এই স্বভাব প্রথম হইতেই আছে, না এখন উদ্ভব হইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, قديما অর্থাৎ প্রথম হইতেই আছে। ইহার পর তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিতেছি যে, তিনি আমার স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে এমন দুই খাসলত সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তাঁহার নিকট খুবই প্রিয়। তো প্রশ্নের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করা দ্বারা এই দিকে ইংগিত রহিয়াছে যে, কোন কোন স্বভাব جبلى অর্থাৎ জন্মগত এবং কোন কোন স্বভাব كتسابى। অর্থাৎ কর্মগত বা অর্জনমূলক।

এই স্থানে সমন্বয় সাধনের এক সূরত বা পদ্ধতি আছে। উহা হইল, যাহা সঙ্গলাভ এবং অভ্যাসের কারণে অর্জন বা সৃষ্টি হয় ঐগুলির পরিবর্তন ও বদল করা সহজ। কিন্তু কোন কোন স্বভাব জন্মগত, প্রকৃতিগত এবং চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। এইগুলির পরিবর্তন করা কঠিন। এতদ্সত্ত্বেও ইহা সম্ভাবনার আওতার বাহিরে নহে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ —আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এবং এই বিশ্বাস রাখা অতি জরুরী যে, তামাম আম্বিয়া ও মুরসালীন আলায়হিম আস্সালাতু ওয়াস্সালামগণের সূরত ও সীরাত অর্থাৎ কায়া ও চরিত্রের মধ্যে মহোত্তম চরিত্র, প্রশংসিত গুণাবলী এবং সর্ব প্রকারের পূর্ণত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে। এবং ইহাদের তামাম মানব জাতি-গোষ্ঠী এবং প্রত্যেক মানব সদস্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার থাকে। সকল স্তর বা মরতবার মধ্যে তাহাদের স্তর বা মরতবা সর্বোপরি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে যাহাদিগকে হক তা'আলা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ও মরতবা দিয়া সম্মানিত করিয়া স্বীয় কিতাব কুরআনুল কারীমে তাঁহাদের ফযীলত, প্রশংসা, গুণগান করিয়াছেন।

আকাঈদ সম্পর্কিত বিষয়ে ইহা প্রমাণিত যে, কোন ওলী নবীগণের স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। শায়খ ইমাম হাফিয উদ্দীন নাসাফী (র) তাফসীরে মাদারিক-এ বলেন, নিঃসন্দেহে কেহ কেহ ওলীর কদম (পা)-কে নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে। অথচ ইহা প্রকাশ্য

www.pathagar.com

কুফরী। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়া ও রাসূলগণকে একের উপর অপরকে ফযীলত দান করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ করেন ঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ — এই রাসূলগণের মধ্য হইতে আমি একের উপর অন্যজনকে ফযীলত-শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।

কাযী ইয়ায মালকী (র)-এর কিতাব শিফাতে উল্লিখিত আছে যে, সমস্ত আম্বিয়া কিরাম আলায়হিমুস্সালাতি ওয়াস্সালাম-এর পবিত্র চরিত্র জিবিল্লী এবং পয়দায়েশী অর্থাৎ পূর্ব হইতে জন্মগত স্বভাব যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা এবং কর্মের মাধ্যমে অর্জিত নয়। বরং সৃষ্টির প্রথমে এবং প্রকৃতির মূলে বিনা কর্ম ও সাধনায় অর্জিত এবং উহার সকল অস্তিত্ব আল্লাহ্র মনোনয়ন এবং তাঁহার অফুরন্ত অসীম ফযল ও অনুগ্রহের ফয়েয হইতে লাভ হইয়াছে।

تَبَارَكَ اللّٰهُ مَا وَحْى بِمُكْتَسَبٍ + وَلَا نَبِىٌّ عَلَى الْغَيْبِ بِمُتَّهِمٍ

'আল্লাহ্ তা'আলা মহামহিমান্বিত, কোন নবীর ওহী কর্ম দ্বারা অর্জিত নয় এবং না কোন নবী গায়েবী খবর বলার দরুন তাহাদের উপর মিথ্যার অপবাদ প্রদান করা হইয়াছে।'

এই কবিতায় ওহীর উদ্দেশ্য হইল নুবুওয়াত ও রিসালত। কেননা, এই নুবুওয়াত ওহী, ইলকা এবং হিকমত বা প্রজ্ঞা এবং সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ও প্রস্রাবণ নতুবা শুধুমাত্র ওহী অর্জনের বর্ণনার কোন আবশ্যকতা রাখে না।

কয়েকজন নবীর শৈশবকালের অবস্থা

কোন কোন নবী (আ) হইতে পবিত্র চরিত্র এবং নুবুওয়াত পদ মর্যাদার বিকাশ তাহাদের ছোট বয়স হইতেই হইয়াছে। যেমন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا অর্থাৎ আমি (আল্লাহ্) তাঁহাকে ছোট বয়সেই হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করিয়াছি। বর্ণিত আছে যে, তাহার বয়স মুবারক যখন দুই অথবা তিন বৎসর ছিল অন্যান্য শিশুরা তাঁহাকে বলিত যে, আপনি আমাদের সহিত খেলাধুলা করেন না কেন ? তিনি বলিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। এবং পবিত্র আয়াত مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ তা'আলার বাক্যকে সত্যায়িতকারী হিসেবে) ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যায়ন ঐ বয়সে করেন যখন তাঁহার বয়স মুবারক তিন বৎসর ছিল এবং সাক্ষ্য দেন যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কালেমা এবং রূহ। হযরত ঈসা (আ) দোলনা হইতে বলেন ঃ

اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا — আমি আল্লাহ্র বান্দা, আমাকে কিতাব দান করতঃ নবী বানাইয়াছেন। সুলায়মান (আ) ফাত্ওয়া দানকালে বাচ্চাদের মধ্যে শিশু বয়সের ছিলেন। তাবারী বর্ণনা করেন যে, তিনি সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স মাত্র ১২ বৎসর ছিল এবং পবিত্র আয়াত وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ 'নিঃসন্দেহে আমি ইবরাহীমকে প্রথম হইতেই পরিপক্ক আকল (বুদ্ধি) দান করিয়াছিলাম। ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে اَىْ هَدَيْنَاهُ الصَّغِيْر অর্থাৎ আমি তাহাকে শিশু অবস্থায়ই হিদায়াত দান করিয়াছিলাম। কথিত আছে যে, সৃষ্টির সূচনার পূর্বে জন্মগ্রহণের সময় এক ফেরেশতাকে তাহার নিকট প্রেরণ করা হয় যে, সে বলুক আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, অন্তর দ্বারা আমাকে জানিয়া রাখ এবং জিহ্বা দ্বারা আমার যিকির কর বা স্মরণ কর। তো তিনি

www.pathagar.com

বলেন, জীবন ও অন্তর দিয়া কবূল করিলাম। যখন নমরূদ তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে সেই সময় তাঁহার পবিত্র বয়স ষোল বৎসর ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর ফিরআওনের দাড়ি ধরাও একই ধরনের ব্যাপার ছিল। হযরত ইউসুফ (আ)-কে যখন তাহাদের ভাইয়েরা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করেন। আমাদের নবী করীম (সা)-এর পবিত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁহার উভয় হস্ত এবং তাঁহার মুবারক মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করার ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, বর্বর জাহিলিয়াত বা মূর্খতার যুগের কার্যকলাপের প্রতি দুইবার ব্যতীত আমি আর কখনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করি নাই, তবে সেই সময়ও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হিফাযত করিয়াছেন এবং অন্তরে সূচনালগ্ন হইতেই প্রতিমা এবং কবিতা আবৃত্তির বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের কর্মসমূহের উপর আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর একের পর এক রাব্বানী ইশারা আসিতে থাকে এমনকি সর্বোচ্চ মরতবার উচ্চ মকাম এবং কামালিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হন। ইহা সকলই বিনা কায় ও ক্লেশে এবং সাধনা ও মুজাহাদা ব্যতীত লাভ হয়।

ইরশাদ হইয়াছে وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا এবং যখন সে বিবেক-বুদ্ধির চরম পূর্ণতা লাভ করিয়া স্থিতি অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাঁহাকে আমি ইলম ও হিকমত দান করি। কোন কোন ওলীও নবীগণ হইতে কোন কোন গুণ লাভ হয়। কিন্তু সকল গুণের মধ্য হইতে হয় না। ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়া তো নবীগণের সহিতই খাস। (প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐ প্রথম কথার প্রমাণ যেখানে বলা হইয়াছিল যে, কোন ওলী নবীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরকতময় সত্তা মহিমান্বিত গুণরাজি, সকল বরকতের উৎস, স্বীয় তামাম আখলাক ও স্বভাব, জামালী ও জালালী সিফাতসমূহের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, পরিপূর্ণ ও পরিসমাপ্ত, অতি সুন্দর ও সুমহান এবং অতীব উজ্জ্বল ও শক্তিশালী যাহা গণনার সীমানা এবং সংরক্ষণ ও আয়ত্তের ক্ষমতা বহির্ভূত। কামালাত (পূর্ণতা)-এর মধ্যে যাহা কিছু খোদা তা'আলার কুদরতের ভাণ্ডারে এবং সম্ভাবনার পর্যায়ে ধারণায় আসিতে পারে উহা সকলই তাঁহার জন্য অর্জিত ছিল। তামাম নবী ও রাসূল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্ণতম সূর্যের চাঁদ এবং তাহার জামালের নূরের বিকাশ-স্থল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। ইমাম বুসায়রী (র) কত সুন্দরই না বলিয়াছেন ঃ

وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلَ الْكِرَامُ بِهَا + فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمْ

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا + يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ + غَرْفًا مِنَ الْيَمِّ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

অর্থাৎ সকল নবী ও রাসূল যে নিদর্শনই লইয়া তাশরীফ আনয়ন করিয়াছেন উহা সকল তাঁহারই জামালী ও জালালী নূরের প্রতিবিম্ব। নিঃসন্দেহে তিনিই হইলেন শ্রেষ্ঠত্বের সূর্য। আর নবী-রাসূলগণ তাঁহারই তারকারাজি। যাহার নূর (জ্যোতি) লোকদের জন্য অন্ধকারে নূরের আলোকবর্তিকা এবং তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ-অনুকরণকারী এবং তাঁহার

www.pathagar.com

ফযীলতের সমুদ্রের এক চুল্লি পানি এবং দরিয়ার এক বিন্দু মাত্র। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী কাদরা হুসনিহী ওয়া জামালিহী ও কামালিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তার মধ্যে মহোত্তম চরিত্র ও প্রশংসিত গুণাবলী এবং এই গুলির আধিক্য, শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব একত্রিত হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনে প্রশংসা ও গুণগান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ। – নিশ্চয় আপনি অতীব উচ্চ ও মহান চরিত্রের অধিকারী।

كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا – আপনার উপর আল্লাহ্‌র বিরাট বড় করুণা বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اُكْمِلُ مَحَاسِنَ الْاَفْعَالِ। অর্থাৎ সুন্দর কর্মসমূহের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে– بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য। ইহা হইতে জানা গেল যে, তাঁহার সম্মানিত যাত বা সত্তার মধ্যে যাবতীয় সৌন্দর্য ও উত্তম চরিত্র একত্রিত হইয়াছিল এবং কেন হইবে না যখন তাঁহার শিক্ষক হইলেন খোদ হক তা'আলা সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী যিনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চরিত্রের এক পশ্‌লা

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র আখলাক (চরিত্র) সম্পর্কে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা হলে তো তিনি বলেন, ঃ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ। — আল কুরআন ছিল তাঁহার চরিত্র। ইহার বাহ্যিক অর্থ হইল এই যে, কুরআনুল করীমে যাহা কিছু উত্তম চরিত্র ও প্রশংসিত গুণাবলী বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন। শিফা কিতাবে কাযী ইয়ায (র) অতিরিক্ত হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ يَرْضٰى بِرِضَاهُ وَيَسْخَطُ بِسَخَطِهٖ অর্থাৎ তাঁহার সন্তুষ্টি কুরআনের সন্তুষ্টির সহিত এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি কুরআনের অসন্তুষ্টির সহিত সম্পৃক্ত ছিল। ইহার মর্ম হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রেযামন্দি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ প্রতিপালনে এবং তাহার অসন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে এবং গোনাহর কাজে লিপ্ত থাকার মধ্যে ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্নদের নিকট ইহার অর্থ তাই যাহা উল্লেখ করা হইল। 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আইশা (রা)-এর كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ। এই উক্তি করার হইল যে কুরআনুল করীম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহোত্তম চরিত্র গঠনকারী ছিল। হযরত শায়খ ইহা বিশদ বিবরণের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যাহার সার সংক্ষেপ হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র ক্বালব হইতে শয়তানের অংশ বহিষ্কার করার পর এবং উহা ধৌত ও পবিত্র করিয়া তাঁহার পরিশুদ্ধ আত্মা (নাফস)-কে মানবীয় আত্মার সীমানা পর্যন্ত কায়েম রাখিয়া উহার মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও চরিত্রকে এমন সীমানা পর্যন্ত কায়েম রাখা হয় যে, উহার বিকাশ পবিত্র কুরআনে অবতারণের হেতু হয়। (এই জন্যে যে, তিনিই নবী হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন যাহার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী পূর্ণতার সহিত পরিপূর্ণ থাকে। এবং পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলী ধারণে যেগুলি বাঁধা থাকে ঐ গুলি বহিস্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ সকল গুণাবলী যাহা ভদ্রোচিত ও সুষমা মণ্ডিত, নবীর মর্যাদা ও শানের উপযুক্ত ঐগুলি বর্তমান রাখা হয়। যাহাতে সৃষ্টির প্রতি রহমত

www.pathagar.com

এবং উম্মতদিগের সুন্দর চরিত্র গঠনের হেতু হয়। উদ্দেশ্য হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে কোন কোন মানবীয় গুণাবলী এই কারণে অবশিষ্ট রাখা হইয়াছিল যাহাতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চেহারা-সূরতে ও গঠনে এবং স্বজাতি জানিয়া তাঁহার সহিত মিল ও মহব্বত রাখিতে পারে। আর যদি আসল ফেরেশতার গুণাবলীর অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে সকল মানুষ আতংকগ্রস্ত হইয়া মিল মহব্বত হইতে দূরে সরিয়া যাইত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মানবীয় গুণাবলী সৃষ্টজীবের জন্য রহমতের কারণ এবং উম্মতের চারিত্রিক সৌন্দর্যতা ও সংশোধনে হেতু বনিয়েছেন। ইহা এই কারণে হয় যে মানবাত্মার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর মূল অধিক জড়তা ও অন্ধকারের শিকড় আঁকড়াইয়া ধরার এবং স্থায়ী রূপ ধারণের কারণ হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ (যাহাতে তোমার দিল ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। (ক্বালবের স্থিরতা, ক্বালবের অস্থিরতার পর লাভ হয়। কেননা আত্মা বা নাফসের ক্রিয়া উহার সিফাতের বা গুণাবলীর বিকাশের সহিত সম্পৃক্ত। কেননা, ক্বালব (দিল) ও নাফস (আত্মা) এর মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক ও বন্ধন রহিয়াছে যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তা (যাত) ঐ সময় চকিত হইয়া উঠে, যখন তাঁহার মুবারক দাঁত শাহাদত বরণ করে এবং পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার নূরানী চেহারার উপর আসিয়া পড়ে। আর সেই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كَيْفَ يَصْلُحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُو اِلٰى رَبِّهِمْ ঐ সম্প্রদায় কোন্ উপায়ে সংশোধন লাভ করিবে যাহারা তাঁহার নবীর পবিত্র মুখমণ্ডলিকে রক্তাক্ত করিয়াছে। অথচ সেই নবী তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর প্রতি আহ্বান করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বালবের স্থিরতার জন্য এই আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ হে প্রিয় (নবী) কোন বিষয়েই আপনার উপর কোন যিম্মাদারী নাই। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর পবিত্র আত্মা ধৈর্যের পোশাক পরিধান করে এবং অস্থিরতার পর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেন। বস্তুতঃ এই সকল অজুহাত ও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হইতে থাকে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র ক্বালবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বানাইতে থাকে আর পবিত্র কুরআন তাঁহার আখ্‌লাক (চরিত্র) হইয়া যায়। হযরত আইশা (রা)-এর বক্তব্য كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ পবিত্র কুরআনই তাহার আখলাক (চরিত্র) ছিল উহার ইহাই অর্থ ও উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, কাহারও চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকৃত মকাম (স্তর) এবং তাঁহার অবস্থার বিরাট গূঢ়রহস্য পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম নহে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহই জানিতে সক্ষম নয়। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় যথোপযুক্ত রূপে আর কেহই জানিতে পারে না لَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ ইহার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ জানে না।

حبر خدا نشناخت کس قدر توزانکه + کس خدا را بمچون توشناخته؟

আল্লাহ্ ছাড়া আপনার সম্মান ও মরতবা কেহই জানিতে সক্ষম নয়। যেরূপ আপনার ন্যায় আল্লাহ্‌কে কেহ জানিতে সক্ষম নয়।

যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মকাম ও স্তর সবার উর্ধ্ব, তখন উহা জানাও মানুষের বিবেকের উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

ترا چنانکه توئی برنظرکجابیند + بقدر دانش خوء ہر کسے کند ادراك

'আপনাকে যেমনটি আপনি আছেন কোন চক্ষু উহা কোথায় দেখিতে পাইবে ? প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি মুতাবেক বুঝার চেষ্টা করিয়া থাকে।'

প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করিতে যাইয়া অনেক কিছু বলা হইয়াছে। সর্বোপরি কথা হইল এই যে, তিনি প্রকৃত পরিচয়ের সীমার উর্ধ্বে ছিলেন। যদি তিনি অনুভবীয় হন (محسوس) অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পবিত্র জেসেম বা শরীরের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে তিনি দৃষ্টিশক্তির ধারণ ক্ষমতার চাইতেও বিরাট ও উঁচু ছিলেন। যেমন বিশাল পাহাড়, দর্শনানুভূতি উহা পরিমাপ করিতে পারে না। আর যদি তিনি উকুল হন অর্থাৎ দর্শনীয় জাতীয় না হন এবং আসল বুদ্ধি ও বিবেক সম্পর্কিত হন। তাহা হইলে বিবেক-বুদ্ধিও তাঁহার প্রকৃত প্রকৃতিকে পরিমাপ করিতে অপারগ। যেমন হক তা'আলার যাত ও সিফাত অর্থাৎ হক তা'আলার সত্তা ও গুণরাজির অবস্থা। (কেননা, কোন বিবেকেই উহার প্রকৃত হাকীকতের দোর গোড়ায় পৌঁছার শক্তি রাখে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার উত্তম চরিত্রকে 'আযীম' মহান, বিরাট বলিয়াছেন, এবং যে ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে দান করিয়াছেন উহাকেও 'আযীম' বলিয়াছেন, অর্থাৎ বিরাট, মহান বলিয়াছেন। তাই উহার প্রকৃত গূঢ় রহস্যকে অনুধাবন করিতে আকল বা বিবেক অপরাগ। এই বর্ণনা পূর্বে চলিয়া গিয়াছে এবং ইহার উপর ঐকমত্য হইল যে, সকল নবী ও রাসূলগণের প্রশংসিত চরিত্র এবং সুন্দর গুণাবলী পূর্ব হইতে প্রাপ্ত (জিবিল্লী) জন্মগত ও প্রকৃতিগ এবং এই সকল মহোত্তম চরিত্র লাভের ক্ষেত্রে কর্ম ও সাধনার কোনই দখল নাই। এবং উহার প্রয়োজনও নাই। বিশেষত: সায়্যিদে আম্বিয়া (সালাওয়াতুল্লাহি তা'আলা ওয়া সালামুহু আলায়হি ওয়া আলায়হিম) যিনি সমস্ত মহোত্তম চরিত্র এবং প্রশংসিত গুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত অবস্থায় তাশরীফ আনয়ন করিয়াছেন।

بتعلیم وادب اورا چه حاجت + که او ازخودز اغاز آمدمودّب

'তাঁহার শিক্ষা ও শিষ্টাচারের কিসের প্রয়োজন, যখন তিনি স্বয়ং প্রথম হইতেই শিক্ষিত ভদ্র হইয়াই শুভাগমন করিয়াছেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপাদমস্তক ঘেরা ইয্যতের পার্শ্ববদল ও পরিবর্তনের কোন পথ নাই। কোন কোন আহকাম ও আছার মানবীয় স্বভাবকে প্রকাশ করে না কিন্তু ঐগুলিও সময় সময় কখন কখন বিশেষ স্থানসমূহে ছিল যেগুলির উপর কিয়াস বা ধারণা করাও সম্ভব হইত না। বরং প্রকৃত ঘটনা এই ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত জানিতেন যে, তিনি ঐ সকল স্থানসমূহেও কোন্ প্রত্যক্ষ দর্শন জগতে এবং কোন্ রাব্বানী তাজাল্লীয়াতের (প্রভুর নূর বিকিরনের) মধ্যে ছিলেন। اوبر ترازانست که آید نحیال অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা হইতে বহু উর্ধ্বে ছিলেন কেহ উহা ধারণায় আনিতে সক্ষম হইবে।

ইহারই ধারাবাহিকতায় উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তাঁহার মুবারক দাঁত শহীদ হয় এবং তাঁহার পবিত্র শির আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নূরানী চেহারা মুবারকের উপর রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা দারুণ কষ্টকর, মর্মন্তুদ ও অসহনীয় মনে হয়। তাহারা নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, হায় আফসোস! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি ইহাদের উপর বদ দু'আ করিতেন তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করিত। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে অভিশাপ ও বদ

www.pathagar.com

দু'আ করার জন্য প্রেরণ করা হয় নাই। বরং আল্লাহ্‌র বান্দাদের খোদার সহিত মিলিত করা এবং তাহাদের উপর দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং এই দু'আ করেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ। আয় আল্লাহ্! আমার কাওমকে হিদায়াত দান করুন, কেননা তাহারা কিছু জানে না।

এই স্থানে স্বয়ং পরিপূর্ণ ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই স্থানে হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও আতংক কোথায়! সুতরাং আওয়ারিফুল মাআরিফ প্রণেতা শায়খের এই কথা বলা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র স্বত্বা বিচলিত অস্থিরতা দেখা দেয় এবং অধৈর্যাবস্থা প্রকাশ পায়। অতঃপর আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়া ধৈর্য ও দৃঢ়তার পোশাক পরিধান করে।এবং (اضطراب) অস্থিরাবস্থার পর কথায় ও কর্মে শান্তি ও স্থায়িত্ব স্থাপিত হয়। এই মিসকীন (শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এই সকল শব্দ উল্লেখ করায় আতংক-গ্রস্ত। কেননা, ইহা আদবের খেলাপ। যদিও শিক্ষাগত প্রথা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তি মোতাবেক এই কথা সঠিক ও দুরুস্ত হইতে পারে। তবু আওয়ারিফুল মাআরিফ প্রণেতা (র)-এর বক্তব্য যে, দূরবর্তী নয় যে, উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর কথা ঃ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ। (আল কুরআন ছিল তাঁহার চরিত্র) ইহাতে আল্লাহ্‌র চরিত্রের দিকে এক গভীর ভেদ এবং সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি এই কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠতম আখলাক (চরিত্র) আল্লাহ্ তা'আলার আখলাকের (চরিত্রের) বিকাশস্থল ছিল। কিন্তু হযরত আইশা (রা) হক তা'আলার মহিমান্বিত নামের অতি উচ্চ শানের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন ঃ مُتَخَلِّقٌ بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আখলাকের উপর (চরিত্রের উপর) পয়দা করিয়াছেন। অতএব, তিনি এই অর্থকে এইভাবে আদায় করিয়াছেন যে, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ। " অর্থাৎ কুরআন তাঁহার চরিত্র ছিল। আল্লাহ্‌র নামের বড়ত্বের প্রতি লজ্জা এবং প্রকৃত অবস্থার সূক্ষ্ম ইশারা হইতে গোপন করিয়া এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়। ইহা তাঁহার পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণতম ভদ্রতার পরিচায়ক। এই অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহা অন্তহীন হওয়ার বর্ণনার মধ্যে অনেক অধিক দখল রাখে।

কোন কোন আলিমগণ বলেন, যেরূপ পবিত্র কুরআনের অর্থ সীমাহীন, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনওয়ার, ক্রিয়াকলাপ, প্রভাব, চরিত্র এবং সুন্দর গুণাবলীও সীমাহীন। তাঁহার উত্তম চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী প্রতি মুহূর্ত এবং সর্বাবস্থায় তরতাজা ও নিত্য নতুন। যাহা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিকতার আধিক্য দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহ জানিতে সক্ষম নয়। সুতরাং তাঁহার গুণাবলীর শাখা-প্রশাখাকে আয়ত্তে আনয়নের প্রতি সচেষ্ট হওয়া এইরূপ, যেরূপ এমন বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করা যাহা মানুষের অদৃষ্টে নাই এবং না উহা স্বাভাবিক সম্ভাবনার মধ্য হইতে থাকা সম্ভব তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)

কোন কোন আরিফের নিকট পবিত্র হাদীস اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ। "নিশ্চয় কোন কোন সময় আমার অন্তরে গায়েনী পর্দা আসিয়া যায়" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই গায়েনী পর্দা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই অবস্থা সম্পর্কিত আসল তত্ত্ব কী ? তখন ঐ আরিফা বলেন যে, হে প্রশ্নকারী! তুমি যদি রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র ক্বালব এবং উহার

www.pathagar.com

গায়েনী পর্দা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে তবে আমি যাহা কিছু অবগত আছি উহা বর্ণনা করিতাম। কিন্তু এই স্থানে গায়েন এমন গায়েন অর্থাৎ এই পর্দা এমন এক পর্দা যাহা আয়েনের অর্থাৎ যাতের সত্তার সঙ্গে আছে। যেখানে গায়েন নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। এই হাদীসের ব্যাখ্যা মারাজাল বাহরায়ন পুস্তিকায় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। হ্যাঁ, নবী করীম (সা)-এর উপর কুদরাতের মহাসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-এর তরঙ্গ রাজি হইতে বহু পরিবর্তন এবং (জ্যোতি অবতীর্ণ হইত। যাহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার দিকে লইয়া যাইত। উপরন্তু আহকাম বা আদেশসমূহের মধ্যে নাসিখ রহিতকারীও মানসুখ রহিত হওয়া ও ইহারই এক শাখা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল অবস্থায় সর্বদা উন্নতি ও পূর্ণতার মধ্যে থাকিতেন। তাঁহার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ অবস্থা হইতে হ্রাস ও পতনোম্মুখ হওয়ার কোন পথ ছিল না। তবে কোন কোন অবস্থা উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর হইত। উদাহরণতঃ যেমন সকল আম্বিয়া কামিল ও মা'সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে যে, فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল কর্ম, বন্দেগী ও আরাধনা শুধু মাত্র শিক্ষা দান ও শরীআতের বিধান জারীর নিমিত্ত ছিল না। এতদ্ব্যতীত যে, তাহার পবিত্র সত্তার মধ্যেও এইগুলির প্রভাব ও নূর জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। ইহার কোন সূরত হইত না। অবশ্য নুবুওয়াত এবং উদার মাকামাত (স্তরসমূহ) আল্লাহ্ প্রদত্ত ছিল এবং তিনি মনোনীত ও বাছাইকৃত ছিলেন। ইহাতে কর্ম ও সাধনার কোনই দখল ছিল না। দিবা-নিশি আসরার (ভেদ সমূহ) এবং আনওয়ার-এর বিকাশ লাভ এবং একের পর এক ধারাবাহিকভাবে আওরাদ ও আযকার (দু'আ ও যিকর) এর উপর সুবিন্যস্ত ছিল এবং সমস্ত কামালতে পূর্ণতা অর্জনের যিম্মাদার এবং সমস্ত প্রকার নূরের বিকাশের যিম্মাদার কুরআন অবতারণের রব্বানী শিক্ষা রহমানী শিষ্টাচার, এবং আল্লাহ্র সকল আদেশ ও নিষেধের জিযাদার ছিলেন। যাতের (সত্তার) স্বভাব খাসিয়ত এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিকে প্রমাণ করা যাহা দর্শনানুভূতির সহিত সম্পৃক্ত, ইহা অবশ্যই পতন ও এটিকে প্রমাণ করে, যাহা উত্তম নয়। উহার উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু মানবীয় পোশাকে আল্লাহ্র সুকৌশলগত উপায়ে তাশরীফ আনয়ন করিয়াছেন যেমন পূর্বেও বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন এই মানবীয় পোশাক বা সূরতের প্রেক্ষাপটে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি, কার্যকলাপ প্রমাণের প্রতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মানবীয় ক্রিয়াকলাপকে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে তাঁহার উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার ও শানের মধ্যে হ্রাসকরণ এবং উহা অবমূল্যায়ণ অবমূল্যায়নের প্রতি মনযোগী হওয়া যাহা একজন মু'মিন মুসলমানের পক্ষেও আদৌ উচিত নয়।

যদি 'তাহযীব'-এর এক প্রকার খবরদারী ও জ্ঞাত করা অর্থ হয় যাহা কোন আলস্য বা আবিলতা উৎপত্তির কারণে যেমন উচ্চস্তরের কাহারও ইস্তিগ্রাকী অবস্থা হয় যাহাকে এক প্রকার বেহুশী অবস্থা বলা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্তিগ্ফার করা (গোনাহ মার্জনার জন্য) ভুলের অবস্থার উদ্রেক হওয়া ইত্যাদি। আলিমগণ বলেন, যদি তাহাদের বলার এই উদ্দেশ্য থাকে, তবে বৈধতার কোন পথ হইতে পারে। নতুবা এই ধরনের ইস্তিগ্রাকী বা বেহুশী অবস্থার বর্ণনা করা এবং চরিত্রের সৌন্দর্য ও সংশোধন সম্পর্কে যাহা পূর্ববর্তী কর্মের উপর যাহার ভিত্তি উহা বর্ণনা করা নিঃসন্দেহে উহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুউচ্চ মরতবা হ্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হইবে। যাহা আদৌ সমীচীন নহে।

www.pathagar.com

কামূসে আছে যে تـهذيـب (তাহযীব) هَذَّبَهٗ (হায্যাবাহু) হইতে উদগত, যাহার অর্থ সূক্ষ্মতা, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা ও সংশোধন করা এবং সুরাহ্-এর অর্থ মানুষকে পাক-পবিত্র করা আসিয়াছে। যেমন বলা হইয়া থাকে "رَجُلٌ مُهَذَّبٌ" (রাজুলুন মুহায্যাবুন) অর্থাৎ সুন্দর চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ। সারসংক্ষেপ হইল এই যে, পূর্ণতম স্তরের অতি উচ্চতাও অতিপূর্ণতার উপর অধিষ্ঠিত করা এবং প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতা স্বীকার করা তাঁহার সুমহান মরতবা ও শানের অধিক নিকটবর্তী।

রিসালতের ব্যাপকতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র আখলাক (চরিত্র) যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র ছিল। ইহারই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমস্ত মানব জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার রিসালাতকে শুধু মানুষের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বরং সমস্ত জগতের জিন্ন, ইন্সান এবং সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁহার রেসালত ব্যাপক করিয়াছেন। যেরূপ আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবিয়াত (প্রতিপালকত্ব) সমস্ত জগতবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, তদ্রূপ "خلق محمدى" মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্রও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতও তদ্রূপ ব্যাপক। সকল জগতবাসীকে শামিল করিয়া লইয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ্ প্রণেতা কোন কোন সম্মানিত আলিমগণের নিকট হইতে এই সকল বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই নুবুওয়াত এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ফেরেশতাদের প্রতিও। যেমন একদল এই দিকে গিয়াছেন। তাহারা প্রমাণ হিসাবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন ঃ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا যাহাতে তিনি (সা) সমগ্র দুনিয়ার জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন। আলামীন শব্দে সমস্ত জ্ঞানবান শামিল বা অন্তর্ভুক্ত আছে। আর হাদীসের সুন্নাত হইতে প্রমাণিত ও স্থিরীকৃত, যাহা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً "আমাকে সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রতি রাসূল করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার রিসালত কোন কোন ফেরেশতাদের উপরও ছিল। কোন কোন ফেরেশতা বলা দ্বারা যেন তাহারা পৃথিবীর ফেরেশতাকে বুঝাইয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের কোন কারণ প্রকাশ নাই। কেননা, দলীল আম বা ব্যাপক এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ ঃ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ 'আপনাকে প্রেরণ করি নাই কিন্তু সকল লোকদের প্রতি।' ইহাও বিশেষ ক্ষেত্রের উপর প্রমাণ করে না। যেহেতু গৃহীত মাযহাব অনুযায়ী এই আয়াতের মর্ম হইল আম (ব্যাপক) নতুবা জিন্নদের প্রতিও রাসূল হিসাবে প্রেরিত না হওয়া অবধারিত হইয়া পড়িবে। এই কথা সর্বসম্মত মতেরও বিরুদ্ধে যায়। বরং পবিত্র আয়াতে "اَلنَّاس" (সকল মানুষ)-এর উল্লেখ এই কারণে করা হইয়াছে যে, কোন কোন মানুষের প্রতি রিসালতকে বিশেষায়িত করার কথাকে প্রত্যাখ্যান করা ও নিষেধ করা উদ্দেশ্য। যেমন ইহুদীরা ধারণা পোষণ করিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত শুধু আরববাসীদের জন্য খাস ছিল। অনুরূপ পবিত্র এই আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে— يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে প্রেরিত।'

www.pathagar.com

হযরত শায়খ মুহাক্কিক শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন যে, কোন কোন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নুবুওয়াত দুনিয়ার সকল অংশের জন্য। যাহার মধ্যে প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত এবং জড়জগতও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিবেক বুদ্ধিসম্পন্নদের প্রতি প্রেরণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দান এবং আল্লাহ্র গযব হইতে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য। আর বিবেক বুদ্ধিহীনদের প্রতি প্রেরণা অনুগ্রহ দান বৃদ্ধি ও পূর্ণতা দান, যাহা তাহাদের অবস্থার জন্য উপযোগী। এবং সমস্ত জ্ঞানবানদের প্রতি রিসালাতের ব্যাপকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদে আছে ঃ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আপনাকে আমি প্রেরণ করি নাই কিন্তু (প্রেরণ করিয়াছি) সমগ্র দুনিয়ার প্রতি রহমত স্বরূপ। ইহা প্রাধান্যতার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করা এবং তাহাদের এই কথা বলা "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতি দান ছিল।

شکر فیض توچمن کند اے ابربہار + کہ اگرخار وگل مہہ پرورده تست

اے غنجئے عروس باغدر پرده تست + آخراے باد صبا این مہہ آورده نست

হে বসন্তের বারিবর্ষণ বাগিচা তোমার করুণার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে কাঁটা ও ফুল সকলই তোমারই দ্বারা প্রতিপালিত।

হে বাগিচার ফুল-কলি-বধূ তোমারই পর্দার অন্তরালে সর্বশেষে হে প্রত্যুষ সমীরণ ইহা সকলই তোমারই উদগত।

যদি কেহ বলে যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হইল আদেশ ও নিষেধের দাওয়াত দেওয়া এবং সুসংবাদ দান ও ভয় প্রদর্শন করা, তবে ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা কোথায় মাওয়াহিবে লাদুনিয়াতে ইহার উত্তর এই দেওয়া হইয়াছে যে সম্ভবত: এই দাওয়াত মি'রাজের রাত্রে দেওয়া হইয়াছে। এই কথা গোপন না থাকা উচিত যে, মি'রাজের রাত্রের সহিত স্বাতন্ত্র্যের কোন কারণ নাই, বরং সকল সময় ইহা সম্ভবপর। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাক খেদমতে অধিকাংশ সময় ফেরেশতাদের অবতারণ হইতে থাকিত। উপরন্তু যেভাবে জিন্নদিগকে দাওয়াত দেন এবং কুরআনুল করীমে জিন্নদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উহা তাহাদের ধৃষ্টতা-বক্রতা প্রদর্শনের কারণে ছিল। (আল্লাহ্ ভাল জানেন) এবং ফেরেশতাদের মধ্যে নিষেধ ও ভীতি প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কেননা, তাহাদের দ্বারা গুনাহ্, কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ করা হইয়াছে যে, لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْلَمُوْنَ তাহারা কোন কিছু প্রথমেই করিত না তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও আদেশকেই কেবল জানিত।

এই কারণে আলমে মালাকুত (ফেরেশতাজগত)-কে আলমে আমর বা আদেশের জগতও বলা হয়। কেননা, সেইখানে নিষেধ বা নিষিদ্ধকরণের কোন অবকাশই নাই। হযরত জিবরাঈল (আ) ব্যতীত অপরাপর ফেরেশতাগণের উপস্থিত হওয়া হাদীসের কিতাবসমূহে আওকাতুন্নবী (সা)-এর অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যেমন বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আ) আগমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত ইসমাঈল নামক ফেরেশতা ছিলেন। যিনি এক লক্ষ এমন ফেরেশতার সর্দার ছিলেন যাহাদের মধ্যকার প্রতিটি ফেরেশতা এক লক্ষ ফেরেশতার নেতা ছিল। আর

www.pathagar.com

ফাযায়েলে কুরআনের অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ফেরেশতা উপস্থিত হইল, যাহার সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ) বলেন যে, সে ঐ ফেরেশতা যে পৃথিবীতে অদ্যকার দিন ব্যতীত আর কখনও আগমন করে নাই (সুবহানাল্লাহ্)। অপর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাওযায়ে আনওয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিমিত্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হন। সুতরাং জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কেন আসিয়া থাকিবেন না।

ইল্‌ম এবং আক্‌ল (বুদ্ধি) মুবারক

বর্ণিত দলীল-প্রমাণ হইতে প্রকৃত তথ্যসহ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন যে, নবী করীম (সা)-এর প্রশংসিত আখলাক (চরিত্র) শ্রেষ্ঠতর পূর্ণতর ও উচ্চতর চরিত্র ছিল। আর এই চরিত্রের বা আখলাকের আসল ও উৎপত্তিস্থল এবং বৃদ্ধির স্থান হইল আকল বা বুদ্ধি। কেননা, আকল বা বুদ্ধি হইতেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মা'রিফাতের সূতা বুনন হয়। আর উহার ফলে সিদ্ধান্ত শক্তি ব্যবস্থাপনায় নিপুণতা, চিন্তা ও গবেষণায় শুদ্ধতা, কর্ম আঞ্জামের পর সঠিক ফলাফল প্রাপ্ত হওয়া, নাফস বা আত্মা সংশোধন, কাম রিপুর বিরুদ্ধে সাধনা, সুন্দর শাসন ও ব্যবস্থাপনা, সুন্দরের প্রচার প্রসার এবং অপকর্ম হইতে বিরত থাকা ইত্যাদি গুণসমূহ বাহির হইয়া আসে।

আকল-এর মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যায় লোকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অভিধান কামূসে বলা হইয়াছে যে, বস্তুর ভাল, মন্দ, সুন্দর, অসুন্দর এবং ইহার পূর্ণত্ব ও নিকৃষ্টের গুণসমূহের ইল্‌ম বা জানার নাম হইল আকল বা বুদ্ধি এবং এই ইলম (বা জ্ঞান), আকল বা বুদ্ধির পরিণতি ও ফলাফল হইতে অর্জিত হইয়া থাকে। আর আকল (বুদ্ধি) এমন এক শক্তি, যা এই ইলমের উৎপত্তিস্থল এবং উৎস এবং বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বলা হইয়া থাকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, নীরবতাসমূহের প্রশংসিত ধরন বা অবস্থার নাম হইল আকল। অথচ ইহাও আকল-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বা প্রভাব প্রক্রিয়া জাতীয়ের মধ্য হইতেই।

আলিমগণের ভাষ্যে সত্য কথা হইল এই যে, আকল এক রূহানী নূর, যদ্দ্বারা জরুরী বিষয়াদির জ্ঞান এবং দর্শনীয় জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর আকল (বুদ্ধি)-এর অস্তিত্বের সূচনা শিশুর জন্মের সহিত সম্পৃক্ত। অতঃপর উহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও দর্শনীয় হইতে থাকে। এমনকি বালেগ হওয়ার সময় পূর্ণতা লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিপূর্ণ বিবেক ও ইলম বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এত উচু স্তরের ছিলেন যে, কোন মানুষ তিনি ব্যতীত ঐ স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু তাঁহাকে দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কতিপয় বিষয়ের উপর অনেকেরই বিবেক ও চিন্তা শক্তি হয়রান ও পেরেশান। এবং যাহারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা ও কায়ফিয়াত এবং তাহার প্রশংসিত গুণাবলী এবং সুন্দর কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিবে এবং তাঁহার বিজ্ঞোচিত মর্ম বহুল বাক্যাবলী, সুন্দর অবয়ব (শামায়েল) দুর্লভ ও সূক্ষ্ম স্বভাবসমূহ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপক, শরীআতের বিধানাবলীর প্রকাশ করা ও বর্ণনা দান সুউচ্চ ভদ্রতার বিশদ বর্ণনা, সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি উৎসাহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রাব্বানী সহীফাসমূহের উপর তাঁহার জ্ঞান, অতীত উম্মতদিগের ঐতিহাসিক অবস্থাসমূহ অতীত দিনের ইতিহাস, কাহিনী এবং তাহাদের সময়কার ঘটনা ও অবস্থাসমূহের বর্ণনা, আরবের অধিবাসী যাহারা হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ছিল। তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতি মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞতা, কালিমাচ্ছন্নতার

www.pathagar.com

কারণে ঘৃণিত এবং বহুদূরে অবস্থানকারী ছিল, ইহাদের ইসলাহ, সংশোধন, তাহাদের যুলুম, অন্যায় আচরণ ও বিভিন্ন প্রকার দুঃখ ও কষ্টের উপর তাঁহার ধৈর্য ধারণ ও কষ্টের পর তাহার ধৈর্য ও বরদাশত করা অতঃপর তাহাদিগকে, ইলম, আমলে উত্তম চরিত্র গঠনে ও কর্মে অতীব প্রান্ত সীমানা পর্যন্ত পৌঁছানো। তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যসমূহ দ্বারা সৌভাগ্যবান করা। অতঃপর কিভাবে এই সকল সৌভাগ্যসমূহকে নিজ আত্মার উপর তাহাদের গ্রহণ করা এবং নিজ বাড়ী-ঘর দোস্ত আহবাব প্রিয়জনকে ত্যাগ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া, এই সকল ব্যাপার যদি কেহ প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে সে জানিতে পারিবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিপূর্ণ আকল এবং তাহার জ্ঞান কত উঁচু মরতবার ও উচ্চ স্তরের ছিল।

نكار من كه بمكتب نرفت وخط بنوسث + بغمره مسئله اموز صد مدرس شد

আমার দৃষ্টি যা পাঠশালায়ই যায় নাই অথচ সে পত্র লিখে।
কিন্তু অবস্থা এই বিষয়ের গভীরতা পর্যন্ত শিখিয়াছে এবং শত শিক্ষক হইয়া গিয়াছে।

যাহারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অবস্থার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিবে, দেখিতে পাইবে যে, বিশ্ব প্রতিপালক তাঁহাকে কি পরিমাণ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর উহার কি পরিমাণ বর্ষণ করিয়াছে! এবং وَمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের উলুম ও আসরার (জ্ঞানসমূহ ও ভেদসমূহ) প্রত্যক্ষভাবে কি প্রকারে লাভ হইয়াছে। তাহা হইল সে নিঃসন্দেহে নির্দ্বিধায় চিন্তা ও ধারনা ব্যতীতই নবুওয়াতের ইলম সম্পর্কে অবগত হইতে পারিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় ও গুণ বর্ণনায় এবং অফুরন্ত ইলম সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا অর্থাৎ আপনি যা কিছু জ্ঞাত ছিলেন না উহা সকলই আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার করুণা কেবল আপনার উপর অতি শ্রেষ্ঠ।

হযরত ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ তাবিঈ যিনি হাদীসের সনদের জ্ঞানে অতি বিশুদ্ধ, সত্য-নিষ্ঠ আল্লামা, বহু গ্রন্থ এবং হাদীস প্রণেতা ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের লিখিত একাত্তরটি কিতাব অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি ঐ সকল কিতাবে পাইয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টির শুরু হইতে দুনিয়া সৃষ্টি সমাপ্ত করা পর্যন্ত সমস্ত লোককে যে পরিমাণ আকল দান করিয়াছেন, তাহাদের সকলের আকলসমূহ নবী করীম (সা)-এর মুবারক আকলের পার্শ্বদেশের মধ্যে আছে উহা দুনিয়াব্যাপী বালুময় এলাকার (মরুভূমির) তুলনায় এক কণার ন্যায়। তাঁহার অভিমত ইহাদের সকলের চাইতে উত্তমতর ও শ্রেষ্ঠতর। ইহা আবূ নুআয়ম হুলিয়া বর্ণনায় এবং ইবনে আসাকির স্বীয় ইতিহাসের কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আওয়ারিফুল মাআরিফ কিতাবে কতিপয় আলিম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি আকলের শত অংশ হয় তন্মধ্য হইতে নিরানব্বই অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে আছে এবং বাকী এক ভাগ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। বান্দা মিসকীন অর্থাৎ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (র) বলেন যে, যদি তারা বলিতেন যে, আকলের সহস্র অংশ এবং তন্মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বই অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে আছে এবং এক হিস্সা সমস্ত লোকের মধ্যে আছে তবে ইহারও অবকাশ আছে। কেননা, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সীমাহীন পূর্ণত্ব প্রমাণিত আছে তাই তাহার সম্পর্কে যাহা কিছু বলা যাইবে যর্থাথ হইবে।

www.pathagar.com

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ وَاِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অধিক কল্যাণ দান করিয়াছি এবং আপনার সম্পর্কে মন্দ বাদকারীরাই অপমানিত ও অসম্মানিত।'

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা

ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার গুণসমূহের মধ্যে গণ্য। ইহা নুবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীসমূহের মধ্যকার গুণাবলী। এই সকল গুণের শক্তি ব্যতীত নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হইত না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا "নিশ্চয়ই আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছি, কিন্তু তাহাদিহগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। (সূরা আনআম ঃ ৩৪) আল্লাহ্ আরও ইরশাদ করেন ঃ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ তো আপনিও اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ। 'রাসূলদের মধ্যকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করুন' (সূরা আহকাফ ঃ ৩৫)। আল্লাহ্ আরও ইরশাদ করেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ অর্থাৎ আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং উপেক্ষা করুন। (সূরা মায়িদা ঃ ১৩)

ধৈর্যের উত্তম গুণ হইল সমস্ত ইবাদত ও বন্দেগীর প্রকাশস্থল এবং যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস। কারণ, প্রত্যেক নেক কাজে উহার বিপরীত ও উল্টার উপর যতক্ষণ ধৈর্য ধারণ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা অস্তিত্ব লাভ করে না। এই কারণে সবর (ধৈর্য)-কে পূর্ণ ঈমান বলা হইয়াছে। এবং যেস্থানে সবরকে অর্ধেক ঈমান বলা হইয়াছে সেখানে সবর-এর দ্বারা গুনাহর কর্মসমূহ ত্যাগ করা এবং উহা হইতে বিরত থাকা উদ্দেশ্য হইবে। কেননা, ঈমানের তাকীদের প্রেক্ষিতে ঈমানের অর্ধেকাংশ হইল যাবতীয় গুনাহ্ হইতে বিরত থাকা এবং দ্বিতীয় অর্ধাংশ হইল সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী আদায় করা। আর এইখানে 'সবর'-এর উদ্দেশ্য হইল মানুষের কষ্ট দেওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করা এবং তাহাদের অন্যায় আচরণ ও অনিষ্টকে সহ্য করা। আর সায়্যিদুল আম্বিয়া রাসূলে আকরাম (সা)-এর বালা ও কষ্টের উপর সবর ও ধৈর্য ধারণ করা সকল নবীর চাইতে অধিক বেশী এবং বহু কঠোর ছিল। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ مَا اُوْذِىَ نَبِىٌّ مِثْلَ مَا اُوْذِيْتُ "কোন নবীকে এতটুকু কষ্ট দেওয়া হয় নাই যতটুকু আমাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে।"

ইহা এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের ইসলাম গ্রহণের জন্য সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। এই জন্য তাহার কষ্ট প্রদান উহাদের কুফরীর চাইতে অধিকতর ছিল।

বর্ণিত আছে যে, যখন ক্ষমা করা, উত্তম কর্মের আদেশ এবং মূর্খদিগকে মার্জনা করা সম্পর্কিত আয়াতে পাক নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-এর নিকট উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন। জিবরাঈল (আ) বলেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার ব্যাখ্যা জ্ঞাত না হইতে পারিব, বলিতে পারিব না। সুতরাং জিবরাঈল (আ) গমন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যে আপনার নিকট হইতে দূরে থাকিবে, আপনি তাহার নিকটবর্তী হইবেন।

www.pathagar.com

আর যে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে তাহাকে দান করিবেন। আর যে আপনার উপর যুলুম ও অত্যাচার করিবে, তাহাকে মার্জনা করিয়া দিবেন।

পবিত্র হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও নিজস্ব কার্যকলাপে এবং অর্থ ও সম্পদের ক্ষেত্রে কাহারও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি হইতে, যে আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাহার বদলা লইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বাধিক কঠোর ধৈর্য উহুদ যুদ্ধের সময় ছিল। কাফিররা তাঁহার সহিত যুদ্ধে ও সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতীব কষ্ট ও দুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি না শুধু ধৈর্য ও মার্জনা করাকে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। বরং তাহাদের প্রতি ভালবাসা ও করুণা করার মাধ্যমে এহেন বর্বরতা, অজ্ঞতা ও অত্যাচারের মধ্যেও তাহাদিগকে অপারগ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন এবং বলেন اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ আয় আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে সোজা সঠিক পথ প্রদর্শন কর। কেননা, তাহারা অজ্ঞ, কিছু জানে না। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ আয় আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। সাহাবায়ে কিরামের নিকট যখন খুব কষ্টকর মনে হইল, তখন তাহারা বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ্‌র রাসূল! আফসোস! আপনি তাহাদের প্রতি যদি বদ দু'আ করিতেন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যে, আমি অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হই নাই। বরং সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং সমগ্র জাহানের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

ফাইদা ঃ আশ্চর্য এই যে, কেহ যদি এই কথা বলে যে, নবী করীম (সা)-এর নাফসে এই স্থানে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং অধৈর্যের বিকাশ ঘটে এবং বলিতে থাকেন "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ" ঐ কাওম কিভাবে কল্যাণ লাভ করিবে যাহারা নিজদের নবীকে রক্তাক্ত করে (শেষ হাদীস পর্যন্ত)। ইহার পর আয়াতে কারীমা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ (আপনার কোন বিষয়ের যিম্মাদারী নাই) নাযিল হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইরশাদ كَيْفَ يُفْلِحُ (কি করিয়া তাহারা কল্যাণ লাভ করিবে) এবং আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ (আপনার উপর কোন বিষয়ের যিম্মাদারী নাই) এতদুভয়ের মধ্যে এমন কিছু নাই যা ধৈর্য, সহনশীলতার খেলাপ এবং উহার বিরুদ্ধে যায়। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার মধ্যে তাহাদের আচরণের প্রতি তাজ্জব বা আশ্চর্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা দান করা হইয়াছে। ইহা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ধৈর্য ও মার্জনা দ্বারা কাজ করিয়াছেন। কিন্তু কাফিররা যখন আহযাবের যুদ্ধের দিন নামায পড়া হইতে বিরত রাখেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, مَلأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কাফিরদের গৃহ ও কবরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবের ঐ গোত্র ও কবিলাসমূহের উপর বদদু'আ করেন যাহা দুর্বল ও সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদিগকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিত। মুত্তাফাকুন আলায়হি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ আপনার উপর কোন বিষয়েরই যিম্মাদারী নাই। এই ঘটনার সময় নাযিল করেন। তদ্রূপ ঐ কাফিরদের প্রতি বদ দু'আ করেন যাহারা কুররা অর্থাৎ কারীগণকে শহীদ করে। কুফফারদের উপর এই সকল বদ

www.pathagar.com

দু'আ দীনে ইসলামের হক (অধিকার) এবং মুসলমানদের অধিকারসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণে ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুম পালনার্থে ছিল। ইরশাদ করেন ঃ

يَآيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

'হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাহাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করুন' (সূরা তাওবা ঃ ৭৩)।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সকল বদবখত দলের উপর বদ দু'আ করেন যাহারা নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক পৃষ্ঠদেশের উপর উটের ভুঁড়ি রাখিয়া দিয়াছিল।

ইয়াহূদী আলিমদিগের মধ্য হইতে ইব্‌ন সা'না নামক এক ব্যক্তি ছিল। তাহার নিকট হইতে রিওয়ায়াত করা হয় যে, সে বলিয়াছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্য বর্ণিত নুবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের মধ্য হইতে এমন কোন বস্তু বাকী ছিল না যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী জ্যোতির্ময় চেহারা যখন আমি দর্শন করিয়াছি তখন না দেখিয়াছি। কিন্তু দুইটি বিষয় আমি পরীক্ষা করিতে পারি নাই। এক এই যে, তাওরাতে লেখা ছিল তাহার সহনশীলতা অজ্ঞতাকে বর্ধিত করিবে না এবং অতিশয় অজ্ঞতা তাহার দানশীলতাকেই বর্ধিত করিবে। বস্তুত আমি তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার প্রদর্শন করি এমন কি বৈষয়িক কায়কারবারে উলটাপালটা ব্যবহার করি। এইভাবে আমি তাঁহার জ্ঞান, সহনশীলতা সম্পর্কে অবগত হই। যেমন একবারের ঘটনা হইল যে, আমি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁহার নিকট হইতে খেজুর ক্রয় করি এবং উহার মূল্য, মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাঁহাকে দিয়া দেই। অতঃপর আমি নির্ধারিত সময়ের দুই/তিন দিন পূর্বে আসি এবং তাঁহার গলা ও চাঁদর ধরিয়া ক্রোধ ও রাগতঃ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং আমি বলি "হে মুহাম্মদ (সা)! আমার প্রাপ্য কেন আদায় কর না। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশ প্রাপ্য পরিশোধ করার ব্যাপার বিলম্বে কর ও টালবাহানা কর।" ইহার পর হযরত উমর (রা) বলিতে লাগিলেন যে, ও আল্লাহ্র দুশমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এই ধরনের কথা বলিস। তোর বদতমিযীর যে সমস্ত কথা আমি শুনিয়াছি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্যতার ভয় না থাকিত তো আমি স্বীয় তরবারি দ্বারা তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-এর প্রতি শান্ত ও সুস্থিরের সহিত দৃষ্টিপাত করেন এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন যে, "হে উমর (রা)! আমি এবং এই ব্যক্তি তোমার মুখ হইতে এই ধরনের কথার বিপরীত কথা শোনার প্রত্যাশী ছিলাম। উদ্দেশ্য হইল যে, আমাকে তুমি উত্তমরূপে উক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের কথা বলিতে এবং ঐ ব্যক্তিকে উত্তমরূপে তাকীদ দেওয়ার শিক্ষা দিতে। এখন হে উমর! যাও উহার হক আদায় কর এবং যাহা কিছু তুমি তাহাকে ডর দেখাইয়াছ এবং ধমকাইয়াছ উহার বদলায় তাহাকে বিশ সা খেজুর অতিরিক্ত দিয়া দাও" বস্তুতঃ হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ মুতাবিক কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর সেই ইয়াহূদী বলে যে, হে উমর (রা) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী চেহারার মধ্যে নুবুওয়াতের সমস্ত আলামতই চিনিতাম কিন্তু এই দুই স্বভাবকে জানিতাম না যাহা আমি এখন পরীক্ষা করিলাম। এখন তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি "আশ্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। (অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য

www.pathagar.com

দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলে খোদা (সা) এক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক মজলিস হইতে উঠেন এবং আমরাও উঠিয়া দাঁড়াই তো দেখি কি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্নিকট এক আরব বেদুঈন আসিয়াছে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গর্দান মুবারক হইতে চাদরকে এমন জোড়ে টান দিয়াছে যে, চাদর শক্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক গর্দান ছিলিয়া গিয়াছে। তাহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত আরব বেদুঈনের দিকে চক্ষু উঠাইয়া দেখেন। তখন সে বলে যে, "আমার কাছে যে এই দুই উট আছে উহাদের উপর মাল উঠাইয়া দাও। কেননা, আমার সন্তান-সন্ততি আছে এবং যদি তুমি এই মাল না উঠাইয়া দাও, তবে তুমি না তোমার নিজের মাল বহন করিবে, আর না তোমার বাপের মাল বহন করিব। এই কথার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি কখনও ঐ সময় পর্যন্ত বোঝা উঠাইয়া দিব না যতক্ষণ না তুমি আমাকে এই চাদরের পাকড়াও হইতে ছাড়িয়া দিবে। বেদুঈন বলিল যে, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনও চাদরকে ঢিলা করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার দুই উটই মাল বুঝাই না করিয়া দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া বলেন যে, ইহার এক উটের উপর খেজুর এবং দ্বিতীয় উটের উপর যবের বোঝা উঠাইয়া দাও"। হাদীসটি আবূ দাঊদ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা) হইতে এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যাইতেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক গলায় নাজরানের শক্ত ডোরাওয়ালা চাদর ছিল। এক আরব বেদুঈন নিকটে আসিয়া চাদর ধরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে টান দিল এবং চাদরকে শক্ত করিয়া পেঁচাইতে লাগিল। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গলা মুবারকের দিকে চাহিয়া দেখি যে, শক্ত পাড় বা ডোরাদার চাদরের প্যাঁচে তাহার গর্দান মুবারক ছিলিয়া গিয়াছে। ইহার পর ঐ বেদুঈন বলিতে লাগিল, "হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলার ঐ মাল হইতে যাহা তোমার নিকট আছে আমাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ লোকটির প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং মুচকি হাসিলেন এবং আমাকে উহা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য ও সহনশীলতার এই বর্ণনা যে কিভাবে তিনি নিজ জান ও মালের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করিতেন এবং অন্যায় ও অত্যাচার ক্ষমা করিয়া দিতেন এই সকল ব্যবহারে পিছনে মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই লোকসকল ইসলাম গ্রহণ করে। এবং রাসূল (সা)-এর প্রশংসিত গুণাবলীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সা) নিজে না শক্ত কথা বলিতেন আর না কাহারও শক্ত কথার প্রতিশোধ নিতেন, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করিয়া দিতেন। অপর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি না গালি-গালাজ করিতেন, না অশ্লীল কথা এবং অভিশাপকারী ছিলেন। অশ্লীলতার মধ্যে কথা, কর্ম এবং স্বভাব সকলই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহার ব্যবহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কথাবার্তায় হইয়া থাকে। আর এই গুণ বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা ان فاحش هو تا نه متفحش না অশ্লীল হইত না বানোয়াট বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল যে, না তাহার স্বভাব এইরূপ ছিল আর না তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে শক্ত কথা বলিতেন। متفحش (মুতাফাহ্হিশ) বলে স্বেচ্ছায় ও বানোয়াটভাবে শক্ত কথা বলাকে। আর "فاحش" ফাহেশ উহা হইতে আরও বেশী ব্যাপক।

www.pathagar.com

যদি কেহ এই কথা বলে যে, এই হাদীসটি বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওকবা ইবনে মুআয়ত এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে খাতাল এবং ইহাদের ছাড়া ঐ সকল লোককেও যাহারা বহু রকমের কষ্ট দিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে হত্যা করার হুকুম দিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহা বলা যে, مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهٖ। নিজ সত্তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই, কিভাবে শুদ্ধ হইবে ? ইহার উত্তর হইল এই যে, এই লোকেরা اِنْتِهَاكَ حُرُمَاتِ اللّٰهِ। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধতা ও পবিত্রতাকেও তাহারা পদদলিত করিত, ধ্বংস করিত। আর কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার বদলা না গ্রহণের উদ্দেশ্য এই যে, এই রকম কোন কারণ হইলে যাহা কুফরীর পর্যায়ে পড়িত না, ঐ সকল ক্ষেত্রে তিনি বদলা নিতেন না। যেমন উপরোল্লিখিত এই ঘটনাই, যে ব্যক্তি তাঁহার চাদর মুবারক টানিয়া ধরিয়া রাখে এবং এই ধরনের অন্যান্য ঘটনা। দাঊদী প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে ঐ সকল বস্তুর উপর ধার্য করিয়াছেন, যাহা ধন ও সম্পদের সহিত খাস হইত এবং মান ও ইয্যত জাতীয় না হইত। আর রাসূলে আকদাস (সা)-এর ক্ষমা ও মার্জনা করার উদাহরণ হইল, লবীদ ইব্ন আসম ইয়াহূদীকে— যে জাদু করিয়াছিল এবং খায়বার-এর সেই ইয়াহূদী মহিলাকে যে বিষ মিশ্রিত বকরীর রান আহার করিতে দিয়াছিল, ক্ষমা করেন। অনুরূপ তিনি কাইলুলার সময় অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন চক্ষু খুলেন তখন দেখেন যে, এক আরবী বেদুঈন উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে যে, এখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে ? এবং আমার হাত হইতে আপনাকে কে হিফাযত করিবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্। ইহার পর তাহার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত তরবারি নিজ হস্তে উঠাইয়া নেন এবং বলেন যে, এখন বল, তোকে এখন কে রক্ষা করিবে ? অতঃপর সে যরযর করিয়া কাঁপিতে লাগিল উহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর সে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে যায় এবং বলিতে থাকে যে, আমি তোমাদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হয়, সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, সে আপনার শত্রুদিগকে হত্যা করিবে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি ভয় করিও না যদি তুমি আমাকে হত্যা করার সংকল্প করিয়া থাক, তবে তুমি আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। এই সকল উদাহরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুমহান চরিত্র এবং গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে।

এখন ঐ সকল বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা রহিয়া গেল, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুনাফিক বা কপট মুসলমানদিগের সহিত ছিল। যেমন অগোচরে মুনাফিকরা তাঁহাকে কষ্ট দিত। আবার যখন তিনি উপস্থিত থাকিতেন তখন তাহারা খোশামোদ ও চাটুকারিতা করিত। মুনাফিকদের এই কার্যকলাপ এমন ছিল যদ্দরুন প্রত্যেক মুসলমানের অন্তর ঘৃণা করিত। কিন্তু যাহাদের প্রতি আল্লাহ্র মদদ ছিল তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আল্লাহ্রই পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের নির্দেশ আসিয়া গিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে– يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ "হে নবী!

www.pathagar.com

আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন"। (সূরা তাওবা ঃ ৭৩)

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের জন্য মার্জনা, করুণা এবং আল্লাহ্‌র নিকট মাফি চাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখেন। এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিতে থাকেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ "হে প্রিয় নবী! আপনি তাহাদের জন্য মার্জনা চান বা না চান আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে মার্জনা করিবেন না। (সূরা তাওবা ঃ ৮০)

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছেন, এখন আমি মার্জনাকে গ্রহণ করিলাম। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এই ইরশাদ করেন- إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً। যদি আপনি তাহাদের জন্য সত্তর বারও মার্জনা কামনা করেন, তবু অবশ্য ক্ষমা করা হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি সত্তর বারের চাইতেও অধিক তাহাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ক্ষমাসুলভ স্বভাব, তাহাদের অপরাধ ও কষ্ট প্রদানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং ক্ষমা ও মার্জনা করার এই স্বভাব উপমাসমূহের মধ্যে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এই দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যে, এই পবিত্র আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ অধিক এবং অতিরিক্তও বুঝা যায়, কোন বিশেষ সংখ্যায় সীমায়িত করা বা নির্দিষ্ট করা এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই পবিত্র আয়াতকে সীমাহীন ক্ষমা ও মার্জনাকে ভিত্তি করিয়া প্রকাশ্য শব্দার্থের উপরই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্রকে যিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন স্বীয় পিতার সহিত উত্তম ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেন এবং যখন সে মৃত্যুবরণ করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জামা মুবারক পবিত্র শরীর হইতে খুলিয়া দেন যাহা দ্বারা তাহার কাফন তৈরী করা হয়। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহার জানাযার নামায পড়াইবার ইরাদা করেন ঐ সময় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কাপড় ধরিয়া আরয করেন আয় আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এমন এক মুনাফিকের নামায পড়াইতে চাহেন, যে সমস্ত মুনাফিকদের নেতা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র কাপড় ছাড়াইয়া নিয়া বলেন, হে উমর তুমি দূরে থাক। তখন এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ 'আপনি কোন মুনাফিকের মৃত্যুর পর কখনও জানাযার নামায পড়াইবেন না এবং না তাহার কবরের উপর দাঁড়াইবেন' (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংকল্প ত্যাগ করেন। ইহা রাসূলে পাক (সা)-এর নেহায়েত সবর, উদারতা, আন্তরিকতা ও অনুগ্রহ তাহার উম্মতের উপর ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতেই নিষেধ আরোপিত হয় তখন আর কি করা।

কোন কোন আলিম বলিয়াছেন যে, ইহা তাহার পুত্রের আত্মসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল। কেননা, তাহার পুত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দরবারের মুখলিস ও সত্যনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন এবং তাঁহার আবেদন তিনি কবূল করেন। কোন কোন আলিম বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে পবিত্র জামা পরিধান করানো এই উদ্দেশ্যে ছিল যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা

www.pathagar.com

হযরত আব্বাস (রা)-কে ঐ সময় জামা পরিধান করাইয়াছিল, যখন তিনি বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে উলঙ্গ হইয়াছিলেন এবং তিনি লম্বা গঠনের হওয়ার দরুন তাঁহার শরীরে কোন জামা ফিট হইত না।

মোটকথা, এই বর্ণনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তম স্বভাব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। যদিও সকল মুনাফিক সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মন্দ জানিত এবং নানা ধরনের কষ্ট দিত। কিন্তু ইহার বিপরীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত সুন্দর আচরণই করিতেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে. মুখলিস মুসলমানদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কি অবস্থা ছিল। এহেন স্থানেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ। 'নিশ্চয় আপনার চরিত্র সুউচ্চ।' এবং ইহা যাহা হক তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ইহার উদ্দেশ্য হইল যে, এই বাধা-নিষেধ এই কারণে ছিল যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারী ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা ইহাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, উম্মতের মধ্য হইতে কবীরা গুনাহকারীগণের গুনাহ সমূহ এবং তাহাদের কষ্টসমূহ যেন পর্দাপুশী অর্থাৎ গোপন রাখা হয় এবং বলেন যে, যদি কাহারও মাহরিমাত অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম, তাহাদের সহিত যদি সহবাস ধরনের গুনাহ সংঘটিত হইয়া যায়, তাহার উচিত সে যেন ঐ গোনাহ গোপন রাখে— প্রচার না করে। এবং উম্মতগণকে আদেশ করেন যে, যে সকল ব্যক্তির উপর শরীআতের হদ (শাস্তি) কায়েম করা হয় তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমার দু'আ করা উচিত এবং তাহাদের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। এবং নিষেধ করিয়াছেন যেন কাহাকেও গালি ও অভিশাপ না দেওয়া হয়। ইরশাদ করেন ঃ لَا تَلْعَنُوْهُ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ কোন মুসলমানকে অভিশাপ করিও না, কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসে। ইহাতে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের অভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যদিও বাহ্যত কোন প্রকার ভুল ও অপরাধজনিত কাজ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি দান করেন। যখন তাহাকে দেখিলেন, তখন বলেন যে, এই ব্যক্তি নিজ গোত্রের মধ্যে অতীব মন্দ ব্যক্তি। যখন সে উপবেশন করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশস্ত চেহারা এবং আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন ঐ ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) আরয করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আপনি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন, তখন উহার সম্পর্কে এইরূপ এইরূপ বলিয়াছিলেন এবং সে যখন বসিয়া গেল, তখন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি প্রশস্ত চেহারা এবং তাহার সহিত খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহা কি ব্যাপার ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আইশা (রা) তুমি আমাকে ফাহ্হাশ, শক্ত কথা কঠিন স্বভাবের কখন পাইয়াছ ? ইহা ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি বহুত খারাপ, যাহাকে লোকেরা ডর ও ভয়ের কারণে ত্যাগ করে এবং তাহার দুষ্টামি ও দুষ্কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই কথার দুই প্রকার অর্থের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ

www.pathagar.com

এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র সত্তার দিক হইতে ওযর হিসাবে ঐ ব্যক্তির সহিত সুন্দর ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করার দিকে ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। শক্ত কথা বলা এবং কঠোর কর্কশ ব্যবহার হইতে বারণ করিয়াছেন, যাতে মানুষ নিকটে আসিতে ভয় না পায় এবং দূরে সরিয়া না যায়। এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনা হইল যে ঐ ব্যক্তির অবস্থার প্রতি ইশারা করিয়াছেন এবং বলেন যে, সে এমন খারাপ ব্যক্তি যাহার দূরাচার হইতে মানুষ ভয় পায় এবং দুষ্কর্মকে তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করিতে পারে না। তাহার দুরাচারের ভয়ে তাহার প্রতি ভদ্র আচরণ করে।

আলিমগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ ব্যক্তির সহিত সুন্দর আচরণ করা হৃদয় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল, যাহাতে সে নিজে এবং তাহার গোত্রের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কেননা, সে নিজ গোত্র এবং সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাকে খারাপ বলা গীবতের মধ্যে শামিল নয়। এই জন্যে যে, শারে' আলায়হিস্ সালাম অর্থাৎ শরীআতের প্রবর্তকের অর্থাৎ নবীর অধিকার আছে যে, তিনি নিজ উম্মতগণের দোষ,ক্রটিসমূহ দেখিবেন এবং উহা প্রকাশ করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এইরূপ করা উম্মতের জন্য উপদেশ এবং মহব্বত করার মধ্যে শামিল। উম্মতগণের ব্যাপার ইহার বিপরীত। কেননা, তাহারা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করে এবং গীবত করে। এবং ইহাও যাহারা প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম ও অশ্লীল কর্ম করে, তাহাদের সেই দোষ প্রকাশ করা জায়েয আছে। এই সকল কথা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীব (সা)-এর স্বভাবগত সৌন্দর্যই এইরূপ বানাইয়াছেন যাহা দয়া ও সুন্দর চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তাঁহার মধ্যে স্নেহ মমতা ভদ্রতা ও প্রফুল্ল কপাল ছিল। তদুপরি ইহার মধ্যে উম্মতের জন্য হুশিয়ারী ও সাবধানতাও রহিয়াছে। যে সকল ঔদ্ধতঃ লোকদের এইরূপ অবস্থা হয় তাহাদের হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং তাহাদের সহিত বিনয় ও ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করিবে যাহাতে তাহাদের মন্দকর্ম এবং ফাসাদ হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে। কিন্তু চাটুকারিতা খোশামদ তোষামদ পর্যায় যেন না পৌছে। এবং مدارات ও مداهن (মুদারাত ও মুদাহেনাত) এর মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, মুদারাত বলা হয় যাহা মন্দকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং নিজ সম্মান রক্ষার জন্য করা হয়। এবং মুদাহেনাত হইল যাহা পার্থিব লাভের জন্য করা হয়। কোন কোন আলিম বলেন যে, ইহা এই অর্থের প্রতি অগ্রবর্তী। যথা মুদারাত হইল এই যে,পার্থিব লেনদেন পার্থিব সংশোধন অথবা দীনের সংশোধন অথবা উভয়টারই সংশোধনের জন্য হয় এবং ইহা মুবাহ এবং অনেক সময় ইহা মুস্তাহসান (সুন্দর) ও মামদুহ (প্রশংসিত)ও হইয়া থাকে। এবং মুদাহেনাত হইল এই যে, দ্বীনী বিশেষ কার্যকলাপকে দুনিয়ার ভালাই এবং দুনিয়া অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। (আল্লাহ্ তা'আলা মুদাহেনাত হইতে রক্ষা করুন) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তির প্রতি স্বীয় এই পার্থিব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচরণ করিয়াছেন যাহা উত্তম ব্যবহার এবং নরম কথার সহিত সম্পর্ক রাখে। ইহা সত্ত্বেও স্বীয় যবান মুবারক দ্বারা তাহার গুণগান ও প্রশংসা করেন নাই। যাহাতে সংঘটিত অবস্থার বিপরীত না হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা সত্য প্রকাশকারী ছিল এবং তাহার কর্ম উত্তম ব্যবহারের সহিত সম্পৃক্ত। কাযী ইয়ায (র) বলেন যে, জানা নাই ঐ সময় সেই ব্যক্তি মুসলমান ছিল কি না। যদি মুসলমান না থাকিয়া থাকে তবে তাঁহার কথা অর্থাৎ তাহাকে মন্দ বলা গীবত হইবে না। আর যদি সে মুসলমান ছিল তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির ইস্‌লাম বিশুদ্ধ এবং উপকারী ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাহিয়াছেন যে, তাহার অবস্থা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া

www.pathagar.com

হউক যাহাতে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি উহা হইতে ধোকা না খায় এবং ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে, ঐ ব্যক্তির সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পার্থিব জীবনে এবং আল্লাহ্র সহিত মিলনের পর অর্থাৎ ওফাতের পর এমন ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হয় যাহা তাহার ঈমানের দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। এই প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ কথা গায়েবী সংবাদ প্রদান এবং নুবুওয়াতের আলামতসমূহের মধ্য হইতে হইবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা হইতে উন্নতি করা এবং চেহারার সুপ্রসন্নতা প্রকাশ করা উপরোক্ত মন্দের উপস্থিতির মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি হিসাবে ছিল।

সতর্কতা ঃ উক্ত ব্যক্তির নাম উওয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর ইব্ন ফারাবী ছিল। লোকেরা তাহাকে আহমাকুল মুতা বলিত। তাহার বেওকুফী বা নির্বুদ্ধিতা এবং অহংকারের জন্য আহমক এবং মুতা (مُطَاعٌ) মুতা বলিত এই জন্যে যে সে নিজ গোত্রের সর্দার ছিল। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, যখন উওয়ায়না বিন হিস্ন বিন হুযায়ফা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর বিন কায়স বিন হাসীনের নিকট আসে, এই হুর বিন কায়স ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে ছিলেন যিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নৈকট্যশীল এবং তাঁহার মজলিসে শূরার (পরামর্শ সভার) সদস্যদের একজন ছিলেন। উওয়ায়না স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেন যে, হে ভাতিজা, আমীরুল মু'মিনীন (রা)-এর নিকট তোমার সম্মান ও মর্তবা আছে, তুমি আমার জন্য তাঁহার নিকট তাঁহার নৈকট্য দানের জন্য আবেদন কর, যাহাতে আমি তাঁহার নৈকট্য লাভকারীদের মধ্যে হইতে পারি। তিনি বলেন যে, আমি দরখাস্ত করিব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, হুর ইব্ন কায়স উওয়ায়না সম্পর্কে দরখাস্ত করেন এবং হযরত উমর (রা) তাহাকে দরবারে উপস্থিতির সম্মান দান করেন এবং উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। যখন উওয়ায়না হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিতে লাগিল যে, হে খাত্তাবের ফরযন্দ! আমাদিগকেও কিছু মাল ও সম্পদ দান করুন। আল্লাহ্র শপথ! আপনি আমাদিগকে বেশী কিছু দেন না, আমাদের মধ্যে ইনসাফ করেন না। এতদশ্রবণে হযরত উমর ফারূক (রা) রাগান্বিত হন এমনকি তিনি সংকল্প নেন যে উহাকে ইহার সাজা দেওয়া যাক্। এবং বেত্রাঘাতের দণ্ডাদেশ কায়েম করা হউক। তখন হুর বিন কায়স বলেন, আয় আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীব (সা)-কে ইরশাদ করেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ 'আপনি ক্ষমা দ্বারা কাজ সমাধা করুন এবং কল্যাণের জন্য আদেশ করুন এবং মূর্খ জাহিলদের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আর ইহার পরে বলেন যে, এই ব্যক্তিও জাহিলদের মধ্যকার একজন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র শপথ হযরত উমর ফারূক (রা) এই আয়াত হইতে এক চুল পরিমাণও লঙ্ঘন করেন নাই।

"ফাতহুল বারী"তে বর্ণিত আছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যুগে উওয়ায়না মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়াছিল। ইহার পর দ্বিতীয় বার ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুরতাদ হওয়ার জন্য তাওবা করে। আর হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে কতিপয় বিজয়সমূহে শরীক হইয়াছিল। আর এই কিতাবের শেষে যুদ্ধসমূহের (গাযাওয়া) অধ্যায়ে ইহার এমন অবস্থা ও ঘটনাসমূহ ইনশাআল্লাহ্ আসিবে যাহা তাহার বদ স্বভাব এবং প্রচণ্ড অত্যাচার ও অন্যায় প্রমাণ করিবে।

www.pathagar.com

বিনয়, ভদ্রতা ও সৎ জীবন যাপন

এই বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার-পরিজন এবং খাদেম ও সাহাবাগণের সহিত যে বিনয়, ভদ্রতা এবং সুন্দর শিষ্টাচার ছিল উহার বর্ণনা করা হইবে। সুরাহ অভিধানে تَوَاضُعْ -এর অর্থ নিজের মধ্যে অনুনয় দেখানো এবং গলা অবনমিত রাখা করা হইয়াছে। এবং কামূসে 'তাওয়াযো' (تواضع) -এর অর্থ নিকৃষ্ট ও নীচুতা করা হইয়াছে।

আরবের অধিবাসীরা ইহাকে ঐ সময় ব্যবহার করে যখন তাহারা উটের ঘাড়কে নীচু করিয়া উহার উপর পা রাখিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করে। 'তাওয়াযো' ওয়াযা (وضع) হইতে উদগত। ওয়াযার অর্থ হইল নিচে রাখা। متواضع شخص মুতাওয়াযে শখস অর্থাৎ বিনয়ী ব্যক্তি যেহেতু নিজকে স্বীয় মর্তবা এবং স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামাইয়া আনে। আর ইহার বিপরীত হইল তাকাব্বুর। কেননা, 'মুতাকাব্বির' অর্থাৎ অহংকারী ব্যক্তি নিজকে স্বীয় মর্তবা হইতে বড় জানে। এবং যে নিজ মর্তবা হইতে নিকৃষ্ট থাকে উহাকে تَصَنُّعْ অর্থাৎ কৃত্রিমতা বলে। "তাওয়াযু" (বিনয়) তাকাব্বুর (অহংকার) ও তাসান্নু (কৃত্রিমতা)-এর মধ্যবর্তী অবস্থার নাম। কিন্তু, যেহেতু মানুষের তাকাব্বুর বা অহংকার করার কোন অবকাশই নাই। কখনও তাসান্নু অর্থাৎ কৃত্রিমতাকে তাওয়াযু অর্থাৎ বিনয়ের স্থান দেওয়া হয়। যেমন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র)-এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, তাওয়াযু (বিনয়) কি? তিনি বলেন خَفْضُ الْجَنَاحِ وَلِيْنُ الْجَانِبِ। অর্থাৎ বাহুদ্বয় ঝুঁকাইয়া দেওয়া এবং পার্শ্বদেশে ঝুঁকিয়া পড়া। আর বলেন ঃ تَخْضَعُ لِلْحَقِّ وَمُنْقَادَلَهُ وَتَقَبَّلَهُ لِمَنْ قَالَهُ وَتَسْمَعُ مِنْهُ অর্থাৎ যে সত্যের সম্মুখে অবনমিত হয় এবং উহার অনুগত হইয়া যায় যাহা সত্য বলে উহা কবূল করে ও শ্রবণ করে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে مَنْ رَاى لِنَفْسِهِ قِيْمَةً فَلَيْسَ لَهُ فِى التَّوَاضُعِ نَصِيْبٌ অর্থাৎ যে নিজ সত্তাকে মূল্যবান জ্ঞান করে তাহার জন্য তাওয়াযু বা বিনয়ের কোন হিস্সা নাই। মা'রিফাত তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, কোন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত তাওয়াযু বিনয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না, যতক্ষণ না তাহার অন্তর মুশাহাদার নূরে আলোকিত হয়। কেননা মুশাহাদা নাফসকে বিগলিত করে এবং ইহাকে নরম করে এবং নাফস বিগলিত হওয়ায় তাকাব্বুর (অহংকার) এবং উজ্ব (আত্ম-প্রশংসা)-এর ঝংকার হইতে পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। বস্তুত নাফস নরম ও মোলায়েম হইয়া যায়। জামালে হক আল্লাহ্ তা'আলার সৌন্দর্য আয়নার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। কিবর অহংকার ও আত্মপ্রশংসার প্রভাব বিলীন হইয়া যায় এবং মন্দ স্বভাবের ধুলাবালি ঝরিয় যায়। ইহার পূর্ণতম অংশ এবং উচ্চ মরতবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য খাস। কেননা, তিনি পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম স্তরে উপনীত ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাওয়াযু বা বিনয় অবলম্বন করিতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইখতিয়ার দান করেন যে, আপনি হয় নবী বাদশাহ হওয়াকে পসন্দ করুন অথবা নবী বান্দা হওয়াকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবী বান্দা হওয়াকে পসন্দ করলেন। অতএব, তিনি এই কথার প্রেক্ষিতে যে, مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ (যে আল্লাহ্র জন্য তাওয়াযু বা বিনম্রতাকে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার স্থান সমুন্নত করিয়া দিবেন) সমস্ত সৃষ্টজীব হইতে অতীব মর্যাদাবান ও অতীব উঁচু ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার

www.pathagar.com

সম্মান ও মরতবা সর্বোপরি ও সর্বশ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন এবং তাঁহাকে গোটা মানব জাতির সর্দার বানাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আমার প্রশংসা ও গুণ গান করার ক্ষেত্রে না অতির ন করিবে আর না সীমা অতিক্রম করিবে, যেরূপ নাসারা অর্থাৎ খৃস্টানরা মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুত্র (আল্লাহ্র পানাহ) বলিতে থাকে। আমি এতসব ফযীলত ও পূর্ণত্ব লাভ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাই হই। সুতরাং আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র রাসূল বলিও।

হযরত আবী উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লাঠির উপর ভর করিয়া আমাদের নিকট তশরীফ আনয়ন করেন। আমরা তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি বলেন যে, যেরূপ আজমী লোকেরা একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ায়, তদ্রূপ তোমরা দাঁড়াইও না এবং বলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা, ঐভাবে আহার করি যেরূপ দাসেরা আহার করে এবং ঐরূপ বসি যেরূপ দাসেরা বসিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথা বলা তাঁহার সহনশীল বিনম্র স্বভাবের কারণে ছিল।

তাঁহার এইরূপ বিনম্র অবস্থাসমূহের মধ্যকার ইহাও একটি যে, তিনি নিজ খাদিমকে না ধমক দিতেন আর না কঠোর হইতেন। এমনকি ইহাও বলিতেন না এইরূপ কেন করিয়াছ এবং এইরূপ কেন কর নাই। পরিবার-পরিজনদের সহিত তো তাঁহার চাইতে অতি বড় মেহেরবান কেহই ছিল না। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কাহাকেও হাত দ্বারা প্রহার করেন নাই এবং তিনি কাহারও হইতে আল্লাহ্র দীন ব্যতীত নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ গৃহে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার নির্জন বাসের কি অবস্থা ছিল। বলেন, তিনি সকল মানুষের মধ্যে সকলের চাইতে কথাবার্তায় নরম এবং বেশী বেশী মুচকি হাসিমুখ এবং আচার-আচরণে সুন্দর ছিলেন। কেহ কখনও তাহাকে নিজ সাহাবাদের মধ্যে পা মুবারক লম্বা করিতে দেখে নাই। এবং তাঁহার সাহাবাদের মধ্য হইতে কেহ অথবা তাঁহার গৃহবাসীদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলে তিনি (লাব্বায়ক) উপস্থিত আছি বলিয়া উত্তর দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্দর সামাজিক আচরণের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তিনি লোকদের আত্মসন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখিতেন এবং তাহাদের প্রতি কখনও অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করিতেন না। তিনি প্রত্যেক কওমের সর্দারের সম্মান করিতেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের উপর শাসক নিয়োগ করিতেন। তিনি স্বীয় সাহাবাদের অবস্থাসমূহের খোঁজখবর রাখিতেন এবং তাহাদের আত্মতুষ্টির প্রতি যত্নবান থাকিতেন। তাহার শুভদৃষ্টির এবং অনুগ্রহের অংশ তাঁহার সকল সাথীকে দান করিতেন। কেহ্-ই এই ধারণা করিতে পারিত না তাঁহার নৈকট্যতায় তাহার চাইতে আর কেহ বড় আছে। মজলিসী হক সকলের মধ্যে সমভাবে দেওয়া হইত। যে কেহ তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইত এবং তাঁহার খেদমতে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করিত তিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে উঠিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে না উঠিত এবং যখন কোন ব্যক্তি তাঁহার পবিত্র কানে গোপন ভেদের কথা বলিত, তখন তিনি তাঁহার শির মুবারক সরাইয়া নিতেন না, যতক্ষণ না সে নিজে সরাইয়া নিত। যে কেহ তাঁহার হাত মুবারক ধারণ করিত, তখন তিনি তাঁহার হাত মুবারক ঢিলা করিয়া দিতেন এবং তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া নিতেন না, যতক্ষণ না সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হাতকে ছাড়িয়া দিত। তিনি লোকদের

www.pathagar.com

হইতে পরহেয করিতেন এবং নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করিতেন। ইহা ব্যতীত যে, কাহারও প্রতি তাঁহার কপাল সংকুচিত হইত না অথবা তাঁহার হাসিখুশী চেহারা এবং ভদ্র ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য আসিত না। তাঁহার উন্মুক্ত চেহারা এবং উত্তম ব্যবহারে লোকজন তৃপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকলের জন্য পিতৃ সমতুল্য ছিলেন। (বরং উহা হইতেও অনেক বেশী বন্ধুবৎসল ও মেহেরবান ছিলেন। তাঁহার নিকট অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সকলেই বরাবর ছিলেন। তিনিও সর্বদা সতেজ চেহারা, উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট এবং নরমভাষী ছিলেন। তিনি কঠোর স্বভাবের, শক্তভাষী, উচ্চস্বর, অশ্লীল বাক্যবাগিস ছিলেন না। কাহারও দোষ সম্পর্কে বলাবলি করিতেন না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন যে, উত্তম স্বভাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে অধিক কেহই ছিলেন না। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দশ বৎসর খেদমত করিয়াছি কিন্তু তিনি আমাকে কোন দিন উফ্ পর্যন্ত বলেন নাই এবং এই কথা কোন দিন বলেন নাই যে, এইরূপ কেন করিয়াছ অথবা এইরূপ কেন কর নাই।

হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, আমি সর্বদাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাসি মুখ দেখিয়াছি এবং কখনও তাঁহাকে স্বীয় সাহাবীদের সম্মুখে নিজ মুবারক পা ছড়াইয়া রাখিতে দেখি নাই। যে কেহ তাঁহার খেদমতে আগমন করিত, তিনি তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার জন্য স্বীয় চাদর মুবারক বিছাইয়া দিতেন। তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেন, তাহাকে শিয়রের দিকে বসাইতেন এবং নিজে পিছনের দিকে তাশরীফ রাখিতেন। কথার মধবর্তী সময়ে কথা বন্ধ করিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সীমা অতিক্রম করিত। ঐ সময় দাঁড়াইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে কথা শেষ করিতেন। কখনও কোন আগন্তুক ব্যক্তির খাতিরে নামায সংক্ষেপ করিতেন এবং তাহার নিকট তাহার আবশ্যকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন তাহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন, তখন পুনরায় নামাযে মশগুল হইতেন। অসহায় অনাথ রোগীদের পরিচর্যা করিতেন এবং গরীব মিসকীনদের সহিত বসিয়া খাইতেন। দাস-গোলামদের দাওয়াত কবূল করিতেন। তাহাদের দাওয়াতে সাধারণতঃ যবের রুটি এবং গলিত পুরাতন চর্বি হইতে। তথাপি তিনি উহাই কবূল করিতেন এবং স্বীয় সাহাবীগণসহ এক সাথে মিলিয়া-মিশিয়া বসিতেন এবং মজলিসের শেষ প্রান্তে যেখানে জায়গা হইত তাশরীফ রাখিতেন। কোন কোন সময় গাধার উপর আরোহণ করিতেন এবং অন্য কাউকে পিছনে বসাইয়া লইতেন। বনী কুরায়যার দিন তিনি এমন এক গাধার উপর সওয়ার ছিলেন যাহার লাগাম রশির ছিল এবং পালান অর্থাৎ সওয়ারীর বসার স্থান খেজুরের খোসার ছিল। তিনি এমন উটের উপর হজ্জব্রত পালন করেন যাহার কাজাওয়া অর্থাৎ উটের উপর বসার পালকি বহুত পুরাতন ছিল এবং উহার উপর চার দিরহাম মূল্যের চাদর বিছানো ছিল। এই পবিত্র হজ্জ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সুবর্ণ সময়ে করেন যখন বিভিন্ন দেশ ও শহর বিজয় লাভ করিয়াছিল। যেদিন মক্কা মুকাররাম জয়লাভ করেন ঐ সময় তিনি একশত উট কুরবানী করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুসলিম সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা মুকররামা প্রবেশ করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সমীপে বিনয় ও হীনতার এই অবস্থা ছিল যে, তাহার মুবারক শির উটের কাজাওয়ার সম্মুখের লাকড়ীর সন্নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল অথচ প্রতাপশালী বাদশাহগণ বিজয়ের সময় শির উঁচু করিয়া রাখেন এবং দম্ভভরে পদচারণা করেন।

www.pathagar.com

হযরত কায়স বিন সা'দ আনছারী (রা) যিনি স্বয়ং নিজেও এবং তাঁহার পিতাও শ্রেষ্ঠ আনসারদের মধ্য হইতে ছিলেন বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের গৃহে তাশরীফ আনয়ন করেন। প্রত্যাবর্তনের জন্য হযরত সা'দ গর্দভ হাযির করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার উপর সওয়ার হন। হযরত সা'দ বলেন যে, হে কায়স রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহগামী হিসাবে তুমিও যাও। কায়স বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন যে, হে কায়স সওয়ার হইয়া যাও। আমি সম্মানের খাতিরে অস্বীকার করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হয় তুমি সওয়ার হও, নতুবা চলিয়া যাও। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, তুমি আমার সম্মুখে বস। কেননা, পশুর মালিকের হক হইল সে সম্মুখে থাকিবে।

অপর একবারের এক সাহাবী সওয়ার হইয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পান। তখন তিনি নামিয়া পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আরোহণ করাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সম্মুখে বসাইলেন। ইহার চাইতেও আশ্চর্য ও বিরল ঘটনা হইল এই, যাহা মুহিব্বে তাবারী মুখতাসারুস্ সিয়ার কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পালান গদ্দী ছাড়াই গর্দভের উপর আরোহণ করিয়া কুবার দিকে যাইতেছিলেন এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি তোমাকে কি আরোহণ করাইয়া লইব ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেরূপ মরযী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরোহণ কর। তিনি আরোহণ করিবার জন্য কাঁধ লাগাইলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আচড় লাগিল এবং উভয়েই মাটিতে পরিয়া গেলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাকেও কি আরোহণ করাইব ? আরয করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেমন মরযী। তিনি পুনরায় আরোহণ করিতে সক্ষম হইলেন না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত জড়াইয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় উভয়ই মাটিতে পড়িয়া গেলেন। যখন তৃতীয় বার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে আরোহণের জন্য বলেন, তখন তিনি আরয করিতে লাগিলেন যে, শপথ সেই আল্লাহ্র, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন এখন আমি আর চাহি না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তৃতীয় বার আরোহী অবস্থা হইতে মাটিতে লইয়া আসি।

তাবারী বয়ান করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সাহাবীগণকে এক দুম্বা তৈরী করার জন্য নির্দেশ দান করেন। সাহাবীগণ উঠিলেন এবং একজন বলিলেন যে, আমি যবাহ করিব, দ্বিতীয়জন বলিলেন, আমি উহার চামড়া ছাড়াইব, তৃতীয়জন বলেন, আমি উহা রান্না করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, লাকড়ী সংগ্রহ করা আমার কাজ হইবে। সাহাহীগণ আরয করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহার কি প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি জানি তোমরাই যথেষ্ট, কিন্তু ইহা পসন্দ করি না যে, আমি তোমাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় ও স্বতন্ত্র থাকি এবং তোমাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া বসিয়া থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা পসন্দ করেন না যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় সাথীগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সহিত উপবেশন করে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুতা মুবারকের ফিতা ছেঁড়া ছিল, সাহাবীদের মধ্য হইতে কেহ বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জুতা জোড়া দিন আমি উহা ঠিক করিয়া দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি চাহি না যে, আমি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া থাকি এবং অন্য কাউকে স্বীয় কাজ করিবার জন্য বলি।

www.pathagar.com

একবার আবিসিনীয় বাদশাহ নাজ্জাশীর কতিপয় দূত আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া যান। সাহাবীগণ নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, আয় আল্লাহ্র রাসূল! তাঁহাদের সেবার সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তাঁহারা আমাদের সাহাবীদিগকে বহুত সেবা সম্মান করিয়াছেন, আমি উহার বিনিময়ে কিছু সেবা করাকে পসন্দ করি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহের বাসিন্দাদের কাজকর্ম নিজে করিতেন এবং নিজের জামা নিজেই সেলাই করিতেন। স্বীয় মুবরক জুতাদ্বয় নিজেই ঠিক রাখিতেন। নিজ বকরীর দুধ নিজেই দোহন করিতেন। নিজ বস্ত্রসমূহের উকুন ইত্যাদি নিজেই দেখাশুনা করিতেন। হাদীসে يَفْلِى ثَوْبَهُ আসিয়াছে। فلى অর্থ বস্ত্রের এবং মাথার উকুন তালাশ করা। অথচ সীরাতবিদগণ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহে না উকুন হইত, না পবিত্র শরীরে মাছি বসিত। তাই يَفْلِى অর্থাৎ উকুন তালাশ করার সম্ভবতঃ অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড়ের উপর এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন যেন উকুন অনুসন্ধান করিতেছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল বস্ত্রসমূহ হইতে ধূলি-বালি, আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) উপরন্তু এক কারণ ইহাও হইতে পারে যে, উম্মতদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এরূপ করিতেন, যাহাতে তাহারা স্বীয় বস্ত্র ইত্যাদি হইতে উকুন তালাশ করে এবং উম্মতগণ এই সুন্নাতের উপর আমল করিয়া ছাওয়াব হাসিল করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় বাহন উটকে নিজে বাঁধিতেন এবং তিনি স্বয়ং উহার জন্য খাদ্য যোগাড় করিতেন। আটা গোলার কাজে খাদেমদের সাহায্য করিতেন। খাদেমদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতেন। খাদেমদের সহিত আহার করিতেন। মাওয়াহিবে লাদুনিয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই সকল ব্যাপার কোন কোন সময়ের সহিত ধর্তব্য হইবে। অর্থাৎ কখনও কখনও এইরূপও করিতেন। কেননা, ইহা প্রমাণিত স্বীকৃত স্তরে পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিক পরিমাণ খাদেম এবং দশজন দাস ছিল। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিজ কর্ম সমাধা করিতেন এবং কখনও তাহাদিগকে আদেশ করিতেন এবং কখনও তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেন। বাজার হইতে নিজ সওদাপত্র নিজেই বহন করিয়া আনিতেন এবং দ্বিতীয় কাহারও উপর উঠাইয়া আনার জন্য রাখিয়া দিতেন না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাজারে গমন করি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) চার দিরহাম দিয়া এক পায়জামা ক্রয় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওযনকারীকে বলিলেন যে, মূল্য গ্রহণের সময় মালকে খুব বেশী করিয়া টানিয়া মাপ অর্থাৎ ওযনে কম অথবা সমান সমান গ্রহণ করিও না বরং বেশী নিও। মাপনেওয়ালা ঐ ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন যে, আমি কখনও কাহাকেও মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে এমন বলিতে শুনি নাই। ইহারপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আফসোস তোমার প্রতি যে, তুমি নিজের নবীকে চিন না? তাহার পর ঐ ব্যক্তি দাঁড়িপাল্লাকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হাতকে চুমু দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক হাত টানিয়া নিয়া বলেন যে, ইহা আজমীদের প্রথা, তাহারা নিজ বাদশাহ ও সর্দারগণের সহিত এইরূপ করিয়া থাকে। আমি বাদশাহ নহি। আমি তো তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিনীত স্বভাব হেতু বলিয়াছেন যেমন তাঁহার পবিত্র স্বভাব ছিল)। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.pathagar.com

পায়জামা তুলিয়া নিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইচ্ছা করিলাম যে, তাঁহার কাছ হইতে পায়জামা নিয়া নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, জিনিসের মালিকেরই অধিকার যে, সে নিজের জিনিস নিজেই বহন করিবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে দুর্বল এবং নিজে বহন করিতে সক্ষম নহে তখন তাহার সেই ভাই-এর সাহায্য করা উচিত।[১]

সতর্কতা ঃ সারাবীল-এর উদ্দেশ্য হইল তান্‌বান অর্থাৎ পায়জামা যাহা অজমী (অনারব) দের পরিধেয়। এই হাদীস হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পায়জামা ক্রয় করা সম্পর্কে জানা গেল। কিন্তু তাঁহার ইহা পরিধানের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। বস্তুতঃ ইবনে কায়্যিম কিতাবুল হুদাতে বলেন যে, ক্রয় করা পরিধান করার জন্যই ছিল। এক রিওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও পায়জামা পরিধান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার পবিত্র যামানায় তাঁহার অনুমতিক্রমে পরিধান করিয়াছেন। কিন্তু ইবনে কায়্যিমের এই কথা মুহাদ্দেসীন কিরাম যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

কোন কোন রিওয়ায়াতে দুর্বল সূত্রসহ আসিয়াছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি পায়জামা পরিধান করিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হ্যাঁ, আমি ইহা সফরে, গৃহে, রাত্রে ও দিনে পরিধান করি। কেননা, লজ্জা (সতর) ঢাকার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার চেয়ে উত্তম আর কোন লজ্জা নিবারণকারী পোশাক আমি পাই নাই। ইবনে হিব্বান, তাবরানী এবং ওকায়লীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু দুর্বল সনদের সহিত রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই হাদীসটির ভিত্তি হইল ইউসুফ ইবনে ওয়াসেতী আর তিনি অতীব দুর্বল। বর্ণিত আছে যে, হযরত উছমান যুন্নুরায়ন (রা)-কে যেদিন শহীদ করা হয়, তখন তিনি পায়জামা পরিধান করা অবস্থায় ছিলেন। এই সম্পর্কে শরহে সিফরুস্‌সা'আদাত গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লইতে পারেন। (সিফরুস্‌সা'আদাতের অনুবাদ টীকাতে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) "ইযার পা" পরিধান করিয়াছেন। যদি ইযার পা' দ্বারা ঐ মর্মার্থই হয় যাহাকে চাদরের ন্যায় বলা হইয়া থাকে। তবে ইহা জানা কথা যে, উহা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আর যদি উদ্দেশ্য সারাবীল অর্থাৎ পায়জামা হয়, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইহা পরিধান সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ এই কথার উপর বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি পায়জামা পরিধান করেন নাই। কিন্তু শুমান্নী শারহে শিফাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়জামা পরিধান করিয়াছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সারাবীল বা পায়জামা খরিদ করার কথা সর্বসম্মত মতে জানা কথা। বস্তুতঃ "জামেউল উসূল" কিতাবে তিরমিযী ও আবূ দাউদ-এর হাদীস হইতে বর্ণিত যে, পায়জামা ক্রয় করার এই ঘটনা, মক্কা মুকাররামায় ঘটিয়াছিল। আবূ আলী মূসেলী স্বীয় মুসনদে দুর্বল সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাজারে গমন করি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) চার দিরহাম মূল্যে একটি সারাবীল অর্থাৎ পায়জামা ক্রয় করেন। বাজারওয়ালাদের এক ওযনকারী ছিল যে মূল্য ওযন করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলেন যে, খুব বেশী টানিয়া ওযন করো। তখন সে ব্যক্তি বলে যে, আমি কখনও কাউকে এমন কথা বলিতে শুনিনাই যে, সে এমন কথা বলিয়া মূল্য আদায় করে। এই কথার উপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আফসোস তোমার প্রতি যে, তুমি নিজের নবীকে চেন না। অতঃপর সে ব্যক্তি দাঁড়িপাল্লা ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হস্তে চুম্বন দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক হস্ত টানিয়া লইয়া বলেন যে, ইহা আজমী (অনারব)-দের প্রথা যে, তাহারা বাদশাহদের সঙ্গে এরূপ করিত। আমি বাদশাহ নহি। বরং আমি তোমাদের ন্যায়ই একজন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়জামা লইয়া চলিতে আরম্ভ করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি চাহিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্ত হইতে পায়জামা লইয়া আমি নিজে বহন করিয়া চলিতে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বস্তুর মালিক অধিক উপযুক্ত যে সে নিজ জিনিস বহন করিবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে শক্তিহীন অনুপায় হয়। তখন তাহার ভাই তাহাকে সাহায্য করিবে।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আগমন করিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি সুস্থির হও, কাঁপিও না। আমি বাদশাহ নহি, বরং আমাকে মাতা জন্ম দিয়াছেন এবং আমি কুরায়শদের একজন। যাহারা কাদীদ ভক্ষণ করে। এমন শুষ্ক গোশতকে কাদীদ বলে যাহা ফকীর ও মিসকীনদের আহার্য। তাঁহার খেদমতে এমন এক মহিলা আগমন করে যাহার বুদ্ধির মধ্যে গণ্ডগোল ছিল। সে বলিতে লাগিল, আমার আপনার নিকট প্রয়োজন আছে। তিনি বলিলেন, বসো। পবিত্র মদীনার যে গলি ও বাজারে তুমি চাও আমি তোমার সহিত বৈঠক করিব এবং তোমার প্রয়োজনাদি পূর্ণ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার সহিত বসেন এবং তাহার যে হাজত বা আবশ্যকতা ছিল উহা পূর্ণ করিয়া দেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, পবিত্র মদীনার দাসীরা আসিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্ত ধারণ করিত, যে স্থানে উহারা চাহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের

চলমান ঃ অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি পায়জামা পরিধান করিবেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি সফরে, গৃহে এবং রাত্র ও দিনে পরিধান করি। কেননা, আমাকে লজ্জাস্থান ঢাকার হুকুম দেওয়া হইয়াছে এবং আমি এই পায়জামা ব্যতীত অধিক লজ্জা ঢাকার পোশাক পাই নাই। এবং তাবারানী ও দারাকুতনী এবং উকায়লীও এই হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু দুর্বল সূত্রতার সহিত। আর এই হাদীসের ভিত্তি হইল ইউসুফ বিন যিয়াদ ওয়াসতী, যিনি বহুতই দুর্বল। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পায়জামা ক্রয় করা সঠিক ও প্রমাণিত। ইবনে কায়্যিম স্বীয় রচিত "হুদান্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম" কিতাবে বলেন যে, ইহা স্পষ্ট যে, ক্রয় করা পরিধান করার জন্য ছিল। আরও বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়জামা পরিধান করিয়াছেন। এবং তাঁহার সাহাবীগণও তাঁহার পবিত্র যামানায় তাঁহার অনুমতিক্রমে পরিধান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে শিরনাম দিয়াছেন। কিন্তু কোন হাদীস ইহা পরিধান করা সম্পর্কে আনয়ন করেন নাই, এই জন্য যে, ইহা সহীহ হইবে না। ঐ সকল শর্ত ও পদ্ধতি মোতাবেক যাহা ইমাম বুখারীর নিকট নির্ভরযোগ্য ছিল মুহাদ্দেসীন রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন উছমান যিন্নুরায়ন (রা) যেদিন শহীদ হন, তিনি পায়জামা পরিধান অবস্থায় ছিলেন। রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন যে,পায়জামা পরিধান করাকে আবশ্যকীয় করিয়া লও। কেননা, ইহা তোমাদের জন্য সর্বাধিক লজ্জাস্থান আবরণকারী। যে সকল মহিলা বাহিরে গমন করে তাহাদিগকে পবিত্র ও সংরক্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদের জন্য পায়জামা বেশী উপযুক্ত পোশাক। বিশেষতঃ গৃহ হইতে বাহিরে গমন অবস্থায়। অনুরূপ কোন কোন গ্রন্থকারও বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) জামউল জাওয়ামেতে আমীরুল মু'মিনীন আলী (কা. ওয়া.) হইতে এই সকল শব্দের সহিত আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে "বাকী"তে বর্ষার দিনে বসা অবস্থায় ছিলাম। এক মহিলা গর্দভের উপর আরোহণ করিয়া যাইতেছিল। তাহার সহিত বোঝা ছিল গর্দভের পা যমীনের নিচুতে পিছলাইয়া যায় এবং সেই মহিলা মাটিতে পড়িয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নূরানী চেহারা ঐদিক হইতে ফিরাইয়া নেন। সাহাবীরা বলিতে লাগেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে পায়জামা পরিহিতা অবস্থায় আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ اُمَّتِى يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّخِذُوْا السَّرَاوِيْلَاتِ فَاِنَّهَا مِنْ اَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَخُصُّوْابِهَا مِنْ نِسَائِكُمْ -

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতের পায়জামা পরিধানকারীদের ক্ষমা করিয়া দাও। হে লোক সকল, পায়জামা পরিধান করাকে বাধ্যতামূলক করিয়া লও। ইহা বস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সতর ঢাকাকারী পোশাক এবং তোমাদের মেয়েদের তো ইহা খাস করিয়া লওয়াই উচিত। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এবং উকায়লী আয্‌যুআফা (اَلضُّعَفَا) কিতাবে এবং ইব্‌ন আদী "আলআদাব" কিতাবে এবং দায়লামী "মুসনাদুল ফেরদৌস" কিতাবে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, এই হাদীসকে ইব্‌ন জাওযী "মাউযূআত" সমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তিনি ইহা ঠিক করেন নাই। কেননা, আমার নিকট এই হাদীস বিভিন্ন সনদের সহিত সঠিক আছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন। শরহে সিফরুস্‌সা'আদাত)

www.pathagar.com

সহিত তথায় তাশরীফ লইয়া যাইতেন। এই ক্ষেত্রে বিনয়ের মধ্যে এক প্রকার আতিশয্য করা হইয়াছে। এই জন্যে যে, মহিলা হোক অথবা পুরুষ, দাসী হোক অথবা স্বাধীন যে কেহই তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিত, তিনি তাশরীফ লইয়া যাইতেন। যদিও মদীনার বাহিরেই লইয়া যাউক না কেন। ইহা অপেক্ষা অধিক বিনয় এবং অহংকারকে ঘৃণা করা এবং উহা হইতে অসন্তুষ্ট হওয়া চিন্তাও করা যায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিসকীন এবং বিধবাদের সঙ্গে যাওয়া হইতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

আবদুল্লাহ্ ইবন আবিল হাস্মা (রা) বলেন যে, নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে কোন জিনিস ক্রয় করি। কিছু মূল্য বাকী রহিয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত অঙ্গীকার করি যে, এই জায়গায়ই লইয়া আসিতেছি। তাহার পর আমি ভুলিয়া যায়। তিন দিন পর আমার স্মরণ হয়। আমি তথায় যাই এবং দেখি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, তুমি আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছ। তিন দিন হইতে আমি এই স্থানে তোমার অপেক্ষা করিতেছি। ইহা আবূ দাঊদ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিনয়, ধৈর্য এবং অঙ্গীকারে সত্যতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। সায়্যিদেনা ইসমাঈল নবীউল্লাহ্ (আ)-এর সম্পর্কেও এইরূপ আসিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ। নিঃসন্দেহে হযরত ইসমাঈল ওয়াদা রক্ষায় সত্য ছিলেন। নবী (সা)-এর শরীআতের কোন কোন অনুগত বুযুর্গ এইরূপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (র) পূর্ণ এক বৎসর কোন ব্যক্তির ওয়াদা মুতাবিক তাহার অপেক্ষায় ঐ স্থানেই বসিয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি হযরত খিযির আলায়হিস্সালাম ছিলেন।

প্রথা ছিল যে, মদীনা তায়্যিবার দাসীরা পাত্রে পানি লইয়া আসিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র হস্ত পানিতে রাখিতেন এবং তাহারা ঐ পানি রোগীদের উপর ছিটাইয়া দিত। এইভাবে তাহারা কখন শীত মওসুমে ঠাণ্ডা পানি লইয়া আসিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের খাতিরে স্বীয় মুবারক হস্ত উহার ভিতরে রাখিতেন। বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাবাররুক হাসিল করার ইহা এক দলীল।

পবিত্র স্ত্রীগণের সহিত সুন্দর আচরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণের সহিত অতীব উত্তম আচরণ করিতেন। তাহাদের নেগাহবানী করিতেন। তাহাদের সহিত আরাম করিতেন এবং আন্সার শিশুদিগকে খেলার জন্য হযরত আইশা (রা)-এর নিকট ছাড়িয়া দিতেন। তিনি যখন পানি পান করিতেন, তখন পিয়ালার ঐদিক স্বীয় মুখ মুবারক রাখিতেন যেস্থানে হযরত আইশা (রা) মুখ রাখিয়া পানি পান করিতেন এবং হযরত আইশা (রা)-এর কনুই ধরিয়া পিয়ালার ঐদিক হইতে পান করিতেন যেস্থান হইতে তিনি পান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিসওয়াক পরিষ্কার করার জন্য হযরত আইশা (রা)-কে দিতেন। তিনি উহা লইয়া স্বীয় মুখ দ্বারা চিবাইয়া উহা নরম করিতেন। তাহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার মুখ হইতে মিসওয়াক লইয়া স্বীয় মুখ মুবারকে ধারণ করিতেন। ইহা চরম পর্যায়ের বিনয় এবং হযরত আইশা (রা)-এর সহিত অতীব ভালবাসার প্রমাণ। নবী (সা) হযরত আইশা (রা)-এর পার্শ্বদেশে ভর করিয়া বসিতেন এবং তাঁহাকে চুম্বন দিতেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা অবস্থায় থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.pathagar.com

তাহাকে হাবশীদের খেলা (তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি) দেখাইতেন এবং তিনি তাহার মুবারক গ্রীবাদেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহু মুবারকের উপর রাখিয়া দিতেন। ইহা ঐ সময়কার কথা যখন আইশা (রা) কমবয়স্কা ছিলেন। একবারকার বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-এর সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। পরস্পরে দৌড় দেন। হযরত আইশা (রা) দৌড়ে অগ্রবর্তী হন। অতঃপর কিছু দিন পর দ্বিতীয় দফা দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। তখন হযরত আইশা (রা)-কে পিছনে ফেলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগে চলিয়া আসেন। ইহার কারণ এই ছিল যে, প্রথমবার হযরত আইশা (রা) সাধারণ দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় বারের সময় তিনি দেহের অবকাঠামোর দিক হইতে ভারী দেহ বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, প্রথমবার তুমি আমা হইতে অগ্রবর্তী হইয়া যাওয়ার বদলা আজ আমার তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দ্বারা হইল।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) খাবার প্রেরণ করেন। হযরত আইশা (রা)-এর হাত খাবার পাত্রে লাগিয়া যায়। খাবার পাত্র পড়িয়া যাইয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং আহার্য মাটির উপর ছড়াইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাত্রের টুকরাগুলি উঠান এবং আহার্য উঠাইয়া পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ওযর করার নিমিত্ত উপস্থিত সকলকে বলেন যে, তোমার এই ঈর্ষা হইবার দরুন আফসোস হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর হযরত আইশা (রা)-এর গৃহ হইতে ভাল পিয়ালা আনিয়া এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, খাবারও আনিয়া তাহার গৃহে খাদেমের হাতে পাঠাইয়া দেন এবং বলেন, পেয়ালার পরিবর্তে পেয়ালা এবং খাবার পরিবর্তে খাবার দেওয়া হইল। এই হাদীস আত্মশ্লাঘার ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে দোষারোপ না করার প্রতি প্রমাণ বহন করে। কেননা, এইরূপ অবস্থায় অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে বিবেক লোপ হইয়া যায়। এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আত্মশ্লাঘার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। হাদীসে আসিয়াছে যে, মহিলাদের ঈর্ষা ও আত্মসম্ভ্রম অবস্থায় উঁচু-নিচুর প্রতি খেয়াল থাকে না।

একবার হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে তরকারির ঝোল আনয়ন করেন। হযরত আইশা (রা) সাওদা (রা)-কে বলেন যে, তুমি ইহা পান কর, কিন্তু তিনি পান করিলেন না। পুনরায় বলিলেন, ইহা তুমি পান করিয়া লও, নতুবা আমি তোমার মুখে লাগাইয়া দিব। তিনি তারপরও পান করিলেন না। তখন হযরত আইশা (রা) হযরত সাওদা (রা)-এর মুখে মাখাইয়া দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তুমিও তাহার মুখে মাখাইয়া দাও। বস্তুতঃ হযরত সাওদা (রা) হযরত আইশা (রা)-এর মুখমণ্ডলে লাগাইয়া দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিতে থাকিলেন। পবিত্রা বিবিগণের উপর তাঁহার এই অবস্থা ছিল যে, তিনি তাহাদের আত্মসম্মান ও মেযাজের উপর ধরপাকড় করিতেন না এবং তাহাদিগকে এ ব্যাপারে অপারগ মনে করিতেন। যখন তাহাদের উপর ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড এবং শরীআতের নির্দেশাবলী কায়েম করিতেন, তখন নরম ও সহানুভূতির সহিত করিতেন।

যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, আসহাব, ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম, বিধবা, অতিথি এবং আসা-যাওয়াকারীদের সহিত আচার-আচরণের প্রতি গভীর চিন্তার সহিত প্রত্যক্ষ করিবে, সে জ্ঞাত হইতে পারিবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূরানী কালবে অতিশয় হৃদ্যতা, নম্রতা এবং করুণা ও অনুগ্রহ ছিল। যাহা

www.pathagar.com

কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কল্পনাও করা যায় না। ইহা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হুদুদ ও সীমানাসমূহ এবং দ্বীনের হকসমূহের ক্ষেত্রে এত কঠোর ছিলেন যে, কেহই ঐ স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আখলাক, মহোত্তম চরিত্র এবং আমল পর্যন্ত পৌঁছা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। কেননা, এইগুলি সকলই মু'জিযা এবং তাঁহার নুবুওয়াতের নিদর্শন ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একে অপরের সহিত সুন্দর স্বভাব খোলামেলা ভাব এবং সাহাবীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কথাবার্তা বলিতেন এবং তাহাদের সহিত হাসি-তামাশা করিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইত শুধু হৃদয় আকৃষ্ট করা ও সন্তুষ্টি দান। যদি মযাক বা ঠাট্টা করিতেন, তবে বাক্যের বিষয় ও মর্ম সত্য এবং বরহক হইত। বাচ্চাদের সহিত খেলা করিতেন এবং উহাদিগকে স্বীয় কোলে বসাইতেন। প্রত্যেক স্বাধীন, দাস দাসী ও মিসকীন-এর দাওয়াত কবূল করিতেন। মদীনা মুনাওয়ারার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রোগীদের পরিচর্যা করিতেন। কোন কোন হাদীসে যে ঠাট্টা এবং খেলা-তামাশা ইত্যাদি সম্পর্কে নিষেধ আসিয়াছে, উহা বেশী ও মাত্রাতিরিক্ত-এর উপর ধর্তব্য হইবে। বেশী ও মাত্রাতিরিক্ত বলার উদ্দেশ্য হইল এই যে, উহা যেন এমন পর্যায়ের না হয় যাহা আল্লাহ্র স্মরণ এবং দীনের কঠিন বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা হইতে গাফিল করিয়া দেয়। যে এই ক্ষেত্রে সহীহ্-শুদ্ধ থাকে, তাহার জন্য ইহা মুবাহ হইবে। ইহা দ্বারা যদি মাকসূদ হয় কাহারও আনন্দ দান এবং আত্মিক ভালবাসা, হৃদয় আকৃষ্ট করা যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ম মুবারক ছিল, তবে উহা মুস্তাহাব হইবে।

প্রকৃতপক্ষে যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহোত্তম চরিত্রের মধ্যে বিনয়, প্রীতি এবং সুন্দর স্বভাব না থাকিত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির পক্ষে উহার গুরুত্ব ও শক্তি অনুধাবন করা অসম্ভব হইত। তাঁহার খিদমতে বসিতে অথবা বাক্যালাপ করিতে সক্ষম হইত না। কেননা, তাঁহার মধ্যে অতি উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠত্ব, ভয়-ভীতি উচ্চ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। সীরাতবিদগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করার পর যদি হযরত আইশা (রা) জাগ্রত থাকিতেন তবে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতেন, নতুবা মাটির উপর পার্শ্বদেশে ভর করিয়া কিঞ্চিৎ আরাম করিতেন অতঃপর বাহিরে আগমন করিতেন এবং ফজরের ফরয নামায আদায় করিতেন। ইহার কারণ ছিল এই যে, রাত্রের শুরু হইতে, কিয়াম, তিলাওয়াতে কুরআন, আল্লাহ্র যিকর-এর মধ্যে মশগুল থাকার কারণে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর পক্ষ হইতে তাঁহার উপর আনওয়ার, আসরার (ভেদসমূহ) নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্ আল জাব্বার-এর তরফ হইতে কালাম শ্রবণ করা এবং মুনাজাতকে মকবূলিয়াত প্রদান ইত্যাদি হইতে তাঁহার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হইত যে, উহা বর্ণনা করা এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা ও শক্তি কাহারও ভাষায় নাই। এই রকম অবস্থার মধ্যে কোন ব্যক্তিরই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার অথবা এক সাথে বসার ক্ষমতা থাকিত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য হয় হযরত আইশা (রা)-এর সহিত কথাবার্তা বলিতেন অথবা পার্শ্বের উপর ভর করিয়া মাটির উপর আরাম করিতেন যাহাতে তাঁহার হযরত আইশা (রা)-এর সহিত প্রীতি স্থাপিত হয় অথবা ঐ মাটির ওসীলায় যাহা সৃষ্টির মূল। ইহার পর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সুউচ্চ মকাম হইতে বাহিরে আগমন করিতেন তখন খোদার বান্দাদের সম্মুখীন হইতেন এবং ইহা এই জন্য ছিল যে, তিনি মুসলমানদের সহিত নম্র ও অনুগ্রহশীল ছিলেন وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا এবং তিনি মুসলমানদের সহিত বড় মেহেরবান ছিলেন। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব যাহা মাওয়াহিবে লাদুনিয়া কিতাবে "মাদখাল" এ ইবনুল হাজ্জ হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ হযরত শায়খে মুহাক্কিক শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন যে, এই অবস্থা শুধু এই মকামের সহিত বিশেষত্ব রাখে না; বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বদাই আ'লা ইল্লিয়্যীনে, নৈকট্য ও বিশেষ মর্যাদার মকামে অবস্থান করিতেন। অভ্যন্তরে কোন বান্দার সহিত সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা রাখিতেন না। অবশ্য আল্লাহ্র নির্দেশে দাওয়াত ও তাবলীগী নির্দেশনাবলীর উপর আদিষ্ট হওয়া এবং ঐ রহমত ও ভালবাসার ভিত্তির উপর যাহা খোদার বান্দাদের সহিত তাঁহার ছিল; আহাদিয়াতের (একত্ববাদের) সুউচ্চ স্তর হইতে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে অবতারণ করিতেন এবং তাহাদের সহিত পরস্পর বৈঠকে বসিতেন বা সহঅবস্থান করিতেন। এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ। আমি কি আপনার বক্ষ মুবারক সুপ্রশস্ত করি নাই তাঁহার মধ্যে এই (কামাল) পূর্ণত্ব গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্যতার সহিত বান্দাদিগকে দাওয়াতের কাজ পরিসমাপ্ত ও পরিপূর্ণরূপে একত্রিত করিতে সক্ষম হন। রাত্রের কিয়াম বা রাত্র জাগরণ এবং প্রত্যুষকাল তাঁহার পবিত্র সময়সমূহের মধ্যে এক বিশেষ সময় ছিল। এই মকাম, কামাল ও পরিপূর্ণতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিল। তিনি ব্যতীত আওলিয়ায়ে কিরামেরও তাঁহার আনুগত্যের মাধ্যমে ইহার কিছু অংশ লাভ হইয়াছে।

ঠাট্টা ও খেল-তামাশা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মযাক, ঠাট্টা, খেল-তামাশার প্রভাব ও বরকতসমূহ সীমা ও সংখ্যার বাহিরে ছিল। উহা গণনা করা ও আয়ত্তাধীন করা অসম্ভব ছিল। একবার হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর সাহেবযাদী বা কন্যা যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাবীবাহ ছিলেন (অন্য স্বামীর ঘরের কন্যা) তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসলখানা হইতে গোসল করিয়া বাহিরে তাশরীফ আনয়ন কালে ঠাট্টা স্বরূপ তাহার মুখমণ্ডলির উপর পানির ছিটা মারেন। ইহার বরকতে তাহার চেহারার উপর এমন সৌন্দর্য ও সুশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যাহা কখনও বিদূরিত হয় নাই, সর্বদা যৌবনাবস্থা বিরাজমান ছিল।

মাহমুদ বিন রবী' (রা) সাহাবীগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। যখন তিনি পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন সেই সময়ে নবী (সা) তাঁহাদের বাটীতে গমন করেন। তাঁহাদের বাটীতে একটি কূপ ছিল। নবী (সা) বালতি হইতে স্বীয় পবিত্র মুখে পানি লইয়া ঠাট্টাচ্ছলে সেই পানি তাঁহার মুখে ফুঁকিয়া দেন। ইহার বরকতে তাহার স্মৃতিশক্তি এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহাকে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁহার বর্ণিত হাদীস বুখারী শরীফে রহিয়াছে।

নবী (সা)-এর ঠাট্টা ও কৌতুকের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ–

যাহির নামে এক বেদুঈন ছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর দরবারে মাঝে মাঝে আগমন করিতেন। আগমনকালে হাদিয়াস্বরূপ এমন কিছু তরকারি আনয়ন করিতেন যাহা নবী (সা) পসন্দ করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনকালে নবী (সা)-ও তাঁহাকে শহরের বস্তু যেমন কাপড় ইত্যাদি দান করিতেন। নবী (সা) তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। এমনকি নবী (সা) বলিতেন, "যাহিরের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে। আমি তাহার শহরের বন্ধু।" একদা নবী (সা) বাজারে গেলেন এবং যাহিরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি চুপিসারে যাহিরের পিছু হইতে হঠাৎ স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁহার চক্ষুদ্বয় টিপিয়া ধরিলেন এবং নিজের দিকে আকর্ষণ

www.pathagar.com

করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশকে স্বীয় বক্ষের সহিত মিলাইয়া লইলেন। যাহির নবী (সা)-কে চিনিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন–"ছাড়িয়া দাও–ইহা কি!"

কিন্তু যখন চিনিতে পারিলেন, তখন স্বীয় পৃষ্ঠদেশকে আরও পবিত্র বক্ষলগ্ন করিয়া রাখিতে চাহিলেন। পৃথক না হউক ইহাই যেন কামনা করিতেছিলেন।

রাসূল (সা) বলিলেন–কে আছ এই গোলামকে ক্রয় করিবে ?

যাহির বলিলেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে নকল ও কম মূল্যে পাইবেন। নবী (সা) বলিলেন–তুমি আল্লাহ্র নিকট নকলও নহ এবং স্বল্পমূল্যেরও নহ; বরং তুমি অতি মূল্যবান হইয়াছ।

নবী (সা)-এর শিষ্টাচারিতার মধ্যে এক বিশিষ্ট শিষ্টাচার ছিল ইহাই যে, তিনি কখনও খাদ্যদ্রব্যের দোষ ধরিতেন না। ইচ্ছা হইলে ভক্ষণ করিতেন, অন্যথায় পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপ কখনও বলিতেন না যে, এই খাদ্য খারাপ, টক, ইহাতে লবণ বেশী হইয়াছে অথবা কম হইয়াছে, ইহার ঝোল পাতলা কিংবা অধিক গাঢ় হইয়াছে ইত্যাদি।

ইহার ফলে জানা গেল যে, খাদ্যদ্রব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করা দূষণীয় এবং সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য কোন কোন আলিমের মতে রন্ধনের ত্রুটি জানাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি এইরূপ বলা হয়–রন্ধন খারাপ হইয়াছে কিংবা জিনিস নষ্ট হইয়াছে–তাহা হইলে ইহা দূষণীয় নহে। তবে রন্ধনকারীর মনঃকষ্টের কারণ হইবে বলিয়া এইরূপ না বলাই উত্তম।

নবী আকরাম (সা)-এর চরম শিষ্টাচার ও সুন্দর চরিত্রের মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, সাধারণত দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জানা, উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ও খারাপ বলা সাধারণ্যে একটি বহুল প্রচলিত ব্যাপার। কিন্তু নবী (সা) বলিতেন, দুনিয়াকে খারাপ বলিও না, উহাকে গালি দিও না। কেননা, দুনিয়া হইল উত্তম বাহন, সে মু'মিন ব্যক্তিকে পথ-নির্দেশ করে এবং অসৎ কর্ম হইতে নাজাত ও পরিত্রাণ দান করে।

অনুরূপভাবে নবী (সা) সময়কে গালি দিতেও নিষেধ করিয়াছেন। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন, لا تسبوا الدهر فانا الدهر –যামানাকে গালি দিও না, কেননা আমিই যামানা।

পৃথিবীর বাদশাহ্ ও দুনিয়াদারদের যেমন দারওয়ান থাকে নবী (সা)-এর সেইরূপ ছিল না। তথাপি তাঁহার পবিত্র দরবারে হাযির হওয়া অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। এই জন্য যে, যাহাতে তাঁহার পরিবার-পরিজনদের সহিত নির্জনে অবস্থান করাকালীন সময়ে গৃহে প্রবেশ না করিতে পারে এবং কর্তব্য কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিতে পারে।

নবী (সা)-এর বিনয়ের মধ্যে এই হাদীসটিও প্রণিধানযোগ্য। হাদীসটি হইল–নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন– لا تفضلونی علی یونس بن متی ولاتخیرونی علی موسی আমাকে ইউনুস ইব্ন মাত্তা-র উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিও না এবং মূসা (আ)-এর উপরেও আমাকে প্রাধান্য দিও না।

অনুরূপ আরো অনেক ঘটনার দ্বারা তাঁহার বিনয় প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে তাঁহার এই উক্তি– انا سيد ولد آدم আমি আদম সন্তানদিগের সর্দার। এবং অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ এবং এই মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এতদসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যও বটে।

www.pathagar.com

অবশ্য কোন কোন আলিম বলিয়াছেন, উপরিউক্ত ইরশাদ কেবল সকল নবী ও রাসূলের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে এবং এতদসংক্রান্ত ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব-আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

নবী (সা) প্রথম সালামকারী ছিলেন

নবী (সা)-এর বিনয়ের মধ্যে ইহাও প্রকৃষ্ট বিনয় ছিল যে, যে কেহ তাঁহার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনিই প্রথমে তাঁহাকে সালাম করিতেন এবং আগন্তুক ব্যক্তির সালামের জবাবও দান করিতেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, নবী (সা)-এর পবিত্র কবর যিয়ারতকারীদের জন্যও সুসংবাদ ইহাই যে, যেহেতু তিনি জীবদ্দশায় এইরূপ গুণের অধিকারী ছিলেন, সেহেতু এখনও যে সকল যিয়ারতকারী তাঁহার পবিত্র কবর যিয়ারত উপলক্ষে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেও তিনি অগ্রে সালাম দান করতঃ সম্মান দান করিয়া থাকেন এবং প্রদত্ত সালামের জবাবও দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মহান দরবারের সান্নিধ্য লাভকারী ওলী-দরবেশগণ নিজ নিজ সাধনা বলে স্বকর্ণে নবী পাক (সা) প্রদত্ত জবাব শ্রবণ করিয়া করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতএব, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবী (সা) জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পরও সকল উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ।

দানশীলতা ও বদান্যতা

জূদ ও সাখাওয়াত শব্দদ্বয়ের অভিধানে একই অর্থ করা হইয়াছে। কামূসে জূদ অর্থাৎ সাখাওয়াত এবং সাখাওয়াত অর্থ জূদ বলা হইয়াছে। সুরাহ্‌তে জূদ এবং সাখাওয়াতের অর্থ বীরত্ব লিখা হইয়াছে।

স্বভাবজাত সৌন্দর্যকে সাখাওয়াত বলা হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইল কৃপণতা (বখীলী) যাহা প্রবৃত্তির পরিণতি। আর প্রবৃত্তি বা নফসের উৎস হইল মাটি। যেহেতু মাটির স্বভাব ধারণ করিয়া রাখা, সেহেতু মানুষের কৃপণতায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ইহা মানুষের প্রকৃতি এবং স্বভাবগত। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ হিসাবে 'সখী' (দানশীল) শব্দ ব্যবহার শুদ্ধ হইবে না। কেননা, এইখানে স্বভাব বা প্রবৃত্তি অনুপস্থিত। বদান্যতার বিপরীত কৃপণতা। বদান্যতা ও কৃপণতা কার্যের মাধ্যমে স্ব স্ব পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দানশীল ব্যক্তি সখী হয় কিন্তু প্রত্যেক সখী ব্যক্তি দানশীল হয় না। কেননা, দাতার প্রকৃত অর্থ হইল বিনা উদ্দেশ্যে এবং প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত কাহাকেও কিছু দান করা। প্রকৃতপক্ষে এইগুণ আল্লাহ্ তা'আলার। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উদ্দেশ্য ও প্রতিদান লাভের আশা ছাড়াই সকল যাহিরী ও বাতিনী নিআমত এবং বস্তু-জগতের ও বিবেকের সকল পূর্ণতাকে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পর সকল দাতার শ্রেষ্ঠ দাতা তাঁহার হাবীব (সা) এবং তাঁহার পর তাঁহার উম্মতগণের মধ্যে উলামা-ই কিরাম। কেননা, তাঁহারা দীনের ইল্‌ম প্রচার করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ হাদীস শরীফে আসিয়াছে –

الله اجود جودا ثم انا اجود بنى ادم واجودهم من بعدى رجل علَّم علما ونشره الى اخر الحديث

'আল্লাহ্ সকলের চেয়ে বড় দাতা, অতঃপর আদম সন্তানের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা এবং আমার পর আদম সন্তানের ঐ আলিমগণ দাতা, যাহারা ইল্‌ম শিক্ষা দান করেন এবং উহার প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকেন।'

কাযী আয়ায মালিকী (র) এই শিরোনামে 'করম' (অনুগ্রহ) ও 'সামাহত' (বদান্যতা)-কেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জূদ, করম, সাখাওয়াত এবং সামাহত–প্রায় সমার্থবোধক। তবে পার্থক্য কেবল এইটুকু করিয়াছেন যে, করম বলিতে এমন দান বুঝানো হয়, যে দানের মূল্যমান অত্যধিক এবং দাতা তাহা জানিয়া-শুনিয়াই দান করেন। এই দানের অপর নাম স্বাধীনতা বলা যায় এবং দানকারীকে স্বাধীনচেতা বলা যাইতে পারে। ইহাই হইল 'নাযালত' অর্থাৎ নিকৃষ্টতর এর বিপরীত।

সুরাহ-তে নাযালত অর্থ 'নিকৃষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট' বলা হইয়াছে। 'নাযল' 'নাযীল' শব্দদ্বয় উহা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। আর অভিধান কামূসে আসিয়াছে–

النذل والنذيل الخسيس من الناس المحتقر فى جميع احواله

'যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট এবং সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, তাহাকে নাযল অথবা নাযীল বলা হইয়া থাকে। আর 'সামাহত' (বদান্যতা) নিজস্ব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সন্তুষ্টচিত্তে সেই বস্তু দান করিয়া দেওয়া। উহার বিপরীতকে 'শাকসুন' (কঠোর স্বভাববিশিষ্ট) বলা হয়। যেমন কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট লোককে বলা হয় رجل شكس এবং কঠোর প্রকৃতির সম্প্রদায়কে বলা হয় قوم شكس –যেরূপ সত্যবাদী ব্যক্তিকে বলা হয় رجل صدق ও সত্যবাদী সম্প্রদায়কে বলা হয় قوم صدق। শামনীও এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং সাখাওয়াত অর্থ বদান্যতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, বদান্যতা হইল সহজভাবে ব্যয় করা। উত্তম নহে এইরূপ বস্তু অর্জন করা হইতে দূরে থাকা-কে 'জূদ' বলা হয়–যাহার বিপরীত শব্দ 'তাকতীর' অর্থাৎ ব্যয় সংকোচ করা।

সুরাহ-তে পারিবারিক ব্যয় সংকোচকে তাকতীর বলা হইয়াছে।

কাযী আয়ায (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ধরনের স্বভাব ও গুণাবলীর সহিত আর কাহারও সমকক্ষতা জ্ঞান করা কিংবা তুলনা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাহারা চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা উপরিউক্তভাবে করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) সকলের চাইতে সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, বাহাদুর ও দানবীর ছিলেন। ইহার কারণ হইল, তাঁহার আত্মা সকল আত্মার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার স্বভাব সকলের চাইতে অধিক সংযত ছিল। বস্তুত যে ব্যক্তি এই সকল গুণে গুণান্বিত নিঃসন্দেহে তাঁহার অবয়ব মাধুর্য ও লাবণ্যময় হইবে, তাঁহার কার্য হইবে সুন্দরতম এবং তাঁহার চরিত্রও হইবে সর্বোত্তম। আর নবী (সা) দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক হইতে পূর্ণতর ছিলেন। তিনি ছিলেন শারীরিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দয়ালু। আর কেনই বা এইরূপ হইবেন না? তিনি তো চিরস্থায়ী সৎকর্মের জন্য পার্থিব সকল বস্তু হইতে নিরাসক্ত ও নির্লোভ ছিলেন। এক আল্লাহ্ ছাড়া এই সকল বস্তুকে তিনি সর্বদা দূরে রাখিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার জন্য এক আল্লাহ্ই যথেষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে- রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এরূপ কোন বস্তুর আবেদন করা হয় নাই- যাহার জবাবে তিনি 'লা' বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন জিনিসের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিলে তিনি তাহা শ্রবণ করিতেন ও উক্ত জিনিস প্রদান করিতেন।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আরবী কবি ফারাযদাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় বলিয়াছেন-

ما قال لا الا فى تشهده * لولا تشهد كانت لاءه نعم

'তিনি একমাত্র কালেমা শাহাদতের মধ্যে পঠিত লা (না) ব্যতীত কোন সময় না বলেন নাই। যদি তাশাহ্হুদ না পড়িতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার 'লা' হাঁ হইয়া যাইত।'

জনৈক ফারসী কবি এই কবিতাটি ফারসীতে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি এই প্রশংসা বাক্যসমূহ কোন এক অত্যাচারী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে এইরূপ প্রশংসার উপযুক্ত নহে। উহার চরণদ্বয় নিম্নরূপ-

نرفت لابرزبان مبارکش ہرگز * مگر باشهد ان لا اله الا الله

তাঁহার পবিত্র মুখে কখনও লা (না) উচ্চারিত হয় নাই; কেবল আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর লা (না) ছাড়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যদি কোন আবেদনকারীকে প্রদানযোগ্য কোন কিছু না থাকিত, তাহা হইলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন এবং সুন্দর কথার দ্বারা সেই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে এই কথা বলিতেন না যে, "উহা দিতে পারিব না।"

ইহাও কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) না দেওয়ার উদ্দেশ্যেও কখনও 'না' বলিতেন না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপারগতার ক্ষেত্রে যেরূপ 'না' করিতেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনাকারীরা ঐ সেই দলটির আগমনের কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা কোন এক যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্যে বাহনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন- لا اجد ما احملكم عليه -কোন বাহন আমি পাইতেছি না যাহাতে তোমাদিগকে আরোহণ করাইতে পারি।

আলিমগণ বলেন, 'কোন বাহন পাই না যাহাতে তোমাদিগকে আরোহণ করাইব' আর "আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইব না' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। যদিও আশায়েরীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নেতিবাচক জবাব দিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, বাহনের জন্য আবদার করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'না' করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন- لا احملكم তোমাদিগকে বহন করাইতে পারিব না। বরং কোন কোন রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কসম করার কথাও বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে- রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন- আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদিগকে বহন করাইব না। যাহা হউক, উপরিউক্ত বর্ণনাবলী হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে কোন বাহনই বিদ্যমান ছিল না। (হইতে পারে) যে, প্রার্থীরাও বাহন না থাকার কথা জানিতেন এবং তথাপিও বাহনের জন্য যিদ ও একগুঁয়েমি প্রকাশ করায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কঠোর ভাষা প্রয়োগ এবং কসম করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এই

www.pathagar.com

অবস্থা হাদীসে বর্ণিত অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবে। যেরূপ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বলা হইয়াছে।

এই মিসকীন বান্দা (লেখক) বলিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখে 'না' শব্দ উচ্চারিত না হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, কৃপণতা ও হীনমন্যতাকে তাঁহার সম্মানিত স্বভাব হইতে নিষেধ করা। বস্তুতঃ কৃপণ হীনমনা ব্যক্তিরা যেইরূপ করিয়া থাকে, তিনি তদ্রূপ কখনও করিতেন না। এই বাক্যটিতে এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, এই বাক্য তাঁহার পবিত্র মুখে অন্য কোন উদ্দেশ্যেও উচ্চারিত হয় নাই।

তাঁহার সম্বন্ধে রিওয়ায়াতকৃত বক্তব্য– যে কেহ যাহা কিছু প্রার্থনা করিত তিনি উহা দান করিতেন– ইহার উদ্দেশ্য হইল তাঁহার স্বভাবের মধ্যে বদান্যতা ও দানশীলতাকে প্রমাণিত করা। কেননা, যাহা কিছু প্রার্থনা করা হইবে, তিনি তাহাই দিয়া দিবেন ইহার প্রকৃত অর্থ হইল, সেই ব্যক্তি যাহা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত তিনি তাহাকে উহাই দান করিতেন। এমনও হইত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রার্থীর কল্যাণ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রার্থিত দ্রব্য দান করা সমীচীন মনে না করিলে দান করিতেন না। বস্তুতঃ চাকুরী ও রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব শুধু আবেদনের প্রেক্ষিতে দান করিতেন না। যার ফলে মুসলমানগণের কার্যাবলী পরিচালনার সুষ্ঠুতা বিঘ্নিত হয়। আরও কোন কোন সময় নেতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতেন যাহাতে প্রার্থী লোভের বশবর্তী হইয়া ভিক্ষা চাহিবার ন্যায় অপমানজনক স্বভাবের শিকার না হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ সাহাবী হাকিম ইব্ন হিযামের কথা উল্লেখ করা যায়। ইব্ন হিযাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারের একজন যোগ্য সাহাবী এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর ভগ্নীপুত্র ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা মনযূর করিলেন না; অধিকন্তু বলিলেন– আমি নিজে হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারিতাম। কিন্তু উক্ত দানের সহিত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টতাও তোমাকে দেওয়া হইত। তাঁহাকে আরও উপদেশ দান করিলেন যে, যতদূর সম্ভব কাহারও নিকট কিছু চাহিও না। বর্ণিত আছে যে, ইহার পর ইব্ন হাযামের অবস্থার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল তিনি এমনকি যদি তাঁহার হাত হইতে ঘোড়ার চাবুকটি পর্যন্ত মাটিতে পড়িয়া যাইত, তাহার জন্য কাহাকেও বলিতেন না– উহা উঠাইয়া দাও।

অনুরূপ হযরত আবূ যার গিফারী (রা) কোন চাকুরী পাওয়ার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলেন, হে আবূ যার! তুমি দুর্বল এবং কর্মে অক্ষম। চাকুরীর আশা করিও না এবং কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিও না। এমনকি তোমার চাবুকও যদি মাটিতে পড়িয়া যায় উহাও কাহারও নিকট উঠাইয়া দিতে চাহিও না। হযরত আবূ যার গিফারী (রা) সংযমী, ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠতম সাহাবীগণের অন্যতম একজন ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও সংযম ছিল অতুলনীয় এবং তাঁহার রীতি ও ধারণা অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ এবং গুদামজাত করা হারাম ছিল। এমনকি যাকাত দেওয়া হইলেও।

অপর এক হাদীসে আসিয়াছে, এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন জিনিস একটি দলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তির অবস্থা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞাত ছিলেন। সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশকল্পে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার জানা মতে এই ব্যক্তি মু'মিন। উমর (রা)

www.pathagar.com

একই বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করিলেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিলেন, এইরূপ অনেকেই আছেন যাহাদিগকে আমি ভালবাসিয়া থাকি। অথচ আমি ঐ ব্যক্তিকে কিছুই দিব না। কেননা, এই না দেওয়ার মধ্যেই তাহার জন্য মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি। কোন কোন বর্ণনায় হযরত উমরের বক্তব্যে 'মু'মিন' স্থলে 'মুসলিম' শব্দ বলা হইয়াছে। একাধারে তিনবার বলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপ বলিয়াছিলেন। এই স্থলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাবকে আল্লাহ্ তা'আলার স্বভাবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন বান্দাকে বন্ধুত্বের অনুগ্রহ দান করেন, তাহা হইলে তাহাকে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত রাখেন এবং যাহাকে প্রিয় মনে না করেন, তাহাকে প্রচুর পার্থিব ঐশ্বর্য দান করেন।

উপরিউক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতিবাচক জবাবে এমনও হইতে পারে যে, এতদুদ্দেশ্যে তিনি 'না' শব্দ উচ্চারণ করেন নাই, বরং অন্য কোন বাক্যে বা শব্দে উহা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এতদস্থলে ভাব এবং অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখাই বাঞ্ছনীয়; শব্দের প্রতি নহে।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করিতেন না। এমনকি নিজের কাছে না থাকিলেও বলিতেন– আমার নাম করিয়া ঋণ গ্রহণ কর। যখন আমার নিকট কোন অর্থ আসিবে তখন উহা পরিশোধ করিয়া দিব। একবার এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে তিনি বলিলেন, আমার নিকট তো কিছু নাই। আমার নাম করিয়া কর্জ গ্রহণ কর। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে বিষয় আপনার ক্ষমতায় নাই উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাকে কষ্ট প্রদান করেন নাই। হযরত উমর (রা)-এর এই কথায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর জনৈক আনসার আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যথেষ্ট দান-খয়রাত করুন এবং আরশের মালিকের তরফ হইতে কোন প্রকার সংকীর্ণতার ভয় করিবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) স্মিত হাস্য করিলেন। এমনকি তাহার মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ইরশাদ করিলেন, আমাকে এইরূপ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নব্বুই সহস্র দিরহাম আনয়ন করা হয়। তিনি উহা চাটাইয়ের উপর রাখিয়া বিতরণ আরম্ভ করেন। এমনকি কোন প্রার্থীই বাকী রহিল না। পরিশেষে একটি দিরহামও অবশিষ্ট রহিল না।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে, একবার বাহ্‌রায়ন হইতে কিছু মালামাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়। তিনি উহা মসজিদে রাখিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর যখন নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমন করেন, তখন মালগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর নামায সমাপন করণান্তে উক্ত মালের কাছে আগমন করেন এবং প্রত্যেককে দান করিতে থাকেন। হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) আসিয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে কিছু দান করুন। কেননা, আমি বদরের যুদ্ধের বন্দী হিসাবে নিজের এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে এত অধিক পরিমাণে দান করিলেন যে, তাঁহার বস্ত্র ভরতি হইয়া গেল। যাহা তিনি একাকী বহন করিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কাহাকেও বলিয়া দিন যেন সে আমার পক্ষ হইতে ইহা বহন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ও চাচা! আপনি নিজে যতটুকু বহন করিতে সক্ষম হন ততটুকু লইয়া যান।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল হযরত আব্বাস (রা)-এর লোভকে সম্বরণ করাইতে এবং তাঁহার চরিত্রকে সুন্দর ও সুসভ্য করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর হযরত আব্বাস (রা) নিজ স্কন্ধে মালামাল বহন করিয়া লইয়া যান আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তাঁহার লোভের আধিক্য দর্শনে বিস্মিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বন্টন সমাপ্ত করিলেন, তখন একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিল না।

ইব্ন আবী শায়বার রিওয়ায়াতে আছে, উক্ত মালের পরিমাণ ছিল এক লাখ দিরহাম– যাহা আলা ইব্ন হাযরামী বাহরায়নের খাযনা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে প্রেরিত সর্বপ্রথম মালামাল।

হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দানশীলতা, বদান্যতা ও দয়ার যে বিকাশ ঘটিয়াছিল উহা ছিল কল্পনা বহির্ভূত। উক্ত দিবসে তিনি প্রত্যেক আরবীয়কে শত শত উষ্ট্র ও সহস্র সহস্র ছাগ দান করিয়াছিলেন। দানের এই প্রাচুর্য ছিল দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পার্থিব সাহায্যের মাধ্যমে তাহাদের হৃদয়কে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবংবিধ প্রচুর দান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাও এই শ্রেণীর এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে প্রথমে একশত ছাগ দান করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে একশত একশত করিয়া পুনরায় দুইশত ছাগ দান করা হয়। ওয়াকিদী প্রণীত কিতাবুল মাগাযীতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন উষ্ট্র ও ছাগীতে সাফওয়ানের ময়দান ভরিয়া গিয়াছিল। অতঃপর সাফওয়ান (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে দান ও অনুগ্রহ প্রদর্শনে অধিক সাহসী ব্যক্তিত্বের পরিচয় আর কেহ দিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে উক্ত অনুগ্রহ দ্বারা তাঁহার অন্তরের কুফরীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন উহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ও এই 'দুর্বলমনা'দের মধ্যে ছিলেন। আবূ সুফিয়ান আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অদ্যকার দিবসে কুরায়শদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মালদার ব্যক্তি আপনিই; সুতরাং উক্ত মাল হইতে আমাদিগকেও কিছু দান করুন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্মিত হাস্য করিলেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাঁহাকে চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য এবং একশত উষ্ট্র দিয়া দিতে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পুত্র ইয়াযীদকেও কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপ পরিমাণ তাঁহাকেও দান করিতে নির্দেশ দিলেন। সুফিয়ান পুনরায় আরয করিলেন, আমার দ্বিতীয় পুত্র মুআবিয়াকেও কিছু দেওয়া হউক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সমপরিমাণ দান করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবূ সুফিয়ান (রা) বলিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক। আল্লাহ্র কসম, যুদ্ধের সময়ও আপনি দয়ালু, শান্তির সময়ও আপনি তাহাই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইহার উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উল্লেখযোগ্য যে, আবূ সুফিয়ান (রা)-এর এক পুত্রের নাম ইয়াযীদ ছিল। তদুপরি মুআবিয়া (রা)ও স্বীয় পুত্রের নাম ইয়াযীদ রাখিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনা হাওয়াযিন ও হুনায়নের যুদ্ধের বর্ণনায়ও আসিবে– যাহা মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হইয়াছিল। অথচ বারংবার বর্ণনায়ও এইগুলি পুনরাবৃত্তির দোষে দূষণীয় হইবে না; কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদান্যতার ঘটনাবলী মৃগনাভির মত। উহা যতই উন্মোচিত করা হইবে ততই সুঘ্রাণ ছড়াইবে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিন যুদ্ধের সময় পরাজিতদের ছয় সহস্র দাসীকে ফেরত দিয়া দেন। এই যুদ্ধের মালে গনীমতের সমষ্টি ছিল ছয় সহস্র দাসী, প্রায় চব্বিশ সহস্র উষ্ট্র, চল্লিশ সহস্র ছাগ এবং চারি সহস্র উকিয়া[১] রৌপ্য।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেন, হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ ধনমাল যে সকল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দান করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ সহস্র।

গ্রন্থকার বলেন- এই মিসকীন বান্দার মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দয়া ও বদান্যতা ছিল ধারণা ও কল্পনার অতীত। যাহা তিনি পাইয়াছিলেন কেবল তাহার উপরই তাঁহার দান সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ধরা যায় না; বরং উহা হইতে শত সহস্র গুণ বর্ধিত সম্পদরাশি থাকিলেও তাঁহার দানশীলতার দৃশ্য একই থাকিত।

প্রকৃতপক্ষে বদান্যতা, দানশীলতা, দয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কার্যতঃ দান করার কোন শর্ত নাই। এই গুণ প্রকৃতিগত ও জন্মগত। ইহার বিকাশের পক্রিয়াও ভিন্নরূপ। যাহা কিছু হস্তগত হয় উহা দান করিয়া দেন। এমনকি অভাবী ও নিঃসম্বল হইয়া যাওয়ার শংকায়ও শংকান্বিত হন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্বীয় আহার্য ও পানীয় তাহাকে দান করিয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দানের প্রকারভেদ ছিল। কাহাকেও হিবা করিয়া দিতেন, কাহারও কোন শরঈ কিংবা পার্থিব ঋণ থাকিলে উহা পরিশোধ করিয়া দিতেন। কখনও আবার সাদ্কা কিংবা হাদিয়া দিতেন। কখনও বা কাপড় ক্রয় করিতেন এবং উহার মূল্য পরিশোধ করতঃ কাপড়টিও বিক্রেতাকে দান করিয়া দিতেন। কখনও ঋণ করিতেন এবং অতিরিক্ত প্রদান করিতেন কিংবা জিনিস ক্রয় করতঃ উহার মূল্য হইতে অধিক অর্থ প্রদান করিতেন। কখনও হাদিয়া গ্রহণ করতঃ উহার কয়েকগুণ প্রতিদান দিতেন।

একদা এক স্ত্রীলোক একটি থালায় নরম রোয়া বিশিষ্ট সুপক্ব খর্জুর আনয়ন করতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। উক্ত খর্জুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুব পসন্দনীয় ছিল। প্রতিদানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহরায়ন হইতে সদ্য আগত স্বর্ণালংকার দ্বারা উক্ত মহিলার দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া বিদায় দেন।

মোটকথা, যেভাবেই সম্ভব হইত রাসূলুল্লাহ্ (সা) দান-খয়রাত করিয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি নিজে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। এমনকি এক এক বা দুই দুই মাস পর্যন্ত তাঁহার চুল্লিতে অগ্নি জ্বলিত না। ক্ষুধার তাড়নায় স্বীয় মুবারক পেটে প্রস্তরখণ্ড বাঁধিতেন। ইহা নবী (সা)-এর দারিদ্র, অভাব-অনটন কিংবা অক্ষমতার কারণে ছিল না; বরং সংযম, ত্যাগ ও দানশীলতাই ছিল ইহার কারণ। কোন কোন সময়ে পবিত্রা স্ত্রীগণের সংবৎসরের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া নিজে রিক্তহস্ত হইয়া থাকিতেন।

নবী করীম (সা) বনী আদমের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দয়ালু ছিলেন। বস্তুত তিনি সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক। দীনের বিকাশ ও বান্দার হিদায়াতের জন্য স্বীয় জানমাল ও জ্ঞান সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছেন।

---

১. এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম এবং এক দিরহাম সাড়ে তিন কিংবা সোয়া চার মাশা।

www.pathagar.com

বীরত্ব, শক্তি ও বাহুবল

আরবী অভিধান সুরাহ্-তে ভীতিজনক স্থানে সাহসিকতা প্রদর্শনকে شجاعت (শাজা'আঃ) বলা হইয়াছে। যাহাকে বাংলায় বীরত্ব বলা হয়।

'শিফা'-তে ক্রোধ-শক্তির আধিক্য এবং বিবেকের নির্দেশের বশ্যতা স্বীকারকে শাজা'আত বলা হইয়াছে।

'কামূসে' ভয়ের সময় অন্তরকে সুদৃঢ় রাখাকে শাজা'আত বলা হইয়াছে। নবী আকরাম (সা)-এর মধ্যে এই গুণও দানশীলতার গুণের ন্যায় পূর্ণতর ছিল। এমন অনেক কঠিন ও কষ্টকর স্থানে যখন বীরপ্রবর এবং সাহসী ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত পলায়ন করিত–এহেন স্থানে পর্যন্ত নবী আকরাম (সা) সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। এহেন অবস্থায়ও তিনি স্বীয় অবস্থান ত্যাগ কেবলমাত্র ঐ কারণেই করিতেন–যে কারণ ছিল সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ কেবল সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্তেই স্থান ত্যাগ করিতেন– পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্যে নহে।

হুনায়নের যুদ্ধের সময় কাফিরদের তীর বর্ষণের দরুন সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে এক প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানী সৃষ্টিতে রণাঙ্গনের অবস্থা টলটলায়মান হইয়া পড়ে। সকলেরই মধ্যে যখন পশ্চাদপসরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, তখন পর্যন্ত নবী (সা) এক বিন্দু পরিমাণও স্থানচ্যুত হন নাই। ঐ সময় তিনি খচ্চরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন এব আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ (রা) উহার লাগাম ধরিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। নবী (সা) লড়াই চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন বিধায় তিনি খচ্চর হইতে অবতরণ করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করতঃ এক মুষ্টি মাটি লইয়া শত্রুপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন কাফিরদের মধ্যে এইরূপ একজনও ছিল না যাহার চক্ষু উক্ত মৃত্তিকায় ভরিয়া না গিয়াছিল। নবী (সা) সেই সময় এইরূপ বীরত্বগাথা গাহিতেছিলেন –

انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب

–আমি যে নবী উহা মিথ্যা নয়–আমি যে আবদুল মুত্তালিব তনয়।

উক্ত দিবসে তাঁহার চাইতে বড় বীর, সাহসী ও নির্ভীক অপর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

বর্ণিত আছে, উক্ত দিবসে মুসলিম ও কাফিরসেনা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার পর এক সময় মুসলিম সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করেন। তখন নবী (সা) একাকী শত্রু বাহিনীর প্রতি আক্রমণ চালান। সেই সময়ে আবূ সুফিয়ান (রা) নবী (সা)-এর সওয়ারীর রেকাব ধারণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পর তিনি আনসারগণকে আহ্বান জানান। এই আহ্বানে মুসলিম বাহিনী পুনরায় নবী (সা)-এর চতুষ্পার্শে সমবেত হন। পরিশেষে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেন। ইনশা আল্লাহ্ যথাস্থানে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেশ করা হইবে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অধিক সাহসী, নির্ভীক, দাতা, আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত আলী (রা) বলেন, যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং উহা চরমে পৌঁছে, তখন আমরা নবী (সা)-এর আশ্রয় অনুসন্ধান করিতাম এবং তাঁহার আশ্রয়ে চলিয়া আসিতাম। নবী (সা) ব্যতীত অপর কেহ শত্রুদলের সন্নিকটে যাইতে সাহস পাইত না। তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন সর্বাধিক কঠোরতম ব্যক্তি।

www.pathagar.com

সীরাত গ্রন্থকারগণ বলিয়াছেন, লোকেরা ব্যক্তিকে বীর বলিয়া গণ্য করিত, যে ব্যক্তি শত্রুর মুকাবিলার সময়ে নবী (সা)-এর সঙ্গে থাকিতেন।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম এমন কোন যোদ্ধা ছিল না, যাহার উপর নবী (সা) আক্রমণ করেন নাই।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

কোন এক রাত্রে মদীনা শরীফের অজ্ঞাত কোন স্থান হইতে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাইতেছিল। ফলে মানুষের মনে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে, হয়ত তস্কর কিংবা শত্রু মদীনায় প্রবেশ করিয়া থাকিবে। গোলমালে নবী (সা)-ও জাগ্রত হন। তিনি শয্যা ত্যাগ করতঃ তরবারি গ্রহণ করেন এবং হযরত আবূ তালহা (রা)-এর অতি ক্ষীণ ও ধীর গতিসম্পন্ন অশ্বে আরোহণ পূর্বক শব্দের লক্ষ্যস্থলে রওয়ানা করেন। তিনি প্রত্যাবর্তনকালে পরে যাহারা শব্দের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন তাহাদের সহিতও সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। প্রকৃতপক্ষে কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই।

ধীরগতিসম্পন্ন আবূ তালহা (রা)-এর অশ্বটিতে নবী (সা) আরোহণ করায় ইহার গতি দ্রুততর হইয়া যায়। এমনকি আর কোন অশ্বই উহার ন্যায় দ্রুত ধাবিত হইতে কিংবা উহার সমকক্ষ হইতে সক্ষম হইত না। ইহাও নবী (সা)-এর একটি ম'জিযা ছিল। কেননা, নবী (সা) যাহাকে শক্তি ও মদদ জোগাইতেন, সে যতই দুর্বল, অলস, অক্ষম হইত না কেন, সে এমনি শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী ও কর্মক্ষম হইয়া যাইত যে, আর কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে কিংবা প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইত না।

নবী (সা) শক্তি, বাহুবল ও দৃঢ়তার দিক হইতে এমন ছিলেন যে, সারা দুনিয়ার কুশতীগীরেরাও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক তাঁহার কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় রুকানা নামক একজন শক্তিশালী, অতুলনীয় কুশতীগীর ও অনন্যসাধারণ এক বীর ছিল। দেশের দূর-দুরান্ত হইতে বড় বড় কুশতীগীরগণ তাহার সহিত লড়িতে আসিত। কিন্তু সে সকলকেই অবলীলাক্রমে পরাজিত করিত। একদিন সে মক্কার কোন এক ঘাঁটি হইতে নবী আকরাম (সা)-এর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। নবী (সা) তাহাকে বলিলেন, ওহে রুকানা! আল্লাহ্কে কেন ভয় কর না এবং কেনই বা আল্লাহ্র দাওয়াত কবূল করো না ? রুকানা বলিল—হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি এমন কোন বস্তু আনয়ন কর যাহা তোমার বক্তব্যের সাক্ষ্য দিবে ?

নবী (সা) বলিলেন, আমি যদি তোমাকে কুশতীতে হারাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কি তুমি ঈমান আনয়ন করিবে ? রুকানা বলিল হাঁ।

নবী (সা) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি কুশতীর জন্য প্রস্তুত হও।

অনন্তর রুকানা কুশতী লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। পক্ষান্তরে নবী (সা) স্বীয় সাধারণ তহবন্দ ও চাদর পরিহিত অবস্থায়ই রহিলেন। রুকানা সম্মুখে অগ্রসর হইলে নবী (সা) তাহার বাহু আকর্ষণ করতঃ মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। রুকানা ইহাতে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং নবী (সা) যাহাতে তাঁহার বাহু ছাড়িয়া দেন সেইরূপ ইচ্ছা করিল। ইহার পর সে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার কুশতী লড়িল, কিন্তু প্রত্যেক বারই নবী (সা) তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিলেন।

www.pathagar.com

ফলে রুকানা অবাক হইয়া গেল এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, আপনার অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক।

ইহার পর রুকানা ঈমান আনয়ন করিয়াছিল কিনা, হাদীসে সে বিষয়ে উল্লেখ নাই।

নবী আকরাম (সা) রুকানা ছাড়াও অনেকের সহিত কুশতী লড়িয়াছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি জয়ী হইয়াছেন। জানা যায়, তদানীন্তনকালে আবুল আসাদ হাজমী নামে জনৈক পাহলোয়ান ছিল। সে একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াইত এবং মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া উহা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু চামড়া ছিন্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহা বাহির করা সম্ভব হইত না। এমনকি তাহাকে স্থানচ্যুত করাও সম্ভব হইত না।

একদা সে নবী (সা)-কে তাহার সহিত কুশতী লড়িতে আহ্বান জানায় এবং বলে, যদি মুহাম্মদ (সা) আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব। অনন্তর নবী (সা) তাহাকে মাটির উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু তথাপি সে ঈমান আনয়ন করে নাই। কাহিনীটি অনেক দীর্ঘ। আমরা যথাস্থানে উহার বর্ণনা করার আশা রাখি।

নবী (সা)-এর লজ্জা

حياء শব্দের অর্থ লজ্জা বা লজ্জা করা। ইহা حية ধাতু হইতে উদ্গত। হায়াত অর্থ বৃষ্টি বা বারিপাত। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, বৃষ্টি হায়াত বা জীবনের হেতু। ইহা ছাড়া হায়াত আত্মা বা প্রাণকেও বলা হয়। যাহার আত্মা যত বেশী উজ্জীবিত তাহার হায়া বা লজ্জাও অধিক হইয়া থাকে।

হায়ার আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন এবং নম্রতা—যাহা ভীতি ও আতংকের দরুন এবং দূষণীয় কর্ম করার দরুন মানুষের অন্তরে উৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কখনও সাধারণভাবে কোন বস্তুকে কোন কারণবশতঃ ত্যাগ করাকেও হায়া বলা হইয়াছে।

শরীঅতে হায়া বলিতে এমন এক চরিত্রকে বুঝানো হইয়াছে, যেই চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত কারণে মন্দ কার্য হইতে বিরত থাকিতে পারে এবং প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধে ত্রুটি হইতে রক্ষা পায়। ইহা ছাড়া শরীঅতে হায়া বা লজ্জাশীলতাকে ঈমান (ঈমানের অংশ) বলা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে الحياء من الايمان। (লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ)। বস্তুতঃ যদিও ইহা স্বভাব বা প্রকৃতিগত, তথাপি ইহার প্রয়োগ পদ্ধতি শরীঅতের বিদ্যার্জনের উপর নির্ভরশীল।

কেহ কেহ হায়া বা লজ্জাশীলতা একটি অর্জনশীল গুণ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং শরীঅত প্রবর্তক ইহাকে ঈমানের অঙ্গ বলিয়াছেন এবং তাহা অনুশীলন করার জন্য মুসলমানদিগকে কঠোর নির্দেশ দান করিয়াছেন। আর যদি ইহা প্রকৃতি ও স্বভাবগতই হইত, তাহা হইলে উক্ত স্বভাব অর্জনের জন্য নির্দেশ দেওয়া সঠিক কাজ প্রতীয়মান হইত না। কিন্তু যাহার স্বভাবের মধ্যে এই গুণ স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান, তাহার পক্ষে উক্ত গুণে পূর্ণতা অর্জন সহজতর হইবে এবং ক্রমান্বয়ে উহা স্বভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। বস্তুত সর্বপ্রকার স্বভাবগত গুণাবলীর ক্ষেত্রেই এবংবিধ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হইবে। যেমন দানশীলতা, বীরত্ব ইত্যাদি। কেননা, ইহা অর্জনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে এবং ইহার বিপরীত কার্য হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রসঙ্গে ওয়াদা এবং ধমকিও প্রদান করা হইয়াছে। এইগুলিও ঈমানের অঙ্গ বটে। কেবল হায়া বা লজ্জার ক্ষেত্রেই নহে। বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য।

www.pathagar.com

নবী (সা)-এর মধ্যে উভয় প্রকারের হায়া বা লজ্জাই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। কেননা, তাঁহার পবিত্র আত্মার শরীঅত কর্তৃক নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার কর্ম হইতে বিরত থাকার ক্ষমতা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ছিল।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে নবী (সা)-এর লজ্জার পরিমাণ বুঝা যায়। হাদীসটিতে বলা হইয়াছে –

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياءا من العذراء فى خدرها

'রাসূলুল্লাহ্ পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।'

সুরাহ্তে পর্দানশীন মহিলাকে 'মুখাদ্দারা' বলা হইয়াছে। হাদীসটির মধ্যে সামাজিক প্রচলিত প্রথা ও স্বভাব অনুযায়ী فى خدرها উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, কুমারী মেয়েরা সাধারণত পর্দার অন্তরালে অবস্থান করে। (যদিও ইহা আকস্মিক শর্ত)।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পর্দনশীন কুমারী মেয়েরা গৃহাভ্যন্তরেই হউক কিংবা নির্জন প্রান্তরেই হউক, তাহাদের লজ্জা ঐ সকল মহিলা অপেক্ষা অধিক হয় যাহারা বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে। গৃহে অবস্থানের দরুন পর্দানশীন মহিলাদের লজ্জা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কেহ কেহ অবশ্য ভিন্ন ধরনের শর্তও আরোপ করিয়া থাকেন। উহা এই যে, যখন কোন ব্যক্তি নবী (সা)-এর সম্মুখে আগমন করিত, তখন তাঁহার চেহারায় লজ্জার ভাব পরিস্ফুটিত হইত এবং ইহা তাঁহার সৌন্দর্যেরই একটি রূপ ছিল। নতুবা পর্দার মধ্যে অবস্থান করাকালীন কোন লজ্জার কারণ থাকিতে পারে না। হইতে পারে যে, কাহারও কল্পনার রাজ্যে কোন চিন্তার উদয় হওয়ার ফলে তিনি সম্ভবতঃ নবী (সা) সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন। কেননা, এইরূপ কষ্টার্জিত বর্ণনার মধ্যে নবী (সা)-এর সুমহান স্তরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্ধিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপকারিতা নাই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক এইরূপ উপমা প্রয়োগ তাঁহার ন্যায় ভদ্র, রুচিজ্ঞান সম্পন্ন এবং সম্মানের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে দৃশ্যতঃ অসুন্দর। কিন্তু সম্ভবতঃ সুন্দররূপে লজ্জাশীলতা ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ অতিরঞ্জিত উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

রাসূলে পাক (সা)-এর লজ্জা সম্পর্কে মতামত বা মাযহাব

তরীকতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গদিগের মধ্যে নবী (সা)-এর লজ্জা বা হায়া-র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতিপয় বক্তব্য রহিয়াছে।

হযরত যুন্-নূন মিসরী (র) বলিয়াছেন, তোমার পক্ষ হইতে যাহা কিছু তুমি ভয় ও ভক্তি সহকারে পূর্বাহ্নে হক তা'আলার দরবারে পেশ করিয়াছ উহার অস্তিত্বের প্রভাব অন্তরে জাগরূক রাখার নামই হায়া বা লজ্জা।

الحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق – বাক্যটির মর্মার্থ হইল, ভালবাসা বন্ধুর প্রশংসা ও গুণ-গানের মাধ্যমে বন্ধুকে বাকশক্তি প্রদান করিয়া থাকে। আর লজ্জা বন্ধুর প্রাপ্যসমূহ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় নির্বাক করিয়া দেয় এবং ভীতি আরামহীন ও অশান্তিময় বানাইয়া দেয়।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয রাযী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি লজ্জাশীল হয়, আল্লাহ্ তা'আলাও তাহার গুণাহসমূহ হইতে লজ্জাশীল হন। এবং লজ্জা কখনও কখনও অনুগ্রহ ও ভীতি হইতে বাহিরে লইয়া আসে।

যেমন নবী আকরাম (সা)-এর উক্ত দলের প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করা –যাহারা হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে শরীক হইয়াছিলেন এবং পবিত্র দরবারে অবস্থানকে দীর্ঘতর করিতেছিলেন। অথচ নবী (সা) তাঁহাদিগকে বিদায় গ্রহণ করিতে বলায় লজ্জা করিতেছিলেন। এমনকি যদ্দরুন আল্লাহ্ পাক ওহী নাযিল করেন – فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا –যখন তোমরা খাদ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিয়াছ, তখন চলিয়া যাইতে থাকো এবং অতঃপর আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের দীর্ঘসময় পর্যন্ত অবস্থান করা নবী (সা)-কে কষ্ট দিয়া থাকে এবং নবী তোমাদের (উঠিতে বলিতে) লজ্জা করিয়া থাকেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

এতদ্ব্যতীত লজ্জা অনেক সময় বন্দেগীতে পরিণত হইয়া যায়। যেমন কেহ যদি মাবূদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার উপযুক্ত বন্দেগী করিতে সক্ষম হয় নাই ভাবিয়া লজ্জা পায়।

দ্বিতীয় প্রকারের হায়া বা লজ্জা নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। আর নানাবিধ প্রকারের লজ্জা অতীব ভদ্র ও সম্মানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পয়দা হইয়া থাকে। নিজেকে ছোট, তুচ্ছ এবং হেয় জ্ঞান করার মাধ্যমে উক্ত প্রকারের লজ্জার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেকেরই স্বীয় আত্মাকে লজ্জাশীল হিসাবে গড়িয়া তোলা উচিত, যাহাতে সে স্বীয় অস্তিত্বকে দেখিয়া লজ্জা পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেন তাহার দুইটি আত্মা আছে। যাহার একটি দর্শনে অপরটি লজ্জা পাইয়া থাকে। বস্তুত এই প্রকারের লজ্জা হইল সর্বপ্রকারের লজ্জা হইতে শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম লজ্জা। কেননা, কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় সত্তাকে দেখিয়া লজ্জা প্রদর্শন করিবে, তখন সে অপরের প্রতি অতি উত্তমরূপে লজ্জা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে।

নবী আকরাম (সা) বলিয়াছেন ঃ الحياء لا يعطى الا بخير –লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছু দান করে না।

অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে ঃ الحياء خير كله –লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর।

পবিত্র হাদীসে উক্ত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে লাযুক না হইবার উপদেশ দিত। কেননা, তাহার ভ্রাতা মানবের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে লজ্জা করিয়া কিছু চাহিতে পারিত না। নবী (সা) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংগ।

লজ্জাশীলতার নিদর্শন হইল, ঐ সকল বস্তু হইতে নির্লিপ্ত হওয়া এবং চক্ষু মুদ্রিত রাখা, যাহা মানুষ নিজের জন্য অপসন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে নবী আকরাম (সা) সর্বাপেক্ষা কঠোরতম ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে। একদা নবী (সা)-এর দরবারে এইরূপ এক ব্যক্তি আগমন করিল যাহার মুখে হলুদ মাখানো ছিল। যাহা যাফরান জাতীয় দ্রব্য এবং কোন স্ত্রীলোক হইতে লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি লজ্জা পাইবে বলিয়া নবী (সা) উহাকে কিছুই বলেন নাই। কেননা, তাঁহার পবিত্র স্বভাব এইরূপ ছিল যে, যে কথায় কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারে এ ধরনের কথা বলা হইতে তিনি বিরত থাকিতেন। যদি কাহাকেও কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেন কিংবা বলিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি বাহির হইয়া গেলে তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন যে, উহাকে বলিয়া দিও যেন উক্ত রং ধৌত করিয়া ফেলে।

অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন–উহাকে ঐ জামা খুলিয়া ফেলার কথা বলিও। প্রণিধানযোগ্য যে, ওয়াজিব অথবা হারামের মধ্যে যে সকল কার্য ও আচরণ অন্তর্ভুক্ত নহে, সেই সব ক্ষেত্রে এইরূপ বক্তব্য নবী (সা) কর্তৃক আরোপিত বলিয়া প্রযোজ্য হইবে। এতদসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, উক্ত হলুদ রং মুবাহ হওয়া সম্পর্কে রিওয়ায়াত আসিয়াছে।

বর্ণিত আছে, নবী আকরাম (সা)-এর লজ্জার অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি কাহারও মুখের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

যদি কাহারও মধ্যে এমন কোন কর্ম দেখিতে পাইতেন, যাহা তাঁহার নিকট অপসন্দনীয় বোধ হইত, তাহা হইলে এইরূপ বলিতেন না যে, ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে, যে এইরূপ করিয়াছে কিংবা এইরূপ বলিয়াছে–বরং বলিতেন, ঐ সম্প্রদায়ের কি অবস্থা হইবে, যাহারা এইরূপ বলিয়াছে কিংবা এইরূপ করিয়াছে। আর উহা করিতে বা বলিতে নিষেধ করিতেন। কাহারও নাম উল্লেখ করিতেন না। তাঁহার পবিত্র স্বভাবের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, নবী আকরাম (সা) অশ্লীল বাক্য বলিতেন না, কাহাকেও গালি দিতেন না, বাজারে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেন না এবং কখনও মন্দের প্রতিশোধে মন্দ বলিতেন না, বরং ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং অপরাধ ভুলিয়া যাওয়ার পথ অবলম্বন করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আস তাওরাত হইতে আখেরী নবীর নিদর্শনস্বরূপ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

স্নেহ, মমতা ও দয়া

নবী আকরাম (সা)-এর স্নেহ, মমতা ও দয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ –আপনাকে সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمٌ -

www.pathagar.com

–নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন তোমাদের মধ্য হইতেই এমন রাসূল যাঁহার নিকট তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া খুবই বেদনাদায়ক এবং যিনি তোমাদের অত্যন্ত কল্যাণকামী এবং মু'মিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। (সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

'শাফকা'ত বলিতে অনুগহ বুঝায় এবং নবী (সা)-এর এক নাম শফীক বা অনুগ্রহকারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইশ্ফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভয় পাওয়া এবং 'শাফকাত' -এর মধ্যেও এই অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, অনুগ্রহকারীর এই ভয় থাকে যে, কাহারও যেন কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা না হয়। এই কারণে নবী (সা)-এর প্রশংসায় হির্স (অতীব আকাঙ্ক্ষাকারী) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কেননা, তিনি সংশোধন উপযোগী ব্যক্তিকে সংশোধন করার আকাংখায় উপদেশ দান করিতেন। অধিক দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনকে রা'ফাত বলা হয়। সুরাহতেও রহমত -এর অর্থ ক্ষমা করা ও অনুগ্রহ আসিয়াছে এবং 'রা'ফাত'-এর অর্থ অধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া বলা হইয়াছে।

নবী আকরাম (সা)-এর স্বীয় উম্মতের প্রতি পরম অনুগ্রহের নিদর্শন হইল, শরীঅতের হুকুম-আহকামকে লঘু করিয়া দেওয়া এবং পাছে ফরয হইয়া পড়ে এইরূপ আশংকায় অনেক আহকামকে তরক করা। যেমন প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করা এবং ইশার নামায বিলম্বে আদায় করাকে তরক করা। একাধারে (নফল) রোযা রাখা পরিহার করা। অনুরূপ অন্যান্য আহকাম। আর গালি বর্ষণকারীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এইরূপ প্রার্থনা করা যে, তাহার গালি ও অভিশাপকে রহমত, নৈকট্য ও পবিত্রতায় পরিণত করিয়া দাও।

একদা কোন এক জামাআতের নামাযের সময় তিনি শিশুর কান্না শুনিতে পান এবং শিশুর মাতা জামাআতে ছিলেন–এজন্য তিনি দ্রুত নামায শেষ করেন। ইরশাদ করেন–আমার নিকট তোমাদের কেউ এমন কিছু যেন না পৌঁছায় যাহা অপসন্দনীয় হয়। কেননা, আমার সব চাইতে প্রিয় বস্তু হইতেছে, যখন আমি তোমাদের সহিত মিলিত হই তখন যেন আমার হৃদয় পবিত্র এবং নির্মল থাকে।

কুরায়শগণ যখন নবী (সা)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে লাগিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সকল পাহাড় যাহার নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় রহিয়াছে সেই ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাহা নির্দেশ দিবেন তুমি তাহাই মান্য করিবে।

অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আরয করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যাহা চাহেন আমাকে তাহাই নির্দেশ করুন। আপনি যদি চাহেন তাহা হইলে 'আখবাশায়ন' নামক পাহাড়দ্বয় আনিয়া উহাদের উপর চাপা দিই। আখবাশায়ন মক্কার দুই বৃহৎ পাহাড়ের নাম, যাহার মধ্যস্থলে মক্কা নগরীর বসতি অবস্থিত।

নবী (সা) বলিলেন, আমি চাই না যে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। আমি আশা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের বংশধরদের মধ্য হইতে এমন লোক পয়দা করিবেন, যাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। –ইহা এক মস্তবড় কাহিনী, যাহা সীরাতের গ্রন্থসমূহে নুবুওয়াতের দ্বিতীয়বর্ষের ঘটনায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) আরয করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন এবং সকল পাহাড়কে হুকুম দিয়াছেন উহারা আপনার আনুগত্য করিবে এবং আপনি যাহা আদেশ করিবেন উহারা পালন করিবে। আপনার নির্দেশে আপনার শত্রুদিগকে নিধন করিবে। নবী (সা) জবাবে বলিলেন, আমি ধৈর্যধারণ করা এবং স্বীয় উম্মতের উপর শাস্তি বিলম্বিত করাকে পসন্দ করি। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন কিংবা তাহাদিগকে ক্ষমা করতঃ তাওবা করার সুযোগ দান করিতে পারেন।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নবী (সা)-কে দুইটি বস্তুর মধ্য হইতে যে কোন একটি বস্তুকে গ্রহণের ইখতিয়ার ব্যতীত আর কোন ইখতিয়ার দেওয়া হয় নাই। অবশ্য এই বাক্যের বহু অর্থ ও অনেক বিশ্লেষণ রহিয়াছে। উহার সুস্পষ্ট ও সহজতর ব্যাখ্যা হইল এই যে, যাহা উম্মতগণের জন্য সহজতর হইত নবী (সা) উহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, নবী (সা) অঙ্গীকার করিতেন এবং আমাদিগকে উপদেশ গ্রহণ ও নসীহত শ্রবণের জন্য মাঝে মাঝে প্রস্তুত রাখিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ কাজই যাহাতে উম্মতের জন্য কষ্টকর না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য সকল সময় না করিয়া মাঝে মাঝে করিতেন।

নবী (সা)-এর পূর্ণ বিশ্বাস, সুন্দর অঙ্গীকার, আত্মীয়তা রক্ষা ও আর্তের সেবা

নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে মানুষকে বিশ্বাস করা, সুন্দর অঙ্গীকার করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা, রোগীর সেবা-পরিচর্যা করা এবং পূর্বস্মৃতি স্মরণ করার গুণগুলিও বিদ্যমান ছিল।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখনই কেহ কোন উপঢৌকন লইয়া নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হইত, নবী (সা) বলিতেন, ইহা অমুক স্ত্রীলোকের নিকট লইয়া যাও। কেননা, সে হযরত খাদীজা (রা)-এর সখী।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি হযরত খাদীজা (রা)-এর সহিত যতটুকু হিংসা করিয়াছি আর কোন স্ত্রীলোকের সহিত এতটা হিংসা করি নাই। কেননা, নবী (সা) তাঁহাকে বেশী স্মরণ করিয়া থাকিতেন। যদি কখনও বকরী যবাহ্ করিতেন উহার গোশ্ত হইতেও খাদীজা (রা)-এর সঙ্গীদের জন্য গোশ্ত প্রেরণ করিতেন।

একদা একজন মহিলা নবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাহাকে অনেক আদর আপ্যায়ন করিলেন। মহিলাটি যখন চলিয়া গেল; তখন বলিলেন, এই মহিলা হযরত খাজীদা (রা)-এর সময় আমাদের নিকট আগমন করিত। অতঃপর বলিলেন, حسن العهد من الايمان –সুন্দর অঙ্গীকার ঈমানের অংশ। অর্থাৎ ভদ্রোচিত ব্যবহার করা ঈমানের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এক অন্যতম নিদর্শন।

নবী (সা) আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য ও সহায়তা করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে বেশি ত্যাগ ও সহায়তা করিতেন যাহারা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হইতেন এবং বলিতেন, 'অমুক পিতার সন্তান' আমার বন্ধু

www.pathagar.com

নহে। কোন কোন হাদীসে আছে, আল্লাহ্ ছাড়া এবং মু'মিনদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছাড়া আমার কোন বন্ধু নাই।

ইহা (এইরূপ ব্যবহার) আর কিছুই নহে। ইহাদের জন্য আমার মধ্যে যে অনুগ্রহ রহিয়াছে তজ্জন্য ইহাদের সহিত আমি নম্র ব্যবহার করিয়া থাকি। আসল কথা হইল, আমি তাহাদের জন্য সামান্যতম সহানুভূতিই প্রদর্শন করিয়া থাকি। উহা যেন কাহারও মুখে পানি ছিটা দেওয়ার মত। 'অমুক পিতার সন্তান' বলিতে সম্ভবত ইব্‌ন আবূল আসকে বুঝানো হইয়াছে। এই ধারণা এজন্য করা হইয়াছে যে, উক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সকলেরই জানা আছে।

নবী (সা) উমামা বিন্‌ত যয়নবকে কোলে লইতেন। নামাযের সময় স্বীয় পবিত্র কাঁধে বসাইয়া লইতেন। যখন সিজদায় যাইতেন, তখন নামাইয়া রাখিতেন। পুনরায় দাঁড়াইবার সময় কাঁধে উঠাইয়া লইতেন। নবী (সা) সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহ ও মমতা রাখিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন।

উমামাকে কাঁধে উঠাইয়া লওয়া এবং সিজদার সময় নামাইয়া দেওয়া ইহা নবী আকরাম (সা) স্বেচ্ছায় করিতেন না; বরং উমামা নিজেই আসিয়া নবী (সা)-কে জড়াইয়া ধরিতেন এবং যখন নবী (সা) সিজদায় যাইতেন, তখন তাঁহাকে মাটিতে নামাইয়া দিতেন। তবে কাহারও এই কথা বলার অবকাশ নাই যে, এই কর্ম নবী (সা)-এর নামাযের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। আরও প্রকাশ থাকে যে, এই কর্ম নফল নামাযের মধ্যে হইয়াছিল।

হযরত কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দল আগমন করেন, তখন নবী (সা) দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানান এবং স্বয়ং তাহাদের সেবা-যত্নের ভার গ্রহণ করেন। সাহাবাগণ আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরাই তো উপস্থিত আছি। মেহমানদের সেবা-যত্নের ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিন। নবী (সা) বলেন, ইহারা আমার সাহাবীদের সেবা ও সম্মান করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিদানে আমি নিজে ইহাদের সেবা-যত্ন করিতে পসন্দ করি। এই ঘটনা নম্রতার অধ্যায়েও ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে অপর একটি ঘটনাও প্রণিধানযোগ্য। শায়মা নাম্নী নবী (সা)-এর এক দুধ-ভগ্নী ছিলেন। তিনি স্বীয় মাতা হালীমার সহিত নবী (সা)-এর সেবাযত্নে সাহায্য করিতেন। মাতার সহিত তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 'ইবনুল আছীর' তাঁহাকে মহিলা সাহাবী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন হাওয়াযিন যুদ্ধের বন্দিনী হিসাবে তিনি নবী (সা)-এর দরবারে আনীত হন এবং তিনি নবী (সা)-এর নিকট স্বীয় পরিচয় দান করেন, তখন নবী (সা) স্বীয় চাদর মুবারক তাঁহার উপবেশনের জন্য বিছাইয়া দেন। অতঃপর ইরশাদ করেন, যদি আমার নিকটে থাকা তোমার পসন্দনীয় মনে হয়, তবে ইয্‌যত ও সম্মানের সহিত আমার নিকটে থাকিতে পারিবে। মাল-সম্পদেও তোমার অধিকার স্বীকৃত হইবে। আর যদি তুমি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যাইতে মনস্থ কর, তাহাও যাইতে পার।

অতঃপর তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নবী (সা) তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনসহ তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন।

আবূ তুফায়েল (রা) বর্ণনা করেন, আমার শৈশব অবস্থায় আমি নবী (সা)-কে দেখিয়াছি যে, একদা এক মহিলা আগমন করেন এবং নবী (সা) তাঁহার সম্মানে স্বীয় চাদর মুবারক বিছাইয়া দেন। মহিলাটি সেই চাদরোপরি উপবেশন করেন।

www.pathagar.com

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে ? সাহাবিগণ বলিলেন, ইনি নবী (সা)-এর দুগ্ধ-মাতা। উল্লেখ্য যে, ইনি ছিলেন বিবি হালীমা।

ইব্‌ন আবদুল বার্ স্বীয় কিতাব 'ইস্‌তিয়াব'-এও উক্ত মহিলাকে হালীমা উল্লেখ করিয়াছেন তবে আলিমগণ এইরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সা)-কে যে আটজন মহিলা দুগ্ধপান করাইয়াছেন উল্লিখিত মহিলা সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই একজন হইবেন। (আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।)

আমর ইব্‌ন সাইয়্যব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বসিয়াছিলেন। এমন সময় নবী (সা)-এর দুগ্ধ-পিতা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নবী (সা) তাঁহার জন্য স্বীয় চাদর মুবারক বিছাইয়া দিলেন এবং তিনি উহাতে উপবেশন করিলেন। ইহার পর তাঁহার দুগ্ধ-মাতা আগমন করেন এবং তাঁহার জন্যও তিনি বস্ত্রের এক অংশ বিছাইয়া দেন। মহিলা উহার উপর উপবেশন করেন। অতঃপর তাঁহার দুগ্ধভ্রাতা আগমন করিলে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং তাঁহাকে স্বীয় সম্মুখে উপবিষ্ট করান।

নবী আকরাম (সা) আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়ায়বাকেও আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্রাদি নযরানা প্রেরণ করিতেন। কেননা, তিনিও নবী (সা)-কে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। ছুওয়ায়বার মৃত্যুর পর নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-তাহার কোন নিকটাত্মীয় আছে কি-না ? কিন্তু তখন তাহার কোন আত্মীয় অবশিষ্ট ছিল না।

হযরত খাদীজা (রা) বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب

المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق (صلى الله عليه وسلم) -

-হে আমার মাথার মুকুট! আপনার মঙ্গল হউক। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত করিবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, ইয়াতীমদের ভার বহন করেন, দরিদ্রদের রোযগারের ব্যবস্থা করেন, অতিথির আপ্যায়ন করেন এবং সত্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।)

নবী (সা)-এর সুবিচার, আমানতদারী, পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা

নবী আকরাম (সা) শ্রেষ্ঠ সুবিচারক, আমানতদার, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও সত্যবাদী ছিলেন। এই কথা শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করিত। নুবুওয়াত লাভের পূর্বেই এই জন্য তিনি 'আল-আমীন' নামে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র উপাধি আল-আমীন এই জন্য প্রদান করা হইয়াছিল যে, তাঁহার মধ্যে সৎ চরিত্র বিষয়ক সকল গুণের সন্নিবেশ ঘটানো হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ -এর তাফসীরে অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, আয়াতটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হইয়াছে। শিফা-তেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদকে স্বস্থানে স্থাপনকে কেন্দ্র করিয়া যখন কুরায়শদের চারি গোত্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন সকলে এই কথার উপর ঐকমত্যে

www.pathagar.com

পৌঁছায় যে, প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে কা'বায় প্রবেশ করিবেন তিনি যে ফায়সালা করিবেন উহাই সকলে সন্তুষ্টির সহিত মানিয়া লইবে। পরদিবস সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বাগৃহে প্রবেশ করিলে সকলে বলিয়া উঠিল, ইনি তো মুহাম্মদ (সা); ইনি 'আমীন'। ইনি যে ফায়সালা করিবেন আমরা সকলে তাহা মানিয়া লইব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) (কলহের বিষয়টি শ্রবণ করতঃ) একটি চাদর আনাইলেন এবং পবিত্র প্রস্তরটি উহার মধ্যস্থলে রাখিলেন। অতঃপর চারি গোত্রের গোত্র-প্রধানগণকে চাদরটির চারি কোণে ধরিয়া বহন করিয়া লইতে বলিলেন এবং স্বহস্তে প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

এই ঘটনা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ঘটিয়াছিল। অতঃপর খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহ্রা (রা)-এর জন্মের বৎসরও যখন কুরায়শগণ তাঁহাকে সালিস ও বিচারক বানাইয়াছিল, তখন তিনি ইরশাদ করিয়াছিলেন–

والله انى لامين فى السماء امين فى الارض

'আল্লাহ্র কসম! আমি আসমানেও যেইরূপ বিশ্বাসী যমীনেও ঠিক তদ্রূপই বিশ্বাসী।'

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন, অভিশপ্ত আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিত, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করি না এবং তোমাকে মিথ্যুকও বলি না। আর তুমিও আমাদের কাছে মিথ্যা বলো না; কিন্তু আমরা তোমার ধর্মের ঐ সকল কথাকে মিথ্যা বলিয়া থাকি, যাহা তুমি আমাদের মধ্যে লইয়া আসিয়াছ।

বস্তুত তাহার এই কথা অর্থহীন, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। কেননা, উহারা যদি তাঁহার বক্তব্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্মের কথাকে বিদ্বেষ ও অহংকারবশত মিথ্যা বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ?

সেই সময় আল্লাহ্ পাক এই পবিত্র আয়াত নাযিল করেন–

فَاِنَّهُمْ لاَيُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

(আয় হাবীব)! নিশ্চয় ইহারা তোমাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে না; বরং এই যালিমরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে। (সূরা আনআম ঃ ৩৩)

এই পবিত্র আয়াতের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়া থাকে। বলা হইয়াছে যে, পরওয়ারদিগার বলিতেছেন– আয় মুহাম্মদ (সা)! কাফিরগণ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতেছে না; বরং যালিমেরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাক। ইহাদের প্রতিফল দান আমার উপর বর্তাইয়াছে। আমিই ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিব।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন কোন সম্প্রদায় কোন প্রভুর বা মালিকের দাসদিগকে দুঃখ-কষ্ট দিলে প্রভু বলিয়া থাকেন– উহারা তোমাদিগকে দুঃ-কষ্ট দেয় নাই, বরং আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়াছে। আমি ইহাদিগকে দেখিয়া লইব।

বর্ণিত আছে– আখনাস ইব্ন শুরায়ক বদরের দিন আবূ জাহলের সহিত সাক্ষাত করে। আখনাস জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাকাম! (আবূ জাহলের উপাধি) এই স্থানে তুমি ও আমি ব্যতীত কেহ নাই, যে আমাদের কথা শুনিতে পাইবে। আমাকে বল, মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী না

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী? জবাবে সে অভিশপ্ত বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে কখনও মিথ্যা বলে না।

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসে সম্রাটের এই প্রশ্নটিও আছে যে, তোমরা কি ঐ ব্যক্তিকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) তিনি এখন যাহা বলিতেছেন এবং যখন তিনি এইরূপ বলিতেন না তখনও মিথ্যাবাদী বলিয়া অপবাদ দিতে ? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলেন, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই।

হেরাক্লিয়াস বলিলেন– যিনি মানুষের সহিত সত্য বৈ কিছু বলেন না, তিনি আল্লাহ্‌র উপর কি করিয়া মিথ্যা আনয়ন করিতে পারেন ?

বস্তুত হেরাক্লিয়াসের এই উক্তি নুবুওয়াতের নিদর্শনাবলীর পরিচিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডেও এই কথার উল্লেখ আছে। শরহে মিশকাত শরীফের জিহাদ অধ্যায়ে ও কাফিরদের নিকট পত্রাবলী প্রেরণ অধ্যায়ে ইহার অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। অত্র কিতাবেও দূত প্রেরণ অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

নযর ইব্‌ন হারিস কুরায়শদিগকে লক্ষ্য করিয়া একদা বলিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্যেই শৈশবকাল এবং যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি তোমাদের সকল কর্মে বড় প্রিয়তম, তোমাদের সকলের মধ্যে অতীব সত্যবাদী ও তোমাদের সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী আমানতদার ছিলেন। এখন যে সময়ে তাঁহার কর্ণের পার্শ্বদেশের চুলগুলিতে বার্ধক্যের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ এবং তিনি তোমাদের নিকট ধর্ম ও মিল্লাতের বাণী লইয়া আগমন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জাদুকর বলিতেছ! আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি জাদুকর নহেন।

এই নযর ইব্‌ন হারিস কাফির ছিল এবং তাহার অন্তরে পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ছিল বুদ্ধিমান ও ন্যায়-নীতির উপর চলিত। কিন্তু অন্যান্য কাফিরদের অন্তরের পর্দা ছিল গাঢ়। যদিও কিছুক্ষণের জন্য এই পর্দা অপসারিত হইত, কিন্তু পরক্ষণই অধিকতর গাঢ় হইয়া যাইত।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কুরায়শ কাফিরদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। সে বহুবার পবিত্র কুরআন শ্রবণ করতঃ ক্রন্দন করিয়াছে এবং বলিয়াছে– আমি বিশ্বাস করি ইহা মানব রচিত বাণী নহে। এই বাক্যাবলী মানুষের বাক্য নহে। এই বাণীতে যে মাধুর্য ও হৃদয় আপ্লুতকারী সুধা ও মনোহারী শক্তি আছে তাহা অপর কোন বাক্যে নাই। এই বাক্যাবলীতে স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও সুধা রহিয়াছে।

হারিস ইব্‌ন আমির নামক একজন মুশরিক ছিল। সে মানুষের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া দোষারোপ করিত। কিন্তু যখন সে স্বগৃহে অবস্থান করিত, তখন গৃহের লোকদিগের সামনে বলিত– আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা) মিথ্যাবাদী নহেন।

একদা আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র খিদমতে আগমন করতঃ তাঁহার সহিত করমর্দন করিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি কি মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত করমর্দন করিতেছ ? জবাবে সে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি যে, মুহাম্মদ (সা) পয়গাম্বর। কিন্তু আমি আবদুল মন্নাফের সন্তানদের আনুগত্য কিভাবে করিতে পারি ? ইহা ছাড়া অপরাপর মুশরিকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে বলিত, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি নবী বটে। বস্তুতঃ এই ছিল মুশরিকদের অবস্থা!

www.pathagar.com

ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, কিতাবীরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁহারা নিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনিতেন। কুরআনের উক্তি অনুসারে يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ চিনিতেন যেরূপ মানুষ নিজ সন্তানদিগকে চিনিয়া থাকে এবং ইহারা বংশ-পরম্পরায় আখেরী নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। মৃত্যুর সময় স্বীয় সন্তানদিগকে ওসিয়ত করিয়া যাইত– যখন আখেরী যামানার নবী আগমন করিবেন, তখন তোমরা তাঁহার খিদমতে আমাদের সালাম পৌঁছাইয়া দিও এবং বলিও আমরা আপনার প্রেমের মধ্য দিয়া স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। আপনি আমাদের সালাম গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে স্বীয় দাসদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউন।

বর্ণিত আছে যে, ইয়ামেনের বাদশাহ্দের মধ্যে তুব্বা নামক এক বাদশাহ ছিলেন। যিনি ছিলেন মুসলমান এবং তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল কাফির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি জ্ঞাত নহি যে, তুব্বা তামীম গোত্রীয় লোক ছিল কিনা।

পয়গাম্বরের নিদর্শনাবলী অবগত হইবার জন্য যে দলটি ইয়ামান হইতে আগমন করতঃ পবিত্র শহরে অবস্থান করে, তাহারা তুব্বার নিকট আবেদন জানায় যে, তাহাদিগকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইহারা সেই দলের সহিত আগমন করিয়াছিল এবং অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় আনসারগণ ছিলেন ইহাদের বংশধর। অতঃপর যখন নুবুওয়াতের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তখনও ইহারা পিতৃকুলের কুফরীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া রহিল। (নাঊযুবিল্লাহ্)

ইফ্ফাত বা পবিত্রতা

হারাম কর্ম হইতে পবিত্রতা অর্জন করাকে ইফ্ফাত বলা হয়। কামূসে ইফ্ফাতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে العفة كف عما لا يحل ويحل وجوده। অর্থাৎ ইফ্ফাত অর্থ হইল যাহা হালাল নহে এবং যাহার অস্তিত্বও হালাল নহে উহা হইতে বিরত থাকা। এই গুণের কি পরিমাণ পূর্ণত্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করিয়াছিলেন উহা ভাষায় বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহার থাকিতে পারে? এবং যেখানে তাঁহার 'ইসমত'-এর বর্ণনা করা হইয়াছে সেস্থলে এতদ্সমুদয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কোন স্ত্রীলোকের হস্ত স্পর্শ করেন নাই যাহার উপর তাঁহার (শরীআতসম্মত) অধিকার ছিল না।

সমাজ ও স্বভাব প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই পবিত্রতার ব্যাখ্যা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রতা ও পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা সকল পবিত্রতম বস্তুর বর্ণনার ঊর্ধ্বে হওয়াই স্বাভাবিক।

সুবিচার

সুবিচারকে আরবীতে আদল বলা হয়। এই আদল শব্দের অর্থ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতাই করা হউক কিংবা সুষম গুণ ও স্বভাবই করা হউক, উভয় প্রকারের গুণই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তার মধ্যে এমনভাবে সন্নিবেশ করা হইয়াছিল – যাহা ছিল কল্পনার অতীত।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু জিনিস বিতরণ করিতেছিলেন। এমন সময় বনী তামীম গোত্রের জনৈক যুল হুয়ায়সরা বলিয়া উঠিল "সুবিচার করুন।" কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে,

www.pathagar.com

সে বলিয়াছিল, "আপনি যাহা করিতেছেন উহা ইনসাফ নহে"। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আফসোস! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহা হইলে আর কে আছে যে ইনসাফ করিতে পারিবে ? ইহা বিরাট কাহিনীর একটি অংশ মাত্র।

প্রখ্যাত নাহুবিদ আবুল আব্বাস মুবাররাদ বলিয়াছেন, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা তাঁহার কর্মদিবসগুলিকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বায়ু প্রবাহের দিনগুলি শয্যাগ্রহণ এবং বিশ্রামের জন্য, মেঘাচ্ছন্ন দিবস শিকারের জন্য, বৃষ্টিময় দিবস মদ্যপানের জন্য এবং আলোকোজ্জ্বল দিবসগুলি ছিল মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কথিত আছে যে, কিসরার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলিতে কিছুই ছিল না। অতএব, তাঁহার ধর্মীয় চেতনাবোধের বালাই না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিবসকে তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন একভাগ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য, একভাগ স্ত্রী-পরিজনদের জন্য এবং একভাগ নিজের জন্য। অতঃপর এই তৃতীয় অংশ পুনরায় নিজের এবং অন্যান্য লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র দেহের গঠন বর্ণনার শেষভাগে করা হইবে।

আবূ জা'ফর তাবারী (র) হযরত আলী (কঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন– জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত কাজ আমি মাত্র দুইবার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই আমার ইচ্ছা এবং আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার পর আমি কোনদিনই এবংবিধ ইচ্ছা করি নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রিসালত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

উক্ত দুই বারের ঘটনাদ্বয়ের একটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং বর্ণনা করেন, এক রাত্রে আমি আমার বকরী চরানোর সঙ্গীকে বলিলাম, আমার বকরীগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিও। কেননা, আমি মক্কায় গমন করতঃ তথাকার অন্যান্য যুবকদের ন্যায় কিস্‌সা কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করিব। অতঃপর আমি মক্কার পথে রওয়ানা হইলাম এবং প্রত্যুষে মক্কার একটি সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে শুনিতে পাইলাম, উহাদের কোন এক প্রতিবেশীর বিবাহ উপলক্ষে তীরের মাধ্যমে লক্ষ্য স্থিরকরণ প্রতিযোগিতা এবং দফ ও হারমোনিয়াম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজানো হইতেছে। আমি ইহা শ্রবণ করিবার জন্য তথায় বসিয়া পড়িলাম। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নিদ্রাভিভূত করিলেন। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যের উত্তাপ আমাকে জাগ্রত করিতে সক্ষম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম। সূর্যের উত্তাপে জাগ্রত হওয়ার পর আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর আমি এই ধরনের কর্ম কোনদিন করি নাই।

ইহার পর আমি আর একদিন অনুরূপ আর একটি কর্মের ইচ্ছা করিলে সেই দিনও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হিদায়াত করেন এবং ইহার পর আমি কোনদিনই এইরূপ কর্মের আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত করি নাই।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গাম্ভীর্য, জাঁকজমক, নীরবতা, আত্মমর্যাদাবোধ, হিদায়াত ও সৌন্দর্যের বর্ণনা

وقار ও تؤدت ধীর স্থীরতা এবং صمت নীরব বা চুপ থাকা, مروت মানবতা আর هدى অর্থ চরিত্র ও চালচলন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তার মধ্যে যে সহিষ্ণুতা, ধীরস্থীরতা ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল উহা আর কাহারও মধ্যে ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে– তিনি মজলিসের সর্বাধিক গাম্ভীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি হইতেন। তিনি কখনও পবিত্র দেহ বা উহার কোন অংশকে ছড়াইয়া যেমন হস্ত কিংবা পদদ্বয় বিলম্বিত করিয়া উপবেশন করিতেন না।

অধিকাংশ সময় তিনি 'ইহ্তিবা'-র কায়দায় বসিতেন। হাঁটুদ্বয় উঠাইয়া দুই পা এবং নিতম্বের উপর বসাকে ইহ্তিবা বলা হয়। তিনি কখনও চাদর ভাঁজ করিয়া আবার কখনও চাদর ছড়াইয়া এইরূপ উপবেশন করিতেন। কখনও 'মুরাব্বা' বা চার জানুর উপরও বসিতেন। সাধারণতঃ সকালে নামায সমাপনান্তে এইরূপ কায়দায় উপবেশন করতঃ দু'আ-কালাম এবং ওযীফা পাঠ করিতেন এবং কখনও 'কারফাসা'-র কায়দায় উপবেশন করিতেন। কারফাসাঃর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে– নিতম্বের উপর উপবেশন করতঃ রানদ্বয়কে পেটের সহিত মিলাইয়া হাঁটুর উপর কিংবা গোড়ালির উপর হস্তদ্বয়কে স্থাপন করা। কেহ কেহ আবার হাঁটুদ্বয়কে একত্রিত করিয়া উভয় রানকে পেটের সহিত মিশাইয়া হস্তের অঙ্গুলিসমূহ এবং তালুকে বগলের নীচে দাবাইয়া উপবেশন করাকে 'কারফাসা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা ইহ্তিবার একটি বিশেষ ধরন। কথিত আছে, বেদুঈন এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা এই রকম উপবেশন করিয়া থাকিত।

কায়লা বিন্ত মাখরামা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে– আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কারফাসা-এর ন্যায় ভয়ংকর অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়াছি এবং আমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উক্ত ভীতি প্রদর্শনকারী অবস্থায় উপবিষ্ট দর্শনে আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং আমি প্রকম্পিত ও অস্থির হইয়া পড়ি।

'খুশূ' শব্দের অর্থ বিনয়াবনত হওয়া ও চক্ষু বন্ধ করা এবং খুযূ'-র অর্থও ইহার কাছাকাছি। কেহ অবশ্য খুশূ'-র সম্পর্ক দেহের সহিত এবং খুযূ'র সম্পর্ক আওয়ায ও চক্ষুর সহিত। আবার কোন কোন হাদীসে খুশূ'-কে অভ্যন্তরীণ এবং খুযূ'কে বাহ্যিক ক্ষেত্রের সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। বাস্তবে উভয় শব্দই নীরবতা ও হীনতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব থাকাকে অধিক পসন্দ করিতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলিতেন না। যদি কেহ তাঁহার সহিত অমার্জিত কথা বলিত, তিনি সেই দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা বড়ই ন্যায়সঙ্গত হইত এবং তিনি কখনও অসম্পূর্ণ কিংবা কর্তিত বাক্য ব্যবহার করিতেন না।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তিনি এমনভাবে কথা বলিতেন যে, কেহ ইচ্ছা করিলে কথা গণনা করিতে পারিত।

হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তারতীল ও তারসীলের সহিত কথা বলিতেন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ও বিরতির সহিত কথা বলিতেন। অভিধান গ্রন্থ সুরাহ-তে

www.pathagar.com

সহজ, সাবলীল ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলাকে তারতীল বলা হইয়াছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً স্পষ্ট উচ্চারণে, ধীরে সুস্থে ও সাবলীলভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর।

'তারসীল'-এর অর্থও তারতীলেরই অনুরূপ। তাজবীদের কিতাবসমূহে এই প্রসঙ্গে অধিক পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবী হালা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারিটি বিষয়ের দরুন নীরব থাকিতেন। বিষয় চারিটি ছিল ধৈর্য, আল্লাহ্ভীতি, অদৃষ্ট ও চিন্তা-ভাবনা। আর তাঁহার পবিত্র হাসি সর্বদা স্মিত হাসি হইত।

সাহাবা-ই কিরামের হাসিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইযযত ও সম্মান প্রদর্শনার্থে স্মিত হাসিই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দরবার ছিল, ধৈর্য, লজ্জা, কল্যাণ ও আমানতের দরবার। তাঁহার সম্মুখে কোন উচ্চ শব্দ করা হইত না এবং কোন প্রকার মন্দ আলোচনাও তথায় হইত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কথা বলিতেন, তখন প্রত্যেকেই মাথা অবনত করিয়া রাখিতেন। মনে হইত যেন তাঁহাদের মাথায় পাখী বসিয়াছে। সামান্য নড়াচড়া কিংবা মস্তকোত্তোলন করিলে পক্ষীকুল উড়িয়া যাইবে।

শিফাগ্রন্থের প্রণেতা সাহাবীদের এই অবস্থাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা বলার সহিত বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। অপরাপর কিতাবে সর্বাবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের এবংবিধ মস্তক অবনত করার কথা উল্লিখিত আছে। কারণ, সাহাবীদের শিক্ষা উক্ত পবিত্র মজলিসেই দান করা হইত।

অপর এক হাদীসে আসিয়াছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) প্রস্তরখণ্ড মুখে ধারণ করতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে উপবেশন করিতেন। উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পবিত্র দরবারে শ্রুত না হয় কিংবা কথা বলার অবকাশ না ঘটে। এই অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চেহারাপানে সম্মোহিত-নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন।

নবী করীম (সা)-এর চালচলন সম্পর্কিত আলোচনা হুলিয়া মুবারকের বর্ণনার অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার চলন গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। কোনরূপ চঞ্চলতা, আলস্য কিংবা দুর্বলতা উক্ত চলনের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ এইরূপ ছিল যে, তিনি আহার্য ও পানীয় দ্রব্যের উপর ফুঁ দেওয়া হইতে বারণ করিয়াছেন এবং যাহা কিছু আহার্য সম্মুখে উপস্থিত করা হইত উহাই আহার করার জন্য আদেশ করিতেন। দাঁত মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করার জন্য এবং প্রতি দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্তী জোড়াসমূহও উত্তমরূপে পরিষ্কার করার নির্দেশ দান করিতেন।

তাঁহার চরিত্র অতীব পবিত্র ও উত্তম ছিল। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসে আছে, خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد –উত্তম বাক্য আল্লাহ্র কালাম এবং উত্তম চরিত্র মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুগন্ধি দ্রব্য খুবই ভালবাসিতেন। তিনি নিজেও সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন এবং অপরকেও সুগান্ধি ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এবং বলিতেন ঃ حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلوة – তিনি দুনিয়ার মধ্যে

www.pathagar.com

আমাকে তিনটি বস্তুকে প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোক, সুগন্ধি এবং নামাযের মাধ্যমে চক্ষুকে শীতলকরণ।

অর্থাৎ এই সকল বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য প্রিয়তর করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অর্থ করা ঠিক নহে যে, আমি স্বীয় ইচ্ছায় এবং কর্মের মাধ্যমে এই গুলিকে প্রিয় মনে করিয়া থাকি। নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর আরাম ও সান্ত্বনা রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা ও শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হইয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের মধ্যে আনন্দ, আহ্লাদ, নূর এবং হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করিতেন। তিনি নামাযের মধ্যে যে স্বাদ ও পবিত্র দীদার লাভ করিতেন অন্য কোন সময় কিংবা কাজে এইরূপ লাভ করিতেন না।

'কুররাতুল আইন' (চক্ষুর শান্তি ও আনন্দ লাভ) দ্বারা অদৃশ্য রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'কুর্‌রাতুন'-এর মূল শব্দ ক্বাররুন। যদি ক্বাফ অক্ষরে যবর দিয়া উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে উহার অর্থ দৃঢ়তা ও স্থিরতা। কারণ, বন্ধুর দর্শন লাভে চক্ষু স্থৈর্য লাভ করে এবং আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়। এমনকি দর্শক তখন স্বীয় ডাইন-বামেও তাকাইয়া দেখে না। বস্তুতঃ আনন্দ ও খুশীর সময় চক্ষু শান্ত ও স্থির থাকে। আর বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে উহা পেরেশান ও অস্থির হইয়া পড়ে। আর সকল বস্তুর উপর যাহাদের দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাদের মধ্যে ভয় ও দুশ্চিন্তা সর্বদা ঘূর্ণায়মান থাকে। ইহার উদাহরণ কুরআন মাজীদের আয়াত تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ অর্থাৎ তাহাদের চক্ষু এমনভাবে ঘুরিতে থাকে যেন উহার উপর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। (সূরা আহযাব ঃ ১৯)।

অপরপক্ষে 'কুররাতুন'-এর ক্বাফ অক্ষরে পেশ দিয়া যদি কুররুন ধাতু হইতে লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে শীতলতা ও চক্ষুর স্নিগ্ধতা। আসলে বন্ধুর দর্শনে চক্ষু স্বাদ পায় আর অন্য কোন বস্তু দর্শনে চক্ষু উত্তাপ ও বেদনাবোধ করে। এই জন্য প্রাণপ্রিয় সন্তানকে 'কুররাতুল আইন' বলা হয়।

এতদ্‌সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, হাদীসটিতে فى الصلوة বলা হইয়াছে; الصلوة বলা হয় নাই। অর্থাৎ "নামাযের মধ্যে" বলা হইয়াছে— "নামায" বলা হয় নাই। ইহার দ্বারা এই রহস্যের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, চক্ষুর শান্তি ও আনন্দ আল্লাহ্‌র দীদারের মাধ্যমে লাভ হইয়া থাকে এবং কেবল নামাযের মধ্যেই উহা সম্ভব। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযকে এইভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন যে, كانك تراه নামায এইভাবে আদায় কর যেন আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইতেছ এবং এই দীদার নামাযের মধ্যে হইয়া থাকে। নামাযের সাওয়াব কিংবা ইহার প্রতিদানে আল্লাহ্‌র দীদারের শান্তি লাভ হয় না। কেবল মুশাহাদার সময় এই আনন্দ লাভ হয়। কেননা, ঐ সময় গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। এবংবিধ শান্তি অপর কোন দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অর্জিত হয় না। এমনকি নামাযও গায়রুল্লাহ্‌ভুক্ত। কেননা, নামায আল্লাহ্ নহেন; বরং নামায আল্লাহ্ পাকের নিআমত এবং দান মাত্র। আল্লাহ্‌র নিআমত এবং দানের মাধ্যমে শান্তি লাভ করাও একটি বিরাট স্তর। ইহার মর্যাদাও বিরাট। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছে। قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 'হে

www.pathagar.com

রাসূল (সা)! আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ্র করুণা ও রহমতের প্রতি তাহাদের সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হওয়া উচিত।' (সূরা ইউনুস ঃ ৫৮)

মুশাহাদার নিম্নতম স্তর হইল দাতার দান ও তাঁহার রহমত ও মেহেরবানীর প্রতি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্তর অতি উচ্চ ও অতি শ্রেষ্ঠ ছিল। এই কারণে কুরআন পাকে। فليفرحوا অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত বলা হইয়াছে। فلتفرح বা 'আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত' বলা হয় নাই। উহা বলা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হইত।

এইভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু উম্মতের মকাম ও স্তর নবীর মকাম ও স্তরের নিম্নে হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের আল্লাহ্র করুণা ও রহমতের উপর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং যেহেতু নবীর স্তর তাঁহাদের ঊর্ধ্বে হইয়া থাকে– বিশেষতঃ বিশ্বনবী সরওয়ারে দোজাহান (সা)-এর স্তর ও মকাম অতীব উচ্চ এবং মহান, সেহেতু তাঁহার আনন্দ ও সন্তুষ্টি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের দীদারের সহিত সম্পৃক্ত।

সতর্কতা

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত বাক্য حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلوة এই হাদীসেরই অংশ বিশেষ। মিশকাত শরীফ প্রণেতা বলেন ঃ হাদীসটি ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ হযরত আনাস (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আর সাখাবী স্বীয় মাকাসিদে হাসানা গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাবারানী হাদীসটি 'আওসাত' এবং জামে সাগীর মারফু' হাদীস হিসাবে আনয়ন করিয়াছেন। অনুরূপভাবে খতীব তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে এবং ইব্‌ন আদী আল-কামিল ও মুস্তাদরাক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে جعلت শব্দটির উল্লেখ করা হয় নাই এবং ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তানুযায়ী ইহাকে সহীহ্ বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইমাম নাসাঈ (র)-এর নিকট হযরত আনাস (রা) হইতে অপর এক সূত্রে من الدنيا। শব্দ বাড়াইয়া এক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ হাদীসবেত্তা এইভাবেই রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইবনুল কায়্যিম বলিয়াছেন, ইমাম আহমদ (র) 'যুহ্দ' নামক কিতাবে একটি সুন্দর কথা বাড়াইয়া দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা হইল اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن আমি পানাহার হইতে বিরত থাকিতে পারিব কিন্তু স্ত্রীগণ হইতে বিরত থাকিতে পারিব না।

ইহার কারণ এই যে, পানাহার স্বীয় সত্তার প্রাপ্য এবং স্ত্রীগণের হক তাঁহাদেরই প্রাপ্য। স্বীয় প্রাপ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা যায় কিন্তু অপরের প্রাপ্য কখনও নিজ ইচ্ছায় ত্যাগ করা সম্ভব হয় না।

হাদীসটির মধ্যে ثلث (তিন) শব্দটি বাড়াইয়া রিওয়ায়াত করা হইয়াছে বলিয়া যে কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তৎসম্পর্কে ইমাম সাখাবী (র) বলেন, এতদ্সম্পর্কে আমি কিছু জ্ঞাত নহি। প্রথমতঃ 'ইহ্ইয়া'-তে এবং দ্বিতীয়তঃ কাশ্শাফের সূরা আল-ইমরানের তাফসীরে। আর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও হাদীসের সূত্রসমূহের মধ্য হইতে কোন সূত্রেই উক্ত বর্ধিত অংশ দেখিতে পাই নাই।

www.pathagar.com

যারকাশী ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন– উক্ত হাদীসে ثلث শব্দ বর্ণিত হয় নাই এবং শব্দটি অর্থের দিক হইতেও বিভ্রান্তিকর বটে। কারণ, সালাত (নামায) পার্থিব বস্তু নহে– যদিও ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শায়খ হাফিয ইব্ন হাজার আস্কালানী রাফিঈর রিওয়ায়াত-এর ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, মানুষের মুখে ثلث (তিন) শব্দ বর্ধিত আকারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু হাদীসের কোন সূত্রেই উহা আমি কোথাও পাই নাই।

ওয়ালীউদ্দীন ইরাকীও স্বীয় কিতাব "আমালী"-তে বলিয়াছেন, ثلث শব্দ হাদীসের কোন কিতাবে নাই এবং নামায দুনিয়ার বস্তুও নহে। অতএব জানা গেল, প্রকৃত হাদীস যাহার উপর ইমামগণের ঐকমত্য রহিয়াছে উহা নিম্নরূপ–

حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلوة

'আমার নিকট সুগন্ধি ও স্ত্রীলোক প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নামাযের মধ্যে আমার চোখের শান্তি রাখা হইয়াছে।'

উক্ত ইবারতে (মূর পাঠে) কোন মতবিরোধ নাই। কোন কোন রিওয়ায়াতে من الدنيا এবং من دنياكم ও উল্লিখিত রহিয়াছে। আবার কোন কোন কিতাবে ثلث শব্দেরও উল্লেখ আছে। যদি এই বর্ণনাদ্বয়ের একটিকে গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যদি উভয় রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়– যেরূপ লোকমুখে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইবে। অনেকেই من الدنيا অথবা من دنياكم "দুনিয়ার বস্তুর মধ্য হইতে" বাক্যটির এই ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন যে, উহার অস্তিত্ব পার্থিব জীবনের সহিত সম্পৃক্ত। এই জন্য ইহাকে দুনিয়ার বস্তু বলা হইয়াছে।

অতএব, ইহার সারকথা হইল– এই দুনিয়ায় আমার নিকট তিনটি বস্তু প্রিয়। তন্মধ্য হইতে দুইটি হইল দুনিয়ার বস্তু এবং তৃতীয়টি পারলৌকিক। কেহ কেহ আবার তৃতীয় বস্তুটিকেও কষ্ট ও গ্লানি সহিতে হয় বলিয়া দুনিয়ার বস্তু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। তবে কষ্ট ও দুঃখের কথার উল্লেখ না করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ আখিরাতের বস্তু বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। অতএব, এই ব্যাখ্যার দরুন এই ধারণা খণ্ডিত হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বস্তুসমূহের স্বাদ, প্রেম ও স্ত্রীগণের সহিত মেলামেশার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে নিমজ্জিত থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সহিত তাঁহার গুপ্তালাপ, কানাকানি বা মুনাজাত হইত না।

আল্লাহ্ তা'আলাই হাদীসটির বর্ণিত তৃতীয় বস্তুটি সম্বন্ধে ভাল জানেন। কেননা, হাদীসে তৃতীয় বস্তুর কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ উহা অশ্বও হইতে পারে। এই মর্মে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীসও প্রণিধানযোগ্য। হাদীসটি হইল لم يكن احب اليه صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট স্ত্রীলোকের পর অশ্ব বেশী প্রিয় ছিল। –নাসাঈ

ইহা ছাড়া উক্ত তৃতীয় বস্তু আহার্য দ্রব্যও হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুনিয়ার বস্তুসমূহের মধ্যে তিনটিবস্তু অধিক প্রিয় ছিল। আহার্য দ্রব্য, স্ত্রী ও সুগন্ধি দ্রব্য। তন্মধ্যে তিনি দুই বস্তুর স্বাদ দুনিয়াতেই গ্রহণ করিয়াছেন, একটি বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করেন নাই। স্ত্রী ও

www.pathagar.com

সুগন্ধির স্বাদ আস্বাদন করিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন নাই। এই হাদীসটি ইমমি আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ত্যাগ ও তিতিক্ষা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান চরিত্র, গুণাবলী এবং ত্যাগের প্রশংসায় বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং হাদীসসমূহে উহার পর্যাপ্ত বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ত্যাগের কতিপয় বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পার্থিব দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র খিদমতে গোটা পৃথিবী উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। একের পর এক তাঁহার সাফল্য ও বিজয় সূচিত হইতেছিল। অথচ তাঁহার পবিত্র ওফাতের সময় পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিবেশী জনৈক ইয়াহূদীর নিকট যেরাহ (যুদ্ধের পোশাক) বন্ধক রাখিয়া অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। অথচ তিনি দু'আ করিতেন اللّهم اجعل رزق ال محمد قوتا আয় আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য জীবন ধারণোপযোগী রিযক দান কর।

এই জীবন ধারণের উপযোগী পরিমিত খাদ্যের উপর পরিতৃপ্ত থাকা সত্ত্বেও উক্ত যেরাহ বন্ধক রাখিতে হয় এবং ওফাতের সময় পর্যন্ত উহা ছাড়াইয়া লইবার সাধ্য তাঁহার হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সংযম, বদান্যতা ও ত্যাগই ছিল ইহার মূল কারণ।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খখনো পর পর তিনদিন পেট ভরিয়া গমের আটার রুটিও ভক্ষণ করিতে পারেন নাই। অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে, পরপর দুই দিন যবের রুটিও তিনি আহার করিতে সক্ষম হন নাই। অথচ তিনি চাহিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এইরূপ বস্তুও দান করিতেন যাহা কেহ কল্পনাও করিতে সক্ষম নহে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারবর্গ তাঁহার ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একটি দিনও গমের রুটি পেট ভরতি আহার করিতে সক্ষম হন নাই।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন প্রকার দিরহাম, দীনার, বকরী কিংবা উট রাখিয়া যান নাই।

আমর ইব্ন হারিস (রা) বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই রাখিয়া যান নাই। তবে যুদ্ধের হাতিয়ার, গর্দভ ও একখণ্ড জমি রাখিয়া যান; যাহা তাঁহার ইনতিকালের পর সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হয়।

হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইনতিকাল করিলেন, তখন আমাদের গৃহের কোণায় অর্ধসের মাত্র যব ব্যতীত খাদ্যবস্তু বলিতে আর কিছুই মওজুদ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমার জীবিকার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমার নিকট প্রস্তাব রাখা হয় ঃ আপনি যদি চাহেন তাহা হইলে মক্কার বাত্হা উপত্যকাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে।

জওয়াবে আমি আরয করিলাম, আয় আল্লাহ্! তুমি এইরূপ করিও না; বরং তুমি আমাকে এতটুকু শক্তি দান কর যেন আমি একদিন অভুক্ত থাকিয়া পর দিবস আহার করিতে পারি। যেই দিন অভুক্ত থাকিব, সেই দিনটি যেন তোমার নিকট কান্নাকাটি ও দু'আর মধ্য দিয়া অতিবাহিত

www.pathagar.com

করিতে পারি এবং যেই দিন আহার করিব, সেই দিন যেন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রশংসা এবং গুণগানের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে পারি।

অপর এক হাদীসে আছে, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, আপনি কি চান এই পাহাড়গুলিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হউক এবং আপনি যে স্থানেই গমনাগমন করুন এইগুলিও আপনার সহিত গমন করুক?

এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ৎকাল স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া রাখিলেন। অতঃপর বলিলেন, আয় জিবরাঈল! যাহার কোন গৃহ নাই, দুনিয়া তাহার গৃহ, যাহার কোন ধন-সম্পদ নাই, দুনিয়া তাহার সম্পদ এবং যাহার বিবেক-বুদ্ধি নাই, সেই উহা সংগ্রহ করে।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আয় মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার কথার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকৃত আল (নিকটাত্মীয়)-এর মধ্যে পরিগণিত হইতাম। আমাদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, দীর্ঘ মাসাধিক কালব্যাপী আমাদের গৃহে কোনরূপ অগ্নি-প্রজ্বলিত হইত না এবং কেবল খর্জুর ও পানি ব্যতীত গৃহে কোন আহার্যও থাকিত না।

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একবার তাঁহার সম্মুখে বিরাট এক খাঞ্চা ভরতি আহার্য আনয়ন করা হয়। উহা দেখিয়া তাঁহার কান্না আসিয়া যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন দিন পেট ভরিয়া আহার করেন নাই এবং তাঁহার পরিবারবর্গও যবের রুটি ব্যতীত কোন দিন তৃপ্ত হইয়া আহার করেন নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার পবিত্রা মহিষীগণ একাধারে বহু রাত্রি অভুক্তাবস্থায় কাটাইয়া দিয়াছেন। রাত্রির খাবার তাঁহাদের গৃহে মওজুদ থাকিত না।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও দস্তরখানে কিংবা প্লেটে আহার করেন নাই। তাঁহার জন্য কখনও পাতলা রুটি তৈয়ার করা হইত না। আর তাঁহার সম্মুখে কোন দিন সুপক্ক ছাগ-গোশ্তও দেখা যায় নাই।

হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করেন নাই এবং কখনও উহা কাহারও নিকট ব্যক্তও করেন নাই। তাঁহার নিকট পূর্ণ পেট হইতে, অভুক্ত পেটই অধিক পসন্দনীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভুক্তাবস্থায় দিবস কাটাইয়া দিতেন এবং রাত্রিভর ক্ষুধার তাড়নায় স্বীয় পেট মর্দন করিতেন।

এই পেট মর্দন দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষুধার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এমনকি এমতাবস্থায়ও তাঁহাকে উক্ত দিবসের রোযা রাখা হইতেও বিরত রাখা যায় নাই। অথচ তিনি যদি পরওয়ারদিগারের নিকট কামনা করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত ধন-ভাণ্ডার এবং যাবতীয় সুখ-সম্পদ দ্বারা তিনি তাঁহার পার্থিব জীবনকে পূর্ণ করিয়া দিতেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসা ও মহব্বতের দরুন আমার কান্না আসিত। তাঁহার এহেন

www.pathagar.com

অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বহস্তে তাঁহার পবিত্র পেট মর্দন করিয়া দিয়াছি। ক্ষুধায় যখন তাঁহার এহেন অবস্থার সৃষ্টি হইত তখন আমি আরয করিতাম, روحى فداك يارسول الله। আমার জান আপনার প্রতি কুরবান হউক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়ায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যতটুকু খোরাক আপনার প্রয়োজন, ঐ পরিমাণ গ্রহণ করাকে যদি আপনি পসন্দ করিতেন!

এতদ্শ্রবণে তিনি বলিতেন, আয় আইশা! দুনিয়াতে আমার কি প্রয়োজন? আমি দুনিয়া কি করিব? আমার ঐ সকল ভ্রাতা– যাঁহারা অতীব মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল ছিলেন– তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও বেশী কষ্ট ও দুঃখের উপর ধৈর্যধারণ করিয়াছেন। এমনকি ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং পরিশেষে স্বীয় মাওলার দরবারে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রত্যাবর্তনকে হক বারী তা'আলা অতীব মর্যাদা দান করিয়াছেন। সুতরাং আমি ইহা ভাবিয়া লজ্জা পাই যে, ইহজীবনে আমি অধিক আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করি এবং আখিরাতে আমাকে তাঁহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হউক। আমার নিকট আমার ভ্রাতৃবর্গ এবং বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া থাকার চাইতে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাসের অধিক কাল দুনিয়ায় অবস্থান করেন নাই। একমাস পর তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শয়নের জন্য কোন বিছানা ছিল না। খর্জুর বৃক্ষের ছাল নির্মিত একটি বিছানা ছিল। উহা কেবল বিছানো হইত। হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি সুতলীর বিছানা ছিল। যাহা আমি দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিতাম এবং তিনি উহাতে শয়ন করিতেন। একরাত্রে আমি বিছানাটি নরম করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেই ফলে উহা কিছুটা নরম হইয়াছিল।

প্রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– আজ রাত্রে আমার জন্য কি বিছাইয়া দিয়াছিলেন ?

আরয করিলাম– প্রত্যেক রাত্রিতে যাহা বিছানো হয় অদ্য রাত্রেও তাহাই বিছানো হইয়াছিল। তবে কিঞ্চিৎ নরম করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে চার ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম।

বলিলেন– উহাকে পূর্বের অবস্থায়ই বিছাইয়া দিও। কেননা, অধিক নরম হইলে উহা আমাকে রাত্রির নামায হইতে বিরত রাখে।

তাঁহার পবিত্র স্বভাব ছিল, কখনও শুধু একখণ্ড তক্তার উপর কিংবা কখনও শুধু খর্জুর চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। এমনকি তাঁহার পবিত্র পৃষ্ঠদেশে খর্জুর পত্রের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হইয়া থাকিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়, ভীতি এবং ইবাদতে দৃঢ়তা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়, ভীতি এবং ইবাদতে দৃঢ়তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের প্রকৃত পরিচয় এবং জ্ঞানের পরিমাপ অনুযায়ী ছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার হাকীকত সম্পর্কে যে যত বেশী জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ, সে তত বেশী ভীত ও ইবাদতগুযার হইবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন– إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে আলিমগণই আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রকৃত রূপে ভয় করিয়া থাকে।

www.pathagar.com

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি যাহা জানি যদি তোমরা উহা অবগত হইতে, তাহা হইলে স্বল্প সময় হাস্য এবং অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করিতে।

তিরমিযী শরীফে হাদীসটির সহিত কিঞ্চিৎ সংযোজন করা হইয়াছে। উহা এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন– তোমরা যাহা দর্শনে সক্ষম নহ আমি উহা দর্শন করিয়া থাকি এবং আমি উহাও শ্রবণ করিয়া থাকি যাহা শ্রবণে তোমরা সক্ষম নহ। এমনকি আমি 'আতীত'– আকাশের এক ধরনের মৃদু শব্দ, যাহা আকাশের জন্য শোভনীয়, উহাও শ্রবণ করিয়া থাকি। (পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত উষ্ট্রের কাতরধ্বনি ও ক্রন্দনকে আতীত বলা হয়। আকাশে ফেরেশতা এবং অন্যান্য যাহা কিছু আছে, উহার আধিক্য বুঝানোর জন্য ইঙ্গিত ও উপমা দেওয়া হইয়াছে। যদিও উপমায় উক্ত বিশেষ শব্দ না আসিয়া থাকে)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আকাশে এমন চারি অঙ্গলি পরিমিত স্থানও নাই, যে স্থানে ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করতঃ সিজদায় পড়িয়া যান নাই।

দ্বিতীয় এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি যাহা জ্ঞাত আছি যদি ঐগুলি তোমরা অবগত হইতে, তাহা হইলে তোমাদের হাসি হ্রাসপ্রাপ্ত হইত এবং কান্না বৃদ্ধি পাইত। স্বীয় স্ত্রীদের সহিত একত্রে শয়ন-সুখ পরিত্যাগ করিতে– এমনকি ভূমিতলে, পথে ইতস্ততঃ নামিয়া আসিতে। আল্লাহ্র দরবারে কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে। উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্কে ডাকিতে।

বস্তুতঃ ইহা বলার উদ্দেশ্য হইল, আমি (রাসূলুল্লাহ্ সা) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে উক্ত বোঝা বহন করিয়া থাকি। যদি তোমরা ইহা জানিতে পারিতে, তাহা হইলে কখনও উক্ত বোঝা বহন করিতে না।

উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবূ যার (রা) বলেন, আমার নিকট ইহা বড় পসন্দনীয় যে, যদি আমি বৃক্ষ হইতাম, তাহা হইলে আমাকে কর্তন করিয়া ফেলা হইত। অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে– সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি দেখিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বেহেশ্ত ও দোযখ দেখিতেছি। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মধ্যে দিব্যজ্ঞান, আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বকে এইরূপ জাগরূক করিয়া দিয়াছিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে উহার উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর নহে।

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের মধ্যে দীর্ঘ কিয়াম করিতেন। যদ্দরুন তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। সাহাবীগণ আরয করিলেন– আয় আল্লাহ্র রাসূল! এত পরিশ্রম ও তাকলীফ কি জন্য করিতেছেন ? আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াব দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণা যে, তিনি আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমি কি তাঁহার কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না এবং তাঁহার শোকর আদায় করিব না ?

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিটি কার্য স্থায়ী এবং সুদৃঢ় হইত। তোমাদের মধ্য হইতে কাহার এমন শক্তি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় এত কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হইবে ?

www.pathagar.com

হযরত আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন এবং মিসওয়াক করিলেন। অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন। আমিও তাঁহার সহিত নামাযে দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি সূরা বাকারা দ্বারা নামায শুরু করিলেন এবং অতঃপর এমন কোন রহমতের আয়াত বাদ পড়ে নাই যেখানে থামিয়া তিনি আল্লাহ্র রহমতের জন্য দু'আ না করিলেন। এমন কোন আযাবের আয়াত নাই যেখানে থামিয়া তিনি আযাব হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা না করিলেন। অতঃপর কিয়ামের ন্যায় দীর্ঘসময় যাবত রুকূ করিলেন। রুকূতে নিম্নোক্ত তাসবীহ্ পাঠ করেন ঃ

سبحان ذى الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء

রুকূ হইতে সোজা হইয়া সমপরিমাণ সময় কিয়াম করেন এবং অনুরূপ (কিছু) পাঠ করেন। ইহার পর সিজদা করেন। সিজদাতেও ঐ সকল কালেমা পাঠ করেন।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে উপবেশন করেন এবং পূর্বের ন্যায় কালেমা পাঠ করেন। (পরবর্তী রাকআতেও) পূর্বের ন্যায় সূরা অর্থাৎ সূরা আলে-ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মাইদা তিলাওয়াত করেন। কখনও তিনি এক আয়াতের উপরই সমস্ত রাত্র দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিতেন। এক বর্ণনায় আসিয়াছে, উহা ছিল এই আয়াত–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –

'যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর তাহা হইলে উহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তুমি ক্ষমা করিয়া দাও, তাহা হইলে তুমিই তো মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।' (সূরা মাইদা ঃ ১১৮)।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উম্মতদিগের অবস্থা পেশ করা এবং তাহাদের মাগফিরাত কামনা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইত।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়িতে থাকিতেন এবং তাঁহার পবিত্র পেটে উত্তপ্ত ডেগচীর বলকানির ন্যায় আওয়ায হইতে থাকিত।

ইব্ন আবী হালার হাদীসে আসিয়াছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহার উপর একাদিক্রমে কষ্ট ও মুসীবত আসিতে থাকিত এমনকি বরাবর চিন্তা ও কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হইয়াছে। কোন সময় তাঁহার জন্য আরামদায়ক ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, আমি দৈনিক সত্তরবার তাওবা করিয়া থাকি। অপর এক রিওয়ায়াতে একশতবারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এতদসমুদয় চেষ্টা, পরিশ্রম, চিন্তা এবং গুনাহ মার্জনার প্রার্থনা ছিল কেবল তাঁহার উম্মতদের কারণেই। অবশ্য আলিমগণ ইহার আরও কারণ বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা 'মারাজাল বাহ্রায়ন' কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জবাবে তিনি বলিয়াছেন, মারিফাত আমার মূলধন, বিবেক আমার দ্বীনের বুনিয়াদ, প্রেম ইহার মূল শিকড়, এবং উন্মাদনা আমার বাহন। আল্লাহ্র যিকর আমার বন্ধু, ভালবাসা আমার ভাণ্ডার, চিন্তা আমার সাথী, জ্ঞান আমার অস্ত্র, ধৈর্য আমার চাদর, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আমার অমূল্য সম্পদ, দারিদ্র্য আমার গর্ব, সংযম আমার পেশা, বিশ্বাস আমার শক্তি, সত্যবাদিতা আমার সুহৃদ,

www.pathagar.com

বন্দেগী আমার মহব্বত, জিহাদ আমার স্বভাব, নামায আমার চক্ষুর শান্তি, যিকরের মধ্যে আমার অন্তরের ফল, সকল চিন্তা আমার উম্মতের জন্য এবং সকল আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আমার প্রতিপালকের প্রতি। صلى الله تعلى عليه وسلم

আল-কুরআনের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় স্বভাব ও গুণের বর্ণনা

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আতা (রা)-এর বরাত দিয়ে এক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র গুণাবলীর অধিকাংশই সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন–তাঁহার কিছু কিছু প্রশংসার বর্ণনা তাওরাত কিতাবেও করা হইয়াছে এবং কুরআন মাজীদেও রহিয়াছে। যেমন হাদীসে কুদসীতে আছে-

يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزاللاميين

–হে নবী! (আপনি জানিয়া রাখুন) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ঐ কিতাবের সাক্ষ্যদাতা, হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি, যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। উহার সত্য ও মিথ্যা, মুক্তি ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকারী এবং সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদানকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে এবং উম্মী আরববাসী স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্তদিগের আশ্রয়দাতা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। মুরাহ্-তে 'হির্য' শব্দটির অর্থ সমতল ও উত্তমস্থল বলা হইয়াছে। انت عبدى رسولى 'আপনি আমার বিশেষ বান্দা' ইহা বলার অর্থ হইল এই বিশেষ মাকাম ও পূর্ণতম স্তরের জন্য আপনি ছাড়া আর কেহই উপযুক্ত নহে এবং আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি সকল মানুষের প্রতি।

আল্লাহ্ আরও বলিয়াছেন سميتك المتوكل আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রাখিয়াছি। কেননা, আপনি আপনার কার্য ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই উপর সোপর্দ করিয়াছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা সংকুচিত করিয়াছেন। সুতরাং আপনার যাবতীয় কর্মের আমি মুতাওয়াল্লী এবং অভিভাবক হইয়াছি। ليس الفظ ولا غليظ আমার এই বান্দা {মুহাম্মদ (সা)} কঠোর স্বভাববিশিষ্ট কিংবা রূঢ়ভাষীও নহেন। ولا سخاب فى الاسواق তিনি বাজারসমূহে উচ্চ আওয়ায করিয়া থাকেন না। এখানে বাজারের কথা আকস্মিক। কেননা, বাজারে প্রতিনিয়তই হট্টগোল হইয়া থাকে। সুতরাং এই বক্তব্যের অর্থ হইবে তিনি পারতপক্ষে বাজার গমন এড়াইয়া চলিতেন। কারণ, বাজার ইহলৌকিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান। তথায় গমনাগম আখিরাতপন্থীদের অবস্থার অনুকূল নহে। ولا يدفع السيئة بالسيئة তিনি (সা) মন্দ দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করিতেন না। অর্থাৎ অপকর্মের প্রতিশোধ অপকর্মের দ্বারা গ্রহণ করিতেন না। যদিও ইহা মাত্রাতিরিক্ত না হইলে শরীআতে সিদ্ধ আছে। কিন্তু তিনি ولكن يعفو ويغفر অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং গোপন রাখিতেন, ক্ষমার জন্য দু'আ করিতেন ও সুন্দর ব্যবহার করিতেন। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন-

ادفع بالتى هى احسن السيئة ولا يقبضه الله حتى يقوم به الملته العوجاء

অপকর্ম হইতে যাহা উত্তম উহা দ্বারা আপনি (পাপ) বিদূরিত করেন এবং যতক্ষণ না তাহা দ্বারা বক্র সম্প্রদায় এবং লোকেরা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ পাঠ করতঃ সোজা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার রূহকে কবয করা হইবে না।

www.pathagar.com

সোজা হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল কালেমা পাঠ করা। يفتح به اعينا عميا তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ চক্ষুহীনদের চক্ষু খুলিয়া দিবেন। এবং واذانا صمًا وقلوبا غلفا কর্ণের বধিরতা ও অন্তরের পর্দাকে খুলিয়া দিবেন।

এই হাদীসে কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে اسدده بكل جميل আমি তাঁহাকে যাবতীয় সুন্দর স্বভাব ও চরিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি।

সুরাহ-তে 'সাদাদ' অর্থ সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধ কর্ম বলা হইয়াছে। واهب له كل خلق كريم আমি তাঁহাকে প্রতিটি উত্তম স্বভাব দান করিয়াছি। واجعل السكينة لباسه والبر شعاره আমি শান্ত স্বভাবকে তাঁহার ভূষণ বানাইয়াছি– যাহা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে এবং সৎকর্মকে তাঁহার নিদর্শন ও চিহ্ন বানাইয়াছি, যাহা অভ্যন্তরীণ পোশাকের ন্যায় তাঁহার শরীর সংলগ্ন রহিয়াছে। والتقوى ضميره সংযমকে তাঁহার অন্তরের গোপন বস্তু বানাইয়াছি। যেহেতু অন্তর তাকওয়া-পরহেযগারীর মূল, সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, التقوى ههنا। সংযমের স্থান এখানে। অন্তরকে গোপন ভেদের স্থানও বলা হইয়া থাকে। অন্তস্তলে কোন কথা গোপন করিয়া রাখাকে اضمار বলা হইয়াছে। والحكمة معقولة এবং হিকমতকে তাঁহার পবিত্র বিবেক বানাইয়াছি। বস্তুর পবিত্র অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে হিকমত বলা হয়। ইহা ছাড়া 'হিকমত' শব্দটির অর্থ সত্যবাদিতা ও সঠিক কার্যকলাপকেও বলা হইয়াছে।

والصدق الوفاء طبيعته আমি তাঁহার স্বভাবকে সত্যবাদী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারী বানাইয়াছি। والعفو والمعروف خلقه ক্ষমা করা ও নেক কাজের আদেশ করা তাঁহার চরিত্র বানাইয়াছি। والعدل سيرته والحق شريعته والهدى امامه والاسلام ملته আমি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতাকে তাঁহার চরিত্র, সত্যকে তাঁহার শরীআত, হিদায়াতকে তাঁহার ঈমান এবং ইসলামকে তাঁহার ধর্ম বানাইয়াছি। واحمد اسمه আহমদ তাঁহার নামকরণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পূর্ববর্তী উম্মতগণের মুহাম্মদ ও আহমদ উভয় নামেই খ্যাত ছিলেন। واهدى به بعد الضلالة আমি তাঁহার মাধ্যমে গুমরাহীর পর সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করিয়াছি। واعلم به بعد الجهالة মূর্খতার পরে তাঁহার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিয়াছি। وارفع به الخماله তাঁহার মাধ্যমে পতনোন্মুখ সৃষ্ট জীবকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাইয়াছি। واسمى به بعد النكرة উহাদিগকে অপরিচিত ও বিলীন হওয়ার পরও তাঁহার মাধ্যমে উন্নত ও পরিচিত করাইয়াছি। واكثر به بعد القلة এবং তাঁহার মাধ্যমে স্বল্পতার পর উহাদিগকে বর্ধিত করিয়াছি। واغنى به بعد العيلة দারিদ্র্য এবং অভাবের পর তাঁহার মাধ্যমে উহাদিগকে পরমুখাপেক্ষিতাহীন ও ঐশ্বর্যশালী বানাইয়াছি।

والف به بين قلوب مختلفة واهواء متشتة وامم متفرقة

বিভ্রান্ত অন্তর, বিচ্ছিন্ন চিন্তা এবং ভিন্ন দলসমূহের মধ্যে তাঁহার মাধ্যমে প্রীতি ও ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছি। واجعل امته خير امة اخرجت للناس এবং যত উম্মত আগমন করিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার উম্মতকে সর্বোত্তম বানাইয়াছি।

صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনা

এই অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের বর্ণনা করা হইবে যাহা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং সহীহ্ হাদীস মাধ্যমে সংগৃহীত।

পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের প্রশংসা করা হইয়াছে। তাঁহার উচ্চতম স্তরই তাঁহার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে। আর ইহা হইতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বই তাঁহার পবিত্রতম শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাঁহার প্রশংসা বিশ্বের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত স্বয়ং করিয়াছেন, তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা কত বিরাট! কত উচ্চ!!

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা কুরআন মাজীদে যাহার স্তরসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া কিংবা আয়ত্তে রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

প্রথমতঃ যে আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ও উম্মতগণের উপর তাঁহাকে যে রহমতের আধার ও বন্ধু স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে তৎ সম্পর্কে সুসংবাদ দান করে, উহা এই–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمُ -

‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন, যাঁহার নিকট তোমাদের কষ্ট বড়ই কষ্টদায়ক মনে হয়, যিনি তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন এবং যিনি মু’মিনদের প্রতি বড়ই দয়া ও মেহেরবানী প্রদর্শন করিয়া থাকেন।’ (সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

বস্তুতঃ উহা বলার উদ্দেশ্য হইল, তোমাদের গোত্রের মধ্যেই তোমাদের প্রতি এই নবীর আগমন হইয়াছে। যাঁহার সততা, বিশ্বস্ততা এবং সুউচ্চ স্তর সম্পর্কে তোমরা উত্তমরূপে অবগত আছো। তিনি তোমাদের মধ্যে কখনও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন নাই। এমনকি তোমরা তাঁহার বাপ-দাদা সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলে। যাহারা সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সম্মানী, সম্ভ্রান্ত, মহৎ, পাক ও পবিত্র ছিলেন। কেননা, তাহাদের পবিত্র চরিত্র অশ্লীলতা ও বর্বর যুগের অসভ্যতা হইতে মুক্ত ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন; اخرجت من اصلاب الطاهرات الى الارحام الطاهرات। আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠসমূহ হইতে পবিত্র পেটসমূহে স্থানান্তরিত করিয়া প্রকাশ্য জগতে আনয়ন করা হইয়াছে। আর তোমরা তাঁহার সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা, চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও কার্যাবলীর সৌন্দর্য অবলোকন করিতেছ। অধিকন্তু তাঁহার কতিপয় পবিত্র গুণের প্রশংসাও তোমরা করিতেছ। অতঃপর আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা বলেন– ইহলোকের ও পরলোকের তোমাদের কষ্ট ও অমঙ্গলের চিন্তা তাঁহার নিকট বড় কষ্টের ও বেদনাদায়ক মনে হইয়া থাকে। তাই তিনি তোমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত অতীব আগ্রহী ও অত্যন্ত উদগ্রীব থাকেন। আর মুসলমানদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ পোষণ করিয়া থাকেন।

যেমন কুরআনুল করীমে আসিয়াছে–

وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

–নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি এই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের জন্য নবী প্রেরণ করিয়াছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)।

আরো বলিয়াছেন .... هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ

–আল্লাহ্‌র শান যে, তিনি উম্মিগণের মধ্য হইতেই তাহাদের প্রতি নবী প্রেরণ করিয়াছেন। (সূরা জুমুআ ঃ ২)।

আরো আসিয়াছে ... كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ যেমন আমি (ইতোপূর্বে) তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য নবী প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা বাকারা ঃ ১৫১) যাহাতে নিজ গোত্রের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করায় তাঁহার প্রতি মমত্ববোধ, হৃদ্যতা প্রদর্শন, সত্যায়িতকরণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার আনুগত্য ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অধিকার ও নৈকট্য বজায় থাকে।

ইমাম জা'ফর সাদিক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মারিফাত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে বান্দার অজ্ঞতা ও অপারগতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি মানবজাতির মধ্য হইতেই এমন এক মানবকে মনোনীত করিয়াছেন যিনি তাহাদেরই স্বজাতীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় গুণের মধ্য হইতে রহমত ও শান্তির পোশাক পরিধান করাইয়া নবী ও রাসূল নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার আনুগত্যকে আপন আনুগত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

'مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ' 'যে রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিয়াছে'।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭)।

আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তাকে, তাঁহার আকৃতি ও গুণাবলীকে সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যাহার ভাগ্যে সেই রহমতের অংশ পৌঁছিয়াছে তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিলাভ হইয়াছে এবং যাবতীয় মন্দ হইতে নিরাপত্তা লাভ হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত মাহবুবের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে ও সফলকাম হইয়াছে। এতদ্ সম্বন্ধে 'শিফা'-তে উল্লেখ করা হইয়াছে, ভাগ্যের এই বর্ণনা হইতে এই মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনগণের জন্য রহমতস্বরূপ বলিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনদের জন্য রহমতের বিকাশস্থল ও উৎসমূল ছিলেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি

www.pathagar.com

হিংসা-দ্বেষ, বিরোধ ও অহংকারের বশবর্তী হইয়া ভাগ্যাহত, পথভ্রষ্ট, বঞ্চনা ও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তাহা হইলে সে আপনার প্রতিই অন্যায় করিবে। তাঁহার নুবুওয়াত বিশ্বের বুকে কিরূপ রহমত স্বরূপ ছিল উহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

চন্দ্র ও সূর্যকে সমগ্র জগত আলোকিত করার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেহ যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে অবস্থান করে, তবে তথায় সে আলোকপ্রাপ্ত হইবে না এবং তাহার এই বঞ্চিত হওয়ার জন্য চন্দ্র-সূর্যকে দায়ী করা যাইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থাও তদ্রূপ।

এই আলোচনা وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা যারিআত ঃ ৫৬)– এই আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যাহাতে ইহাদিগের একমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি লক্ষ্য থাকে সেইভাবেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে অনুরূপ যোগ্যতাও সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই বিবেকশক্তি সৃষ্টির কালেই দান করা হইয়াছে। যাহা সকল প্রকার কাম রিপু, ক্রোধ ও কার্যকারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার একমাত্র শক্তি। ইহা দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্য ও বন্দেগীর উৎসস্থল। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল মুসলমানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে এবং সকল মানুষের জন্য পরোক্ষভাবে রহমতস্বরূপ ছিলেন।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন– তিনি সমস্ত মানবকুলের জন্যই প্রত্যক্ষ রহমত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা বলেন, মু'মিনদের জন্য তিনি রহমত ছিলেন এই জন্য যে, তাহারা তাঁহার মাধ্যমে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুনাফিকদের জন্যও তিনি রহমত ছিলেন এবং উহা এই জন্য যে, উহারা তাঁহার কারণে হত্যার হাত হইতে রেহাই পাইয়া নিরাপত্তা লাভ করিয়াছিল। এবং কাফিরদের জন্য তিনি রহমতস্বরূপ ছিলেন– এইভাবে যে, তাহাদের দুনিয়ার শাস্তি ত্বরান্বিত করা এবং আখিরাতের শাস্তি বিলম্বিতকরণ তাঁহার কল্যাণে হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাহাদের নিহত হওয়া, বিতাড়িত হওয়া এবং ভীতি প্রদর্শিত হওয়াও তাঁহার পক্ষ হইতে এক ধরনের রহমতস্বরূপ ছিল। কেননা, সৎকর্মশীলদের প্রতিপালন ও নিরাপত্তার জন্য উক্ত কার্য প্রয়োজনীয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন কোন বৃক্ষের বিনষ্ট ও শুষ্ক ডাল এই জন্য কর্তন করা হয় যাহাতে অন্যান্য ডালগুলি সতেজ হয় ও অধিক ফলধারণে সক্ষম হয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের জন্যও রহমতস্বরূপ ছিলেন এবং কাফিরদের প্রতিও। উহা এই জন্য যে, তাহাদেরকে ঐ শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখা হইয়াছে যে শাস্তি অতীতের মিথ্যারোপকারীদের উপর পতিত হইয়াছিল।

হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– তুমিও কি আমার রহমতের অংশপ্রাপ্ত হইয়াছ ? জবাবে তিনি আরয করিলেন– হাঁ, আমিও আমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভীত ছিলাম, এখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমার প্রশংসা করায় আমি নির্ভয় হইয়াছি। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ শক্তিশালী, আরশের নিকটে অবস্থানকারী, তথায় সকলে তাহার অনুগত। অধিকন্তু তিনি বিশ্বাসী [অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)]

www.pathagar.com

আর জিবরাঈল (আ)-এর এই ভীতি ছিল পরওয়ারদিগারের দরবারের নৈকট্য লাভের ভীতি– যাহা উক্ত দরবারের নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর হইতে কখনও বিদূরিত হয় না।

কোন কোন আরিফ বলিয়াছেন, যেইদিন হইতে সকল ফেরেশতার উস্তাদ ইবলীস বিতাড়িত হয়, সেইদিন হইতে ফেরেশতা জগতের অধিবাসীদিগের সমস্ত শান্তি বিদূরিত হয়। তাঁহারা সকলে সেইদিন হইতে ভীতি-শংকার মধ্যে কালাতিপাত করিতে থাকেন। যদিও আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁহাদের শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন সাহাবা আফসোস করিয়া বলিতেন– হায়, আমি যদি বৃক্ষ হইতাম এবং আমাকে যদি কর্তন করা হইত! আবার কেহ কেহ বলিতেন, হায়! আমি যদি বকরী হইতাম, তাহা হইলে মানুষ আমাকে (যবাহ করিয়া) আহার করিত!

ফাইদা

কোন কোন আম্বিয়া (আ)-এর বক্তব্য لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (তাঁহার সহিত তোমরা যাহাকে শরীক বানাইয়াছ উহাকে আমি ভয় করি না– একমাত্র আল্লাহ্ যাহা চাহেন উহাকে ভয় করি)। এবং অপর বাক্য وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ رَبِّيْ–(এবং আমরা ইহাতে নিরাপদ থাকিব এরূপও নহে তবে যদি উহা আমার রব ইচ্ছা করেন)। ইহাও উক্ত পর্যায়ভুক্ত। কোন কোন আলিমের আলোচনার মাধ্যমে ইহার প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে এবং 'তাসাল্লিয়াতুল মানাযের' নামক গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ আছে।

কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জিবরাঈল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যুক্তি দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা অত্যন্ত হীন কাজ হইয়াছে। আসলে তিনি কি ইহা অবগত নহেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর এই সকল গুণ লাভ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রহমতের ওসীলায়ই হইয়াছে? এবং তিনি কি ইহাও অবগত নহেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে এমনই পরিপূর্ণ গুণাবলী বিরাজিত ছিল যদ্দ্বারা জিবরাঈল (আ)-এর সমস্ত গুণকে আচ্ছাদিত ও বিলীন করা সম্ভব ? অধিকন্তু ইহা হইতেও বড় কথা হইল– হযরত জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী গণনা করিয়া শেষ করা সম্ভব, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণরাশি গণনা করিয়া (শেষ করা আদৌ সম্ভব নহে! যেমন কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির গুণপনা বর্ণনা করিলে ইহা বুঝা যায় না যে, উক্ত গুণ দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে নেই। বড় জোর অবস্থার প্রেক্ষিতে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা কুরআন মাজীদে আসিয়াছে। অতএব, কুরআন মাজীদের সহিত তাঁহার এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বলা যায়– কুরআনের অকাট্য দলীল দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন। আর সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ফেরেশতা জগতও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই বর্ণনায় ইহাও প্রতীয়মান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। মুফাস্‌সিরীনের একদল এতদ্‌সমুদয় গুণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। এমনকি إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (ইহা সম্মানিত রাসূলের ফরমান) বাক্যটির রাসূল বলিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝাইয়াছেন।

www.pathagar.com

কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তা হইতে বিশ্বের সকল অংশই রহমতপ্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। বলা হইয়াছে– মাটি তাঁহার রহমতপ্রাপ্ত হইয়া পাক-পবিত্র হইয়াছে, পানি তুফান হইতে রক্ষা পাইয়াছে, বায়ু শয়তানের পথ হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে এবং কাফিররা ঝঞ্ঝাবর্ত ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পুরাকালে সাদাকা ও কুরবানীর পশুগুলিকে অগ্নিতে জ্বালাইয়া দেওয়া হইত, সুতরাং অগ্নি উহা হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং শয়তানের আসমান হইতে চুরি করিয়া কথা শ্রবণ হইতে আকাশ রক্ষা পাইয়াছে।

গ্রন্থকার বলেন, এক ব্যক্তি এই মিসকীন বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইবলীস এই রহমত হইতে কি পাইয়াছে ? জবাবে বলিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহত্ত্ব, মর্যাদা, প্রতাপ ও সত্যবাদিতার প্রভাব এতদূর পৌঁছিয়াছিল যে, এতদ্সম্পর্কে কালামুল্লাহ্ শরীফে ইরশাদ হইয়াছে– جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ –'সত্য আগমন করিয়াছে এবং মিথ্যা বিলীন হইয়া গিয়াছে' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১) এবং অপর আয়াতে আসিয়াছে فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ 'ফলে উহা (সত্য) মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়' (সূরা আম্বিয়া ঃ ১৮)। এই সকল আয়াতের বক্তব্য অনুসারে বুঝা যায়, নবী (সা)-এর আগমনের ফলে অভিশপ্ত শয়তানের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার কথা। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত উহার অস্তিত্ব টিকিয়া থাকার যে কথা বর্ণিত আছে উহা পরিবর্তিত ও রহিত হইয়া যাইত। রহমত ব্যতীত সে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে কোনক্রমেই সক্ষম হইত না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়া থাকাই শয়তানের প্রতি উক্ত রহমতের ফলশ্রুতি।

নূর এবং প্রদীপ-এর বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলা নবী আকরাম (সা)-এর নাম নূর রাখিয়াছেন এবং নূর বিকিরণের কারণে তাঁহাকে 'সিরাজুম মুনীরা' নামে ডাকা হইয়াছে। কেননা, তাঁহার ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের পদ্ধতিসমূহ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার পরিপূর্ণ চরিত্রের সৌন্দর্য -আভা হইতে দৃষ্টিশক্তি ও বিবেকশক্তি লাভ হইয়াছে।

এতদ্সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ –নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে নূর ও প্রকাশ্য কিতাব আসিয়াছে।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে এবং তাঁহার নির্দেশে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বলতম প্রদীপ রূপে। (সূরা আহযাব ঃ ৪৫-৪৬)

আলিমগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে প্রদীপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অবশ্য চন্দ্র কিংবা সূর্যের সহিত তুলনা করিলে অধিকতর শোভনীয় হইত। কিন্তু তাহা করেন

www.pathagar.com

নাই। উহা এই জন্য যে, নবী (সা)-এর দৈহিক সম্পর্ক মৃত্তিকার সহিত অধিক সম্পৃক্ত। এতদ্ব্যতীত প্রদীপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল–একটি প্রদীপ হইতে শত-সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যায়। পক্ষান্তরে চন্দ্র কিংবা সূর্যের কোন প্রতিভূ নাই। পারস্য কবি যথার্থই বলিয়াছেন –

یك چراغ است درین خانه که ازپرتوان * برکجای نگری انجمنے ساخته اند

অর্থাৎ এই গৃহে একটিমাত্র প্রদীপ, যাহার আলোকে তুমি গৃহের যে কোন স্থানে দৃষ্টিপাত কর না কেন, সেখানেই প্রদীপের উদ্যান দেখিতে পাইবে।

অথবা যদি বলা যায় এই উপমা দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হইয়াছে, তথাপিও তাহা সত্যের অপলাপ হইবে না; কেননা, আল-কুরআনের অন্যত্র সূর্যকেও প্রদীপ বলা হইয়াছে। উহা এই – وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا – 'এবং তিনি আকাশমণ্ডলে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ (সূর্য) ও উজ্জ্বল চন্দ্র' (সূরা ফুরকান ঃ ৬১)। এবং আরো বলিয়াছেন – وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَاجًا এবং আমি প্রদীপ (সূর্য)-কে অত্যুজ্জ্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। এই আয়াতদ্বয়ে سراجا (সিরাজান) অর্থে প্রদীপ এবং সূর্য উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতএব, অর্থ দাঁড়ায় সূর্য যেইরূপ জগতব্যাপী আলো বিস্তার করিয়া থাকে এবং এইজন্য আবার কোন বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; তদ্রূপ নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র সত্তার দ্বারাও সমগ্র জগতের মানবাত্মার জ্ঞানের জগত আলোকিত হইয়াছে। আর এই জন্য অপর কোন বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্যই তাঁহার জন্য যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে যদি তাঁহাকে চন্দ্রের সহিতও তুলনা করা হয়, তাহা হইলে তাহাও অশুদ্ধ হইবে না। اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ্ সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে জন্য নূর বিশেষ। নবী (সা)-এর নূর নামকরণের মধ্যেও উক্ত আয়াতের শানে বিশেষ অর্থ বহন করে।

অতএব, আসমান ও যমীনের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা ব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টিত নাই। উক্ত নূরই হইতেছে সকল অস্তিত্ব ও জীবনের, সকল সৌন্দর্য ও পূর্ণতার (জামাল ও কামাল) আধার। আর নবী আকরাম (সা) হইলেন সেই নূরের পূর্ণতম বিকাশস্থল ও মাধ্যম। যেমন مثل نوره-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর কলবের ঈমানকে উক্ত প্রদীপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।–যাহার উপর জ্যোতি বিরাজমান রহিয়াছে। এবং তাঁহার বক্ষের সহিত 'মিশকাত'-কে তুলনা করা হইয়াছে ও زجاجة -কে তাঁহার পবিত্র কালবের সহিত উপমা দান করা হইয়াছে। আর مصباح-কে তাঁহার অন্তরস্থ জ্ঞান ও ঈমানের জ্যোতির সহিত উপমা দান করা হইয়াছে। হক তা'আলা এই মর্মে ইরশাদ করিয়াছেন – الم نشرح لك صدرك। আমি কি আপনার বক্ষকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেই নাই ?

বস্তুত তাঁহার বক্ষের প্রশস্ততার মধ্য দিয়া যে বিরাট নিআমত দান করা হইয়াছে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকল্পে ইহা বলা হইয়াছে। আর নবী (সা)-এর প্রশস্ত বক্ষকে উদারকরণের মর্ম

www.pathagar.com

হইল–যাহাতে তাঁহার পবিত্র হৃদয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মারিফাত এবং মানব সম্প্রদায়ের প্রতি দাওআত দানের ভার একই সঙ্গে বহন করিতে সক্ষম হন।

অথবা আল্লাহ্র মারিফাতের নূর এবং ইল্ম, তাওহীদ-এর নূর পরিপূর্ণ হৃদয় যেন তত্ত্বজ্ঞান, অভিনব রহস্যজ্ঞান এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা ও হীনতাকে বিদূরিত করিতে পারে। সত্যবিমুখতাও অন্তরকে অন্য বস্তুর সহিত সম্পৃক্ত করা হইতে মুক্ত রাখিতে পারে এবং প্রত্যাদেশকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করিতে ও রিসালত তথা প্রচারকার্যের সুকঠিন দায়িত্বভার বহন করিতে পারে। এইজন্য তাঁহার পবিত্র বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ –এবং আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ঐ বোঝাকে অপসারিত করিয়া দিয়াছি, যাহা আপনার পৃষ্ঠদেশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

বক্ষের প্রশস্ততার সেই নূরই শ্রেয়–যাহা বান্দার অন্তরকে আলোকিত করিয়া দেয়। যেমন আরবীতে প্রবাদ আছে وَاِذَا دَخَلَ النُّوْرُ الْقَلْبَ اِنْفَسَخَ وَانْشَرَحَ –যখন হৃদয়ে নূর প্রবেশ করে তখন সে উহাকে উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত করিয়া দেয়। যাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইল মন্দ স্বভাব ও কর্ম হইতে হৃদয় পাক ও পবিত্র থাকা।

বস্তুতঃ সৃষ্টিকুলের গৌরব, নবীকুল শিরোমণি নবী আকরাম (সা)-এর মধ্যে এই সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এবং তাঁহার সহচর (সাহাবী)-গণও আনুগত্য, অনুসরণ ও স্ব স্ব ভালবাসার মযবূতী অনুযায়ী এই সকল গুণের অংশ লাভ করিয়াছিলেন।

সফরুস্-সাআদাত গ্রন্থে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ফারসী কিতাবেও এবংবিধ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন – وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ – আমি আপনার নাম তথা স্মরণকে ইহলোকে ও পরলোকে উন্নীত করিয়াছি এবং নুবুওয়াত ও শাফাআতের দ্বারা আপনার নামকে স্বীয় নামের সহিত ইসলামের কালেমা, আযান ও নামাযের মধ্যে একত্রিত করিয়া দিয়াছি।

সুতরাং এমন কোন খুতবা দানকারী, তাশাহ্হুদ পাঠকারী, কিংবা নামায আদায়কারী নাই যিনি اشهد ان لا اله الا الله -এর সহিত اشهد ان محمدا عبده ورسوله বলেন না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–জিবরাঈল (আ) আরয করিলেন, আপনি জানেন কি আল্লাহ্ কোন্ বস্তুর সহিত আপনার নামকে বুলন্দ করিয়াছেন ? বলিলাম–আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। বলিলেন–উহা এইরূপে যে, যখন কেহ আমাকে (আল্লাহ্কে) স্মরণ করিবে তদ্সঙ্গে আপনাকেও স্মরণ করিবে এবং ঈমানের পূর্ণতাকে আমার নামের সহিত আপনার নাম স্মরণ করার মধ্যেই সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ لا اله الا الله محمد رسول الله

আরও বলিয়াছেন –আমি আপনার স্মরণকে আমার স্মরণ এবং আপনার আনুগত্যকে আমার আনুগত্য হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছি। সুতরাং যে কেউ আপনাকে স্মরণ করিবে প্রকারান্তরে উহা আমাকেই স্মরণ করা হইবে। এবং যে কেহ আপনার পায়রবী করিবে

www.pathagar.com

প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা আমারই পায়রবী করা হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ –যে রাসূলকে অনুসরণ করিবে সে যেন আমাকেই অনুসরণ করিল। এবং আপনার অনুসরণ করাকে স্বীয় মহব্বতের স্বীকৃতি দান করিয়াছি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে– فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ আপনি বলিয়া দিন (হে মুহাম্মদ সা) তোমরা আমার পায়রবী কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

গুণাবলীর উল্লেখপূর্বক আহ্বান

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নবী আকরাম (সা)-এর যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইয়াছে উহা এইরূপ যে, নবী আকরাম (সা)-কে সম্বোধনের সময় নুবুওয়াত ও রিসালাতের গুণের সহিত সম্বোধন করা হইয়াছে। যেমন বলা হয় يا ايها الرسول কিংবা يا ايها النبى (হে নবী!, হে রাসূল!) । এবং অপরাপর নবীকে তাঁহাদের স্বনামে সম্বোধন করা হইয়াছে। যেমন يا ادم - يا نوح - يا موسى - يا عيسى (হে আদম, হে নূহ, হে মূসা, হে ঈসা) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া يا ايها المزمل (হে চাদর আচ্ছাদনকারী), يا ايها المدثر (হে চাদর পরিধানকারী)। অনুরূপভাবে সম্বোধনের মধ্যে যে করুণা, ভালবাসা ও অনুগ্রহ নিহিত উহা সকল চিন্তাশীল ও প্রেমিকদের নিকট সুস্পষ্ট।

আবূ নুআয়ম নবী আকরাম (সা)-এর হুলিয়া মুবারক-এর বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এক রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন, আদম (আ) যখন হিন্দুস্তানের ভূমিতে পতিত হইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করতঃ আযান দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, আল্লাহু আকবার দুইবার, আশহাদুআল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দুইবার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ দুইবার (শেষ পর্যন্ত) এবং নবী (সা)-এর নাম আরশে, প্রত্যেক আকাশে, বেহেশতের প্রত্যেক স্থানে এবং নহরের গর্দানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এমনকি বেহেশতের এমন কোন বৃক্ষ নাই যাহার পাতায় পাতায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ লিখিত না রহিয়াছে।

আল্লামা বায্যাজ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমাকে আকাশের পানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় আমি যেই আকাশেই গমন করিয়াছি সেইখানেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ লিখিত দেখিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মুবারক নাম হইতেই নবী আকরাম (সা)-এর নামকে উদগত করিয়াছেন। যেমন এই মর্মে আরবের প্রসিদ্ধ কবি হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) তাঁহার এক কবিতায় বলিয়াছেন فذر العرش محمود وهذا امحمد অর্থাৎ আরশের অধিপতির নাম মাহমুদ এবং ইনির নাম মুহাম্মদ। উভয় নামের অর্থই প্রশংসিত।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র আসমাউল হুসনা (প্রশংসিত নামসমূহ) এর মধ্য হইতে সত্তরটি নামের সহিত রাসূল (সা)-এর নামকেও সংযুক্ত করিয়াছেন। নবী (সা)-এর পবিত্র নামসমূহের বর্ণনায় এতদ্সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মরতবার শপথ করা সম্পর্কে বর্ণনা

নবী আকরাম (সা)-এর মহান বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার পবিত্র মরতবা ও ইজ্জতের শপথ করাও একটি। যেমন এরশাদ করিয়াছেন لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আপনার জীবনের শপথ! নিশ্চয় ইহারা আপন নেশায় উদভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ মুফাস্সেরীনদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী আকরাম (সা)-এর আয়ুষ্কাল ও স্থায়িত্বের শপথকে স্মরণ করিয়াছেন। এবং ইহাদ্বারা তাঁহার প্রতি চরম সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যেমন প্রেমিক প্রেমাস্পাদের কসম খাওয়ার সময় বলিয়া থাকে তোমার মস্তিষ্কের শপথ! তোমার জীবনের শপথ! ইত্যাদি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী আকরাম (সা) হইতে অধিক সম্মানিত করিয়া আর কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন নাই এবং এইজন্যই তিনি কেবল নবী আকরাম (সা) ব্যতীত আর কাহারও জীবনের শপথকে স্মরণ করেন নাই।

তাবিঈনদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবিঈ হযরত আবুল জাওযা (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শপথ ব্যতীত আর কাহারও জীবনের শপথ করিয়াছেন এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। কেননা, একমাত্র তিনিই ছিলেন তাঁহার নিকট অতীব সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।

আল্লামা কুরতুবী বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নবী (সা)-এর পবিত্র হায়াতের শপথ করায় আমাদের জন্য নবী আতরান (সা)-এর পবিত্র হায়াতের শপথ করাকে প্রকাশ্য রূপে অনুমতি দানের শামিল হইয়াছে। এই শপথের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীবের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে আকরাম (সা) আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কাহারও শপথ খাওয়া হইতে আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন।

ফায়েদা ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, যদি কেহ নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হায়াতের শপথ করে, তাহা হইলে উহা তাহার উপর আবশ্যকীয় হইয়া পড়িবে। এবং উহা পূর্ণ করা তাহার জন্য ওয়াজিব হইবে এবং উহা ভঙ্গ করিলে তাহার উপর কাফফারা ওয়াজিব হইবে। কেননা,নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র সত্তা কালেমা শাহাদতের দুই রুকনের মধ্যে এক রুকন।

আলিমদের মধ্য হইতে কোন কোন আলিম বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তার শপথ করার রেওয়াজ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মদীনাবাসীরা সব সময় নবী আকরাম (সা)-এর শপথ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শপথ করার ধরন হইল, তাহারা বলিয়া থাকেন "যিনি এই নূরানী কবরে লুকায়িত আছেন সেই সত্তার শপথ।" কিংবা সেই সত্তার শপথ যাঁহাকে এই নূরানী কবর গোপন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। সেই সত্তার শপথ যাহাকে এই নূরানী কবর গোপন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতিপালন-এর গুণের সহিত স্বীয় হাবীবকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন যে, فَوَرَبِّكَ অতঃপর শপথ আপনার প্রভুর। প্রেমিক রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট ইহা বড় মধুর বটে।

www.pathagar.com

আর يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ) এর ব্যাখ্যায় يٰس সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ টীকা লেখকদের মতে يٰس হইল নবী (সা)-এর এক পবিত্র নাম তাফসীরকারগণের মতে طٰه নবী (সা)-এর একটি নাম। সাইয়েদানা ইমাম জা'ফর সাদিক (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াসীনের অর্থ হইল নেতা এবং হুযুর (সা)-এর প্রতি সম্বোধন করা। অর্থাৎ হে সর্দার বা হে নেতা! কেহ বলিয়া থাকেন যে, বনী তাঈ-এর ভাষা কোষে ইহার অর্থ হইল, হে মানুষ, হে লোক! মোটকথা, সর্ব দিক দিয়া রাসূল (সা)-এর পবিত্র সত্তা হইল ইহার উদ্দেশ্য। চাই ইহার উদ্দেশ্য শপথ হউক চাই সম্বোধন। ইহাও তাঁহার সম্মান ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার পরিচয় বহন করে। এবং কুরআনে আযীমের শপথ করার উদ্দেশ্য হইল নবী (সা)-এর রিসালাতকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁহার হিদায়তের সত্য পক্ষের উপর সাক্ষ্যদান করা। অর্থাৎ তিনি সহজ ও সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। উক্ত পথে না কোন প্রকার বক্রতা আছে, না সত্য বিমুখিতা।

সম্মানিত শহরের শপথ

উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁহার কিতাব কুরআনে কারীমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন নবীর রিসালাতের শপথ করেন নাই। বরকতময় সূরা 'বালাদ'-এর আয়াত لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ। "শপথ করিতেছি এই শহরের, আর তুমি এ নগরের অধিবাসী" (সূরা বালাদ ঃ ১, ২)।

এই আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শ্রদ্ধা ও সম্মান অধিক পরিমাণে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই শহরের নামের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়াছেন, যাহার নাম 'সম্মানিত শহর' ও 'নিরাপদ শহর'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন এ শহরে অবস্থান করা শুরু করিলেন, তখন হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ওই শহরটিও শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র হইয়া গেল। তা থেকেই এ প্রবাদটি প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, شَرْفُ الْمَكَانِ بِالْمَكِيْنِ। অর্থাৎ 'অবস্থানকারীর কারণে স্থানের মর্যাদা হইয়া থাকে।'

আর আয়াতে কারীমা وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ "শপথ পিতার এবং শপথ ওই ব্যক্তির যে তাহার সন্তান"-এর মধ্যে وَالِدٌ (পিতা) দ্বারা যদি হযরত আদম আলায়হিস সালামকে বুঝানো হইয়া থাকে আর مَا وَلَدَ দ্বারা যদি তাঁহার বংশধরদেরকে বুঝানো হইয়া থাকে, তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বংশেরই অন্তর্ভুক্ত। আর وَالِدٌ দ্বারা যদি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস-সালামকে আর وَمَا وَلَدَ দ্বারা তাঁহার সন্তানদেরকে বুঝানো হইয়া থাকে, তবে ইহার দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকেই বুঝানো হবে। মোটকথা, এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম নিয়া দুইবার শপথ করিয়াছেন।

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করিয়া বলেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হউক।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জীবনের শপথ করিয়াছেন। অন্য কোন নবীর জীবনের শপথ করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার মান-মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ 'এই শহরের শপথ করিতেছি' অর্থাৎ তিনি এ শহরের মাটির শপথ করিতেছেন যাহা আপনার পায়ের নীচে পদদলিত হয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পায়ের নীচের ধূলির শপথ করিতেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ শব্দটি শক্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন ঃ রিসালাতের ধারকের পদধূলির শপথ করিয়াছেন। প্রকৃত দৃষ্টিকোণ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা যে কোন ধূলিকণাকেই বোঝানো হইয়াছে। এর কারণ হইল এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁহার নিজ সত্তা ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কারোর শপথ করার অর্থ হইতেছে অন্যান্য বস্তুর উপর শপথকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর গৌরব ও মর্যাদার বিকাশ ঘটানো। যাহাতে মানুষ এই কথা জানিতে পারে যে, (শপথকৃত) এই ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকারী। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা হইলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একাধিকবার বিভিন্ন বস্তুর উপর শপথ করিয়াছেন। কখনো নিজের সত্তা ও গুণাবলীর শপথ করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো তাঁহার বিশেষ কিছু সৃষ্টির শপথ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন–আকাশ, মাটি, দিন-রাত ইত্যাদি। এইগুলি তাঁহার বিশাল নিদর্শন ও বাস্তবিক শক্তি-সামর্থের দলীল-প্রমাণ। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি হইতেছে আলোর উদয়স্থল, গোপন ভেদের উন্মোচন, বিশ্বপ্রদীপ, মানববংশের কল্যাণ বিন্যাসকারী, পথ পাওয়ার উপায় ও শয়তানকে বিতাড়নের হাতিয়ার। তাঁহার অনেক সৃষ্টির অবস্থা এমন যে, এগুলির মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম ব্যক্তিদের দৃষ্টি থমকিয়া গিয়াছে। পরওয়ারদিগারে আলম এইগুলির শপথ করিয়াছেন। যেমন وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ "শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর"। কে জানে আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মধ্যে কত ধরনের হিকমত-প্রজ্ঞা নিহিত রাখিয়াছেন, আর কত না গোপন রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন। মর্যাদার বিকাশ ও অন্যান্য বস্তুর তুলনায় এগুলির বিশেষত্ব বর্ণনার জন্য তিনি তাহা করিয়াছেন। মানুষের নামের শপথ করার বিষয়টিও এমন ধরনের যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর সহিত শপথ করিয়া শপথকৃত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

কালের শপথ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ (سور - عصر) (কাল)-এর শপথ! নিঃসন্দেহে মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে।"

عصر শব্দের তাফসীর করিতে গিয়া মুফাস্সিরীনে কিরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, عصر দ্বারা কালকে বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু صُرَاحْ (সুরাহ) গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে দিন-রাতের আবর্তনের নাম হইলো عصر (কাল পরিক্রমা)। আর একে دهر (দাহ্র) কালও বলা হয়। দাহ্র শব্দটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্বলিত হইয়া থাকে। যাহার বর্ণনা দিতে ভাষা অক্ষম। হাদীসে কুদসীতে আসিয়াছে - لَا تَسُبُّوْا الدَّهْرَ

www.pathagar.com

فَاَنَا الدَّهْرُ "তোমরা কালকে গালমন্দ করো না, আমিই কাল"। এ উক্তি দ্বারা দাহর শব্দটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ, সুস্থতা-অসুস্থতা, বিপদ-আপদ, ফরয-বরকত ইত্যাদি সব ধরনের অর্থ এ ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ "নিঃসন্দেহে মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অবশ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত নহে)"। (সূরা আসর ঃ ১-৩)

কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের শপথ করিয়াছেন। যেমনিভাবে لاَ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ "এ শহরের শপথ করছি"-এর মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থানের শপথ করিয়াছেন। আর لعمرك -এর মধ্যে তাঁহার জীবনের শপথ করিয়াছেন। الـــم-এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত আছে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে–'আলিফ' দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ইঙ্গিত করা। 'লাম' দ্বারা জিবরাঈল ও 'মীম' দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। এক মত অনুযায়ী ق দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তরের শক্তি উদ্দেশ্য। এই কারণে যে, তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন ও কথোপকথনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করিতেন। وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى "নক্ষত্রের শপথ, যখন তা অবতরণ করে"-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, اَلنَّجْمُ (নক্ষত্র) দ্বারা 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তর' বুঝানো উদ্দেশ্য। আর اِذَا هَوٰى দ্বারা উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকার নূর দ্বারা বক্ষ উন্মোচিত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আবার هَوٰى শব্দটির অর্থ 'অবতরণ'-ও ব্যবহৃত হয়।

সূরা وَالْفَجْرِ "আলোকিত প্রভাতের শপথ"-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, فجر দ্বারা উদ্দেশ্য, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কেননা, তাঁহার মধ্য হইতে নূরের ঝলক বর্ষিত হয়। আর মহান আল্লাহ্ তা'আলার সত্য বাণী وَمَا اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ - اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ। "তুমি কি জান, রাত্রে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা কী ? তাহা উজ্জ্বল নক্ষত্র" (সূরা তারিক ঃ ২,৩)।

এই নক্ষত্র বলিতেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়। সূরা নূনে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ نٓ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ "নূন। শপথ কলমের এবং তাহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তার"। (সূরা কলম ঃ ১)। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 'মস্তিষ্ক বিকৃত' না হওয়ার উপর শপথ করিয়াছেন এবং অফুরন্ত পুরস্কারের এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। উন্নত আখলাকের উপর তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রমাণ মিলে। 'নূন'–এটি একটি আরবী বর্ণ। الـــم। আলিফ-লাম-মীমের মত এটিও হয়ত সূরার নাম হবে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম হবে। যেমনটি حروف مقطعات (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা)-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, নূন একটি মাছের নাম। এ মাছ বলিতে ওই মাছকে বুঝানো হইয়াছে যাহার উপর এ পৃথিবী অবস্থিত। এ মাছটির নাম বাহ্মূত।

www.pathagar.com

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নূন দ্বারা এখানে দোয়াত বুঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং দোয়াত-কলম ও যাহা কিছু দিয়ে লেখা হয়, তা বড়ই উপকারী বস্তু। অন্য এক বর্ণনা মতে নূন হচ্ছে আলো নির্মিত একটি ফলক। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা লিখিতে নির্দেশ দেন ফেরেশতারা এতে তাহা লিখিয়া থাকেন। হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে কলম আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম একটি নিদর্শন। যাহা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির অন্যতম। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুকের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফাইদা

এই পৃথিবীর কলম মূলত ওই মহান কলমেরই নমুনা। যাহা দিয়া মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া শরীআত ও তাহার ওহী লিপিবদ্ধ করা হয়। এর দ্বারাই দীন-ধর্মকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। আর ইহা দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াবলী সুবিন্যস্ত করা হয়। পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও তাদের ঘটনাপ্রবাহ কাগজে আবদ্ধ করা হয়। এর দ্বারা নাযিল হওয়া গ্রন্থাবলী ও আসমানী কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। কলম যদি না হইত, তবে ইহ-পরকালের দীনী ও দুনিয়ার বিষয়াবলী স্থির থাকিত না। কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার সূরা 'ইকরা'-এর তাফসীর করিতে গিয়া عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 'কলম দিয়া শিক্ষা দিলেন' শিরোনামে লিখেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাসমূহ ও তাঁর সুনিপুণ কর্মপদ্ধতির উপর কলম ও লেখনী ছাড়া যদি আর কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিত, তবে এর জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কলমের অনন্য বৈশিষ্ট্য, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের না'ত, কুরআনে কারীমের তাফসীর, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ব্যাখ্যা, আওলিয়ায়ে কিরামের মুক্তাঝরা আলোচনা ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ - ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً - فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ -

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বলে, তা মহান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (নাযিল হইয়াছে)। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার কারণে তাহাদের জন্য রহিয়াছে শাস্তি এবং তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহার কারণেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে শাস্তি"। (সূরা বাকারা ঃ ৭৯)

وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - (سورة ال عمران : ٧٨)

"আর তাহারা বলে, উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে, অথচ উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে। তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৮)

اَعَاذَنَا مِنْ ذٰلِكَ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন অবস্থা থেকে আশ্রয় দান করুন'।

www.pathagar.com

চরম অজ্ঞতা, বোধহীনতা, শত্রুতা ও অহংকারবশত কাফির সম্প্রদায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'মস্তিষ্ক বিকৃত' বলে গালমন্দ করিত। অথচ তাঁহার প্রতিপক্ষ অবলম্বনে কাফিরগোষ্ঠীর সমুদয় বুদ্ধিজীবী ও সুস্পষ্টভাষী সাহিত্যিকরা অক্ষম হইয়া গিয়াছিল। হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যেখানে বিশ্বের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যাইতেই পারিত না। তিনি এমন এক গ্রন্থ নিয়া আগমন করিয়াছেন, যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুস্পষ্টভাষী বাগ্মী ও ভাষা-সাহিত্যিকরা অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই মহান অবদানের প্রশংসায় বলেন, اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٌ "নিশ্চয় আপনি উন্নত আখলাকের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন"। (সূরা কলম ঃ ৪)। এটা আপনার নুবুওয়াত ও রিসালাতের বড় বড় নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। خُلُقٍ عَظِيْمٍ (উন্নত চরিত্র)-এর বর্ণনায় হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ كان خلقه القران "তাঁহার চরিত্র হইল কুরআনে কারীম।"

মর্যাদা-পবিত্রতা, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও নিআমতের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় মর্যাদা-সম্মান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনার উপর শামিল রহিয়াছে। ইহা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার নিআমত ও রহমতের প্রমাণ বহন করে এবং অফুরন্ত নিআমত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সূরা যুহায় আল্লাহ্ তা'আলা দিন ও রাতের শপথ করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর প্রকাশক। আর ইহাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন অবস্থার সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى "তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।" এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন কারণে কিংবা কোন কল্যাণের লক্ষ্যে ওহী আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ ছিল। ইহাতে মুশরিকরা বিভিন্ন কথা বলাবলি শুরু করে। এক পর্যায়ে বলে, তাদের প্রতিপালক মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাকে শত্রুতে পরিণত করিয়াছে। مَعَاذَ اللّٰهُ। 'আল্লাহ্ রক্ষা করুন'।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى "তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।"

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের জন্য যে নিআমত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন যেমন শাফাআত, মাকামে মাহমূদ ইত্যাদি, তা দুনিয়ায় দান করা নিআমত অপেক্ষা অনেক উঁচু মানের মর্যাদা। কেননা, দুনিয়া তাহার সংকীর্ণতা ও অনবকাশের কারণে তাহা সংকুলানের স্থান রাখে না।

اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا "যখন আপনি তাকাবেন, তো দেখবেন, এখানে অনেক বড় বড় নিআমত ও অনেক বড় রাজত্ব।"

www.pathagar.com

অথবা এর দ্বারা এ উদ্দেশ্যও হইতে পারে যে, তাঁহার কার্যক্রমের পরিণাম ফল এর সূচনাপর্ব অপেক্ষা উত্তম। এই জন্য যে, তাঁহার প্রতিটি মুহূর্ত, পরিপূর্ণ মর্যাদা ও দানের ফয়েয-বরকত কত উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। দুনিয়া ও আখিরাতে দান-খয়রাত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা, বিভিন্ন প্রকার কারামত ও সৌভাগ্যের প্রকারসমূহের ক্ষেত্রে এ আয়াতটি খুবই সমৃদ্ধ। কেননা, তিনি বলেন, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى "অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, আমি আপনাকে এ পরিমাণ নিআমত দান করিব যে, আপনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন এবং বর্ণনা সীমাতিরিক্ত ও সংখ্যা গুণে নেওয়া অসম্ভব। নবী পরিবারের সদস্যদের (আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন) কাহারও কাহারও হইতে শিফা শরীফে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে এ আয়াত অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্টির কারণ আর কোন আয়াতে নাই। কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন না, যতক্ষণ না প্রতিটি উম্মতকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিবেন।

আমি অর্থাৎ শায়খ মুহাক্কিক শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا "আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)। এ আয়াতও আশাবাদ ব্যক্ত করার কারণরূপে গণ্য।

ফায়দা

তবে এ আয়াত গুনাহ ক্ষমা করার উপরই সীমাবদ্ধ। আর ওই আয়াত অর্থাৎ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى মর্যাদা বৃদ্ধি ও সম্মান অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। হে মুসলমানগণ, আমাদের জন্য ইহা আনন্দের বিষয়।

اِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ "নিশ্চয় আমাদের জন্য রহিয়াছে এমন অনুগ্রহের উপকূল যাহা কখনো ধ্বংস হওয়ার নয়।"

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার' গ্রন্থকারের উপর আশ্চর্যবোধ হয় যে, তিনি বলেন–যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কোন একটি উম্মতকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সন্তুষ্ট হইবেন না।" ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে চাপাইয়া দেওয়া একটি প্রতারণা। সে তাহাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন প্রতিটি বস্তু বা কর্মের উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, যেগুলির উপর আল্লাহ্ তা'আলাও সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গুনাহ্গার-পাপীদেরকে জাহান্নামে রাখিবেন। আর রাসূলে

www.pathagar.com

কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন রহিয়াছেন। তিনি এমন কর্মকাণ্ড হইতে মুক্ত যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে এ কথা বলিবেন যে, "আমি ইহাতে সন্তুষ্ট নই যে, আমার কোন উম্মতকে জাহান্নামে দেওয়া হউক কিংবা সেখানে তার ঠিকানা বানাইয়া দেওয়া হউক।" বরং আসল কথা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করিবেন। এই অধিকারের বলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিবেন, যাহাকে মহান আল্লাহ্ চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকেই সুপারিশ করিবেন, যাহার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি অর্জিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, শাফাআতের আলোচনা সম্পর্কীয় হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ধরনের পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপ প্রভৃতি লোকদের শাফাআত করিবেন। তাহাদের মধ্যে আবার এমন লোকেরা বাকী থাকিয়া যাইবে, যাহাদের সরিষা বরাবর ঈমান আছে। সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান ছাড়া তাহাদের আর কোন নেক আমল নেই। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, এরা আমার বান্দা। এরা আমার বিশেষ লোক। এদের জন্য আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে সুপারিশ করিব। তখন তাহারা ক্ষমা পাইয়া যাইবে। জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া যাইবে। মূলত ইহা হইবে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই শাফাআতে কুবরার ফসল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

ফাইদা ঃ এই কথাটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত শাফাআত হইবে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ প্রতিশ্রুতির কারণে যা দুনিয়ায় তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিয়াছেন, শাফাআতের অনুমতি ও সন্তুষ্টি দিয়া তা পূর্ণ করিবেন। আর 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে যাহার উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এর উদ্দেশ্য হইতেছে ওইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাহারা চিরন্তনকাল জাহান্নামে থাকিবে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি চিরন্তনকালের জন্য জাহান্নামী হইবে না। এ উক্তিটিতে দুটি সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথমত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কোন উম্মতকেই জাহান্নামে প্রবেশ করাতে সন্তুষ্ট হবেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর কোন উম্মতকেই জাহান্নামে অবশিষ্ট রাখাতে সন্তুষ্ট হইবেন না।

এরপর সূরা যুহার মধ্যে সেইসব নি'মতের বর্ণনা রহিয়াছে, যাহা তাঁহার প্রাথমিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। যাহাতে এ কথা বিধৃত হইয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিআমত এমনই হইয়া থাকে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিবে। لَقَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ فِيْمَا مَضٰى وَكَذٰلِكَ يُحْسِنُ فِيْمَا بَقِى "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অতীত জীবনে সুন্দর অনুগ্রহ করিয়াছেন, আর এমনিভাবে ভবিষ্যতেও করিবেন।" মোদ্দা কথা, সবার হাত নিঃশেষ, অনাথ, অসহায় ও বিপর্যস্ত হইয়া যাওয়ার পরও তাঁহার দয়া-অনুগ্রহের আঁচলে লালন-পালন করিয়াছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন।

www.pathagar.com

কেহ কেহ বলেন ঃ ইয়াতীম অর্থ একক ও অনুপম। তাঁহার বরকতময় সত্তাকে যেন এসব জাহিল মূর্খদের মাঝে যাহারা অজ্ঞতার ঘাঁটি ও ভ্রষ্টতার তলদেশে নিমজ্জিত ছিল তাহাদের মাঝে অতীব মূল্যবান ও অনুপম ব্যক্তি হিসাবে পাইয়াছেন। সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়াতের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার আলোকিত হৃদয়কে স্বল্পতুষ্টিতা ও অমুখাপেক্ষিতার সম্পদ দিয়া সম্পদশালী করিয়া অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন। শৈশব, অসহায়ত্ব ও ইয়াতীম অবস্থায় যখন তাহাকে বঞ্চিত রাখেন নাই, তখন নুবুওয়াত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব দেওয়ার পর কেন তাঁহাকে সহায়-সম্বলহীন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন ? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।" কেননা, নিআমতের প্রকাশ ও নিআমতের চর্চা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও অবদানের স্বীকৃতির অন্যতম উপায়। শরীআত ও ইহার বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং মানুষদেরকে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করাও নিআমত সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

সূরা নাজ্‌ম

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা ও নিদর্শনাবলীর উপর সূরা নাজ্‌ম এমনভাবে সমৃদ্ধ যে, তা গুণে শেষ করা অসম্ভব ব্যাপার। প্রথম কথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা 'নাজ্‌ম'-এর শপথ করিয়াছেন। নাজ্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য, নক্ষত্ররাজির ছুটাছুটি, অথবা সুরাইয়্যা তারকা। অনেকেই একে 'বানাত' কিংবা 'কিরান' নামে নামকরণ করিয়া থাকে। نَجْمًا نَجْمًا (নাজমান-নাজমান) শব্দের অর্থ অল্প অল্প করে নাযিল হইয়াছে। অথবা এর অর্থ মি'রাজ রজনীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উর্ধ্বাকাশ হইতে নিচে আগমন করিয়াছেন। অথবা এর অর্থ সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আলোকিত অন্তরের উন্মোচন ও অন্যান্য বিষয়াবলী হইতে রুদ্ধ হওয়া। এরপর ওই তারকা পবিত্র আকাশ হইতে মানব অধ্যুষিত পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। হিদায়াতের কর্ম কৌশল শিখাইয়া দিল। মনোপ্রবৃত্তি হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সত্য ও সততার আদলে গড়িয়া তুলিল। আয়াতে কারীমা এরই সাক্ষ্য বহন করে। অন্তরের ইচ্ছা যা সততা ও হিদায়াতের অবস্থানস্থল উহার শপথ করা খুবই সঙ্গত ও জুতসই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى "এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এ-তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনে কারীমা, আর যদি এর দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে কোন কথা, উক্তি ও হাদীসকে উদ্দেশ্য হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়, তবে দু-তিনটি জায়গা এর হইতে বাদ দিতে হইবে। যেমন বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ঘটনা, মারিয়া কিবতিয়া ও শহীদের ঘটনা এবং তাবীরে নাখল (খেজুর বৃক্ষের পরাগরেণু) সম্পর্কীয় আলোচনা ওই বাদ পড়া বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা, এইগুলি ছিল অগ্রিম সংবাদ।

www.pathagar.com

এ কথাও ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى-এর মধ্যে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁর কোন উক্তিই নিজের নহে, বরং সবগুলিই ওহী। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বলা হইয়াছে, এ সর্বনামটি 'কুরআন' শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়াই উত্তম। এই জন্যে যে, কথোপকথন তো কুরআন ও হাদীস উভয়টির মধ্যেই পাওয়া যায়। আর উভয়টিই ওহী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ। "আল্লাহ্ আপনার উপর কিতাব ও প্রজ্ঞা নাযিল করিয়াছেন।" এই আয়াতে কিতাব দ্বারা কুরআন ও হিকমত দ্বারা হাদীসকে বুঝানো হইয়াছে।

হাস্সান ইব্ন আতিয়্যা (রা) থেকে আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে সুন্নাত নিয়া এই ভাবে হাযির হইতেন, যেই ভাবে কুরআন নিয়া হাযির হইতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি তা'লীম (শিক্ষা)-ও দিতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, نطق (কোন কিছু বলা) শুধু কুরআনে কারীমেরই বিশেষত্ব নহে, বরং তাঁহার ইজতিহাদপ্রসূত কথাগুলিও সত্য ওহী।

.উলামায়ে কিরাম বলেন, এ আয়াতের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বর্ণনা করিতে গিয়া ইস্রা তথা শবে মি'রাজের ঘটনা সূরা নাজমে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পৌছিয়াছেন। এই স্থানটি মানুষের ধারণার গণ্ডির চূড়ান্ত সীমা। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে না কোন দিকে তাহার চোখ ফিরাতে হইয়াছে, না সীমা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছে। তিনি যাহা অবলোকন করিলেন এবং 'জাবারূত ও লাহূত' নামক স্থানে তাঁহার উপর যাহা উন্মুক্ত হইল এবং ফেরেশতার আশ্চর্যমণ্ডিত যেসব কিছু দেখিলেন, ভাষা ও কলম দিয়া তাহা আবদ্ধ করা যায় না। উপলব্ধি ভাণ্ডারেও এ পরিমাণ শক্তি নাই যে, এর সামান্য কিছু শ্রবণ করিয়াও বরদাশ্ত করা যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টিকে ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করিলেন, যাহা তাঁহার মহত্ত্ব ও সম্মানের উপর প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى "ফলে তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এমন ওহী পাঠাইলেন, যে ওহী পাঠানো সমীচীন।"

গভীর জ্ঞানের অধিকারী উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত তিন ধরনের উক্তি করিয়াছেন। প্রথমত, এমন ভাষায় যা আরবী অভিধানসম্মত এবং এর বাহ্যিক অর্থ মানুষের বুঝে আসে। দ্বিতীয়ত, ইশারা-ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন, যাহা উপলব্ধি করা ও গবেষণা করার শক্তি ও যোগ্যতা কাহারও মধ্যে নাই। যেমন কুরআনে কারীমের حروف مقطعات (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা)। তৃতীয়ত, অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা কাহারও কল্পনা ও ধারণায়ও আসিতে পারে না। যেমন তিনি ইরশাদ করেন فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى "ফলে তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এমন ওহী পাঠাইলেন, যে ওহী পাঠানো সমীচীন।"

www.pathagar.com

এখন বাকী রইল-দীদার সম্পর্কীয় বিষয়টি। এ সূরাতে তো এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করিয়াছেন। অবশ্য মুফাস্সিরীনে কিরাম এ বিষয়ে মতবিরোধ করিয়াছেন। এ দীদার কি জিবরাঈলের ছিল, না আল্লাহ্ তা'আলার ? অন্তরের দেখা ছিল, নাকি চর্মচক্ষে ? গবেষণাপ্রসূত কথা এটিই যে, তাহা ছিল চর্মচক্ষে মহান আল্লাহ্র দীদার।

কা'ব আহবার বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দীদার ও কথোপকথনকে যথাক্রমে সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মূসা আলায়হিস সালামের মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। তাইতো তিনি হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে দুইবার তাঁহার সহিত কথা বলার সুযোগ দিয়াছেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দুইবার দীদার লাভের সুযোগ দিয়াছেন। সায়্যিদুনা ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের মত এটিই। তবে সায়্যিদা হযরত আইশা (রা) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ফাইদা

এ বরকতময় সূরায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এমন মান-মর্যাদার উপর প্রমাণ বহন করে যাহা তিনি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। সূরা اذا الشمس كورت-এর মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ انّهٗ لقول رسولٍ كريمٍ ذى قوّةٍ عندَ ذى العرش مكينٍ مطاعٍ ثمّ امين - "নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থশীল, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।" (সূরা তাকভীর ঃ ১৯-২১)

কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট এ আয়াত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সত্তার উপর প্রযোজ্য। কেননা, তিনিই এ গুণাবলী ও সমস্ত মর্যাদা ও কারামতের বহনকারী। যেমনিভাবে সূরা আল-হাক্কায় انّه لقول رسولٍ كريمٍ বলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ طٰهٰ - وما انزلنا عليك القرانَ لتشقٰى "ত্বা-হা, তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার উপর কুরআনে কারীম নাযিল করি নাই।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১-২)

এ বরকতময় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ সূরা ইয়াসীন। অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন অবতীর্ণ হওয়ার পর এ সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা, সূরা ইয়াসীনে তিনি বলেছেন ঃ يٰسٓ - والقرانِ الحكيمِ - انّكَ لمنَ المرسلينَ "ইয়াসীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ। নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১-৩)

www.pathagar.com

'ত্বা-হা'-কেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার এর দ্বারা 'মানুষ' ও 'পুরুষ' উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন 'ইয়াসীন'-কে 'হে সায়্যিদ' অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। এমনিভাবে 'ত্বা-হা'-কে 'হে ত্বাহের' (হে পবিত্র সত্তা) অথবা 'হে হাদী' (হে হিদায়াতকারী) রূপে প্রয়োগ করা হয়। তাহারা বলেন, আবজাদের হিসাব অনুযায়ী ط-এর মান ৯ আর ه-এর ৫। এ অক্ষর দুটির মানের সমষ্টি ১৪। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে এ কথা বলা যে, হে চতুর্দশ রজনীর চাঁদ। যেমন কবি বলেন ঃ

رخت را خوانده طه رامر درگاه + چو ماه چارده بل چارده ماه

কিন্তু মুফাস্সিরীনে কিরাম এ ধরনের তাফসীর ও ব্যাখ্যাকে বিদআত বলিয়াছেন। طه-কে তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার নামের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। মোটকথা, উভয় সূরাতেই হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা হইয়াছে। তাইতো বলা হইয়াছে ঃ

ترا عز لولاك تمكيں بس است * ثنائے توطه ويس بس اس

সূরা ইয়াসীনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঠিক পথের ও প্রতিষ্ঠিত দীনের উপর শপথ ও সাক্ষ্য রহিয়াছে। আর সূরা ত্বা-হা-এর মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার ভঙ্গিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন ইবাদত-বন্দেগী, বিশেষ করিয়া তাহাজ্জুদ ও রাতের নামায আদায় করার ক্ষেত্রে এত কঠোরতা অবলম্বন করিতে শুরু করিলেন যে, পা ফুলিয়া যাইত এবং কখনো কখনো এক পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সূরা 'ত্বা-হা' অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ طٰهٰ - مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى "ত্বা-হা। আমি তোমার উপর এ জন্যে কুরআন অবতীর্ণ করি নাই যে, তুমি যারপর নাই কষ্ট করিবে।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১, ২)।

'ত্বা-হা' যদি তাঁহার নাম হইয়া থাকে, তবে তা হইতেছে আহ্বানসূচক শব্দ। অর্থাৎ "হে ত্বা-হা।" আর যদি তা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হইয়া থাকে, তবে তা হইবে শপথ বাক্য। অর্থাৎ ত্বা-হা'র শপথ। আর যদি তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামের মধ্যে গণ্য করিয়া শপথের অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবু তা বৈধ হবে। এ ইলতিফাতের মধ্যে যেখানে মধ্যম পুরুষ হইতে নাম পুরুষের দিকে ধাবিত হইবে, এতেও বিশেষ দয়া ও মর্যাদা রহিয়াছে, যা ভালবাসার সালাদের মত সুস্বাদু। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى "যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, (কুরআন) শুধু তাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য।" এখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা উদ্দেশ্য।

এক বর্ণনায় আছে, রাতের বেলায় যখন তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন, তখন সীনা মুবারককে রশি দিয়া বাঁধিয়া লইতেন, যাহাতে নিদ্রা না আসে। আর সারা রাত জাগ্রত থাকিতেন।

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার ঐটিকে কিয়াস হইতে অনেক দূরবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতের

www.pathagar.com

সারকথা, তিনি নিজকে যেন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত না করেন। আর কাফিরদের কুফরী ও অস্বীকারের উপর অস্থির হইয়া যেন নিজকে কষ্ট না দেন। কেননা, আমি তো কুরআনে কারীমকে আপনার উপর এ জন্যে অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আপনি এর দ্বারা তাহাদেরকে মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করিবেন এবং তাহাদের প্রতি দীনের প্রচার-প্রসার করিবেন। যে কেউ ঈমান আনিবে, তার কল্যাণের জন্যেই তা আনিবে। আর যাহারা কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তা-ও তাহারা নিজের জন্যেই তা করিবে। আপনার দায়িত্ব তো শুধু তাদের নিকট হুকুম-আহকাম পৌঁছাইয়া দেওয়া। আপনার জন্য তাই যথেষ্ট। যেমন, অন্য স্থানেও স্নেহ-অনুগ্রহের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا "এরা এ কথা বিশ্বাস না করিলে সম্ভবত তাহাদের পেছনে ঘুরিয়া তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে।" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৬)

মোদ্দাকথা, হে আমার প্রিয়! তাহারা যদি ঈমান আনয়ন না করে, তবে তুমি কি তাদের পেছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিবে ?

আয়াতে উল্লিখিত 'হাদীস' শব্দ দ্বারা 'কুরআনে কারীম' উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন ঃ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ "আমি তো জানি, এরা যাহা বলে, এতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।" (সূরা হিজর ঃ ৯৭)

এরা তোমার উপর এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে। তোমাকে জাদুকর ও দেওয়ানা বলিয়া অভিহিত করে। মহান আল্লাহ্র সহিত শরীক সাব্যস্ত করে এবং কুরআনে কারীমের উপর অঁপবাদ দেয়। কাজেই, তুমি ধৈর্যধারণ করিতে থাক, কাফিরদের তো এ অবস্থাই আছে। তুমি উৎফুল্ল থাক। পরিণামে সাহায্য তোমার পক্ষেই থাকিবে। তোমার উপর কঠোরতার জন্য তো আমি কুরআনে কারীম অবতীর্ণ করি নাই যে, তুমি সর্বদা এদের চিন্তায় অস্থির হইয়া থাকিবে, যেমনটি অন্যান্য নবীগণ করিয়াছেন। (হে পাঠকবৃন্দ! এখানে হয়তো অন্তর সম্প্রসারণের স্থলে অন্তর সংকোচনের কথা বলায় আপনাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হইতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ "আমি কি তোমার অন্তর সম্প্রসারণ করিয়া দেই নাই ?" হইতে পারে ইহা তার আগের অবস্থা। এতদ্সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি নম্রতা, মহব্বত ও মনোরঞ্জন এ অবস্থার চাহিদা ও এ কথার বিকাশে বাকী থাকে।

সুরুচিবোধ ও মহান আল্লাহ্র প্রেমে মাতোয়ারাগণের কেহ কেহ বলেন, ইবাদত ও শরীআতের বিধান পালনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সীমাহীন ভালবাসা ও অনুরাগ সত্ত্বেও যে ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করিতেন, তা এ জন্যে যে, প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী ও সক্ষম আর বেচারা প্রেমিক দুর্বল ও অক্ষম। প্রেমাস্পদ যদি প্রেমিকের বুক চাপিয়া ধরিয়া চাপ দেয়, তো এ দুর্বল ও অক্ষম প্রেমিক নিরুপায় হইয়া বিশেষ ধরনের যাতনার শিকার হইবেন। তবে এ ক্ষেত্রে এ কথাও জানা যায় যে, এর মধ্যে কি পরিমাণ স্বাদ ও তৃপ্তি নিহিত রহিয়াছে। উপলব্ধিকারী তা উপলব্ধি করিতে পারে, আর বোধসম্পন্ন ব্যক্তি তা বুঝিতে পারে।

www.pathagar.com

দরূদ ও সালাম

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তা'যীম-তাকরীম, উঁচু মর্যাদা, অলৌকিকত্বের প্রকাশ ও মান-সম্মান বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় এ একটি অনন্য আয়াত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬)

হে মুসলমান সম্প্রদায়! তোমরা মহান আল্লাহ্র আনুগত্য কর, ফেরেশতাদের আনুকূল্যতা বজায় রাখ, আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর। তোমাদের আর ফেরেশতাদের দরূদ পাঠ করার অর্থ এই যে, তোমরা পালনকর্তার নিকট এ দু'আ কর যে, "হে আল্লাহ্! তাঁহার উপর তুমি শান্তি ও রহমত প্রেরণ কর।" তোমাদের শক্তি ও সামর্থ কোথায় আছে যে, তোমরা তাঁহার উপর দরূদ ও শান্তি পাঠাইতে পারিবে ? আর তোমাদের এত জ্ঞানগভীরতা-ই বা কোথায় আছে যে, তোমরা তাঁহার মান-মর্যাদার যথাযথ পরিমাপ করিতে পার ? আর সে অনুযায়ী দরূদ পাঠাইতে পার ? হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে জানেন, সে অনুযায়ী তিনিই তাঁর মর্যাদার মূল্যায়ন করিতে পারেন। আর আমরা মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ করিতে পারি। মূলত আমাদের দায়িত্ব তাহাই।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً اَنَّهٗ لَهَا اَهْلٌ وَّهُوَ لَهَا اَهْلٌ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের উঁচু-নিচু সকল স্থানের সকল অধিবাসীকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আ ও প্রশংসায় সমবেত করিয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের নিকট তাঁর মান-মর্যাদা ও কীর্তির ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং প্রাচী-প্রতীচী, জল-স্থল, আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী, কুরবে ইসতিওয়া ও হারীফে আকলামসহ সর্বত্র তাহা ঘোষণা করিয়া দিলেন। মুসলমানদের অন্তরে এমনভাবে তাঁর ভালবাসার স্থান করিয়া দিলেন যে, তাঁহার আলোচনায় তাদের আত্মা প্রশান্ত ও উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। তাঁহার আলোচনা শুনিয়া আনন্দে এমন বিনম্র হইয়া উঠে যে, তাঁহার স্মরণে হৃদয়ের স্পন্দন জাগিয়া ওঠে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তাঁহার অনুসরণের মধ্যে বিশ্বের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিব ,যাহাতে তাহারা তাঁহার প্রশংসা ও অনুসরণ করে। আর তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে। এমন কোন ফরয নামায নাই, যে নামাযের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্নাত নামাযের বিধান রাখেন

www.pathagar.com

নাই। অর্থাৎ ফরয আদায় করা যেন তাঁহার সুন্নাত পরিপূর্ণ করা। কাজেই, আমার বিধান অনুযায়ী ঐগুলির ফরয হওয়া আর তাহার বিধান অনুযায়ী ঐগুলির সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত হয়। মূলতঃ তাঁহার বিধান ও আমার বিধান একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ প্রতিটি ফরযের মধ্যে আমার বিধান ও তাঁহার বিধান নিহিত রহিয়াছে। আর আমি তাঁহার আনুগত্যকে আমার আনুগত্য ও তাঁহার হাতে শপথ করাকে আমার হাতে শপথ করার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি। তাঁহার কুরআনের শব্দাবলী মুখস্থ করিবে। মুফাস্সিরগণ আমার কুরআনের ব্যাখ্যা তাঁহার মাধ্যমে করিবে। ওয়ায়েযগণ তাঁহার উপদেশমূলক কথাগুলি মানুষের নিকট পৌঁছাইবে। রাজা-বাদশাহ, ফকীর-মিসকীন দূর-দূরান্ত হইতে সফর করিয়া আসিয়া তাঁহার দরবারে হাযির হইয়া সালাম পেশ করিবে। তাঁহার আলোকিত রওযার পবিত্র মাটি নিজের চেহারায় মাখিয়া নিবে। তাঁহার শাফাআতের আশাবাদী হইবে। তাঁহার বড়াই-মহত্ত্ব চিরন্তনকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকিবে। প্রশংসা সব আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِى الصَّلٰوةِ "নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা বানানো হইয়াছে"-এর এ ব্যাখ্যা করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, তাঁহার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এবং ফেরেশতারা তাঁহার উপর দরূদ পাঠ করেন। কিন্তু গবেষণালব্ধ বক্তব্য অনুযায়ী এর দ্বারা উদ্দেশ্য, নামায। 'হুসনে হাদী ও সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'-এর আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সূরা ফাত্হ

আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবার হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর যেসব পরিপূর্ণ নিআমত, পূর্ণাঙ্গ মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বরকত-রহমত নাযিল হইয়াছে সবগুলির দ্বারা সূরা ফাত্হ একটি সমৃদ্ধ সূরায় পরিণত হইয়াছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় এ সূরার প্রারম্ভিকা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا - لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا -

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়াছি। যেন মহান আল্লাহ্ তোমার পূর্বের ও পরের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আর মহান আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন" (সূরা ফাত্হ ঃ ১-৩)।

এ কথা একেবারেই স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর যেসব আকৃতিগত ও আকৃতিহীন বিজয় ও ফয়েয এবং

www.pathagar.com

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মর্যাদা ও বরকত দেওয়া হইয়াছে, তা অসীম ও গণনা বহির্ভূত। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন শহর বিজয় করা, মহান আল্লাহ্র বান্দাদের অধীনস্থ করা, গনীমতের সম্পদ অর্জন করা, দীনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া, উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ইসলামের প্রচার-প্রসার অন্যতম। তন্মধ্যে মক্কাহ্ মুকাররমার বিজয় একটি বড় ধরনের বিজয়। কেননা, পবিত্র মক্কাহ বিজয়ের পর বিভিন্ন আরব গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগিল। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র জগতের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এ সূরায় তাঁর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। আর এ বিজয় নিশ্চিতভাবে সংঘটিতব্য বিধায় অতীতকাল বুঝানোর শব্দ দ্বারা এবং 'সুস্পষ্ট বিজয়' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। এ বিজয় একেবারে খোলামেলা বিজয় এবং দীনের মধ্যে ইযযত-সম্মান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা অর্জনে সহায়ক। সুস্পষ্ট বিজয়ের অর্থ ইয্যত-সম্মানের বিকাশ সাধনকারী ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব সৃষ্টিকারী বিজয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-এর ব্যাখ্যায় অনেক মতামত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একটি মত হইল, এর দ্বারা ওই বিষয়গুলি উদ্দেশ্য যা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে প্রাগৈসলামিক যুগে সংঘটিত হইয়াছে। ইমাম সুবকী (র) বলেন ঃ এ বক্তব্যটি প্রত্যাখ্যাত, এ জন্যে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে জাহিলিয়্যাতের বাতাসও লাগে নাই। আরও কারণ এই যে, তিনি নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ও পরে সর্বদাই মাসূম-নিষ্পাপ। মুজাহিদ বলেন ঃ পূর্ববর্তী পাপ বলিতে মারিয়া (রা) ও পরবর্তী পাপ বলিতে হযরত যায়দ (রা)-এর স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করা হইয়াছে। ইমাম সুবকী বলেন, এ মতটি বাতিল। কেননা, মারিয়া (রা) ও যায়দ (রা)-এর স্ত্রীকে বিবাহ করায় মূলতঃ কোন পাপ-ই হয় নাই। যাহারা এ ধরনের বিশ্বাস রাখেন, তারা ভুল করেন। আল্লামা যামাখশারী 'কাশ্শাফ' গ্রন্থে ও বায়যাবী 'তাবইয়্যাত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এর দ্বারা সেইসব ভুলত্রুটি উদ্দেশ্য, যা তিরস্কারের যোগ্য। ইমাম সুবকী (র) বলেন, এ বক্তব্যটিও প্রত্যাখ্যাত। এ জন্যে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিষ্পাপ হওয়া প্রমাণিত। অবশ্য এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু ভুলত্রুটি যা তাঁর মান-সম্মানকে হ্রাস করে না– এ প্রসঙ্গে মতবিরোধ রহিয়াছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও অনেক অমু'তাযিলা সম্প্রদায়ও এটি বৈধ হওয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আর কাহারও কাহারও নিকট পসন্দনীয় মত হইল তাহা বৈধ না হওয়া। কেননা, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা ও কাজের অনুসরণ করিতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের হইতে এ ধরনের কাজ কিভাবে প্রকাশ পাইতে পারে, যাহা অশোভনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রলাপকারীরা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের উপর দুঃসাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করে। তাহারা বিনাশর্তে সাধারণভাবে এ কথা বৈধ হওয়ার প্রবক্তা। ওই অনর্থক কর্মকান্ডের প্রতি যদি তাহাদের এ কথার সম্বন্ধ সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে এর প্রতি মনোনিবেশ করা ও তাহা সঠিক হওয়ার যোগ্য নহে। কেননা, উম্মতের সর্বসম্মত মত ইহার পরিপন্থী। আর যাহারা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের জন্যে ছোট পাপকে বৈধ মনে করেন, তাহাদের নিকট না আছে কোন নাস্স (কুরআনের স্পষ্ট উক্তি) এবং না আছে

www.pathagar.com

কোন প্রমাণ। বরং তারা শুধু ওই আয়াতকে কিংবা এর মত অন্যান্য আয়াতগুলিকে নিজেদের মতের উৎস হিসাবে স্থাপন করে। আর এর উত্তর অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

পাপ নহে এমন ছোট দোষ নবীদের জন্য বৈধ কিনা? এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আতিয়্যাহ বলেন ঃ পাপ নহে এমন ছোট দোষ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা এ প্রসঙ্গে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে সঠিক কথা ইহাই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে এর কোনটিই প্রকাশ পায় নাই। ইমাম সুব্‌কী (র) বলেন ঃ আমি এতে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করি না, বরং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে এসব কিছু প্রকাশ পায় নাই। আর তাঁহার এ কথা ও অবস্থার পরিপন্থী ধারণা-ই বা কি করিয়া করা যাইতে পারে, যখন তাঁহার গুণ বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى "এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এ-তো ওহী যাহা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)

এখন বাকী রহিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন জীবনের আমল সম্পর্কীয় আলোচনা। হযরত সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা অকাট্যভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করিতেন এবং অল্প-বেশী, ছোট-বড় যাহা কিছু আমলই তাঁহার নিকট হইতে প্রকাশ পাইত উহার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই তাহারা অনুসরণ করিতেন। এমনকি গোপনে গোপনে ও নির্জনে তিনি যে আমল করিতেন সেইগুলি জানার জন্যও তাহাদের তীব্র বাসনা থাকিত এবং এর অনুসরণ করিতেন চাই তিনি তা জানিতেন কিংবা না জানিতেন। এ অবস্থাসমূহে যে কোন সাহাবীর আমলের ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করিবে, সে ভাল করিয়াই তাহা জানিতে পারিবে। যে কেহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় অবস্থাগুলিকে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি ও অবলোকন করিবে, সে এ ধরনের কথাবার্তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে মুখ হইতে বাহির করিতে কিংবা মনের মধ্যে এ ধরনের ধারণা পোষণ করিতেও লজ্জাবোধ করিবে। (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন কথা হইতে বিরত রাখুন।) ইমাম সুবকী (র) বলেন ঃ কেউ যদি এমন কথা না বলিতেন, তবে আমি এর আলোচনা করিতাম না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী যে বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এতে শুধু অসন্তুষ্টই নহি, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ন্যায়বিচার কামনা করিতেছি। ইহা হইতেছে যামাখশারীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ইমাম সুবকীর উক্তি যা আল্লামা সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর পুস্তিকাসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন। এ ছাড়া আরো কিছু বক্তব্য তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহার সংখ্যা এগার, বরং ইহা অপেক্ষাও বেশীতে পৌঁছিয়াছে। ইমাম সুবকী (র) এইগুলি তাঁহার তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি যখন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ -এর উপর চিন্তা-ভাবনা এবং এর পূর্বের ও পরের বিষয়বস্তুতে গভীরভাবে গবেষণা করি, তখন একটি মাত্র কারণ ছাড়া এখানে আর কোন সম্ভাবনার অবকাশ আমি খুঁজিয়া পাই না। আর ওই কারণটি হইতেছে– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন প্রকার গুনাহ্ ও অপরাধ ছাড়াই শুধুমাত্র তাঁহার

www.pathagar.com

মর্যাদা-সম্মান প্রকাশ করা। ইমাম সুবকী বলেন ঃ এ অর্থ ও কারণের উৎস খুঁজিতে গিয়া আমি ইব্ন আতিয়্যাহ্কেও এর প্রবক্তা হিসেবে পাইলাম। তিনি বলেন, "এ নির্দেশনার সহিত আয়াতের অর্থ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটানো। এতে কোন প্রকার গুনাহ ও অপরাধ কল্পনা করা যায় না।" আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাওফীকপ্রাপ্ত হইয়াই ইব্ন আতিয়্যা তাহা বলিয়াছেন। সুবকী (র)-এর কথা এখানেই শেষ।

এ কথাটি সংক্ষিপ্ত, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল এই যে, মুনীব কখনো কখনো তাহার দাসদেরকে তাহার বিশিষ্ট ও নিকটবর্তীদের মাধ্যমে সম্মানিত করে ও মহত্ত্ব দান করে। আর বলে যে, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব ধরনের অপরাধ মাফ করিয়া দিলাম। অথচ মুনীব ভাল করিয়াই জানেন যে, তাহার নিকট হইতে আগে-পরে কখনো কোন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু দাসদের উদ্দেশ্যে মুনীবের এহেন কথা দাসদের জন্য গৌরবের বিষয়। সুতরাং ভাল করিয়া বুঝিয়া নিন। আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করিতেছি। কোন কোন মুফাস্সির বলিয়াছেন, এখানে মাগফিরাত (ক্ষমা করিয়া দেওয়া) দ্বারা তাঁহার নিষ্পাপ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তখন ইহার অর্থ হইবে এই যে,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اَىْ لِيَعْصِمَكَ اللّٰهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمْرِكَ وَفِيْمَا تَأَخَّرَ مِنْهُ۔

"যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত জীবনের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। অর্থৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমার অতীত জীবন ও ভবিষ্যত জীবনকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখেন।"

ইহা খুবই সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য একটি বক্তব্য। নিঃসন্দেহে অলংকার শ্রাস্ত্রবিদগণ কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গিকে 'বালাগাত'-এর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। 'হালকা' ও 'অপূর্ণ' স্থানগুলিকে বুঝানোর জন্য কুরআনে কারীমের মধ্যে 'মাগফিরাত' 'আফু' ও 'তাওবা' শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন রাত্রি জাগরণ রহিত ও হ্রাস প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ঃ "তিনি জানেন, তোমরা তা পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে পারিবে না, অতএব, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছেন।" (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০)

এমনিভাবে অগ্রিম সাদাকা প্রদানের বিধান রহিত করে ইরশাদ করেন ঃ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ "যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।" (সূরা মুজাদালা ঃ ১৩)

রমযান মাসের রাতের বেলায় সহবাস নিষিদ্ধের বিধান রহিত করিতে গিয়া ইরশাদ করেন- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ "সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

www.pathagar.com

অতঃপর বলেন ঃ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ "অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সংগত হও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

মুফাস্সিরীনে কিরাম এ কথাও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের যেসব স্থানে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের তাওবা ও মাগফিরাতের আলোচনা করিয়াছেন, সেখানে তাহাদের ওই স্খলন ও ক্রুটির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাহাদের হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল। যেমন হযরত আদম আলায়হিস সালামের ব্যাপারে বলিয়াছেন ঃ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّه "আর আদম তাহার রব্বের নাফরমানী করিল।"

হযরত নূহ্ আলায়হিস সালামের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন। اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ। "আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।" (সূরা হূদ ঃ ৪৬) হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামের মর্যাদায় বলেন, فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ "সে মনে করিয়াছিল, আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭) হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى "সুতরাং প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না"। (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)। হযরত মূসা আলায়হিস সালামের ঘটনায় বলিয়াছেন ঃ فَوَكَزَه مُوْسٰى "তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল।" (সূরা কাসাস ঃ ১৫)। কিন্তু সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে فتح বিজয় সম্বলিত বিষয়কে আগে বর্ণনা করিয়াছেন। এরপর অতীত ও ভবিষ্যতের অপরাধের ক্ষমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং অপরাধের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছেন।

শায়খ আযীযুদ্দীন আবদুস সালাম তাঁহার লিখিত গ্রন্থ نِهَايَةُ السُّئُوْلِ فِيْمَا سَنَحَ مِنْ تَفَضُّلِ الرَّسُوْلِ 'নিহায়াতুস-সুউল ফীমা সানাহা মিন তাফায্যুলির রাসূল'-এর মধ্যে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য নবীর উপর অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ওই দিকগুলির বর্ণনা দিতে গিয়া একটি দিকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতেই তাঁহার পূর্বাপর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার সংবাদ দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন নবীকে এমন সংবাদ প্রদান করেন নাই। বরং তাঁহাদের মোটেও এই ধরনের কোন খবর দেওয়া হয় নাই। এ কারণেই হাশরের ময়দানের কঠিন মুহূর্তে নিজ নিজ উম্মতগণ তাঁহাদের নিকট সুপারিশের আবেদন করিলে তাহারা নিজ নিজ অপরাধের কথা বলিয়া অপরাগতা প্রকাশ করিবেন। আর এ ভয়ানক স্থানে সুপারিশ করিতে কেউ রাযীও হইবেন না। আর সকল মানুষ যখন এ কঠিন মুহূর্তে সুপারিশের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিবে, তখন তিনি বলিবেন, হ্যাঁ ইহা তো আমারই কাজ। এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য সর্বপ্রথম فتح مبين 'সুস্পষ্ট বিজয়' সাব্যস্ত করিয়াছেন। এরপর ক্ষমা ও অপরাধের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তারপর নিআমতের পূর্ণতা, হিদায়াতের সাব্যস্ততা, সিরাতে মুসতাকীম, নসরে আযীয অর্থাৎ

www.pathagar.com

প্রবল সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, এখানে অপরাধ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নহে, বরং তাহা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। অতএব, ভাল করিয়া বুঝিয়া নাও। মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাওফীক কামনা করিতেছি। এ গোটা আলোচনাটি আল্লামা সুয়ূতী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ "আর তোমার উপর তাঁহার নিআমতরাজি পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।" প্রকাশ থাকে যে, সব ধরনের মর্যাদা ও পূর্ণতা এবং ফয়েয ও বারাকাত এ শব্দটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বিশেষ ও ব্যাপক নিআমতগুলির মধ্যে যাহা কিছুই উল্লেখ করা হউক না কেন কিংবা যাহা কিছুই খেয়াল ও ধারণার মধ্যে আসে এইগুলি খেয়াল এবং গণনার হিসাব করিতে অক্ষম। এর আলোচনা ও বর্ণনা করিতে বাকযন্ত্র বাকশক্তিহীন হইয়া পড়ে। প্রকাশ ও বর্ণনার আওতায় যাহা কিছুই পড়ে, তাহা সবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। এর বিশদ বিবরণ পেশ করা সম্ভাব্য শক্তির বহির্ভূত বিষয়।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

"বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে– আমরা এর সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও।" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৯)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ ـ

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবু আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না।" (সূরা লুকমান ঃ ২৭)

গবেষক মহলের দৃষ্টিতে এ শব্দগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে সেইসব মান-মর্যাদা, পূর্ণতা, মূলতত্ত্ব ও মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ, যা মহান আল্লাহ্‌র দরবারের বিশেষ ব্যন্দাগণ, আম্বিয়ায়ে কিরাম, সূফিয়ায়ে কিরাম বিশেষ করিয়া সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি বর্ষিত হয়। অন্যথায় যেসব গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য, সেগুলি ইহা হইতে মুক্ত। এর কোন উপমা নাই। নিআমতের ব্যাপকতা ও দীন-দুনিয়ার নিআমতের ব্যাপকতার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ

১. এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কিরামের এ বক্তব্য ও ব্যাখ্যাগুলি তখনই প্রযোজ্য হইবে, যখন তাহারা আয়াতে কারীমার لِيَغْفِرَ لَكَ -এর لام হরফে জরটিকে تخصيص -এর অর্থে ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এ لام টিকে যদি تخصيص -এর পরিবের্ত تعليل ও سبب -এর অর্থে প্রয়োগ করিতেন, তবে এ দূরবর্তী ব্যাখ্যার ঝামেলা হইতে বাঁচা যাইত। لام ببية মানিয়া নিলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-সম্মান ও উঁচু মর্যাদার উপর অনুপম দলীলে পরিণত হইত। এমনকি জালালাইন গ্রন্থকারও এটিকে تعليل ও سببية হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

করিয়া দুইটি নিআমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত, সরল-সঠিক পথে পথ প্রদর্শন করা যাহা নিআমতপ্রাপ্তির মৌলনীতি, সফলতার ফসল ও মানুষের নির্দেশনা। কেননা, রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই ইহা। দ্বিতীয়ত, পার্থিব নিআমত, যাহার উদ্দেশ্যও হচ্ছে দীন, যেমনটি প্রথম নিআমত এবং যাহা বিশ্বের শান্তি ও বিদ্যমান বস্তুর কর্মশালার শৃংখলার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا "তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।" (সূরা ফাত্হ ঃ ২-৩)

ইব্ন আতা বলেন ঃ এ অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য একাধিক বড় বড় নিআমত একত্রিত করিয়াছেন। প্রথমত, সুস্পষ্ট বিজয়, যা কবুল হওয়ার লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, মাগফিরাত, যাহা ভালবাসার অনন্য লক্ষণ, তৃতীয়ত, নিআমতের পূর্ণতা, যা বিশেষত্বের লক্ষণ। চতুর্থত, হিদায়াত, যা বিলায়াতের লক্ষণ। মাগফিরাত সমস্ত অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র অর্থাৎ যে কোন ধরনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর নিআমতের পূর্ণতা হইতেছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রচার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। আর হিদায়াত ও মুশাহিদার প্রতি আহ্বান। আর ইহাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা এত উঁচু হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহান আল্লাহ্র নিকট কোন জিনিস এ পর্যন্ত পৌঁছা কল্পনাও করা যায় না। তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ "যাহারা তোমার হাতে বায়আত করে, তারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর।" (সূরা ফাত্হ ঃ ১০)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যাহারা রাসূলের অনুসরণ করিল, তাহারা যেন আল্লাহ্র অনুসরণ করিল" (সূরা নিসা ঃ ৮০)।

অন্য এক স্থানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যে রাসূলকে অনুসরণ করিল, নিশ্চয় সে আল্লাহ্কেই অনুসরণ করিল" (সূরা নিসা ঃ ৮০)।

যদিও আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী তা রূপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃত তথ্য উদঘাটনকারীরা জানেন যে, এখানে কি ইঙ্গিত রহিয়াছে। মহান আল্লাহ্-ই ভাল জানেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের উপর প্রশান্তি, নিষ্ঠা ও সুখ-শান্তি এবং বিশ্বাস নাযিল করার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর সূরার শেষাংশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুহবতে থাকার কারণে তাঁহার সাহাবীগণ পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা, ইহা ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। কাফিরদের সহিত সে সাহাবায়ে কিরামের কঠোর আচরণ, তাহাদের বিপরীত কাজকর্ম করা এবং মুসলমানগণের সহিত পরস্পরের হৃদ্যতা-সখ্যতা ও ভালবাসামূলক আচরণ করা দীন-ধর্মের কারখানার বিধান। তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের গুণাবলীকে এইভাবে প্রকাশ

www.pathagar.com

করিয়াছেন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ "আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন আর তাহারাও আল্লাহ্কে ভালবাসে।" যেমন সূরা মায়িদায় ইরশাদ করেন ঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ। "তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে।" আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহাপুরস্কার ও মাগফিরাতের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এইগুলি সব অবদান স্বীকৃতির কারণ এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইয্যত-সম্মানের বর্ণনা।

সূরা কাওছার

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি যত প্রকার মান-মর্যাদা, ইয্যত-সম্মান, পূর্ণতা-দক্ষতা ও ফয়েয-বরকত প্রদান করা হইয়াছে, সবগুলি এ একটি শব্দ 'জাওয়ামিউল কালিম'-এর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ। "হে প্রিয়! নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।" (সূরা কাওছার ঃ ১)। কেননা, 'কাওছার' শব্দের অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রচুর কল্যাণ। এ শব্দটি খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এ ভেদ প্রকাশ করিতে সক্ষম। গোটা বিশ্বের সমস্ত আলিম সমাজ যদিও ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, তবু ইহার হক আদায় করিতে পারিবে না। এর মূলতত্ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তথাপি আমার দৃষ্টিতে যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে, তা আমি লিখিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই আমি তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।" কাওছারের প্রতিটি নিআমত সারা দুনিয়া হইতেও বড়। আমি যখন তোমাকে এত বড় নিআমত-ই দান করিয়াছি, তখন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।" (সূরা কাওছার ঃ ২-৩)

ইবাদত দুইপ্রকার। ১. শারীরিক ইবাদত ২. সম্পদগত ইবাদত। "তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর" বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা শারীরিক ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর 'কুরবানী কর' দ্বারা সম্পদগত ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ। (আমি তোমাকে দান করিয়াছি)-এর মধ্যে 'দান করিব' শব্দটি না বলিয়া 'দান করিয়াছি' অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব দান তাঁহার শারীরিক গঠন সৃষ্টির পূর্বেই তাঁহার জন্য নির্ধারিত ছিল। যেমন তিনি বলেন, كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ "আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন আদম রূহ ও শরীরের মাঝখানে ছিল।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আপনার অস্তিত্বে আপনি প্রবেশ করার পূর্বেই আমি আপনাকে সমুদয় নিআমত দান করিয়াছি। সুতরাং এখন অস্তিত্বে প্রবেশের পর কি করিয়া দান করা ছাড়াই ছাড়িয়া দিতে পারি? আর সর্বদা তাঁহার ইবাদতে লিপ্ত থাকার বিষয়টি তো ব্যাপক মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। যা তাঁহার ইবাদত-বন্দেগীর বিনিময়ে দেওয়া হয় নাই। বরং অনাবশ্যকীয়ভাবে ও বিনা কারণে শুধুমাত্র অনুগ্রহ স্বরূপ। ইজতিবা (নির্বাচিত)-এর অর্থের মর্মকথা ইহাই যদি কেহ বলে, সমস্ত নবীকে, বরং সমস্ত

www.pathagar.com

মানবজাতিকে যা কিছুই দেওয়া হইয়াছে, তা-তো অস্তিত্বে প্রবেশের পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তা-ই দেওয়া হইয়াছে। তাহলে মর্যাদা তো এ ক্ষেত্রে হওয়া উচিত যে, তাহাকে কি সবচেয়ে আগে দান করা হইয়াছে, নাকি সবচেয়ে বেশী দান করা হইয়াছে। ইহার জবাবে বলা যাইবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত ও তাঁহার পূর্ণতা-দক্ষতা-যোগ্যতা রূহ জগতের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছিল আর অন্য নবীগণের পবিত্র রূহগুলি তাঁহার নিকট হইতে ফয়েয লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। যেমনটি كُنْتُ نَبِيًّا হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য নবীগাণের নুবুওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান-ভাণ্ডারেই ছিল। ইহার বাহিরে নহে।

এক বর্ণনায় আছে, 'কাওছার' দ্বারা উদ্দেশ্য, জান্নাতের একটি নহর। যেমন এর গুণাগুণ বর্ণনায় হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, এর নাম কাওছার এজন্য রাখা হইয়াছে যে, মানুষ কাছরতের সহিত অর্থাৎ বেশী বেশী এর নিকট যাইবে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সফরের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন, আমি জান্নাতে সফর করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি নহর আমার নযরে পড়িল। দেখিলাম, এর চতুর্দিকে শুধু গম্বুজ আর গম্বুজ। যা ফাঁপা মোতি দ্বারা তৈরী করা হইয়াছে। যাহার মাটি মেশ্‌কের মত সুঘ্রাণযুক্ত। জিবরাঈলকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কী ? তিনি বলিলেন, ইহা কাওছার, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। বুখারী তা বর্ণনা করিয়াছেন। সালাফীদের নিকট মাশহুর ও প্রসিদ্ধ তাফসীর ইহাই।

কেহ কেহ বলেন, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সন্তান। কেননা, এ সূরাটি ঐ ব্যক্তির বক্তব্য খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে নাযিল হইয়াছে, যে তাঁহাকে নির্বংশ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তোমাকে এমন সন্তান দান করিয়াছি, যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে।

ফাইদা

আবার কেহ কেহ বলেন, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য কল্যাণের প্রাচুর্য। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হইতে কাওছার শব্দের অর্থ দরূদের প্রাচুর্য। মোটকথা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা তাঁহাকে নির্বংশ হওয়ার অপবাদ দিয়াছিল।

'আয়নুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হইয়াছে 'কাওছার' শব্দটি فَوْعَلُ 'ফাওআল'-এর ওযন অনুযায়ী كَثْرَةٌ ধাতু হইতে আসিয়াছে। যেমনিভাবে نَفْلٌ ধাতু হইতে نَوْفَلٌ এবং جَهْرٌ ধাতু হইতে جَوْهَرٌ শব্দ আসিয়াছে। এর বিপরীত اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ বিধেয় আসিয়াছে। মোদ্দা কথা, যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নির্বংশ বলিয়া অপবাদ রটাইয়াছে, পরিণামে তাহারাই নির্বংশ প্রমাণিত হইয়াছে। 'আবতার' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার কোন বংশ নাই। কাশ্‌শাফ গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'কাওছার' শব্দটি 'ফাওআল' (فَوْعَلُ)-এর ওযনে আসিয়াছে। যাহার অর্থ প্রাচুর্য। আর ইহাতে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রচুর প্রচুর। কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ছেলে সফর হইতে আসিয়াছে। মানুষেরা তাহাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ছেলে কিরূপে ফিরিল ? সে বলিল, جَاءَ بِالْكَوْثَرِ –'সে প্রচুর কল্যাণের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি 'কাওছার' অর্থ করিতেন 'প্রচুর কল্যাণ'। ইহাতে হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র তাঁহাকে বলিলেন, মানুষেরা তো বলে, 'কাওছার' জান্নাতের একটি নহরের নাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, ইহাও প্রচুর কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকার। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আমি তোমাকে উভয় জাহানের কল্যাণসমূহ দান করিয়াছি। এর আধিক্যের কোন সীমারেখা নাই। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে এত বেশী দেওয়া হয় নাই। আর এত কিছুর দাতা হইলাম আমি। আমি সারা বিশ্বজাহানের মালিক। কাজেই, তোমার জন্য আমিই সবচেয়ে বেশী মহত্ত্ব প্রদানকারী, সবচেয়ে বেশী দানকারী, সবচেয়ে বেশী ক্ষমাকারী এবং বড় ধরনের পুরস্কার প্রদানকারী। فَصَلِّ لِرَبِّكَ সুতরাং তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে তুমি সালাত আদায় কর। তিনি তোমাকে তাঁহার দানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। আর সেইসব লোকের অনুগ্রহ হইতে তোমাকে হিফাযত করিয়াছেন, যাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করিয়াছে। وَانْحَرْ আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে কুরবানী কর। এতে সেইসব লোকের বিপরীত কাজ কর, যাহারা প্রতিমার নামে যবাহ্ করে। إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ। নিঃসন্দেহে যাহারাই তোমার সহিত শত্রুতা পোষণ করে, তোমার বিরোধিতা করে, মূলত তাহারাই নির্বংশ, তাহারাই বরকতশূন্য। তুমি নির্বংশ নহ। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ জন্মগ্রহণ করিবে, সে-ই তোমার রূহানী সন্তান ও উত্তরসূরী হইবে। আর তোমার আলোচনা মিম্বর ও বক্তৃতার মঞ্চে উচ্চকিত। কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের রসনা তোমার আলোচনায় সিক্ত থাকিবে। যে কোন কাজের শুরুতো তাহারা মহান আল্লাহ্র নামেই করিবে। আর দ্বিতীয়ত, মহান আল্লাহ্র পর তোমার নাম নিবে। পরকালে তোমার যে মর্যাদাগত অবস্থান হইবে, তা তো বর্ণনাশক্তির বহির্ভূত বিষয়। তোমার মত মহান ব্যক্তিত্বকে 'আবতার' (নির্বংশ) বলার প্রবক্তারাই মূলত নির্বংশ। দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও তাদের নাম নেওয়ার মত কেহ নাই। কেহ যদি তাহাদের নাম উচ্চারণও করে, তবে তা অভিশাপের সুরে।

আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ বলেন, 'কাওছার' দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মতের সংখ্যাধিক্য। হাসান বসরী এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া কুরআনে কারীমের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইকরিমার মতে নুবুওয়াত, মুগীরার মতে ইসলাম এবং হুসায়ন ইব্ন ফযলের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআনে কারীমের সহজতা ও শরীআতের শীতলতা। কাহারও মতে এর উদ্দেশ্য অধিক উম্মতের মাঝে সুপারিশ করা, কারো মতে নুবুওয়াতের মু'জিযা, কাহারও মতে নুবুওয়াত ও মু'জিযা, মহান যিক্র ও শত্রুতার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান এবং কাহারও মতে উম্মতের উলামায়ে কিরাম। কেননা, উলামায়ে কিরাম হইতেছেন নবীগণের ওয়ারিছ। ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কাওছার' দ্বারা 'ইলম' উদ্দেশ্য নিয়াছেন। এর লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন পরবর্তী আয়াতকে। এতে বলা হইয়াছে فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ –তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। ইবাদতের মধ্যে

www.pathagar.com

ইহাই সর্বপ্রথম বিষয়। ফলাফল দাঁড়াইল ইল্ম-ই। সংখ্যাধিক্য ও প্রশস্ততার ক্ষেত্রে কোন বস্তু ইল্ম-এর গুণ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন, কাওছার হইতেছে সৃষ্টির সৌন্দর্য। সঠিক কথা হইল, কাওছার নির্দিষ্ট কোন বস্তুর সহিত নির্ধারিত নহে। বরং যোগ্যতা-দক্ষতার সবগুলি গুণই এর মধ্যে শামিল রহিয়াছে।

সম্বোধন করার ধারাবাহিকতায় উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করার পর আরও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন। যেমন ইব্ন আতা বলেন, হে প্রিয়! আমি তোমাকে তোমার রব্বের রবুবিয়্যাতের পরিচয়, তাঁহার একত্ববাদের অদ্বিতীয়তা এবং তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থের পরিচয় দান করিয়াছি।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। -এর অর্থ বর্ণনা করিতে গিয়া সাহ্ল তাস্তরী বলেন, আমি তোমাকে একত্ববাদ সম্পর্কীয় অধিক ইল্ম, একত্ববাদ সম্পর্কীয় জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ এবং তাঁহার অনুপম তাজাল্লীর সহিত আধিক্যের মধ্যে একত্ববাদের সাক্ষ্যের পরিচয় দান করিয়াছি। আর এ তাজাল্লী জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারার মত যে, যে কেহ একবার মাত্র এর পানি পান করিবে, সে কখনো আর পিপাসিত হইবে না। فَصَلِّ لِرَبِّكَ-এর সারকথা হইল–স্বচক্ষে দেখা ও আধিক্যের মধ্যে যখন একত্ববাদকে প্যাইয়া গেল, তখন নামাযের উপর অটল থাকার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে রূহের দর্শন, অন্তরের উপস্থিতি, নফসের আনুগত্য ও শরীরের ইবাদত দ্বারা বারবার ইবাদতের আকৃতি গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। কেননা, এ পরিপূর্ণ নামাযই সমস্ত হক আদায় করার পন্থা। وَانْحَرْ অর্থাৎ আমিত্বের উট ও গরুকে যবাহ্ করুন। যাহাতে তোমার মধ্যে আমিত্বের রং বিকশিত না হয় এবং তোমাকে 'তামকীন'-এর মর্যাদা হইতে বিচ্যুত না করে আর আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের মধ্যে সীমিত রাখে। তা বাকী থাকার পাশাপাশি তুমিও যাহাতে সর্বদা বাকী থাকিতে পার। যাহাতে তোমার অন্তর্ধানের সময়, তোমার সহিত তোমার উম্মতের সাক্ষাতের সময় এবং তোমার বংশধরদের মধ্যে কাহারও উপর যেন নির্বংশের বিষয়টি পতিত না হয়। প্রকৃতপক্ষে তোমার সহিত শত্রুতা পোষণকারীরাই আল্লাহ্ তা'আলা হইতে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তাহারাই মূলত নির্বংশ, তুমি নহ।

মাওলানা তাজুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আল-মাসদারুল বুখারী 'হাকায়েকুল হাদায়েক' গ্রন্থে বলেন ঃ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। -এর অর্থ নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে অসংখ্য-অগণিত কল্যাণের প্রাচুর্য এবং প্রত্যেক প্রকারের বেশুমার মর্যাদা দান করিয়াছি।

মোটকথা, 'কাওছার' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বড় বড় উলামায়ে কিরামের অনেক বক্তব্য ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে। নিজ নিজ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে যতটুকু দেখিয়াছেন, তিনি ততটুকু বলিয়াছেন। কিন্তু, সারা জাহান মাখলূকের ইল্ম-জ্ঞান 'কাওছার'-এর ব্যাপৃত জ্ঞানের এক কোণ পর্যন্তও পৌছিতে পারিবে না । সংক্ষিপ্ত হওয়ার দিক হইতে এসব বিশদ বিবরণ বিশাল একটি বইয়ের তুলনায় একটি অক্ষর মাত্র এবং এই নদীর একটি ফোঁটা মাত্র। ফসলুল খিতাবের আলোচনা এখানেই শেষ। মহান আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

মীছাক বা প্রতিশ্রুতি বিষয়ক আয়াত

এ আয়াত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ মর্যাদার উপর প্রমাণ বহন করে এবং এ কথার ঘোষণা দেয় যে, তিনি নবীকুলে নবী ও সমস্ত নবীর সর্দার। অন্যান্য সকল নবী তাঁহার উম্মতের সমতুল্য। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ - قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ - فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীগণের অঙ্গীকার নিয়াছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে, তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে, তখন তোমরা অবশ্যই তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন, তোমরা কী স্বীকার করিলে ? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কী তোমরা গ্রহণ করিলে ? তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম। এরপর যাহারা মুখ ফিরাইবে, তাহারাই সত্যপথ ত্যাগী।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮১-৮২)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া শেষ নবী পর্যন্ত সমস্ত নবীর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হইয়াছে। মুফাস্‌সিরীনে কিরামের সম্মিলিত মাযহাব এটিই যে, আয়াতে কারীমায় 'রাসূল' বলিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্তাকে বুঝানো হইয়াছে। এমন কোন নবী পাঠানো হয় নাই, যাহার নিকট রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করা হয় নাই এবং গুণসমূহ বর্ণনা করার পর এ প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা না নেওয়া হইয়াছে যে, যদি তুমি তাঁহার যুগ পাও, তবে অবশ্যই তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। আর তাহারাও তাহাদের নিজ নিজ উম্মতদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়া থাকিবে। যেহেতু আম্বিয়া কিরাম মূল ও অনুসরণীয়। তাই আয়াতে তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে।

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন যে, তুমি যদি মুহাম্মদ (সা)-কে পাও, তবে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে, তাঁহার সহযোগিতা করিবে। আবার কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ওয়াদা নিয়াছেন যে, তাহারা যেন নিজ নিজ উম্মতদের নিকট হইতে এই ওয়াদা নিয়া নেয় যে, যখন মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হইবেন, তখন তোমরা সবাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। এইভাবে পরবর্তী প্রজন্মকেও বলিতে থাকিবে। এমনিভাবে এ ধারাবাহিকতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের যুগের ইয়াহূদীদের পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে। যখন মদীনা শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আলোকবিভায় উদ্ভাসিত হইলেন, তখন ইয়াহূদীরা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। যাহারা এ কথা সংকলন করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের নিকট হইতে এ মর্মে ওয়াদা নিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ উম্মতের নিকট হইতে ওয়াদা নেয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পরে আহলে কিতাবের উপর ফরয হইতেছে তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করা। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের সময় সমস্ত নবী দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত ব্যক্তি মুকাল্লাফ (শরীআত পালনে আদিষ্ট) নহে। কাজেই, এ কথা নির্ধারিত হইল যে, ওয়াদা আসলে উম্মতদের নিকট হইতে নেওয়া হইয়াছে। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীও উপস্থাপন করা যায়। ইরশাদ হইতেছে ঃ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ "সুতরাং যাহারা ইহার পর হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে, তাহারা সত্যপথ ত্যাগী।"

এ ধরনের গুণ নবীগণের জন্য শোভনীয় নহে, বরং উম্মতের জন্য তা গ্রহণযোগ্য। এর উত্তরে বলা হয়, এ আয়াতের উদ্দেশ্য মনে মনে ধরিয়া নিতে হইবে। মোদ্দা কথা, যদি মনে করা হয় যে, নবীগণ জীবিত আছেন, তো তাহাদের উপর ওয়াজিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করা। এর অর্থ এই নহে যে, তাহাদের অস্তিত্বের মধ্যে তা পাওয়া যাইতেই হইবে। মনে মনে ধরিয়া নেওয়ার এমন অনেক বিধান অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিধান প্রচলিত আছে। যেমন لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "তুমি যদি শির্ক কর, তবে অবশ্যই তোমার আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ –"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত।"

وَمَنْ يَّقُلْ اِنِّىْ اِلٰهٌ "আর যে বলিবে, আমি মা'বূদ।" এসই হইল মনে মনে ধরিয়া নেওয়ার উদাহরণ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা, ইয্যত-সম্মানের বিকাশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আলোচ্য বাক্যের অর্থ যখন মনে মনে ধরিয়া নেওয়ার অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার মহাবাণী "এরপর যে কেহ মুখ ফিরাইয়া নিবে, সে সত্যত্যাগী" মন্তব্য যথার্থ। আবার যখন নবীগণকে নির্দেশ দেওয়া হইবে এই মর্মে যে, তাহাদের নিকট হইতে এই ওয়াদা নেওয়া হইবে যে, তাহারা হায়াত পাইলে যেন শেষ নবীর উপর ঈমান আনয়ন করে, তখন ইহাও যথার্থ হইবে। আর আয়াতে কারীমা فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর সম্বন্ধ উম্মতের সহিত হইবে। সুতরাং নবীগণের নিকট হইতে ওয়াদা নেওয়া, এর উপর গুরুত্বারোপ ও মযবূত করা উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ও শক্তিবর্ধক।

www.pathagar.com

ইমাম সুবকী (র) বলেন, এ আয়াতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নবীর তাকদীরী জীবনে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। কাজেই, তাঁহার নুবুওয়াত ও রিসালাত ব্যাপক ও সর্বজনীন। হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া সমস্ত নবী ও তাহাদের উম্মতগণও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ "আমি সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি" এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ "আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরণ করিয়াছি।" এই আয়াতগুলি প্রমাণ করে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত ও রিসালাত শুধু তাঁহার যুগ হইতে কিয়ামত পর্যন্ত–এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহাতে সেইসব মানুষও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যাহারা তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে নবীগণের নিকট হইতে ওয়াদা এ জন্য নেওয়া হইয়াছে যে, তিনি সবার অগ্রগামী ও প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি সবার নবী ও রাসূল। সুতরাং হে সত্যের সন্ধানীরা! গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহিমা প্রকাশে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কত বড় ভূমিকা। যখন তোমরা এ কথা জানিয়া যাইবে যে, তাহারা সব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবী আর তিনি সমস্ত নবীগণের নবী। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন হযরত আদম (আ) ও তাঁহার সমস্ত সন্তানাদি তাঁহার পতাকাতলে অবস্থান করিবে। যেমন তিনি নিজেই বলেন ঃ اٰدَمُ وَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِىْ "আদম ও তাঁহার পরবর্তী সমস্ত মানুষ আমার ছায়াতলে অবস্থান করিবে।" যদি মানিয়া নেওয়া যায় যে, সমস্ত নবী যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে হইতেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতেন এবং তাঁহার সাহায্য করিতেন। এ জন্যেই তো তিনি বলিয়াছেন لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَّا وَسِعَهُ اِلاَّ اتِّبَاعِىْ "পার্থিব জগতে যদি হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁহার আর কোন উপায় থাকিত না।" আর তা ঐ ওয়াদার ভিত্তিতে হইত, যাহা তাহাদের নিকট হইতে নেওয়া হইয়াছে। কাজেই, হযরত ঈসা (আ) শেষ যুগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীআতের অনুসারী হইয়া আগমন করিবেন। অথচ তিনিও ইয্যত-সম্মানের অধিকারী ও নিজের নুবুওয়াতের উপর বহাল রহিয়াছেন। তাঁহার নুবুওয়াত হইতে কোন অংশ হ্রাসও করা হয় নাই। এমনিভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থানও অনুরূপ। তাঁহারা নিজেই নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের উম্মতসহ সবাই তাঁহার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তাঁহার নুবুওয়াত ব্যাপক, সর্বজনীন ও সমৃদ্ধ। এ অর্থ গ্রহণে গভীরভাবে চিন্তা করুন। যাহাতে অন্যান্য নবীর নুবুওয়াত ও রিসালতের বিলুপ্তি কিংবা অস্বীকৃতির কল্পনাও উদয় না হয়। এ ধারাবাহিকতায় 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের লেখকও অনুরূপ বলিয়াছেন। এখানে এ প্রসঙ্গে যাহা কিছু উল্লেখ করা হইল, তিনি এর চেয়ে বেশী গবেষণা ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

অধম অর্থাৎ শায়খ মুহাক্কিক শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, প্রকাশ থাকে যে, বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, নবীগণের নিকট হইতে ওয়াদা ও

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি নেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ "যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত দিব ..."।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাযা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নেওয়ার সময় আম্বিয়ায়ে কিরাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনিতেন, তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতা করিতেন"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, আনুকূল্য, ওয়াদার দৃঢ়ীকরণ অথবা সাহায্য-সহযোগিতার ইচ্ছা করা যা অস্তিত্ববান এ পৃথিবীতে আসিয়াছে। অনেক মানুষ এমনও রহিয়াছে, যাহারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শারীরিক গঠনাকৃতি সৃষ্টির পূর্বেই তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। যেমন হাবীব নাজ্জার প্রমুখ। পূর্ববর্তী যুগে অতিবাহিত হইয়া যাওয়া অনেক মানুষই তাঁহার মান-মর্যাদা, ইয্যত-সম্মান ও নুবুওয়াত-রিসালাতের খবর শুনিয়াই ভাগ্যবান হইয়াছিল।

সমস্ত আম্বিয়া কিরাম ও তাঁহাদের উম্মতগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁহাদের নিকটও প্রেরিত হইয়াছেন। ইসরা রজনীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম মসজিদে আকসায় সমবেত হন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীর ইমামতী করিলেন। বাকী সবাই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এ সময় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করেন। সমস্ত নবীর হায়াত এবং পার্থিব জগতে তাহাদের প্রকৃত হায়াত বাকী থাকা প্রসঙ্গে সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। শেষ নবীর উপর ঈমান আনয়ন করার জন্য সমস্ত নবী ও তাঁদের উম্মতগণের নিকট হইতে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি নেওয়া-ই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য সম্মানের বিষয়। যা অন্য কোন নবীর অর্জিত হয় নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার পক্ষ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট হইতে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি নেওয়া বিরাট বড় মর্যাদার কথা।

রাসূলগণের পারস্পরিক মর্যাদাগত অবস্থান

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ "এ রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৩)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ "আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

এ আয়াত দুইটি আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের মর্যাদাগত তারতম্যের ক্ষেত্রে অকাট্য দলীল। এর দ্বারা মু'তাযালাহ্ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস খণ্ডিত হয়। তাহাদের বক্তব্য হইল, নবীগণের কতকের উপর কতকের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তাঁহারা সবাই বরাবর। একদল বলে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম সবার আদি পিতা হওয়ার কারণে বেশী মর্যাদার অধিকারী। এ উক্তিটি ভ্রান্ত। কারণ, আলোচনা তো চলিতেছে নুবুওয়াতের দিক হইতে শ্রেষ্ঠত্ব হওয়া না হওয়া

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে, পিতৃত্ব প্রসঙ্গে নহে। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা-দক্ষতার বিচারে ছেলে পিতা অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকে। যদিও পিতা পিতৃত্বের অধিকার রাখে। অন্য এক দল বলে, এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া চুপ থাকাই সমীচীন। অথচ কুরআনে কারীমে স্পষ্ট দলীল দ্বারা যখন জানা যায় যে, কোন কোন নবী কোন কোন নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, তখন চুপ থাকার অবকাশ কোথায়? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ। "তাঁহাদের মধ্যে কেহ এমনও আছেন, যাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কথোপকথন করিয়াছেন।" মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন, এর দ্বারা হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। অথচ মহান আল্লাহ্র কথোপকথনের বিষয়টি শুধু মূসা আলায়হিস্ সালামের সহিত নির্ধারিত নহে। কেননা, সাব্যস্ত আছে যে, মি'রাজের রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। অবশ্য মূসা আলায়হিস সালামের সহিত বিশেষ কোন কারণে কথোপকথন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ওই বিশেষ কারণ ও এ নিআমতে ধন্য হওয়ায় তাঁহার নাম 'কালীম' হইয়া গিয়াছে। যেমন বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে 'কালামে নফসী' (রূহানী কথা) শুনাইয়াছেন, আর কোন এক দিক হইতে তা শুনিয়াছেন।

সায়্যিদে 'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন 'আরশের উপর গেলেন এবং এমন জায়গায় গেলেন, যেখানে মাখলূকের জ্ঞানের পরিধি নিঃশেষিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গমন এমন জায়গায় হইল, যেখানে কেহ কোন দিন যাইতে পারে নাই। সেখানে তিনি এত বেশী মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত হইলেন, যাহা অন্য কাহারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। ওই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ "আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন।" মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁহারা বলেন, এ অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁহার মান-মর্যাদা ও ইয্যত-সম্মান আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথা বলার কায়দা সম্পর্কে যাহারা ধারণা রাখেন, তাহাদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নহে।

উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের যেসব মর্যাদা এখানে উল্লেখ করা হয়, এর তিনটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, তাদের মু'জিযা ও নিদর্শনগুলি এ পরিমাণ বেশী স্পষ্ট, প্রসিদ্ধ, শক্তিশালী ও আলোকিত সেসব উম্মতের জন্য যাহারা বেশী পবিত্র, বেশী জানে এবং সংখ্যায়ও তাহারা বেশী। অথবা ব্যক্তিগতভাবেই তাহারা মর্যাদাবান, পূর্ণতার অধিকারী ও প্রকাশ্য ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত মর্যাদা সেইসব বৈশিষ্ট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট যা ওই নবীর মধ্যে কারামাত, উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। অথবা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত বন্ধুত্ব, তাঁহার দর্শন ইত্যাদি লাভ করিয়াছেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী তো অনেক বেশী প্রকাশ্য, পরিপূর্ণ আলোকিত, দীর্ঘস্থায়ী। তাঁহার উচ্চ পদ, তাঁহার মহান শান-শওকত, তাঁহার উম্মত বেশী

www.pathagar.com

পরিশুদ্ধ, বেশী জ্ঞানী ও সংখ্যায়ও বেশী। কুরআনে কারীমের আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ "তোমরা তো সর্বোত্তম উম্মত।" তাঁহার উম্মত এ শুভ ও কল্যাণের গুণে গুণান্বিত যাহার মর্মার্থে সমস্ত পূর্ণতা ও মর্যাদা শামিল রহিয়াছে। তাঁহার মর্যাদা অন্যান্য সকল নবীর মর্যাদা অপেক্ষা অধিক উঁচু, তামাম মাখলূক অপেক্ষা বেশী পরিশুদ্ধ ও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার সাহাবায়ে কিরামের উপর এবং তাঁহার সমস্ত অনুসারীর উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

শাফা'আত বিষয়ক হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টজীব সুপারিশকারীর তালাশে হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিমুস সালামের নিকট আসিবে। শাফা'আতের আবেদন করিবে। সবাই এ কঠিন মুহূর্তে এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকিবে। আর বলিতে থাকিবে যে, এ কাজ আমাদের নহে। অবশেষে এ সৃষ্টিকুল সায়্যিদুল মুরসালীন সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈনের নিকট হাযির হইবেন। তিনি বলিবেন, হ্যাঁ, এটা তো আমারই কাজ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযিরা দিবেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত....। তিনি ইরশাদ করেন ঃ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ 'আমি আদম সন্তানদের সরদার।' আরো বলেন ঃ اَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ 'আমি আদম সন্তানদের সর্বোত্তম"। যেন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী সম্মানী। আবার কেহ কেহ বলেন, وُلْدِ اٰدَمَ ও بَنِىْ اٰدَمَ দ্বারা মানুষের প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য। যাহার মধ্যে হযরত আদম আলায়হিস সালামও অন্তর্ভুক্ত। যেমন অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত মানব জাতির সর্দার। আরো সুন্দর দলীল দেওয়া যায় এই হাদীস দ্বারা اٰدَمُ وَمَنْ دُوْنَه تَحْتَ لِوَائِىْ আদম আলায়হিস সালাম ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরদের সবাই আমার পতাকার ছায়াতলে অবস্থান করিবে। আবার কেহ কেহ এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন যে, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ যত মানুষ অতিবাহিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ দীনের পূর্ণতা অনুযায়ী হইয়া থাকে। আর তা ওই দীন-শরীআতের নবীর পূর্ণতার উপর নির্ভর করে। কেননা, উম্মত তো তাঁহারই অনুসরণ করে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ আয়াত দ্বারা এ কথার দলীল পেশ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের প্রশংসা করিয়াছেন। এর মধ্য হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলা হইল, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ "উহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাঁহাদের পথের অনুসরণ কর।" (সূরা আনআম ঃ ৯০)। কাজেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের রাস্তায় চলার নির্দেশ দিলেন, তো অবশ্যই তা মান্য করা ওয়াজিব। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা মান্য করিবেন, তো সমস্ত সৌন্দর্যতা ও পূর্ণতা যা সমস্ত নবীর মধ্যে ছিল, তার

www.pathagar.com

সবগুলি নিঃসন্দেহে তাঁহার মধ্যে আসিয়া একত্রিত হইয়া গেল। এইভাবে তিনি সর্বোত্তম হইলেন। এ দলীলের উপস্থাপনাটি খুবই সূক্ষ্ম। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে এ রকম ধারণা করা হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য নবীর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়া তাঁহার উপর অন্যদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইল। কিন্তু এখানে অনুসরণ-অনুকরণের অর্থ হইতেছে মিল রাখা বা বহাল রাখা। যেহেতু অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁহার আগমনের পূর্বেই দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাই اقتداء (অনুসরণ) শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুরূপ সেইসব স্থানেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য, যেমন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ধর্মের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়াও তাঁহার দীনের দাওয়াত অন্যান্য নবীর দাওয়াত অপেক্ষা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আনাচে-কানাচে বেশী বিস্তৃত হইয়াছে। কাজেই, তাঁহার দাওয়াত দ্বারা বিশ্ববাসীর উপকৃত হওয়া অন্যান্য নবীর উম্মতগণের দাওয়াতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেয়ে বেশী। অতএব, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ সর্বোত্তম ও কল্যাণকামী ওই ব্যক্তি যে মানুষদের নিকট উপকার পৌঁছায়।

হযরত সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা প্রসঙ্গে একটি হাদীস আছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার এক দরজা দিয়া বাহির হইলেন। এতে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন ঃ هٰذَا سَيِّدُ الْعَرَبِ তিনি হলেন আরবদের সর্দার। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আপনি কী আরবদের সর্দার নন? তিনি বলিলেন, اَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ عَلِىٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ—আমি সারা বিশ্বের সর্দার আর আলী আরবের সর্দার।

ফাইদা

হাকিম বর্ণনা করেন যে, এ হাদীস সহীহ্। আবার কাহারও কাহারও মতে তা যঈফ। আর আল্লামা যাহাবী (র) একে মাওযূ' হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু কুরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ আমরা তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে, لاَ تُفَضِّلُوْنِى عَلَى الاَنْبِيَاءِ অন্যান্য নবীগণের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, لاَ تُفَضِّلُوْا بَيْنَ الاَنْبِيَاءِ নবীগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। আর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الاَنْبِيَاءِ নবীগণের মাঝে পার্থক্য করিও না। হযরত ইব্ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার হাদীস যা মুসলিম (র)-এর নিকট আসিয়াছে, তা হইল– কোন বান্দাকে শীর্ষে স্থান দিও না। তোমরা এমন কথা বল যে, "আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ", নিঃসন্দেহে ইহা মিথ্যা কথা। বর্ণিত আছে, যে কেহ এই কথা বলে যে, "আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা অপেক্ষা উত্তম' নিঃসন্দেহে সে মিথ্যা কথা বলে। ইহার জওয়াবে হযরত উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

www.pathagar.com

“আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না” -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমানের মধ্যে পার্থক্য করা। সারকথা কাহারও প্রতি ঈমান আনা, আর কাহারও প্রতি না আনা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ “নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণকে অস্বীকার করিল”। وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ “আর তাহারা চায়, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে”। وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ “আর তাহারা বলে, আমরা কতকের প্রতি ঈমান আনয়ন করি, আর কতকের উপর আনয়ন করি না।” মৌলিকভাবে কোন এক রাসূলকে অস্বীকার করাই সমস্ত রাসূলকে অস্বীকার করা। এরই ভিত্তিতে কোন কোন আলিম আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদকে প্রয়োগ করিয়াছেন। اِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ তাহারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেওতো রাসূলগণকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করার ক্ষেত্রে সমান হওয়ার বিষয়টি পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্যের পরিপন্থী নহে। উপরোক্ত হাদীসগুলির জওয়াব বিভিন্নভাবে দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি ওই সময়ের পূর্বের কথা, যখন ওহীর মাধ্যমে জানানো হইল যে, তিনি নবীগণের সর্দার, শ্রেষ্ঠ মানব এবং আদম সন্তানদের নেতা। কিন্তু এর প্রবক্তার উপর জরুরী ইহতেছে বিষয় দুইটির কোন্টি আগে সংঘটিত হইয়াছে, কোন্টি পরে সংঘটিত হইয়াছে– তা প্রমাণ করা। কেহ কেহ বলেন, এর অর্থ হইল–এমনভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না যে, যাহাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেছ তাহাদের মানহানি হয়। আবার কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারী করা নুবুওয়াত ও রিসালাতের মূল বিষয়। কেননা, নুবুওয়াতের মূল দিক হইতে সমস্ত নবী একই গণ্ডির ভিতর রহিয়াছেন। নুবুওয়াতের দিক হইতে একের উপর অপরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। বরং তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের কারণে একের উপরে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হইয়াছে। যেমন কেহ্ রাসূল, আবার কেহ নবী, কেহ উলুল আযম রাসূল, তবে এ কথাটি ভুলের উর্ধ্বে নহে। এর বিস্তারিত আলোচনা এই যে, কেহ কেহ বলেন যে, আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি সে পরিমাণ, যে পরিমাণ আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত বিশেষ নৈকট্যের কারণে তাঁহার মর্যাদা উঁচু করিয়াছেন। আর উম্মতের প্রশাসন, তাহাদের ভীতি প্রদর্শন, দীনের উপর ধৈর্যধারণ, রিসালাত আদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং গোমরাহ্দের হিদায়াতের উপর ইচ্ছা রাখিতে কাহারও সহিত বৈপরীত্য ভাব রাখেন না। এ জন্যে যে, প্রত্যেক নবীই নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করিয়াছেন। আর এরচেয়ে বেশী কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে চাপ দেন নাই। সুতরাং ভাল করিয়া বুঝিয়া নিবে।

কেহ কেহ বলেন, আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপর সামগ্রিকভাবে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা ব্যক্তিগতভাবে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে বিরত থাকি। কেননা, আমরা কাহারও মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের নিজ সিদ্ধান্তে বর্ণনা করিতে পারিব না। বরং কিতাবুল্লাহ্ ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস শরীফের আলোকে তা বর্ণনা করা যাইতে পারে, যেমনটি দলীল ভিত্তিক আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

'ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা' প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় মালেকী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিম ইব্‌ন আবী জামরা বলেন, এর দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য হইল– বিশেষ কোন দিক, সীমা ও অবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নিষেধ করা। ইব্‌ন খতীব অর্থাৎ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, এর অর্থ হইল, হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব এমন নহে যে, আমাকে আসমানের উপরে উঠানো হইবে, আর হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামকে সমুদ্রের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং এমন যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র খুব নিকট আর তিনি খুব দূরে। কাজেই, এ দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলে এ কথা সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কোন দিক আছে, স্থান আছে। (অথচ তা বাতিল) যদিও অস্বাভাবিকভাবে আমাকে সপ্ত আসমানের উপরে উঠানো হইয়াছে আর হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামকে সমুদ্রের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে আমার ও তাঁহার নৈকট্য সমান সমান। অন্যান্য নবী ও ইউনুস আলায়হিস সালামের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করা ছাড়াই আমার অন্যান্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। উপরোল্লিখিত নিয়মে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বিশেষ কোন দিক ও স্থান সাব্যস্ত হইয়া যায়। এ কথাটি দারুল হিজরতের ইমাম অর্থাৎ ইমাম মালিক (র) হইতেও বর্ণিত আছে। ইমামুল হারামায়ন হইতেও এমন ঘটনা উদ্ধৃত আছে। কোন কোন সম্মানী ব্যক্তিবর্গের নিকট এ ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। তাহারা বলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষ কোন স্থানের দিক সাব্যস্ত করিয়া এর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দেই না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে সমস্ত দিকের সম্বন্ধ সমান সমান। বরং ভূ-মণ্ডলে অবস্থিত মাখলূকের উপর পরিমণ্ডলে অবস্থিত মাখলূকের যে মর্যাদা অর্জিত হয় এবং এ জগতের তুলনায় ওই জগতের যে মর্যাদা রহিয়াছে– এ ভিত্তিতে আমরা হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামের উপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। এটি যেন মর্যাদাগত দিক হইতে শ্রেষ্ঠত্ব, অবস্থানগত দিক হইতে নহে। কাজেই, হাদীসে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠত্বের নিষেধাজ্ঞাটি অবস্থানগত দিক হইতে হইয়াছে। কেননা, ইহাতে অবস্থানের নৈকট্যের অর্থ অর্জিত হয়, যা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং ভাল করিয়া বুঝিয়া নিতে হইবে।

ফেরেশতার উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস ও মত অনুযায়ী ফেরেশতার উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, মানুষের মধ্যে যাহারা বিশেষ ব্যক্তি যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমুস্ সালাম শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন সেইসব ফেরেশতার উপর যাহারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন হযরত জিবরাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইসরাফীল, হযরত আযরাঈল, আরশ বহনকারী, নৈকট্যবান ফেরেশতা প্রমুখ। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থেও এমন তাফসীর করা হইয়াছে। আকাঈদে নসফীতে এভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ رُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلٰئِكَةِ মানব জাতির রাসূলগণ ফেরেশতাদের রাসূল অপেক্ষা উত্তম। ফেরেশতার ওই দল যাহাদের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহারা ফেরেশতাদের রাসূল। কেননা, এইসব রাসূল

www.pathagar.com

ফেরেশতাদের দলকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধানের তাবলীগ ও তা'লীম দিয়া থাকেন। আর সাধারণ মানুষ যাহারা আওলিয়া, সৎকর্মপরায়ণ, মুত্তাকী, ফাসিক-পাপিষ্ঠ নহে, তাহারা সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম।

ফাইদা

শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে গুনাহ্গার পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমালোচনা করা হইয়াছে। এ গ্রন্থে এইভাবে লেখা হইয়াছে যে, ফেরেশতা ও মানুষ সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক উলামায়ে কিরাম অনেক তর্ক-বিতর্ক করেন। অবশেষে তাহারা এ ফায়সালা করেন যে, মানুষের রাসূল ফেরেশতাদের রাসূল অপেক্ষা উত্তম। মানুষের আওলিয়া ফেরেশতাদের আওলিয়া অপেক্ষা উত্তম। শু'আবুল ঈমান গ্রন্থের কথা এখানেই শেষ। জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, কোন কোন মাশায়েখ ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি অবলম্বন করিয়াছেন। কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী এ মতাদর্শের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও শায়খ আবূ হাসান আশ'আরী রহমতুল্লাহি আলায়হির শাগরিদ। তাঁহার নিকট পসন্দনীয় মত এটিই। আবদুল্লাহ্ হালীমীও এই দিকে গিয়াছেন। ইমাম গাযালীর আলোচনা হইতেও এইরূপ মর্ম নিঃসৃত হয়। আবার কাহারও কাহারও মত হইল– নিঃসঙ্গ ও নৈকট্যতার দিক হইতে ফেরেশতা উত্তম। আর অধিক সাওয়াব অর্জনের দিক হইতে মানুষ উত্তম। আহলে সুন্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সাওয়াবের আধিপত্য। যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের ব্যাপারে বলা হইয়াছে।

শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহে আলায়হি শাফিঈ মতাবলম্বীদের শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন শ্রেষ্ঠত্বের এ বিষয়টিকে বিপজ্জনক মনে করিয়া গ্রহণ না করে, আর না তা অস্বীকার করে, না সাব্যস্ত করে, তাহলে আশা রাখা যায় কিয়ামতের দিন এ প্রসঙ্গে তাহাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

ফেরেশতাদের মাঝেও কতক কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম। তাঁহাকে রূহুল আমীনও বলা হয়। তিনি ইল্ম প্রকাশকারী এবং ওহী বহনকারী। তিনি ছাড়াও আরো তিনজন ফেরেশতা অন্যান্য ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। সমস্ত রাসূল সমস্ত নবী অপেক্ষা উত্তম। আবার কতক রাসূলও অপর রাসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবী-রাসূলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি সমস্ত রাসূলের সর্দার, নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী এবং তামাম সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

صلى الله عليه وسلم افضل ما صلّى على احد من الانبياء والمرسلين

وعلى اله واصحابه اجمعين بداة طريق الحق ومحى علوم الدين -

আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নানা মত রহিয়াছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ যার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস প্রসিদ্ধ আছে। ইব্ন মারদুইয়্যা তাঁর তাফসীরে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আবূ যার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি

www.pathagar.com

নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নবী কতজন? তিনি বললেন, একশ' চব্বিশ হাজার। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল কতজন? তিনি বললেন, তিনশ' তের জন। (ইহার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই রহিয়াছে)

কুরআনে কারীমে যেসব নবীর নাম উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম— হযরত আদম (আ), হযরত ইদরীস, হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়া'কুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইউব, হযরত শু'আয়ব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত ইউনুস, হযরত দাঊদ, হযরত সুলায়মান, হযরত ইলইয়াস, হযরত আল-ইয়াসা' হযরত যাকারিয়্যা, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস্-সালাম। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে যুল্কিফ্ল-ও নবীগণের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কোন কোন নবীর ঘটনা তো আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, আর বাকীগণের ঘটনা বর্ণনা করি নাই। ইহাতে বুঝা গেল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট সমস্ত নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয় নাই।

বিশেষ মর্যাদা-সম্মান

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যেসব মর্যাদা-সম্মানের কথা কুরআনে কারীমে প্রকাশ করা হইয়াছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উচ্চ মর্যাদা হইল ইসরা-মি'রাজের ঘটনা। যা সূরা বনী ইসলাঈল (دَنَى فَتَدَلَّى—নিকটবর্তী হইল, আরো বেশী নিকটবর্তী হইল) ও সূরা ওয়ান-নাজম-এর মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে। এগুলি তাঁহার উচ্চ মর্যাদা, সম্মানজনক অবস্থান এবং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলী ও বিস্ময়কর বস্তু প্রত্যক্ষ করার উপর শামিল রহিয়াছে। কাজেই, তাঁহাকে শত্রুদের হাত হইতে বিশেষ করিয়া পবিত্র মক্কা মদীনার কাফির-মুশরিকদের নিকট হইতে হিফাযত করা যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষদের হইতে হিফাযত করিবেন।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার সাহাবায়ে কিরামকে হিফাযতের জন্য নির্ধারণ করিয়া রাখিতেন। এইভাবে তিনি শত্রুপক্ষের অনিষ্টতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেন। এই হিফাযতের বিষয়টি যদিও মহান আল্লাহ্র নির্দেশে ও তাঁহার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হইল, তখন তিনি শত্রুদের প্রতারণা ও অনিষ্ট হইতে নিরাপদ হইয়া গেলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ "স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য।" (সূরা আনফাল ঃ ৩০)

ইহা ছিল হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় এবং ইহার ভিত্তিতেই তাঁহার হিজরতের সূচনা হইয়াছিল। যেমন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ "তাহারা যদি তাহাকে সাহায্য-সহযোগিতা না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন।" (সূরা তাওবা ঃ ৪০)

এ ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হইতে মুশরিকদের কষ্ট প্রদানকে তাহাদের বায়আতের পর তাহাদের ধ্বংস ও তাঁহার ব্যাপারে তাহাদের মতবিরোধিতা দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া দেন। তাহাদের সামনা-সামনি তাঁহার বাহির হইয়া যাওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের চোখগুলিকে অন্ধ করিয়া দিলেন, আর ছাওর পর্বতের গুহায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অনুসন্ধিৎসু মনে গাফলত ঢালিয়া দিলেন। তাহাদের ইচ্ছাকে ফিরাইয়া দিলেন, আর নিদর্শনাবলীর প্রকাশ, প্রশান্তির অবতারণা, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের দর্শন এগুলি এমন মহান মু'জিযা ও নিদর্শন, যাহার আলোচনা যথাস্থানে আসিবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হিফাযতের ক্ষেত্রে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "যখন তিনি তাঁহার সফরসঙ্গীকে বলিলেন, অস্থির হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সহিত রহিয়াছেন।" (সূরা তাওবা ঃ ৪০)

এমনি একটি অবস্থার মুখোমুখি হইয়াছিলেন হযরত মূসা (আ)। যখন তিনি বনী ইসরাঈলের সাহিত বাহির হইলেন আর ফিরআওন ও তাহার সৈন্যবাহিনী তাঁহার পিছে ধাওয়া করিল, তখন বনী ইসরাঈল ভয় পাইয়া গেল যে, না জানি ফিরআওন বাহিনী তাহাদেরকে ধরিয়া ফেলে। মূসা (আ) বলিলেন, ভয় পাইবে না, اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার রব রহিয়াছেন। (সূরা সূআরা ঃ ৬২)। কিন্তু উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করা আর মূসা (আ)-এর মহান আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করার মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রথম দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের উপর পতিত হইয়াছে। এরপর দ্বিতীয় দৃষ্টি তাঁহার নিজের উপর পতিত হইয়াছে। তখন বললেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।" মূসা (আ)-এর প্রথম দৃষ্টি নিজের উপর পতিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় দৃষ্টি পতিত হইয়াছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের উপর। তখন বলিলেন, اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ "নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার রব রহিয়াছেন।" এই উভয় প্রকারই দর্শন ও নৈকট্যের প্রকার। তবে প্রথমটি পরিপূর্ণ ও নৈকট্যতর মনে হয় যেন এ কথা বলিলেন যে, আমি কিছুই দেখি নাই, তবে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্কে দেখিয়াছি। আর দ্বিতীয়টিতে যেন এ কথা বলিলেন, আমি কিছুই দেখি নাই, তবে আল্লাহ্কে তার পরে দেখিয়াছি। প্রথম প্রকারে আবেগাপ্লুত পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় প্রকারে সুলূক। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ "আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং মহান কুরআন" (সূরা হিজর ঃ ৮৭)। আয়াতে সাত আয়াত দ্বারা কুরআনে কারীমের দীর্ঘ দীর্ঘ সাত সূরাকে বুঝানো হইয়াছে যাহা কুরআনে কারীমের শুরু দিয়াই উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সূরা বাকারা হইতে সূরা আনফাল তথা সূরা তাওবার শেষ পর্যন্ত। কেননা, এ দুই সূরা মূলত একই

www.pathagar.com

সূরার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, এ দুই সূরার মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই।

ফাইদা

কুরআনে কারীমের সাত আয়াতকে উম্মুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি) কিংবা سبع مثانى(সাবয়ে মাছানী) বলা হয় আর বাকী অংশকে কুরআনে কারীম বলা হয়। এর পুনঃ পুনঃ আলোচনা কিংবা প্রতি রাকআতে তা তিলাওয়াত করা হয়, কিংবা একাধিকবার নাযিল হওয়ার কারণে উম্মুল কুরআনের নাম সাবয়ে মাছানী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, এর কারণ হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য এ সাত আয়াত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য এগুলিকে ভাণ্ডার বানাইয়াছেন। তিনি ব্যতীত আর কোন নবীকে এমন কিছু দেওয়া হয় নাই। আর কুরআনে কারীমকে 'মাছানী' হিসাবে নামকরণ করা হয়তো এইজন্যে যে, এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা এর মধ্যে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিংবা ভাষালংকারের সহিত তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।" (সূরা সাবা ঃ ২৮)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا "বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্র রাসূল।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষি করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

অর্থাৎ রাসূলের বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিলেন যে, তিনি তাহাদেরই গোত্র হইতে হইবেন। কিন্তু সায়্যিদে আলম মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সারা সৃষ্টিজীবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ "আমি আরব-অনারব সবার জন্যে প্রেরিত হইয়াছি।" এখানে اَسْوَدُ বলে অনারবকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, তাদের রং সবুজাভ। আর احمر দ্বারা আরবদেরকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, তাহাদের রং লাল ও সাদা হইয়া থাকে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهَاتُهُمْ নবী মু'মিনদের জানের চাইতেও বেশী প্রিয়-নিকটবর্তী। আর তাঁহার স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা।" (সূরা আহযাব ঃ ৬)

www.pathagar.com

মোদ্দাকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অব্যাহত-চলমান রহিয়াছে, যেমনিভাবে মুনীবের নির্দেশ ভৃত্যের জন্য পালনীয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের অনুসরণ করা নিজস্ব রায়ের অনুসরণ করা অপেক্ষা বেশী উত্তম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ও অনুসরণের দিক হইতে ওয়াজিব বিষয়গুলির মধ্যে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানের কারণে তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত অন্যদের বিবাহ হারাম। আর তা এ কারণেও যে, এই স্ত্রীগণ আখিরাতেও তাঁহার স্ত্রী হিসাবে থাকিবেন। একটি শায (অল্প প্রচলিত) কিরাআতে আসিয়াছে هُوَ اَبٌ لَّهُمْ (নবী তাহাদের পিতা)।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁহার প্রশংসা বর্ণনায় ইরশাদ করেন ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।" (সূরা নিসা ঃ ১১৩)

মহা অনুগ্রহ অনুধাবন করা ও ইহার মূল পর্যন্ত পৌঁছা কাহারও জন্য সম্ভব নহে। বলা হয়, এতে মহান আল্লাহ্কে দেখার শক্তি ও সহ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেননা, হযরত মূসা (আ) এর শক্তি ও সহ্যের ক্ষমতা রাখেন নাই। কুরআনে কারীমের এমন আয়াত অনেক আছে, যেগুলির মধ্যে রাসূলে কারীম (সা)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হইয়াছে। মূলতঃ গোটা কুরআনে কারীম আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন গুণাবলী ও পূর্ণতা-দক্ষতা-যোগ্যতার বর্ণনায় ভরপুর। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অন্যতম একটি হইল এই যে, মুশরিক ও দীনের শত্রুরা যেখানেই তাঁহার প্রতি অপবাদের সম্বন্ধ করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দায়িত্বশীল হইয়া তাঁহার পক্ষ হইতে তাহার প্রতিকার করিয়াছেন। প্রেমিকের আচরণ এমনই হইয়া থাকে যে, যখন তাঁহার হাবীবের বদনাম শুনিবে, তখন তা নিজের কাঁধে টানিয়া আনিয়া উহার জওয়াব দিয়া থাকে এবং উহার প্রতিকার করিতে লাগিয়া যায়। আর প্রেমাস্পদের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহার এ প্রতিকার পরিপূর্ণ, তাহার সাহায্য-সহযোগিতা বেশী শক্তিশালী ও উচ্চ হইয়া থাকে। যখন কাফিররা বলিল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ـ

'হে ওই ব্যক্তি যাহার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছে, নিশ্চয় তুমি একজন পাগল।" (সূরা হিজ্‌র ঃ ৬)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিলেন ঃ

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ـ وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ـ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

www.pathagar.com

"তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ। তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম ঃ ২-৪) এই ধরনের সুন্দর চরিত্র যাহারই হইতে পারে, কি করিয়া সে পাগল হইতে পারে?

আস ইব্ন ওয়ায়েল সাহমী যখন দেখিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে হারাম হইতে বাহিরে বাহির হইতেছেন আর সে ভিতরে যাইতেছিল, তখন বনী সাহম দরজায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার সহিত কিছু কথাবার্তা বলিল। তখন কুরায়শের কাফিররা মসজিদে হারামের ভিতর অবস্থান করিতেছিল। আস যখন মসজিদে প্রবেশ করিল, তো কুরায়শ গোত্রের কাফিররা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কার সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলে? সে বলিল, ওই নির্বংশের সহিত মোটকথা হইল, হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলার গর্ভে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছিল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আর কোন সন্তান বাকী ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জবাবে ইরশাদ করিলেন ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। 'নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ'।

আর কাফিররা যখন বলিল, لَسْتَ مُرْسَلاً "তুমি রাসূল নও", এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰسٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

"ইয়াসীন! প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ, নিশ্চয় নিঃসন্দেহে তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ১-৩)

আর কাফিররা যখন বলিল,

اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ

"আমরা কী এই উন্মাদ কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করিব?" (সূরা সাফফাত ঃ ৩৬)। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ

"বরং সে তো সত্য নিয়া আসিয়াছে এবং সে রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।" (সূরা সাফ্ফাত ঃ ৩৭)।

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ

"আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই। আর তা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

কাফিররা যখন বলিল ঃ

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

www.pathagar.com

"ইচ্ছা করিলে আমরাও এর অনুরূপ বলিতে পারি, এ তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা"। (সূরা আনফাল ঃ ৩১)

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ

"বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয়, তবু তাহারা এর অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

কাফিররা যখন বলিল ঃ

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْاَسْوَاقِ

"এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭)।

ইহার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

"তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের সবাই তো খাবার খাইত, হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত।" (সূরা ফুরকান ঃ ২০)

কাফিররা যখন মানব বংশ হইতে রাসূল প্রেরণের বিষয়টিকে দূরবর্তী ও অসম্ভব মনে করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا -

"বল, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তবে আমি আকাশ হইতে তাহাদের নিকট অবশ্যই ফেরেশতা রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৫)।

সারকথা, স্বজাতির মধ্যে মিত্রভাব ও মহব্বত সৃষ্টি হইয়া থাকে আর ভিন জাতির মধ্যে দূরত্বভাব সৃষ্টি হয়। কাজেই, ইহা প্রজ্ঞার পরিচায়ক যে, ফেরেশতাদের জন্য ফেরেশতা প্রেরিত হইবে, আর মানুষের জন্য মানুষ প্রেরিত হইবে। সমস্ত নবীই নিজ সত্তা দ্বারা সমপর্যায়ের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। যেমন হযরত নূহ আলায়হিস সালাম বলিলেন ঃ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ "আমার মধ্যে কোন বক্রতা নাই।" হযরত হূদ আলায়হিস সালাম বলিলেন ঃ لَيْسَ لِىْ سَفَاهَةٌ আমার মধ্যে কোন অজ্ঞতা নাই। কুরআনে কারীমের মধ্যে এমন উদাহরণ অনেক রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

কিছু আয়াতের প্রতি সন্দেহ ও তাহার নিরসন

এখানে কুরআনে কারীমের কিছু মুবহাম বা অস্পষ্ট আয়াতের মধ্যে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হয়, সেগুলি নিরসন করা হইতেছে। অজ্ঞতা ও বক্রতার কারণে আপাতদৃষ্টিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদায় ত্রুটি ও ভুলের সন্দেহ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কিরাম এগুলির সমীচীন ও উপযুক্ত অর্থ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার দিকে নির্ভরতার সম্বন্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি আয়াত হইতেছে— وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى "তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইলেন, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।" (সূরা যুহা ঃ ৭)। মনে হয় যেন নবীরূপে প্রেরণের পূর্বে (আল্লাহ্ না করুক) তাঁহাকে গোমরাহীর দিকে সম্বন্ধ করিয়াছেন আর হিদায়াত দিয়া তাহা দূর করিয়াছেন। অথচ উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম না নুবুওয়াতের পূর্বে, না নুবুওয়াতের পরে, কখনও গোমরাহীতে মিলিত হইতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্টি ও বাড়িয়া ওঠা ঈমান, তাওহীদ ও নিষ্পাপতার মধ্যে হইয়াছে। সমস্ত নবী ও রাসূলগণের একই অবস্থা। সংবাদদাতাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই এমন কোন ব্যক্তির সংবাদ দেয় নাই যাহাকে নুবুওয়াত, রিসালাত ও নির্বাচনের মহান গুণ দ্বারা ধন্য করিয়াছেন এবং তিনি ইহার পূর্বে (আল্লাহ্ না করুন) কুফর-শিরক, পাপ-পঙ্কিলতা ও গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিল। অবশ্য এর মধ্যে মতবিরোধ আছে যে, বিবেকগ্রাহ্যভাবে তা বৈধ কিনা ? মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মাযহাব অনুযায়ী তা বৈধ নহে। কেননা, ইহা ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণ। কিন্তু, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট বিবেকগ্রাহ্যভাবে ইহা বৈধ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে গোমরাহীর কূপ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া হিদায়াত দিয়া নুবুওয়াতের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দলীল সাক্ষ্য দেয় যে, এ বৈধ বিষয়টি এ পৃথিবীতে কখনো ঘটে নাই। কেননা, সমস্ত নবী-রাসূল নুবুওয়াতের পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সন্দেহ করা হইতে পাক-পবিত্র। কুফরী-পাপকর্ম ও ঘৃণ্য যে কোন কাজ হইতে তাহারা নিরাপদ। নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে ভুল, গল্তী, জোশ ও ক্রোধের সময় অলসতা ও দীনের সহিত সংশ্লিষ্ট, উম্মতের তাবলীগের সহিত সম্পৃক্ত এবং সাধারণ কবীরাহ ও সগীরাহ্ গুনাহ্ হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্ত ও পবিত্র। বিশেষ করিয়া সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিষ্পাপ হওয়া পূর্ণাঙ্গরূপে স্বীকৃত ও তাঁহার মর্যাদা সর্বোচ্চ। যে কেহ তাঁহার ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্তে বেয়াদবের মত উক্তি করে, সে পতিত হইয়া যায় এবং গোমরাহীর সবচেয়ে নীচে অন্ধকার গুহায় তাহার স্থান হয়। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা তো শুরু হইতেই এমন পবিত্র ও সুসজ্জিত যে, দোষ-ত্রুটির কোন হাত তাঁহার ইয্যত-সম্মানের আঁচল স্পর্শ করার শক্তি নাই। কবি বলেন ঃ

به تعليم وادب اوراچه حاجت
كه او خود زآغاز آمد مؤدب

"শিক্ষা ও শিষ্টাচারিতার আর আছে কী প্রয়োজন, তিনি তো নিজেই করিলেন শিষ্টাচারের আয়োজন।"

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার শিক্ষা, তারবিয়্যত ও কুরআনের সমর্থন ধীরে ধীরে শক্তি হইতে কাজের দিকে উন্নীত করে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার ওই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি যা তাঁহার সহিত করা হইয়াছিল, নির্দিষ্ট সময়ে যখন এইগুলির প্রকাশ হইত, তখন তাহার পূর্ণতা প্রমাণকারী বিষয়গুলির নিশ্চিত বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়া যাইত। যেমন অধিকাংশ সময় মু'জিযার প্রকাশ ও আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের দর্শনের সময় তিনি বলিতেন, اَشْهَدُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰه আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সমস্ত যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তো এমনটি হইয়া থাকে যে, তাহাদের ভাণ্ডার ও যোগ্যতায় যা-কিছুই তৈরী করা হইয়াছে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তা বিকশিত হইয়াছে। এর জবাব হইল এই যে, এখানে যোগ্যতা বিষয়টি নিকট ও দূরের তফাৎ ও পার্থক্যের কারণে হইয়া থাকে। কেননা, আহ্‌লে কামাল (সফল ব্যক্তি)-এর সফলতা সাধন করিতে করিতে অস্তিত্বে আসে। কিন্তু এখানে সবগুলি বর্তমানে বিদ্যমান আছে। আর যা কুরআন নাযিলের নৈকট্যের কারণে সাধনা ছাড়াই প্রকাশ্যে আসিয়া যায়। সারকথা হইল, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কুরআন কারীমের সভ্যতা ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ এই নহে যে, কুরআনে কারীম তাহাকে দোষ-ত্রুটি হইতে পূর্ণতার দিকে কিংবা অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের দিকে নিয়া আসিয়াছে।

এই দলের কিছু কিছু মানুষ তাঁহার পবিত্র সত্তার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর অস্তিত্ব এবং স্বভাব-প্রকৃতি ও নফসের আহকামের 'অংশ' সাব্যস্ত করে আর ইহাকে ধৈর্যহীনতা ও কম্পনতার মত কাজের উৎসস্থল হিসাবে নির্ধারণ করে। শরীআতের হিকমত ও অসুরণের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়াকে ইহার কারণ মনে করে। আর কুরআনে কারীমের অবতরণকে সভ্যতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তা দূর করার কারণ মনে করে। এরা তাহাদের নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধি শক্তি দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাকীকত (মূলতত্ত্ব) সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবী করে। আর এমন ধারণা পোষণ করে ও এমন কথা বলে, যাহা এ অধম (মাদারিজুন নুবুওয়াত গ্রন্থকার)-এর বিশ্বাস করিতে ভারী মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিভিন্ন অবস্থাকে অন্যদের বিভিন্ন অবস্থার উপর অনুমান করা বৈধ নহে। কবি বলিয়াছেন ঃ

او برتراز آن ست که آید بخیال

"তাঁহার সম্পর্কে মানুষের ধারণায় যে পর্যন্ত ধারণ করা যায়, তিনি তাঁহারও উর্ধ্বে।"

এ আলোচনার কিছু অংশ যেহেতু 'আখলাক শরীফ' অধ্যায়ে অতিবাহিত হইয়াছে, তাই পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি না। এখানে এমন কিছু বিষয় নিয়া আলোচনা করা হইবে যা গোমরাহ ও বক্র মানসিকতার লোকদেরকে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তাহাদের আলোচনায় যদিও অধমের (মাদারিজুন-নুবুওয়াত গ্রন্থকারের) এখনকার বক্তব্য তাহাদের সন্দেহ-সংশয় নিরসন করার রাস্তায় অগ্রসর হইতেছে, তথাপি অখুশী। কিন্তু উলামায়ে কিরাম যখন এ পথ ধরিয়াছেন এবং তাহারা এতে কল্যাণ দেখিয়াছেন, তখন আমিও তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিতে বাধ্য। আমি আশা করিতেছি, ইহার পরিণাম শুভ হইবে।

www.pathagar.com

এখানে এই নিয়ম ও নীতি জানিয়া রাখিতে হইবে যাহা কোন সূফী ও গবেষক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মনে রাখিলে এবং ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। ওই নিয়ম ও নীতিটি হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন সম্বোধন, কোন ধমক, কোন শান-শওকত, কোন প্রভাব, কোন অমুখাপেক্ষিতা, কিংবা কোন উঁচুতা— এসব কিছুই সেইসব কথা যা অস্তিত্বে আসিয়াছে। যেমন إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ। নিশ্চয় তুমি হিদায়াত দিতে পারিবে না। لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ অবশ্য তোমার আমল বাতিল হইয়া যাইবে। لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ কোন বিষয়ের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত নহে। وَتُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا। তুমি তো পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসিতা কামনা কর। এ রকম আরও অনেক উদাহরণ রহিয়াছে। অথবা নুবুওয়াতের পক্ষ হইতে বন্দেগী, বিনম্রতা, মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ। আমি তো তোমাদের মতই মানুষ। وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْعَبْدُ আমি ক্রোধান্বিত হই, যেমন মানুষ ক্রোধান্বিত হয়। وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ আমি জানি না যে, আমার সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হইবে। وَلَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ هٰذَا الْجِدَارِ আর আমি জানি না এ দেওয়ালের পিছে কি আছে ? এ রকম অনেক কথা আছে, যেগুলির কারণ উদঘাটন করার আমাদের প্রয়োজন নাই। আর আমাদের এমন অবস্থানও নাই যে, আমরা এর কারণ উদঘাটনে দখল দিই। কিংবা ইহাতে কোন শরীক তালাশ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করারও অধিকার নাই। বরং শিষ্টাচারিতা ও নির্বাকতার সীমায় অবস্থান করিয়া ইহা হইতে বিরত ও চুপ থাকা উচিত। মুনীবের অধিকার হইল, সে তাহার বান্দাকে যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে। বড়াই ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতে পারে। আর বান্দা তাহার মুনীবের সামনে বন্দেগী ও বিনম্রতা প্রকাশ করে। এখানে দখল দেওয়ার অন্যের কি শক্তি, কি অধিকার আছে ? ইহা এমন একটি স্থান, যেখানে অনেক দুর্বল-অজ্ঞদের পা ফস্কে গিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। وَمِنَ الْعِصْمَةِ وَالْعَوْنِ। হিফাযত ও সাহায্য তাঁহার নিকট হইতেই হয়। এখন স্পষ্টভাবে খেয়াল করুন আয়াতের প্রতি– وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইলেন, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।"

মুফাস্সিরীনে কিরাম ইহার তাফসীর ও তা'বীল করিতে গিয়া একাধিক কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম কারণ

ইহার অর্থ এই যে, "আপনাকে নুবুওয়াতের চিহ্ন ও শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অনবগত পাইয়াছেন।" এ উক্তিটি হযরত ইব্ন আব্বাস, হাসান, যাহ্হাক ও শাহ্র ইব্ন জাওশবের। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ। "তুমি তো জানিতে না কিতাব কি ও ঈমান কি ?" সারকথা হইল, ওহী আগমনের পূর্বে তুমি কুরআনে কারীম পড়িতে এবং মাখলূককে ঈমানের দাওয়াত দিতে জানিতে না।

www.pathagar.com

কাহারও কাহারও মতে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য, ফরয আহকাম ও অন্যান্য বিধান। অন্যথায় রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওহী আগমনের পূর্বে আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর ঈমান রাখিতেন। এরপর ফরয আহকাম নাযিল হইয়াছে। যাহা তিনি জানিতেন না। কিংবা ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য শরীআতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অথবা নামায। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ "আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করিবেন"। অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরিয়া তোমরা যে নামায পড়িয়াছ, আল্লাহ্ তা বিনষ্ট করিয়া দিবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের স্বীকৃতি দিতেন, প্রতিমাকে শত্রু জানিতেন এবং প্রাগৈসলামিক যুগে হজ্জ ও উমরা আদায় করিতেন। হাদীস শরীফে আসিয়াছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন– আমি কখনও মদ পান করি নাই, কখনও প্রতিমার পূজা করি নাই আর আমি জানিতাম কুরায়শ সম্প্রদায় কুফরীর উপর অধিষ্ঠিত আছে। অথচ কুরআনে কারীম ও ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কুরায়শের লোকদের মধ্যেও কেহ কেহ হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের দীনের উপর আংশিকভাবে আমলকারী ছিল। যেমন– হজ্জ, খাতনা, জানাবতের গোসল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কারণ

বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার শিশুকালে আমি একবার দাদা আবদুল মুত্তালিব হইতে হারাইয়া গিয়াছিলাম। তখন ক্ষুধার তাড়নায় আমি প্রায় ধ্বংসের নিকটবর্তী চলিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর আমার রব্ব আমাকে সঠিক পথ দেখাইলেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এ ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থেও এমনই উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, হযরত হালীমা সাদিয়া (রা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিয়া মক্কা মুকার্‌রমা শহরে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি হারাইয়া গেলেন।

তৃতীয় কারণ

আয়াতে কারীমার মধ্যে ضَلَالٌ শব্দটি ضَلَّ الْمَاءُ فِى اللَّبَنِ (দুধে পানি মিশানো) অর্থ হইতে নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন দুধের মধ্যে পরিমাণের চেয়ে বেশী পানি মিশাইতেন (সম্ভবতঃ মিষ্টান্ন কিংবা লাচ্ছি বানানোর জন্য দুধের মধ্যে বেশী পানি মিশাইতেন) অর্থাৎ পবিত্র মক্কার কাফিরদের মধ্যে তিনি প্রভাবিত ও তাহাদের দাপটের অধীনে ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শক্তি দান করিলেন যাহাতে মহান আল্লাহ্র দীনকে বিকশিত ও বিজয়ী করিতে পারেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ কারণ

আরবরা সাধারণতঃ বিয়াবানে এখানে-সেখানে অবস্থিত একাকী বৃক্ষকে ضَالٌّ বলিয়া নামকরণ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার হাবীব! এ শহরের মধ্যে তুমি ঐ বৃক্ষের মত একাকী স্বজনহারা ছিলে, যা বিয়াবানে একাকী পড়িয়া থাকে। ঈমান ও তাওহীদের ফল দিয়া তুমি তাহাদিগকে ফলবতী করিলে এবং হিদায়াত দিলে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূককে তোমার দিকে রাস্তা দেখাইলেন, যাহাতে তাহারা পথপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম কারণ

এ উক্তিটি কখনও কখনও দলনেতা ও দলের প্রতিনিধিকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়। মূলতঃ এর দ্বারা গোটা দল বা সম্প্রদায়কে বুঝানো উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সারকথা হইল, তোমার সম্প্রদায়কে আমি গোমরাহ পাইলাম, অতঃপর তোমার মাধ্যমে শরীআত দ্বারা আমি তাহাদেরকে হিদায়াত দিয়াছি।

ষষ্ঠ কারণ

ضَالٌّ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, মহব্বত-ভালবাসা। সারকথা হইল, তোমাকে প্রেমিক ও মা'রিফতের সন্ধানকারী হিসাবে পাইলাম। তারপর তোমাকে পথ দেখাইলাম। আর মহব্বত-ভালবাসাকে ضَالٌّ বলার প্রচলন অনেক বেশী। কেননা, মহব্বত-ভালবাসা নিজকে ও নিজের স্বাধীনতাকে, স্থিরতাকে হারাইয়া ফেলে। কখনও যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّا لَنَرَاهَا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ (নিঃসন্দেহে আমি তাহাকে উন্মুক্ত পথহারা দেখিতেছি) আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّكَ لَفِىْ ضَلاَلِكَ الْقَدِيْمِ আর তুমি তো সেই পুরাতন পথহারাদের মধ্যেই রহিয়াছ। এ ব্যাখ্যাটি আতা' (র) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি ছিলেন তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম কারণ

ইহার অর্থ হইবে এই যে, আমি তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া অবস্থায় পাইলাম। অতঃপর আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। এ কথাটি মি'রাজ রজনীর অবস্থার উপর প্রয়োগ করা যায়। এ সময়ের অদ্ভুত অবস্থায় তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, কীভাবে কী নিবেদন করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা কিভাবে করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পথ দেখাইলেন এবং প্রশংসা করার ধরন করিয়া দিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ "তোমার প্রশংসা আমি বেষ্টন করিতে পারি না।" মুফাস্সিরীনে কিরামও তা-ই বর্ণনা করেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য সময়ও তাঁহার ভুল হইয়া থাকে। যেমন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদী ভুলের ব্যাপারে মানুষেরা বলিয়া থাকে যে, তাঁহার জন্য ইহা বৈধ। যখন এমন হইয়া থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তা অবহিত করিয়া দেন এবং যথার্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এই আয়াত অনুগ্রহের ঐ আলোচনা প্রসঙ্গেই নাযিল হইয়াছে। মহান আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

অষ্টম কারণ

ইহার অর্থ হইল, তোমাকে আমি গোমরাহ্দের মাঝে পাইলাম। অতঃপর তাহাদের হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে ঈমান ও ইরশাদের হিদায়াত দিলাম। আমাদের নিকট ব্যাখ্যা-ও তাহাই। কেননা, বলা হইয়া থাকে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের সহিত যখন সম্পর্ক রাখিলেন এবং তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলেন, তখন তাঁহার গোমরাহীতে পড়িয়া যাওয়ার ধারণা হইল এবং অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার যাঁতাকলে ফাঁসিয়া যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হইয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত ও সংরক্ষণ যদি না হইত, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ "তোমাকে ফিতনায় নিপতিত করার উপক্রম হইয়া গিয়াছিল।" তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ। "তুমি তো তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়া গিয়াছিলে"। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত ও সংরক্ষণের অবদানের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া এ আয়াতটি নাযিল করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই, তাঁহার সম্প্রদায় নহে। কাজেই, ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

নবম কারণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট যেসব ওহী প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে, সেগুলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি অস্থির হইয়া যাইতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বর্ণনা করার নির্দেশনা দান করিলেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন ঃ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ "তাহা বর্ণনা করা তো আমার দায়িত্ব।" আরও ইরশাদ করেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ "নিশ্চয় আমি তোমার নিকট যিক্র (কুরআন) নাযিল করিয়াছি।"

এ ব্যাখ্যাটি হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র) হইতে বর্ণিত আছে।

দশম কারণ

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কখনও কোন অবস্থাতেই জাহিলদের কোন কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। তবে দুইবার করিতে বাধ্য হইয়াছি। উভয়বারই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে তাহা হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আর আমার সচ্চরিত্রতা, আমার এবং আমার ঐ ইরাদার মধ্যে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। এরপর কখনো এ ধরনের কাজের প্রতি আমি আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁহার রিসালাত দিয়া ধন্য করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার কুরায়শের এক গোলামের সহিত আমার সাক্ষাত হইল, যাহার সহিত আমি পবিত্র মক্কার পাহাড়ে বকরী চরাইতাম। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি যদি আমার বকরীগুলির দেখাশুনা কর, তবে আমি পবিত্র মক্কায় গিয়া তাহাদের কিস্সা-কাহিনী শুনিয়া আসিব, যা সাধারণতঃ পবিত্র মক্কার যুবকরা করিয়া থাকিত। চারণভূমি হইতে বাহির হইয়া আমি পবিত্র মক্কায় আসিলাম এবং তাহাদের একটি ঘরে পৌঁছিলাম। দেখিলাম তাহারা গান-বাজনা ও খেলাধুলায় মগ্ন রহিয়াছে। আমি এগুলি দেখিতে

www.pathagar.com

লাগিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মধ্যে নিদ্রা ঢালিয়া দিলেন। আর পরদিনের সূর্যের তাপ না লাগা পর্যন্ত আমি ঘুমাইয়াই রহিলাম। দ্বিতীয় দিনের রাতেও একই অবস্থা হইল। এরপর কখনও আমি এদিকে তাকাই নাই এবং কোন খারাপ কাজের ইচ্ছাও করি নাই। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁহার রিসালাত দ্বারা ধন্য করিয়াছেন। কাজেই, আয়াতে কারীমা দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

বোঝা হালকাকরণ

সন্দেহ নিরসন সম্পর্কীয় আরেকটি আয়াত হইল ঃ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ "আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার, যাহা ছিল তোমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক" (সূরা ইনশিরাহ ঃ ২-৩)। বাহ্যত এর দ্বারা কঠিন গুনাহর বোঝা সাব্যস্ত হয়। এমনকি ফুকাহায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীনে ইযাম এবং কালাম শাস্ত্রবিদদের একটি দল আম্বিয়ায়ে কিরাম সালাওয়াতুল্লাহি তা'আলা ওয়া সালামুহূ আলায়হিম আজমাঈনের জন্য সগীরা গুনাহ্ বৈধ হওয়ার জন্য এ আয়াত দ্বারা দলীল দাঁড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক শব্দাবলীর দিকে তাকাইলে এবং এগুলিকেই উৎস ধরা হইলে অনেক শব্দ দ্বারাই কবীরা গুনাহ্ বৈধ হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য হইয়া পড়ে। অথচ কোন মুসলমানই এ বক্তব্যটি গ্রহণ করে না। সঠিক কথা হইল, এই দলটি যাহা দিয়াই দলীল পেশ করুক না কেন, এসবের অর্থ প্রসঙ্গে মুফাস্সিরীনে কিরামের একাধিক মত রহিয়াছে। তাহাদের এ দাবীতে পরস্পর বিপরীতমুখী সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এই দলটি যে বিষয়ের বাধ্য-বাধকতা সাব্যস্ত করিয়াছে, সালফে সালেহীনের বক্তব্য এর বিপরীত উদ্ধৃত আছে। যেহেতু এই দলটির পরিপন্থী ইজমা' সাব্যস্ত আছে। যে বিষয়ের উপর এই দলটি সমবেত হইয়াছে, তাহা সবই সম্ভাব্য ও তাবীলকৃত বিষয়। সালফে সালেহীনের ঐকমত্যে তাহাদের বক্তব্যের পরিপন্থী আমাদের দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদের বাহ্য অর্থ মূলতঃ বর্জনীয়। তাই তাহাদের বক্তব্য বর্জন করিয়া সালফে সালেহীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। নিঃসন্দেহে এ আয়াতের তাফসীরে মতবিরোধ রহিয়াছে। যেমন কেহ কেহ বলেন ঃ এটা ঐ বোঝার পরিমাণের উপমা, যা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর তা হালকা করার অর্থ হইল—এর বিনিময়ে তাঁহাকে ধৈর্য ও সন্তুষ্টি দান করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কথা হইল, এর দ্বারা নুবুওয়াতের বোঝা হালকা করাকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, নুবুওয়াতের প্রতিষ্ঠা, নুবুওয়াতের উপকরণাদির সংরক্ষণ এবং এর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠশক্তিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা তাঁহার উপর তা সহজ ও শীতল করিয়াছে। বক্ষ উন্মোচন দান করিয়া মাখলূকের দাওয়াতের পাশাপাশি অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া এর বোঝা হালকা করিয়া দিলেন। আর বক্ষ উন্মোচনের বিষয়টি এত উঁচু মর্যাদার বিষয়, যাহার পূর্ণতা সাইয়িদুস-সা'দাত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কাহারও জন্য অর্জিত হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। অবশ্য মর্যাদাবান ব্যক্তিদের যোগ্যতর আওলিয়াগণের উপলব্ধি পরিমাণ তাঁহার অনুসরণের ওসীলায় এর কিছু অংশ অর্জিত হইবে। যেমন বলা হয়, সূফী অটল ও স্থির

www.pathagar.com

থাকেন। এর বহুবচনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমনটি মাজযুবদের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যের কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। যা সাধারণত মাজযুবগণের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন ঃ وِزْرٌ (বোঝা) দ্বারা সেসব অপসন্দনীয় জিনিসকে বুঝানো হইয়াছে, কুরায়শরা হযরত খলীলুল্লাহি আলায়হিস সালামের সুন্নাতে যেসব বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করিয়াছে। তাহারা তাঁহার সত্তার প্রতি অপসন্দনীয় উক্তি ও আচরণ করিত। তাহাদেরকে বাধা দেওয়ার মত নিয়ন্ত্রণশক্তি তাঁহার ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নুবুওয়াত, রিসালাত, নির্দেশ ও শক্তি দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া দিলেন। আর বলিলেন, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا "তুমি একনিষ্ঠ হইয়া ইবরাহিমী মিল্লাতের অনুসরণ কর।" এ অনুসরণের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও সমর্থনে, তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতায় শরীআত প্রবর্তন ও মহান আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম কার্যকর করা। আর খলীলুল্লাহ্র আদর্শের বিষয়টি বর্ণনাভঙ্গির কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবার কাহারও কাহারও মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, গুনাহ্র বোঝা হইতে তাঁহাকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষণ করা। কেননা, গুনাহ্র বোঝা তাহার পৃষ্ঠশক্তিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মত। তাই গুনাহ করার ইচ্ছা-আগ্রহ না থাকার বিষয়টিকে রূপক অর্থে 'বোঝা দূর করা' বলিয়া বুঝানো হইয়াছে। এখানে ইসমত শব্দের অর্থ, গুনাহ্র বোঝা না থাকা, যেমন অন্য আয়াতে এ শব্দটিকে 'গুনাহ্ ক্ষমার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, হাদীসে আসিয়াছে, নুবুওয়াতের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গিয়াছিলেন। সেখানে গান-বাজনা চলছিল, ঢোল-তবলা বাজানো হইতেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ফলে, তিনি তাহা শ্রবণ হইতে মুক্ত ছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে وِزْرٌ (বোঝা) দ্বারা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চিন্তা-ফিক্র ও শরীআতের আহকাম সন্ধানের বোঝা উদ্দেশ্য। ইহার পর যখন শরীআত প্রকাশিত হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা শরীআত বর্ণনা করিলেন, তখন তাহার পবিত্র পিঠ হইতে বোঝা নামিয়া গেল।

আবার কেহ কেহ বলেন, এর দ্বারা শরীআতের বিষয়াবলী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহজতা ও আসানী বোঝানো উদ্দেশ্য, যা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে কামনা করা হইয়াছে। তাহা সংরক্ষণের দায়িত্ব একটি বোঝা ও কষ্টের বিষয়। যাহা বহন করায় মেযাজের উপর চাপ পড়ে এবং পিঠ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়া যায়।

আবার কাহারও কাহারও মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেইসব বিষয়ের বোঝা অনুভব করিতেন, যেইগুলো নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে। আর তাহা প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁহার উপর হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এইগুলিকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বোঝা মনে করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই বোঝা দূর করিয়া দিলেন। ইহার দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের বাহ্যিক উদ্দেশ্য সেই সব সগীরা গুনাহ্ যাহা

www.pathagar.com

প্রকাশ পাওয়া তাহারা নুবুওয়াতের পূর্বে বৈধ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু নুবুওয়াতের পরে কখনো নহে।

আর এক দল খুবই কঠোরভাবে এ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে যে, এ বোঝা দ্বারা উম্মতের গুনাহ্র বোঝা উদ্দেশ্য, যাহা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরানী অন্তরে একটি বোঝা ছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়ায় তাহাদেরকে তাহার শাস্তি হইতে নিরাপত্তা দান করিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ "আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিবে, অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)।

আর আখিরাতে তাহাদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ কবূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى "অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।" (সূরা দুহা ঃ ৫)।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন।" (সূরা ফাত্হ ঃ ২)

এ আয়াত এ অর্থের জন্যই সমীচীন ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বিবেকগ্রাহ্য সম্ভাবনায় শুধুমাত্র মানিয়া নেওয়ার ভিত্তিতে বলা যায় ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহের ক্ষমা, প্রকৃত অর্থে নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, শুহুদ দ্বারা বাস্তবে পতিত হওয়া উদ্দেশ্য। এসমস্ত ব্যাখ্যা আল্লামা তাবারী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং আল্লামা কুশায়রী (র) এগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও মতে مَا تَقَدَّمَ (পূর্ববর্তী) দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আদম (আ)-এর ভুল আর مَا تَاَخَّرَ (পরবর্তী) দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতের গুনাহ। আল্লামা সমরকন্দী এ উক্তিটি বর্ণনা করেন। আবার এক বক্তব্য অনুযায়ী এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ذَنْبٌ (গুনাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য উত্তমের পরিপন্থী কাজ করা। অথচ উত্তমের পরিপন্থী কাজ প্রকৃতপক্ষে গুনাহ-ই নহে। কেননা, উত্তম ও উত্তমের বর্জন উভয়টিই বৈধ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সঠিক কথা হইল, এ শব্দটি মহিমা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কোন গুনাহের কর্ম সংঘটিত হওয়া ছাড়াই। এ আয়াতটির উদ্দেশ্য ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে 'কুরআনী আয়াত দ্বারা মর্যাদা-সম্মান' বিষয়ক আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছে।

কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য না করার প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

"হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না।" (সূরা আহযাব ঃ ১)।

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা তাক্ওয়া না থাকা এবং আদেশ-নিষেধসূচক ক্রিয়া প্রয়োগে কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্যের ধারণা লাভ হয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাক্ওয়া ও তাহাদের আনুগত্য না করার ক্ষেত্রে সর্বদা বজায় থাকা। যেমন কোন উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এ কথা বলা যে, তোমরা বস, আমি তোমাদের কাছে আসিতেছি। অথবা কোন নিশ্চুপ ব্যক্তিকে এ কথা বলা যে, তোমরা চুপ থাক, তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করা হইবে।

মোটকথা, তোমরা বসে থাক এবং চুপ থাক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য অটল ও দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া এবং গুরুত্ব বুঝানো।

কাহারও কাহারও মতে, প্রতিটি মুহূর্তেই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইল্ম-মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। এমনকি তাঁহার পূর্বের অবস্থাটি বর্তমান অবস্থার তুলনায় অতীত ও বর্জন করা উত্তম হওয়ার দাবী রাখে। কাজেই, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁহার ইল্ম ও সম্মান উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছিল আর তাক্ওয়া নবায়ন ও তরতাজা হইতে থাকিত।

কেহ কেহ বলেন, বাহ্যত সম্বোধন নবীর প্রতি হইলেও মূলত উম্মত হইল সম্বোধিত। এ জন্যেই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا "তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যাপারে সচেতন।"

এ আয়াতে بِمَا تَعْمَلُ একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। এরই মত এ আয়াত فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ "সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করও না।" প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং এসব লোকর হইতে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ও তাহাদের বিরোধিতায় দৃঢ় প্রত্যয় থাকা। এটা একেবারেই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়। অবাক লাগে, সেসব মূর্খের কথায়, যাহারা এ আয়াতগুলিকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার প্রতি ধারণা সৃষ্টি করে। তাঁহার সুউচ্চ মর্যাদার অবস্থান এসব হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

কুরআন নাযিলের উপর সন্দেহ-সংশয় প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاِنْ كَنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ - وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর ঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। এবং যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হইও না–তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৪-৯৫)।

এ কথাটি কি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, নাকি অন্য কেহকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মাঝে নানা মত রহিয়াছে। যাহারা বলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহারা তিনটি বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রথমত, সম্বোধন যদিও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য অন্যদেরকে বোঝানো। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "তুমি যদি কাউকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত কর, তবে তোমার আমল বাতিল হইয়া যাইবে।" (সূরা যুমার ঃ ৬৫)। অথবা যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর ব্যাপারে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ "তুমি কি মানুষদেরকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর ?" (সূরা মায়িদা ঃ ১১৬)। বাক্য প্রয়োগে এ ধরনের ভঙ্গি খুবই ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, বাদশাহ কোন প্রদেশে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া থাকে আর সে জনগণকে কোন নির্দেশ দিতে চায়, তখন ঐ জনগণকে সম্বোধন করে না, বরং তাহার নিযুক্ত গভর্নরকে সম্বোধন করে। আর বলে, এটা কর, ওটা করও না। যদি এটা কর, ওটা না কর, তবে এমন করিব, অমন করিব। বাহ্যত ইহার সম্বোধন গভর্নরের প্রতি হইলেও মূলত ইহার উদ্দেশ্য জনগণ ও এলাকাবাসী। এমনিভাবে উক্ত আয়াতে মূলত আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতকে সম্বোধন করিয়াছেন।

কুররা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ পোষণকারী নহেন। এটা কি করিয়া হইতে পারে যে, ওহী ও কুরআনের নূরানিয়্যাত সত্ত্বেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্দেহে নিপতিত হইতে পারেন। এটা তো এমনই হইল, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার ছেলেকে বলিল, তুমি যদি আমার ছেলেই হইয়া থাক, তবে আমার সঙ্গে ভাল আচরণ কর। (অথচ পিতা তাহার ছেলের ব্যাপারে কোন সন্দেহ করিতেছে না।) অথবা মুনীব তাহার ভৃত্যকে বলিল, তুমি যদি আমার ভৃত্য হইয়া থাক, তবে আমার আনুগত্য কর। সাধারণতঃ এমনভাবে কথাবার্তা বলার প্রচলন আছে। মোদ্দাকথা, সে ভাল করিয়াই জানে যে, সে তাহার ছেলে কিংবা ভৃত্য। সন্দেহবোধক শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলে বা ভৃত্যকে ধমক বা তিরস্কার করা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করিয়াই জানেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্দেহে নিপতিত নন। কিন্তু, তা'রীয ও ইঙ্গিতের জন্য সম্বোধনের ক্ষেত্রে সন্দেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। এটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। প্রথম ব্যাখ্যাটিতে সম্বোধিত ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর দ্বিতীয়টিতে তিনি ছাড়া অন্যরা উদ্দেশ্য। কাজেই, ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে সন্দেহ দ্বারা উদ্দেশ্য বুকের সংকীর্ণতা ও অন্তরের রুদ্ধতা। উদ্দেশ্য হইল, তুমি যদি এ থেকে সংকীর্ণ হইয়া পড় যে, কেহ কাফিরদের কষ্ট দান ও শত্রুতা সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সেসব লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যাঁহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। নবীগণ তাহাদের উম্মতদের দেওয়া কষ্টের উপর কেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছেন। আর কাফিরদের পরিণাম ফল-ই বা কেমন হইল। আর নবীগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলার কেমন সাহায্য-সহযোগিতা অবতীর্ণ হইয়াছিল। এটা মনে মনে ধরিয়া লওয়ার একটি বিষয়। মনে হয় যেন, মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, তোমার উপর যেসব কিছু পাঠানো হইল, ইহাতে যদি কোন সন্দেহ থাকিত, অথবা শয়তান মনের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তবে সেইসব লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ববর্তী কিতাবগুলি নাযিল করা হইয়াছে। কেননা, এ বিষয়গুলি তাহাদের নিকট প্রমাণিত ও সাব্যস্ত আছে। আর তাহাদের কিতাবগুলিও যেমন তোমার উপর ওহী নাযিল করা হইল। এর দ্বারা অবস্থার যাচাই ও সাক্ষ্যগ্রহণ করা উদ্দেশ্য। আর তাহা এই কথার বর্ণনা যে, কুরআনে কারীম এমন বিষয়াবলীর সত্যায়নকারী যাহা ঐ কিতাবগুলিতে রহিয়াছে। ইহাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহিত করা এবং তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ় করা উদ্দেশ্য। সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা উদ্দেশ্য নহে। কাজেই, এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, لَآ اَشُكُّ وَلَآ اَسْاَلُ "ইহাতে আমার না আছে কোন সন্দেহ, আর না আমি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করি।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চোখের পাতার স্পন্দন বরাবরও সন্দেহ করেন নাই। আর এ প্রসঙ্গে কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

অধম বান্দা আবদুল হক ইব্ন সায়ফুদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এখানে সন্দেহ দ্বারা ঐ বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে, যাহা সত্যায়ন ও নিশ্চিত বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। বরং সেই অবস্থা উদ্দেশ্য যা স্বচক্ষে দেখার পূর্বে অন্তরের প্রশান্তির কারণ হইয়া থাকে। তাই তো হযরত খলীলুল্লাহ আলায়হিস্-সালামের বক্তব্যকে সন্দেহ নামে নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, তিনি নিবেদন করিলেন, رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى "হে আমার রব্ব! আমাকে দেখাইয়া দিন, কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন ?" এ ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশ করিতে গিয়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত খলীলুল্লাহ আলায়হিস সালাম হইতে এক ধাপ আগাইয়া বলিলেন, نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْهُ "আমি তো তাহার চাইতে বেশী সন্দেহের হকদার।"

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরাটিকে এ কারণে বেশী ভালবাসিতেন যে, এর মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে- اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى "এ-তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে, ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।" (সূরা আ'লা ঃ ১৮-১৯)

www.pathagar.com

দাজ্জালের অস্তিত্ব সম্পর্কে তামীম দারীর খবর দেওয়া ঐ ইরশাদের অনুকূলে যাহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দিয়াছেন। আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে ডাকা ও ঐ ঘটনা শোনানো সবই এই অর্থে প্রযোজ্য। মু'জিযা প্রকাশ পাওয়ার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই কথা বলা اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰه "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল"–এটাও এরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, যাহারা এ কথা বলে যে, لَئِنْ اَشْرَكْتَ "তুমি যদি শিরক কর"-এর মধ্যে সম্বোধন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নহে, বরং শ্রোতাগণ। তবে এটাও সম্ভব যে, এখানে অর্থাৎ فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ-এর মধ্যেও সম্বোধন শ্রোতাদের জন্য হইবে।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় যুগে মানুষদের মধ্যে তিনটি দল ছিল ঃ (ক) সত্যায়নকারী, (খ) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও (গ) মুনাফিকীন বা মুতাওয়াক্কিফীন। তাহারা তাঁহার কাজকর্মে সন্দেহ পোষণ করিত। কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে সাধারণ সম্বোধন এক বচনের শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। আর বলিলেন, হে মুতাওয়াক্কিফ! অর্থাৎ যে সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছ! তোমার যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে যে, আমি যাহাকে আমার নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছি আর সে যেই দীন নিয়া আসিয়াছে, তবে আহলে কিতাবীদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তাহা তোমার জন্য তাঁহার নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতার উপর পথ-নির্দেশক হইবে এবং উম্মতের জন্য কুরআন নাযিলের সম্বোধন প্রমাণিত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا। "আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আলো প্রেরণ করিয়াছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাহাদের জন্য এমন জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাহাদের সন্দেহের নিরসন করিয়া দেয়, তখন তিনি তাহাদেরকে এই ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট বর্ণনার পর তুমি দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। যেমন তিনি ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ "আর যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না–তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ -

"আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা জানে যে, তাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই, তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।" (সূরা আনআম ঃ ১১৪)।

সারকথা হইল, আহলে কিতাবীরা এ কথা জানিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে নবী-রাসূল আগমন করেন এবং কিতাব নাযিল হয়। অথবা এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য যে, قُلْ يَا

www.pathagar.com

مُحَمَّدُ لِمَنِ افْتَرَى لاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ হে মুহাম্মদ! যে সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে তাহাকে বলিয়া দাও যে, তোমরা সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। কাজেই, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজকে বাদ দিয়া অন্যদেরকে সম্বোধন করিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদেরকে সম্বোধন করা আল্লাহ্ তা'আলার এ ইরশাদ সমর্থন করে, যা এর পরই রহিয়াছে, চিন্তা-ফিক্র কর। তিনি বলেন ঃ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِنْ دِيْنِىْ "তুমি বল, হে মানুষেরা! আমার দ্বীনের ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দিহান হইয়া থাক, তবে .....।" (সূরা ইউনুস ঃ ১১৪)

অজ্ঞতার সম্বন্ধ প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

কাযী ইয়ায (র) বলেন, এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নহে যে, "তুমি এ প্রসঙ্গে অজ্ঞ থাকিও না যে, মহান আল্লাহ্ যদি চাহিতেন, তবে তাহাদেরকে হিদায়াতের উপর সমবেত করিতেন।" কেননা, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে 'মূর্খতা' একটি গুণ হিসাবে সাব্যস্ত হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে কিংবা নবীগণের উপর 'মূর্খতা' গুণ সাব্যস্ত করা বৈধ নহে। এর দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ উপদেশ প্রদান করা উদ্দেশ্য যে, নিজের কাজ-কর্মে মূর্খদের মত পন্থা অবলম্বন করিও না। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে এমন কোন গুণ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ নাই, যে গুণে গুণান্বিত হওয়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রতিবন্ধক। বরং সম্প্রদায়ের মুখ ফিরাইয়া নেওয়া ও তাহাদের বিরোধিতার উপর ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ ইহাতে রহিয়াছে। আবূ বকর ইব্ন ফাওরাক তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, অর্থগত দিক হইতে তা উম্মতের প্রতি সম্বোধন। অর্থাৎ তোমরা মূর্খদের মত হইও না। যেমনটি অন্যান্য স্থানেও বলা হইয়াছে। কুরআনে কারীমের মধ্যে এ ধরনের উদাহরণও রহিয়াছে অনেক। এমনিভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চল, তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১১৬)

এ সম্বোধন অন্যদের প্রতি। যেমনটি বলা হইয়াছে وَاِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "তোমরা যদি কাফিরদের অনুসরণ কর, তবে .....।"

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মহাবাণী ঃ فَاِنْ يَشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ "যদি তা-ই হইত, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন" (সূরা শূরা ঃ

www.pathagar.com

وَلَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার আমল ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" (সূরা যুমার ঃ ৬৫)

এই ধরনের সমস্ত উদাহরণের প্রত্যেকটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যরা উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ যেইভাবে চান সেভাবেই তাহাকে আদেশ-নিষেধ করিতে পারেন। অথচ, তাঁহার নিকট হইতে তাহা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ "তাহাদেরকে বিতাড়িত করিও না, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে।" (সূরা আন'আম ঃ ৫২)

অথচ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও তাহাদেরকে নিজের কাছ হইতে বিতাড়িত করিতেন না। কেননা, তিনি তো যালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ "ইতোপূর্বে তুমি তো অবশ্যই গাফিল ছিলে।" এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত হইতে গাফিল উদ্দেশ্য নহে। বরং হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে অনবগত থাকা উদ্দেশ্য। কেননা, কখনও এ ঘটনা না তোমার খেয়ালে আসিয়াছে, না তোমার কান ইতোপূর্বে তাহা কখনও শুনিয়াছিল। আর তুমি নিজে নিজেও তাহা জানিতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে তোমার জানা হইল।

কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ "যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ নিবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০০)

বাহ্যতঃ এ আয়াত সন্দেহে নিপতিত করিয়া ফেলে। অথচ শয়তানের কুমন্ত্রণা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য নহে। কিন্তু, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানের ইচ্ছা-অভিপ্রায় যে, সে কুমন্ত্রণায় নিপতিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহা তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া দিলেন।

সারকথা, কাহারও উপর যদি তোমার এমন কোন গোস্‌সা আসিয়া যায়, যাহা তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা তাহার সামনে না আসতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তুমি মহান আল্লাহ্‌র শরণ চাও। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আশ্রয়ে রাখিবেন। 'নয্‌গ' শয়তানের সবচেয়ে নিম্নস্তরের ষড়যন্ত্র। যেমন, আল্লামা যুজাজ বলেন ঃ বুঝা গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যে, কোন শত্রুর উপর যখন তোমার গোস্‌সা আসিবে কিংবা শয়তান তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার ইচ্ছা করে কিংবা অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, তখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। ইহাতে তিনি তোমাকে শয়তানের অকল্যাণ হইতে নিরাপদ রাখিবেন। ইহা তাঁহার নিষ্পাপতার পূর্ণতার কারণেই হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর প্রভাব বিস্তার করার শক্তি-সামর্থ্য দেন নাই। ইহা ঐ আয়াতের প্রতীয়মান বিষয়বস্তু যাহাতে ইরশাদ হইয়াছেঃ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ "আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না।" (সূরা হিজ্‌র ঃ ৪২)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

"যাহারা তাক্ওয়ার অধিকারী হয়, তাহাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০১)

এ আয়াতের উদ্দেশ্যও তাহাই হইবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ। (কিন্তু শয়তান যদি তোমাকে ভুলাইয়া দেয়)-এর মধ্যে 'ভুলিয়া যাওয়া' নয়্গ নহে। আর এ কথাও বিশুদ্ধ ও ঠিক নহে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কিংবা পরে শয়তান ফেরেশতার আকৃতিতে আসিয়া তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার যে ইচ্ছা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সত্য প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এর চাহিদাও এটাই যে, নবীর নিকট যে-ই আসিবে সেই ফেরেশতা কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার পাঠানো কেহ হইবে। অথবা বাধ্যতামূলকভাবে এর জ্ঞান জানা হইয়া যায়, যা আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অথবা এমন দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের মাঝে প্রকাশ করিয়া দেন। 'ওহীর সূচনা' পর্বে এ আলোচনার বিস্তারিত পর্যালোচনা আসিবে।

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই।" (সূরা আন'আম ঃ ১১৫)।

তিলাওয়াতে শয়তানের অনধিকার চর্চা প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ -

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৫২)।

এ আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় সবচেয়ে উত্তম ও প্রসিদ্ধ হইল জমহুর মুফাস্সিরীনে কিরামের এ বক্তব্য যে, এখানে تَمَنّٰى দ্বারা উদ্দেশ্য তিলাওয়াত। আর শয়তানের প্রক্ষিপ্ত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল তিলাওয়াতকারীর অন্তরে দুনিয়াবী কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া রাখা। ইহাতে শয়তান তিলাওয়াতে বিভিন্ন ধারণা ও তাহার তিলাওয়াতে ভুলে যাওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেয়। অথবা শ্রোতাদের উপলব্ধিতে বিকৃতি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মত জিনিস ঢুকাইয়া দেয় যাহা আল্লাহ্ তা'আলা রহিত ও দূর করিয়া দেন। আর সামঞ্জস্যতাকে উন্মুক্ত করিয়া দেন। আয়াতে ইলাহিয়াকে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করিয়া দেন। মাওয়াহিবে

www.pathagar.com

লাদুন্নিয়ায়ও এমনই উল্লেখ রহিয়াছে। এ ধারাবাহিকতায় মুফাস্‌সিরগণের আলোচনা তো অনেক কিছুই আছে, যাহার কিছু আলোচনা 'শিফা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন বাকী রহিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের লায়লাতুত তা'রীসের উপত্যকায় নিদ্রা যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ। 'লায়লাতুত-তা'রীস' একটি উপত্যকার নাম, যাহা ছিল শয়তানের বাসস্থান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি দ্বারা ইহা কোথায় জানা গেল যে, শয়তান তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া নিল কিংবা তাঁহাকে কুমন্ত্রণায় ফেলিয়া দিল ? যদি এটা সম্ভবই হয়, তবে তাহা হইয়া থাকিবে হযরত বিলাল (রা)-এর উপর। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রা)-কে ফজরের নামাযের হিফাযতের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। শয়তান আসিয়া হযরত বিলাল (রা)-কে গভীর ঘুমে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছিল। 'লায়লাতুত-তা'রীস'-এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। আর এটাও এ ভিত্তিতে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ নামাযের সময় ঘুমাইয়া যাওয়ার কারণে সতর্ক করার জন্য নহে। আর সতর্কতার জন্য যদি হইয়াও থাকে, তবে তাহা এই উপত্যকা হইতে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার জন্য এবং ইহাতে নামায বাদ পড়িয়া যাওয়ার কারণ বর্ণনা করার জন্য। কাজেই, এখানে কোন আপত্তিই নাই। আর তাহা খণ্ডন করারও কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অন্ধ সাহাবী হযরত ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘটনা

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى "সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া নিল। কারণ, তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।" (সূরা আবাসা ঃ ১-২)

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, যখন অন্ধ সাহাবী হযরত ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) সত্য অনুসন্ধানের জন্য আসিলেন আর ঐ সময়টি ছিল কথাবার্তা বলার সময়। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার আগমনে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে আলোচনা না করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আর যেসব কাফির সত্যবিমুখ হইয়াছিল ও তাঁহার সামনে উপবিষ্ট ছিল, তিনি তাহাদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এর দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য 'ত্রুটি' সাব্যস্ত হয়। এর উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাও অভিযোগ তুলিয়াছেন। তাঁহার এই আচরণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ সূরার শানে নুযূল তা-ই উল্লেখ রহিয়াছে।

'ত্রুটি' সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি তো ধারণা মাত্র। অবশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিষয় বর্জন করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার সুরাত বাহির হয়। এটা এ কারণে যে, এ দুই ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা যদি তাঁহার নিকট উন্মোচিত কিংবা অবগত থাকিত, তবে অন্ধ সাহাবীকে আগে বসাইতেন। কিন্তু, তিনি কাফিরদের প্রতি যেভাবে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিলেন, তাহা তাঁহার অনুগত, শরীআতের হুকুম-আহকামের প্রচার, মনোরঞ্জন ও ঈমানের উপর আশা-আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ছিল। কেননা, তাঁহার রিসালত ও প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল ইহা, দীনের বিরোধিতা নহে। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার হাবীব রাসূলে

www.pathagar.com

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি এক প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উপদেশ প্রদান করা। আর এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ইসলামের জন্য তোমার দাওয়াত ও তাবলীগের গাম্ভীর্য এ পর্যায়ে পৌঁছা উচিত নহে যে,এর কারণে কোন মুসলমানের প্রতি অবহেলা করিতে বাধ্য হও। শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া ও সতর্ক করাই তোমার কাজ। وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ। "রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া।" প্রকৃতপক্ষে, উম্মে ইব্ন মাকতূমই এ ধমকের উপযুক্ত। এই জন্য যে, যদিও তিনি চোখে দেখিতে পারিতেছেন না, কিন্তু কাফিরদের সহিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথোপকথন তো কান দিয়া শুনিতেছিলেন। আর এ কথাটি তিনি জানিতেন যে, তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার গুরুত্ব ও মনোনিবেশ কি পরিমাণ ছিল ? যাহার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর মজলিসে ভীড় হইয়া যাইতেছিল। আর তা ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য কষ্টের কারণ। নবীকে কষ্ট দেওয়া ছিল বড় গুনাহের কাজ। কাজেই বুঝা গেল, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর ধমক ও আদব শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে এ আয়াত নাযিল হইয়াছে। যেমনিভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা এবং তাঁহার কক্ষের পেছনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের মধ্যে আহকাম নাযিল হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ ও বিশুদ্ধ নিয়ত থাকায় তাঁহাকে ক্ষমার যোগ্য রাখা হইয়াছে এবং বিনম্রতা ও মেহেরবানীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। মহান আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

মুনাফিকদেরকে অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ "আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, তুমি কেন তাহাদেরকে অনুমতি দিলে ?" (সূরা তাওবা ঃ ৪৩)

এ আয়াত দ্বারাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কেননা, ক্ষমা করাই দাবী করে এর পূর্বে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়া। আবার لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ-এর মধ্যে استفهام انکاری অর্থাৎ অস্বীকার বুঝানোর জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছে। কাজেই, মুনাফিকদেরকে এ অনুমতি প্রদান আল্লাহ্ তা'আলার স্বীকৃতি ছাড়া ও অসন্তুষ্টির সহিত হইবে। যদিও সান্ত্বনার বহিঃপ্রকাশের জন্য অনুমতির অস্বীকৃতির উপর ক্ষমা করার বিষয়টিকে উল্লেখ করিয়াছেন।

আর অসন্তুষ্টি প্রকাশের পূর্বে ক্ষমার কথা উল্লেখ করা বড়ই প্রিয় ও বিরল। যাহা মহব্বত ও ভালবাসার সংবাদ বহন করিয়া থাকে। তাহারা বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন দুইটি কাজ করিয়াছেন, যাহার নির্দেশ প্রথমে মহান আল্লাহ্ দেননি। প্রথমত, বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার জবাব হইল, এখানে عَفَا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন) দ্বারা ঐ ক্ষমা উদ্দেশ্য নহে, যাহা সাধারণতঃ গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার পর হইয়া থাকে। বরং এ বাক্যটি এমন,

www.pathagar.com

যেমন মান-মর্যাদার অতিরিক্ত অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মানী কোন বন্ধুর উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে যে, "আল্লাহ্ তোমাকে মা'ফ করুন। আমার জন্য তুমি কেমন কাজ করিলে ?" "আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তুমি আমার কথার কেমন উত্তর দিয়াছ।" "আল্লাহ্ তোমার পরিণাম শুভ করুন, তুমি আমার অধিকার সম্পর্কে জান ?" ইত্যাদি। এ কথাগুলি দ্বারা ইযযত-সম্মানের আধিক্যই বুঝায়। এর দ্বারা তাহার কোন অন্যায় ও অপরাধ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নহে। আর এখানে عَفَا অর্থ غَفَرَ (ক্ষমা করা) নহে, এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশের আগে তাহা উল্লেখ করা, উক্ত অর্থের সংবাদ বহন করা এবং এ অর্থ বুঝানোর জন্য নহে, বরং যেমনটি হাদীসে আসিয়াছে–

عَفَا اللّٰهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঘোড়া ও কৃতদাসের যাকাত মাফ করিয়া দিয়াছেন।" অথচ এগুলির মধ্যে আগে হইতে যাকাত ওয়াজিবই ছিল না। উদ্দেশ্য, এ কথা বুঝানো যে, এগুলির যাকাত তোমাদের উপর জরুরী নহে।

ইমাম কুশায়রী (র) বলেন, যাহারা বলে গুনাহ্র পূর্বে ক্ষমা হইতেই পারে না, তাহারা আরবী ভাষার বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত নয়। তিনি আরও বলেন عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ পাক তোমাকে মাফ করুন। অর্থাৎ তোমার উপর গুনাহের কোন অভিযোগ নাই। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থেও এমনই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় কথার জবাব হইল অস্বীকারবোধক প্রশ্ন। তাহারা বলেন, উত্তম বিষয় বর্জন করার উপর অস্বীকৃতি ও ভর্ৎসনা করা হয়। এর জবাবে কেহ কেহ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তিনি চাহিলে অনুমতি দিতে রুখসত দান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ

"তাহারা তাহাদের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাহাদের মধ্যে যাহাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও।" (সূরা নূর ঃ ৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সমর্পণ করিয়া সাধারণভাবে তাঁহাকেও অনুমতি দিয়া দিলেন। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে তাফতূনিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, একদল এই মত অবলম্বন করিয়াছে যে, এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দোষারোপ করা হইয়াছে। (মা'আযাল্লাহ্) কখনও নহে। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাধীন ছিলেন। নবী যখন তাহাদেরকে অনুমতি দিয়া দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন যে, তুমি যদি ইহাদেরকে অনুমতি না-ও দাও, তবু তাহারা তাহাদের মুনাফিকীর কারণে বসেই থাকে। কাজেই, তাহাদেরকে রাসূলের অনুমতি দেওয়ায় কোন অসুবিধা নাই।

মুনাফিকদের প্রতি ঝুঁকিয়া যাওয়া প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً ـ اِذًا لَّاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ

www.pathagar.com

"আমি তোমাকে অবিচল না রাখিলে তুমি তাহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে. তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৪-৭৫)

এ আয়াতও নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুনাফিকদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহাকে তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া হইতে নিরাপদ রাখিলেন, তাই নবীর পক্ষ হইতে তাহা গুনাহ্। অথচ, এ ধারণা ঠিক নহে। কেননা, ইহার অর্থ হইবে এই যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যদি তাহার সহিত দৃঢ় প্রত্যয় ও নিরাপত্তা না থাকিত, তবে তাহাদের নৈকট্যের দিকে প্রবৃত্তির অনুসরণে ঝুঁকিয়া যাইতেন। কিন্তু, তাঁহার সহিত যখন আমার নিরাপত্তা ছিল, তাই তিনি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইলেন। কাজেই, এ কথাটি খুবই সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহা গ্রহণ করার দিকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই এবং তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়া শক্তির সহিত তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন নাই। আর আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের জীবনে কোন গুনাহ সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে স্বয়ং তাঁহার পেছনে বলা হইয়াছে যে, শরীআতের ও বিবেকের দৃষ্টিতে তাহা নবীগণের জন্য প্রযোজ্য হইতেই পারে না। কেননা, তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া নিরাপত্তায় রহিয়াছেন। আর ইস্মত (গুনাহমুক্ত থাকা) ইচ্ছাধীন বিষয়কে বাতিল করিতে পারে না এবং বিবেকগ্রাহ্যভাবে গুনাহ্কে অসম্ভবও করিয়া দেয় না। পক্ষান্তরে, মহান আল্লাহ্র হিফাযতে থাকিলে গুনাহ সংঘটিত হইতে পারে না। কাজেই, প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত নবী মা'সুম (নিষ্পাপ)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়প্রত্যয়ী। আয়াতে কারীমার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পাক-পবিত্রতার পূর্ণতায় অতিরিক্ত অর্থ রহিয়াছে। আর তাহা হইল এই যে, তাঁহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত, ইস্মত (গুনাহমুক্ত) ও মহব্বত রহিয়াছে, ধমকি ও কঠোরতা নহে। (মাআযাল্লাহি)।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ প্রসঙ্গ

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ـ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, কল্যাণময়। আল্লাহ্র পূর্ববিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত।" (সূরা আনফাল ঃ ৬৭-৬৮)

একদল লোক এ আয়াতকেও ভর্ৎসনার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরামর্শক্রমে বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পরামর্শক্রমে তাহাদেরকে হত্যা না

www.pathagar.com

اِثْخَانٌ। অর্থ অধিক করা এবং কোন বিষয় অতিরিক্ত করা।' আর এখানে اِثْخَان। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হত্যা ও যখম করা। মোদ্দাকথা, নবীর জন্য উচিত, যখন তাহার হাতে কোন বন্দী আসিবে, তখন তাহাকে হত্যা করা, যাহাতে কুফর বিদূরিত হইয়া ইসলাম সমুন্নত হয়।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ "তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ, আর আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ।"

মোদ্দাকথা, তোমরা দুনিয়ায় গনীমত ও সম্পদের ইচ্ছা করিয়াছ। আর আল্লাহ্ পরকালকে চান। ইহাতে দীন-ইসলামের শক্তি এবং পরকালে ইহার ছাওয়াব দেওয়া হইবে।

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত।"

মোদ্দাকথা, আযল হইতেই যদি আল্লাহ্র হুকুম এমন না হইত যে, ইজতিহাদকারীকে ভুলের জন্য ধরা হবে না, তবে এ সময় তুমি যাহা নিয়া নিলে কিংবা যে সিদ্ধান্ত নিলে, তাহাতে তোমার বড় শাস্তি হইত। এক হাদীসে আসিয়াছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমাদের উপর যদি শাস্তি বর্ষিত হইত, তবে উমর ছাড়া আর কেহ তাহা হইতে রেহাই পাইত না। এরই ভিত্তিতে ঐ দলটি বলে যে, এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর (মা'আযাল্লাহ্) ভর্ৎসনা ও শাস্তির ধমকি আসিয়াছে। এর জবাবে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার বলেন ঃ এই আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর গুনাহ করার কোন অভিযোগ নাই। বরং ইহার মধ্যে এ কথার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় যে, সমস্ত নবী-রাসূলের উপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কোন নবীর জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ ছিল না। যেমন তিনি বলেন ঃ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ "আমার জন্য গনীমতের সম্পদকে হালাল করা হইয়াছে।"

তুমি চাহিলে এ কথা বলিতে পার যে, এই হুকুম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য বৈধ আছে যে, তিনি বন্দীদেরকে হত্যা না করিয়া মুক্তিপণ নিবেন। আর মুক্তিপণ তো গনীমতেরই একটি প্রকার। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا (তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ)। কেহ কেহ বলেন, ইহার দ্বারা ওই ব্যক্তিকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যে দুনিয়ার ইচ্ছা রাখে এবং দুনিয়ার উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করে। এই আয়াতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও অধিকাংশ সাহাবা উদ্দেশ্য নহে। বরং যাহ্হাক হইতে বর্ণিত আছে, এই আয়াত ওই সময় নাযিল হইয়াছে, যখন বদরের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আর মানুষেরা ধন-সম্পদ জমা ও গনীমতের সম্পদ সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মুশরিকদের হত্যা না করিয়া হাত গুটাইয়া লইতেছিল। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশংকাবোধ করিলেন যে, কাফিররা না জানি পুনরায় পাল্টা আক্রমণ করে। আর অবশেষে হইলও তাহাই। তখন তাহাদের প্রসঙ্গে নাযিল হইল ঃ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ "তোমাদের কতক চাহিয়াছিল ইহকাল আর কতক চাহিয়াছিল পরকাল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২)

www.pathagar.com

করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা ছিল তাঁহার ইজতিহাদ। আর ইজতিহাদে ভুল হইয়া গেলে শরীআত সেটাকে বৈধ রাখিয়াছে। তবে নবীর জন্য ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বৈধ নহে। যেমনটি উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সহীহ্ মুসলিমে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের পরাজিত করিলেন আর মুশরিকদের ৭০ জন নিহত হইল আর ৭০ জন বন্দী হইল, তখন নবী আকরাম (সা) বন্দীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এ বন্দীরা তো আমাদের চাচাদেরই বংশধর, আপন ভাই ও আপনার গোত্রের লোক। আমার পরামর্শ হইল, তাহাদের কাছ হইতে মুক্তিপণ নেওয়া হউক। ইহাতে যে অর্থ আমাদের হাতে আসিবে তাহা দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রণসামগ্রীর ব্যবস্থা করা যাইবে। আর এ-ও আশা রাখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাহাদেরকে হিদায়াত দিয়া দেন, তবে তো তাহা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি ও সহায়ক হইবে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর ইব্‌ন খাত্তাব! তুমি কি পরামর্শ দিতেছ ? আমি নিবেদন করিলাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার পরামর্শ আবূ বকর (রা)-এর পরামর্শের অনুকূলে নহে। আমার পরামর্শ হইল, ইহাদেরকে হত্যা করা হউক। আর আমাকে নির্দেশ দিন আমি অমুক অমুককে হত্যা করিয়া দেই (আমি আমার প্রিয়জনদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম)। আর আলী (রা)-কে নির্দেশ দিন, সে যেন তাঁহার ভাই আকীল (রা)-কে হত্যা করে। হযরত হামযা (রা)-কে নির্দেশ দিন, সে যেন তাঁহার অমুক আত্মীয়কে হত্যা করে। যাহাতে অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা জানিয়া নিক যে, আমাদের অন্তর মুশরিকদের মহব্বত ও বন্ধুত্ব হইতে মুক্ত। কিন্তু নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরামর্শ ভাল মনে হইল। তিনি তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে মুক্তিপণ নিয়া নিলেন। পরের দিন যখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম, তখন দেখিলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনিয়াছেন, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার নিকটেই আছেন। উভয়ে কাঁদিতেছেন। তাহা দেখিয়া আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাদের দুইজনকে কে কাঁদিতে বাধ্য করিল ? বলুন, তাহাতে আমিও কাঁদিব। কান্না না আসিলে কান্নার ভান করিয়া উচ্চ আওয়াযে কান্নার চেষ্টা করিব। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমরা এ জন্যে কাঁদিতেছি যে, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের নিকট হইতে মুক্তিপণ নেওয়ায় নিঃসন্দেহে আমার সামনে এ গাছটির অতি নিকটে আযাব প্রকাশ হইয়া গেল। আর তিনি একটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, যাহা আমাদের খুব নিকটেই ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নহে।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ "যদি আযলের দিন হইতে তা লিপিবদ্ধ না থাকিত, তবে"-এর অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া মুফাস্সিরীনে কিরাম নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, "শুরু হইতেই যদি তা লিপিবদ্ধ না থাকিত যে, কাউকে আমি শাস্তির সম্মুখীন করিব না। কিন্তু, নিষেধ করার পর তো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম।" ইহাতে বুঝা গেল বন্দীদের বিষয়টি অপরাধ ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, এর অর্থ পবিত্র কুরআনের উপর যদি তোমাদের ঈমান না হইত, তখন পূর্ববর্তী কিতাব দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য। আর তোমরা ক্ষমার যোগ্য হইলে গনীমতের সম্পদের উপর নিন্দা করা হইত। অথবা এ উদ্দেশ্যও হইতে পারে যে, "যদি লাওহে মাহ্ফূযে এ কথা লিপিবদ্ধ না থাকিত যে, গনীমতের সম্পদ ভোগ করা বৈধ।" সমুদয় ব্যাখ্যাই গুনাহ্ ও অপরাধ সংঘটিত না হওয়াকে প্রমাণ করে। কেননা, যে কাজ করা বৈধ, তা গুনাহ ও অপরাধ নহে। কাজেই, আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا "যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর।" (সূরা আনফাল ঃ ৬৯)

আবার কেহ কেহ বলেন ঃ "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে হত্যা ও মুক্তিপণ এ দুইটির মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। নিঃসন্দেহে আলী মুর্তাযা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরাঈল আসিয়া বলিল, বন্দীদের বিষয়ে আপনার সাহাবীগণকে এ অধিকার দেওয়া হইল যে, হয়ত তাহাদেরকে তাহারা হত্যা করিয়া দিবে, নতুবা এই শর্তে মুক্তিপণ নিয়া তাহাদেরকে ছাড়িয়া দিবে যে, আগামী বছর তাহাদের ৭০ জন নিহত হইবে। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম বলেন ঃ আমরা মুক্তিপণ গ্রহণের বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি, যাহাতে আমাদের মধ্য হইতে ৭০ জন শাহাদাত বরণ করে। ফলে দেখা গেল উহুদের যুদ্ধের দিন ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম শাহাদাত বরণ করিলেন। ইহাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা অধিকার ও অনুমতি পাওয়ার পরই এমনটি করিয়াছে। কাজেই, এতে গুনাহ বা অপরাধ হইল কোথায়? কেহ কেহ বলেন ঃ যদিও তাহাদেরকে হত্যা ও মুক্তিপণ গ্রহণ– এ দুইটির যে কোন একটি অবলম্বন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তবু হত্যা করিয়া দেওয়াটা বেশী উত্তম ছিল। যাহার কারণে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। কিন্তু, কেহই গুনাহগার ও অপরাধী হিসাবে বাকী রহিল না। মহান আল্লাহ্-ই অধিক পরিজ্ঞাত।

শান-শওকতের প্রকাশ ও প্রভুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ - لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ -

"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি অবশ্যই তাঁহার ডান হাত ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার শাহ্রগ (জীবন ধমনী)।" (সূরা হাক্কা ঃ ৪৪-৪৬)।

www.pathagar.com

যেন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা রচনা করিয়া আমার নামে তাহা চালাইয়া দিত, তবে অবশ্যই আমি তাঁহাকে ডান দিক হইতে ধরিয়া ফেলিতাম। তাঁহার শাহ্‌রগ (জীবন ধমনী) কাটিয়া দিতাম। তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম। ইহাতে শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যেমনটি রাজা-বাদশাহ্‌দের স্বভাব হইয়া থাকে। যাহাদের উপর গোস্‌সা আসে, তাহাদের প্রতি এমন করিয়া থাকে। মূলতঃ তাহা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইতে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে অতির ন। কিন্তু এ আলোচনায় لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ -এর মত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও মান-মর্যাদা সত্ত্বেও শান-শওকতের প্রকাশ ও প্রভুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। আর এ আয়াত তাঁহার অবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও পরিপূর্ণ মহব্বত-ভালবাসার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য তাহা একটি সতর্কসংকেত, যাহাতে তাহারা সতর্ক হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্বাবস্থায় আমাদের আদব বজায় রাখিতে হইবে এবং প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে রসনা সংযত রাখিতে হইবে।

বিস্তারিত ইল্‌মের প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ "তুমি তো জানিতে না কিতাব কি ও ঈমান কি?" (সূরা শূরা ঃ ৫২)

কেহ কেহ বলেন ঃ ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য, ঈমানের আহকাম ও ঈমানের গুণাবলীর বিস্তারিত বিধান। যেমন, কুরআনে কারীম। কেননা, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ও দীনে শরীআত পরিপূর্ণ হওয়ার পর ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। নিঃসন্দেহে ইহা তো প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, নুবুওয়াতের পূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রতিমা ও প্রতিমাপূজারীদেরকে শত্রু জানিতেন। তিনি হজ্জ ও উমরা করিতেন। তিনি কখনও মদ পান করেন নাই। অথচ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মাধ্যমে যে শরীআত নির্ধারণ করিলেন, তাহা তখন পর্যন্ত তাঁহার উপর অবতীর্ণ হয় নাই। এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহাই। ঈমানের ইচ্ছা করার উদ্দেশ্য হইল, সত্যায়ন ও স্বীকৃতি। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ ইহার উদ্দেশ্য, ঈমান ও আহকামের দাওয়াত। কেহ কেহ বলেন ঃ এখানে مضاف (সম্বন্ধপদ) বিলুপ্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ اَهْلَ الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে, তোমরা আহলে ঈমানকে জানিতে না যে, চাচা ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে কে কে ঈমান গ্রহণ করিবে। এ অর্থটি বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক হইতে অনেক দূরে। সঠিকভাবে মহান আল্লাহ্ই বেশী জানেন। আমরা সবাই তাঁহারই মুখাপেক্ষী ও অভিমুখী।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং অতীতের উম্মতগণ সম্পর্কে বর্ণনা

এ অধ্যায়ে তাওরাত-ইনজীলসহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সেইসব ভবিষ্যদ্বাণী ও অগ্রিম সুসংবাদ উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা-দীক্ষা ও রিসালাতের সহিত সম্পৃক্ত। আহ্‌লে কিতাবের বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কথায় ও লেখায় ইহার স্বীকৃতিও দিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ - يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খুব আলোচনা করা হইয়াছে। নবী-রাসূলগণের মজলিসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আলোচনা সর্বদাই থাকিত। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতে তাঁহার সম্পর্কে অবগত করিয়া দিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের মজলিসে তাঁহার আলোচনা হইয়া থাকিবে। কেননা, مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভালবাসে বেশী বেশী ওই বস্তুকে স্মরণ করে। উক্ত আয়াতে কারীমা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করে। এ সংবাদটি যদি বাস্তবভিত্তিক না হইত, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদের ঘৃণা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার পাত্র হইতেন। ইয়াহূদী-খৃস্টান অপেক্ষা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ও জাতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সার্বিক অবস্থা ও নুবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে বেশী জানিত না। কেননা, ইয়াহূদী-খৃস্টানরা তাওরাত ও ইনজীলে তাঁহার গুণাগুণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং মদীনা শরীফে দীর্ঘ সময় হইতে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষিত ছিল। কেননা, এ শহরে তাঁহার আত্মপ্রকাশের লক্ষণ ও চিহ্ন পাওয়া যাইত। এই ইয়াহূদী-খৃস্টানরাই যখন তাহাদের সহিত মুখোমুখি ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, তখন তাহারা তাঁহার আবির্ভাবের দোহাই দিয়া বিজয় ও সহযোগিতা খুঁজিয়া বেড়াইত। আর বলিত, এখন সেই সময় আসিয়া গিয়াছে যখন আমরা শেষ যুগের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার ছায়ায় তোমাদের সহিত লড়িব। মৃত্যুর সময় তাহাদের বাপ-দাদারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ওসিয়তনামা লিখিয়া যাইত আর বলিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে আমাদের সালাম পৌছাইয়া এই নিবেদন করিবে যে, তাঁহার প্রতীক্ষায় আমরা আমাদের জীবন দিয়া দিলাম, আর ঈমানের সহিত এই দুনিয়া হইতে তাহারা বিদায় নিয়াছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ "তাহারা তাঁহাকে এমনভাবে চিনিত, যেমন চিনিত তাহাদের সন্তানদেরকে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৬)

মোটকথা, এই কাফিররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে খুব ভাল করিয়াই জানিত-চিনিত। কিন্তু, যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তাহাদের স্বভাবগত দুর্ভাগ্য আবার ফিরিয়া আসিল এবং হিংসা-বিদ্বেষে তাঁহার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে লাগিল। জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপনের অসৎ উদ্দেশ্যে তাহাদের কিতাবগুলিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। দুনিয়ার ভালবাসা ও পদমর্যাদার মোহ তাহাদেরকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুর্ভাগ্যের অতল তলে ডুবাইয়া দিল। কিন্তু, এ বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধনের পরও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ ও তাঁহার শরীআতের বিভিন্ন লক্ষণ-চিহ্ন তাহাদের কিতাবসমূহে এখনও আলোকদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন যে, সুরিয়ানী ভাষায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম مُشَفَّحْ (মুশাফ্ফাহ্)। আর মুশাফ্ফাহ্ অর্থ মুহাম্মদ, কেননা, তাহাদের ভাষায় 'শাফহুন' (شَفْحٌ) অর্থ 'প্রশংসা' (حَمْدٌ)। আর তাহারা যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে তাহারা شَفَحَالاَ অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) বলে। 'শাফহুন' অর্থ যখন 'হাম্দ' হইল, তো 'মুশাফ্ফাহ্' অর্থ 'মুহাম্মাদ' সাব্যস্ত হইল। ওই কিতাবে তাঁহার বিভিন্ন অবস্থা, গুণাগুণ, নুবুওয়াতের নিদর্শন ও লক্ষণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল এবং তাঁহার আবির্ভাব ও হিজরতের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ ছিল। যেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মদীনায় আগমন করিলেন, সেই দিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি ইয়াহূদীদের মান্যগণ্য একজন পণ্ডিত ও হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামের বংশধরের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উপস্থিত হইলেন এবং ঈমান গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। যেদিন হইতে তিনি মক্কা মুকাররমা হইতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সংবাদ পাইলেন, সেইদিন সহিত তিনি তাঁহার সহিত সৌজন্য সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। কবি বলেন ঃ

مدتے بودکه مشتاق لقایت بودم
لاجرم روئے ترا دیدم وازجا رفتم

"দীর্ঘদিন ধরিয়া তোমার সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলাম, আচমকা তোমার চেহারা দেখিয়া ফেলিলাম আর এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আলোকিত চেহারা দেখিয়া ধন্য হইলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কী ইয়াসরিবের আলিম ইব্ন সালাম ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম দিয়া তোমাকে বলিতেছি, যিনি আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন– তুমি কী আল্লাহ্র কিতাব তাওরাতের মধ্যে আমার গুণাগুণ পাইয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বিজয়ী ও সফলকাম করিবেন। তিনি

www.pathagar.com

আপনার দীনকে অপরাপর দীনগুলির উপর বিজয় দান করিবেন। অবশ্যই নিশ্চিতভাবে আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে আপনার প্রশংসা ও গুণ-গরিমা পাইয়াছি। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" (সূরা আহযাব ঃ ৪৫)।

حِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ উম্মী অর্থাৎ আরবদের যাহারা লেখাপড়া জানিত না, তাহাদের জন্য তিনি আশ্রয়স্থল এবং তিনি সারা জাহানের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। বিশেষ করিয়া আরবদের কথা উল্লেখ করার কারণ হইল, তাহাদের মধ্যে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাহারা ছিলেন তাঁহার একেবারেই নিকটের মানুষ। অথবা এ জন্য যে, প্রথমে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও মানসিক হতভাগা হিসাবে তাহারা প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তাহারা তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান ও হিদায়াতের চরম শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। حِرْزٌ এমন সংরক্ষিত এলাকাকে বলা হয়, যেখানে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে না। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য, তাহাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা হইতে, চাই ওই অপ্রীতিকর বিষয়টি আত্মিক হউক, কিংবা শয়তানী কুমন্ত্রণামূলক বা অন্য কিছু। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারাই ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" (সূরা জুমু'আহ্ ঃ ২)। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল চিরন্তন শাস্তি ও ধ্বংস এবং অস্তিত্বহীন হইয়া যাওয়া হইতে সংরক্ষণ করিয়া আশ্রয়ে রাখা। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ "আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বিষয়ক হাদীসের উপসংহার হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ তুমি আমার বিশেষ বান্দা, এই গুণে তোমার সমকক্ষ আর নাই। আর তুমি আমার এমন রাসূল, যে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত। وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ আর তোমার নামকরণ করিয়াছি 'মুতাওয়াক্কিল' নামে। কেননা, সে সব কাজ আমার দায়িত্বে ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সে তাঁহার নিজ শক্তি-সামর্থ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কেননা, বন্দেগীর প্রকৃত অর্থ ইহাই لَسْتَ بِفَظٍّ وَّلاَ غَلِيْظٍ "তুমি রূঢ় নও ও কঠোরচিত্তও নও"। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ "যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে, তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

www.pathagar.com

আর অন্যত্র যেখানে বলা হইয়াছে وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ "এসব মুনাফিক ও কাফিরদের প্রতি আপনি কঠোর হউন।" (সূরা তাওবা ঃ ৭৩)-এর জবাব হইল এই যে, মিযাজের সৌন্দর্যতা ও মনের নম্রতা তাঁহার স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত অভ্যাস। কঠোর আচরণের নির্দেশ সৃষ্টির চিকিৎসার জন্য। যাহার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হইল– কঠোর না হওয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করা মুসলমানদের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর কঠোরতার বিষয়টি কাফির ও মুনাফিকদের সহিত নির্দিষ্ট। তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান দুইটি গুণই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ (ভালবাসাও আল্লাহ্র জন্য আর বিরোধিতাও আল্লাহ্র জন্য)। আবার তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, اَنَا الضَّحُوْكُ الْقَتُوْلُ (হাস্যময়তা আমার অভ্যাস)। আখলাক সম্পর্কীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। وَلاَ سَخَّابٌ فِى الْاَسْوَاقِ (আর বাজারে তিনি হৈহুল্লোড়কারী নন) যাহা সাধারণ মূর্খদের অভ্যাস। এটা বিবেকবান ব্যক্তির লক্ষণ যে, নম্র আচরণ করিবে আর আওয়ায উঁচু করিবে না। বক্রচরিত্র হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিবে মজলিসেও, নিজের বাড়িতেও এবং বাজারেও।

وَلاَ يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرْ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"অসদাচরণ দ্বারা অসদাচরণের বদলা নিও না। ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন কর। বক্রমনের অধিকারী লোকদের সুপথে আনার পূর্বে মহান আল্লাহ্ তোমাকে কখনও মৃত্যু দিবেন না, যতক্ষণ না তাহারা বলিবে– আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই।"

يَنْفَتِحُ بِهٖ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَنًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মাধ্যমে এমন চোখগুলি দৃষ্টিসম্পন্ন করিবেন, যাহা সঠিক পথ দেখে না। এমন কানগুলি খুলিয়া দিবেন যাহা সত্য কথা শুনে না। এমন অন্তরগুলি খুলিয়া দিবেন যাহা সত্য বিষয় উপলব্ধি করে না এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবগত রহিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটিও উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি বাজারে ফরিয়াদ ও অশালীন কথাবার্তা বলিবেন না। আর তিনি যাহা বলিবেন তাহা মিথ্যা হইবে না। তিনি সব ধরনের যোগ্যতা-দক্ষতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যতায় সুসজ্জিত থাকিবেন। আমি তাহাকে সব ধরনের সুচরিত্র দান করিব। প্রশান্তি, স্থিরতা ও সুখ-সমৃদ্ধিকে তাঁহার পোশাকে পরিণত করিব। তাক্ওয়া ও পরহেযগারীকে তাঁহার গুপ্তধনে পরিণত করিব। প্রজ্ঞা তাঁহার বিবেক, ওয়াদা পূরণ তাঁহার স্বভাব, দয়া-মায়া ও সৎকর্ম তাঁহার অভ্যাস, ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার চরিত্র, সত্য তাঁহার শরীআত, নির্দেশনা তাহার ইমাম। ইসলাম তাহার ধর্ম এবং আহমদ তাঁহার নাম হিসাবে আমি নির্ধারণ করিয়া দিব। পথহারা মানুষেরা তাঁহার নিকট পথের দিশা পাইবে। তাঁহার ওসীলায় মানুষ অজ্ঞতার পর জ্ঞানের আলো পাইবে। মানুষের স্মৃতি হইতে তাঁহার নাম হারাইয়া যাওয়ার পর সারা পৃথিবীতে আবার আলোকিত হইয়া উঠিবে। হ্রাস পাওয়ার পর ধনে-মানে তাঁহাকে প্রাচুর্য দান করিব। বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পর তাহাকে কাছে টানিয়া নিব। নিঃস্ব হইয়া যাওয়ার পর তাহাকে সম্পদশালী করিয়া দিব। বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ ও বিক্ষিপ্ত উপদলগুলিতে ভালবাসা

www.pathagar.com

ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া দিব। তাঁহার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে স্বীকৃতি দিব। কা'ব আহ্বারের নিকট হইতেও একই বর্ণনা বর্ণিত আছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কা'বের নিকট জানিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাওরাতের মধ্যে আপনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কি কি ভাল গুণ পাইয়াছেন ? জবাবে তিনি বলিলেন, তাওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে–মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মহান আল্লাহ্র একজন বিশেষ বান্দা। তাঁহার জন্মস্থান হইবে পবিত্র মক্কা মুকাররমা। মদীনা মুনাওয়ারা হইবে তাঁহার হিজরতের লক্ষ্যস্থান আর সিরিয়া হইবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি কঠোর ভাষী হইবেন না, আবার কড়া স্বভাবেরও হইবেন না। বাজারেও তিনি চেঁচামেচি করিবেন না, আর দুর্ব্যবহারেরও কোন প্রতিশোধ নিবেন না। বরং দয়া-মায়া ও ক্ষমার মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু অর্জন করিবেন। এই বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের প্রশংসাও করা হইয়াছে। যেমন তিনি বর্ণনা করিলেন যে, তাঁহার উম্মত হর্ষ-বিষাদ ও সুখ-দুঃখে সর্বদাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হইবে। যে কোন উত্থান-পতনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও বড়ত্ব প্রকাশ করিবে। নামায পড়ার জন্য সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সূর্যের পথ পরিক্রমায় যখন কোন নামাযের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা নামায আদায় করিবে, যদিও তাহারা তখন মাটিতে অবস্থিত থাকে। তাহারা টাখনার উপর লুঙ্গি ও পায়জামা পরিধান করিবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পার্শ্বদেশ অর্থাৎ হাত-পা ও চেহারা ধৌত করার মধ্য দিয়া উযূ করিবে। তাহাদের আহ্বানকারীরা আসমানে আহ্বান করিবে অর্থাৎ মুয়ায্যিনরা সুউচ্চ স্থানে আযান দিবে। তাহাদের সারিগুলি রণাঙ্গন ও নামাযের মধ্যে একই রকম হইবে। তাহারা রাতের বেলায় মধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হইবে। মধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হওয়া দ্বারা রাতের বেলার ওযীফা আদায় কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতকে বুঝানো হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃত আছে যে, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–হযরত মূসা (আ)-এর উপর যখন তাওরাত নাযিল হইল, তিনি তাহা পড়িলেন। তাহাতে তিনি এ উম্মতে মারহুমার উল্লেখ দেখিতে পাইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্! আমি তাওরাতের পাতায় এমন উম্মতের আলোচনা দেখিতে পাইয়াছি যাহারা শেষও শুরুও। অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমনের দিক দিয়া তো তাহারা সর্বশেষ। আর মর্যাদা-সম্মানের দিক দিয়া তাহারা সবার অগ্রগামী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহাদের জন্য সুপারিশ করা হইবে। তাহাদের দু'আয় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। তাহাদের স্মৃতিশক্তিতে মহান আল্লাহ্র কালাম সংরক্ষিত থাকিবে। ফলে মুখস্থই তাহারা তাহা পড়িতে পারিবে। গনীমতের সম্পদ তাহারা নিজেরা ভোগ করিবে। সাদাকাগুলি তাহাদের পেটে শোভা পাইবে। এইগুলি ঐ উম্মতের বৈশিষ্ট্য যাহাদের জন্য শরীআতের বিধানকে সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গনীমত ও সাদাকার সম্পদকে তাহাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তাহা হালাল ছিল না। যখন তাহারা কোন অসৎ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে না। বরং কাজটি যখন করিয়াই ফেলিবে, তখন একটিমাত্র গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হইবে। পক্ষান্তরে যখন কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা পোষণ করিবে, সঙ্গে সঙ্গেই

www.pathagar.com

তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে, আর যখন কাজটি করিয়া ফেলিবে, তখন তাহার দশগুণ বেশী সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হইবে। তাহাদেরকে শুরু ও শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানো হইবে। দাজ্জালকে তাহারা হত্যা করিবে।

এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ)-এর আকাঙ্ক্ষা

কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন তাওরাতের পাতায় শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের আনুমানিক সত্তরটি গুণের কথা পড়িলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্! এই উম্মতকে আমার উম্মত বানাইয়া দাও।" আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে জবাব আসিল, "হে মূসা! এই উম্মতকে তোমার উম্মত কি করিয়া বানাইব। তাহারা যে শেষ নবী আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মত।" হযরত মূসা নিবেদন করিলেন, "তাহলে আমাকে মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন।" ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বাণীতে তাঁহার জন্য দুইটি সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَا مُوْسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِىْ وَبِكَلاَمِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ـ

"হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৪)

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম।

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়া আবূ নুআয়ম বলেন, কা'ব আহ্বারকে এক ব্যক্তি বলিল, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, হিসাব-কিতাবের জন্য সমস্ত মানুষ সমবেত হইয়াছে। সমস্ত নবীকেও সেখানে ডাকা হইয়াছে। সমস্ত নবী তাহাদের নিজ নিজ উম্মতদের সহিত রহিয়াছেন। প্রত্যেক নবীর সঙ্গে দুইটি নূর আর প্রত্যেক উম্মতের সঙ্গে একটি নূর চলিতে দেখা গেল। এরপর রাসূলে আকরাম (সা)-কে ডাকা হইল। দেখা গেল তাঁহার শরীরের প্রতিটি পশমের সহিত একটি করিয়া নূর এবং প্রত্যেক উম্মতের সঙ্গে দুইটি করিয়া নূর রহিয়াছে। ইহাতে কা'ব আহ্বার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যেইভাবে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়াছ, এমনিভাবে কী কখনও কোথাও পড়িয়াছ ? লোকটি বলিল, আল্লাহ্র শপথ! স্বপ্ন ব্যতীত আর কোথাও কখনও আমি তাহা পড়ি নাই। তখন হযরত কা'ব বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যাহার কুদরতী হাতে কা'বের জীবন, এই গুণ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মতের। আর প্রথমোক্ত গুণ অন্যান্য সকল নবী ও তাঁহাদের উম্মতদের। এইটিই আল্লাহ্র কিতাব। তুমি মনে হয় যেন তাওরাতের মধ্যে তাহা পড়িয়াছ।

যেসব সংবাদে রাসূল (সা)-এর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রসঙ্গে ইয়াহূদীরা আগেই জানিত

এখন সেই সব বর্ণনা নিয়া আলোচনা হইবে যেগুলি দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলে আকরাম সায়্যেদুল আবরার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ব হইতেই

www.pathagar.com

ইয়াহূদীরা অবগত ছিল। অথচ তাঁহার আত্মপ্রকাশের পর এ ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে অস্বীকার ও তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র তাওফীক ও হিদায়াতের দৃষ্টি ছিল তাঁহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। এমন সংবাদ অনেক অনেক রহিয়াছে। কেননা, তাহারা সর্বদা তাওরাত গ্রন্থের শিক্ষা-দীক্ষার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গ নিয়া আলোচনা করিত এবং তাহাদের সন্তানদের মধ্যে লাগাতার ইহার চর্চা করিত। তাহারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শারীরিক গঠনপ্রকৃতির বর্ণনা দিত, হিজরত ও প্রেরণস্থল নির্দিষ্ট করিয়া বলিত যে, শেষ যুগের নবী মক্কা মুকাররামা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় আলোকদীপ্ত হইয়া আগমন করিবেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন প্রেরিত হইলেন, তখন তাহারা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার পথ বাছিয়া নিল এবং বলিতে লাগিল ঃ তিনি ঐ ব্যক্তি নন, যাহার ব্যাপারে আমরা তোমাদের বলিয়া আসিতেছিলাম। তাহারা তাঁহার বরকতময় গুণাবলী বিকৃত করিতে লাগিল। কিন্তু, তাহাদের এ বিকৃতি সাধনের পরও তাওরাত গ্রন্থে তাঁহার দলীল-প্রমাণ আলোকিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। 'আবূ আমির' নামক আওস গোত্রের একজন পাদ্রী ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সে ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণনাকারী আর কেহ ছিল না। পবিত্র মদীনার ইয়াহূদীদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাহাদের সহিত সে উঠা-বসা করিত। তাহারা তাহার নিকট দীন-ইসলাম সম্পর্কে জানিতে চাহিত। আর তাহারা তাহাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী শুনাইত এবং বলিত পবিত্র মদীনা হইবে তাঁহার হিজরতের লক্ষ্যস্থল। অতঃপর সেখান হইতে সে 'তীমা' নামক স্থানে গেল। তাহারাও তাহাকে এমনই বলিল। তারপর সে সিরিয়া গেল এবং সেখানকার খৃস্টানদের নিকট জানিতে চাহিলে তাহারাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনই গুণাবলী বর্ণনা করিল। আবূ আমির তখন নির্জনে বসিয়া গেল এবং সাধু হইয়া গেল। সন্ন্যাসীদের মত পোশাক পড়িতে লাগিল। বারবার সে এ কথাই বলিয়া বেড়াইত যে, আমি হানীফিয়া ধর্ম ও ইবরাহীমী ধর্মে বিশ্বাসী এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষিত। এই আবূ আমিরের নিকট জান্নাতী নারীরাও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি শুনিয়াছিলেন। তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সে নিজের অবস্থায় অটল থাকিয়া বিরোধিতা, হিংসা ও কপটতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইল। সে বলিল, হে মুহাম্মদ! কিসের উপর তুমি প্রেরিত হইয়াছ ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হানীফিয়া ধর্মের উপর আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। সে বলিতে লাগিল, না, বরং একে অন্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, বরং আমি একে আলোকদীপ্ত, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হিসাবে নিয়া আসিয়াছি। অতঃপর বলিলেন, হে আবূ আমির! ঐ সংবাদগুলি কী যাহা ইয়াহূদীরা আমার গুণাবলী সম্পর্কে তোমার নিকট বলিয়াছিল ? সে বলিতে লাগিল, আপনি ঐ ব্যক্তি নন, যাহার প্রসঙ্গে ইয়াহূদীরা আমার নিকট গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হে আবূ আমির! তুমি তো মিথ্যা বলিতেছি। আবূ আমির বলিল, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, বরং

www.pathagar.com

আপনিই মিথ্যা বলিতেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, মিথ্যাবাদীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অসহায় ও বিপর্যস্ত অবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিবেন। আবূ আমির এরপর পবিত্র মক্কায় ফিরিয়া গেল এবং কুরায়শ ধর্মের অনুসরণ করিতে লাগিল। সে তাহার সন্ন্যাসী রূপ পাল্টাইয়া ফেলিল। এরপর সিরিয়া যাওয়ার সময় একাকী অসহায় ও বিপর্যস্ত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত অসদাচরণের পাপের শিকার হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাতে বুঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও হিদায়াত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ও জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে আসিবে না।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "আল্লাহ্ যাহাকে চান তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" ঐ আবূ আমিরের ছেলেই হইল হযরত হানযালা (রা)। যাহাকে غسيل ملائكة (ফেরেশতা কর্তৃক স্নাত) বলা হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করিলেন। বড় বড় সাহাবীর মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার ফেরেশতা কর্তৃক স্নাত হওয়ার কিস্সা প্রসিদ্ধ আছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়া ইব্ন হিব্বান তাহার 'সহীহ্' গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁহার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন নব বিবাহিত। বরং ঐ দিনই বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া সারিলেন মাত্র। এমন সময় উহুদ যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে শুনিয়া অস্থির হইয়া গেলেন। ফরয গোসল করার সুযোগটিও পাইলেন না। বাহিরে বাহির হইয়াছে কাফিরদের সহিত মুখোমুখি হইয়া পড়িলেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এদিকে লক্ষ্য করিলেন যে, ফেরেশতা তাহাকে গোসল করাইয়া দিতেছে। তিনি বলিলেন, হানযালার আসল ঘটনা কী ? কোন্ কারণেই বা ফেরেশতারা শহীদদের মধ্য হইতে তাহাকে বিশেষ করিয়া গোসল দিতেছে ? (কেননা, মাসআলা হইল, যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদ যখন শহীদ হইয়া যায়, তখন না তাহাকে গোসল দিতে হয়, না তার কাপড় খোলা হয়। অথচ এখানে তো ফেরেশতারা গোসল দিতেছে ?)

অন্য এক বর্ণনায় বিধৃত হইয়াছে যে, হযরত হানযালা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা জুনুবী (যাহার উপর গোসল ফরয) ছিলেন। স্ত্রীর নিকট থেকে এই অবস্থাতেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এইরূপই বলিলেন। এরই উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ জুনুবী শহীদকে গোসল দিতে হইবে। কিন্তু, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈ (র) ইহার বিপরীত রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহারা বলেন, জানাবাতের কারণে যে গোসল ফরয ছিল; মুকাল্লাফ হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় তাহা বাদ পড়িয়া গেল। আর মৃত্যুর কারণে যে গোসল জরুরী ছিল, শাহাদাতের কারণে তা বাদ হইয়া গেল। এখন তাহার উপর কোন্ ধরনের গোসল ওয়াজিব ? ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁহার দলীল-প্রমাণে হযরত হানযালা রাযিয়াল্লাহু তা'আলার প্রসঙ্গটি টানিয়া আনিয়াছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁহার জুনুবী হওয়ার কথাটি দলীল হিসাবে পেশ করেন।

এখন আমরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, আদম আলায়হিস সালামের সহীফা, ইবরাহীম আলায়হিস সালামের সহীফা ও অন্য নবীগণের সহীফায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, আমরা সেগুলি উল্লেখ করিব।

www.pathagar.com

তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদিতে সুসংবাদ

এই কথা প্রকাশ্য যে, কুরআনে কারীমের এ সংবাদের পর যে, ওই গ্রন্থগুলিতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন অবস্থা ও তাঁহার গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে— এ দাবীর সপক্ষে আর কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার শত্রু কাফিরদের অহেতুক অভিযোগ খণ্ডনের জন্য তাহা উপস্থাপন করা জরুরী। আর এর দ্বারা মুসলমানগণের মধ্যে প্রশান্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হইবে। কিন্তু, তাওরাতে কারচুপি, বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আত্মসাতের পরও এ কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা সীনা পর্বতে জ্যোতি বিকিরণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন, সাগীর পর্বতে স্বীয় পর্দা উন্মোচন করিলেন এবং ফারান পর্বতে আত্মপ্রকাশ করিলেন।"। 'সীনা' ওই ছোট পর্বতের নাম যাহাকে 'তূরে সীনা' বা 'তূরে সীনীন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই পর্বতে আলোকদীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলেন এবং হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সহিত কথা বলিয়াছেন। এখানে তাঁহাকে নুবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। 'সাগীর' পর্বতে ইনজীল অবতীর্ণ হইয়াছে। আর 'ফারান' হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। মক্কা মুকাররমার বনী হাশিমের সেইসব ছোট ছোট পর্বতকে 'ফারান' বলা হয়, যেগুলির যে কোন একটি পর্বতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ইবাদতে ব্যস্ত থাকিতেন। আর ওই পর্বতটিতেই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ওহী নাযিল হইয়াছিল। এই তিনটি পর্বত হইল। প্রথমত, জাবালে আবূ কুবায়স যাহার পাদদেশে মক্কা মুকাররমার জনবসতি। ইহার বিপরীত দিকে রহিয়াছে জাবালে ফায়কা'আন। বত্‌নে ওয়াদী পর্যন্ত রহিয়াছে ইহার বিস্তৃতি। ইহার পূর্ব প্রান্তে রহিয়াছে জাবালে ফায়কা'আনের সহিত মিলিত শি'আবে বনী হাশিম। আর ওই শি'আবের মধ্যেই রহিয়াছে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্মস্থান।

উম্মতের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের মধ্যে ইব্‌ন কুতায়বা অন্যতম। পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও অনুবাদে তিনি ছিলেন পারদর্শী। 'ই'লামুন-নুবুওয়াত' গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ যে কেহ এখানে সামান্য একটু চিন্তা-ফিক্‌র করিবে, তাহার জন্য কোন কঠিন কিছু নহে যে, প্রকৃতপক্ষে তূরে সীনীন অর্থাৎ 'সীনীন' পর্বতে আল্লাহ্ তা'আলার আলোকদীপ্ত প্রকাশিত হওয়ার অর্থ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করা। আর সাগীর পর্বতে তাঁহার আত্মপ্রকাশের অর্থ হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের উপর ইনজীল নাযিল করা। কেননা, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম 'আরযে খলীল' এলাকার 'জাবালে সাগীর' (যাহার অপর নাম নাসিরা)-এর মধ্যে বসবাস করিতেন। এ জন্যেই তাঁহার অনুসারীদেরকে নাসারা বলা হয়। যখন এ কথা সাব্যস্ত হইল যে, সাগীর পর্বতে আল্লাহ্ তা'আলার আত্মপ্রকাশের অর্থ হইল হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের উপর ইনজীল অবতীর্ণ করা, তখন আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, ফারানের পর্বতগুলির কোন এক পর্বতে আল্লাহ্ তা'আলার আত্মপ্রকাশ হওয়ার অর্থ হইবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়া। এ প্রসঙ্গে মুসলমান ও আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে কোন প্রকারের মতবিরোধও নাই যে, 'ফারান'

www.pathagar.com

মক্কা মুকাররমার পর্বতশ্রেণীরই নাম। আর যদি তাহারা এ দাবী করে যে, 'ফারান' মক্কা মুকাররমাহ্ ভিন্ন অন্য কোন এলাকার পর্বতশ্রেণীর নাম, তবে তাহা হইবে তাহাদের বানানো নির্জলা মিথ্যা উক্তি ও জঘন্য অপবাদ। এর জবাবে আমরা বলিব, তাহা হইলে ওই অন্য স্থানের নামটি বল, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আর ওই স্থানটির নাম 'ফারান'-ই হইবে। সেখানে কোন না কোন নবীর আবির্ভাব অবশ্যই হইয়া থাকিবে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পর ওই নবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবও প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। আর আমাদেরকে এমন একটি দীন-ধর্ম দেখাও, যাহা প্রচার-প্রসার ও পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের মত প্রকাশিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। তোমরা কী জান না, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে এমন কোনও দীন প্রস্ফুটিত ও বিস্তৃত হয় নাই, যতটুকু প্রস্ফুটিত ও বিস্তৃত হইয়াছে ইসলাম ধর্ম।

তাওরাতের দ্বিতীয় সুসংবাদ

তাওরাতে এ কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাওরাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে 'সফরফাম্স্'-এর মধ্যে এ সম্বোধন করেন ঃ "তোমাদের প্রতিপালক বনী ইসরাঈলের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য হইতে (অন্য বর্ণনা মতে তাহাদের ভাইদের মধ্য হইতে) নবী সৃষ্টি করিয়া প্রেরণ করিবেন। তাঁহার মুখে থাকিবে তাঁহার নিজের কথাই। সে ওই কথাই বলিবে, যাহা বলিবার জন্য আমি তাহাকে নির্দেশ দিব। যে কেহ তাহার কথার আনুগত্য ও অনুসরণ না করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব।"

তাওরাতের এ বর্ণনাটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁহার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল হযরত ইসহাক আলায়হিস সালামের বংশধর এবং তাঁহার ভাই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের সন্তান-সন্ততি। প্রতিশ্রুত এ নবী যদি হযরত ইসহাক আলায়হিস সালামের সন্তান-সন্ততি বনী ইসরাঈলদের মধ্য হইতেই হইয়া থাকে, তবে তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই হইবেন, ভাইদের মধ্য থেকে নহে। আর যদি তাহারা বলে, বনী ইসরাঈল তো বনী ইসরাঈলেরই ভাই। এ ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের প্রয়োগ ঠিক আছে। এর জবাবে তখন আমরা বলিব, এভাবে তো তোমরা তাওরাতকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করিতেছ। কেননা, তাওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোন নবীই হযরত মূসা আলায়হিস সালামের মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাওরাতের অন্য এক অনুবাদ কপিতে রহিয়াছে; মূসা আলায়হিস সালামের মত কোন নবী বনী ইসরাঈলের মধ্যে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কাজেই, কোন কোন ইয়াহূদীর এ বক্তব্য অসার প্রমাণিত হইল যে, প্রতিশ্রুত এই নবীর দ্বারা হযরত 'ইউশা' ইব্ন নূন'-কে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, হযরত ইউশা' ইব্ন নূন না ছিলেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সমপর্যায়ের, না ছিলেন তাঁহার মত। বরং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার খাদিম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দাওয়াতকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কাজেই, সাব্যস্ত হইল যে, প্রতিশ্রুত এই নবী দ্বারা উদ্দেশ্য সায়্যিদে আলম মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মত ও তাঁহার সমপর্যায়ের। সত্যের দাওয়াত

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা, অলৌকিক কর্মের চ্যালেঞ্জ, বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং পূর্ববর্তী শরীআতের উপর আংশিকভাবে তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্-সালামের সমপর্যায়ের। অনেক অনেক দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রদীপ্ত সূর্যের মত এই কথাই বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত নবী ও শেষযুগের নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর ইহাতে কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নাই।

তাওরাতের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "আমি আমার কথা তাহার মুখে রাখিব" দ্বারা উদ্দেশ্য হইল– আমি আমার কথার ওহী তাহার নিকট প্রেরণ করিব এবং ওই ওহীর কথা দ্বারাই সে সম্বোধন করিবে, যাহা তাহারা শুনিয়া থাকিবে। আর তাহাদের নিকট লিখিত কোন পুস্তিকা কিংবা কোন ফলক নাযিল করিব না। কেননা, সে তো (দুনিয়ার শিক্ষায়) নিরক্ষর। লিখিত পুস্তক বা ফলক সে পড়িতে পারিবে না।

ইনজীলের সুসংবাদ

ইনজীলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ প্রসঙ্গে ইব্ন তুফায়ল বর্ণনা করেন ঃ হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের হাওয়ারী (সঙ্গী) ইউহান্না তাহার ইনজীলে হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

"আমি আমার পিতার নিকট আবেদন করিতেছি তিনি যেন তোমাদের জন্য অন্য 'ফারকালীত' দান করেন। যিনি চিরকাল তোমাদের সহিত দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি আল্লাহ্র রূহ। তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখাইবেন। আর এ কথা বলিলেন যে, পুত্র তো গমনকারী (এর দ্বারা নিজ সত্তার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন)। কেননা, তারপরে তো এখন ফারকালীত আসন্ন। যিনি তোমাদের গোপনীয় ভেদগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া সবকিছুকে পাল্টাইয়া দিবেন। তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন, যেমনিভাবে আমি তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছি। আমি তোমাদের জন্য একটি আদর্শ নিয়া আসিয়াছি। আর তিনি এর তা'বীল (ব্যাখ্যা) নিয়া আসিবেন। (এ তা'বীল দ্বারা কুরআনে কারীম উদ্দেশ্য। যা সম্ভাব্য অনেক তা'বীল ও অর্থের ধারক-বাহক। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বিষয়টি এমন নহে।)

আর সেই অন্য ফারকারীত এমন হইবেন যে, সারা পৃথিবীর কোন শক্তি-ই তাহাকে নিঃশেষ করিতে পারিবে না। তোমরা যদি আমার দাওয়াত মানিয়া লও ও আমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রাখ তবে আমার এই ওসিয়তকে ভালভাবে স্মরণ রাখিবে। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করিতেছি, তিনি যেন তোমাদের জন্য সেই ফারকালীত প্রেরণ করেন। যিনি শেষ যুগ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন।"

ইহাতে এই কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণ করিবেন, যিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্য হইবেন এবং সৃষ্টির সুশাসন তাঁহার দায়িত্বে বর্তাইবে। আর তাঁহার শরীআত ততদিন স্থায়ী থাকিবে, যতদিন যুগ-যুগান্তর বাকী থাকিবে। সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আসিয়াছে কী এমন কেহ?

www.pathagar.com

'ফারকালীত'-এর ব্যাখ্যায় খৃস্টানরা মতবিরোধ করে। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, 'ফারকালীত' অর্থ প্রশংসাকারী। আবার কেহ বলেন, এর অর্থ মুখলিস। 'মুখলিস' অর্থে আমরা যদি তাহাদের সমর্থন করি, তবে মুখলিস এমন রাসূল হইবেন যিনি সারা বিশ্বের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হইবেন। আর এ তাফসীর আমাদের অনুকূলে। এই জন্য যে, যে কোন নবীই উম্মতের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই অর্থে ইনজীলে হযরত মাসীহ্ আলায়হিস সালামের উক্তি সাক্ষী আছে যে, "আমি মানুষের মুক্তির জন্য আসিয়াছি।" যখন এই কথা সাব্যস্ত হইল যে, হযরত মাসীহ্ নিজের পরিচয় দিতে গিয়া 'মানুষের মুক্তিকামী' বলিয়াছেন, তখন তিনি পিতার নিকট দ্বিতীয় 'ফারকালীত' অর্থাৎ মুক্তিকামীর আবেদন করিয়াছেন। ইহার দলীল হইল এই উক্তি যে, এক 'ফারকালীত' তো চলিয়া গেলেন, আর এক 'ফারকালীত' অচিরেই আসিতেছেন।

অবতরণ স্বরূপ আমরা যদি তাহা মানিয়াও লই যে, 'ফারকালীত' অর্থ حامد (প্রশংসাকারী) তাহা হইলে তাহা আহমদ (أحمد) শব্দ হইতে কত নিকটবর্তী। এর উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন যাফর বলিয়াছেন– ইনজীলে যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা এই কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, 'ফারকালীত' একজন রাসূল। এই জন্যে তিনি বলিয়াছেন যে, যে কথা তোমরা আমার নিকট হইতে শুনিতেছ, তাহা আমার কথা নহে, বরং তাহা পিতার। তোমাদের জন্য আমার উপর তাহা নাযিল করা হইয়াছে। আর ওই 'ফারকালীত' যিনি পবিত্রাত্মা, পিতা আমার নামে তাহাকে পাঠাইবেন যেন তিনি তোমাদেরকে সবকিছুর শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিবেন, উপদেশ দিবেন, যেমনিভাবে আমি তোমাদের উপদেশ দিতেছি কাজেই 'ফারকালীত' যে একজন রাসূল এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট আরো কোন বর্ণনা আছে কী ? তিনি মহান আল্লাহ্র সব সৃষ্টিকে সব কিছু শিক্ষা দিবেন। তিনি তাহাদেরকে ওয়ায ও নসীহত করিবেন। কিন্তু এখানে 'পিতা' একটি পরিবর্তিত শব্দ। আহলে কিতাবরা এ শব্দটির ব্যবহারের সহিত অপরিচিত নহে যে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কেননা, এটি মহত্ত্ববোধক শব্দ। এমন শব্দ দ্বারা ছাত্র উস্তাদকে সম্বোধন করে এবং এর দ্বারা নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে এ কথাও প্রসিদ্ধ যে, খৃস্টান সম্প্রদায় তাহাদের ধর্মীয় গুরুকে আধ্যাত্মিক পিতা বলিয়া সম্বোধন করে। আর বনী ইসরাঈল ও বনী আইয়ায নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়া نحن ابناء الله 'আমরা আল্লাহ্র সন্তান বা বংশধর বলিয়া থাকে। এ কারণে তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কুধারণায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু হযরত ঈসা আলায়হিস্-সালামের উক্তি 'পিতা তাহাকে ফারকালীতকে আমার নামে প্রেরণ করিবেন'– এর মধ্যে সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর রিসালাত ও তাঁহার সত্যতার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুরআনে কারীমের সেই সব আয়াত যাহা হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের গুণ ও প্রশংসা এবং তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ রহিয়াছে, যেগুলির জন্য বনী ইসরাঈল মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত– সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ইনজীলের অন্য এক অনুবাদগ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে হযরত মাসীহ্ আলায়হিস সালাম বলিয়াছেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাইব, ততক্ষণ পর্যন্ত ফারকালীত আসিবেন না। আর

www.pathagar.com

ফারকালীত যখন আসিবেন, তখন অপরাধ ও ভুলের জন্য বিশ্ববাসীকে তিরস্কার ও ধমকি দিবেন। নিজের পক্ষ হইতে তিনি কিছুই বলিবেন না, তিনি তাহাই বলিবেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে শুনিবেন। সত্য ও সততার সহিত মানুষদের পরিচালনা করিবেন। আর বিভিন্ন দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় সংবাদ তাঁহাদেরকে জ্ঞাত করিবেন।"

. অন্য আর এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, "তিনি নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলিবেন না। বরং শুধু তাহাই বলিবেন, যাহা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শুনিবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ "নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কিছুই বলেন না। তিনি শুধু তাহাই বলেন, যাহা ওহীর মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট হন।" (সূরা নাজম ঃ ৩,৪)

হযরত মাসীহ্ আলায়হিস সালাম বলিয়াছেন, "তিনি (অর্থাৎ ফারকালীত) আমার বড়াই ও মহত্ত্ব বর্ণনা করিবেন, আমার নিদর্শনাবলীকে মহান মনে করিবেন।" বাস্তবিকই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের যত মহত্ত্ব-বড়াই বর্ণনা করিয়াছেন অন্য কেহ তত বেশী বর্ণনা করেন নাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার রিসালাতের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সেই বিষয়াবলী হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, উম্মত তাঁহাকে যেই বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এইসব কিছুই হইতেছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী। কে সেই মহান ব্যক্তি, যিনি বনী ইসরাঈলের আলিমদেরকে সত্য গোপন করার কারণে, মহান আল্লাহ্র কালামকে বিকৃত করার কারণে এবং অল্পমূল্যে দীন বিক্রি করার অপরাধে ধমক দিয়াছেন? কে সেই ব্যক্তি যিনি পূর্ববর্তী বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও অদৃশ্যের সংবাদ মানুষদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন? তিনিই হইলেন সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া ইনজীল শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, "সায়্যিদে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তুমি সত্যায়ন কর এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আন। আর তোমার উম্মতের নিকট বলিয়া দাও, তাহাদের যে কেহ তাঁহার যুগ পাইয়া যায়, সে যেন তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করে।" হে কুমারীর সন্তান! তুমি জানিয়া রাখ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি না হইত, তবে আমি আদম, জান্নাত, দোযখ কোন কিছুই সৃষ্টি করিতাম না। আরশকে যখন আমি অস্তিত্ববান জগতে প্রকাশ ঘটাইলাম, তখন তাহা কাঁপিতে শুরু করিল, এর কোন স্থিরতা ছিল না। অতঃপর আরশের মধ্যে আমি লিখিলাম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"! ইহাতে আরশ স্থির হইয়া গেল।

হযরত ইব্ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণনায় বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়া মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, জারূদ নাসরানী যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন সে বলিল, “ওই আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি আপনাকে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইনজীল শরীফে আমি আপনার গুণাবলী পড়িয়াছি। কুমারীর সন্তানও আপনার আগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন। হিশাম ইব্‌ন আস উমাবী থেকে আবূ উমামা বাহেলী এবং তাঁহার নিকট হইতে বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেন, আমাকে এবং আমার সাথে আরও কয়েকজনকে রোমক অধিপতি হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠানো হয়, যাহাতে আমি তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিই। অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এক রাত্রে হিরাক্লিয়াস আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিল। আমরা তাহার নিকট গেলাম। তিনি স্বর্ণনির্মিত একটি সিন্দুক চাহিয়া পাঠাইলেন যাহার মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো কোষ ছিল। প্রত্যেকটি কোষের মুখ ছিল ছোট। অতঃপর সে সিন্দুকটি খুলিল। কালো রং-এর রেশমের একখণ্ড কাপড় বাহির করিয়া ছড়াইয়া দিল। তাহাতে একটি ছবি দৃষ্টিগোচর হইল। যাহার চোখ দুইটি ছিল বড় বড়, নিতম্ব খুবই ভারী, ঘাড় দীর্ঘ আর চুলগুলি ছিল বাঁধা। ইহা ছিল আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সুন্দরতম এক ছবি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কী এই ছবিটি চিন? আমি বলিলাম, না, চিনি না। সে বলিল, ইহা হযরত আদম আলায়হিস সালামের ছবি। অতঃপর সে অন্য একটি কোষ খুলিল এবং কালো রং-এর রেশমের একখণ্ড কাপড় বাহির করিয়া ছড়াইয়া দিল। ইহাতে সাদা চিত্রে বড় বড় লাল চোখ ও সুশ্রী দাড়ি বিশিষ্ট একটি ছবি দৃষ্টিগোচর হইল। সে বলিল, তুমি কী ইহাকে চিন? আমি বলিলাম, না, চিনি না। সে বলিল, ইহা হইতেছে হযরত নূহ আলায়হিস সালামের প্রতিচ্ছবি। অতঃপর সে আরও একটি কোষ খুলিয়া রেশমের কাপড় বাহির করিয়া ছড়াইয়া দিল। তাহাতে শুভ্র চেহারা বিশিষ্ট সুশ্রী একটি ছবি দেখা গেল। মনে হইল যেন সরাসরি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ নিয়া আসিয়াছেন। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কী তুমি চিন? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তিনি তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, অতঃপর কাঁদিতে শুরু করিলাম আর হিরাক্লিয়াস উঠিয়া গিয়া আবার বসিল। আর সে বলিতে লাগিল, কী ব্যাপার এ-ই কী ওই ব্যক্তি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তিনি-ই। এই ছবি দেখিয়া মনে হয় যেন তুমি সরাসরি তাহাকে দেখিয়া ফেলিলে। এরপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস ছবিটি দেখিতে থাকিল। অতঃপর বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র শপথ, তিনিই শেষ নবী। কিন্তু আমি তাড়াহুড়া করিলাম এই জন্যে যাহাতে তোমার ইল্‌ম আমি পাইতে পারি। অন্যথায় এ সিন্দুকে হযরত ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং সুলায়মান আলায়হিমুস-সালামের ছবিও আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ছবিগুলি তুমি কোথায় পাইলে? সে বলিল, হযরত আদম আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত নবী ও তাহাদের সন্তানদেরকে আমায় দেখাইয়া দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ছবিগুলি তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সূর্য অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার স্থানে হযরত আদম আলায়হিস সালামের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত ছিল। হযরত যুল-কারনায়ন সূর্যাস্তের স্থান হইতে তাহা বাহির করিয়া আনেন এবং হযরত দানিয়াল আলায়হিস সালামের নিকট তা সমর্পণ করেন।

www.pathagar.com

যাবূরের সুসংবাদ

যাবূরের ৪৪তম অধ্যায়ে শেষ যুগের নবীকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আপনার দুই ঠোঁটের মধ্য হইতে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নিআমত প্রস্রবিত! এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অনন্তকাল পর্যন্ত বরকত দান করিয়াছেন।"

فَائِضٌ শব্দটি فيض শব্দ হইতে আসিয়াছে। صراح নামক অভিধানে فيض অর্থ লিখা হইয়াছে সংবাদ ছড়াইয়া পড়া, পানি উপচে পড়া, নদীতে পানি টইটম্বুর হইয়া প্রবাহিত হওয়া ও প্রবাহিত করা। আবার হাদীসে মুস্তাফীয অর্থ ব্যাপকভাবে হাদীস ছড়াইয়া পড়া। এখান হইতে فَيَّاض অর্থ তাগড়া যুবক এবং খুব দানশীল।

"হে মহান! আপনার তরবারি গর্দানে রাখুন। ভগ্ন বান্দাদের সুসজ্জিত করিয়া দিন।"

"নিশ্চয় আপনার শরীআত ও প্রজ্ঞা, আর আপনার আদর্শ আপনার ডান হাতের বড়ত্বের সহিত মিলিত। আপনার তীর খুবই শাণিত। সমস্ত উম্মত আপনার নিকট নতশির।"

এ সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁহার দুই ঠোঁটের মাঝখানের যেই নিআমতের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল তাহার কালাম, যাহা তিনি বলিতেন আর তাহা কুরআন মাজীদ যাহা তাহার উপর নাযিল করা হইয়াছে। আর সুন্নাত (আদর্শ) দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁহার আমল। আর গর্দানে তরবারি স্থাপন করার বিষয়টি এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, শেষ যুগের নবী হইবেন আরবী। কেননা, আরব ছাড়া অন্য কোন উম্মত গর্দানে তরবারি রাখে না। গর্দানে তরবারি রাখা আরবদেরই বৈশিষ্ট্য। আর তাঁহার শরীআত, তাঁহার সুন্নাত তাঁহার ডান হাতের বড়ত্বের সহিত মিলিত-এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি শরীআত ও সুন্নাতের প্রবর্তক। আর ওই নবী তরবারির সহিত প্রেরিত হইয়া থাকেন এবং তরবারির মাধ্যমে মানুষদেরকে ঠিক করিয়া সত্যের উপর দাঁড় করাইবেন। আর তরবারির মাধ্যমে তাহাদেরকে কুফরী হইতে বাহির করিয়া আনিবেন। তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। যাবূর গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া এই দু'আ করিতেন যে, "হে আমার প্রতিপালক! সুন্নাত প্রকাশকারীকে প্রেরণ করুন। যাহাতে মানুষ জানিতে পারে যে, মাসীহ্ একজন মানুষ।"

এই সংবাদগুলি হযরত মাসীহ্ আলায়হিস সালাম এবং রাসূল সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে। এর সারকথা, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ কর, যাহাতে তিনি মানুষকে এ কথা জানাইয়া দেন এবং তাহারা পড়িয়া নেয় যে, হযরত মাসীহ্ একজন মানুষ মাত্র, তিনি আল্লাহ্ বা মা'বূদ নন। মনে হয় যেন হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের এ কথা জানা হইয়া গিয়াছে যে, মাসীহ আলায়হিস সালামের ব্যাপারে মানুষেরা মা'বূদ হওয়ার দাবী করিবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আলোচনা করিতে গিয়া হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তা'আলা এই শেষ নবীকে সততা-যথার্থতা, কথা-কাজ ইত্যাদিতে নির্বাচিত করিয়াছেন। তাঁহাকে ও তাঁহার উম্মতকে বড়ত্বের মর্যাদা দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সফলতা দান করিয়াছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উম্মতকে এমন সম্মান দান করিয়াছেন যে, তাহারা স্বপ্নযোগেও মহান আল্লাহ্র তাসবীহ পড়ে। উঁচু আওয়াযে তাকবীর ধ্বনি বলে। তাহাদের হাতে থাকে শাণিত তরবারি, যাহাতে তাহারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই লোকদের বদলা নিতে পারে, যাহারা মহান আল্লাহ্র ইবাদত করে না। সে যুগের রাজা-বাদশাহদেরকে বন্দী করিয়া ফেলে এবং তাহাদেরকে যাহারা ইয্যত-সম্মান করে তাহাদের গলায় শিকল পরাইয়া দেয়।"

অন্য এক মুনাজাতে রহিয়াছে, "আল্লাহ্ তা'আলা সায়হুন হইতে (সায়হুন দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা মুকাররামাহ্) তাজ পরিহিত প্রশংসিত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটানোর বিষয়টি নির্ধারণ করিয়াছেন। তাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, দান করা নেতৃত্ব, ইমামত। আর প্রশংসিত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

অন্য এক মুনাজাতে উল্লেখ রহিয়াছে, "তিনি বাদশাহ হইবেন। দান-সাদাকা করিবেন। এক নদী হইতে অপর নদীতে, নদ-নদী হইতে স্থলভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত এবং তাহার মুখোমুখি হইয়া উপদ্বীপবাসীরা তাহাদের উরুর উপর বসিবে। তাহার সব শত্রুরা জিহ্বা দিয়া মাটি চাটিয়া চাটিয়া খাইবে। সমসাময়িক রাজা-বাদশাহ্রা তাহাদের চাটুকারদেরসহ বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার দরবারে আসিয়া হাযির হইবে। তাঁহার উম্মতের আনুগত্য করার উপর তাহারা অক্ষমতা ও বিনম্রতা প্রকাশ করিবে। মাথা নত করা হইতে তাহাদেরকে মুক্তি দেওয়া হইবে। ওই নবী অসহায় চিন্তাক্লিষ্ট ও নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির নির্যাতন হইতে মুক্তি দিবে। দুর্বল, অসহায় ও বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিবে। নিঃস্ব ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উপর দয়া করিবে। তাঁহার জন্য সর্বদা শান্তির কামনা করিয়া তাহার উপর দরূদ পড়া হইবে এবং তাঁহার জন্য সর্বদা দু'আ করা হইবে। চিরকাল পর্যন্ত তাঁহার আলোচনার চর্চা চলিবে।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

নবীগণের সহীফাসমূহে মনোমুগ্ধকর আলোচনা

তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলে যেমনিভাবে সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী উল্লেখ করা হইয়াছে, এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর সহীফাগুলিতেও তাঁহার গুণাবলী উল্লেখ করা হইয়াছে। এমনকি নবীগণের পিতা হযরত আদম (আ)-এর সহীফাতেও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছেন ঃ

"আমি মক্কার মালিক। এর অধিবাসীরা আমার প্রতিবেশী। কা'বাঘর যিয়ারতকারীরা আমার মেহমান। তাহারা আমার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্রয় ও ছায়ার মধ্যে অবস্থিত এবং আমার হিফাযত ও তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। পৃথিবীবাসী ও আকাশচারীদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক করিয়া দিব। দলে দলে মানুষেরা ধুলামলিন অবস্থায় লাব্বায়ক বলিয়া ডাকিবে। উচ্চস্বরে তাকবীরধ্বনি দিবে। চোখ দিয়া অশ্রু ঝরাইতে আসিবে। যে কেহ কা'বা শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসিবে, তাহার উদ্দেশ্য শুধু এই থাকিবে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত ও আমার

www.pathagar.com

সন্তুষ্টি অর্জন করা। কেননা, এ ঘরের অধিপতি তো আমিই। মনে হয় যেন তাহারা আমারই যিয়ারত করিতে আসিল এবং তাহারা আমার মেহমান হইবে। আর আমার দয়ার যোগ্য হওয়ার অর্থ, আমি তাহাদের সম্মান করিব। বঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিব না। এ কা'বাঘরের পরিচালনার দায়িত্ব তোমার বংশধরদের মধ্যে এমন এক নবীর উপর সমর্পণ করিব, যাহার নাম ইবরাহীম। তাঁহার মাধ্যমে কা'বাঘরের ভিত্তি উঁচু করাইব এবং তাহারই হাত দ্বারা একে প্রাসাদে পরিণত করিব। তাহার জন্য যমযমের ঝর্ণা প্রবাহিত করিব। এর নিষিদ্ধতা ও বৈধতা তাহার মীরাছে দান করিব। এর নিদর্শনাবলী তাহার হাত হইতে প্রকাশ করিব। (مشاعر দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হারাম শরীফের চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী)। অতঃপর ইবরাহীম (আ)-এর পর প্রত্যেক নবী ইহাকে আবাদ রাখিবে। এর প্রতি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা রাখিবে। এমনকি ধীরে ধীরে তোমার বংশধর হইতে ঐ নবী পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে, যাহাকে মুহাম্মদ ((সা) বলা হইবে। তিনি নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করিয়া দিবেন। ঐ নবীকে আমি এই ঘরের অধিবাসীদের ব্যবস্থাপকদের, পরিচালকদের এবং প্রহরীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃতি দিব।

যে কেহ আমার সন্ধান করে এবং আমাকে খুঁজিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, তাহার জন্য উচিত এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকা, যাহাদের চুলগুলি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র সামনে নযর-মানত পূর্ণ করে।"

ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় মনোমুগ্ধকর আলোচনা

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর সহীফায় উল্লেখ রহিয়াছে ঃ "হে ইবরাহীম! তোমার সন্তান ইসমাঈল (আ)-এর প্রসঙ্গে আমি তোমার দু'আ কবূল করিয়াছি। তাঁহার উপর ও তাহার বংশধরের উপর আমি অনেক বরকত জারী করিয়াছি। তাহাদের মধ্য থেকে এমন একজন তোমার সন্তান সৃষ্টি করিব, যিনি মর্যাদা-সম্মানে বিভূষিত হইবেন এবং যাহার নাম হইবে মুহাম্মদ (সা)। তিনি হইবেন আমার বাছাইকৃত ও প্রেরিত। তাঁহার উম্মত হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।"

হাবকুকের গ্রন্থে প্রাঞ্জল আলোচনা

হযরত হাবকুক ছিলেন একজন নবী। তিনি ছিলেন হযরত দানিয়াল (আ)-এর সমসাময়িক। তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

جَاءَ اللّٰهُ مِنَ التَّيْمَنِ وَالتَّقْدِيْسِ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيْدِ اَحْمَدَ وَتَقْدِيْسِهِ وَمَلَكَ الْاَرْضَ وَرِقَابَ الْأُمَمِ -

"বরকত ও পবিত্রতার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা ফারানের পর্বতগুলিতে আলোরবিভা ছড়াইলেন। আহ্মদের প্রশংসা ও পবিত্রতায় পৃথিবীকে ভরতি করিয়া দিলেন, যিনি পৃথিবীর সমস্ত উম্মতের মালিক।"

এ কথাও উল্লেখ আছে ঃ

لَقَدِ انْكَشَفَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَهَاءِ مُحَمَّدٍ وَّامْتَلَاَتِ الْاَرْضُ مِنْ حَمْدِهِ

www.pathagar.com

"নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা)-এর যশ-খ্যাতিতে আকাশ আলোকদীপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় ভরিয়া গিয়াছে।"

এই কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, يُضِيُّ بِنُوْرِهِ الْاَرْضُ وَيَحْمِلُ خَيْلُهُ فِى الْبَحْرِ "তাঁহার আলোকবিভায় পৃথিবী আলোকিত হইয়া গিয়াছে আর তাঁহার ঘোড়া সমুদ্রে দৌড়াইবে।"

আর হযরত হাবকুকের আলোচনায় এই কথাও আসিয়াছে যে, سَتَنْزَعُ فِى قَيْلِكَ اِغْرَاقًا وَتَرْتَوِى السِّهَامُ بِاَمْرِكَ يَا مُحَمَّدُ اِرْتَوَاءً "খুব তাড়াতাড়িই আপনার কামানে শক্ত তীর আকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং আপনার নির্দেশে তীর সহসাই জয় করিবে, হে মুহাম্মদ!"

এ আলোচনায় অতিরঞ্জনের অর্থে পরিপূর্ণভাবে কর্মসম্পাদনের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর এদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাঁহার বরকতময় যুগে দীন-ধর্মের কাজ পরিপূর্ণভাবে পূর্ণতা পাইবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ "তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। আর তোমাদের জন্য আমার নিআমতকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম।"

হযরত ওয়াহ্ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ হইতে উদ্ধৃত আছে যে, তিনি বলেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কসম করিয়াছেন ঃ "আমার প্রতাপ ও বড়াইয়ের কসম! আরবের পাহাড়গুলিতে আমি আমার নূর (আলো) অবতীর্ণ করিব। যাহার দ্বারা প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত পুরা দুনিয়া আলোয় আলোকিত হইয়া যাইবে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্য হইতে একজন আরবী উম্মী নবী সৃষ্টি করিব, যাহার প্রতি আকাশের তারকারাজির ও পৃথিবীর পদচারী পরিমাণ মানুষ ঈমান আনিবে। তাহারা সবাই আমার প্রতিপালন ও তাঁহার রিসালাতের উপর ঈমান আনিবে। তিনি তাহার পিতৃপুরুষদের ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবেন।"

হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র। তোমার নামগুলিও পবিত্র। নিঃসন্দেহে তুমি শেষ যুগের নবীকে খুব ইয্‌যত-সম্মান দান করিয়াছ। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে জবাব আসিল, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তাহার শত্রুদের হইতে প্রতিশোধ নিব। সমস্ত দাওয়াতের উপর তাঁহার দাওয়াতকে বিজয়ী ও বিস্তৃত করিব। যে কেহ তাঁহার শরীআতের বিরোধিতা করিবে, আমি তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিব। ঐ শরীআত এমন, যাহাকে ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এ শরীআতের গোড়াপত্তন করিব। আমার ইয্‌যত ও দাপটের কসম! সমস্ত উম্মতকে আমি তাঁহার ওসীলায় জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দিব। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাধ্যমে আমি দুনিয়ার গোড়াপত্তন করিয়াছি আর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে তাহা শেষ করিব। এখন যে কেহ তাহার যুগ পাইয়া তাঁহার উপর ঈমান না আনিবে, তাঁহার শরীআতের অনুসরণ না করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট।

www.pathagar.com

শা'ইয়া' (আ)-এর সহীফায় প্রাঞ্জল আলোচনা

হযরত শা'ইয়া (আ)-এর সহীফাগুলিতে নবী আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় আলোচনা এইভাবে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–ঐ বান্দা আমার প্রিয়। আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হই। সেই আমার মনোনীত যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। আমি তাহার উপর আমার রূহ ফুঁকে দিই। তিনি আরও বলেন, আমি তাহার উপর ওহী নাযিল করি। উম্মতের উপর এর ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পায়। সে তো এমন বান্দা যে অট্টহাসি হাসে না। বাজারেও তাহার কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। ঐ বান্দা অন্ধদের চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করে। বধিরদের শ্রবণশক্তি দান করে। মৃত অন্তরকে জীবিত করে। আমি তাহাকে এমন কিছু দিব, যাহা কাউকে আর দেই নাই। সে আমার বান্দা আহমদ। সে তাহার রব্বের নিত্য নতুন প্রশংসা করে। কেহ তাহাকে দুর্বল করিতে পারিবে না। কেহ তাহাকে পরাজিতও করিতে পারিবে না। সে তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। সৎকর্মপরায়ণ গরীব, দুঃখী, অসহায়দেরকে সে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মনে করে না। সিদ্দীকগণকে সে শক্তিশালী করে। নম্র ও ভদ্রদের সে অন্যতম। সে আল্লাহ্ তা'আলার এমন নূর যাহাকে কেহ কখনও নিভাইতে পারিবে না। তাহার মাধ্যমে আমার দলীল দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। তাহার মাধ্যমে ওযর-আপত্তি দূরীভূত হইয়া যায়। তাহার তাওরাত অর্থাৎ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের দ্বারা জিন-ইনসান আনুগত্যশীল হয়। (এখানে তাওরাত দ্বারা উদ্দেশ্য, ঐ গ্রন্থ যাহা হযরত মূসা (আ)-এর তাওরাত গ্রন্থের স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ কুরআনে কারীম।)

হযরত শা'ইয়া' (আ)-এর আলোচনায় আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাও উল্লেখ করেন যে, "হে মুহাম্মদ (সা)! আমি ঐ প্রতিপালক, যিনি তোমাকে সত্যের সহিত মহান ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন এবং তোমাকে এমন নূর বানাইয়াছেন যাহার দ্বারা তুমি উম্মতের অন্ধ চোখগুলিকে দৃষ্টিশক্তি দান করিবে। আর তুমি এমন দলীল যাহার দ্বারা তুমি প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দীদেরকে সমূহ অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া যাইবে।"

হযরত শা'ইয়া (আ)-এর গ্রন্থে এই কথাও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হে শা'ইয়া! উঠিয়া দেখ। আর যাহা কিছুই তুমি দেখিবে তাহা মানুষদেরকে জানাইয়া দিবে। অতঃপর আমি উঠিয়া দেখিলাম, সামনের দিক হইতে দুইজন আরোহী আসিতেছেন। একজন গাধার উপর, অন্যজন উটের উপর উপবিষ্ট। একজন অপরজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, বাবেল ও তাহার প্রতিমাগুলিকে ফেলিয়া দাও, যাহা তাহারা তৈরী করিয়া রাখিয়াছে।"

উম্মতের অন্যতম আলিম, আসমানী গ্রন্থাবলীর অভিজ্ঞ গবেষক ও বিশ্লেষক ইব্ন কুতায়বা বলেন, গাধার উপর আরোহী ব্যক্তি দ্বারা হযরত মাসীহ ইব্ন মারইয়াম (আ) উদ্দেশ্য। এই কথার উপর সমস্ত খৃস্টানরা একমত। কাজেই, বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় উটের উপর আরোহী ব্যক্তিটি হইতেছেন রাসূল সায়্যিদে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি (সা)। কেননা, বাবেলের পতন ও তাহার প্রতিমাগুলির ভাংচুর তাঁহার বরকতময় হাত দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। হযরত মাসীহ (আ)-এর হাত দ্বারা নহে। কেননা, বাবেল শহরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ

www.pathagar.com

হইতে সর্বদাই সেখানকার বাদশাহ মূর্তিপূজা করিয়া আসিতেছে। আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উটের উপর আরোহণ করা ও হযরত মাসীহ (আ)-এর গাধার উপর আরোহণ করার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ।

হযরত শা'ইয়া (আ)-এর কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ কায়দার পরিবারের মহল্লাসমূহ হইতে মাঠ-ময়দান ও শহর-বন্দরগুলি ভরিয়া দিব। তাহারা মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিবে এবং পাহাড়গুলির চূড়ায় আযান দিবে। তাহারা এমন লোক যাহারা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়াই ও মহত্ত্ব বর্ণনা করিবে। জল-স্থল সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ ছড়াইয়া দিবে। ভূ-পৃষ্ঠের প্রান্তসীমা হইতে উচ্চকণ্ঠে তাকবীরধ্বনি দিতে দিতে আসিবে। তাহারা এমনভাবে তাহাদের পা মোড়াইবে যেমনিভাবে মৃতশিল্পীরা পা দ্বারা মাটি গুলিয়া খামির তৈরী করে।"

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, তাহারা মহব্বতের সহিত খুব দ্রুত ছুটিয়া আসিবে। হজ্জের উদ্দেশ্যে খুব দ্রুত আসা, উচ্চৈঃস্বরে আওয়ায দেওয়া, তালবিয়াহ অর্থাৎ লাব্বায়ক বলিতে বলিতে আসা, তাওয়াফের মধ্যে রমল অর্থাৎ সুপুরুষের মত বুক ফুলাইয়া চলা উদ্দেশ্য।

ইব্ন কুতায়বা বলেন, কায়দার পরিবার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরববাসী। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর-নাতির নাম কায়দার। ইব্ন কুতায়বা বলেন, হযরত শা'ইয়া (আ)-এর গ্রন্থে মক্কা মুকাররমা, কা'বাঘর, হাজারে আসওয়াদ ইত্যাদিরও উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দিবে। হযরত শা'ইয়া (আ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মনে রাখ, সায়হুন অর্থাৎ মক্কা মুকাররামায় আমি আমার ঘর তৈরী করিব। যাহার এক কোণে হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন করিব। একে খুবই গুরুত্ব-মহত্ত্ব ও সম্মান দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে চুম্বন করা হইবে। মক্কা শরীফকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, হে বন্ধ্যা নগরী! তুমি সন্তুষ্ট হও এবং তাসবীহ্র মাধ্যমে প্রশংসা কর। এই জন্য যে, তোমার (আনুগত্যশীল) অধিবাসী আমার অধিবাসী অপেক্ষা বেশী হইবে। 'আমার অধিবাসী' বলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস ও বনী ইসরাঈলদের বুঝানো হইয়াছে। পবিত্র মক্কায় হজ্জ ও উমরাকারীর সংখ্যা তাহাদের চাইতে বেশী হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা-মুকাররমাকে বন্ধ্যা হওয়ার সহিত উপমা দিয়াছেন। তাহার কারণ, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পূর্বে ইহাতে কোন বসতি ছিল না। আর এখানে কোন আসমানী গ্রন্থও নাযিল হয় নাই। পক্ষান্তরে, বায়তুল মাকদাসে অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটিয়াছে এবং তাহা ছিল ওহীর অবতরণস্থল। হযরত শা'ইয়া (আ)-এর গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, মক্কা-মুকাররমাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার নিজ সত্তার কসম, যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ)-এর যুগে আমার কসম ছিল যে, পৃথিবীবাসীকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এমনিভাবে এখন তোমার জন্য আমার সত্তার কসম, আমি কখনও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না। আর তোমাকে ছাড়িয়াও দিব না। যতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়গুলি নিজ জায়গা হইতে সরিয়া না যাইবে এবং এর দুর্গ ধসিয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিআমত তোমার হইতে সরাবি না। হে মিসকীনাহ্! তুমি মনে রাখিবে যে, পাথর ও মার্বেল

www.pathagar.com

দ্বারা আমি তোমার ভিত্তি রচনা করিব স্বর্ণ ও মাণিক্য দ্বারা তোমাকে সাজাইয়া রাখিব। চমকদার মোতি দ্বারা তোমার ছাদ ও যবরজদ পাথর দ্বারা তোমার দরযাগুলোকে সাজাইয়া রাখিব। যুলম-অত্যাচার তোমার দেহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইবে। কোন অস্ত্রধারীকে তুমি ভয় পাইবে না। ওঠ এবং আলোকদীপ্ত হও। তোমার আলো ছড়ানোর সময় আসিয়া পড়িয়াছে। তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা রহিয়াছে। খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূর প্রকাশের সুসংবাদ রহিয়াছে। এমনিভাবে হারাম শরীফের ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভেড়া ও বকরী একটি চারণভূমিতে চরিবে। তাহার পথগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পথগুলির মর্যাদা ও মহত্ত্ব এত বেশী যে, তাহা বর্ণনা ও রচনাশক্তির বাহিরে।

সারকথা, নবী সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও অবস্থাসমূহ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এর চেয়ে কিছু বেশী রহিয়াছে। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও সন্দেহ নাই। অবশ্য দীনের শত্রুরা তাঁহার নামে অনেক কিছু বদলাইয়া ফেলিয়াছে এবং বিকৃত করিয়াছে। তথাপি দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষ্যসমূহ আলোকদীপ্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"তাহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা তাহা অপসন্দ করে।" (সূরা সাফ্ফ ঃ ৮)

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَخَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

সুসংবাদ সম্বলিত কিছু বর্ণনা

সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা জানা গেল যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলিতে সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। আহলে কিতাবরাও নিশ্চিতভাবেই তাহা জানিত। হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হতভাগ্য হওয়ার কারণে তাহারা অস্বীকৃতি ও ইরতিদাদের রাস্তা অবলম্বন করিয়া বিকৃতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই, তাহাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিষয়ক বর্ণনাগুলি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন।

হাদীস ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁহার পিতা মালিক ইব্ন সিনান, যিনি উহুদের শহীদদের অন্যতম, তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তিনি বলেন ঃ কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে আমি একদিন বনী আবদুল আশহালের নিকট আসিলাম। ঐ দিনগুলিতে আমরা ইয়াহূদীদের সহিত সন্ধি করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইউশা' ইয়াহূদীকে আমি সেখানে এই কথা শুনিতে পাইলাম যে, এখন তো ঐ নবীর আত্মপ্রকাশের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে যাহার নাম আহমদ। পবিত্র মক্কা নগরী হইতে তিনি প্রকাশ পাইবেন এবং হিজরত করিয়া পবিত্র মদীনায় আসিবেন। তারপর আমি আমার গোত্রের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। ইউশা'র নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম ইহার উপর অবাক হইয়াছিলাম। আমার গোত্রের একজনের নিকট ঐ

www.pathagar.com

কথাটি শুনাইলাম। সে বলিল, এটি শুধু ইউশা'-ই বলে নাই, বরং ইয়াসরিবের সমস্ত ইয়াহূদীই এই কথা বলিয়াছে। অতএব, এখান হইতে আমি কুরায়যা গোত্রের নিকট আসিলাম। এখানে আসিয়াও শুনিলাম, তাহারা সবাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের আলোচনাই করিতেছে। এমন কি শীর্ষস্থানীয় একজন ইয়াহূদী নেতা যুবায়র ইব্ন বাত্বা বলিল, নিঃসন্দেহে সে লাল তারকার উদয় হইয়াছে, যাহা কোন নবীর আত্মপ্রকাশ ছাড়া উদয় হয় না। সে এই কথাও বলিল যে, আহমদ (মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া এখন আর কোন নবীও আসিবে না। এ ইয়াসরিব শহর হইবে তাঁহার হিজরতের লক্ষ্যস্থল। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ নবী (সা) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ আনিলেন, আমি তাঁহার নিকট এ ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, যুবায়র ও তাহার সঙ্গী যাহারা শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ের রহিয়াছে, তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করিত, তবে সমস্ত ইয়াহূদী মুসলমান হইয়া যাইত। কেননা, সবাই ছিল তাহাদের অনুসারী।

হাদীস ঃ কাতাদা হইতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা যখন আরবের কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্য দু'আ করিত, তখন দু'আর মধ্যে তাহারা এই কথা বলিত, হে আল্লাহ্! ঐ উম্মী নবীর আত্মপ্রকাশ ঘটাও, যাহার আলোচনা তাওরাত গ্রন্থে আমরা পাই। যাহাতে ঐ কাফিরদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারি। তাহাদের আগ্রহ এই জন্য ছিল যে, তাহাদের ধারণা অনুযায়ী শেষ যুগের নবী বনী ইসরাঈল হইতে হইবে। কিন্তু যখন দেখা গেল তিনি বনী ইসরাঈল হইতে না হইয়া ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হইতে হইলেন, তখন হিংসা করিতে লাগিল এবং বিরোধিতা শুরু করিল।

হাদীস শরীফ ঃ হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুকাওকিস বাদশাহর নিকট গেলেন। তিনি তাহার নিকট বলিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) নবী ও রাসূল। তিনি যদি কিব্ত অর্থাৎ মিসরে কিংবা সিরিয়ায় হইতেন, তবে সবাই তাঁহার অনুসরণ করিত। মুগীরা ইব্ন শু'বা বলেন, এরপর আমি ইস্কান্দারিয়ায় বসবাস করিলাম। এমন কোন গির্জা বাদ রাখি নাই যেখানে আমি যাই নাই। কিব্ত ও সিরিয়ার সমস্ত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নিকট আমি গিয়াছি এবং তাহাদের নিকট জানিতে চাহিয়া বলিলাম, তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা)-এর যেইসব গুণের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। সেখানে তাহাদের একজন ধর্মীয় নেতা ছিল। মানুষেরা তাহার নিকট রোগীদের নিয়া আসিত। সে তাহাদের জন্য দু'আ করিত। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নবীদের মধ্যে এমন কোন নবী আছে কি, যিনি আসন্ন ? এবং এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি শেষ নবী। তাঁহার ও হযরত ঈসা (আ)-এর মাঝখানে আর কোন নবী নাই। শুধুমাত্র তিনিই নবী। নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ) আমাদেরকে তাহার অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন। ঐ নবী হইবেন আরবী, উম্মী। তাঁহার নাম হইবে আহমদ। তিনি একেবারে বেঁটে-গেঁটেও হইবেন না, আবার একেবারে দীর্ঘকায়ও হইবেন না। তাঁহার উভয় চোখে লালচে ভাব রহিয়াছে। না আছে শুভ্রতা, না আছে কালচে রং। তাঁহার চুলগুলি কোঁকরানো। তিনি শক্ত ও মোটা কাপড়ের পোশাক পরিধান করিবেন। খাবার-দাবার যা-ই মিলিবে তাহার উপরই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাঁহার কাঁধে থাকিবে তরবারি। যে কেহ তাঁহার

www.pathagar.com

মুখোমুখি হউক না কেন, তিনি কাহাকেও ভয় করিবেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি প্রথম আক্রমণ করিবেন না। তাঁহার সঙ্গীরা হইবেন তাঁহার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ। তাঁহারা তাঁহাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা তাঁহাকে বেশী ভালবাসিবেন। তাঁহার আত্মপ্রকাশ এমন জায়গায় ঘটিবে, যেখানে 'সালম' বৃক্ষ রহিয়াছে। তিনি এক হারাম (পবিত্র স্থান) এলাকা হইতে বাহির হইবেন এবং অন্য হারাম (পবিত্র স্থান) এলাকায় হিজরত করিবেন। তিনি লবণাক্ত ভূমি হইতে খেজুর প্রধান এলাকায় হিজরত করিবেন। পায়ের নলা পর্যন্ত তিনি জামা পরিধান করিবেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশগুলি ধৌত করিবেন (অর্থাৎ উযূ করিবেন)। তাঁহার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু গুণ থাকিবে যাহা অন্য কোন নবীর মধ্যে নাই। প্রত্যেক নবীই প্রেরিত হইয়াছিলেন নিজ নিজ জাতির জন্য। কিন্তু তিনি প্রেরিত হইবেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে তাহার জন্য সিজদাভূমি বানাইয়া দেওয়া হইবে। মাটিকে তাহার জন্য পবিত্র করিয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ যেখানেই নামাযের সময় হইবে, সেখানেই (পানি না পাওয়া গেলে) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিবেন। অতঃপর এ সফর হইতে যখন মুগীরা (রা) ফিরিয়া আসিল, তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীদের নিকট তাহা বর্ণনা করিল যাহা সে শুনিয়াছিল।

হাদীস শরীফ ঃ সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণিত, তাহার পিতা যায়দ ইব্‌ন আমর দীনের সন্ধানে বাহির হইলন। মুসেল নগরীতে এক রাহিব (পাদ্রী)-এর সহিত দেখা হইল। পাদ্রী যায়দকে দেখিয়া বলিল, কোথা হইতে আসিয়াছ ? যায়দ বলিল, ইবরাহীমী ঘর অর্থাৎ কা'বা ঘর হইতে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সন্ধানে ? যায়দ বলিল, দীনের সন্ধানে। এ জন্য যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লকে প্রাগৈসলামিক যুগের একত্ববাদী বলা হয়। সে মুশরিকদের যবাহকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাইত না। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট তাওরাত পাঠ করিত না। সহীহ্ বুখারীতেও তাহার আলোচনা আসিয়াছে।

হাদীস শরীফ ঃ হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একটিমাত্র ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য নবী প্রেরণ করিয়াছেন। এ প্রবাদের আসল ঘটনা হইল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন এক ইয়াহূদীর গির্জায় আগমন করিলেন। সেখানে এক ইয়াহূদীকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট তাওরাত পাঠ করিয়া শোনাইতে দেখিলেন। যখন সে শেষ নবীর গুণাবলীর বর্ণনা পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল, তখন হঠাৎ থামিয়া গেল এবং চুপ হইয়া গেল। এরপর সে অসুস্থ শিশুর মত গোঙানী দিল এবং তাওরাত নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী পাঠ করিল। আর বলিতে লাগিল, এ তো আপনার গুণাবলী, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰه "আমি সাক্ষ্য দিতেছি–আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। আর নিঃসন্দেহে অবশ্যই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।" এ কথাটি বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, তোমাদের এ ভাইয়ের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর।

হাদীস শরীফ ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাইফের বাদশাহ তুব্বা যখন পবিত্র মদীনা আক্রমণ করিয়া এই ঘোষণা দিল যে, মদীনা শহরকে আমি

www.pathagar.com

ধ্বংসস্তুপে পরিণত করিয়া দিব। আর এর অধিবাসীদেরকে আমার ছেলে হত্যার প্রতিশোধ নিতে হত্যা করিয়া দিব, যাহাকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করিয়া তাহারা হত্যা করিয়াছিল। তখন ঐ সময়ের ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সামূল বলিল, হে বাদশাহ! এটা তো ঐ শহর যেখানে হযরত ইসমাঈল নবী হইতে শেষ নবী পর্যন্ত সবার হিজরত হইবে। আর ঐ নবীর জন্মস্থান হইবে মক্কা মুকাররমা। তাঁহার নাম হইবে আহমদ। এই শহর হইেব তাঁহার হিজরতের লক্ষ্যস্থল। তাঁহার পবিত্র সমাধিও এখানেই হইবে। ফলে এমনিতেই তুব্বা' এখান হইতে ফিরিয়া গেল।

যুদ্ধ-জিহাদ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উদ্ধৃত করেন যে, শেষ যুগের নবীর জন্য তুব্বা' একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিল। তুব্বা'র সঙ্গে ছিল চারিশত তাওরাতের আলিম। তাহারা তাহার সংস্পর্শ ছাড়িয়া দিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় এ আশায় রহিয়া গেল যে, তাহারা শেষ যুগের নবীর সোহবত লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য বাদশাহ তুব্বা' একটি করিয়া বসবাসের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। প্রত্যেককে একটি করিয়া বাঁদী ও ঢের সম্পদ দিয়াছিল। তুব্বা' তাহাদেরকে চিঠিতে তাহার ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দিয়াছেন। চিঠিটির কিছু পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَنَّهٗ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ بَارِى النَّيَمِ فَلَوْلَا عُمْرِىْ اِلٰى عُمْرِهٖ
لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَّهٗ وَابْنُ عَمٍّ -

"আমি আহমদ মুজতাবা (সা)-এর উপর সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল, যিনি মাটি দিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি যদি তাঁহার বরকতময় আত্মপ্রকাশের যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমি হইব তাঁহার মন্ত্রী ও তাঁহার চাচাত ভাই।"

তারপর তুব্বা' এই চিঠিটির মুখ বন্ধ করিয়া চারিশত আলিমের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তাহার নিকট সমর্পণ করিল। তাহাদেরকে এই ওসিয়াত করিল যে, তাহারা যদি শেষ যুগের নবীর সাক্ষাত পায়, তবে যেন এ চিঠিটি তাঁহার খিদমতে পেশ করে। অন্যথায় তাহাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এ ওসিয়াত করিয়া যায়। খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য তুব্বা' যে প্রাসাদটি তৈরী করিয়াছিল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় পা রাখা পর্যন্ত তাহা বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন, হযরত আবূ আইউব আনসারীর (রা) ঐ বাড়ি যেখানে হিজরতের পর রাসূল (সা) প্রথম অবস্থান করেন, এটিই ছিল তুব্বা'র তৈরী বাড়ি।

বর্ণনা ঃ বর্ণনা করা হয়, যুবায়র ইব্ন বাত্বা, যে ইয়াহূদীদের শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিল, সে বলিল, আমার পিতা একটি চিঠি যাহার মধ্যে আহমদ (মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর আলোচনা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া আমাকে দিয়া বলিল, তিনি ঐ নবী যিনি কুরত নামক স্থানে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাহার গুণাবলী এই। তারপর তাহার পিতার মৃত্যুর পর ইহার আলোচনা করিল। এখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হন নাই। কিন্তু, সে যখনই শুনিতে পাইল, মক্কা মুকাররমায় নবী আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন সে এ চিঠিটি নষ্ট করিয়া ফেলিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী লুকাইতে লাগিল।

www.pathagar.com

বনী কুরায়যা, বনী নাযীর, ফাদাক ও খায়বারের ইয়াহূদীদের নিকট নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের পূর্বে তাঁহার পরিচিতি ছিল। আর তাহারা বলিত, তাঁহার হিজরত মদীনায় হইবে। মক্কা মুকাররমায় যখন রাসূলে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাহারা বলিয়াছিল, আজ রাতে আহমদ (মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম হইয়া গিয়াছে এবং তাহার জন্মের তারকা উদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন প্রেরিত হইলেন, তখন তাহারা কাফির ও অস্বীকারকারী হইয়া গেল। তাহাদের এই কুফরী ছিল হিংসা-বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাজনিত।

বর্ণনা ঃ হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক ইয়াহূদী পবিত্র মক্কায় বসবাস করিতেছিল। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের রাত যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন ঐ লোকটি কুরায়শদের মজলিসে আসিয়া বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, আজ রাতে কি তোমাদের কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ? কুরায়শরা বলিল, আমরা জানি না। সে বলিল, না, হে কুরায়শ! ভালো করিয়া খোঁজ নিয়া দেখ, আমি বলিতেছি, আজ রাতে অবশ্যই কোন এক নবজাতক জন্মলাভ করিয়াছে। সে এই উম্মতের নবী। তাঁহার নাম আহমদ। তাঁহার উভয় কাঁধের মাঝখানে একটি বিশেষ চিহ্ন আছে, যাহার মধ্যে পশম গজানো আছে। তখন কুরায়শরা মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। আর এ ইয়াহূদীর কথায় অবাক হইল। তাহাদের একজন ঘরে আসিয়া গৃহকর্ত্রী হইতে জানিতে পারিল, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে তাহার সন্তান জন্মলাভ হইয়াছে। যাহার নাম রাখা হইয়াছে মুহাম্মদ। তখন সে ঐ ইয়াহূদীর নিকট আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আজ আমাদের এলাকায় একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমাদের সংবাদ শোনানোর পূর্বে অথবা পরে ঐ ইয়াহূদী বলিতে লাগিল, নবজাতক শিশুটির নিকট আমাকে নিয়া চল। সে ইয়াহূদীকে হযরত আমিনা (রা)-এর নিকট নিয়া আসিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বাহিরে নিয়া আসিল। ইয়াহূদী তাঁহার পিঠ মুবারকে ঐ নিদর্শন দেখিল এবং বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া গেল। হুঁশ ফিরিয়া আসিলে কুরায়শ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিল, হায় আফসোস! তোমার কি হইল ? সে বলিল, বনী ইসরাঈল হইতে নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের হাত হইতে তাওরাত কিতাব ছুটিয়া গেল। এই নবজাতক শিশু তাহাদেরকে প্রহার করিবে, তাহাদের আলিম-উলামাকে হত্যা করিবে। আরবরা নুবুওয়াত পাইয়া গেল। হে প্রিয় কুরায়শ! তোমাদের আনন্দ মুবারক হউক। মনে রাখিবে, আল্লাহ্‌র শপথ, প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী তোমাদের আওতাধীন থাকিবে। এ ঘটনার কিছু শেষাংশও রহিয়াছে। যাহা ইনশাআল্লাহ্ সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কীয় আলোচনায় আসিবে।

হাদীস ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বায়তে মিদরাসে তাশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী বিবেকবান তাহাকে আমার নিকট নিয়া আস। তাহারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুরিয়াকে উপস্থাপন করিল। নির্জনে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। আর বলিলেন, তোমার কসম দিয়া বলিতেছি, আরো কসম দিতেছি ঐ

www.pathagar.com

নিআমতের যা মান্না ও সাল্ওয়া নামে বনী ইসরাঈলকে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর মেঘমালার ছায়া পড়িয়াছিল, আমি কী আল্লাহ্র রাসূল ? সে বলিল, অবশ্যই, হ্যাঁ। আমার পুরা গোত্র ভাল করিয়াই জানে। আপনার প্রশংসা, গুণাবলী ও কমনীয়তা আমি যতটুকু জানি, তাহা তাওরাতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু, গোত্রের সবাই আপনার উপর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈমান গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইতে কোন্ জিনিস তোমার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল? সে বলিল, আমি আমার গোত্রের পরিপন্থী চলিতে পসন্দ করি না। আমি চাই, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করুক এবং আপনার আনুগত্য প্রকাশ করুক, তাহলে আমিও মুসলমান হইয়া যাইব।

হাদীস ঃ হযরত তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন, সিরিয়ার বসরার বাজারে থাকা অবস্থায় হঠাৎ এক উপাসনালয় হইতে আমি এই আওয়ায শুনিতে পাইলাম যে, এক রাহিব (পাদ্রী) বলিতেছিল, ঐ ব্যবসায়ীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের মধ্যে কি কোন পবিত্র মক্কার বাশিন্দা রহিয়াছে ? তালহা বর্ণনা করেন যে, আমি বলিলাম, আমি ওখানকার বাশিন্দা। তিনি বলিলেন, পবিত্র মক্কায় কি আহমদ নামে কেউ প্রেরিত হইয়াছেন ? আমি বলিলাম, কোন্ আহমদ ? সে বলিল, তিনি আবদুল মুত্তালিবের প্রপৌত্র। এই দিনেই তিনি সেখানে প্রেরিত হইবেন। তাঁহার আত্মপ্রকাশের স্থান হইবে পবিত্র মক্কা আর তাঁহার হিজরতস্থল হইবে খেজুর বাগান, প্রস্তরময় স্থান ও লবণাক্ত যমীন, যার নাম ইয়াছরিব। হযরত তালহা বলেন, পাদ্রীর ঐ কথাগুলি আমার অন্তরে স্থান করিয়া নিল। তারপর আমি ওখান হইতে পবিত্র মক্কায় চলিয়া আসিলাম। আমি জানিতে চাহিলাম, কী ব্যাপার, নতুন কোন কথা, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কী ? মানুষেরা বলিল, হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছে এবং ইব্ন আবূ কুহাফা অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহার অনুসরণ গ্রহণ করিয়া নিয়াছে। তারপর আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিলাম। পাদ্রীর কথাটি তাহার নিকট খুলিয়া বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাঁহার অনুসরণ গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তারপর হযরত সিদ্দীক (রা) তালহাকে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিলেন। ফলে তিনিও তাঁহার অনুসরণ গ্রহণ করিয়া নিলেন।

হাদীস ঃ হযরত জুবায়র ইব্ন মুত্'ইম (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যে সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিলেন এবং পবিত্র মক্কায় তাঁহার নুবুওয়াতের কথা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল, তখন আমি সিরিয়ার দিকে বাহির হইয়া গেলাম। বুসরা গিয়া পৌঁছাইলে খৃষ্টানদের একটি দলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল, তুমি কী মক্কার হারাম শরীফ হইতে আসিয়াছ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তাহারা বলিল, তুমি কী ঐ ব্যক্তিকে চেন, যে পবিত্র মক্কায় নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, চিনি। তাহারা আমার হাত ধরিয়া এমন একটি উপাসনালয়ে নিয়া গেল, যেখানে অসংখ্য ছবি ও মূর্তি সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা আমাকে বলিল, এই ছবিগুলি ভাল

www.pathagar.com

করিয়া দেখ, এইগুলির মধ্যে কী ঐ ব্যক্তির ছবি আছে, যে তোমাদের মধ্যে নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছে ? প্রত্যেকটি ছবি ভালভাবে আমি দেখিলাম। কিন্তু, কোন ছবিই তাঁহার ছবির মত মনে হইল না। এরপর তাহারা আমাকে আরো বড় একটি উপাসনালয়ে নিয়া গেল, যেখানে আগ থেকেই পূর্বের চেয়ে বেশী ছবি ও মূর্তি সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা আমাকে বলিল, এইগুলির মধ্যে দেখ, তাঁহার মুবারক প্রতিচ্ছবি এখানে আছে কিনা ? আমি দেখিতে থাকিলাম। হঠাৎ করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিচ্ছবি ও গুণাবলী দৃষ্টিগোচর হইল যে, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলে আকরাম (সা)-এর যানু মুবারক ধরিয়া আছেন। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার ছবি কী তুমি দেখিতে পাইয়াছ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তারপর মনে মনে আমি ভাবিলাম, এখনই আমাকে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। তাহা হইলে দেখিতে পারিতাম, তাহারা এ ব্যাপারে কি বলিতে চাহে। তাহারা রাসূল আকরাম (সা)-এর গুণাবলী বর্ণনা করিল। আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনিই ঐ ব্যক্তি। এরপর তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার যানু মুবারক যিনি ধরিয়া আছেন, তাঁহাকে কী তুমি চেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি তাঁহার বিশেষ সাহাবী। আর তাঁহার পরবর্তী খলীফা (প্রতিনিধি)। আর আমি বলিলাম, কিন্তু আশংকাবোধ করিতেছি যে, কখনও কুরায়শরা আবার তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে কিনা ? তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, তাহারা কখনও তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। তিনি শেষ যুগের নবী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সবার উপর বিজয়ী করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হাদীস ঃ উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী আকরাম (সা) আগমন করিলেন এবং কুবা মসজিদে অবস্থান করিলেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব ও আমার চাচা আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আখতাব রাতের অন্ধকারে সুবহে সাদিকের পূর্ববর্তী সময়ে নবী আকরাম (সা)-এর নিকট গেলেন। তারপর তাহারা আর ফিরিলেন না। এমনকি সন্ধ্যা শেষ হইয়া রাত আসিয়া গেলে তাহারা ঘরে ফিরিলেন। তাহাদেরকে তখন এত বেশী ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অস্থির দেখিলাম যাহা আমি পরিমাপ করিতে পারিতেছি না। ঘরে আসিয়া তিনি পড়িয়া গেলেন। তাহার সন্তানদের মধ্য হইতে যেহেতু আমিই ছিলাম তাঁহার প্রিয়, তাই পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী আমি তাঁহার নিকট আসিয়া গেলাম। কিন্তু পেরেশানীর বোঝায় তিনি এতটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আমার দিকে একটু তাকাইলেন। এমতাবস্থায় চাচাজান আব্বাজানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিই কী ঐ ব্যক্তি? এ ব্যক্তিই কী শেষ যুগের নবী, যাহার গুণাবলী আমরা তাওরাতের মধ্যে পাঠ করি ? আব্বাজান তখন চাচাজানকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনিই ঐ ব্যক্তি! চাচাজান আবারও আব্বাজানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কী নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তিনিই ঐ ব্যক্তি ? আব্বাজান বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চিতভাবেই আমি জানি যে, তিনিই ঐ ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, তাঁহার প্রসঙ্গে আপনার অন্তরে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে–ভালবাসার না শত্রুতার? তিনি বলিলেন, শত্রুতার। আল্লাহ্‌র কসম! যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন

www.pathagar.com

তাহার শত্রুতার মধ্যে বরাবরই চেষ্টা করিয়া যাইব। ফলে, তাহারা দুইজনই নবী আকরাম (সা)-এর শত্রুতায় সৃষ্টিগতভাবে হতভাগ্য এবং চিরকালের জন্য শাস্তিকে বরণ করিয়া নিল। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন পরিস্থিতি হইতে রক্ষা করুন।

এই ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু হতভাগ্য ব্যক্তি হীলা (কৌশল) ও নিফাককে পার্থিব জগতের নিকৃষ্ট সম্পদ উপার্জনের মাধ্যম ও নশ্বর জীবনের সংরক্ষণের ওসীলা বানাইয়া জাহান্নামের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু পাদ্রীও ছিল, যাহাদের ক্রমবিকাশের কপালে শুরু হইতেই স্বাভাবিক রহমত ও সৌভাগ্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহারা ছিল অগ্রসরমান। আর পরকালের সম্পদ ও সৌভাগ্য তাহারা অর্জন করিয়া নিয়াছিল। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)। মাজযীক, যিনি ইয়াহূদী পাদ্রীদের মধ্যে খুবই বড় আলিম, ধনী ও বিবেকবান ছিলেন, তিনি নবী আকরাম (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। আর তিনি উহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা তো ভাল করিয়াই জান, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য করা আমাদের সবার দায়িত্ব। কাজেই, তোমরা এ সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা কর। ইয়াহূদীরা বলিল, আজ শনিবার। তিনি বলিলেন, কোন শনিবার নাই। তারপর তিনি তরবারি উঠাইয়া মাঠে নামিয়া আসিলেন এবং ঈমান গ্রহণ করিয়া ওসিয়ত করিলেন, আজ যদি আমি মরিয়া যাই, তবে আমার সমুদয় সহায়-সম্পদ নবী আকরাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারিবেন। এরপর তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। নবী (সা) তাহার সমুদয় সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিলেন। ঐ সম্পত্তি হইতেই নবী (সা) সাধারণ সাদাকা করিতেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা) তিনশত বছর ধরিয়া, অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ইহা অপেক্ষাও বেশী সময় ধরিয়া নবী আকরাম (সা)-এর নবীরূপে আবির্ভূত হওয়ার খবর শুনিয়া উদ্দিষ্ট বস্তু দেখার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁহার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

নবী (সা) ও অন্য নবীগণের মধ্যে যৌথ ও বিশেষ মর্যাদার আলোচনা

নবী আকরাম (সা)-এর কতক মর্যাদা এমন রহিয়াছে যাহা অন্য আম্বিয়া (আ)-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আবার কতক মর্যাদা এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র রাসূলে কারীম (সা)-এর সহিতই সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অন্য কোন নবী দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও তাঁহার সহিত অংশীদারি হইবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আত্মাকে বিভিন্ন রকম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কখনও কখনও বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের পবিত্রতা দান করেন। আবার কখনও কাহাকেও মধ্যপন্থী অবস্থায় রাখেন। আবার কাহাকেও আত্মিক অপরিচ্ছন্নতায় ভরপুর করিয়া রাখেন। প্রত্যেক প্রকারেই অবস্থানগত পার্থক্য পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। কিন্তু আম্বিয়া (আ)-এর পবিত্র আত্মা সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হইতে মুক্ত থাকে। তথাপি আম্বিয়া (আ) পরিপূর্ণ মর্যাদা-সম্মানের গণ্ডিতে হইতে অন্যান্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু, তাহাদের মধ্যে আবার মর্যাদাগত অবস্থানের তারতম্য রহিয়াছে। নবী আকরাম (সা) তাহাদের মধ্যে স্বভাব-প্রকৃতির দিক হইতে সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ ও স্বীকৃত। শারীরিক দিক হইতে সবচেয়ে বেশী পবিত্র ও পরিশুদ্ধ। আধ্যাত্মিক দিক হইতে সবার চেয়ে পরিপূর্ণ আর সৃষ্টিগত দিক হইতে সবার চেয়ে বেশী কোমল ও শ্রেষ্ঠ তাঁহার শ্রেষ্ঠ মানব–মানব সন্তানের সর্দার ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) পূর্ণতা ও মর্যাদার যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলেন ইহার সম্পূর্ণ অংশের সাহিত কিংবা এর সম-পরিমাণ মর্যাদা এবং তাহাদের বিশেষ মর্যাদা ও পূর্ণতার সহিত অন্য নবীগণ অংশীদার নন, যাহা বিশেষভাবে নবী আকরাম (সা)-কে দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আদম (আ) ও আমাদের নবী (সা)

হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তিনি নিজেই তাঁহার কুদরতী হাতে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে রূহ ফুঁকিয়া দেন। কিন্তু আমাদের নবী (সা)-কে এই মর্যাদা দান করা হইল যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁহার বক্ষ উন্মোচনের তত্ত্বাবধায়ক ও কার্যসম্পাদনকারী হিসাবে দায়িত্ব নিয়াছেন এবং এতে ঈমান ও প্রজ্ঞা রাখিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর অস্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর আমাদের নবী হাবীবে খোদা (সা)-এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নুবুওয়াত সৃষ্টিতে। হযরত আদম (আ) ফেরেশতা কর্তৃক সিজদা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম (আ)-এর প্রতিটি 'রূহ'-এর মধ্যে যে মুহাম্মদী নূর গচ্ছিত রাখা হইয়াছে তাহার কারণে ছিল। এ বরকতময় নূরকে তাঁহার কপালে ঝলসিত করা হইয়াছে। এ শ্রদ্ধা ও সম্মানে নবী (সা)-কে ভূষিত করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ "আল্লাহ্ নবীর জন্য অনুগ্রহ করেন এবং ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।"

সিজদা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সঙ্গে ছিলেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তাহা শোভনীয় নহে। কিন্তু সায়্যিদে আলম (সা)-এর উপর অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সঙ্গে ছিলেন। নিশ্চয় তাহা রাসূলে কারীম (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। তাহা ছাড়া ফেরেশতাদের সিজদা করার মধ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি বেশী নাই। কেননা, তাহা সংঘটিত হইয়াছিল মাত্র একবার। কিন্তু রাসূলে কারীম (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ করার বিষয়টি সর্বদাই অব্যাহত রহিয়াছে।

হযরত আদম (আ)-কে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে দায়লামী মুসনাদুল ফিরদাউসে আবূ রাফে'-এর বর্ণনায় হাদীস উদ্ধৃত করেন, নবী আকরাম (সা) বলেন, আমার উম্মতকে আমার জন্য ঐ সময় যখন তাহারা মাটি ও পানি ছিল মানবাকৃতি দান করা হয়। আর আমাকে তাহাদের সবার নাম শিখাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই, যেইভাবে হযরত আদম (আ)-এর বস্তুর নাম শিক্ষা হইল, তেমনিভাবে নবী (সা)-এর তাহাই হইয়াছে। এ অতিরিক্ত সংযোজনের সঙ্গে সত্তা ও বস্তুর জ্ঞানও দান করা হইয়াছে। আর নিঃসন্দেহে বস্তুর নাম অপেক্ষা বস্তুর সত্তার মর্যাদাই বেশী। কেননা, বস্তুর নাম তো রাখা হয় বস্তুর সত্তা প্রকাশের জন্য আর সত্তা-ই মূল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, আর 'নাম' উদ্দেশ্যের সহায়ক। আর কোন জ্ঞানের মর্যাদা অনুমিত হয় যে বস্তুর জ্ঞান ঐ বস্তু দ্বারা।

হযরত ইদরীস (আ) ও আমাদের নবী (সা)

হযরত ইদরীস (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا "আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছি উচ্চ মর্যাদায়।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৭)। আর আমাদের নবী রাসূলে আকরাম (সা)-কে মি'রাজের নিআমত দান করিয়াছেন। তিনি ছাড়া আর কোন নবীর জন্য এত উঁচু মর্যাদা মিলে নাই।

হযরত নূহ (আ) ও আমাদের নবী (সা)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তাঁহার মাধ্যমে ঈমানদারগণকে ডুবিয়া যাওয়া হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আর আমাদের নবী (সা)-কে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তাঁহার কোন উম্মতকে আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হইবে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ "আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর নৌকাকে পানির মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর মর্যাদা ইহা অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি করিয়াছেন। একবার রাসূলে কারীম (সা) লক্ষ্য করিলেন যে, ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল পানির কিনারায় বসিয়া

www.pathagar.com

আছে। ইকরিমা বলিল, আপনি যদি সত্য হইয়া থাকেন, তবে অপর প্রান্তের পাথরগুলিকে নির্দেশ দিন যাহাতে ঐগুলি পানিতে সাঁতার কাটিয়া এপারে আসিয়া যায় এবং পানিতে না ডুবে। নবী (সা) ইঙ্গিত করিলেন, আর অমনিতেই পাথরগুলি নিজ জায়গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাঁতার কাটিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আসিয়া গেল এবং তাঁহার রিসালাতের সাক্ষ্য দিল। তারপর রাসূল (সা) বলিলেন, হে ইকরিমা! এখন তুমি খুশি হও। এটাই যথেষ্ট। ইকরিমা বলিল, আপনি এখন এইগুলিকে নির্দেশ দিন যেন নিজ জায়গায় ফিরিয়া যায়। রাসূল (সা) পুনরায় ইঙ্গিত করিলেন, আর পাথরগুলি সাঁতার কাটিয়া নিজ জায়গায় গিয়া স্থাপিত হইয়া গেল। পাথরের এইভাবে সাঁতার কাটা এবং পানিতে ডুবিয়া না যাওয়া কাঠের তৈরী নৌকার পানিতে ভাসিয়া থাকা এবং ডুবিয়া না যাওয়া অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) ও আমাদের নবী (সা)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এ মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তাহার উপর আগুন শান্তির সহিত শীতল হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) কাফিরদের যুদ্ধের আগুন শীতল করিয়াছেন। যুদ্ধের আগুনে তরবারিগুলি তাহার লাকড়ী ও ইন্ধন হইয়াছে। ইহার স্ফুলিঙ্গ হইল হিংসা-বিদ্বেষ আর জ্বলন্ত বস্তুগুলি হইল রূহ ও শরীর। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ "যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ততবার, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৪)। কাফিররা কুফরীর আগুন দ্বারা দীনের নূর শীতল করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু জাব্বার-কাহ্হার, তাই তিনি তাহা প্রতিহত করিয়া দিয়াছেন এবং দীনের আলো পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের ষড়যন্ত্রের আগুন নির্বাপিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে – يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ "কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার দীনের আলো পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না" (সূরা তাওবা ঃ ৩২)। ইহাও উল্লেখ আছে যে, মি'রাজ রজনীতে নবী আকরাম (সা) আগুনের স্তর সুস্থভাবে অতিক্রম করিয়াছেন।

নাসাঈ বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিব বর্ণনা করেন যে, আমি তখনও ছোট ছিলাম। আমার শরীরের উপর উথলে উঠা ফুটন্ত পানির পাত্র উল্টাইয়া পড়িল। ইহাতে আমার শরীর ঝলসিয়া গেল। আমার পিতা আমাকে রাসূলে কারীম (সা)-এর নিকট নিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার মুখের বরকতময় লালা আমার ঝলসে যাওয়া অঙ্গে লাগাইয়া দিলেন এবং এই দু'আ করিলেন ঃ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ "হে মানুষের পালনকর্তা! তাহার অসুবিধা দূর করিয়া দাও।" তখন আমি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করিলাম যে, মনে হয় যেন আমার উপর কোন কষ্ট লাগেই নাই।

খিল্লাত ও মহব্বতের মর্যাদাগত অবস্থান

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'মাকামে খিল্লাত' দান করিয়াছেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কে 'মাকামে মহব্বত' দান করিয়াছেন। 'মাকামে

www.pathagar.com

মহব্বত' মাকামে খিল্লাত' অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। 'হাবীব' এমন 'মুহিব্ব'-কে বলা হয়, যিনি 'মাকামে মাহ্বুবিয়্যাত' পর্যন্ত পৌছিয়াছেন। রাসূলে আকরাম (সা)-এর শাফাআত করার মর্যাদা লাভ এবং এইস্থানে তাঁহাকে কথা বলার অনুমতি প্রদানের বিষয়টি তাঁহার মাহবুবিয়্যাতেরই প্রতিফলন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মধ্যে 'মাকামে খিল্লাত' ও 'মাকামে মহব্বত' উভয়টিই বিদ্যমান ছিল। তাঁহার 'মাকামে খিল্লাত' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 'মাকামে খিল্লাত' অপেক্ষা বেশী মর্যাদাবান ও পরিপূর্ণ। অষ্টম অধ্যায়ে এই আলোচনাটি "পরকালীন মর্যাদার সহিত রাসূলে কারীম (সা)-এর বিশেষত্ব" শিরোনামে আসিবে।

মূর্তি ভাংচুর

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রতিমা ভাংচুরের মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) কা'বাঘরের মধ্যে স্থাপিত মযবূত প্রতিমাগুলিকে লাঠির ইশারায় ভাঙ্গিয়া দিলেন আর বলিলেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 'হক আসিয়াছে আর বাতিল অপসৃত হইয়াছে।'

কা'বাঘর নির্মাণ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাঘর নির্মাণের মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) কা'বাঘরের নির্ধারিত স্থানে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করেন। এ সংক্রান্ত কুরায়শদের বিবাদ নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারকার্যের ঘটনা প্রসিদ্ধ। হাদীসে আসিয়াছে- اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللّٰهِ "হাজারে আসওয়াদ আল্লাহ্ তা'আলার ডান হাত।" কেননা, এমনভাবে একে চুম্বন দেওয়া হয়, যেমনিভাবে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার সময় ডান হাতে চুম্বন দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদের চোখ ও বাকশক্তি থাকিবে। চোখ দিয়া যাহারা ইহাকে দেখিতে গিয়াছিল তাহাদেরকে দেখিবে আর বাকশক্তি দ্বারা তাহাদের জন্য শাফাআত করিবে। কাজেই, বায়তুল্লাহ্ নির্মাণে রাসূল আকরাম (সা)-এর বরকতময় কাজ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাজ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ ছিল।

•

হযরত মূসা (আ) ও আমাদের নবী (সা)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে এই মু'জিযা দান করিয়াছেন যে, তাঁহার লাঠি সাপে পরিণত হইয়া যাইত। আর আমাদের নবী (সা)-কে তাঁহার মত এই মু'জিযা দান করিয়াছেন যে, উসতুওয়ানাহ হান্নানাহ্ (খেজুর গাছের খুঁটি যাহার সহিত হেলান দিয়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিতেন। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর তাহা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।) তাঁহার বিরহে আহাজারি করিত। সুস্পষ্ট ভাষায় কাঁদিত। মু'জিযার অধ্যায়ে এই আলোচনা আসিবে ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, অভিশপ্ত আবূ জাহল একদিন রাসূলে আকরাম (সা)-কে পাথর নিক্ষেপ করিয়া রক্তাক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিল

www.pathagar.com

(মাআযাল্লাহ)। কিন্তু, কাছে যাইতেই সে রাসূলে আকরাম (সা)-এর দুই কাঁধে দুই অজগর দেখিতে পাইয়া ভয়ে পালাইল।

আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে হাতের শুভ্রতা ও এমন চমক দান করিলেন যাহার দ্বারা চোখ ফিরিয়া যাইত।

আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) আপাদমস্তক ছিলেন আলোয় ঝলকিত। তাঁহার সৌন্দর্য-প্রভায় দৃষ্টিশক্তি উল্টা যেন ফিরিয়া আসিত। তিনি যদি মানবীয় পোশাক পরিধান না করিতেন, তবে কাহারও জন্য তাঁহার সৌন্দর্যপ্রভা উপলব্ধি করা সম্ভব হইত না। তাঁহার আলোকিত অণু হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ পর্যন্ত পবিত্র ঔরসে ও পবিত্র জরায়ুতে স্থানান্তরিত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল।

ফাইদা ঃ

মু'জিযা-১

হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) যিনি অন্যতম সাহাবী ছিলেন। একবার তিনি বৃষ্টিবাদলের অন্ধকার রাতে নবী আকরাম (সা)-এর সহিত ইশার নামায আদায় করিলেন। নবী (সা) একটি খেজুরের ডাল তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহা নিয়া যাও। রাস্তায় বাহির হইলে চতুর্দিকে দশ হাত করিয়া জায়গা পর্যন্ত আলো দিবে। বাড়িতে গিয়া পৌঁছাইলে ইহাকে একটি কাল সাপে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিবে। তখন ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া দিও। আবূ নুআয়ম এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মু'জিযা-২

সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌র ও হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র এক অন্ধকার রাতে রাসূলে আকরাম (সা) হইতে (দূরে) কোথাও গেলেন। তাহাদের দু'জনের হাতে ছিল দুইটি লাঠি। রাস্তায় একজনের লাঠি আলোকিত হইয়া গেল। আর তাহারা দুইজনেই এই আলো দ্বারা পথ চলিতে লাগিল। যখন একে অপর হইতে (দূরে) পৃথক হইয়া গেলেন, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলোকিত হইয়া গেল। আসল কথা হইল, রাসূলে আকরাম (সা) নিজেই ছিলেন আলো। আর তাঁহার নামের মধ্যেও ছিল আলো।

মু'জিযা-৩

ইমাম বুখারী তাহার 'তারীখ' গ্রন্থে ও ইমাম বায়হাকী ও আবূ নুআয়ম হামযা আসলামীর বর্ণনায় উদ্ধৃত করেন যে, তাহারা বলেন, আমরা একবার নবী (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। অন্ধকার রাতে যখন আমরা রাসূল (সা) হইতে পৃথক হইলাম, তখন আমার আঙ্গুলগুলি আলোকিত হইয়া গেল। ইহাতে আমরা পথ চলিলাম। কেহ বিপদগ্রস্ত হইলাম না।

মু'জিযা-৪

হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলে আকরাম (সা) এক সাহাবীকে তাহার স্বজাতির নিকট দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি কোন একটি নিদর্শন কামনা করিলেন, যাহা দলীল

www.pathagar.com

হিসাবে উপস্থাপন করিতে পারে। রাসূলে আনওয়ার (সা) তাঁহার আঙ্গুল মুবারক তাহার উভয় চোখের মাঝে বুলাইয়া দিলেন। ঐ স্থানটি আলো ও শুভ্রতায় আলোকিত হইয়া গেল। ঐ সাহাবী নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, আমার আশংকাবোধ হইতেছে–লোকেরা একে ধবল রোগ মনে করে কিনা ? যেমন হযরত মূসা (আ)-এর কিস্সায় আসিয়াছে– بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ অর্থাৎ এমন শুভ্র যাহা কোন রোগের কারণে নহে। ইহাতে রাসূল (সা) এ আলোকে তাহার চাবুকের দিকে পরিবর্তন করিয়া নিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রের পানি জমাট হইয়া রাস্তায় পরিণত হইয়াছিল। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর ইশারার মাধ্যমে চাঁদকে দুইটুকরায় পরিণত করিয়া দেওয়া সমুদ্রে রাস্তা তৈরী হওয়া অপেক্ষা বেশী বড় বিষয়। কেননা, হযরত মূসা (আ)-এর কার্যক্ষমতা ছিল ভূ-মণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তাঁহার কার্যক্ষমতা নভোমণ্ডলেও বিস্তৃত। এ দুইটি মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিভিন্ন বর্ণনায় আসিয়াছে যে, পৃথিবী ও আকাশের মধ্যখানে একটি সমুদ্র আছে, যাহাকে মাকফূফ বলা হয়। ইহার বিপরীতে পৃথিবীর সমুদ্র এক ফোঁটা পানির মত। নবী আকরাম (সা)-এর জন্য এ সমুদ্রটি ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহা ভেদ করিয়া তিনি মি'রাজ রজনীতে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন।

হযরত মূসা (আ)-এর জন্য পৃথিবীর সমুদ্রে রাস্তা তৈরী হইয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহা অনেক উর্ধ্বে।

দু'আ কবূল হওয়া

মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল হইয়াছিল মূলত ফিরআওন ও তাহার বাহিনীকে নিমজ্জিত করিবার জন্য। আর রাসূলে আকরাম (সা)-এর তো অসংখ্য-অগণিত দু'আ-ই কবূল করা হইয়াছে।

পানি প্রবাহিত করা

হযরত মূসা (আ)-এর এই মু'জিযা ছিল যে, তিনি পাথর হইতে পানি প্রবাহিত করিতেন এবং পাথর হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করিতে পারিতেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) নিজের আঙ্গুল মুবারক হইতে পানি প্রবাহিত করিতেন। পাথর তো ভূমি হইতেই সৃষ্ট। আর তাহা হইতে তিনি পানি প্রবাহিত করিতেন। পক্ষান্তরে রক্ত-গোশতে গড়া শরীরের অংশ বিশেষ হইতে পানি প্রবাহিত করা অনেক উচ্চস্তরের বিষয়।

কথোপকথন করা

হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا। "আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন।" আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কে ইসরা ও মি'রাজের রজনীতে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন। এমনকি তাহাকে খুবই নিকটে নিয়া কথা বলিয়াছেন। রাসূলে আকরাম (সা)-এর কথাবার্তা বলিবার স্থান ছিল আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহায়, যাহা সৃষ্টির জ্ঞানভাণ্ডারে প্রান্তসীমা। আর হযরত মূসা (আ)-এর কথাবার্তা বলিবার স্থান ছিল তূর পর্বত।

www.pathagar.com

ভাষাগত স্পষ্টতা

হযরত হারূন (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ভাষাগত স্পষ্টতা দান করিয়াছেন। হাদীসে আসিয়াছে, أَخِىْ هَارُوْنَ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا "আমার ভাই হারূন কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমার চাইতেও স্পষ্টভাষী।" আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর ভাষাগত স্পষ্টতা ও বাগ্মিতা এত বেশী ছিল যে, এর চাইতে বেশী তো দূরের কথা, এর সমপর্যায়েরও কল্পনা করা যায় না। হযরত হারূন (আ)-এর স্পষ্টতা শুধুমাত্র ইবরানী ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আরবী ভাষা ইবরানীর চাইতে বেশী সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট। আর হযরত মূসা (আ) সাধারণভাবে এই কথা বলেন নাই যে, 'আমার ভাই হারূন আমার চাইতে বেশী স্পষ্টভাষী।" বরং তাহার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর ভাষায় জড়তা ছিল।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ও আমাদের নবী (সা)

হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেওয়া হইয়াছে। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কে দেওয়া হইয়াছে সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ অংশ। যে কেহ রাসূলে কারীম (সা)-এর শারীরিক সৌন্দর্য সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করিবে, সে-ই তাঁহার সৌন্দর্য ও কমনীয়তার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবে। কেননা, তাঁহার মত সৌন্দর্যের অধিকারী কোন ব্যক্তি না সৃষ্টি হইয়াছে, না হইবে। হযরত ইউসুফ (আ)-কে সৌন্দর্যপ্রভা ও চেহারায় ঝলকানি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর শারীরিক গঠনাকৃতিতে এমন লাবণ্য ও সৌন্দর্য দেওয়া হইয়াছে, যাহা কাহারও মধ্যেই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছিল মাত্র তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহা হইল– ১. চাঁদ ও সূর্যকে তাহাকে সিজদা করিতে দেখা। ২. জেলখানায় দুই সাথীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। ৩. বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। কিন্তু, আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অসংখ্য-অগণিত। যে কেহ হাদীস ও বর্ণনাগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করিবে, সে আশ্চর্যজনক অনেক অবস্থা ইহাতে পাইবে। যাহার কিছু কিছু অংশ নিজ নিজ স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সামনেও বর্ণনা করা হইবে।

হযরত দাউদ (আ) ও আমাদের নবী (সা)

হযরত দাউদ (আ)-কে লোহা নরম করার মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল। লোহার উপর যখন তিনি হাত রাখিতেন, তখন তাহা নরম হইয়া যাইত। তাঁহার হাতের ছোঁয়ায় শুকনো কাঠ কাঁচা হইয়া যাইত ও পত্র-পল্লবে ভরিয়া যাইত। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) হযরত উম্মে মা'বাদ (রা)-এর ঐ বকরীর উপর পবিত্র হাত রাখিলেন, যাহা শুকাইয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বরকতময় হাতের ছোঁয়ায় উহার স্তন সতেজ ও দুধেল হইয়া উঠিল। আর এমন বেশী দুধ দিতে লাগিল যাহা সাধারণত অন্য বকরীগুলি দেয় না। হযরত দাউদ (আ)-এর

www.pathagar.com

জন্য যদিও লোহা নরম করা হইত, কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর জন্য কঠিন পাথরকে কোমল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

হাফিয আবূ নুআয়ম বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) যখন গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং নিজকে ইহার মধ্যে লুকাইবার ইচ্ছা করিলেন, তখন সর্বপ্রথম নিজের মাথা মুবারক গুহায় প্রবেশ করাইলেন। এমনকি নবী আকরাম (সা)-এর মাথা মুবারক ভিতরে চলিয়া গেল আর পাথর ধীরে ধীরে প্রশস্ত হইতে লাগিল। বুঝা গেল পাথর তাহার জন্য কোমল হইয়া গেল। তাঁহার বাহু ইহার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করিল। আর বায়তুল মাকদাসের পাথর তাঁহার জন্য আটার খামিরার মত নরম করিয়া দেওয়া হইল। তারপর এর মধ্যে তিনি তাহার সাওয়ারী জানোয়ার বাঁধিলেন। হযরত দাঊদ (আ)-এর সহিত পাহাড়ও তাসবীহ্ পড়িয়াছিল। আর রাসূলে আকরাম (সা)-এর হাত মুবারকে পাথর তাস্‌বীহ্ পাঠ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত সুলায়মান (আ) ও আমাদের নবী (সা)

হযরত সুলায়মান (আ)-কে পাখ-পাখালির ভাষা, শয়তান ও বাতাসের নিয়ন্ত্রণ এবং এমন প্রজ্ঞা দান করা হইয়াছে, যাহা তারপর আর কাউকে দান করা হয় নাই। কিন্তু, আমাদের নবী সায়্যিদে আলম সুলতানে কাওনায়ন (সা)-কেও তাঁহার মত আরও কিছু সংযোজনের সহিত দেওয়া হইয়াছে। আর পাখ-পাখালির ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে বলা হইয়াছে اُوْتِيْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ "আমাকে পাখ-পাখালির ভাষার উপলব্ধি শক্তি দেওয়া হইয়াছে।" রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র হাতে পাথরও কথাবার্তা বলিয়াছে ও তাসবীহ পড়িয়াছে। অথচ কংকর হইল জড় পদার্থ। পাখ-পাখালির কথা বলা অপেক্ষা পাথরের কথা বলা বেশী আশ্চর্যজনক। হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর সহিত বিষমিশ্রিত ভুনা বকরী ও হরিণ কথা বলিয়াছে এবং তাঁহার নিকট অন্যরা অভিযোগ করিয়াছে। মু'জিযার বর্ণনায় তাহা আসিবে। এক বর্ণনায় আসিয়াছে–একটি পাখি আসিয়া রাসূলে আকরাম (সা)-এর মাথার উপর ঘুরপাক খাইতেছিল এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতেছিল। তিনি বলিলেন, হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে কে এই পাখির বাচ্চা ধরিয়া কষ্ট দিতেছ ? সে যেন পাখির বাচ্চাটিকে ছাড়িয়া দেয়। এমনিভাবে রাসূল (সা)-এর সহিত চিতাবাঘের কথা বলিবার ঘটনাও প্রসিদ্ধ।

বাতাসকে নিজের নিয়ন্ত্রণভুক্ত করিবার বিষয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে – وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ "আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।" (সূরা সাবা ঃ ১২)

হযরত সুলায়মান (আ)-কে তাঁহার সিংহাসন যেইখানে তিনি যাইতে চাহিতেন সেইখানে নিয়া যাইত। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কে বুরাক দেওয়া হইয়াছে যাহা ছিল বায়ু হইতেও দ্রুতগামী বরং বিজলী হইতেও দ্রুতগামী। এক মুহূর্তের মধ্যে তাহা রাসূল আকরাম (সা)-কে ফরাশ (শয্যা) হইতে আরশে নিয়া গেল।

www.pathagar.com

হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য বাতাস অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ও যে কোন প্রান্তে নিয়া যাইতে পারে। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর জন্য সমগ্র পৃথিবীকে টানিয়া আনা হইয়াছে, যাহাতে রাসূল আকদাস (সা) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবকিছু দেখিতে পান। এ পার্থক্যটি ঠিক এমন দুই ব্যক্তির মত, যাহাদের একজন দৌড়াইয়া পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, আর অপরজনের দিকে পৃথিবী দৌড়াইয়া চলিয়া আসিতেছে।

আর শয়তানকে অধীনস্থ করার বিষয়ে সহীহ্ হাদীস শরীফে আসিয়াছে—একবার শয়তান নামাযের মধ্যে নবী আকরাম (সা)-এর সামনে আসিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাঁহাকে উহার উপর শক্তিপ্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করিলেন। তিনি চাহিলেন, শয়তানকে মসজিদের কোন স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবেন, যাহাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ইহাকে নিয়া খেলাধুলা করে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন্নকে অধীনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর উপর জিন্নেরা ঈমান আনিয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) জিন্নদের দ্বারা খিদমাত গ্রহণ করিয়াছেন। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা) জিন্নদেরকে মুসলমান বানাইয়াছেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে জিন্ন, মানুষ ও পাখ-পাখালিদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আর রাসূল আকরাম (সা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ফেরেশতা এমনকি জিবরাঈল, মীকাঈল (আ)-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে পাখিদের অন্তর্ভুক্ত করা অপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক হইতেছে ছাওর পর্বতের গুহায় কবুতরের ঘটনা। হিজরতের সময় যখন নবী (সা) ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করিলেন, তখন কবুতর গুহার মুখে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িয়া তা দেওয়া শুরু করিয়াছিল এবং দীনের শত্রুদের হাত হইতে রাসূল (সা)-কে হিফাযত করিল। সেনাবাহিনীর কাজ তো হিফাযত করাই হইয়া থাকে। নিঃসন্দেহে অতি সহজে এ উদ্দেশ্য অর্জন হইয়া গেল।

হযরত সুলায়মান (আ)-কে এমন রাজত্ব দান করা হইয়াছে, যাহার উপযুক্ত তাহার পর আর কেহ ছিল না। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কে এ ইচ্ছা অবলম্বন করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল যে, হয়তো তিনি বাদশাহ হইবেন, নয়তো বান্দা। কিন্তু তিনি বান্দা হওয়াকে বাছিয়া নিলেন। ইহা এমন মহারাজত্ব যাহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার কোন আশংকা নাই। রাসূল (সা)-এর পর এমন রাজত্ব আর কাউকে দেওয়া হয় নাই।

হযরত ঈসা (আ) ও আমাদের নবী (সা)

হযরত ঈসা (আ)-কে অন্ধ ও ধবল রোগীকে সুস্থ এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করা হইয়াছে। আর আমাদের নবী সায়্যিদে আলম (সা)-কেও এমন মু'জিযা দান করা হইয়াছে। হযরত আবূ কাতাদা (রা)-র চোখ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল, নবী (সা) তাহা ভিতরে পূর্বের জায়গায় স্থাপন করিয়া দিলেন। ফলে পূর্বের চাইতেও আরও বেশী ভালভাবে স্থাপিত হইল এবং ভাল দেখিতে পাইলেন। বর্ণিত আছে, হযরত মুআয ইব্ন আফরার স্ত্রী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল। তিনি নবী আকরাম (সা)-এর নিকট তাহা জানাইলেন। নবী (সা)

www.pathagar.com

তাঁহার হাতের লাঠি দ্বারা কুষ্ঠ আক্রান্ত স্থানটিতে আঘাত করিলেন। আর অমনিতেই তাহা সারিয়া গেল।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় ও বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হইয়া বলিলেন, এ মুহূর্তে আমি ঈমান গ্রহণ করিব যদি আপনি আমার মৃত কন্যাকে পুনরায় জীবিত করিয়া দেন। নবী (সা) ঐ কন্যার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া 'হে অমুক' বলিয়া ডাক দিলেন। আর কবর হইতে বাহির হইয়া মেয়েটি বলিল, لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার ডাকে আমি উপস্থিত" (..হাদীসের শেষ পর্যন্ত)। নবী আকরাম (সা)-এর মৃতকে জীবিত করার ঘটনা অনেকবার সংঘটিত হইয়াছে। এছাড়া রাসূলে কারীম (সা)-এর হাতে পাথর ও কংকরের তাসবীহ পড়া এবং হাজারে আসওয়াদের তাঁহাকে সালাম করা, উসতুয়ানায়ে হান্নানার কান্নাকাটি করা, মৃত ব্যক্তির কথাবার্তা অপেক্ষা বেশী পূর্ণতা রাখে। হযরত ঈসা (আ)-কে তো আসমানে উঠানো হইয়াছে। আর আমাদের নবী (সা)-কে মি'রাজ রজনীতে এর চাইতেও আরও অনেক উর্ধ্বে উঠানো হইয়াছে, যেখানে অন্য কাউকে নেওয়া হয় নাই। তারপর তাঁহাকে আরও অতিরিক্ত বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে। যেমন খালাওয়াতে কুদসে মুনাজাত শ্রবণ করা এবং নানা রকম বস্তু স্বচক্ষে দর্শন ও কারামাত দ্বারা ধন্য হওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, সমস্ত নবী-রাসূল (আ)-কে যত মর্যাদা, পূর্ণতা ও মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সবগুলি নবী আকরাম (সা)-এর সত্তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মু'জিযা ও মর্যাদা

উপরোল্লিখিত মু'জিযা ও মর্যাদাগুলি ছিল নবী আকরাম (সা) ও অন্যান্য সমস্ত নবীর মধ্যে যৌথভাবে। কিন্তু অন্যান্য মর্যাদা ও মু'জিযা যাহা একমাত্র রাসূলে আকরাম (সা)-এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই গণ্য তাহা অসংখ্য-অগণিত। কিন্তু উলামায়ে কিরামের স্মৃতিভাণ্ডারে যাহা ধারণ করা হইয়াছে তাহা দুই প্রকার। প্রথমত, যা শরীআতের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, যে গুণাবলী বিভিন্ন অবস্থা ও মু'জিযার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিম বলেন, প্রথম প্রকারের বিষয়ে আলোচনা করা অনর্থক। কেননা, তাহা এমন বিষয় যা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা সঠিক যে, উহার প্রতি কোন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইবে না। কেননা, উহার দ্বারা প্রথম লাভ তো এই যে, উহার দ্বারা তাহার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। আর নিঃসন্দেহে এ সম্পর্কে গবেষণা করা এমন এক সুমহান ভাগ্যের কথা, যাহা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য তাঁহার সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী। প্রথম প্রকারটির আবার চারিটি ভাগ রহিয়াছে। প্রথমত, যাহা নবী আকরাম (সা)-এর সহিত বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত। ইহার হিকমত হইল, নৈকট্য ও মর্যাদার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটে। কেননা, ফরয ইবাদতের সহিত নৈকট্য লাভ করা নফল ইবাদতের সহিত নৈকট্য লাভ অপেক্ষা বেশী মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ। যেমন হাদীস শরীফ সাক্ষী আছে, নির্দেশিত কাজের বোঝা বহন বেশী শক্তিশালী এবং উহার বিনিময়ও খুব বেশী। প্রত্যেক প্রকারের সহিত আমরা উদাহরণও দিয়াছি। আর এ উদাহরণগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগতি লাভ করার জন্য

www.pathagar.com

উলামায়ে কিরামের গ্রন্থাদির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ইহার আলোচনা মাওয়াহিবে ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে রহিয়াছে। এক বর্ণনা মতে ضُحٰى-এর নামায ওয়াজিব। অথচ প্রকৃত মাসআলা ইহার বিপরীত। যদিও এক হাদীসে আসিয়াছে যে, اُمِرْتُ بِرَكْعَتَىِ الضُّحٰى 'আমাকে যুহার দুই রাকআত নামাযের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গবেষণালব্ধ আলোচনা অনুযায়ী যুহার নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর এখানে اَمْرٌ 'আদেশবোধক' শব্দটি 'ওয়াজিব' বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে যুহার নামায দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ নামায যাহা সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর পড়া হয়। সাধারণত এ নামাযকে ইশরাকের নামায বলা হয়। যুহার নামাযকে চাশতের নামাযও বলা হয়। হযরত আইশা (রা)-এর উক্তি ঃ

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ صُبْحَ الضُّحٰى

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুহার সময় তাসবীহ পড়িতে দেখি নাই।"–এটা এ নামাযের অর্থেই প্রযোজ্য। যেমনিভাবে বিতর ও ফজরের দুই রাকআত নামায। হাকিম তাহার মুসতাদরাক গ্রন্থে এমনই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও তাবারানীর হাদীসেও আসিয়াছে যে, নবী আকরাম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উপর তিনটি জিনিস ফরয। আর তোমাদের উপর নফল ঃ বিতর, ফজরের দুই রাকআত ও যুহার দুই রাকআত। বিতর সম্বলিত উক্তিটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট বিতর সবার উপর ওয়াজিব। যেমন তাহাজ্জুদের নামায রাসূলে আকরাম (সা)-এর উপর ফরয ছিল। তারপর উম্মতের উপর হইতে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শাফিঈ আলিমগণের কেহ কেহ বলেন, নবী আকরাম (সা)-এর নিকট হইতেও ইহার ফরয হওয়ার বিধান প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এমনিভাবে মিসওয়াক করার বিধানও। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, নবী আকরাম (সা) প্রতিটি নামাযের সময় মিসওয়াকের সহিত উযূ করার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। আর যখন তাহা কষ্টসাধ্য মনে হইল, তখন প্রতি নামাযের জন্য মিসওয়াকের নির্দেশ দেওয়া হইল। (অর্থাৎ উযূ যদি করিয়া থাকে, তবে উযূ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মিসওয়াক অবশ্যই করিতে হবে।) অন্যান্য হাদীস শরীফেও মিসওয়াক সম্পর্কে নির্দেশ আসিয়াছে। এ হাদীসগুলি অকাট্যভাবে ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু সম্মানজনক বিষয়, যাহা নবী আকরাম (সা)-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সেসব আহকাম যাহা নবী (সা)-এর উপর তো হারাম, কিন্তু অন্যদের উপর হারাম নহে। যেমন যাকাত হারাম হওয়ার বিধান। নবী আকরাম (সা)-এর উপর যাকাত গ্রহণ করা হারাম। এমনিভাবে বিশুদ্ধ উক্তি, প্রসিদ্ধ হাদীস ও খোদ রাসূলে আকরাম (সা)-এর বাণী দ্বারা সদকা হারাম হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। তিনি বলেন ঃ اِنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ "আমরা সাদাকার মাল খাই না।" মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা স্পষ্ট যে, তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া হারাম হওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহার খাওয়ার নিষিদ্ধতা দ্বারা হারাম হওয়া অনিবার্য হয় না। হইতে পারে মাকরূহে তানযীহীর উপর ভিত্তি করিয়া খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, হারামের উপর ভিত্তি করিয়া নহে। মোটকথা,

www.pathagar.com

সাদাকার মাল ভোগ করা হইতে বিরত থাকা বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত। চাই এ নিষিদ্ধতা তাহ্‌রীমী হউক কিংবা তানযীহী। এমনিভাবে নবী (সা)-এর পরিবার-পরিজন এবং দাস-দাসীদের উপরও যাকাত হারাম। যেমনটি ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

ফাইদা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট হইতে তাঁহার যুগে এর বৈধতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এমনিভাবে সেসব বস্তু খাওয়া যাহার মধ্যে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি। যেমনটি হাদীসে আসিয়াছে। এমনিভাবে কবিতা রচনা করা হারাম হওয়ার বিধান। এখানে হারাম হওয়ার কথাটির অর্থ হইল তিনি লেখালেখি ও কাব্য রচনার বিষয়টি জানিতেন। আসল কথা হইল, তাঁহার স্বভাব-প্রকৃতির দিক হইতে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট হইতে দুইটি কাজ সম্পন্ন হইত না। 'সুলহে হুদায়বিয়া' শীর্ষক আলোচনায় ইহার বিশ্লেষণ করা হইবে ইনশাআল্লাহ্। এমনিভাবে যুদ্ধের সময় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ না করিয়াই শরীর হইতে অস্ত্র খুলিয়া ফেলা। এমনিভাবে কিতাবিয়া অমুসলিম নারীর সহিত বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নিষিদ্ধতা। এই জন্যে যে, নবী আকরাম (সা)-এর সমস্ত স্ত্রীই মুসলমানের জননী এবং জান্নাতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী। কাজেই, তাঁহার পবিত্র বীর্য কাফির নারীর জরায়ুতে রাখা যাইতে পারে না। মুসলিম বাঁদীর সহিত তাহাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটিও অনুরূপ। বাঁদী বানাইয়া নেওয়া সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তৃতীয়ত, সেসব বৈধ বিষয় যাহা নবী আকরাম (সা)-এর সহিত নির্ধারিত। যেমন–ঘুমের কারণে উযূ ভঙ্গ না হওয়া। কেহ কেহ বলেন, এই বিধানটি সমস্ত নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর নফল নামাযের বৈধতা। এমনিভাবে বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সাওয়ারীর উপর তাহা আদায় করার বৈধতা। এমনিভাবে গায়েবানা জানাযা। লাগাতার রোযা রাখার বিষয়টি রোযার আলোচনায় আসিবে ইনশা আল্লাহ্। অপরিচিত নারীর উপর দৃষ্টি দেওয়ার বৈধতা ও অপরিচিত নারীর সহিত নির্জনবাস, চারের অধিক নারীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বৈধতা।

এমনিভাবে অন্যান্য নবী (আ)-এর জন্য এবং আমাদের নবী (সা)-এর জন্য নয়টির চাইতে বেশী বিবাহ বৈধ। এমনিভাবে সাধারণ নারীরা অভিভাবক ও সাক্ষী ব্যতীত শুধু নিজকে হিবা করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হইয়া যায় এবং মহর চাইতে পারে না। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সা)-এর পক্ষ হইতে 'নিকাহ' অথবা 'তাযাওউজ' (বিবাহ) শব্দ উল্লেখ করা আবশ্যক। (অর্থাৎ নারী নিজেকে হিবা করিয়া দিবে এবং বিবাহ সংক্রান্ত কোন শব্দ বা শর্ত ব্যবহার না করিলেও তাহা না করিতে পারে। কিন্তু নবী (সা)-এর জন্য আবশ্যক যে, তিনি অবশ্যই 'নিকাহ' বা 'বন্ধন' শব্দ উল্লেখ করিবেন। যাহাতে শরঈ ইজাবত পাওয়া যায়।) নবী (সা)-এর জন্য বৈধ ছিল যে, তিনি যে কোন নারীকে যে কোন পুরুষের সঙ্গে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিংবা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়া দিবেন। নারীর সন্তুষ্টি ব্যতীত বিবাহ দিয়া দেওয়ার অধিকার বলে নবী (সা) যদি স্বামীহারা কোন বিধবা নারীকে নিজের বিবাহে আবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করিতেন, তবে ঐ নারীর উপর অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইত তাহা

www.pathagar.com

মানিয়া নেওয়া। অন্য কেহ যদি উহাকে চায়-ও তাহা তাহার জন্য হারাম হইবে। আর যদি তাহার স্বামী থাকিয়া থাকে, তবে স্বামীর উপর ফরয হইবে, তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া। কেননা, এখানে তাহার ঈমানের পরীক্ষা। যেমন রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَاَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

"তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট তাহার, তাহার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা বেশী ভালবাসার পাত্র হই।" কাজেই, ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যাহার নিকট খাবার ও পানীয় আছে এবং তাহা তার নিজের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনও আছে। কিন্তু নবী (সা)-এর যখন তাহা প্রয়োজন হইবে, তখন তাহা নবীর উপর ব্যয় করিতে হইবে। সে নিজেকে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্য কুরবান করিয়া দিবে। কেননা, اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ নবী কারীম (সা) তাহাদের জান-প্রাণ অপেক্ষা বেশী হকদার। হযরত যায়দ (রা) ও হযরত যায়নব (র)-এর ঘটনার উদ্দেশ্যও তাহাই। এই ঘটনার সারকথা হইল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সায়্যিদে আলম (সা)-এর সহিত হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং হযরত যায়দ (রা)-এর মনের মধ্যে যায়নব (রা)-এর পক্ষ হইতে অপসন্দনীয় ভাব সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা যাহাতে ভুল বোঝাবুঝির খপ্পরে না পড়িয়া যায়, তাই তাহা প্রকাশ করিতে আশংকাবোধ করিতেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন, "হে মাহবূব! তুমি আমার ভয়ই মনের মধ্যে রাখ। মহান আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী কিছু করিও না। মানুষদের নিকট কিসের ভয়?" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে ঘরে উঠাইয়া আনিলেন। কোন কোন তাফসীরকারক এবং জীবনী প্রণেতা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, নুবুওয়াতী মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এমন কাজ উপযোগী নহে। প্রকৃত গবেষকগণ এ ধরনের মন্তব্যকে মুফাস্সিরগণের প্রমাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম ও মিসরের অধিপতির স্ত্রী যুলায়খা এবং হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম এবং উরিয়ার ঘটনা। আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের মর্যাদাগত অবস্থান এর চাইতে আরও অনেক উর্ধ্বে। আযাদ অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেওয়াকে মহরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেওয়া যেমনটি ঘটিয়াছিল হযরত সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ক্ষেত্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের খোরপোশ তাঁহার উপর ওয়াজিব ছিল কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। আল্লামা নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বিশুদ্ধ মতে তাহা ওয়াজিব ছিল। এমনিভাবে বলা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে পালাক্রম বজায় রাখা ওয়াজিব ছিল না। অধিকাংশ হানাফী আলিম এ মতেরই প্রবক্তা। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে পালাক্রম নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা ছিল অনুগ্রহ মাত্র, বাধ্যতামূলক নহে।

www.pathagar.com

উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য একত্রিত করার কারণ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে বিবাহ বাঁদীর বিবাহের বিধানভুক্ত এবং সমস্ত মহিলা ও পুরুষগণ বাঁদী ও গোলামের পর্যায়ে। বাঁদী, তলোয়ার ইত্যাদি গনীমতের মাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহা গ্রহণ করা বৈধ ছিল। তাঁহার জন্য পবিত্র মক্কায় সশস্ত্র জিহাদ ও ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ ছিল। পবিত্র মক্কা বিজয় অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ এর বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বর্ণনা আসিবে।

তাঁহার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিল, তিনি নিজ ইল্ম্ দ্বারা নিজের জন্য ও তাঁহার সন্তান-সন্ততির জন্য নির্দেশ দিতেন এবং নিজের জন্য ও নিজের সন্তানের জন্য তাঁহার সাক্ষ্য ব্যবহার করিতেন। কাউকে মন্দ বলা, অভিসম্পাত করা তাঁহার জন্য বৈধ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্য ইহাও ছিল যে, পবিত্র মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি ভূমি বন্টন করিয়া দিতেন। কেননা, মালিকুল মুলক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সমস্ত ভূমি ও রাজত্বের মালিক বানাইয়া দিয়াছেন। ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন জান্নাতের ভূমি বণ্টন করিতেন, তো দুনিয়ার ভূমি বণ্টন করার বিষয়টি তো সহজেই অনুমেয়।

مالك كونين ہیں پاس كچه ركهتے نہیں

"দুই জাহানের মালিক তিনি, নিজের জন্য তিনি কিছুই রাখেন না।"

গুণাবলী ও বিভিন্ন অবস্থার বিশেষত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেইসব বিশেষত্ব যাহা আহকামের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং গুণাবলী তাহা বিভিন্ন অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সেইগুলির কোন হিসাব ও সংখ্যা নির্ধারিত নাই। বিশেষ করিয়া ওই গুণাবলী ও অবস্থাসমূহ যাহা আধ্যাত্মিকতার সহিত সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডারেও পৌঁছাইতে পারে নাই। ইহার মধ্য হইতে কিছু বাহ্যিক গুণ উল্লেখ করা হইল। কেননা, উলামায়ে কিরাম এইগুলি গুণিয়া একত্র করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত মু'জিযা এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত যাহা কোন নবীর নিকট প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু সেগুলির সংখ্যাধিক্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে তাহা নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে উন্নত ও পরিপূর্ণ মর্যাদা হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার 'রূহ' মুবারককে অন্যান্য সকল 'রূহ'-এর পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তাঁহার এই 'রূহ' হইতে সমস্ত 'রূহ' সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত আদম আলায়হিস সালাম রূহ ও শরীরাকৃতির মধ্যে থাকা অবস্থায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নবী। যেমন তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রূহ জগতেও সমস্ত নবী আলায়হিমুস সালামের পবিত্র রূহগুলিকে তাঁহার রূহ বরকতপূর্ণ করিয়া দিলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহের সূর্য অদৃশ্যের অন্তরালে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি তাঁহার আলো দ্বারা আলোকিত

www.pathagar.com

হইয়া বিশ্বজগতে ঝলমল করিতেছিলেন। তাঁহার নুবুওয়াতের সূর্য উদিত হইয়া যখন প্রকাশ পাইল, তখন তাহারা চেহারা ঢাকিয়া লুকাইয়া পড়িল। বিষয়টি ঠিক এমন, যেমন রাতের বেলার উদিত নক্ষত্ররাজির রং ও রূপ ঝকমক করে, আর যখনই সূর্য উদিত হইয়া চকমক শুরু করিয়া দেয়, তখন তাহা ম্লান হইয়া লুকাইয়া পড়ে। হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রূহ জগতে আমি সবার অগ্রে আর অস্তিত্বের জগতে সবার পশ্চাতে। তাঁহার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে ইহাও একটি যে, তিনিই ওই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'আলাসতু'-এর দিন প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন এবং তিনিই ওই প্রথম ব্যক্তি যিনি ওই দিন সবার আগে 'হ্যাঁ' বলিয়াছেন। হাদীস শরীফে এমনই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, আদম আলায়হিস সালামসহ সারা বিশ্ব জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই তাঁহার অস্তিত্ব প্রদান করা। তাঁহার বরকতময় নাম আরশের উপর, জান্নাতের দরজায় এবং তার প্রতিটি জায়গায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অন্য নবীদের নিকট হইতে তাঁহার ব্যাপারে এই অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যখন দুনিয়ায় আবির্ভূত হইবেন, তখন তাঁহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ ইরশাদে তাহাদের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ "আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবর অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন।" যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আরও বিশেষত্ব হইল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিতে তাঁহার আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার উর্ধ্বতন বংশ পরম্পরায় হযরত আদম আলায়হিস সালাম পর্যন্ত কাহারও মধ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হয় নাই। যেমনটি প্রাগৈসলামিক যুগের অভ্যাস ছিল। 'আবির্ভাব মুবারক' সম্পর্কীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা আসিবে ইনশাআল্লাহ্। প্রত্যেক যুগেই আদম সন্তানদের সর্বোত্তম যুগে উঠানো হইয়াছে এবং সর্বোত্তম গোত্রের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস সালামের সন্তান-সন্ততি হইতে বনী কিনানাকে নেতৃত্ব দান করিলেন। বনী কিনানার মধ্য হইতে কুরায়শকে এবং কুরায়শ হইতে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিম হইতে আমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন। কাজেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নেতৃত্বশীলগণের নেতা, উত্তমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নির্বাচিতগণের মধ্যে বাছাইকৃত। তাঁহার জন্ম মুবারকের সময় সমস্ত ভূতপেরেত মাথানত করিয়া পড়িয়া যায়। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন খতনাকৃত, নাভি বিচ্ছিন্ন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিজদা করিলেন। দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে। শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়াছিল। তাঁহার মাতা সায়্যিদা আমিনা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে একটি নূর হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, যাহার কারণে সিরিয়ার সমস্ত দালানকোঠা আলোকিত হইয়া গেল। ফেরেশতাগণ তাহার দোলনা দুলাইয়া দিল। দোলনায় অবস্থানকালেই তিনি কথা বলিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, দোলনার মধ্যে থাকা অবস্থায় চাঁদ তাঁহার সঙ্গে কথা বলিত। চাঁদকে যে দিকে ইঙ্গিত করা হইত, ঝুঁকিয়া যাইত। তাহার আরও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হইল, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দিত। অবশ্য

www.pathagar.com

এটা সব সময়ই নহে, অধিকাংশ সময় এমনটি হইয়াছে। শিশুকালে তাঁহার চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে যখন তিনি সফরে ছিলেন, তখন বাহিরা পাদ্রী তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলে।

তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার বিষয়টি আরেকটি বৈশিষ্ট্য। চারিবার এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমবার বনী সা'আদের গোত্রে অবস্থানকালে শিশুকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। দশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার সংঘটিত হইয়াছিল। তৃতীয়বার সংঘটিত হইয়াছিল নুবুওয়াত প্রকাশের সময়। আর শবে মি'রাজের সময় চতুর্থবার বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ঘটে। তাঁহার নিকট সর্বপ্রথম জিবরাঈল আলায়হিস সালাম ওহী নিয়া আসার সময় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরার বিষয়টি এবং তাঁহার অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার বিষয়টিকেও অনেকে তাঁহার বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অন্য কোন নবীর সহিত এমনটি হয় নাই। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে তাঁহার প্রতিটি বরকতময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন তাঁহার পবিত্র কলবের উল্লেখ এ আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে ঃ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ "জিবরাঈল আমীন তাঁহার পবিত্র কলবের উপর তাহা নিয়া অবতীর্ণ হইতেন।" অন্য আয়াতে তাঁহার 'জিহবা' মুবারকের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ "অবশ্যই তোমার ভাষায় আমি কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি।" আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى 'তিনি তাঁহার নিজের হইতে কিছু বলিতেন না।" তাঁহার চোখের উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।" চেহারার উল্লেখ পাওয়া যায় এই আয়াতে ঃ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِ "আসমানের দিকে বারবার তোমার চেহারা ফিরানোকে আমি দেখিয়াছি।" ঘাড় ও হাত মুবারকের উল্লেখ রহিয়াছে- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না"-এর মধ্যে। বুক ও পিঠ মুবারকের উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে ঃ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ "আমি কী তোমার কল্যাণে তোমার বুক প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার (বোঝা)। যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।" এ আয়াতগুলিতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করা তাঁহার প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ বহন করে। তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল- আল্লাহ্ তা'আলা নিজের গুণবাচক নাম 'মাহ্মূদ' শব্দ হইতে তাঁহার নাম 'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' শব্দ দুইটি তৈরী করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এই নাম আর কাহারও রাখা হয় নাই। হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

وشق له من اسمه ليجليه
وذو العرش محمود وهذا محمد

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজের নামের শোভা বর্ধনের জন্য তাহা ফাটাইয়া এ নামটি বাহির করেন। তিনি হইলেন আরশের অধিপতি 'মাহমূদ'। আর (শোভাবর্ধনকারী) এই নামটি হইল 'মুহাম্মদ'।"

কেহ কেহ বলেন ঃ এ পংক্তিটি মূলতঃ হযরত আবূ তালিবের রচিত। 'তারীখে সগীর' নামক গ্রন্থে বুখারী (র), এমনই লিখিয়াছেন। তাঁহার আরও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রহিয়াছে– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বেহেশ্তী খাবার খাওয়াইয়াছেন এবং পানীয় পান করাইয়াছেন। সাওমে বেসাল (লাগাতার রোযা)-এর আলোচনায় তাহা আসিবে ইনশাআল্লাহ্। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে যেমনি দেখিতেন, ঠিক পেছনের দিকেও তেমনি দেখিতেন। রাতের অন্ধকারে তেমনই দেখিতেন, যেমনটি দেখিতেন আলোকদীপ্ত দিনে। আরও বৈশিষ্ট্য, তিনি যখন পাথুরে ভূমিতে চলিতেন, পাথরের মধ্যে পায়ের ছাপ অঙ্কিত হইয়া যাইত। যেমন মাকামে ইবরাহীম আলায়হিস সালামের মধ্যে পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। অকাট্যভাবে কুরআনে কারীমের মধ্যে তাহা উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার উভয় কনুর চিহ্ন পবিত্র মক্কার পাথরে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার ঘোড়ার খুরের চিহ্ন পবিত্র মদীনা শরীফে মু'আবিয়া গোত্রের মসজিদে অঙ্কিত আছে। তাঁহার মুখের লালা লবণাক্ত পানিকে মিষ্টি করিয়া তুলিত এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধের কথা ভুলাইয়া দিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বগলের বর্ণ ছিল শুভ্র ও লালচে। এতে কোন পশম ছিল না। আর তাহা পবিত্র দেহের বর্ণ হইতে ভিন্নও ছিল না। ইহাতে কোন গন্ধও ছিল না। ইস্তিস্কার হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় উভয় হাত এ পরিমাণ উপরে উঠাইতেন যে, তাহার বগলের নিচের শুভ্রতা দেখা যাইত। আবার কেহ কেহ বলেন, বগল শুভ্র হওয়ায় এ কথা আবশ্যক হয় না যে, সেখানে পশম ছিল না। কেননা, যেখান হইতে পশম উপ্‌ড়ে ফেলা হয়, ওই জায়গাটি শুভ্রই হইয়া থাকে। বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বগলের পশম উপড়াইয়া ফেলিতেন।

আবার কোন কোন হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আকরাম খুযাঈ বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত নামায পড়িলাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন তাঁহার বগলের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। হাদীসের মধ্যে غفره ابطين শব্দ আসিয়াছে। তিনি বলেন, একেবারে ধবধবে শুভ্রতাকে غفره বলা হয় না, বরং মেটে রং-কে বলা হয়। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার বগলে পশম বিদ্যমান ছিল। ওই স্থানটিকেই غفر। বলা হয়, অন্যথায় পশমশূন্য অঙ্গকে غفر। বলা হয় না। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার মধ্যেও এমনটি বর্ণনা করা হইয়াছে। হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই এ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ শান যে, তাঁহার বগলে অপসন্দনীয় কোন গন্ধ ছিল না, বরং পবিত্র ও সুঘ্রাণ ছিল। যেমন বুখারীতে বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আওয়ায মুবারক এতদূর পর্যন্ত পৌঁছাইত, যতদূর তাঁহার আওয়ায ছাড়া অন্য কাহারও আওয়ায পৌঁছিত না। আর তাঁহার চোখ দুইটি ঘুমাইলেও অন্তর কিন্তু ঘুমাইত না। বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার পাশে কথা বলিত

www.pathagar.com

তিনি তাহা শুনিতেন। ইহাই হইল এ মাসআলার ভিত্তি যে, ঘুমের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উযূ ভাঙ্গতো না। কেহ কেহ বলেন, ঘুমের কারণে উযূ না ভাঙ্গার বিষয়টি সকল নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে 'লায়লাতুত-তা'রীস'-এর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সূর্যোদয়ের বিষয়টি কেন জানিলেন না ? যাহার কারণে ফজরের নামায কাযা পড়িতে হইয়াছে। ইহার জবাব হইল এই যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া চোখের কাজ। চোখ যখন ঘুমাইয়া ছিল, তখন তাহা জানা যায় নাই। আর অন্তরে এ কৌশলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ওহী প্রত্যাদিষ্ট হয় নাই, যাহাতে কাযা নামায পড়ার বিধান শরীয়াতসম্মত হইয়া যায়। কিংবা এমন কোন কারণে যাহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও হাই তোলেন নাই। ইব্ন আবী শায়বা ও বুখারী তাঁহার 'তারীখ' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও হাই না তোলার বর্ণনাও রহিয়াছে। যেহেতু কোন নবীই হাই তোলেন নাই, তাই এ বর্ণনাটি বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত এ বর্ণনাটি ইহা সমর্থন করে যে, হাই তোলার কাজটি শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরে কখনও কোন মশা বসে নাই। আর তাঁহার কাপড়-চোপড়েও কখনও উকুন পড়ে নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কখনও স্বপ্নদোষও হয় নাই। অন্য কোন নবীরও হয় নাই, তাবরানী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্ধৃত আছে যে, স্বপ্নদোষও শয়তানের কারণে হইয়া থাকে। কোন কোন রেতপাতকে বৈধ রাখিয়াছেন। কেননা, হইতে পারে শারীরিক কারণে এমন হইয়া থাকে, শয়তানী স্বপ্নের কারণে নহে। অন্য এক জায়গায় ইহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

তাঁহার বুকের সুঘ্রাণ মিশ্কে আম্বর অপেক্ষা অধিক বেশী ছিল। যমীনের মধ্যে তাঁহার ছায়া পড়িত না। কেননা, যমীন (ভূমি) হইল দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতার স্থান। সূর্যের আলোতে কখনও তাঁহার ছায়া দেখা যায় নাই। আলিম সমাজের এ কথাটি খুব আশ্চর্য ও বিরল যে, তাহারা বাতির আলোর কথা উল্লেখ করেন নাই। লম্বা এক হাদীসের মধ্যে রাত্রের নামাযের পর দু'আ পড়ার কথা বর্ণিত আছে। কোন কোন শায়খ ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে দু'আটি পড়েন। এ দু'আর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুনাজাত করিতেন যে, "হে আল্লাহ্! সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চতুর্দিকে নূর দান কর।" দু'আর শেষাংশে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا "আমাকে নূরে পরিণত করিয়া দিন"। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই ছিলেন নূর, আর নূরের তো ছায়াই হয় না। তিনি যখন লম্বা গড়নের লোকদের সঙ্গে চলিতেন, তখন তাঁহাকে সবার চাইতে লম্বা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার কাপড়-চোপড়ে কখনও কোন মশা-মাছি বসে নাই। যেমনটি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বর্ণনা করিয়াছেন। কাপড়-চোপড়েই যেহেতু মশা-মাছি বসে নাই, তো তাঁহার দেহ মুবারকে তো তাহা বসার প্রশ্নই ওঠে না। বিচ্ছু কখনও তাহাকে দংশন করে নাই। আর ছারপোকাও কখনও তাঁহার রক্ত চোষে নাই। ইহাই উলামায়ে কিরামের বক্তব্য। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য তাহার শরীরে কোন উকুন ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে كَانَ يَفْلِىْ ثَوْبَه "তিনি তাহার কাপড়ে উকুন

www.pathagar.com

দেখিতেন।" মূলতঃ এখানে উকুন দেখা উদ্দেশ্য নহে। (বরং উম্মতের শিক্ষার জন্য তাহা করিয়াছেন। যাহাতে ইহার উপর আমল করিয়া উম্মত ছাওয়াবের অধিকারী হয়।) তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার আবির্ভাবের সময় জ্যোতিষী ও শয়তানদের আসমান হইতে চুপিসারে তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আসমানকে সংরক্ষিত করা হইয়াছিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন ঃ শয়তানরা আসমান হইতে দূরে কোথাও লুকাইয়া ছিল না। আসমানের সহিত ঘেঁষিয়া থাকিয়া তাহারা চুপিসারে অনেক তথ্য নিয়া আসিত। তাহারা তাহা আনিয়া সেই জ্যোতিষীদের কানে ভরিয়া দেয়, যাহাদের আত্মা শয়তানের আত্মার মতই নোংরা ছিল। শয়তানের সহিত তাদের সম্পর্ক ছিল অশরীরী। জ্যোতিষীরা শয়তান হইতে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া ইহার সহিত নিজের পক্ষ হইতে আরও কিছু মিথ্যা বিষয় মিলাইয়া শুনাইত। নবীগণের পবিত্র রূহের সহিত যেমন ফেরেশতাগণের সম্পর্ক থাকে, তেমনি সম্পর্কের কারণে তাহারা ওহী ও সত্য তথ্যসমূহের অবতরণের স্থানে উপস্থিত হইয়া যাইত। যখন হযরত সায়্যিদুস-সা'দাত ফখরে মাওজুদাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইলেন, তখন শয়তানদেরকে আসমানে আরোহণ ও প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জন্মের বরকতে তিন আসমান হইতে শয়তানকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের বরকতে সমস্ত আসমান হইতেই শয়তানের বিচরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যখনই কোন শয়তান আসমানের উপর আরোহণের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন আগুনের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ নক্ষত্র দ্বারা তাহাদেরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এ নক্ষত্র কখনও বিফলে যায় না। কোন শয়তানকে হয়তো জ্বালাইয়া দেয়, আবার কাহারও চেহারা ঝলসাইয়া দেয়। আবার কাহারও কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অকেজো বানাইয়া দেয়। ফলে এদের বিবেক বিকৃত ও নষ্ট হইয়া যায়।

ফাইদা

এই যে শয়তানরা দুষ্টুমি করে, বনে-জঙ্গলে একাকী পাইলে মানুষকে ভেংচি দেয়, ভয় দেখায়– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে এইগুলি ছিল না। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে এগুলি কেহ বর্ণনাও করে নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের প্রাথমিক যুগ হইতে তাহা দেখা দিতে লাগিল। ইহা ছিল তাঁহার নুবুওয়াতের মূলভিত্তি। হযরত মু'আম্মার বর্ণনা করেন ঃ আমি যুহ্‌রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইসলাম-পূর্ব যুগেও কী নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হইত? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তবে ইহার মধ্যে কঠোরতা করা হইয়াছে ওই সময় হইতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইলেন। 'কিন্তু ইব্‌ন কুতায়বা বলেন ঃ আগুনের স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে মারার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতে ইহাকে আরও কঠোর করা হইল। আসমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হইল। কেহ কেহ বলেন ঃ পূর্বেও নক্ষত্র খসিয়া পড়িত এবং শয়তানকে নিক্ষেপ

www.pathagar.com

করা হইত। কিন্তু পূর্বের জায়গায় তাহা আবার ফিরিয়া যাইত। ইমাম বাগাবী (র) তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

একটি বৈশিষ্ট্য হইল,ইসরা রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য লাগামসহ বোরাক লওয়া হইয়াছে। উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ অন্য নবীগণ এতদিন বুরাকের নাঙা পিঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, অন্য নবীগণের জন্যও বোরাক ছিল। বর্ণনাসমূহে এমনই আসিয়াছে। কিন্তু কথা হইল, অন্য নবীগণের জন্যও কী এই একই বোরাক ছিল, যাহার উপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরোহণ করিয়াছিলেন, নাকি শ্রেণী মোতাবেক প্রত্যেক নবীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বোরাক ছিল ?

মি'রাজ সম্পর্কীয় হাদীসে আসিয়াছে– "বোরাক যখন অস্বাভাবিক নড়াচড়া ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করিতে চাহিল, তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বোরাককে বলিলেন, আরামের হইতে থাক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মত তোমার আর কোন আরোহী হয় নাই।" এ কথাটি প্রথমোক্ত কথার উপর প্রমাণ বহন করে। (মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।) আর বোরাক রাতারাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকসায় নিয়া গিয়াছে; সেখান থেকে সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত নিয়া গিয়াছে এবং আয়াতে কুবরা অর্থাৎ বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখানো হইয়াছে। আর তাঁহার বরকতময় দৃষ্টিকে অন্য কিছু হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।" তাঁহার জন্য সমস্ত নবীকে উপস্থিত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের সবার এবং ফেরেশ্তাদের ইমামতী করেন। তাঁহাকে বেহেশ্তে ভ্রমণ করানো হইয়াছে এবং দোযখ দেখানো হইয়াছে। তাঁহাকে এমন জায়গা পর্যন্ত নেওয়া হইয়াছে, যেখানে কাহারও জ্ঞান পৌঁছাইতে পারে না। স্বচক্ষে তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে দর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য কথোপকথন ও দর্শন একত্র করিয়াছেন। এ জগতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৌন্দর্য প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিল। কোন ফেরেশ্তা, নবী ও ওলীর এই মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেখানে মাথা রাখিতেন এবং চল্লিশ কদম হাঁটিতেন, সেখানে ফেরেশতা তাঁহার পিঠ মুবারকের পেছনে চলিত। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বলিতেন, তোমরা আগে চলো আর আমার পেছনকে ফেরেশ্তাদের জন্য ছাড়িয়া দাও। ফেরেশ্তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নিতেন। যেমনটি বদর ও হুনায়ন যুদ্ধে হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমেও ইরশাদ হইয়াছে। তাঁহাকে পরাক্রমশালী একটি গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআনে কারীম দেওয়া হইয়াছে। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তিনি কাহারও নিকট কোন কিছু পড়েন নাই, কোন মাদ্রাসায় যান নাই, কোন আলিমের সাহচর্যও গ্রহণ করেন নাই। এর দ্বারা বুঝা যায় উম্মিয়ত (নিরক্ষরতা) তাঁহার পবিত্র সত্তার সহিত নির্ধারিত বিষয়। কেননা, তিনি উলুহিয়াতের প্রকাশক এবং তিনি কোন প্রকার মাধ্যম ও ওসীলার মুখাপেক্ষী নন।

তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার কিতাব কুরআনে কারীমকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতি হইতে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। তবু অনেক নাস্তিক, যিন্দীক, মুআত্তিল' (আল্লাহ্কে

www.pathagar.com

নিষ্কর্মা বলিয়া বিশ্বাসী) ও কারামিত্বা (শিআদের কট্টর ফেরকা বিশেষ, যাহারা হযরত আলী (রা)-কে খোদা মান্য করে) সম্প্রদায়ের লোকেরা আরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃত করার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, ইহাতে সফল হইতে পারে নাই। ইহার একটি শব্দ, এমনকি একটি অক্ষর পর্যন্ত পরিবর্তন-বিকৃত করিতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ "কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না– সামনের দিক হইতেও নহে, পেছনের দিক হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসাহ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ।" (সূরা হা-মীম-আস-সিজদা ঃ ৪২)।

এই গ্রন্থে সেইসব বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ রহিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থসমূহে ছিল। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী যুগের তথ্যসমূহ, পূর্ববর্তী উম্মতদের বিভিন্ন অবস্থা ও তাহাদের সেইসব আহকাম ও শরীআত দ্বারা সমৃদ্ধ, যেগুলির আজ কোন নাম-নিশানও নাই। আহ্লে কিতাবদের মধ্যে মাত্র দুইএকজন এমন আছে, যাহারা পড়িতে পড়িতে ও পড়াইতে পড়াইতে গোটা জীবন কাটাইয়া দিয়াছে, তাহারা ইহার সামান্য অবস্থা সম্পর্কেই অবগত হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তকরণ বিষয়ক আলোচনা এবং ইহার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা ও বর্ণনা মু'জিযার অধ্যায়ে আসিবে ইনশাআল্লাহ্। এই গ্রন্থকে উম্মতের যে কেহ ইচ্ছা করিবে মুখস্থ করার জন্য একেবারেই সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহের কোন গ্রন্থই কেহ মুখস্থ করিতে পারে নাই। বিরাট কোন দলের মুখস্থ করার তো প্রশ্নই আসে না। বছরের পর বছর ও শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পরও শিশু ও যুবকদের জন্য কুরআনে কারীম আজও এমন সহজসাধ্য যে, সামান্য সময়ে ইহাকে মুখস্থ করিয়া নিতে পারে। সহজসাধ্যতা, মর্যাদা, অনুগ্রহ ও ইহার সম্মানের কারণে 'সাত হরফের উপর' একে নাযিল করা হইয়াছে। মিশকাত শরীফে এ সাত হরফের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কুরআন সর্বদাই চিরস্থায়ী মু'জিযা। চিরন্তনকাল তাহা থাকিবে। জান্নাতীরা জান্নাতে তাহা তিলাওয়াত করিবে। ইহার মাধ্যমে মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নয়ন সাধন করিবে। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ رَتِّلْ وَارْتَقِ অর্থাৎ তাহারা তিলাওয়াত করিবে এবং মর্যাদার সিঁড়িতে আরোহণ করিবে। সমস্ত নবীর মু'জিযা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মু'জিযার তথ্যগত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই বাকী নাই। কিন্তু কুরআনে কারীম এমন মু'জিযা যে, ইহার নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ "এ কুরআন আমিই নাযিল করিয়াছি এবং আমি নিজেই ইহার হিফাযতকারী।" (সূরা হিজর ঃ ৯)। তাওরাত ও ইনজীলের হিফাযতের বিষয়টি নবী ও পাদ্রীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে তাহাতে বিকৃতির রাস্তা খুলিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা চাহিলেন, কুরআন সংরক্ষিত থাকুক। তাই সাহাবায়ে কিরামকে আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া দিলেন, যাহাতে এ কথা না বলা যায় যে, যখন আল্লাহ্ ইহার হিফাযতকারী ছিলেন তখন সহীফার মধ্যে তাহা এইভাবে সংকলন করার

www.pathagar.com

কি দরকার ছিল। কোন কোন শাফিঈ বলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কুরআনে কারীমের প্রতিটি সূরার অংশ হওয়ার পক্ষে এখানে শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান আছে। কেননা, কুরআনে কারীমে একে বহাল রাখা হইয়াছে। অন্যথায় তাহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে ধরা হইবে। আবার হ্রাস করার ধারণাও সৃষ্টি হইতে পারে। ইহার জওয়াব হইল– প্রত্যেক সূরার শুরু দিয়া 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিপিবদ্ধ করা সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিতে হইয়াছে। আর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাযিল হইয়াছে সূরাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। কেননা, পরবর্তী আলিমগণের কেহ কেহ সূরাসমূহের নামসমূহ এবং আয়াতগুলিকেও গণনার মধ্যে ধরিয়াছেন। আর ইহাকে এমন 'পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের' মধ্যে ধরা হয় না, যাহার দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে। কুরআনে কারীমের হিফাযতের জন্য মানুষের কালাম (কথাবার্তা) হইতে একেবারেই ভিন্ন ও মু'জিয হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এমনকি কেহ যদি সামান্যও কম-বেশী করে, তাহলে ইহার ছন্দপতন হইয়া যায়। সবাই তখন জানিয়া ফেলে যে, এটা কুরআনে কারীমের শব্দ নহে। মানুষের ইহা মুখস্থ করার বিষয়টিও ইহাকে হিফাযতের উপকরণের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি বড় ধরনের প্রভাবশালী কোন ব্যক্তিও যদি একটি অক্ষর কিংবা একটি নোকতার কমবেশ করে, তখন ছোট শিশু হইতে নিয়া যুবকরা পর্যন্ত ইহার ভুল ও পরিবর্তিত দিকটি ধরিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, আমানার রাসূলু অর্থাৎ সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। এই আয়াতগুলি আরশের নীচে রক্ষিত ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইয়াছে। অন্য কোন নবীকে তাঁহার সমপরিমাণ নিদর্শন দেওয়া হয় নাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হইয়াছে। ইহার বাহ্যিক অবস্থা এই যে, পারস্য ও রোমের ভাণ্ডারগুলি সাহাবায়ে কিরামের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে। আর ইহার অন্তর্নিহিত অবস্থা এই যে, এই ভাণ্ডার দ্বারা উদ্দেশ্য বিষয়ের বিভিন্ন প্রকার। কেননা, সমস্ত রিযক তাঁহার হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক তারবিয়্যাত ও শক্তি তাহাকে দান করা হইয়াছে। যেমনিভাবে গায়বের চাবি আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি ছাড়া ইল্‌মে গায়ব (অদৃশ্যের জ্ঞান) আর কেহ জানেন না। তাহাদের রিযক ও বন্টনের ভাণ্ডার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَالْمُعْطِىْ هُوَ اللّٰهُ "আমি হইলাম বন্টনকারী আর আল্লাহ্ হইলেন দাতা।" রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি সমস্ত মানুষের প্রতি আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি রাসূলে সাকলায়ন অর্থাৎ জিন্ন ও মানব উভয় জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। আবার কোন কোন ফেরেশতার প্রতিও এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিও তিনি প্রেরিত। এমনকি তাহারা তাঁহার রিসালাতের সাক্ষ্য দিত। গাছ-গাছালী ও জড় পদার্থ পাথরও তাঁহার প্রতি সালাম নিবেদন করিত।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত মানুষের প্রতি আবির্ভাব হওয়ার বিষয়ে হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালামের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নূহ আলায়হিস্

www.pathagar.com

সালামের তুফানের পর শুধুমাত্র ওই ঈমানদাররাই বাকী রহিয়া গিয়াছিল, যাহারা নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। তাহাদের ছাড়া দুনিয়ার বুকে আর কেহ বাকী ছিল না। তবে কী তাঁহার আবির্ভাবও সবার জন্য? এর জবাবে শায়খ ইব্‌ন হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহ আলায়হি বলেন ঃ হযরত নূহ্ আলায়হিস সালামের এ ব্যাপক রিসালাত তাঁহার আবির্ভাবের আওতায় ছিল না। বরং তুফানের কারণে হঠাৎ দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় এমনটি হইয়াছে। আর মানুষেরা সবাই ঈমানদারদের দলভুক্ত হইয়াই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালতের ব্যাপকতা আবির্ভাবের মূলে ও তাঁহার শুরুতেই ছিল।

মিসকীন বান্দা (অর্থাৎ মাদারিজুন নুবুওয়াত গ্রন্থের লেখক শায়খ মুহাক্কিক মুহাদ্দিস আবদুল হক দেহলবী) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পুরা মাখলূকের প্রতি আবির্ভাব হওয়ার ব্যাপকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য, আরব-অনারব তথা সারা বিশ্ব তাঁহার রিসালাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন, হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসে আসিয়াছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীই বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার আবির্ভাব যে কোন লালবর্ণ ও কালো বর্ণের (আরব-অনারব) মানুষের প্রতি। লালবর্ণ দ্বারা অনারব এবং কালো বর্ণ দ্বারা আরবকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, আরবরা কালো ও সবুজ বর্ণের দিকে ধাবিত থাকে।

কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ "নিশ্চয় নূহকে আমি তাহার নিজ গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিয়াছি।" ছোট দলকে 'কাফ্‌ফাতুন-নাস' বলা হয় না। যদিও দুর্ঘটনার কারণে শুধু এ পরিমাণ মানুষ বাকী ছিল, যাহা শায়খ ইব্‌ন হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ব্যাখ্যার অনুরূপ। আর এ প্রশ্নও উঠানো হইয়াছে যে, হযরত নূহ আলায়হিস সালাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য ধ্বংসের দু'আ করিয়াছিলেন। ঈমানদার ছাড়া যাহারা তাহার নৌকায় ছিল, তাহার বদ দু'আয় সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তিনি যদি তাহাদের প্রতি প্রেরিত নাই হইতেন, তবে তাহাদেরকে ধ্বংস করা হইল কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا "যতক্ষণ না আমি রাসূল প্রেরণ করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শাস্তি দেই না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)। নিঃসন্দেহে শাফা'আতের হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি প্রথম রাসূল ছিলেন। তো এর জবাবে বলা হইয়াছে, সম্ভবত হযরত নূহ আলায়হিস সালামের তাওহীদের দাওয়াত ওই লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কেননা, তাঁহার বয়স এ পৃথিবীতে অনেক দীর্ঘ (অর্থাৎ তুফানের পূর্বে সাড়ে নয়শত বছর) ছিল। হযরত নূহ আলায়হিস সালামের উম্মত শিরকের উপর খুব বাড়াবাড়ি করার কারণে শাস্তির উপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। শায়খ ইব্‌ন দাকীক আল-ঈদ বলেন ঃ কোন কোন নবীর ক্ষেত্রে তাওহীদের বিষয়টি ব্যাপক। আর শরীআতের শাখাগত বিধানগুলি ব্যাপক নহে। এই জন্য কোন কোন নবী শিরক করার কারণে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। যেমন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ সম্ভবত হযরত নূহ আলায়হিস সালামের সমসাময়িক যুগে তিনি ছাড়াও অন্য কোন নবী প্রেরিত হইয়াছেন। আর হযরত নূহ আলায়হিস সালাম তাহা

www.pathagar.com

জানিতে পারিলেন যে, তাহারা তাহার উপরও ঈমান আনে নাই। এই ভিত্তিতে তিনি শুধু সেইসব ব্যক্তিদের উপর বদ দু'আ করিলেন, যাহারা তাহার উপর ঈমান আনে নাই। চাই তাহারা নিজের গোত্রের হউক, কিংবা ভিন্ন কোন গোত্রের। এ উত্তরটি ভাল। যদি এ কথা প্রমাণ হইয়া যায় যে, তাঁহার যুগে অন্য কোন নবীও প্রেরিত হইয়াছিলেন। অথচ এমন কোন উদ্ধৃতি কোথাও নাই। শুধু সম্ভাবনাই যথেষ্ট নহে। কেহ কেহ বলেন ঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য ব্যাপক প্রেরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা উদ্দেশ্য, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার শরীআতের অবশিষ্ট থাকা। সারকথা, তিনি সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার শরীআত এইভাবেই স্থির থাকিবে। হযরত নূহ আলায়হিস সালাম এবং তাঁহার সমস্ত নবী আলায়হিমুস-সালাম এক সময়কালের জন্য ছিলেন। কেননা, তাঁহার নিজের যুগে অথবা তাঁহার পরে অন্য কোন নবী আসিতেন এবং তাঁহার শরীআতের কিছু অংশ রহিত করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহার শরীআতের রহিত না হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, তিনি শেষ নবী। কোন কোন উহুদীর উক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র আরবদের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন– ভুল ও বিপরীতমুখী একটি উক্তি। যখনই তাঁহার রিসালাতকে মানিবে, তখনই তাহারা রাসূলকে সত্য হিসাবে জানিবে। কেননা, রাসূল কখনও মিথ্যুক হন না। অথচ, তিনি নিজেই দাবী করিতেছেন যে, আমি সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। কাজেই, অবশ্যই তাঁহার এ দাবী সত্য।

রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল– এক মাস দূরত্বে তাঁহাকে প্রভাব ও ভীতি প্রদর্শন করার শক্তি দান করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এক মাস দূরত্বের কথা এই জন্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শহর ও দীনের শত্রুদের শহরগুলোর দূরত্ব ছিল এক মাসেরও বেশী পথ। সাধারণভাবে তিনি এই বিশেষত্ব লাভ করেন। এমনকি তিনি যদি কোন সৈন্য-সামন্ত ব্যতীত একাও কোথাও অবস্থান করেন, তবু এ প্রভাব ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তি বিদ্যমান থাকে। অবশ্য এ বিশেষত্বটি অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে। আর কোন কোন সম্রাটের যদি এই মর্যাদা অর্জিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ভিন্ন কথা। মূলতঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত তাঁহার বিজয় ও মদদ লাভ হইত। যেমনটি যুদ্ধ-বিগ্রহের পর অর্জিত হইয়া থাকে। অবশ্য অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার, শান-শওকত ও আশংকা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি সমস্ত নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সম্রাটেরও তাহা অর্জিত হইতে পারে। কাজেই, ভাল করিয়া বুঝিয়া নিন, তাওফীক মহান আল্লাহ্‌রই হাতে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হইত। অন্য কোন নবীর জন্য এই মর্যাদা লাভ হয় নাই। যুদ্ধ সম্পর্কীয় আলোচনায় বিশেষ করিয়া 'বদরের যুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলা হইবে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার উম্মতের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বৈধ করা হইয়াছে। অথচ এর পূর্বে কোনও নবীর জন্য তাহা বৈধ ছিল না। কাহারও কাহারও জন্য তো জিহাদ করারই অনুমতি ছিল না। আবার কাহারও জন্য জিহাদের নির্দেশ তো ছিল,

www.pathagar.com

কিন্তু জিহাদ দ্বারা অর্জিত সম্পদ গনীমত ভোগ করা বৈধ ছিল না। জিহাদ দ্বারা অর্জিত সম্পদ তাহারা এক জায়গায় একত্র করিয়া রাখিত। আকাশ হইতে আগুন আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিত। গনীমতের সম্পদ এইভাবে জ্বলিয়া যাওয়া ছিল গ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু এ উম্মতে মারহুমার জন্য তাহা বৈধ করা হইয়াছে। উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উম্মতের স্বভাব-চাহিদা মোতাবিক সব কিছু দেওয়া হইয়াছে। এ জন্য যে, তাহাদের দিকে কোন ইচ্ছা ব্যক্ত করা নিজ স্বভাব প্রকৃতিতে তৃপ্তিবোধ করেন। তাই দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া তাহা অর্জন করেন। কাজেই, এমন কিছু চাহিবেন না যার কারণে ওই নি'আমতগুলো হইতে তৃপ্তিবোধ ভোগস্বাদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য ও তাঁহার সমস্ত উম্মতের জন্য গোটা বিশ্বের ভূমিকে সিজদার জায়গা বানাইয়া দিয়াছেন। যে কোন জায়গায় তাহাদের জন্য নামায আদায় করা বৈধ। সিজদার জন্য বিশেষ কোন জায়গা নির্ধারিত করা হয় নাই। তাঁহার ও তাঁহার উম্মতের জন্য মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তায়াম্মুমের বিধান বৈধ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য শরীআতগুলিতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনিভাবে অন্যান্য উম্মতদের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও নামায আদায় করা বৈধ ছিল না। যেমন গির্জা, উপাসনালয় ইত্যাদির মধ্যেই নামায পড়িতে হইত। নির্ধারিত ওই স্থানটি যদি তাহাদের আবাসন হইতে দূরে হইত, তবে কি জানি তাহারা করিত। হয়ত নামাযই পড়িত না, অথবা কোন বস্তুকে ইহার প্রতি সম্বন্ধ করিয়া নির্ধারণ করিয়া নিত। যেমন, কোন কাপড়, লাকড়ী ইত্যাদি।

ফাইদা

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া ছাড়া কোন উলামায়ে কিরামের কিতাবে আমি এ কথা পাই নাই যে, "হযরত ঈসা আলায়হিস্-সালাম সব সময় পথে পথে চলিতেন। যেখানেই নামাযের সময় হইত, সেখানেই নামায আদায় করিয়া নিতেন।" দাউদী ও ইবনুত-তাবয়ীন হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ফাতহুল বারীতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হইতে হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসের মতই বর্ণিত আছে যে, আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের মধ্যে কোন নবীই নিজ মিহরাব (বায়তুল মাকদেস বা পরিবার ইত্যাদি) এর মধ্যে পৌঁছা ব্যতীত নামায আদায় করিতেন না। অবশ্য বর্ণনা দুইটির কোনটিতেই উম্মতের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। মোটকথা, বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে নহে। (মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।) কেহ কেহ বলেন, অন্য কোন নবীর ও উম্মতের জন্য মাটি মসজিদ ও পবিত্র ছিল না। কেননা, মাটি মসজিদ তো ছিল, কিন্তু পবিত্র ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য, যে জায়গার পবিত্রতা সম্পর্কে তাহাদের নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকিত, সে জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামায পড়া তাহাদের জন্য বৈধ ছিল না। আর এ উম্মতের জন্য যেইখানে অপবিত্রতা না থাকার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, সেখানে নামায পড়া বৈধ। বাহ্যিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযার পরিমাণ অন্যান্য সকল নবীর মু'জিযার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী। পুরা কুরআনে কারীমই মু'জিযা। এর মধ্যে

www.pathagar.com

সবচাইতে ছোট হইতে ছোট সূরা হইল اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। "আমি তোমাকে দান করিয়াছি অফুরন্ত নিআমত।" এখানে চিন্তা করা উচিত যে, 'অফুরন্ত'-এর সীমা কোথা পর্যন্ত। অথবা এই পরিমাণ অন্য কোন আয়াত নিয়া চিন্তা করুন। এ প্রসঙ্গে মু'জিযার অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

তাঁহার আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি সমস্ত নবীর মধ্যে শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবে না। কুরআনে কারীম এ ব্যাপারে নিজেই সাক্ষী। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, আমার কাহিনী ও অন্যান্য নবীর কাহিনীর উপমা ঠিক এমন যে, কোন ব্যক্তি একটি প্রাসাদ তৈরী করিল। প্রাসাদটি পরিপূর্ণ করিল। কিন্তু, কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রহিয়া গেল। দলে দলে মানুষ ইহাকে দেখার জন্য আসে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া চতুর্দিকে দেখে। আর অবাক হইয়া বলে, এ শূন্য জায়গাটিতে ইট দেওয়া হয় নাই কেন? অতএব, তোমরা বুঝিয়া নাও, আমি হইতেছি ওই ইট। আমি নবী আগমনের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী। এখন সুরম্য প্রাসাদটির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহাতে আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি। ইহার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারাবাহিকতার নিঃশেষের দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাঁহার শরীআত হইল চিরন্তন শরীআত, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকিবে। এই শরীআত হইল অন্যান্য নবী আলায়হিমুস সালামের শরীআতগুলির রহিতকারী। তাঁহার উম্মত অন্যান্য নবীর উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংখ্যার দিক দিয়াও তাঁহার উম্মত অন্যান্য সমস্ত নবীর উম্মতদের চাইতে বেশী। অন্য নবীগণও যদি তাঁহার যুগ পাইতেন, তবে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। 'মর্যাদাবলী' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করার বিষয়টিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। 'রহমত' দ্বারা যদি হিদায়াত (নির্দেশনা) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে ইহার অর্থ হইবে সমস্ত মানুষের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া। যদিও সমস্ত মানুষ হিদায়াত না পায়। বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয়ের অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। আর যদি ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে তাঁহার অস্তিত্বের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির জন্য য়রযে উজুদীর মধ্যে শামিল হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু দিয়া এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমুস সালামকে তাঁহাদের নাম নিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যেমন হে আদম!, হে নূহ!, হে ইবরাহীম!, হে দাঊদ!, হে যাকারিয়া!, হে ঈসা!, হে ইয়াহ্ইয়া! ইত্যাদি। কিন্তু, রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করেন নাই; বরং গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করে হে নবী!, হে রাসূল!, হে চাদরে আবৃত ব্যক্তি!, হে কম্বলাবৃত ব্যক্তি! বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শেষোক্ত দুইটি সম্বোধন ছিল স্নেহ-ভালবাসার কারণে। আর এ স্বাদের স্বাদ মহব্বতের দাবীদাররাই উপলব্ধি করিতে পারে। তাঁহার আরও বৈশিষ্ট্য হইল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নাম নিয়া ডাকা উম্মতের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত মনে করিও না" (সূরা নূর ঃ ৬৩)। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন গুণবাচক নাম দ্বারা ডাক। যেমন, হে আল্লাহ্র হাবীব!, হে আল্লাহ্র রাসূল!, হে আল্লাহ্র নবী! ইত্যাদি। আর খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শিষ্টাচারের সহিত পরিমিত আওয়ায দিয়া ডাকিবে। উক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাবিত ইব্ন কায়স রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আওয়ায শ্রুতিকটু ও উঁচু হওয়ার অভিযোগ ছিল। যখন এ আয়াত নাযিল হইল, তখন তিনি ঘরে বসিয়া পড়িলেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইতেন না। একদিন রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল– ছাবিত না আমাদের মজলিসে আসে, না কোথাও উপস্থিত হয়। তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপর এ আয়াত নাযিল হইয়াছে, আর আমি উঁচু আওয়াযের মানুষ। আমি আশংকাবোধ করিতেছি যে, না জানি আমার কোন আমল বিনষ্ট হইয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি এ আয়াতের মিসদাক নহ, আর না তুমি এদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাঁহার আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারিতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমার অতীত জীবনও ভাল, আর যখন এ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে, তখনও ভাল থাকিবে। আর তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। এক পর্যায়ে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন। এ কিতাবের শেষাংশে খতীবদের আলোচনায় তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলা হইবে ইনশাআল্লাহ্। এমনিভাবে কক্ষের বাহির হইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ডাক দেওয়াও ছিল নিষিদ্ধ। এর মধ্যে অপূর্ব শিষ্টাচারিতা এই যে, মানুষেরা আসিবে এবং বসিয়া যাইবে। এমনকি রাসূল আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছায় বাহিরে গিয়ে সাক্ষাতপ্রার্থীদের ধন্য করিতেন। শিষ্টাচার সম্পর্কীয় আলোচনা যথাস্থানে আসিবে ইনশাআল্লাহ্।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আরও বৈশিষ্ট্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জীবনের, পবিত্র শহরের ও বরকতময় যামানার শপথ করিয়াছেন– যাহার আলোচনা অতিবাহিত হইয়াছে। ওহীর যতগুলি প্রকার হইতে পারে প্রত্যেকটি প্রকারেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত কালাম করিয়াছেন। 'মাব'আস'-এর আলোচনায় ইহার বিশ্লেষণ করা হইবে ইনশাআল্লাহ্! হযরত ইসরাফীল আলায়হিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করিয়াছেন। অথচ ইহার পূর্বে অন্য কোন নবীর নিকট আগমন করেন নাই। ইব্ন উমার রাযিয়াল্লাহু তা'আলার বর্ণনায় তাবারানী উল্লেখ করেন ঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আমি এই কথা ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার নিকট ইসরাফীল আলায়হিস সালাম আগমন করিয়াছেন। আর আমার পূর্বে তিনি অন্য কোন নবীর নিকট আগমন করেন নাই, ভবিষ্যতেও আর কাহারও নিকট আগমন করিবেন না। তিনি নিবেদন করিলেন, আপনার প্রতিপালক আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনার নিকট মহান আল্লাহ্র এ নির্দেশ পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য যে, আমি

www.pathagar.com

তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম, তুমি চাহিলে নবী ও বান্দা থাকিতে পার, আবার ইচ্ছা করিলে নবী ও বাদশাহ্ হইতে পার। তারপর পরামর্শের নিয়ম অনুযায়ী আমি হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে বলিলাম, সে তো এই কথা বলিয়াছে, আপনি বলুন? তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বিনম্র ও বান্দা থাকার বিষয়টি গ্রহণ করিয়া নিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যদি আমি এ কথা বলিতাম যে, আমি নবী ও বাদশাহ্ হিসেবে থাকিতে চাই, তাহা হইলে স্বর্ণের পাহাড় আমার হইতে চলিত। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার মধ্যেও এমনই উল্লেখ আছে। হযরত ইসরাফীল আলায়হিস সালাম এক-দুইবারই শুধু আসেন নাই, বরং তিনি সর্বদাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় মজলিসে উপস্থিত থাকিতেন।

'সিফরুস-সা'আদা' গ্রন্থকার লিখেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাত বছর বয়সে তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করেন তাঁহার চাচা আবূ তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসরাফীল আলায়হিস সালামকে সর্বদা তাহার সান্নিধ্যে থাকার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইসরাফীল আলায়হিস সালাম সর্বদা তাহার সহিত থাকিতেন। এমনকি তাঁহার বয়স যখন এগার পরিপূর্ণ হইল, তখন জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে তাঁহার খিদমাতে আসার নির্দেশ দেওয়া হইল। (মহান আল্লাহ্ তাঁহার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান। হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা মুসলিম এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামতের দিন আমি মানব সন্তানদের সর্দার হইব।" কিয়ামতের দিন যখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্দার হইবেন, তো দুনিয়ায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, সেখানে তো নেতৃত্ব, ইয্যত-সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিবে। কাহারও দম মারারও শক্তি সেখানে থাকিবে না তিনি ছাড়া। যেমনটি আয়াতে কারীমা 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'-এর তাফসীরে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر بيدى لواء الحمد ولا فخر "কিয়ামতের দিন আমি মানব সন্তানদের সর্দার হইব, আর তাহা অহংকার নহে। আমার হাতে থাকিবে মহান আল্লাহ্র প্রশংসার ঝাণ্ডা, ইহাও অহংকার নহে।" মোটকথা, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রশংসা করিবেন, যাহা হয়ত কেহ কোন দিন করে নাই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানেন, অন্য কেহ ততটুকু জানেন না এবং তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'আলার যত বেশী অনুগ্রহ-অবদান রহিয়াছে, অন্য কাহারও উপর তত বেশী নাই। সম্ভবত এখানে حمد অর্থ محمديت অর্থাৎ প্রশংসার বিষয়। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝাইবে যে, কিয়ামতের দিন তাঁহার যে পরিমাণ প্রশংসা ও কৃতিত্ব অর্জিত হইবে, অন্য কাহারও তাহা হইবে না। ওই দিনটি তাঁহারই দিন। সেখানে সম্মান তাঁহারই হইবে। তাঁহার ইরশাদ 'তাহা

www.pathagar.com

আমার অহংকার নহে'– কথাটির অর্থ হইল, এ চরিত্র আমার নিজ বলে অর্জিত নহে। বরং এ মান-সম্মান মহান আল্লাহ্‌র অবদান। আমি নিজে তাহা পাওয়ার নহি। আর এমন শক্তি আমার হইবেও না, যাহার উপর আমি অহংকার করিব। (বরং এইগুলি সব মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে।) যেমন উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, হইতে পারে ইহার দ্বারা এ উদ্দেশ্য হইবে যে, মানব সন্তানদের মধ্যে আমার যে নেতৃত্ব অর্জিত হইয়াছে ইহাতে আমার কোন অহংকার নাই। বরং আমি গৌরববোধ করিতেছি ওই বিষয়ে, যাহা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আমার অর্জিত হইয়াছে। যেমনিভাবে কোন কোন আলিম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিলায়াতকে তাঁহার নুবুওয়াতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, ইহার অর্থ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সত্তার মধ্যে ফানা হইয়া যাওয়ার ও হারাইয়া যাওয়ার উপর আমার গৌরব, অস্তিত্বের চিহ্ন ও সৃষ্টিতত্ত্বের উপর গৌরব নহে। যেমন, প্রসিদ্ধি আছে الفقر فخرى। "দরিদ্রতা আমার গৌরব"। এমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানব সন্তানদের সর্দার, সমগ্র সৃষ্টির সর্দার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমস্ত নবী-রাসূল, নিকটস্থ ফেরেশ্‌তা, সমস্ত পৃথিবী ও আকাশবাসী অপেক্ষা বেশী সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ও তাঁহার কারণে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ শায়খ ইয্‌যুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন। এ কথা উদ্ধৃত করেন নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন নবীকে এ সুসংবাদ দেন নাই। এমনকি কিয়ামতের দিন তাঁহারা নাফ্‌সী নাফ্‌সী বলিবেন। মোটকথা, সমস্ত নবী যদিও ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং নবীগণকে শাস্তি দেওয়া হইবে না, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কোন নবীকেই দুনিয়াতে এ মর্যাদার সংবাদ দেওয়া হয় নাই। আর কিয়ামতের ব্যাপারে তাহাদেরকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এটা একমাত্র রাসূল সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নিজের চিন্তা-পেরেশানী হইতে অবসর হইয়া একনিষ্ঠ চিত্তনিবিষ্টে তাঁহার উম্মতের অবস্থার চিন্তা-ফিকির করিতেন। উম্মতের শাফা'আত, গুনাহ্‌র মাগফিরাত ও শ্রেণীগত মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে আরেকটি হইল– তাঁহার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছে। এ কথাটির ব্যাখ্যা হইল– হযরত ইব্‌ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসে আসিয়াছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই মক্কেল নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মক্কেল হিসেবে জিন্নদের একজন ও ফেরেশতাদের একজন সদস্য রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করিলেন, আপনারও কী এমনই অবস্থা ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। তাই সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ভাল ও কল্যাণের কথা ছাড়া সে অন্য কিছু বলে না। কাহারও কাহারও মতে ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আনুগত্যকে বুঝানো হইয়াছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সে

www.pathagar.com

তাহার কোন ব্যক্তিগত প্রভাব সাধন করিতে পারে না। তবে অধিকাংশের মত হইল, সে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করিয়াছে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর কোন خطا 'ভুল করা' বৈধ নহে। মাওয়ারদী ও হিজাযী 'মুখতাসির রওযা'-এ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এক দল বলে, نسيان ভুলিয়া যাওয়াও তাহার জন্য বৈধ নহে। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার কোন ব্যাখ্যা ও মতানৈক্য উল্লেখ করা ছাড়াই এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি তাবলীগ, ওহী ও শরীআতের বিধানের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়াবলীতে ভুলচুক না হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা (সর্বসম্মত) প্রকাশ করেন। আর বিভিন্ন খবর সংক্রান্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেন। ইহাতে نسيان ভুলিয়া যাওয়া বা স্মৃতিশক্তি হইতে হারাইয়া যাওয়াকে বৈধ রাখিয়াছেন। এ বক্তব্যটি দুর্বল। কেননা, বাস্তববিরোধী খবর প্রদান করা মিথ্যা ও দোষের অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইয্যত-সম্মানের আঁচলকে পাক-পবিত্র মানিয়া নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নিশ্চিত বিশ্বাসের সহিত সবার জানা আছে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রিযওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈনের এ অভ্যাস ছিল যে, তাঁহারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথার সত্যায়ন ও সমস্ত খবরের উপর নির্ভর করিবার ক্ষেত্রে খুবই ত্বরা কারিতেন। চাই তাহা যে কোন বিষয়ের যে কোন বস্তুতেই হউক না কেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মাযহাব (মত) ইহাই। কিন্তু نسيان (স্মৃতিশক্তি হইতে হারাইয়া যাওয়া) কাজকর্মের ক্ষেত্রে বৈধ আছে। নামাযের মধ্যে এমন কিছু হইয়া গেলেও নামায সহীহ্ থাকে। এ কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অবশ্য এর আওতায় এ বিশ্বাসও রাখিতে হইবে যে, এতে শরঈ প্রজ্ঞা ও উম্মতের ইহার অনুসরণ করার সৌভাগ্য লাভের কল্যাণ রহিয়াছে। আর রাসূলে আকরাম সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মানবিক দিক, জন্মগত স্বভাবের স্থায়িত্ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ও অঙ্গচালনার বিষয়াবলী এ দুনিয়ার (স্বভাবের) সহিত সম্পৃক্ত। (অবস্থার প্রকৃত তথ্য মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।) خطا 'ভুল' করার দিকে তাঁহাকে সম্বন্ধ করার বিষয়ে خطا দ্বারা যদি اجتهادى خطا। (চিন্তা ও দর্শনগত ভুল) হইয়া থাকে, যাহা কখনো সংঘটিত হইয়াছেও। যেমন বদরের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা; তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এমন চিন্তা ও দর্শনগত ভুলের উপর অটল রাখা হয় নাই। বরং এই ব্যাপারে তাঁহাকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনিভাবে نسيان স্মৃতি হইতে লোপ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি হইয়া থাকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে 'সন্দেহ' তো কখনও হয় নাই। অর্থাৎ এমন সন্দেহ কখনও হয়নাই যে, নামায দুই রাকআত পড়িলেন নাকি তিন রাকআত। তিনি বলেন, সন্দেহ-সংশয় শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, কবরের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, 'এ ব্যক্তি প্রসঙ্গে তুমি কি বল, যিনি তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন ?" এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যান্য নবীগণকে

www.pathagar.com

তাহাদের নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হইবে না। অর্থাৎ কবরের মধ্যে তাদের নিজ নিজ নবীগণ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে না। ইহা দ্বারা কতক উলামায়ে কিরাম বলেন, কবরের প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়টি উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য। কেননা, আলমে বরযখে (কবর জগতে) তাদেরকে গুনাহ্মুক্ত করিয়া আলমে আখিরাতে (হাশরের ময়দানে) নেওয়া হইবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামেই আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করাকে বৈধ রাখিয়াছেন। ফেরেশ্তা, অন্য কোন নবী কিংবা অন্য কাহারও নামে নহে। শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম বলেন, এ বৈধতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিতই নির্ধারিত এবং ইহা দ্বারা তাঁহাকেই উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁহার সমপর্যায়ের অন্য কেহ নাই। তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও শান্তি বর্ষণ করুন। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁহার পর উম্মতের জন্য বিবাহ হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ অর্থাৎ হারাম হওয়ার দিক দিয়া তাহারা সবাই মায়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক। তাহাছাড়া তাঁহার স্ত্রীগণ জান্নাতেও তাঁহারই স্ত্রী হিসাবে থাকিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

"তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

'রওযাতুল আহ্বাব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ত্বালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলিয়াছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দুনিয়া হইতে আড়াল হইয়া যাইবেন, তখন আমি হযরত আইশাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আবার কোন কোন কিতাবে বলা হইয়াছে– ইয়াযীদ হযরত আইশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রতি লোভ করিয়াছিল, মানুষেরা তখন এই আয়াত পড়িল এবং তাহাকে তাহা হইতে ফিরাইয়া রাখিল। বিবাহ হারাম হওয়ার বিষয়টি ওই স্ত্রীগণের সহিত সংশ্লিষ্ট যাহাদেরকে এই ইচ্ছা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য গ্রহণ করিতে পারে কিংবা মহান আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রিয় রাসূলকে বাছিয়া লইতে পারে। কাজেই, যাহারা দুনিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছে তাহারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদেরকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমামুল হারামায়ন ও ইমাম গাযালী তাহাদেরকে বিবাহ করা বৈধ থাকার উপর বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু যেসব স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন, তাঁহারা উম্মতের জন্য হারাম। তাহাদেরকে দেখা দেওয়া বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে দুইটি মত। প্রসিদ্ধ হল দেখা না দেওয়া। আর 'মা'-এর বিধানভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হইল, মর্যাদা, সম্মান, আনুগত্য, বিবাহের নিষিদ্ধতা ইত্যাদি। ইহার অর্থ এ নয় যে, নির্জনে বসবাস, আত্মীয়তা, মীরাছের বৈধতা স্বীকৃত হইবে। আর এ বিধান অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হইবে না। যেমন তাঁহারা

www.pathagar.com

উম্মাতের 'মা' হওয়ার সুবাধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ মুসলমানদের বোন হইবে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় এমনই বলা হইয়াছে।

মূলতঃ কবরের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবিত থাকার কারণেই তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য হারাম হইয়াছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণের উপর স্বামীর মৃত্যুপরবর্তী ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। আর যে স্ত্রীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'ইচ্ছা' প্রদানের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছেন, যেমন ওই স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে মুক্ত হইয়াছে এবং ওই স্ত্রী যার নিম্নাংশে শুভ্রতা দেখিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদেরকে অন্য কেহ বিবাহ করিতে পারিবে কিনা। এ ব্যাপারে কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত আছে। এক বক্তব্য অনুযায়ী তাহাদেরকে বিবাহ করা হারাম। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উপর দৃঢ় ও অনড় রহিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী হারাম নহে। ইমামুল হারামায়ন বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত যদি সহবাস হইয়া থাকে, তবে হারাম; অন্যথায় নহে। বর্ণিত আছে যে, ঐ স্ত্রী মুক্ত হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলে রাসূল মুক্ত করিয়া দিলেন। ওই মহিলাকে আশআছ ইব্ন কায়স হযরত ফারূকে আযম উমর ইব্ন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাসনামালি বিবাহ করিল। ইহাতে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করিলেন। তারপর তাঁহাকে এই মর্মে সংবাদ দেওয়া হইল যে, তাহার সহিত রাসূলের সহবাসই হয় নাই। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইতে বিরত থাকিলেন। আর ওই দাসী যাহার সহিত রাসূলের সহবাস হওয়ার পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে তিনটি মত উদ্ধৃত রহিয়াছে। তৃতীয় মত অনুযায়ী মৃত্যুজনিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে অন্যের জন্য তাহাকে বিবাহ করা হারাম। যেমন, হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছেলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আম্মাজান। আর যদি রাসূলে করীমের জীবদ্দশায় বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়, তবে হারাম নহে। আলোচনা এখানেই শেষ। এ বিষয়টিও এমন কিছু বিষয়, যাহার আলোচনায় কোন লাভ নাই।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, মহিলাদের পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণের শারীরিক গঠন দেখাও হারাম ছিল। যদিও তাহারা বোরকা ও চাদরে আবৃত থাকিত। কোন প্রয়োজনের কারণে যেমন সাক্ষ্যপ্রদান ইত্যাদির জন্য চেহারা ও হাতের তালু উন্মুক্ত করাও হারাম ছিল। যাহা অন্যান্য মহিলাদের জন্য জাইয। কাযীখান এ ফাতওয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে চেহারা ও হাতের তালুর পর্দা করা ফরয করা হইয়াছে। সাক্ষ্য ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজনেও তাঁদের তাহা খোলা জাইয নাই। আর শারীরিক গঠন প্রদর্শন করাও জাইয নাই। অবশ্য মানবিক চাহিদা মেটানোর কাজ যেমন পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাইয। মুওয়াত্তায় এই বর্ণনা দ্বারা দলীল দেওয়া হইয়াছে যে, যখন হযরত হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ইন্তিকাল করিলেন, তো মহিলারা তাহার লাশকে ঢাকিয়া দিল যাহাতে তাহার শারীরিক গঠন কেহ না দেখে। হযরত যায়নাব বিন্ত জাহশ তাঁহার লাশের উপর এমনভাবে অন্য কিছু রাখিয়া দিলেন, যাহাতে তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা

www.pathagar.com

না যায়। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার শায়খ ইব্‌ন হাজর আসকালানী হইতে উদ্ধৃত করেন, ফাতাওয়া কাযীখানের মধ্যে যাহা বর্ণনা করা হইল উহার ফরয হওয়ার কোন দলীল নাই। অথচ এ কথা প্রমাণিত যে, তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণ হজ্জ ও তাওয়াফের জন্য বাহিরে আসিতেন। সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁহাদের হইতে হাদীস শুনিতেন। তাঁহাদের শারীরিক অবয়ব কাপড় দ্বারা আবৃত থাকিত এবং শারীরিক অস্তিত্ব একেবারে গোপন হইয়া যাইত না।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের পর্দার উদ্দেশ্য হইল, শারীরিক গঠনের প্রকাশ না করা। যদিও তাহারা কাপড়ে আবৃত ও লুক্কায়িত। ইহা কেন প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত হইল? এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খ ইব্‌ন হাজার রহমাতুল্লাহি আলায়হির আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য কী? তিনি কি পর্দা ফরয না হওয়ার কথা বুঝাইতেছেন যাহা তাঁহার বাহ্যিক কথার দ্বারা বুঝা গেল, নাকি পর্দা ফরয না হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? অথচ হজ্জ ও উমরার সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনের শারীরিক গঠন প্রকাশ হওয়ার কথা প্রমাণিত আছে। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হযরত আইশাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন ঃ হজ্জের সময় আমরা যখন রাস্তায় নারীদের সমাবেশে চলি, তখন চেহারা থেকে আমরা পর্দা উঠাইয়া নিতাম। যখন আমরা দেখিতাম যে, মানুষেরা পৌঁছিয়া যাইতেছে, তখন আবার চেহারায় পর্দা টানিয়া দিতাম। এমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যখন শারীরিক দুর্বলতার কারণে ভীড়ের মধ্যে তাওয়াফ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি সবার পেছনে থাকিয়া তাওয়াফ কর। মোটকথা, এটা প্রকাশ্য যে, তাঁহার শারীরিক গঠন প্রকাশ্য ছিল। আর তাহার উপর ওড়না জাতীয় কিছু দিয়া ঢাকিয়া গঠনাকৃতি আড়াল করার কথাটি অনেক দূরবর্তী। আর হাদীস শোনানোর বিষয়টিতো হইতেই পারে। কেননা, তা তো ছিল পর্দার অন্তরাল হইতে। হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আয়মন তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, আমি উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আইশাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিকট আসিলাম। দেখিলাম, তাঁহার উপর কাতারী ওড়না ছিল। ইহাতে বুঝা গেল যে, ওড়না তাঁহার পবিত্র দেহের উপর ছিল। আর যদি হিজাব দ্বারা এই অর্থ নেওয়া হয় যাহা উন্মুক্ত করা মহিলাদের জন্য জাইয আছে। যেমন চেহারা, হাতের তালু ইত্যাদি তো এগুলিও তাহাদের উপর হারাম ছিল। শারীরিক গঠন আড়াল করা নহে। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যাদের সম্বন্ধও হুযূরের দিকে করা হয়। যেমন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীর সন্তানই তাঁহার ঔরস হইতে হইয়া থাকে। আর আমার সন্তান-সন্ততি হযরত আলী মুরতাযা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঔরস হইতে হইয়াছে। হযরত হাসান ও হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার শান-শওকত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, هٰذَانِ ابْنَا بِنْتِى اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبْهُمَا وَاَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا "ইহারা দুইজন আমার কন্যার সন্তান। হে আল্লাহ্! ইহাদের উভয়কে আমি স্নেহ সোহাগ করি। আপনিও ইহাদের ভালবাসুন। তাহাদেরকে যাহারা ভালবাসে তাহাদেরকেও ভালবাসুন।"

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে ঃ اِنَّ ابْنَىْ هٰذَيْنِ رَيْحَانَتَىْ مِنَ الدُّنْيَا "নিশ্চয় আমার এ দুইসন্তান দুনিয়ার মধ্যে আমার দুইটি ফুল।"

www.pathagar.com

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলিতেন, আমার এ দুইসন্তানকে আমার কাছে নিয়া আস। তারপর তিনি তাহাদেরকে চুমু খাইলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সায়্যিদুনা হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রসঙ্গে বলেন ঃ "اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ" "নিশ্চয় আমার এ সন্তান সায়্যিদ"।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, একবার হাসান ও হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার যে কোন একজন মসজিদে নববীতে আসিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সিজদারত পাইয়া তাঁহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মাথা মুবারক উপরে উঠাইলেন না। আর সিজদা আরও দীর্ঘ করিলেন। নামায শেষে হযরত সাহাবায়ে কিরাম সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সিজদায় থাকাকালে কি ওহী নাযিল হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, আমার পিঠে আমার সন্তান চাপিয়া বসিয়াছিল। যতক্ষণ না সে নিজেই নামিয়া পড়ে, তার আগে আমি তাড়াহুড়া করা ভাল মনে করিলাম না। 'মুবাহালা' সংক্রান্ত আয়াত نَدْعُ اَبْنَائَنَا (আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ডাকিব) এটিও ইহার উপর প্রমাণ বহন করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যাবলীর আর একটি হইল কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ও স্ত্রী-পরিজনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না। কিন্তু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনের সম্পর্ক অটুট থাকিবে। এই কারণেই সায়্যিদুনা ফারূকে আযম উমর ইব্‌ন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফাতিমাতুয-যাহ্‌রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, যাহাতে কিয়ামতের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বংশধারার সহিত সম্পৃক্ত থাকিতে পারেন। যথাযথ স্থানে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইবে। আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হইল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যাদের উপস্থিতিতে তাহাদের স্বামীদের অন্য কাহাকেও বিবাহ করা বৈধ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার কোন কন্যা কাহারও বিবাহে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় ওই কন্যার স্বামী অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে সতিন বানানো বৈধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এখানে সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয-যাহরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘটনা আসিয়া যায়। হযরত আলী মুর্তাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আবূ জাহলের কন্যা যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনা শরীফ আসিয়া গিয়াছিল তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। সায়্যিদা হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিষয়টি টের পাইয়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে হাযির হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আপনার স্বগোত্রীয় লোকেরা বলে– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কন্যাদের অকল্যাণ চান না। "হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবূ জাহ্‌লের কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে। আর আপনি ইহাতে কিছুই বলিতেছেন না।" এই কথা শুনিয়া হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করিয়া বলিলেন ঃ "আবুল

আসের নিকট আমি আমার কন্যা বিবাহ দিলাম। (তিনি ছিলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জামাতা। নবী (সা)-এর কন্যা সায়্যিদা যায়নাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনা পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঘরেই ছিলেন।) সে তো আমাদের সহিত সৌজন্য আচরণই করিয়াছে এবং আমাদের কল্যাণ ও সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। সায়্যিদা ফাতিমা যাহ্রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) আমার কলিজার টুকরা। আমি চাহি না তাহার কোন কষ্ট হউক, কিংবা তাঁহাকে কোন পরীক্ষায় নিপতিত করা হউক। যে বিষয় দ্বারা ফাতিমাকে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি শুনিলাম-আলী মুর্তাযা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাকি আবূ জাহ্লের কন্যাকে বিবাহ্ করিতে চাহিতেছে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা আর আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহার উচিত প্রথমে ফাতিমাকে তালাক দেওয়া, তারপর আবূ জাহ্লের কন্যাকে বিবাহ করা।" ফলে হযরত আলী মুর্তাযা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাযির হইয়া ওযর আপত্তি পেশ করিলেন এবং আবূ জাহ্লের কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ দিলেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী মুর্তাযা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলিয়া দিলেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত সায়্যিদা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার সতিন বানানো তোমার উপর হারাম করিয়া দিলাম।" তিনি আরও বলিলেন ঃ "হে আলী আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি। আবার তোমার ব্যাপারে এ আশংকাবোধও করি যে, তুমি ফাতিমাকে কষ্ট দিবে। আর ইহার কারণে আমিও কষ্ট পাইতে বাধ্য হই।" যদিও হাদীসটি সায়্যিদা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, কিন্তু রাসূলের কোন কন্যার সহিতই সতিন ঘরে আনা তাঁহার কষ্টের কারণ ছিল। কাজেই, এ বিধানটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কন্যাদের বেলায় জারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্যাবলীর আর একটি হইল মসজিদে নববীতে কিবলা নির্ধারণের জন্য মদীনা শরীফে অবস্থিত মিহরাব হইতে ইজতিহাদ করিয়া ডানে-বামে নেওয়া যাইবে না। শায়খুল ইসলাম আবূ যুরআহ্ ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়াছেন, যে নববী মিহরাবের দিকে নামায আদায় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, আমি ইজতিহাদ করিয়া কিবলা নির্ধারণপূর্বক নামায পড়িব। এ মিহরাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল এই কথা জানা সত্ত্বেও যে ইজতিহাদ ও তাহাররী করিল, সে মুরতাদ হইয়া গেল। (মহান আল্লাহ্ আমাদের এমন অবস্থা হইতে হিফাযত করুন) আর যদি সে এই ব্যাখ্যা করে যে, বর্তমান মিহ্রাব ওই মিহরাব নহে, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল। বরং ইহাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইয়া গিয়াছে। তাহলে তাহাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাইবে না। কেননা, বর্ণনাগুলিতে আসিয়াছে যে, মাঝখান হইতে সব ধরনের অন্তরায় ও পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টির সামনেই ছিল কা'বা শরীফ। মুখোমুখি করিয়া কা'বা শরীফের বিপরীত দিকেই মিহরাব নির্মাণ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিল, নিঃসন্দেহে সে সত্য ও সংশয়হীনভাবে তাঁহাকেই দেখিল! এই জন্য যে, শয়তান তাঁহার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না। তাহাকে এই শক্তি দেওয়া হয় নাই যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করিয়া ধোকা ও প্রতারণা করিবে। এক বর্ণনায় আসিয়াছে, যে আমাকে দেখিল, সে সত্যিই আমাকে দেখল। হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় আসিয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখিল, সে সত্যিই আমাকে দেখিল। মোটকথা, শয়তানকে যদিও যে কোন ধরনের আকৃতি ধারণ করার শক্তি দেওয়া হইয়াছে, তবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করার শক্তি দেওয়া হয় নাই। এই জন্য যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিদায়াত প্রকাশকারী আর শয়তান গোমরাহী প্রকাশকারী। হিদায়াত ও গোমরাহী একটি আর একটির বিপরীত। এমনকি শয়তান আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতি ধারণ করিয়া আসিতে পারে এবং মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হিদায়াত ও গোমরাহী উভয়টির সৃষ্টিকারী। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা উভয়টির জন্য সদৃশতার মহল নয়।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, এ মর্যাদাটি সমস্ত নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর শয়তান কোন নবীর আকৃতিই ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার এ মর্যাদাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিবার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন আকৃতিতে দেখিবার শর্ত নাই। যে ব্যক্তি যে আকৃতিতেই দেখুক না কেন, নিশ্চিতভাবে যেন তাঁহাকেই দেখিল। আবার কেহ কেহ সন্দেহের পথ গ্রহণ করিয়া এই কথা বলে যে, বিশেষ আকৃতিতে দেখিলেই শুধু তাহা সঠিক হইতে পারে।

সারকথা হইল, সে ওই আকার-আকৃতিতে দেখিল, বাস্তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে আকৃতি ছিল। আবার কেহ কেহ আরও সংকুচিত করিয়া বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ওই বিশেষ আকৃতিতে দেখিল, দুনিয়া হইতে যাওয়ার সময় তাহার যেই আকৃতি ছিল। এমনকি তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাড়িগুলির মধ্যে পাকা দাড়িগুলিরও লক্ষ্য রাখেন। অর্থাৎ তাঁহার দাড়ি শরীফ বিশটির বেশী পাকা ছিল না। তাহারা বলেন, স্বপ্নের তা'বীর করিতে অত্যন্ত পারঙ্গম ব্যক্তি ইব্ন সীরীনের নিকট যদি কেহ আসিয়া বলিত, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তো তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, বল কোন্ আকৃতিতে দেখিয়াছ ? যদি সে ওই আকৃতির কথা না বলিত যে রকম আকৃতি তাঁহার ছিল, তবে তিনি তাহাকে বলিতেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত কর নাই। উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসের সনদ সহীহ্। (মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কোন ব্যক্তি বলিল, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছি। তিনি জানিতে চাহিলেন, কোন্ আকৃতিতে

www.pathagar.com

দেখিয়াছ ? লোকটি বলিল, সায়্যিদুনা হাসান (রা)-এর মত আকৃতিতে দেখিয়াছি। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ঠিকই দেখিয়াছ। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, তাঁহার বিশেষ ও পরিচিত প্রকৃত আকৃতিতে দেখা হইতেছে প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি। আর অন্য কোন আকৃতিতে দেখা হইতেছে তাহার মত আকৃতির উপলব্ধি। তবে সমস্ত মুহাদ্দিসের ঐকমত্য অনুযায়ী সঠিক কথা ইহাই যে, যে কোন আকৃতিতেই দেখুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকেই দেখিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। অবশ্য তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখা পরিপূর্ণতার দাবী রাখে। আকৃতিগত পার্থক্যই ধারণাগত পার্থক্য। যাহার ধারণার আয়না ইসলামের নূর দ্বারা যতটুকু পরিষ্কার ও নূরান্বিত হইবে তাহার দর্শনও ততটুকু সঠিক ও পরিপূর্ণ হইবে। এ বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। সেখানেও দেখিয়া নেওয়া দরকার।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আসিয়াছে ঃ مَنْ رَآنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ "যে আমাকে স্বপ্নে দেখিল, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিবে।" কয়েকটি আলোচনায় এ হাদীসের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সে আখিরাতে দেখিবে। অথচ উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, আখিরাতে গোটা উম্মতই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিবে। স্বপ্নযোগে দর্শনকে নির্ধারণ করা হইয়াছে। উলামায়ে কিরাম বলেন, এ ধরনের দর্শনের জন্য বিশেষ এক প্রকারের দর্শন ও বিশেষ প্রকারের নৈকট্য অর্জিত হইবে। হইতে পারে কতক পাপিষ্ঠ উম্মত কোন কোন সময়ে রাসূলের দর্শন হইতে গুনাহ্ করার কারণে বঞ্চিত থাকিবে। বিপরীতে এ ধরনের দর্শন দ্বারা সে বঞ্চনা ও ব্যর্থতা হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ জাগ্রত অবস্থায় দেখার উদ্দেশ্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ও তার বিশুদ্ধতা। আর এ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিষয়টি এমন, যেন, তাহাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহার যুগের যাহারাই স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিল, আশা করা যায় তাহারা তাঁহার সুহবত লাভে ধন্য হইবে। এ অর্থটি একেবারেই সুস্পষ্ট। যেমন কোন কোন বর্ণনায়ও আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আসিয়া নিবেদন করিল, আমার পিতা একেবারেই বৃদ্ধ। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার শক্তি রাখে না। কিন্তু স্বপ্নযোগে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হইল। তিনি বলিলেন ঃ مَنْ رَآنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ "আমাকে যে স্বপ্নযোগে দেখিবে, অবশ্যই অচিরেই সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখিবে।" আবার এ অর্থও হইতে পারে যে, কোন কোন মহান আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও মহান আল্লাহ্র রাস্তায় সাধনায় ব্রত কোন ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে, যে কোন সময় এই নিআমত দ্বারা ধন্য হইয়া জাগ্রত অবস্থায় রাসূলের সাক্ষাত লাভ করিবার মর্যাদা ও ভাগ্য অর্জন করিবে। কিন্তু উলামায়ে কিরাম নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়া হইতে ওফাত পাওয়ার পর জাগ্রত অবস্থায় তাঁহাকে দেখা অসম্ভব বলিয়া মত

www.pathagar.com

প্রকাশ করিয়াছেন। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার তাঁহার শায়খ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে চাই সে সাহাবী হউক কিংবা তাহার পরবর্তী যুগের কেহ হউক, জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাত লাভে ধন্য হয় নাই। আর এই কথাও তো ভালভাবে প্রমাণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সায়্যিদা ফাতিমা যাহ্রা (রা) শোকাহত হইয়া পড়েন। এমনকি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওই শোকে শোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের ছয় মাস পর দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়া গেলেন। অথচ তাঁহার ঘর ছিল নবী (সা)-এর নূরান্বিত কবরের পাশেই। কিন্তু বিরহের এ দীর্ঘ সময়েও কোন দিন জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছেন বলিয়া কেহ বর্ণনা করে নাই। অবশ্য কোন কোন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজেদের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন বাযিরী কর্তৃক রচিত 'তাওছীকু ইবরাসিল ঈমান' গ্রন্থে ইব্ন আবী হুমায়রা বর্ণনা করিয়াছেন। আফীফ ইয়াফিঈ 'বাহ্জাতুন-নুফূস' ও 'রওযুর রাইয়াহীন' এবং তাহার অন্যান্য রচিত গ্রন্থে, শায়খ সফিউদ্দীন মানসূর তাঁহার পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে ইব্ন আবী হুমায়রার উদ্ধৃতি দিয়া বলা হইয়াছে, "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এমন এক দলের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা এই হাদীসের সত্যায়ন করে। অর্থাৎ مَنْ رَاٰنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ "স্বপ্নযোগে যে আমাকে দেখিবে, জাগ্রত অবস্থায় অচিরেই সে আমাকে দেখিবে।" স্বপ্নযোগে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিলাম। তারপর জাগ্রত হইয়াও তাঁহার সাক্ষাত লাভে ধন্য হইলাম। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে সমস্যা ও সংকট হইতে উত্তরণের ব্যবস্থা জানিয়া নিলেন। নবী তাহাকে তাহা হইতে মুক্তির রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। মানুষ যদি ওলীদের কারামতের উপর বিশ্বাস না রাখে, তবে তাহার সহিত বিতর্ক হইতে পারে না। কেননা, তাহার সহিত যাহাই বলিবে সে তাহা অস্বীকার করিবে। আর যদি সে বিশ্বাস করে এবং সত্যায়ন করে, তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, জাগ্রত অবস্থায় রাসূলের দর্শন লাভ করার বিষয়টিও ওই কারামতেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য এমন অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য বিষয়— চাই তাহা উর্ধ্বজগতের হইতে হউক, বা নিম্নজগত হইতে উন্মোচিত হয়, যাহার উপর অন্য কোন মানুষ শক্তি রাখে না।" ইহা ছাড়াও "মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া" গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, শায়খ আবূ মানসূর তাঁহার পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "বুযুর্গগণ বর্ণনা করেন যে, শায়খ আবুল আব্বাস কুসতোলানী একবার রাসূলের দরবারে হাযির হইলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, اَخَذَ اللّٰهُ بِيَدِكَ اَحْمَدُ অর্থাৎ "হে আহমদ! আল্লাহ্ তোমার হাত ধরুন।"

শায়খ আবুস সাউদের উদ্ধৃতি দিয়া 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার বলেন, আমি তোমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ও অন্যান্য মাশায়িখ ও বুযুর্গদের সাক্ষাত লাভ করিয়াছি। তারপর সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি মশগুল হইয়া পড়িলাম এবং বিভিন্ন বিষয়ের উন্মোচন শুরু হইয়া গেল। তারপর আমি শায়খকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত দেখিতে পাইলাম। সবার শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার সঙ্গে মুসাফাহা করিলেন।

www.pathagar.com

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস হারাঁ বলেন, একবার আমি রাসূলের দরবারে হাযির হইলাম। দেখিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য বিভিন্ন আহকাম ও ফরমান লিখিতেছেন। আমার ভাই মুহাম্মদের জন্যও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ফরমান লিখিয়াছেন। আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম!) আমার জন্য কি কোন ফরমান লেখেন নাই ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা ছাড়াও তাঁহার জন্য অন্য একটা অবস্থান আছে।

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম তাঁহার গ্রন্থ 'আল-মুনকিযু মিনায-যালাল'-এ বলিয়াছেন, আরবাবে কুলূব জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশ্‌তাদের এবং নবীদের রূহসমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাহাদের আওয়ায শোনেন, তাহাদের হইতে নূর কুড়াইয়া নেন ও বিভিন্নভাবে উপকৃত হন।

হযরত সায়্যিদ নূরুদ্দীন আল-হাই তাঁহার পিতা সায়ফুদ্দীন ও সায়্যিদ আফীফুদ্দীন হইতে ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, তিনি কখনও কখনও যিয়ারতের সময় কবর শরীফের ভিতর হইতে عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِىْ "তোমার উপর সালাম হউক হে আমার সন্তান" বলিয়া সালামের জবাব দিতেন।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলির দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম (সা)-এর দর্শনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। উদ্ধৃত করা হয় যে, শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আযীয 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থে শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করি নাই, যতক্ষণ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিবাহ্ করার নির্দেশ না দিয়াছেন।"

গ্রন্থকার বান্দা মিসকীন আবদুল হক ইব্‌ন সায়ফুদ্দীন (মুহাদ্দিসে দেহলবী) সাব্বাতাল্লাহু ফী মাকামিস-সিদ্‌ক ওয়াল-ইয়াকীন বলেন ঃ 'বাহ্‌জাতুল আসরার' শায়খ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন ইউসুফ শাফিঈ খামী রহমাতুল্লাহি আলায়হির রচিত গ্রন্থ। উক্ত শায়খ ও হযরত গাওছুছ্‌ছাকলায়ন শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর মাঝখানে দুইটি ওয়াসিতা (মাধ্যম) রহিয়াছে। তিনি হযরত শায়খ জালীলুল কদর আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন শায়খ আবদুল্লাহ্ আযহারী হুসায়নী (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, আমি সায়্যিদুনা মুহীউদ্দীন শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর মজলিসে হাযির হইলাম। তখন তাঁহার মজলিসে দশ হাজার মানুষ বসিয়া ছিলেন। আর শায়খ আলী ইব্‌ন হায়তীর একেবারে সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। কেননা, তাঁহার বসার জন্য এই জায়গাটি নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। এমন সময় শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র) বলিলেন, চুপ হইয়া যাও। ফলে সবাই চুপ হইয়া গেল। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়ায ছাড়া আর কোন আওয়ায শোনা যাইতেছিল না। হযরত জীলানী (র) মিম্বর হইতে নামিলেন এবং হযরত শায়খ হায়তীর সামনে আদবের সহিত হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং খুব মনোযোগের সহিত তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর যখন হযরত শায়খ আলী জাগ্রত হইলেন,

www.pathagar.com

তখন বলিলেন, হে শায়খ! তুমি কী স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিতেছিলে ? তিনি বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ। গাওছুল আ'যম বলিলেন, এই জন্যই তো আমি আদব বজায় রাখিয়াছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কি উপদেশ দিলেন ? তিনি বলিলেন, আপনার খিদমতে হাযির থাকার নির্দেশ দিয়াছেন। তখন হযরত শায়খ আলী হায়তী মানুষদেরকে বললেন, স্বপ্নযোগে আমি যাহা কিছু দেখিলাম, হুযূর গাওছুল আ'যম জাগ্রত অবস্থাতেই তাহা দেখিলেন। ওই দিন উপস্থিত লোকদের মধ্যে সাতজন ব্যক্তি (মহান আল্লাহ্র ভয়ে) মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। জানিয়া রাখিতে হইবে যে,

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখা যাওয়া প্রসঙ্গে মাশায়েখে কিরামের মতামত উদ্ধৃত করার পর শায়খ বদরুদ্দীন হাসান ইব্‌ন আহরাল হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করার ঘটনা সেইসব আওলিয়ায়ে কিরামের নিকট হইতে তাওয়াতুর অর্থাৎ অধিকসংখ্যক লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যাহাদের এমন শক্তিশালী ইল্‌ম অর্জিত আছে, যাহার মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নাই। দর্শন লাভের সময় আওলিয়ায়ে কিরামের অনুভূত শক্তি হারাইয়া যায় এবং তাহাদের উপর এমন একটি অবস্থা বিরাজ করে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই দর্শন লাভের মধ্যে তাহাদের মর্যাদা ও অবস্থাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ও কমবেশী হইয়া থাকে। কখনও তাহারা স্বপ্নযোগে দর্শন লাভে ধন্য হন, আবার কখনও অনুভব শক্তির অদৃশ্যে যাহাকে তাহারা জাগ্রত ধারণা করেন দর্শন লাভে ধন্য হন। আবার কখনও কখনও নিজের কল্পনা ও খেয়াল দেখে ধারণা করিয়া নেন যে, প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় অর্থাৎ তন্দ্রায় হইয়া থাকে। হ্যাঁ, আরবাবে কুলূব যাহারা সর্বদা মুরাকাবা ও ধ্যান করার মধ্যে ব্যস্ত থাকে, মানবিক নোংরামি হইতে পাক-পবিত্র থাকে, দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী হইতে সাধারণত পৃথক্ থাকে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য প্রভার উপর আশিক ও আগ্রহী থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে যে কোন ওলী-ই নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তারপর তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ ওই অবস্থায় করিতে পারে, যেমনিভাবে সায়্যিদুনা গাওছুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র) প্রত্যক্ষ দর্শনের জগতে নিজ চোখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্বীয় আকৃতিতে তাঁহার যিয়ারত করিলেন। তাঁহার এমন ইখতিয়ার ছিল যে, প্রত্যেক জগতের যেখান পর্যন্ত শারীরিক অস্তিত্বের সম্পর্ক আছে, সেখানে যওকের অবস্থাতেই কথাবার্তা বলিতেন।

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস মুরসী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মুহূর্তের জন্যও যদি সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য্যপ্রভা দুনিয়া হইতে লুকাইয়া যায়, তবে আমি আমার নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করিব না। এটিও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুনান, আদাব, সুলূক ও চাল-চলনের মধ্যে সার্বক্ষণিক দর্শন ও উপস্থিতির উপর প্রয়োগ করা হইবে। ইহা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

এই ইরশাদের ভিত্তিতে ধরা যায়, যাহাতে বলা হইয়াছে– اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ "ইহসান অর্থ হইল তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করিবে; যাহাতে তুমি আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাও।" শায়খ আবুল আব্বাস মুরসীর এই বক্তব্যের পর বদর ইহ্‌লাল বলেন, মাশায়খে কিরামের কালাম ও বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে যাহা কিছু বলা হইল তাহা বৈধ রাখার ক্ষেত্রে এ বক্তব্য। ইহার সারকথা হইল এই যে, অবচেতনা ও বিস্মৃতির পর্দায় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আচ্ছাদিত নন এবং সার্বক্ষণিকভাবে কথা ও কাজে মুরাকাবা, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধ্যান করার দিক থেকে চক্ষুষ্মান থাকে। আর এ উদ্দেশ্য লওয়া হয় নাই যে, নিজ চোখে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহের চিহ্নসহ আচ্ছাদিত নহে। কেননা, ইহা সম্ভব নহে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার বক্তব্যের সারকথা হইল, যাহা তাহারা চর্মচোখে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মিসকীন বান্দা (আবদুল হক) সাব্বাতাহুল্লাহু আলা তরীকিস সিদ্‌কি ওয়াল ইয়াকীন বলেন, সার্বক্ষণিক মুরাকাবা, শওক ও মহব্বতের আতিশয্যের উপস্থিতি, খেয়ালের চোখের দর্শন ও সদৃশতার কল্পনা করা আহ্‌লে তলব ও আসহাবে সুলূকের একটি স্তর। যাহার দ্বারা তাহারা লাভবান ও আনন্দিত হয়। আকৃতি ও সদৃশতার দর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা চলিতেছে। যেমনটি স্বপ্নযোগে বৈধ হইয়া থাকে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শারীরিক গঠনের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হইয়া পড়ে এবং ইহাতে শয়তানের কোন দখল থাকে না। জাগ্রত অবস্থায়ও ইহা অর্জিত হইয়া থাকে। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমনিভাবে স্বপ্নযোগে দেখিয়া থাকে, জাগ্রত ব্যক্তিও তেমনিভাবে দেখিয়া থাকে। 'বাহ্‌জাতুল আসরার'-এর ঘটনা দ্বারা এ কথাই বুঝা যায়।

এমনিভাবে এক হাদীসে আসিয়াছে, আমি হযরত মূসা (আ)-কে কয়েক হাজার বনী ইসরাঈলের সঙ্গে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পড়িতে ও হজ্জ করিতে দেখিয়াছি। এই দেখাকেও স্বপ্নযোগে ও ইয়াকীনের উপর অতিরঞ্জন করিয়া প্রয়োগ করা বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থী। ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন করার বিষয়টি প্রকৃত বিষয়। এর দ্বারা এই কথা অপরিহার্য হইয়া পড়ে না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কবর শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। আর এ কথাও অনিবার্য হইয়া পড়ে না যে, জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভকারী ব্যক্তিকে পারিভাষিক 'সাহাবী' বলা হইবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই সাহাবীর বিধানভুক্ত হইবেন। আর অনুভূতির জগতে যদি যিকরের প্রবলতার কারণে অদৃশ্যতা সাব্যস্ত করে এবং নিদ্রা বা স্বপ্ন সাব্যস্ত না করে, তবে কোন বিষয় ইহার অন্তরায় নহে। কেননা, ঘুম বা নিদ্রা হইতেছে মস্তিষ্কে স্বভাবগত সিক্ততার প্রবলতার কারণে অনুভূতি শক্তি লোপ পাওয়ার নাম। আর এ স্থানে অনুভূতির অদৃশ্যতা প্রত্যক্ষ যিকরের প্রবলতার কারণে হইয়া থাকে। আর তাহা জাগ্রত অবস্থায় হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় নহে।

আলোচনার সারাংশ এই দাঁড়াইল যে, ওফাতের পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ হইল আদর্শিক। যেমনটি সাধারণত মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়া থাকে। এমনিভাবে জাগ্রত অবস্থায়ও দর্শন লাভে ধন্য হওয়া যায়। আর মদীনা শরীফে কবর মুবারকে যে অস্তিত্ব শায়িত আছে, ওই অস্তিত্বেরই অনুরূপ। আর একই মুহূর্তে একাধিক স্থানে

www.pathagar.com

দ্যুতি ছড়াইতে পারেন যাহা সাধারণকে স্বপ্নযোগে আর বিশিষ্টদেরকে জাগ্রত অবস্থায় ধন্য করে। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার' গ্রন্থকার নিজেই বলেন, যে ব্যক্তি আওলিয়ায়ে কিরামের কারামতের সত্যায়ন করে আর আওলিয়ায়ে কিরাম ইহার যোগ্যতা রাখে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু নিঃসন্দেহে তাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যায়। এ দর্শন লাভটিও ওই রকমই। ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ সাধারণরা স্বপ্নযোগে যাহা দেখিয়া থাকে, বিশিষ্টরা তাহাই জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পায়। আর সাধারণ মানুষ শ্রম সাধনা করে যাহা অর্জন করে, আওলিয়ায়ে কিরাম বিনাশ্রমে আল্লাহু তা'আলার ধনভাণ্ডার হইতে তাহা পাইয়া যান। وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ "আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনি সরল পথ নির্দেশ করেন।"

সতর্কতা

যদিও স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভের বিষয়টি সত্য ও প্রমাণিত তথাপি উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ স্বপ্নযোগে যেসব বিষয় শরীআতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত শ্রবণ করিবে, সেসব বিষয়ে আমল করিবে না। এটা এই ভিত্তিতে নহে যে, দর্শনগতভাবে কোন সন্দেহ-সংশয় আছে। বরং এই জন্য যে, স্বপ্নযোগে অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ন্ত্রণশক্তি ও স্মৃতিশক্তি অরক্ষিত থাকে। যেমনটি উলামায়ে কিরাম বলিয়া থাকেন। আর বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয় শোনার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এমন শরঈ বিধান যাহা দীন ও শরীআতের পরিপন্থী (এর উপর আমল করা যাইবে না)। অন্যথায় যেসব বিষয় শরীআত পরিপন্থী নহে, সেইগুলি মানিতে ও উহার উপর আমল করিতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। কেননা, অনেক মুহাদ্দিস স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে হাদীস শোধরাইয়া নিয়াছেন। আর নিবেদন করিয়াছেন, অমুক হাদীস কী আপনার নিকট হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে ? ইহার উত্তরে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'হ্যাঁ' বা 'না' বলিয়া জওয়াব দিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করিয়াও কোন কোন শায়খ ইল্‌ম সম্পর্কিত ব্যাপারে উপকৃত হইয়াছেন। (মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

পবিত্র নামে নামকরণ করা

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র নামের সহিত নামকরণ করা বরকতময় ও কল্যাণকর এবং ইহলোক ও পরলোকে সংরক্ষণকারী হইবে। বস্তুত হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে খোদা (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দুই বান্দাকে দাঁড় করান হইবে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দান করিবেন। এই দুই বান্দা আরয করিবে, হে খোদা! আমাদিগকে কোন্ বস্তু জান্নাতের যোগ্য ও উপযুক্ত বানাইল ? অথচ আমরা একমাত্র তোমার রহমতের ভরসায় জান্নাতে গমনের আকাংখা ছাড়া কোন সৎকর্ম করি নাই। এতদ্শ্রবণে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত বলিবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর এই জন্য যে, আমার সত্তার শপথ, আমার উপর আবশ্যক করিয়া লইয়াছি যে, আমি উহাকে কখনও দোযখের অগ্নিতে প্রেরণ করিব না যাহার নাম আহমদ অথবা মুহাম্মদ হইবে।

www.pathagar.com

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী আকরাম (সা)-এর নিকট বলেন যে, আমার ইয্যত ও জালালের কসম! তোমার নামে নামকরণ করা হইয়াছে এমন কোন একজনের প্রতিও আমি শাস্তি দান করিব না। সায়্যিদানা আলী ইব্ন আবী তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, এমন কোন দস্তরখান নাই যাহা বিছান হয় এবং উহাতে মানুষ খাবার জন্য আগমন করে এবং তন্মধ্যে আহমদ অথবা মুহাম্মদ নাম বিশিষ্ট কেহ থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত গৃহকে যে গৃহে এই দস্তরখান খাবার জন্য বিছান হইয়াছে, উহাকে প্রত্যহ দুইবার পাক না করিয়া থাকেন। এই হাদীসটি আবু মানসুর দায়লামী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, কোন গৃহ নাই যে গৃহে মুহাম্মদ নাম বিশিষ্ট কেহ থাকে আর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত গৃহে বরকত দান না করিয়া থাকেন। এক হাদীসে আছে, যে সম্প্রদায় কোন পরামর্শের জন্য একত্রিত হয় এবং তন্মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে যাহার নাম মুহাম্মদ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা উহার নামের উপর বরকত দান করিবেন। এক হাদীসে ইহাও আছে যে, যাহার নাম মুহাম্মদ হইবে, নবী (সা) তাহার শাফাআত করিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। ইমাম বুখারী কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

فَانَّ لِى ذِمَّتَهُ مِنْهُ بَتَسْمِيَتِىْ * مُحَمَّدُ وَهُوَ اَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

মাদারিজুন্ নুবুওয়াত প্রণেতা একবার নবী গাওছুছ ছাকালায়ন (রা)-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। হাযিরীন মজলিস আরয করিলেন যে, মুহাম্মদ আবদুল হক (মুহাদ্দিস দেহলবী র) সালাম আরয করিতেছেন। নবী আকরাম (সা) দাঁড়াইয়া যান এবং মুআনাকা করেন এবং বলেন যে, তোমার উপর দোযখের আগুন হারাম। বাহ্যত এই সুসংবাদ ঐ নাম রাখার বরকতের ফল বুঝা যায়। কেননা, আলিমদের ইহাতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন আলিম পবিত্র নাম এবং তাঁহার কুনিয়াত দুইটাকে একত্রিত করিয়া নাম রাখা নিষেধ করিয়াছেন এবং পৃথক পৃথক করিয়া নাম রাখাকে সিদ্ধ রাখিয়াছেন (অর্থাৎ হয় আবুল কাসিম নাম রাখ অথবা মুহাম্মদ নাম রাখ)। ইহা বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম নববী বলেন যে, এই মাসআলা সম্পর্কে কয়েক রকম মাযহাব রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব হইল এই যে, ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব হইল যে, ইহা সম্পূর্ণ জাইয। তৃতীয় মাযহাব হইল এই যে, ঐ ব্যক্তির জন্য আবুল কাসিম নামই রাখা জাইয হইবে যাহার নাম মুহাম্মদ নহে। আর যাহারা জাইয বলিয়া থাকেন তাহারা নিষিদ্ধ হাদীসসমূহকে নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র জীবদ্দশার সহিত সম্পৃক্ত ও শর্তযুক্ত করিয়া থাকেন। এই উক্তি বিশুদ্ধতার অতি নিকটতম।

নবীর দরবারে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস পাঠের সময় গোসল করা, সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস্ পাঠকালে আওয়াযকে নিচু করিতে হয় যেরূপ পবিত্র জীবিতাবস্থায় যখন কথাবার্তা হইত, তখন আওয়াযকে নিচু রাখা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

www.pathagar.com

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

'হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়ায হইতে নিজ আওয়াযকে উচ্চ করিও না।' (সূরা হুজুরাত ঃ ২)।

এই জন্য যে, তাঁহার কথা ও পবিত্র হাদীস বর্ণিত ও গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা তাঁহার পর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁহারই আওয়াযের ন্যায় এবং কোন উচু স্থানে পাঠ করা আবশ্যক।

হযরত মুতাররিফ হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন লোকেরা ইমাম মালিক (র)-এর নিকট আগমন করিত, তখন তিনি প্রথমতঃ দাসীকে বাহিরে পাঠাইয়া জানিয়া লইতেন যে, শায়খের নিকট কি চাও। পবিত্র হাদীস অথবা শরীআতের মাসআলা ? যদি লোকেরা মাসআলার কথা বলিত, তাহা হইলে তক্ষুণি বাহিরে তাশরীফ লইয়া আসিতেন এবং তাহাকে মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দান করিতেন। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি ভিতর হইতেই মাসআলার উত্তর প্রেরণ করিতেন। আর যদি লোকেরা পবিত্র হাদীস শোনার দাবী করিত, তবে প্রথমতঃ তিনি গোসলখানায় গমন করিতেন, গোসল করিতেন, সাদা পোশাক পরিধান করিতেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন, চাঁদর পরিধান করিতেন, খোশবূ লাগাইতেন, চেয়ার রাখা হইত, তারপর তিনি বাহিরে আগমন করিতেন এবং চেয়ারের উপর উপবেশন করিতেন এবং চন্দন ও আম্বরের ধোঁয়া লাগান হইত এবং একাগ্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত হাদীস মুবারক পাঠ করিতেন। পবিত্র হাদীস পাঠ করা ছাড়া তিনি চেয়ারে উপবেশন করিতেন না। আলিমগণ বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব হইতে এই রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

হযরত কাতাদা এবং মালিক প্রভৃতি এক জামাআত বিনা উযূতেহাদীস পাঠ করা মাকরূহ জানিতেন। হযরত আমাশের তো এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি উযূ ছাড়া হইয়া যাইতেন, তখনই তিনি তায়াম্মুম করিয়া লইতেন। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা ও সন্দেহ নাই যে, নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র যিকর, হাদীস পাক, মুবারক নাম এবং তাঁহার পবিত্র সীরাত শ্রবণ করার সময় ঐরূপ সম্মান, তা'যীম এবং ইয্যত করা আবশ্যক, যেরূপ তাঁহার পবিত্র মজলিসে হাযির হওয়ার ক্ষেত্রে ছিল।

কোন আগন্তুকের কারণে হাদীস পাঠের সময় দাঁড়ান চাই না, এই জন্যে যে, উহাতে নবী (সা)-এর সম্মান ও ইয্যতের উপর অপরকে প্রাধান্য দান করা হয় এবং ইহাও যে, অন্যের প্রতি লক্ষ্য করার দরুন তাঁহার হাদীস বর্ণনার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া দুষ্কৃতকারী দুশ্চরিত্রবান বেদআতী লোকদের জন্য তো কখনও দাঁড়াইতেই নাই। পূর্ববর্তী সৎকর্মমনা লোকদের মধ্যে প্রচলিত এই রূপ স্বভাব ছিল যে, নবীর হাদীসে সম্মানের খাতিরে, না হাদীসের মধ্যে কর্তন করিতেন, না নড়াচড়া করিতেন। যদিও তাহাদের শরীরে কোন আপদ অথবা কষ্ট পৌঁছিত। বর্ণিত আছে যে, একদা ইমাম মালিক (র)-এর মুবারক শরীরে সতের বার বিচ্ছু দংশন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করেন নাই, ধৈর্য ও বরদাশত করিতেছিলেন। এবং হাদীসে নববীর সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে হাদীস বর্ণনাকে বন্ধ করিয়া দেন নাই। ইহাকে ইবনুল হাজ্জ 'আলমাদখালে' বর্ণনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে একটি ইহাও যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে নবী আকরাম (সা)-এর সহিত এক মুহূর্তের জন্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন অথবা তাঁহার পবিত্র মজলিসে উপবেশন করিয়াছেন এবং তাঁহার চেহারা মুবারকের উপর এক পশলা বা একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহার জন্য সাহাবা হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে নবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল এই যে, প্রচলিত নিয়ম ও স্বভাব অনুযায়ী তো লম্বা সময় থাকা এবং বেশী কাল পর্যন্ত সাহচর্য লাভ হওয়াকে সাহাবা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এইস্থানে এক পশলা এবং এক নযরও যদি লাভ হয়, তবে সাহচর্য অর্জিত হয়। এবং বিশুদ্ধ ও গৃহীত মতানুযায়ী ইহাকেই সাহাবা বলা হয়।

আলিমগণ এমন অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করিয়াছেন যাহা নবী আকরাম (সা) এবং অন্যান্য সকল আম্বিয়ার মধ্যে সংমিশ্রিত হইয়াছে। যথা নিদ্রার দরুন উযূ নষ্ট হওয়া এবং শয়তান কর্তৃক আকৃতি ধারণ না করা এবং হাই ইত্যাদি না উঠা। হইতে পারে নবী আকরাম (সা)-এর এক নযর চেহারা দর্শনে এবং সংসর্গ গ্রহণ করায় নূরানিয়ত এবং পরিপূর্ণতা অর্জিত হইয়া যায় এবং এই সকল গুণ তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। যেমন বলা হয় যে, নবী আনওয়ার (সা)-এর মাত্র এক দৃষ্টির এই ক্রিয়া ছিল যে, নির্বোধ ও অজ্ঞের উপরও যদি পতিত হইত তাহা হইলে সে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের মত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিত। কুওয়াতুল কুলূবে আছে যে, নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর ভুবন উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের এক ঝলক পতিত হইলে এমন সব দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে এবং এমন সব উদ্ভাসিত হইতে থাকে যাহা বহুবার চিন্তা এবং মুরাকাবা দ্বারাও অর্জিত হইতে পারে না। নবী সায়্যিদে আলম (সা)-এর এমন সব বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব আছে, যাহা অন্য কোন নবীর মধ্যে ছিল না, তাহাকেও নবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

তদুপরি রাসূলের (সা) বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার সকল সাহাবা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কেননা, তাঁহাদের প্রশংসা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাহাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে কোন একজন সম্পর্কেও কাহারও কোন কথা নাই। যেমন হাদীস বর্ণনাকারী (রাবী) গণের মধ্যে একজন সাহাবীর রিওয়ায়াতকে (মুনফারিদ) বিরল বলা হয় না। বরং সাহাবার পর তাবিঈন এবং তাহাদের পরবর্তী রাবীগণকে বিরল বলা হইয়া থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল সাহাবার ন্যায়পরায়ণতার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও তাহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি বাদ-বিসংবাদ ও বিদ্রোহিতার সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু সুধারণার বশবর্তী হইয়া বলা হইয়া থাকে যে, এই বিদ্রোহ ও ঝগড়া-বিবাদ তাঁহাদের চিন্তার ও ব্যাখ্যার ভুলের দরুন হয়ত হইয়া থাকিবে। তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালতের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাইবে না। কেননা, তাহারা নবী আকরাম (সা)-এর আদেশ ও নিষেধসমূহকে পরিপূর্ণরূপে পালন করিতেন। নবী (সা)-এর সংসর্গে উপস্থিত থাকিতেন, জিহাদে নবী (সা)-এর সহিত এক সাথে আরোহী থাকিতেন। সাম্রাজ্য ও দেশ বিজয় করিতেন, মানুষকে পথ-নির্দেশ ও হিদায়াত দান করিতেন, নামায, রোযা এবং যাকাত ইত্যাদি বন্দেগীসমূহের মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকিতেন। এই সকল কার্যে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইত না। এই সকল সাহাবার মধ্যে, শক্তি, শৌর্য, দান ও করুণা এবং সুন্দর

www.pathagar.com

চরিত্রের এমন পূতঃপবিত্র গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, যাহা অতীতের উম্মতগণের মধ্য হইতে কোন উম্মতেরই হাসিল ছিল না।

তদুপরি জমহুর আলিমাদের মাযহাব হইল যে, পবিত্র সম্মানিত সাহাবাগণ সকল উম্মতের মধ্যে অতি উত্তম উম্মত এবং ধর্মের শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। তাহাদের পরবর্তিগণের মধ্য হইতে কোন একজনও তাহাদের মরতবা ও মকাম পর্যন্তই পৌঁছিতে পারিবে না। কোন কোন আলিম যেমন হযরত ইব্ন আবদুল্লাহ্ (যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন) এবং তাঁহাদের ন্যায় অন্যরাও তাঁহাদের সম্পর্কে ইহাই বলিয়াছেন যে, ঐ জামাআতের সমতুল্য কে হইতে পারিবে যাহারা তাহাদের পরে আগমন করিবে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কর্মে তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে ? কোন সাহাবা হইতে কবীরা গুনাহ্ প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাঁহার উপর শরীআতের বিধান হদ জারী করা হইয়াছে। ইব্ন আবদুল্লাহ্ এই সকল হাদীস হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, যাহা শেষ উম্মতগণের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। কোন কোন হাদীসবেত্তাগণ বলিয়াছেন যে, সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বোত্তম হওয়ার গৌরব ঐ সকল মর্যাদাবান সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য যাহারা নবী আকরাম (সা)-এর সংসর্গে বহুকাল পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন এবং তাছাড়া নবী আকরাম (সা) হইতে অনেক ফয়েয এবং অনেক কল্যাণকর বস্তু অর্জন করিয়াছেন। প্রথম উক্তি হইল পসন্দনীয় উক্তি এবং সত্য কথা হইল এই যে, নবী (সা)-এর দশনের গৌরব ও ইয়াকীনের স্তর লাভ করা এবং সম্মুখ দর্শনের মাধ্যমে ঈমানের দ্বারা সম্মান লাভ করা সাহাবা-ই-কিরামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কেহ এমন শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন না। আর ঐ সকল হাদীস যাহা শেষ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের মর্যাদাই অন্যরূপ। কেননা, অদৃশ্যের প্রতি তাঁহাদের ঈমান। যেমন يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (না দেখিয়া ঈমান আনয়ন করিয়াছেন)-এর তাফসীরে মুফাসসিরগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসাল্লী অর্থাৎ নামায আদায়কারী নামাযের মধ্যে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী নবী আনওয়ার (সা)-কে সম্বোধনসূচক বাক্য দ্বারা, "আস্সালামু আলায়কা আইয়ুহান্নাবীউ" দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকে, তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও এমন সম্বোধন বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা হয় না। যদি এই সম্বোধন হইতে এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয় যে, নবী পাক (সা) ব্যতীত আর কাহারও প্রতি বিশেষরূপে সালাম প্রেরণ বাস্তবায়িত হয় নাই, তাহা হইলে ইহা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ঐ মুবারক হাদীসের অনুকূলে হইবে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমরা নবী আনওয়ার (সা)-এর সহিত নামায পড়িতাম, তখন আমরা বলিতাম, আস্সালামু আলাল্লাহ্, আস্সালামু আলা জিবরীল, আস্সালামু আলা মীকাঈল, আস্সালামু আলা অমুক। তারপর যখন নবী (সা) নামায হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন স্বীয় নূরানী চেহারা আমাদের দিকে ফিরাইয়া বলেন যে, আস্সালামু আলাল্লাহ বলিওনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সালাম অর্থাৎ প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি ও ভয় হইতে তিনি সংরক্ষণকারী ও সংরক্ষিত এবং বান্দাদের জন্য প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভয়ভীতি হইতে নিরাপত্তা ও শান্তিদানকারী তিনিই। তাহার উপর এমন সালাম (শান্তির বাণী) প্রেরণ করা যাহাতে ভয় ও পরমুখাপেক্ষার ধারণার উৎপত্তি হয়, অর্থহীন। সুতরাং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নামাযের বৈঠকে বসিবে, তখন সে বলিবে-

www.pathagar.com

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

যখন বান্দা এই সকল বাক্য বলিয়া থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক সৎকর্মশীল বান্দার প্রতি চাই স্বর্গে হউক অথবা মর্ত্তে— শান্তি বর্ষিত হইয়া থাকে (শেষ হাদীস পর্যন্ত)। সুতরাং এই স্থানে বিশেষরূপে রাসূলে আকরাম (সা)-এর উপর 'সালাম' প্রেরণ করা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যগণকে সাধারণের স্তরে রাখা হইয়াছে। আর যদি "আত্তাহিয়্যাতু" এর মধ্যে দৃষ্টির অগোচর হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন বাক্য দ্বারা 'সালাম' আরয করা বৈশিষ্ট্যের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহারও এক হেতু আছে। উহা এই যে, আলিমগণ বলেন যে, যেহেতু মি'রাজের রাত্রে সম্বোধন বাক্য মহিমান্বিত রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ হইতে রাসূল আকরাম (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, উহার পর উক্ত বাক্যকে পূর্ব অবস্থায়ই ঠিক রাখা হইয়াছে। বুখারী শরীফের শরাহ-এর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পর সম্মানিত সাহাবীগণ আস্ সালামু আলান্নবী বলিতেন, সম্বোধন বাক্য দ্বারা নহে।

কোন কোন আরিফগণের বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নামাযীদের "আত্তাহিয়্যাতু"-এর মধ্যে সম্বোধনবাচক বাক্য দ্বারা সালাম নিবেদন করা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রাত্মাকে দর্শন ও প্রত্যক্ষ করা এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে পবিত্র রুহ মুহূর্ত কালের মধ্যে প্রধাবিত হওয়া বিশেষতঃ নামাযীগণের রূহের মধ্যে শুভাগমন হইয়া থাকে। মোটকথা, নামাযের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দর্শন ও উপস্থিতি এবং পবিত্র সত্তা দ্বারা আলোকিত হওয়া হইতে গাফিল ও অজ্ঞ না থাকা চাই এবং আকাঙ্ক্ষা রাখা চাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূতঃ পবিত্র ও বিজয়ী রূহের উপর সর্বপ্রকার ফয়েয অবতীর্ণ হয়।

আর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহা একটি যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব হইয়া যায় যাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডাকেন, তাহাকে তদুত্তরে উপস্থিত হইতে হইবে, যদিও সে নামাযে রত থাকুক। যেমন এই মর্মে সাঈদ ইব্ন মুআল্লা'র হাদীস সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি নামাযে রত ছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকেন, আমি উত্তর দেই নাই। তারপর আমি পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি নামাযে মগ্ন ছিলাম, উত্তর দিতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি এই ইরশাদ করেন নাই? اِسْتَجِيْبُوْ لِلّٰهِ وَالسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ আল্লাহ্ এবং রাসূল যখন তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ আহ্বান কবূল করতঃ হাযির হইয়া যাও, এই কারণে যে, তোমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং উহা ত্যাগ করা গোনাহ হইবে। এখন এই কথা বলা রহিয়া গেল যে, ইহাতে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে কি যাইবে না? মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, শাফিঈ জামাআতের আলিমগণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই বিশ্লেষণ দান করিয়াছেন যে, নামায নষ্ট হইবে না। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা হউক হাদীস দ্বারা স্পষ্ট কোন কিছু জানা যায় না।

www.pathagar.com

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও একটি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অন্যদের প্রতি মিথ্যারোপ করার ন্যায় নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবে, তাহা হইতে কখনও কোন রিওয়ায়াত কবূল করা যাইবে না, যদিও সে মিথ্যা হইতে তাওবা করিয়া লউক, যেমন মুহাদ্দিসগণের একদল বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, "যাও যদি উহাকে তোমরা পাইয়া যাও, তাহা হইলে উহাকে হত্যা করিয়া দিও।' শায়খ মুহাম্মদ জুয়ায়নী যিনি ইমামুল হারামায়নের পিতা হইতেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করা কুফরী হইবে। কিন্তু তাঁহার এই বক্তব্যের প্রতি সম্মানিত ইমামগণ সমর্থন দান করেন নাই। সত্য কথা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা, শ্রেষ্ঠতম পাপ এবং কবীরা গোনাহ্। কিন্তু কাফির হইবে না, যতক্ষণ না সে উহাকে বৈধ জানিবে এবং যদি বিশুদ্ধরূপে তাওবা করে এবং উহার চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তবে তা গ্রহণীয় হইবে। আর সাক্ষ্য ও বর্ণনা দান করার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি সর্ব প্রকার পাপ হইতে চাই বড় হউক অথবা ছোট, ইচ্ছাকৃত হউক অথবা ভুলক্রমে প্রত্যেক পাপ হইতে মা'সুম নিষ্পাপ। ইহাই পরিগৃহীত মাযহাব। নিষ্কলুষতার ক্ষেত্রে সমস্ত আম্বিয়া-ই কিরামের ব্যাপারেও এই একই কথা। ইলমে কালামের কিতাবে এতদ্ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পাগল, উন্মাদ এবং দীর্ঘ সময় অজ্ঞানতার সম্বন্ধ করা সিদ্ধ নহে। এই জন্য যে, ইহা দূষণীয় ও ক্রটিযুক্ত। অনুরূপ সমস্ত নবীর প্রতিও ইহা আরোপ করা সিদ্ধ নয়। আল্লামা সুবকী (র) ইহার উপর সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, আম্বিয়াগণের অচেতনতা-অজ্ঞানতা অন্যদের অজ্ঞানতার বিপরীত হইয়া থাকে। ইহাও যে, দুঃখ-কষ্টের প্রাবল্য বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর হইয়া থাকে। দিলের উপর নহে। এই জন্য যে, হাদীসসমূহে আসিয়াছে যে, তাঁহাদের চক্ষু তন্দ্রাবিভূত হইয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় নহে। যখন তাহাদের হৃদয়কে নিদ্রা ও ঘুম হইতে যাহা অজ্ঞানতার চেয়ে অনেক হালকা ও পাত্লা, উহা হইতে নিরাপদ রাখা হইয়াছে, তাহা হইলে অচেতনতা হইতে অতি উত্তমরূপেই নিরাপদ হইবেন। উপরন্তু আল্লামা সুবকী (র) বলেন যে, আম্বিয়া কিরামের অন্ধ হওয়া অর্থাৎ চক্ষের জ্যোতি দূর হইয়া যাওয়াও জাইয নহে। কেননা, ইহা দোষ ও ক্রটি বটে। কোন নবীই কখনও অন্ধ হন নাই এবং হযরত শুআয়ব আলায়হিস সালাম সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার কোন প্রমাণ নাই। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পবিত্র চক্ষুর উপরে পর্দা পড়িয়াছিল। যদ্দরুন চক্ষের আলো ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ (তাহার চক্ষুদ্বয় শোকে সাদা হইয়া গিয়াছিল)-এর তফসীরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার উপর কান্নার প্রবণতা বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কান্নার প্রবণতার সময় তাঁহার চক্ষু অধিক অশ্রুসিক্ত হইয়া যাইত, মনে হইত যেন সাদা হইয়া গিয়াছে আর উক্ত

www.pathagar.com

শুভ্রতা, পানির দরুন ছিল। ইহা উক্ত উক্তির শুদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, প্রবল কান্নার সময় চিন্তাশক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে, অন্ধত্ব অর্জনের কারণে নয়। ইহার পর ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) বলেন যে, আলিমগণের মধ্যে ইহাতে মত বিরোধ রহিয়াছে যে, তিনি কি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র জামা, পবিত্র মস্তিষ্কে ফেলিবার সময় পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রত্যাবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ বলেন যে, অধিক কান্না ও চিন্তার দরুন তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি উহা অনুভব করিতে পারিতেন। তারপর যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র জামা তাহার নূরানী মুখমণ্ডলের উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি প্রবল হইয়া যায় এবং ক্ষীণতা দূরীভূত হইয়া যায়।

আল্লামা সুবকী (র) অন্ধত্ব সিদ্ধ না হওয়ার কারণ উহার দোষ ও ক্রটি হওয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তবে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের প্রতি এই ধরনের রোগাক্রান্ত হওয়া যাহা দূষণীয় ও ক্রটিপূর্ণ, তৎপ্রতি সম্বন্ধ করাও উক্ত হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকল পরীক্ষামূলক বালা-মুসীবত-এর ক্ষেত্রে যাহা হযরত আইয়ুব (আ)-এর সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রতি এমন রোগের সম্বন্ধে বলা, যাহা ক্ষতি ও ক্রটির কারণ হয়, যেমন কুষ্ঠরোগ, পক্ষাঘাত ও অন্ধত্ব, তাহাকে অশ্বপিষ্ট করা, ইত্যাদি এই সকলের সহিত সম্বন্ধ করা জাইয নহে। কেননা, এই সকল রোগ নুবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী এবং ক্ষতির ও ঘৃণার কারণ হইয়া থাকে। নবীগণ এই সকল হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন (হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন)। অনুরূপ হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর অন্ধত্বের কাহিনী ও ইহার কোন প্রকার প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতি সম্বন্ধ করা সরাসরি হুকুমজারী করা এবং দিব্য চক্ষে বাহাদুরী করা হইবে। অবশ্য হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে বর্ণনা শুদ্ধ বটে। এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, فَارْتَدَّ بَصِيرًا (অতঃপর তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে)। মুকাতিল বলেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ)- ছয় বৎসর পর্যন্ত চক্ষে দেখেন নাই, অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার দরুন তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী'র উক্তি হইল যে, চিন্তার প্রতিক্রিয়া অতিরিক্ত কান্নার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, অন্ধ হওয়ার মধ্যে নয়। ইহার উত্তর হইল এই যে, অধিক কান্নার মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া এবং অন্ধত্বের মধ্যে অধিক কান্নার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং চিন্তার ক্রিয়ার ফলে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, কোন নবী বোবা হন নাই, অবশ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ অন্ধ হইয়াছেন।

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, যে কেহই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দেয় অথবা কোন প্রকারের দোষারোপ ও অসম্মান করে তা প্রকাশ্য হউক অথবা ইশারায় তাহাকে হত্যা করা ওয়াজিব হইয়া যায়, ইহা সকলের সর্বসম্মত মত। অবশ্য ইহাতে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, এই হত্যা হদ্ হিসাবে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হইবে না, অথবা ইহা ধর্মান্তরিত হওয়ার দরুন হইবে। কেননা, মুরতাদ হওয়ার কারণে তাওবা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যদি তাওবা করে তাহা হইলে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম উক্তি হইল গ্রহণীয় এবং উহা

www.pathagar.com

এই অবস্থায় হইবে যদি সে মুসলমান হইয়া থাকে তবে, আর যদি কাফির হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহা হইলে ক্ষমা করিয়া দেওয়া যাইবে। এতদ্ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থের শেষের দিকে আসিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহার জন্য যাহা ইচ্ছা বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারেন। এই স্থানে দুই প্রকার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এক এই যে, নির্দেশাবলীর ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হুকুম করিবেন। দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ওহী অবতারিত হইতে পারে। বস্তুতঃ হযরত খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা)-এর জন্য খাস করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার এক সাক্ষ্য দুই সাক্ষ্যের সমতুল্য। ইহার ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বেদুঈনের নিকট হইতে একটি ঘোড়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তারপর সেই বেদুঈন এই বিক্রয়কে অস্বীকার করিয়া বসে এবং বলিতে থাকে যে, এই রকম কোন সাক্ষী আনয়ন করুন যে, সে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমি উক্ত ঘোড়া আপনার নিকট বিক্রয় করিয়াছি। যে মুসলমানই সেই বেদুঈনের নিকট আসিত, সেই বলিত যে, "তোমার উপর আফসোস হয়, আল্লাহ্র নবী সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না।" কিন্তু বেদুঈন কাহারও কথা শুনিল না, শেষ পর্যায়ে হযরত খুযায়মা আসিলেন এবং তিনি বলিলেন যে, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তুমি বিক্রয় করিয়াছ" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যে, হে খুযায়মা! তুমি কেমন সাক্ষ্য দিতেছ? অথচ আমি তোমাকে সাক্ষী মানি নাই। তিনি আরয করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার ঐশী বাণীকে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে কি আমরা উক্ত বেদুঈনের উপর আপনার কথাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না? এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খুযায়মা (রা)-এর সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষীর সমান স্থির করিয়াছেন। তাহাকে এই গৌরবের সহিত ভূষিত করেন। খাত্তাবী বলেন যে, অনেকেই এই হাদীসকে অস্থানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং বেদআতীদের একদল স্বীয় কোন সুপরিচিত জানাশোনা ব্যক্তির সাক্ষ্যকে বৈধকরণে ইহাকে মাধ্যম বানাইয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল এই যে, তাহাদের নিকট সুপরিচিত ব্যক্তি সে যা দাবী করুক (শরীআতের প্রমাণ ছাড়াই) উহা সত্য হইবে। অথচ হাদীসটির কারণ হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেদুঈনের প্রতি তাঁহার নিজ জ্ঞান অনুযায়ী আদেশ করিয়াছেন এবং হযরত খুযায়মা'র সাক্ষ্যকে স্বীয় বাক্যের সপক্ষে সমর্থন এবং বিপক্ষের উপর বিজয়ের উপর স্থুলাভিষিক্ত করিয়াছেন। এই কারণে অর্থের ক্ষেত্রে দুই জন সাক্ষীর সমপর্যায়ে হইয়া গিয়াছেন।

তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে আতিয়া (রা)-কে যিনি শ্রেষ্ঠতম সাহাবীয়াদের অন্যতম ছিলেন। মহিলাদের বায়আত করার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যেহেতু উক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে যে, وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ নেক কর্মে তাহারা আপনার নাফরমানী করিবে না, তাহাকে কান্নাকাটি করার অনুমতি দান করেন, বস্তুতঃ তিনি আরয করেন যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক গোত্র অন্ধকার যুগে কান্নাকাটার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিত, এখন আমার ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে, আমিও তাহাদের সহিত সহযোগিতা করি। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে আতিয়্যাকে কান্নাকাটার ব্যাপারে অনুমতি দান করেন। ইমাম নববী

www.pathagar.com

বলেন যে, উম্মে আতিয়্যাকে অনুমতি দান করা এবং কান্নাকাটার ব্যাপারে (অমুক বিশেষ গোত্রের জন্য) তাঁহাকে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে, এবং শরীআত প্রবর্তকের এই অধিকার আছে যে, যাহার জন্য যাহা চাহেন, খাস করিয়া দিতে পারেন।

তদ্রূপ হযরত আসমা বিন্ত উমায়সকে তাহার স্বামী হযরত জা'ফর ইব্ন আবী তালিব-এর শোক প্রকাশ করাকে ত্যাগ করার অনুমতি দান করিতে যাইয়া ইরশাদ করেন যে, তিনদিন পর্যন্ত শোকের পোশাক পরিধান কর এবং শোক কর, ইহার পর যা চাও তা করিও।

তদ্রূপ হযরত আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ারকে কুরবানী করার জন্য এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই এমন বকরীর বাচ্চাকে কোরবানী দেওয়া জাইয করিয়া দেন। ইহার কিসসা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়ছিলেন যে, ঈদের নামাযের পূর্বে যে কোরবানী করিবে উহার কুরবানী গণ্য হইবে না। হযরত আবূ বুরদা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক বকরী ছিল, আমি দ্রুত উহাকে যবাহ্ করার ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করিয়াছি (অর্থাৎ ঈদের নামাযের পূর্বেই যবাহ করিয়া ফেলিয়াছি এবং আরয করেন যে, আমি ধারণা করিলাম যে, যেহেতু আজকের দিন পানাহারের দিন, তাই আমি নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং নিজ প্রতিবেশীদিগকে আহার করাইয়া দিয়াছি। এখন আমার নিকট একমাত্র এক বৎসরের কম বয়সের উক্ত বকরীর বাচ্চা ছাড়া অন্য কোন পশু নাই। কিন্তু উক্ত বকরীর বাচ্চা (এক বৎসরের কম বয়স) মোটা তাজা এবং দুম্বার চেয়ে উত্তম মাংসবিশিষ্ট হইবে। আমার পক্ষ হইতে উহাকে কুরবানী করা যথেষ্ট হইবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, তোমার পক্ষ হইতে উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে কিন্তু তোমাকে ছাড়া অন্য কাহারও জন্য নয়।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মেয়েলোকের এক পুরুষের সহিত ঐ জিনিসের বিনিময়ে (যাহা সেই ব্যক্তি কুরআন হইতে মুখস্থ করিয়াছিল) বিবাহ দিয়াছিলেন। কুরআনে যদ্‌সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ......امْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ 'এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল যে, আমি স্বয়ং নিজকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হেবা (উৎসর্গ) করিয়া দিয়াছি' (সূরা আহযাব ঃ ৫০)। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহা জাইয ছিল, তখনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা কবূল করেন নাই। নিকটেই এক মিসকীন ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহিলা যদি আপনার উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহার বিবাহ আমার সহিত করাইয়া দিন। নবী (সা) বলিলেন, মহরানা হিসাবে দিবার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট পরিধানের এই তহবন্দ ব্যতীত কিছুই নাই। বলিলেন, তালাশ করিয়া দেখ, লোহার আংটিই হউক না কেন ? সে আরয করিল, কুরআন মাজীদের এই কয়েকটি সূরা ছাড়া, যাহা আমার স্মরণে আছে, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, কুরআনের যতটুকু পরিমাণ তোমার মুখস্থ আছে, উহার বদলায় বিবাহ করিয়া লও। তুমি তাহাকে শিক্ষা দান করিও এবং উহাকেই স্বীয় মহরানা ধার্য করিয়া লইও। কিন্তু তোমার পর আর কাহারও জন্য কুরআন মাহর হইবে না।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই ব্যক্তির সমান জ্বর আক্রমণ করিত, যাহাতে দ্বিগুণ প্রতিদান ও ছাওয়াব পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও একটি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার শুশ্রূষা এবং পবিত্র অবস্থার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তিন দিন আগমন করেন। ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানাযা নামায (যাহা শুধু দরূদ ও সালাম আরয করার কাজ ছিল) ইমাম ছাড়া মুসলমানেরা দলে দলে আদায় করে এবং ইহাও যে, ইন্তিকালের তিন দিন পর দাফন করা হয় এবং তাঁহার পবিত্র লাহদ শরীফে (কবর শরীফ) উক্ত কতীফা অর্থাৎ মখমলের চাদর বিছান হয়, যাহা তাহার পবিত্র দেহের নিচে বিছান হইয়াছিল, অথচ এই উভয়টাই একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া আর কাহারও জন্য সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ না বিনা ইমামতীতে জানাযার নামায পড়া, না কবরে কোন বস্ত্র ইত্যাদি বিছান জাইয আছে। কেহ কেহ বলেন যে, কবরে মখমলের চাদর ইত্যাদি বিছানো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম শুকরানের পক্ষ হইতে ছিল, যদসম্বন্ধে সাহাবাগণের জানা ছিল না। ইহা এইজন্য ছিল যে, আর কেহ যেন এই চাদরকে নিজের নীচে না বিছাইতে পারে। ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যমীন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। স্ব স্থানে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আসিবে। ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহকে যমীন ভক্ষণ করিবে না। অনুরূপভাবে সমস্ত আম্বিয়া-ই-কিরামের দেহও মাটি খাইবে না। পণ্ডিতগণ ইহাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অথচ উম্মতের কোন কোন ওলীর ক্ষেত্রেও তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন যেমন শায়খ আলী মুত্তাকীর কবর কোন এক বিশেষ দিনে উন্মুক্ত করা হয়, তখন দেখা যায় যে, তিনি ঠিক তেমনি সঠিকভাবে কাফন পরিধান করা অবস্থায় প্রতিষ্ঠ ছিলেন। সেই বিশেষ দিনটি এই ছিল যে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র যিনি সৎকর্মশীল যুবক ছিলেন, ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার কবরে যেন দাফন করা হয়। কেননা, পবিত্র মক্কায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, মৃতগণকে বুযুর্গের কবরের বরকত হাসিল করার জন্য উক্ত কবরে দাফন করা হইত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহ মাটিতে না খাওয়ার বাহ্যত উদ্দেশ্য হইল ইহা পবিত্র হায়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর এই জীবন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্যান্য নবীগণের সহিত সম্পৃক্ত।

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হায়াত ও স্থায়ী থাকার দরুন কেহ প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব তাঁহারই থাকিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন সাদ্কা হইয়া যায়। যেমন পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ আমি যা কিছু ত্যাজ্য করিব উহা সাদকা হইয়া যাইবে এবং ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ঐ সকল স্থানে ব্যয় করা যাইবে, যে সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যয় করিয়া থাকিতেন। অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-প্রপৌত্র, ফকীর এবং ওসিয়তকৃত এবং মুসলমানদের কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করা যাইবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পার্থিব কর্মে ব্যয় করিয়া থাকিতেন। ইহাও তাহার বৈশিষ্ট্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য তাঁহার সকল ধন-সম্পত্তির ওসিয়ত করা মুবাহ এবং তাঁহাকে ছাড়া অপর ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশের উর্ধ্বে ওসিয়ত করা জাইয নাই। এই একই হুকুম সমস্ত আম্বিয়া (আ)-এর জন্যও যে তাহাদের

www.pathagar.com

ওয়ারিস হয় না। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদসমূহের উদ্দেশ্য হইল যে, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ হযরত সুলায়মান হযরত দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হইয়াছেন এবং এই ইরশাদ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ হে আমার রব! তোমার পক্ষ হইতে আমার ওয়ারিস বানাইয়া দাও, যে আমার মীরাছ গ্রহণ করিবে। এই ওয়ারাছত দ্বারা নুবুওয়াত এবং বিদ্যা অর্থকে বুঝানো হইয়াছে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, নবী করীম (সা) তাঁহার নূরানী কবরে জীবিত আছেন। অনুরূপভাবে অন্য নবীগণও জীবিত আছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযান ও ইকামতের সহিত নামায আদায় করিয়া থাকেন।

ইব্‌ন যাবালা এবং ইব্‌ন নাজ্জার বর্ণনা করেন যে, হার্‌রার দিনগুলোতে (ইহা ঐ সময় যে যখন ইয়াযীদের সৈন্য-সামন্তরা মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করিয়া শত শত সাহাবাকে শহীদ করে, মেয়েদের শালীনতাহানি করে এবং মসজিদে নববীতে গাধা ও ঘোড়া বাঁধিয়া রাখে। এই সময় মসজিদে নববী শরীফে তিন দিন পর্যন্ত আযান দেওয়া হয় নাই এবং মানুষ মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ঐ সময় হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব পবিত্র মসজিদে নববীতে থাকিয়া যান। তিনি বলেন যে, যখন যুহরের ওয়াক্ত হইল, তখন আমি ব্যস্ত সমস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং নূরানী কবরের নিকট চলিয়া গেলাম এবং আমি আযানের আওয়ায শ্রবণ করিলাম এবং যুহরের নামায আদায় করিলাম। ইহার পর সকল নামাযের সময় পবিত্র কবর শরীফ হইতে আযান ও ইকামতের আওয়ায শুনিতে পাইতাম, এমনকি এইভাবে তিন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। তারপর যখন লোক প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাহারাও ঐরূপ শব্দ শুনিতে পায়, যেরূপ আমি শুনিতে পাইতাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিত ও যিন্দা থাকার উপর ঐকমত্য হওয়ার পর আলিমগণের মধ্যে এই ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিয়াছে যে, তিনি পবিত্র কবরে জীবিত আছেন, না অন্য কোন বিশেষ স্থানে অথবা ঐ সকল স্থানে যেখানে আল্লাহ্‌র মর্যী হয়, উহা চাই বেহেশতে হউক অথবা আকাশে অথবা অন্য কোন স্থানে হউক। যেরূপ তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ ছিলেন না। কেহ বলেন যে, আমরা তাঁহার পবিত্র দেহকে কবরে রাখিয়াছি। তথা হইতে বাহির হইয়া আসার উপর আমাদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহাই সুস্পষ্ট যে, তিনি উক্ত জ্যোতির্ময় স্থানেই বিদ্যমান আছেন। যদি কেহ বলেন যে, উক্ত জ্যোতির্ময় স্থান বড় সংকীর্ণ। উহার মধ্যে পবিত্র দেহ পরিবেষ্টিত থাকিবে এই কথা ঠিক নহে, তদুত্তরে আমরা ঐ হাদীস উপস্থাপিত করিব যাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, মু'মিন ব্যক্তির কবরকে, প্রত্যেক দিক হইতে সত্তর গুণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্যোতির্ময় কবরের প্রশস্ততার কি ধারণা করা যাইতে পারে! উহার প্রশস্ততা তো কল্পনা ও ধারণার ক্ষমতারও বাহিরে।

যদি কেহ এই কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান ও আরাম করার জন্য তাঁহার কবরের স্থান হইতে ফেরদৌস শ্রেষ্ঠতম ও অতি উত্তম ও উপযুক্ত স্থান। তদুত্তরে বলিব যে, কবর শরীফ হইতে কোন্ বেহেশত্ উত্তম ও মর্যাদাবান হইবে! (কেননা, জান্নাত তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলামদের বাসস্থান)। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত স্থানেই অবস্থান করেন তো ইমাম

www.pathagar.com

তাকীউদ্দীন সুবকী (র) বলেন যে, যদি উক্ত স্থানকে যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অঙ্গের সহিত মিলিত আছে, সকল বস্তু ও প্রত্যেক স্থান হইতে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় এমনকি পবিত্র কা'বা এবং আরশ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়, তো আমার জানা নাই যে, ইহাকে কোন মু'মিন ও মুসলমান বিলম্বে গ্রহণ করিবে। হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা)-এর এই হাদীসটি যে "নূরানী কবর হইতে তিনি আযানের আওয়ায শ্রবণ করিয়াছেন" এবং শবে মি'রাজ -এর ঐ হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমি হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার পবিত্র কবরে নামায পড়িতে দেখিয়াছি, উক্ত কথার সমর্থন দান করিতেছে। নবীগণকেও মি'রাজের রাত্রে আকাশসমূহে দর্শন করার হাদীস, এবং অন্যান্য ঐ হাদীস যে "আমি হযরত মূসা (আ)-কে সত্তরজন বনী ইসরাঈলের সহিত হজ্জ করিতে ও তালবিয়া পাঠ করিতে দেখিয়াছি" তো বলা হইয়াছে এই দর্শন অনির্দিষ্ট স্থানের ক্ষেত্রে হইবে।

আর যদি কেহ বলে যে, কুরআনে করীম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মওতের কথা ঘোষণা করিয়াছে, যেমন হক্ তা'আলা বলিয়াছেন اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ। (নিশ্চয় তোমাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও মরিতে হইবে) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, اِنِّىْ رَجُلٌ مَقْبُوْضٌ। (আমি এক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি) এবং সিদ্দীকে আকবর (রা) বলিয়াছেন فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) নিশ্চয়ই ইন্তিকাল করিয়াছেন। আর এই ইন্তিকাল ও রিহ্লাতের উপর সকল উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে তদুত্তরে বলা হইবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিঃসন্দেহে মৃত্যুর কষ্ট ও বেদনা এবং উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জীবিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, "আমি খোদার নিকট ইহার চেয়ে অতি বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে, তিনি আমাকে কবরের মধ্যে চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশী রাখেন।" আরও হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে নবীগণের দেহকে খাওয়া হারাম করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক জীবন, পার্থিব এবং আদর্শবান জীবনের সহিত জীবিত আছেন, যেভাবে তিনি জীবন ধারণ করিতেন ঐভাবেই আছেন। এই হায়াত শহীদদের হায়াত হইতেও বেশী পূর্ণতম। কেননা, শহীদদের হায়াত আত্মিক এবং পারলৌকিক এবং ইহা রূহের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহাদের রূহের জন্য প্রতিচ্ছবি দেহ ঐ জগতে সৃষ্টি করেন অথবা তাহাদিগকে দেহের মধ্যেই রাখিয়াছেন। যাহা তাহাদের ধারণ স্থানের হুকুম রাখে। যেমন হাদীসে আসিয়াছে যে, মুসলমানদের আত্মা সবুজ পাখিসমূহের পেটের মধ্যে রহিয়াছে যাহারা আরশের পর এর নিম্নদেশে আরাম গ্রহণ করিয়া থাকে অথবা জান্নাতে থাকে। কিন্তু আম্বিয়া আলায়হিস্ সালামগণের পবিত্র আত্মা তাঁহাদের নিজ পবিত্র দেহের মধ্যে পুনরায় দিয়া দেওয়া হয়, যাহা দুনিয়ায় তাহাদের ছিল। তাহাদের শরীর ও দেহ না গলিয়া যায়, না মাটি হইয়া যায়। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ আত্মাকে দেহ ছাড়াই সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগকে দেহের সহিত অস্তিত্বশীল রাখার উপর নকল বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর কবরের মধ্যে নামায আদায় করা। কেননা, নামায আদায় করিতে জীবিত দেহের প্রয়োজন হইয়া

www.pathagar.com

থাকে। আর ঐ গুণসমূহ যাহা মি'রাজের রাত্রে আম্বিয়াগণের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল দৈহিক গুণ ছিল উহা দ্বারা পার্থিব দুনিয়ায় যেমন ছিল তদ্রূপ জীবন হইতে হইবে, ইহার কোন প্রয়োজন নাই। পানাহার করা এবং শারীরিক অন্যান্য আবশ্যকতার প্রয়োজন যেমন আমরা ইহলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, থাকিতে পারে। বরং বরযখের মধ্যে (কবর) তাহার অন্য নির্দেশাবলী হইতে পারে। পানাহার এবং অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজনীয়তার মুখাপেক্ষী হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম এবং তথাকার অবস্থা স্বভাব বিরুদ্ধ। সম্ভবতঃ তথাকার বায়ু, স্ত্রীলোক, এবং রিযিক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক হইবে। যেমন শহীদদের শানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ তাহাদিগকে রিযিক দেওয়া হয়, তাহারা আনন্দিত আছেন। আর যদি জান্নাতের খাবার দেওয়া হয়, তাহাও আশ্চর্যের কিছু নয়। যেমন হাদীসে আসিয়াছে যে, يُطْعِمُنِىْ وَيُسْقِيْنِىْ তিনি আমাকে আহার করান এবং আমাকে তিনি পান করান।

এখন রহিয়া গেল জানা এবং শোনা সম্পর্কে। তাহা এই সকল পবিত্র ব্যক্তির জন্য উহার প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা ও সন্দেহ নাই। বরং পণ্ডিতগণের সবিস্তার আলোচনায় দেখা যায় যে, ইহা তো সকল মৃতেরই অর্জিত আছে। হাদীসমূহে আসিয়াছে তাহারা নামায পড়িয়া থাকে, তালবিয়া বলিয়া থাকে আর যিক্র ও তাসবীহ্ পাঠ করিয়া থাকে।

যদি কেহ বলে যে, বরযখ (কবর) না কর্মস্থল আর না তথায় শরীআতের নির্দেশাবলী প্রতিপালনের কষ্ট প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে এই আমল কি কারণে করিয়া থাকে ? ইহার উত্তর এই যে, আলমে বরযখের মধ্যে প্রতিদান ও ছাওয়াবকে জারি করা হয় এবং উহার উপর পার্থিব দুনিয়ার নির্দেশাবলী যথা অধিক কর্ম এবং অতিরিক্ত প্রতিদান ও ছাওয়াবের হুকুম জারীকৃত আছে এবং অনেক সময় বিনা কষ্টে অর্থাৎ শরীআতের প্রদত্ত কষ্ট ছাড়া স্বাদ উপভোগ করার নিমিত্ত কর্মের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার উদ্রেক হয় যেমন সকল নফল কর্মসমূহ ও সকল সৎকর্মসমূহের অবস্থা, ঐখানেও ইহাই। অতএব, জান্নাতে তাসবীহ্ করিবেন এবং কুরআন পাঠ করিবেন। বস্তুত কুরআনের ক্বারীর শানে উক্ত হইয়াছে وَرَتِّلْ وَارْتَقِ অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফাআতের দ্বার উন্মুক্ত করার সময় সেজদা করাও এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিমগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধন তাহার মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহার নফকার জন্য ওয়াদা করা হইয়াছে। হারামায়নের ইমাম ইহাকে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন যে, যাহা কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন উহা তাঁহার স্বত্বাধিকারেই প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফতের নিয়মানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ, সন্তানগণ, খাদিমগণ এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় করা সম্পর্কে একমত হইয়াছেন। হযরত আবূ বকর (রা) জানিতেন যে, তাঁহার মাল তাঁহার স্বত্বাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, পার্থিব নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে তাঁহার হায়াত প্রমাণিত, তদুপরি শহীদদের জীবনের চেয়েও তাঁহার জীবন পদ্ধতি অনেক প্রশস্ত ও অনেক উর্ধ্বে এবং কেহ কেহ স্বত্বাধিকার না থাকার পক্ষপাতী। মোটকথা উভয় প্রকার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলে করীম (সা)-এর এই ইরশাদ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ "আমি যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া যাইব উহা সকলই সাদকা হইয়া যাইবে" সত্য ও বরহক বটে (اللّٰه اعلم)।

www.pathagar.com

এই আলোচনা নবীগণের হায়াত এবং নবীকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হায়াতের আলোচনার প্রেক্ষিতে আসিয়া গিয়াছে, নতুবা কিতাবের শেষ ভাগে "ওফাতুন্নবী" অধ্যায়ে উভয় কথাই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইবে। যদিও বারংবার উল্লেখ করা ত্রুটির কারণ হইবে, কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ, ইহাতে বরং এই বিষয়টি দৃঢ় ও মযবূত হইয়া যাইবে।

বিশ্বনেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যের অপর একটি হইল, তাহার জ্যোতির্ময় কবরের উপর ফেরেশতা মোতায়েন করা হইয়াছে। যাহারা যিয়ারতকারিগণের সালাত ও সালাম তাঁহার খেদমতে পেশ করিয়া থাকেন। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ ও নাসাঈ এবং হাকিম বর্ণনা করিয়াছেন, এবং হাকিম এই হাদীসটি এই শব্দসমূহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِى عَنْ اُمَّتِى السَّلَامَ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে যমীনের উপর বিস্তার করিয়াছেন, যাহারা আমার উম্মতগণের সালাম আমার নিকট লইয়া হাযির হইয়া থাকেন।'

আর অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট হযরত আম্মারা (রা)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দিষ্টকৃত এক ফেরেশতা আছে, উহাকে এমন শ্রবণশক্তি দান করা হইয়াছে, যাহা অন্য কোন বান্দার মধ্যে নাই, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে কেহই যে স্থানেই আমার উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করিয়া থাকে ঐ ফেরেশতা আমার নিকট উক্ত সালাত ও সালাম পেশ করিয়া থাকে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহা একটি যে, বিশ্বনেতা (সা)-এর খিদমতে উম্মতগণের কার্যাবলী পেশ করা হইয়া থাকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের পাপমুক্তি কামনা করিয়া থাকেন। ইব্‌ন মুবারক সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এমন কোন দিন নাই যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে সকাল ও সন্ধ্যা উম্মতের কার্যাবলী পেশ না করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে তাহাদের কপাল এবং তাহাদের আমল দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার নিকট উম্মতের আমলসমূহকে পেশ করা হইয়া থাকে, তন্মধ্য হইতে যাহা মন্দ উহা আমি গোপন রাখি, আর যাহা ভাল উহা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করিয়া থাকি। "গোপন রাখি" দ্বারা পেশ না করা বুঝান হইয়াছে। যেন এইরূপ আল্লাহ্‌র নিয়ম জারী করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পেশ করার পর আমল প্রমাণ হইয়া যায় এবং যাহা পেশ করা হয় না উহা ধর্তব্যের বাহিরে রাখা হয়।

কা'ব আহবারের হাদীসে আছে যে, প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কবরে সত্তর সহস্র ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং জ্যোতির্ময় মাযার শরীফ তাওয়াফ করেন এবং স্বীয় বাহুসমূহ হেলাইয়া থাকেন। কিয়ামতের দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র কবর হইতে উত্থিত হইবেন, তখন ঐ সকল ফেরেশতার ভীড়ের মধ্যে বাহিরে তাশরীফ আনয়ন করিবেন এবং তাঁহাদের সহিত যুফাফ (মিলন) করিবেন। যুফাফের প্রকৃত অর্থ হইল "বধূকে স্বামীর গৃহে লইয়া যাওয়া" কিন্তু এই স্থলে ইহার অর্থ হইল প্রেমাস্পদকে প্রেমিকের সম্মুখে

www.pathagar.com

লইয়া যাওয়া হইবে। উদ্দেশ্য হইল এই যে, ফেরেশতাগণ তাঁহাদের ভীড়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মহামহিমান্বিত দরবারে লইয়া যাইবেন। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)।

পবিত্র মসজিদে নববীর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক মিম্বর তাঁহার পবিত্র হাউযের উপর অবস্থিত। যেমন হাদীসে আসিয়াছে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আমার মিম্বর জান্নাতের তুরআ (تُرْعَةٌ)-এর মধ্যকার একটি তুরআ। তুরআ'র ব্যাখ্যা দ্বার করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ ইহার অর্থ স্তর, কেহ কেহ কাননের উঁচু স্থানও করিয়াছেন। হাদীসে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন যে, এই সময় আমার পা জান্নাতের দরজার মধ্য হইতে এক দরজার উপর রহিয়াছে এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর আছে। অপর হাদীসে আছে যে, এখন আমি স্বীয় হাউযের উৎসের عُقْرٌ-এর উপর দাঁড়াইয়া আছি। যে স্থান হইতে হাউযে পানি আসে ঐ স্থানকে উৎস বা উক্‌র বলা হইয়া থাকে এবং ইহার ব্যাখ্যায় কোন কোন বিদ্বান, "হাউযের উপর মেম্বর হওয়া" বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা উহার জন্য সচেষ্ট হওয়া, উহা হইতে বরকত অর্জন করা এবং উহার সম্মুখে সর্বদা সৎ কার্যাবলী করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহাতে সে এইভাবে হাউযে নববীতে আগমন করার এবং উহা হইতে মনোহরণকারিণী স্বচ্ছ পানি পান করার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, সম্ভবতঃ নবীকুল শিরোমণি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার স্বীয় মিম্বরকে যে সম্মান দান করিয়াছেন কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্ট জীবের রং-এ পরিবর্তন করিবেন এবং হাউযে কাওছারের কিনারায় রাখিয়া দিবেন। উহাকে জান্নাতের তুরআ বা দ্বার বলা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে বিকাশ জন্য উহাকে দাঁড় করান হইবে। একদল এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ মিম্বর-এর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যাহা কিয়ামত দিবসে সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মসজিদে নববীতে মিম্বর রহিয়াছে ঐ মিম্বর নহে। এই ব্যাখ্যা হাদীসের শব্দদ্যোতনার ও পূর্বাপর ধারা অনুযায়ী বহু দূরের। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছেন যে, আমার হুজরা এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যকার এক দরজা এবং আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর আছে। এই বাণীর উজ্জ্বল দিক ঐ পবিত্র মিম্বরের দিকেই যাহা পবিত্র রওযা মুবারকের সীমা চিহ্নিতকরণের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। মদীনার ইতিহাসে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, কোন একজন বিদ্বানও এই হাদীসটিকে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করার পরিপন্থী নহেন এবং ইহাই হইল শুদ্ধ মত। কেননা, সত্য সংবাদদাতা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে যে সকল সংবাদ দান করিয়াছেন, উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বর এবং রওযা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি দরজা আছে। ইহাকে ইমাম বুখারী مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى এই শব্দ দ্বারা রিওয়ায়াত করিয়াছেন এই স্থানেও আলিমগণ সমালোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ কেহ বলেন যে, রাওযা-ই-জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের

www.pathagar.com

বাগান-এর সহিত এই পবিত্র স্থানকে তুলনা করা উদ্দেশ্য। রহমত অবতীর্ণ হওয়া এবং সৌভাগ্য অর্জন হওয়া ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তথায় যিকর ও সংসর্গ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করিবে। যেমন মসজিদগুলোকে রিয়াযে জান্নাত (জান্নাতের বাগান) নামকরণের মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুতঃ বলা হইয়াছে اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا (যখন তোমরা রিয়াযে জান্নাত অর্থাৎ মসজিদে গমন কর তখন উহার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখো) এই ইশারার ঝলকও ঐদিকেই। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌভাগ্যের স্বর্ণ যুগে, কারণ তথা হইতে জ্ঞানের ফল্গুধারা, আন্ওয়ারে আযকার এবং স্বর্গোপম সংসর্গ সকল লোক লাভ করিত।

কেহ কেহ বলেন যে, ইহলোকে ইবাদত ও বন্দেগী ঠিকমত করাই বেহেশতে প্রবেশের কারণ হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়াছে اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ অর্থাৎ বেহেশত হইল তলওয়ারের ছায়ার নীচে। আরও বলা হইয়াছে যে, اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ বেহেশত্ মায়ের পদতলে। উল্লিখিত দুই উক্তিই দুর্বল এবং দূরবর্তী বলিয়া গণ্য। এই জন্যে যে, জান্নাতের বাগানের সহিত উপমা দান করা, রহমত অবতীর্ণ হওয়া বেহেশতী কাননে প্রবেশ করা এবং উহার উপর ছাওয়াব পৌছা এই সমুদয় মসজিদ এবং প্রত্যেক কল্যাণকর স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সুসংবাদ মসজিদে নববী এবং মুবারক মিম্বরের সহিতই কেবল সম্পৃক্ত নয়। আর যদি ঐগুলিকে বিশেষ করুণা এবং জান্নাতের বিশেষ বাগানের সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহা দুর্বোধ্য ও কষ্ট কল্পনা হইতে বিমুক্ত নয়। ইহাই সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাক্য প্রকৃত এবং প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত। নবীর হুজরা এবং মুবারক মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থান প্রকৃতই জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান হইবে। উহা এই অর্থে যে, কিয়ামতের দিন ইহা বেহেশতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল স্থানের ন্যায় ফানা ও বিলীন হইয়া যাইবে না। যেমন ইব্‌ন ফারহুন ও ইব্‌ন জাওযী হযরত ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আলিমগণের এক দলের ঐকমত্যকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শায়খ ইব্‌ন হাজর আসকালানী এবং অধিকাংশ হাদীসের পণ্ডিতগণ এই উক্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়া থাকেন এবং মালিকী শ্রেষ্ঠ আলিমগণের মধ্য হইতে ইব্‌ন আবী জামরা বলিয়াছেন যে, এই পবিত্র স্থান আদতে বেহেশতের বাগানসমূহের এক বাগান, যাহাকে ঐ স্থান হইতে দুনিয়ার এই স্থানে অবতীর্ণ করা হইয়াছে। যেমন হাজারে আস্ওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহা কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুনরায় উহাদিগকে উহাদের আসল স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। করুণা বর্ষিত হওয়া এবং বেহেশতের যোগ্য হওয়া স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দরুন হইয়া থাকে। যেরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বেহেশতের এক বিশেষ পাথর দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্তর এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করা হইয়াছে, তদ্রূপ হাবীবে খোদা আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে "রাওযাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত" অর্থাৎ বেহেশতের বাগান হইতে এক বাগান দ্বারা বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। যদি উহা বাহ্যত সমস্ত দুনিয়ার সকল বস্তুর অংশের ন্যায় দেখা যায়, তবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। এই জন্যে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই জগতে প্রকৃতির গাঢ় পর্দা এবং মানবীয় স্বভাব ও চরিত্রের পর্দার অন্তরালে পরিবেষ্টিত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর বস্তু জগতের

www.pathagar.com

প্রকৃতাবস্থা বিকশিত হওয়া এবং পরকালের কার্যাবলী অনুভব করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যখন এই পবিত্র স্থানের প্রকৃতাবস্থা বেহেশতের বাগানের ন্যায় এক বাগানে পরিণত হইল, তখন পিপাসা ও উলঙ্গমুক্ত হওয়া যেমন বেহেশতের বৈশিষ্ট্য, এই স্থানেও তেমন হওয়া উচিত, তোমাদের এই ধারণা করা উচিত হইবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ لَكَ اَنْ لاَ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرٰى 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য জান্নাতে না ক্ষুধা হইবে, না উলঙ্গতা।'

এই জন্যে যে, হয়তো এই পবিত্র স্থানে বহিষ্কৃত হইয়া আসার পর, বেহেশতের প্রয়োজনীয়তাসমূহ পরিবর্তন ও পৃথক আকৃতি গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম (আ)- সম্পর্কে কি বলিবে? এই স্থানেও তো এই চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায় নাই।

যদি বলা হয় যে, এই ধরনের কথা বিনা শ্রবণে ও খবরে (হাদীস) প্রমাণিত হয় না। যেহেতু রুকন অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ এবং মকামে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য সকল দলীল ও সাক্ষ্য ইবাদত-বন্দেগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান আছে, তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব এবং উহা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এমন নয়, তদুত্তরে আমরা বলিব যে, ইহার প্রমাণও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস ব্যতীত আর কিছু নয়। যেরূপ রুকন এবং মকামে ইবরাহীম (আ)-এর প্রকৃত তথ্য ঐ সত্যবাদী ও সত্যের প্রতীক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ হইতে জানা হইয়াছে, তদ্রূপ রওযা শরীফ এবং পবিত্র মিম্বর-এর অবস্থাও জানা হইয়াছে। যদি এই স্থানে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে উভয় স্থানেই এই সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর যদি প্রকৃত অবস্থার দিকে লইয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে ইহা উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, নবী করীম (সা)-এর জন্য সর্বপ্রথম নূরানী কবর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি সর্ব প্রথম বাহিরে তাশরীফ আনয়ন করিবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ময়দানে হাযির হইবেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথম পুলসিরাত অতিক্রম করিবেন এবং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি হইবেন যিনি জান্নাতের দরজা সর্বপ্রথমে কড়া নাড়াইবেন। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আমি কিয়ামতের দিন বেহেশতের দ্বারে আসিয়া উহাকে খোলাইব। তারপর জান্নাতের খাযেন (কোষাধ্যক্ষ) বলিবে بِكَ اُمِرْتُ لاَ اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ আমাকে আপনার জন্যই হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, আমি আপনার পূর্বে আর কাহারও জন্য বেহেশতের দরজা যেন না খুলি এবং সম্ভবতঃ بِكَ -এর بِ শপথের জন্য হইতে পারে অর্থাৎ "আমাকে আপনার শপথ" শেষ পর্যন্ত। প্রেমিকদের প্রেমের স্বাদ উপভোগ করার জন্য এই অর্থ অত্যন্ত চমৎকার হইয়াছে। এবং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম শাফাআতের দরজা উন্মোচিত করিবেন।

নবী করীম (সা) বুরাকে আরোহণ করিয়া হাশরের ময়দানে সমবেত হইবেন এবং তাঁহাকে বেহেশতের অতি উত্তম খেলাতসমূহের মধ্য হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাত ও পোশাক দান করা হইবে। অন্য হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত হইবে। ঐ

www.pathagar.com

সময় আমি এবং আমার উম্মত "রাতল" অর্থাৎ উঁচু স্থানে থাকিব এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সবুজ জোড়া পরিধান করাইবেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা আরশের মকামে ঐ স্থানে দাঁড়াইবেন যেখানে কেহই দাঁড়াইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন না এবং তৎপ্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোক হিংসা ও ঈর্ষা করিবে। ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে "মকামে মাহমূদ" দান করা হইবে। মুজাহিদ, যিনি তাফসীরের ইমামগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ইমাম ছিলেন, তিনি বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল আরশের উপর উপবেশন করা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হইতে বর্ণিত আছে যে, কুরসীর উপর উপবেশন করা। তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হইয়াছে যে, ইহা সেই স্থান হইবে, যে স্থানে যে কেহই দাঁড়াইবেন তাহাকে চিনিতে পারিবে এবং তাহার প্রশংসা ও গুণগান করিবে। ইহা সাধারণভাবে সকল মকামের জন্যই হইবে। যেন তিনি যেখানেই অবস্থান করিবেন, ঐ স্থানই অলৌকিক ও অতি মর্যাদাময় হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রসিদ্ধ হইল এই যে, উহা শাফাআতের মকাম হইবে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, তাঁহার ঐ সকল ফাযায়েলের পর্যায়ে আলোচিত হইবে, যাহা পরলোকে প্রকাশ পাইবে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও যে, বিশ্বনেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাশরের ময়দানবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাফাআতের ক্ষমতা দান করা হইবে। যখন সমস্ত নবী ও রাসূলগণের পর তিনি আগমন করিবেন, তখন কাহাকেও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন এবং কাহারও স্তর বর্ধিত করাইয়া দিবেন ইহার বিস্তারিত বর্ণনা স্বস্থানে আসিবে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, বিশ্বনেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকিবে এবং কিয়ামতের দিন হযরত আদম (আ) এবং তাঁহাকে ব্যতীত আর সকলেই এই ঝাণ্ডার নিচে থাকিবেন এবং ওয়াসীলা যাহা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ স্তরসমূহের একটি স্তর, উহাও তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট হইবে। সারকথা হইল এই যে, নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত হইবেন এবং কিয়ামতের দিন সকলের প্রধান নেতা হইবেন। যেমন ইরশাদ হইল ঃ

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا وَهُوَ تَحْتَ لِوَائِىْ -

কিয়ামত দিবসে আমি আদম সন্তানের নেতা হইব এবং আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হইব এবং আমার হস্তে প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকিবে, ইহা গৌরবের দরুন নয়, ঐদিন আদম ব্যতীত অন্য নবীগণও আমার পতাকাতলে হইবেন।

যখন নবী করীম (সা) জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তাশরীফ আনয়ন করিবেন, তখন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন নিমিত্ত জান্নাতের খাযিন দাঁড়াইয়া যাইবেন এবং তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবেন এবং জান্নাতের দরওয়াযা খুলিয়া দিবেন আর বলিবেন যে, আপনার পূর্বে আর কাহারও জন্য ইহা উন্মুক্ত করি নাই আর না আপনার পর আর কাহারও জন্য আমি দাঁড়াইব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা জান্নাতের খাযিন অর্থাৎ

www.pathagar.com

বেহেশতের রক্ষকগণ সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেবক, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী তাহাদের বাদশাহ সমতুল্য হইবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হাউযে কাওছারকে তাঁহার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন, যেখান হইতে মধুর চেয়েও অতি সুমধুর এবং দুধের চেয়ে অতি শুভ্র, সফেদ পানি প্রবাহিত হইতেছে। এক রিওয়ায়াতে বরফের চেয়েও অধিক শুভ্র আসিয়াছে। অন্য এক রিওয়ায়াতে বরফের চেয়েও অধিক শুভ্র এবং উহার পিয়ালাসমূহ নক্ষত্রের চেয়েও অধিক আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, পরকালে প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করিয়া হাওয হইবে। যাহা তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মরতবা অনুপাতে হইবে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাওযে কাওছার তাহাদের সকলের চেয়ে অতি শ্রেষ্ঠ ও অতি মর্যাদাবান হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুরআন মাজীদের মধ্যে যেহেতু নবী (আ)-গণের তাওবা, মার্জনা এবং তাহাদের কর্তৃক সংঘটিত ভুল ও ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাই নবী করীম (সা)-এর পবিত্র শান সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ এইখানে সর্বপ্রথম বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর অতীত ও ভবিষ্যতের পাপ মার্জনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পাপকে গোপন রাখিয়াছেন। এই স্থানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলিয়া গিয়াছে।

অতীতে নবীগণকে যাহা কিছু চাহিবার ও কামনার পর দান করা হইয়াছে উহা নবী করীম (সা)-কে না চাহিতেই প্রদান করা হইয়াছে। যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) আরয করিয়াছিলেন যে, وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ "যেদিন লোকদিগকে উঠান হইবে, আমাকে অপমানিত করিও না" (সূরা শুআরা ঃ ৮৭)। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার উম্মতের শানে বলিয়াছেন যে,'يَوْمَ لَا يُخْزِىْ اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ' 'সেইদিন আল্লাহ্ নবীকে এবং তাহার ঈমানদার সঙ্গীগণকে যাহারা তাহার সহিত থাকিবে অপমানিত করিবেন না' (সূরা তাহ্রীম ঃ ৮)। হযরত মূসা (আ) আরয করেন, رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ হে আমার প্রভু! আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দাও, আর নবী করীম (সা)-এর শানে বলিয়াছেন اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা সাইয়েদে আলম (সা)-কে মকামে মহব্বত-এর উচ্চস্তর দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে "মকামে খিল্লাত" বন্ধুত্বের স্তর দ্বারা বৈশিষ্ট্যময় করিয়াছেন। মহব্বতের মকাম, খিল্লাতের মকাম হইতে উচ্চতর। প্রথম অধ্যায়ে ইহার আলোচনা চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন অধ্যাত্ম পণ্ডিতগণ খলীল ও হাবীবের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, খলীল খিল্লাত হইতে উদ্গত যাহার অর্থ হইল আবশ্যকতা, মুখাপেক্ষিতা এবং হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র প্রতি আপাদমস্তক মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল ছিলেন। এই জন্য তাহাকে হক্ তা'আলা খলীল বলিয়াছেন। আর হাবীব 'ফাঈলুন'-এর ওযনে যাহা কর্তৃবাচক (ফায়েল) অথবা ক্রিয়াবাচক (মাফউল) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিনা মাধ্যমে প্রেমিকও তিনি, প্রেমাস্পদও তিনি। আরও বলা হইয়াছে যে, খলীলের কর্ম খোদা তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হইয়া থাকে এবং হাবীবের সন্তুষ্টির

www.pathagar.com

জন্য খোদা তা'আলার কর্ম হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কেবলার দিকেই ফিরাইয়া দিব যাহার উপর আপনি সন্তুষ্ট আছেন। এবং বলিয়াছেন যে, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى খুব শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এত দান করিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। আর খলীল কখনও প্রেমাস্পদের দর্শনের জন্য তাড়াহুড়া করে না, যেমন বর্ণিত আছে যে, যখন রূহ কবয করার জন্য মালাকুলমওত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বিলম্ব করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে, বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কি হুকুম হয়! কি শীঘ্র উপস্থিত হইতে হইবে, না কিছু দেরী আছে ? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اِخْتَرْتُ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى। অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ্ তা'আলাকে গ্রহণ করিয়াছি। আর তিনি দু'আর মধ্যে বলিতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ النَّظْرَ اِلٰى جَلَالِ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ হে খোদা! আমি আপনার নিকট এমন দর্শন কামনা করিতেছি যাহা আপনার মহামহিমান্বিত চেহারার দিকে রয় এবং ঐ বাসনা যাহা আপনার দীদারের দিকে থাকে।

আর খলীল উহাকে বলা হয়, যাহার মার্জনা আকাঙ্ক্ষা পর্যায়ে থাকে যেমন বলিয়াছেন وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِى خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন (সূরা শুআরা ঃ ৮২)। আর হাবীব তাহাকে বলা হয় যাহার মার্জনা সুনিশ্চিত পর্যায়ে রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং আপনার উপর স্বীয় নিআমত পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন' (সূরা ফাত্হ ঃ ২)। আর খলীল দু'আ করিয়াছেন وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ যেদিন মানুষ উত্থিত হইবে সেইদিন আমাকে অপমানিত করিও না, এবং হাবীব সম্পর্কে বলা হইয়াছে يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ। যেদিন আল্লাহ্ নবীকে অপমান করিবেন না। মিসকীন বান্দা (আবদুল হক শায়খ মুহাক্কিক) বলিতেছে, তদুপরি অতিরিক্ত যাহা হইয়াছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ এবং ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আপনার সহিত ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং খলীল উহাকে বলা হয়, যিনি বলেন, اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ। আমি আমার প্রভুর দিকে গমন করিতে চাই, খুব শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন। এবং হাবীব হইলেন তিনি যাহার জন্য বলা হইয়াছে وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى এবং আপনাকে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পাইয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তিনি খলীল, যিনি বলিয়াছেন وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের মধ্যে আমাকে সত্যবাদী বানাইয়া দাও। এবং হাবীবের জন্য বলিয়াছেন যে, وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করিয়াছি। খলীল বলিয়াছেন যে, وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيْمِ এবং আমাকে নিআমতে পরিপূর্ণ জান্নাতের ওয়ারিসগণের মধ্যে বানাও। আর হাবীবের জন্য বলিয়াছেন اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। আমি আপনাকে কাওসার দান করিয়াছি। খলীল বলিয়াছেন وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ এবং বাঁচাও আমাকে

www.pathagar.com

এবং আমার সন্তানদিগকে মূর্তিপূজা হইতে এবং হাবীব হইলেন তিনি যাহাকে বলা হইয়াছে ঃ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا হে নবীর গৃহবাসীগণ! আল্লাহ্ তো ইহাই চান যে, তোমাদের সকল অপবিত্রতাকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে অতীব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবেন।

বস্তুতঃ প্রমাণিত হইল যে, খলীলের খিল্লাত (বন্ধুর বন্ধুত্ব)-এর তুলনায় হাবীবের মহব্বত (প্রেমিকের প্রেম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব উচ্চতর।

রাসূলে আকরাম (সা) যে সকল নফল নামায বসিয়া আদায় করিয়াছেন তাঁহার জন্য উহার ছওয়াব দাঁড়াইয়া আদায় করার সমান হইবে। অন্যান্যগণ ইহার বিপরীত, যেমন বলা হইয়াছে যে, مَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرَ الْقَائِمِ যাহারা বসিয়া নামায পড়িবে তাহাদের জন্য দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর ছওয়াবের অর্ধেক রহিয়াছে যদিও এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বিস্তৃত। কিন্তু সায়্যিদে আলম (সা) এই সাধারণ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হই। তখন আমি তাঁহাকে বসিয়া নামায পড়িতে দেখি। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, আপনি বলিয়াছেন صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ قَائِمًا বসিয়া নামায পাঠকারীর নামায দাঁড়াইয়া নামায পাঠকারীর চেয়ে অর্ধেক হয় এবং এই সময় আপনি বসিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন! বলিলেন হাঁ! ইহা আমার ইরশাদ বটে, কিন্তু لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হইতে কেহই আমার সমতুল্য নয়।

ইহলোকে আদম (আ)-এর যুগ হইতে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত যাহা কিছু আছে, উহা সকলই নবী (সা)-এর উপর উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এমনকি তাঁহাকে পূর্বের ও পরের সকল অবস্থাসমূহের জ্ঞান দান করা হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে কতিপয় অবস্থা তিনি তাঁহার সম্মানিত সাহাবীগণকেও অবহিত করিয়াছেন এবং কোন কোন গৌরবের অধিকারী সৎকর্মশীলদের নিকট হইতে শোনা গিয়াছে যে, কোন কোন আরিফ কিতাব লিখিয়াছেন। যাহার মধ্যে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সরওয়ারে আলম (সা)-কে খোদায়ী জ্ঞান হইতে সকলই জ্ঞাত করান হইয়াছিল। এই কথা বাহ্যত বহু দলীল-প্রমাণের পরিপন্থী। কিন্তু বক্তব্যকারীর এই কথা বলার কি উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলাই উহা ভাল জানেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

অনুগৃহীত উম্মতে মুহাম্মদিয়া (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অগণিত এবং এই সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যও রাসূলে আকরাম (সা)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা, তাঁহার উম্মত হইল অনুগত ও ফরমাবরদার উম্মত। জানিয়া রাখা উচিত যে, যদিও মানুষ ও জিন্ন সকলই তাঁহার উম্মত, কিন্তু সকল বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা যাহা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে, উহা ঐশীদান হিসাবে মানবের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আর রাসূল (সা) মানবের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমরা

www.pathagar.com

সকল উম্মতের মধ্যে উত্তম উম্মত। এই সম্বোধন বিনা মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের প্রতি করা হইয়াছে। ঈমান আনয়নে অগ্রগামিগণ দরবারের নৈকট্য লাভকারী হইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ সৎকর্মে নির্দেশ দান করিয়া থাকেন এবং মন্দ কার্য হইতে বিরত রাখেন। আসলে ইহাই হইল শ্রেষ্ঠত্বের এবং উত্তমতার কারণ। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই সৌন্দর্য অতি সুন্দররূপে রাসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের কারণে পূর্ণতর, শ্রেষ্ঠতর ও উন্নত রূপে বিরাজমান ছিল। কেননা, সম্মানিত সাহাবীগণ ভুবন উজ্জ্বলকারী জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যের মুশাহাদা (অবলোকন) এবং তদীয় জ্যোতির প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি ফয়েজ অর্জনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তীগণ হইতে উত্তম উম্মত, এবং শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ হইতে ইহার শ্রেণী বিন্যাসও করা হইয়াছে। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى الَّذِيْنَ اَنَا فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ সর্বোত্তম যুগ আমার ঐ যুগ যাহাতে আমি আছি, তারপর উহা যাহা উহার সংলগ্ন, তারপর উহা যাহা উহার সংলগ্ন।

এই তিন স্তর প্রসিদ্ধ, প্রথম সাহাবা, দ্বিতীয় তাবেঈন, তৃতীয় তাবে-তাবেঈন। সহীহ্ বুখারী শরীফের এক হাদীস হইতে চতুর্থ স্তরও জানা যায় যাহাদেরকে আতবায়ে তাবা' অর্থাৎ তবে তাবেঈনের অনুসরণকারীর যুগ বলা হয়। তারপর রাসূল (সা) বলেন যে, ثُمَّ يَفْشُوْ الْكِذْبُ। তারপর মিথ্যা বিস্তার লাভ করিবে। অর্থাৎ এই তিন অথবা চার স্তরের পর যেরূপ পূর্ব যুগে দীন, সত্যতা, সংযমতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে সুশৃংখল ও সুদৃঢ়তা ছিল উহার পর মিথ্যা, অসত্য ও অপবাদ ব্যাপক হইয়া যাইবে।

সম্মানিত সাহাবীদের একদল তো মুহূর্তকালের জন্য মুহাম্মদ মুস্তফার দীদারের সম্মান লাভের পর ঈমান আনয়ন করতঃ স্বীয় কাজ-কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং যাহাদের দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁহার খিদমতে এবং সাহচর্যে উপস্থিত থাকিয়া ফায়েদা হাসিল করার সুযোগ কোন প্রকার ঘটে নাই। তাহাদের সম্পর্কেও কোন কোন আলিম এই উক্তি করিয়াছেন যে, পরবর্তীদের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়াছে। জানা যায় নাই যে, তাহাদের এই উক্তির উদ্দেশ্য কি ? যদি তাঁহারা এই কথা বলেন যে, রাসূল (সা)-এর দীদার ও মুশাহিদার বরকতে তাহাদের এই কামালাত অর্জিত হইয়াছিল যাহা পরবর্তীদের অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাহচর্য থাকার দরুন হইয়াছিল। তবে এই স্থান নীরব থাকার স্থান এবং সাহাবীগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকার আবশ্যকতা দেখা দিবে, আর ইহা হইবে বাস্তবের পরিপন্থী। এতদ্‌সত্ত্বেও আসল কথা হইল এই যে, রাসূলে আকরাম (সা)-এর দীদার ও মুশাহিদা এমন এক ফযীলত, যাহা সমস্ত ফযীলত ও কামালাত হইতে শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম। আর কোন ফযীলত উহার সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। মোটকথা, যাহা কিছুই হউক ঐ সাহাবীবৃন্দ যাহারা তাঁহার স্বল্প সময়ের জন্য হইলেও সাহচর্য হাসিল করিয়াছেন তাহাদের পরে ঐ সকল আগমনকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেন যাহারা নবী করীম (সা)-এর সংসর্গ ও দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। উসূল শাস্ত্রবিদগণ সাহচর্য নামের সম্বন্ধকেও প্রথম দলের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, অথচ ইহা হাদীসের পণ্ডিতগণের মতের পরিপন্থী। কেননা, সাহচর্যের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দর্শন ও সাক্ষাতকে একবারের জন্য হইলেও যথেষ্ট মনে করা হয়।

www.pathagar.com

এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণতঃ অসংখ্য এবং এই সম্পর্কে বহু হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম ফযীলত হইল এই যে, তাহারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যেরূপভাবে আখেরী যামানার এই নবী (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সমস্ত নবীগণের যাবতীয় ফযীলত ও কামালতের ধারক ও বাহক এবং তাঁহার উপর মহোত্তম চরিত্র এবং প্রশংসিত গুণরাজির সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তদ্রূপ তাঁহার উম্মতও সর্বশেষ উম্মত এবং দীনের পূর্ণত্ব ও নিআমতের পরিসমাপ্তির সহিত সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেন যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং নিজের সমস্ত নিআমত তোমাদের উপর পরিসমাপ্ত করিয়া দিয়াছি। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) আরয করেন, হে প্রভু! তোমার নিকট আমার উম্মত যে রকমেরই হউক, তুমি তাহাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতরণ করাইয়াছ। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট বলেন যে, হে মূসা! তুমি উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত নও। সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর যতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব আমার রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর ততটুকু এককভাবে ঐ উম্মতের রহিয়াছে। মূসা (আ) আরয করিলেন, হে প্রভু! আমাকে সেই উম্মত দেখাইয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তুমি উহাদিগকে দেখিতে পারিবে না। কারণ, উহারা শেষ যামানার উম্মত হইবে। আমি তোমাকে উহাদের কথা শ্রবণ করাইব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ডাক দিলেন। তখন সকলেই সমস্বরে উত্তর দিল لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (হাযির আছি হে খোদা, হাযির আছি) অথচ ঐ সময় উহারা সকলেই নিজ নিজ মাতা-পিতার পেটে ও পৃষ্ঠদেশে ছিলেন। উহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, صَلٰوتِىْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ وَعَفْوِىْ سَبَقَ عَذَابِىْ আমার দান তোমাদের উপর এবং আমার রহমত (করুণা) আমার গযবের উপর এবং আমার মার্জনা আমার শাস্তির উপর, অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। তোমাদের দু'আ করার পূর্বেই আমি তোমাদের দু'আ কবূল করিয়া লইয়াছি। আর যে কেহ আমাকে এই অবস্থায় পাওয়ার চেষ্টা করে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে আমি তাহার সমস্ত গুনাহকে মার্জনা করিয়া দিব। রাসূলে কারীম (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা চাহিলেন যে, আমার উপর নিআমতের বিকাশের অনুগ্রহ করিবেন তো আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَاهُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনার দেহ সৃষ্টিকালে যখন আমি আপনার নূরকে আহ্বান করি এবং আহ্বান করি আপনার উম্মতগণকে মূসা (আ)-কে উহাদের বাক্য শোনাইবার জন্য, তখন ঐ সময় আপনি তূরের উপর অবস্থানকারী ছিলেন না। এই হাদীসটি কাতাদা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হাদীসটিতে আরও সংযোজিত হইয়াছে যে, তখন মূসা (আ) বলিলেন, হে প্রভু! আশ্চর্য হইতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর আওয়াজ কত উত্তম ও কত প্রিয়, হে পরওয়ারদিগার আমাকে উহা পুনরায় শ্রবণ করাও।

আবূ নুআয়ম হুলিয়া বর্ণনায় হযরত আনাস কর্তৃক এক রিওয়ায়াত বর্ণনা করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা (আ)-কে ওহী

www.pathagar.com

করেন যে, যে কেহ আমার দিকে এই অবস্থার সহিত মিলিত হয় যে, সে আহমদ (সা)-এর অস্বীকারকারী, তাহা হইলে আমি তাহাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করিব। মূসা (আ) বলিলেন, আহমদ (সা) কে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আহমদ ঐ সম্মানিত সত্তা, আমি আমার নিজের নিকট উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর, মর্যাদাবান আর কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই। আর যমীন ও আসমানকে সৃষ্টির পূর্বে তাহার নাম নিজ নামের সহিত আরশের উপরে লিখিয়াছি। আর ঐ সময় পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর জান্নাত হারাম করা হইয়াছে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এবং তাহার উম্মত সর্বপ্রথম উহাতে প্রবেশ না করিবেন। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, রাসূল (সা)-এর উম্মত তাহার অনুসরণে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল নবীগণের প্রথম হইবেন। যখন অতিথি প্রিয়তম হন, তখন তাঁহার অনুসারীরাও প্রিয় হইয়া থাকেন। সৃষ্টজীব (খালক) বলার উদ্দেশ্য হইল আম্বিয়া (আ) ব্যতীত হওয়া, অথচ সমস্ত মাখলুক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, এই উম্মত নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হইবে অথবা তাহাদের সমতুল্য হইবে। সাবধান, নিশ্চয় নিশ্চয় এমন নহে। এই জন্য যে, কোন ওলী নবীর স্তরে পৌঁছিতে কখনও পারে না।

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, উম্মতে মুহাম্মদী (সা) কিরূপ ? এবং তাহাদের গুণাগুণ কি ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গুণাবলীর বর্ণনা দান করেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) আরয করিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে সেই উম্মতের নবী বানাইয়া দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, সেই উম্মতের নবী তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে হইবে। তারপর হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে খোদা! আমাকে সেই নবীর উম্মত বানাইয়া দিন।

হযরত ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, হযরত শুআয়ব নবীর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, আমি উম্মী নবীকে প্রেরণ করিব, যিনি বধির কর্ণ, অন্ধ চক্ষু এবং গাফলতের পর্দায় আচ্ছাদিত অন্তরকে উন্মুক্ত করিবেন। তাঁহার জন্মস্থান পবিত্র মক্কা হইবে এবং তাহার হিজরতের স্থান পবিত্র মদীনা হইবে, এবং তাহার দেশ জেরুজালেম হইবে এবং রাসূল (সা)-এর গুণাবলী উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ এতটুকু পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্যে অতি উত্তম উম্মত বানাইব। তিনি সৎকর্মের আদেশ করিবেন এবং অসৎ কর্ম হইতে বিরত রাখিবেন। আমার একত্ববাদকে গ্রহণ করিবেন ও আমার উপর ঈমান আনয়ন করিবেন। আমার সহিত নিষ্কাম ও নির্লোভ আচরণ করিবেন এবং আমি যাহা কিছু নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি উহার সকলই সত্য প্রতিপাদন করিবেন। সূর্য ও চন্দ্রকে সংরক্ষণ করিবেন অর্থাৎ ইবাদতের সময় নির্ণয়ের জন্য উহার হিফাযত করিবেন। সৌভাগ্যবান ঐ সকল হৃদয়, মুখমণ্ডল এবং আত্মা, যাহারা আমার সহিত নিষ্কাম আচরণ করিয়া থাকে। আমি তাহাদের তাসবীহ্, তাকবীর এবং প্রশংসাবাদ ও তাওহিদকে তাহাদের মজলিসসমূহে, তাহাদের আরামের স্থানসমূহে এবং তাহাদের স্বগৃহে, ভ্রমণে এবং প্রত্যেক কার্যকলাপে ঐশী ইলহাম দান করিব। মসজিদে তাহাদের কাতার ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় হইবে। ফেরেশতা আরশের চতুষ্পার্শ্বে থাকিবে। উহারা আমার বন্ধু এবং আমার সাহায্যকারী হইবে। আমি তাহাদের মাধ্যমে স্বীয় বংশকে মূর্তিপূজক শত্রুদের

www.pathagar.com

হাত হইতে বাহির করিয়া আনিব। তাহারা আমার জন্য দাঁড়াইয়া, বসিয়া, রুকূ ও সিজদার সহিত নামায আদায় করিবে। তাহারা আমার সন্তুষ্টির জন্য আপন ঘর-বাড়ী এবং ধনসম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে আর আমার রাস্তায় জিহাদ ও সংগ্রাম করিবে। আমি তাহার কিতাব অর্থাৎ কুরআন দ্বারা অন্যান্য কিতাবসমূহকে, তাহার শরীআত দ্বারা অন্য শরীআতসমূহকে এবং তাঁহার দীনের দ্বারা অন্য দীনসমূহকে বিলুপ্ত করিয়া দিব। যে কেহ তাহার যুগ প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিবে আর তাহার দীন ও শরীআতকে গ্রহণ না করিবে, সে আমার নহে, আমি তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকিব। আমি তাঁহাকে সকল উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণশীল বানাইয়াছি। যাহারা সমস্ত উম্মতের উপর সাক্ষী হইবেন। যখন ক্রোধান্বিত হইবেন, তখন আমার তাহলীল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নারা (তাকবীর) লাগাইবেন এবং ঝগড়ার সময় তাসবীহ্ পাঠ করিবেন এবং আমার পবিত্রতা বর্ণনা করিবেন অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি বলিবেন এবং স্বীয় চেহারা ও অঙ্গকে পাক ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন আর পায়ের গোড়ালির উপর পায়জামা পরিধান করিবেন। প্রত্যেক উপরে উঠার ও নিচে নামার সময় আল্লাহু আকবর বলিবেন এবং কুরবানী দান করিবেন এবং তাহার কিতাব অর্থাৎ কুরআন তাহার বক্ষে (সীনায়) থাকিবে। রাত্রে বন্দেগীকারী এবং দিনে ব্যাঘ্র অর্থাৎ সংগ্রামকারী হইবেন। তাহারা কতই না সৌভাগ্যশালী যাহারা তাহার সহিত থাকিবেন এবং তাহার মাযহাব, তাহার পথ ও পদ্ধতির উপর থাকিবেন। ইহা আমার করুণা যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে দান করিয়া থাকি, আমিই শ্রেষ্ঠ করুণার মালিক। আবূ নুআয়ম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বন্দেগীতে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য

এই সকল শ্রেষ্ঠত্ব সেই অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের রহিয়াছে। যাহা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রহিয়াছে। সুতরাং উম্মতগণের উচিত হইবে ঐ সকল গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই গুণাবলীই হইল শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতার কারণ এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ যাহারা সাহাবা-ই-কিরাম এবং তাহাদের সমসাময়িক যাহারা ছিলেন তাহারা এই সকল গুণে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য গনীমতকে বৈধ করিয়া দিয়াছেন, অথচ ইহার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য ইহা বৈধ ছিল না। আর ইহাও যে, সমস্ত মাটিকে সিজদার স্থান বানাইয়াছেন (যথা ইচ্ছা তথা নামায পড়িতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্র করিয়াছেন (অর্থাৎ যদি পানি পাওয়া না যায় অথবা উহা লাভে ক্ষমতা না থাকে তবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতঃ নামায পড়িয়া লইবে) যেমন রাসূল আকরাম (সা)-এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ উম্মতগণও তাঁহার সহিত এই গুণাবলী ও নির্দেশাবলীর মধ্যে শরীক আছেন। কোন কোন বিদ্যান উযূকেও তাহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা এই হাদীস হইতে প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন যে, اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا الْمُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ নিশ্চয় কিয়ামতের দিন উযূর চিহ্ন দ্বারা আমার উম্মতের অঙ্গসমূহ জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় আগমন

www.pathagar.com

করিবে এবং হইতে পারে যে, এই ঔজ্জ্বল্য উযূর প্রতিদান হিসাবে তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত থাকিবে। কারণ, 'ফাত্হুল বারীতে হযরত সারাহ্র কিসসার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন পরাক্রমশালী কাফির বাদশাহ তাহাকে বন্দিনী করিতে চাহিল, তখন তিনি উঠিয়া উযূ করিলেন এবং নামাযে মশগুল হইয়া পড়িলেন। ধর্মযাজক জরীহ রাহেবের কাহিনীর মধ্যেও আসিয়াছে যে, উযূ করেন, নামায পড়েন এবং বাচ্চাদের সহিত কথা বলেন। সুতরাং ইহাই সুস্পষ্ট যে, এই উম্মতের জন্য যে বস্তু বৈশিষ্ট্য উহা হইল উজ্জ্বলতা ও জ্যোতি উযূ নহে। মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, কপালের এই উজ্জ্বল্য তোমাদের ছাড়া কাহারও মধ্যে নাই।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও রহিয়াছে। অতীতের উম্মতগণের মধ্যে চার ওয়াক্ত নামায ছিল, ইশার নামায ছিল না। সর্বপ্রথম আমাদের নবী করীম (সা) ইশার নামায আদায় করেন। হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, ইশার নামাযে বিলম্ব কর (এক-তৃতীয়ংশ রাত্র পর্যন্ত) এই জন্য যে, তোমাদিগকে অতীতের উম্মতগণের নামাযের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে।

আযান, ইকামত এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলাও এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে এক বৈশিষ্ট্য। কেননা, অন্য কোন উম্মতের প্রতি ইহা অবধারিত ছিল না। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) ইহা হইতে স্বতন্ত্র। কেননা, তিনি সম্রাজ্ঞী সাবাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আমীন বলাও একটি। হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, ইয়াহূদীরা আমাদের উপর কোন বস্তুর ক্ষেত্রে এমন হিংসা করে না যেমন তাহারা জুমুআর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। আর ইমামের পিছনে আমীন বলার উপরও উহারা ঈর্ষা করিয়া থাকে। এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নামাযের মধ্যে রুকূ করাও একটি বৈশিষ্ট্য। হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে রিওয়ায়াত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম যে নামাযে আমরা রুকূ করিয়াছি উহা আসরের নামায ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, এই রুকূ কি যাহা আপনি অদ্য ব্যতীত কখনও করেন নাই ? রাসূলে করীম (সা) বলেন যে, এই রুকূ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। ইহা হইতে এই কথা জানা যায় যে, আমাদের ধর্মেও প্রথম প্রথম রুকূ ছিল না। পরে উহার হুকুম হইয়াছে। অবশ্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي হে মারয়াম! স্বীয় প্রভুর বন্দেগী কর এবং সিজদা ও রুকূ কর এই আয়াত রুকূর অস্তিত্বের প্রতি সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধেও রুকূ ছিল। ইহার উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকেন যে, কুনূত এর উদ্দেশ্য হইল দীর্ঘস্থায়ী শক্তি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا এবং কুনূতের অর্থ বন্দেগী, কিয়াম এবং বিনয় আসিয়াছে। সুজূদ-এর উদ্দেশ্য নামায, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَأَدْبَارَ السُّجُودِ এবং রুকূর উদ্দেশ্য, বিনয়, নম্রতা। রুকূর উপর

www.pathagar.com

সিজদাকে প্রথম আনয়ন করা ইহা এক প্রকার ইঙ্গিত, যাহা এই অর্থের প্রতি সাক্ষ্য দেয়। নতুবা সুপ্রকাশ্য তো ইহাই যে, প্রথম রুকূ করা হইয়া থাকে। এই উত্তর ও ব্যাখ্যা ঐ অবস্থায় হইবে যে, ইহা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নতুবা পূর্ব উম্মতগণের মধ্যে রুকূ শুরু না থাকার উপর আলিমগণ হযরত আলী মুরতুযা-এর হাদীস হইতে প্রমাণ আনয়ন করিয়াছেন যদিও এই দলীল পূর্ণাঙ্গ নহে।

নামায ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাহাদের সারিবদ্ধতার মর্যাদা ও স্তর এবং আল্লাহ্র দরবারের নৈকট্যতায় ফেরেশতাদের ন্যায় নৈকট্যতাও এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার এক বৈশিষ্ট্য। আর যদি এই কথা বলা হয় যে, জামাআতও এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিগণিত, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে তাহিয়্যাতুস সালামও একটি। যেমন হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে বলা হইয়াছে। জ্ঞাত থাকা দরকার হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইল নামাযের শেষে সালাম ফেরান, আর তাহিয়্যাতুস সালামের বাহ্যিক অর্থ হইল সাক্ষাতের সময় একে অপরকে সালাম করা।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে জহুমার নামায ও যাহা অন্য উম্মতের মধ্যে নাই। যেমন হাদীসে আছে,

هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَهٰذَا اَنَا اللّٰهُ لَه‘وَالنَّاسُ فِيْهِ لَنَا تَبِعُ
الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

ইহা তাহাদের সেই দিন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ফরয করিয়াছেন তো এই দিন আল্লাহ্র। অপর লোক এই ক্ষেত্রে আমাদের পরে হইবে। ইয়াহূদীদের জন্য শনিবার আর খৃস্টানদের জন্য রবিবার রহিয়াছে। (বুখারী শরীফ)

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জুমুআর ঐ মুহূর্তে, যে সময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা কিছু চাওয়া যায় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে প্রায় চল্লিশটি বক্তব্য রহিয়াছে। যেগুলিকে শহরহে সিফরে সাআদত-এ আমি বক্তব্যসমূহের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ সৃষ্টি করতঃ বর্ণনা দান করিয়াছি। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম বক্তব্য হইল দুইটি। প্রথম এই যে, বর্ণিত ঐ বিশেষ মুহূর্ত হইল ইমাম খুতবার জন্য বাহির হওয়ার পর হইতে লইয়া জুমুআর নামায শেষ করা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় বক্তব্য হইল এই যে, ইহা জুমুআর দিনের শেষ মুহূর্ত হইবে। নারীগণের সর্দার হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্রা (রা) এই দিকে গিয়াছেন। আলিমগণ বলেন যে, এই শেষ মুহূর্তের সংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি এক খাদিম নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আরও আছে, যখন পবিত্র রমযানের প্রথম রাত্রি আসে, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন এবং যাহার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দান করেন তারপর আর কখনও তাহাকে শাস্তি দান করেন না। জান্নাতকে তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ও পরিপাটি করেন। এবং ইহাও যে, রোযাদারের মুখের গন্ধকে নিজের নিকট মৃগনাভি সুগন্ধের চেয়েও অধিক পবিত্র বানাইয়াছেন। আর রমযানের প্রত্যেক

www.pathagar.com

রাত্রে ফেরেশতারা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যখন তাহারা ইফতার করেন ঐ সময় হইতে সারা রাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যখন রমযানের শেষ রাত্র হয়, তখন তাহাদের সকলকে মার্জনা করিয়া দেন। আর এই উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে, যাহা তাহাদের পূর্বে কোন নবীর উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। হাদীসে আসিয়াছে যে, রোযাদার যখন ইফতার করে ঐ সময় হইতে ফেরেশতারা গুনাহ মার্জনা প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর সকল শয়তানকে শিকলে বাঁধিয়া বন্দী করিয়া দেওয়া হয়।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সেহরী খাওয়া, শীঘ্র ইফতার করা মুস্তাহাব করা হইয়াছে। রাত্রিকালের সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগমনকে মুবাহ করা হইয়াছে। অথচ আমাদের পূর্বে প্রত্যেকের উপর এই সকল বস্তু হারাম ছিল। অনুরূপ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমাদের উপরও ছিল। তবে ইহা রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শবে কদরও একটি, যেমন ইমাম নববী শরহে মুহায্যাব-এ বলিয়াছেন, এক রিওয়ায়াতে আছে বনী ইসরাঈল গোত্রে এক ব্যক্তি ছিল, যে সহস্র মাস পর্যন্ত খোদার রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং স্বীয় দেহ হইতে অস্ত্র নামাইত না। সাহাবীরা বলিতে লাগিলেন, আমাদের মধ্যে কাহারও কি এমন শক্তি আছে যে, এইরূপ করিতে সক্ষম হইবে? ঐ সময় সূরা-ই-কদর অবতীর্ণ হয় যে, শবে কদর সহস্র মাস হইতে উত্তম। আর এই একরাত্রি দাঁড়াইয়া কাটান সহস্র মাস খোদার রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। অবশিষ্ট আলোচনা স্ব-স্থানে আসিবে। পণ্ডিতগণের এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, রমযান মুবারকের রোযা এই উম্মতেরই বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি অথবা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয ছিল। পবিত্র আয়াতে আছে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল।

রমযানের রোযাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে স্পষ্ট কথা ইহাই যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হইয়াছিল। ইব্ন আবী হাতিম ইব্ন উমর (রা) হইতে সরাসরি রিওয়ায়াত করেন যে, রমযানের রোযা পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিল। এই হাদীসের সূত্রের মধ্যে এক ব্যক্তি উহ্য আছে। আর যদি আমরা এই কথা বলি যে, শুধু রোযা উদ্দেশ্য না উহার পরিমাণ এবং সময়ও, তবু এই উপমা সাধারণভাবে রোযার উপরই বর্তাইবে। বেশীর ভাগ আলিমের কথা ইহাই।

কর্মসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিপদের সময় ইস্তিরজা' অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" বলা যাহা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হইতে করুণা ও রহমতের অধিকারী এবং তাহার জন্য হিদায়েতের কারণ হইয়া থাকে। হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন এই উম্মতকে বিপদের সময় এমন বস্তু দেওয়া হইয়াছে, যাহা কোন নবীকে উহার অনুরূপ দান করা হয় নাই। উহারা এই ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন বলিয়া থাকে। যদি এই বস্তু নবীগণকে দেওয়া হইত তো ইয়াকুব আলায়হিস

www.pathagar.com

সালামকেও দেওয়া হইত, যখন তিনি বলিয়াছিলেন يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ –আহ আমার ইউসুফের উপর দুঃখ হয়।

মিসকীন বান্দা বলিতেছে যে, এই বাক্য এই উম্মতকে নবীদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ধারণা করিতে পারে। অথচ হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ এখন পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় আর আল্লাহ্ বলেন, ইহাও ইস্তিরজা'র সমার্থ বটে। আর তাহার এই বলা যে يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ উহার পরিপন্থী নহে। যদি ইহা বলা হয় যে, এই উম্মতকে ইস্তিরজার জন্য এমন বস্তু দেওয়া হইয়াছে, যাহা অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই, তবে উত্তম হইবে। স্পষ্ট রূপে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রে হইবে। নবীগণের ক্ষেত্রে নহে।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি ইহাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মত হইতে ইছর ও এগলালকে উঠাইয়া লইয়াছেন যা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ছিল। اصْرٌ (ইস্র) আলিফের যের দিয়া হইলে তখন উহার অর্থ হইবে অঙ্গীকার, ভার এবং গুনাহ, আর আলিফে যবর দিয়া হইলে অর্থ হইবে, ভঙ্গ করা, বন্ধ করা এবং বিরত রাখা। আর এগলালের অর্থ হইল ঈর্ষা পোষণ করা এবং গনীমতের মালে খিয়ানত করা। উহার উদ্দেশ্য হইল হ্রাস করা এবং ঐ সকল কষ্টকে দূরীভূত করা যাহা পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর নিশ্চিত ছিল। যথা ইচ্ছাকৃত ও ভুলজনিত হত্যার কিসাস অর্থাৎ হত্যার বিনিময় হত্যা, অপরাধীর অঙ্গ কর্তন, অপবিত্র স্থান কর্তন এবং স্বীয় আত্মাকে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাওবা করা, ইত্যাদি। বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে যদি কেহ রাত্রিকালে কোন গুনাহ করিত, তাহা হইলে পরবতী ভোর বেলা তাহাদের গৃহের ফলকে লিখিত থাকিত যে, উক্ত অপরাধের কাফফারা এই যে, স্বীয় চক্ষুদ্বয় উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তি তখন দুই চক্ষু উঠাইয়া ফেলিত।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহা আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ঐ সকল বস্তুকে সহজ করিয়া দিয়াছেন, যাহা তাহাদের ছাড়া অন্যদের উপর বড় কঠোর ছিল এবং তাহাদের ধর্মে কোন কঠোরতাকে বলবৎ রাখেন নাই। যেমন যদি কেহ দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে অপারগ হয়, তখন সে বসিয়া নামায আদায় করিবে এবং ভ্রমণাবস্থায় ইফতার এবং ফরয নামাযে কসর (হ্রাস)কে মুবাহ করিয়াছেন এবং ইহাদের উপর তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এবং যে সকল আল্লাহ্র হক ঐগুলির ক্ষেত্রে কাফ্ফারাকে শরীআত মোতাবিক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বান্দার হক সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দিয়ত (নির্ধারিত নিয়মে বিনিময় মূল্য) ও জামানতকে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, বলিয়াছেন বনী ইসরাঈলের উপর যে পরিমাণে কষ্ট ও কঠোরতা ছিল আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর হইতে ঐ সকল উঠাইয়া লইয়াছেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে ভুল, ভ্রান্তি এবং প্রত্যেক ঐ সকল কার্য যাহা জোরপূর্বক ও অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সকলকে ধর্তব্যের বাহিরে রাখিয়াছেন। নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলদের এই অবস্থা ছিল যে, যে বস্তুর জন্য তাহাদিগকে আদেশ করা হইত, যখন তাহারা তন্মধ্য হইতে কিছু ভুলিয়া যাইত

www.pathagar.com

অথবা কোন ত্রুটি হইয়া যাইত, তখন তাহাদের উপর দ্রুত শাস্তি পতিত হইত এবং তাহাদের গুনাহর পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে পানীয় ও আহার্য বস্তুসমূহের মধ্য হইতে কতিপয় বস্তু তাহাদের প্রতি অবৈধ করিয়া দেওয়া হইত। নিঃসন্দেহে রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفَعَ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ। হাদীসটি আহমদ ও ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম এবং ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করিয়াছেন। অথ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত হইতে ভুল ও ত্রুটি এবং জোর-জবরদস্তি উঠাইয়া লইয়াছেন। খাতা (ত্রুটি) ও নিসিয়ান (ভুল) বলা হয় যেমন রোযাদার রোযার কথা ভুলিয়া যাইয়া কিছু পানাহার করে। আর খাতা (ত্রুটি)-এর মধ্যে স্মরণ থাকে। কিন্তু ভুল করিয়া ফেলে যথা রোযাদারের রোযার কথা স্মরণে আছে। কিন্তু কুলি করার সময় পানি গলার ভিতরে হলকুমে চলিয়া যায়। আর ইকরাহ (জোর-জবরদস্তি)-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়াকে নিসিয়ান (বা ভুল) বলা হয় কাহারও নিকট হইতে জোরপূর্বক কোন কার্য করাইয়া লওয়া— যথা কোন অত্যাচারী জোর-জবরদস্তি করে এবং বলে যে, কুফরী কালেমা মুখে উচ্চারণ কর, তা না হইলে আমি তোকে হত্যা করিব, ঐ সময় যদি কুফরী কালেমা বলিয়া ফেলে এবং অন্তরে ঈমান-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হইবে না, উহার উপর ধৃত হইবে না। কিন্তু হাদীসে নাফস যাহাকে ধারণা ও ওয়াসওয়াসা বলা হইয়া থাকে, উহার কয়েক প্রকার রহিয়াছে। এক এই যে, হৃদয়ে হঠাৎ করিয়া কোন বস্তুর ধারণার উদ্রেক হয়, তো ইহাকে 'হাজিন' বলা হয়। ইহাতে কোন শাস্তি নাই, চাই যাই হউক না কেন। অতঃপর উহা যদি অন্তরে ঠাঁই করিয়া লয় এবং অন্তরকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, তাহা হইলে উহাকে খাতর (خاطر) বলা হয়। ইহার পর কাস্‌দ ও ইরাদার স্থান অর্থাৎ ইচ্ছা ও ইরাদার স্থান চাই ইচ্ছা করুক অথবা না করুক। ইহা এই উম্মত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। বরং যদি না করে, তবে এক নেকী লেখা হইয়া থাকে। ইহার পর আযম ও তাহিয়্যাহর স্থান; অর্থাৎ অবশ্যই করিতে চায় কিন্তু বাহ্যিক কোন বাধা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে করিতে পারে না। অবশ্য কোন বাধা না থাকিলে সে করিত, এই অবস্থায় ধৃত হইবে। এই কারণে যে, ইহা অন্তরের কর্ম এবং তৎপ্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

إِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ 'যাহা তোমাদের অন্তরসমূহে রহিয়াছে চাই উহা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব লইবেন।' কিন্তু ব্যভিচারিতার ইচ্ছা করা, ব্যভিচারিতা নহে। উহাকে ব্যভিচারিতার ন্যায় ধৃত করা হইবে না। বরং ইহা এমন এক গোপন পাপ যদ্দুরুন মানুষকে ধৃত করা হইয়া থাকে।

এই উম্মতের পূর্ণতম বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে একটি হইল, সর্বোত্তম উম্মত হওয়া। কারণ, উহার শরীআত অতীতের সমস্ত শরীআতের চেয়ে বেশী পরিপূর্ণ এবং ইহা এত সুস্পষ্ট যাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূলে আকরাম (সা) যখন চরিত্রের মহত্ত্ব এবং প্রশংসিত কর্মসমূহের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা হইলে অতি অবশ্য রূপে তাঁহার শরীআত এবং তাহার দীন, সমস্ত দীন ও শরীআতসমূহের চেয়ে পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম হইবে। হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের উপর চিন্তা করুন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে,

www.pathagar.com

উহাতে কঠিন কঠিন কষ্ট ছিল। যথা আত্মহত্যা করা, পবিত্র বস্তুকে অবৈধ করা, শীঘ্র শাস্তি অবতারিত হওয়া, অঙ্গীকার, চুক্তি এবং অসহনীয় বোঝা বহন করা এবং ক্রোধ ও পরাক্রমকে প্রকাশ করা ইত্যাদি। হযরত মূসা (আ) ভয়, গযব, এবং ধরপাকড়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র মাখলুকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কঠোর ছিলেন। বস্তুতঃ তাহার প্রতি মানুষের তাকাইয়া দেখার শক্তি ছিল না। বর্ণনা করা হয় যে, যেদিন হইতে হযরত মূসা (আ) কালামে রব্বানী এবং তাজ্জাল্লীয়ে ইলাহী দ্বারা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথোপকথন ও আল্লাহ্র নূরের ঝলক দ্বারা সম্মানিত ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, তখন হইতে স্বীয় মুখমণ্ডলের উপর বস্ত্র ফেলিয়া লইতেন, যাহাতে উহার সার্বক্ষণিক প্রতাপ, পরাক্রমের দরুন মানুষ অস্থির না হইয়া যায়। আর তাঁহার উম্মতের লোকেরাও কঠোর, শক্ত ও কঠিন স্বভাবের এবং বক্র প্রকৃতির ছিলেন। কঠিন এবং শক্ত আদেশসমূহ ব্যতিরেকে সংশোধন ও সোজাপথে আসিতে সক্ষম হইত না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন রূপে শক্ত হইয়া যায়। যেন উহা পাথর হইয়া গিয়াছে অথবা উহা অপেক্ষা অধিক শক্ত হইয়া গিয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর শরীআতে করুণা, সদাচরণ, অনুগ্রহ ও নম্রতা ছিল। উক্ত শরীআতে পরস্পর হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। খৃস্টধর্মে যুদ্ধ-বিগ্রহকে অবৈধ করা হইয়াছে। যদি তাহারা উহা করে, তাহা হইলে গুনাহগার ও অপরাধী হইবে। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতের লোকেরা মোলায়েম এবং নম্র স্বভাবের ছিলেন। তাহাদের উপর ইস্র, ইগলাল, কঠিন আদেশ ও শক্ত নির্দেশ ছিল না। বরং ইনজীলে আছে যে, যদি কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তাহার সম্মুখে বাম গালও পাতিয়া দাও। এবং যদি কেহ তোমাদের মধ্যে বস্ত্র সম্পর্কে ঝগড়া করে এবং বস্ত্র খুলিয়া রাখিতে চায়, তবে নিজ বস্ত্রের সহিত স্বীয় চাদরখানাও তাহাকে দিয়া দাও। আর যদি কেহ তোমাকে এক মাইল পর্যন্ত লইয়া যায়, তবে তুমি তাহার সহিত দুই মাইল পর্যন্ত চলিয়া যাও। এই যে বৈরাগ্যতা খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা সৃষ্টি করিয়াছে, উহা তাহাদের নতুন সৃষ্টি, বিদআত, ইহা কখনও আল্লাহ্ তা'আলা ইনজীলে তাহাদের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ কুরআন কারীম এই সম্পর্কে বলিতেছে যে, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ "এবং তাহাদের বৈরাগ্যবাদ যাহা তাহারা স্বীয় দীন হিসাবে স্থির করিয়া লইয়াছে উহা আমি তাহাদের উপর ফরয করিয়া দেই নাই" (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)। হযরত ঈসা (আ) প্রকৃত সৌন্দর্য, সদাচরণ এবং নেকীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন, যেরূপ হযরত মূসা (আ) পরাক্রম, প্রতাপ, মহা শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সা) পূর্ণতা, মহাপরাক্রমতা ও সৌন্দর্যতা বিকাশের মহা কেন্দ্রস্থল ছিলেন এবং শক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, কঠোরতা ও নম্রতা, দয়া ও করুণার আধার ছিলেন। তাঁহার শরীআত সমস্ত শরীআতের মধ্যে পূর্ণতম, তাঁহার উম্মত সকল উম্মতের মধ্যে পূর্ণতম, এবং তাহাদের সকল অবস্থা ও স্তরসমূহও পূর্ণতম ছিল। সুতরাং তাহার শরীআত হইল চরম মধ্যমবর্তী, ন্যায় ও পরম পূর্ণত্বের উপর অধিষ্ঠিত। তাঁহার শরীআতে কোথাও ফরয ও ওয়াজিব আবার কোথাও নফল ও মুস্তাহাব, কঠোরতার ক্ষেত্রে কঠোর এবং নম্রতার ক্ষেত্রে নম্র

www.pathagar.com

কোন স্থানে শাণিত তরবারি তো কোন স্থানে করুণা ও দান, কোথায় ন্যায় ও সুবিচারের বিকাশ তো কোথায়ও অনুগ্রহ ও করুণার বারিবর্ষণ। বস্তুতঃ এক সময় পাপের পরিবর্তে তৎসমতুল্য বদী রহিয়াছে। বলা হইতেছে এবং ইহাই হইল সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণণতা। আবার অন্য সময় ইরশাদ করা হইয়াছে فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰه। যে ক্ষমা করে এবং সংশোধন করিয়া লয় উহার প্রতিদান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর। আর ইহা তাহার অনুগ্রহ ও করুণা اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারীকে পসন্দ করেন না। আর এই অত্যাচারকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا مِثْلَ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه এবং যদি কেহ তোমাদিগকে কষ্ট দেয় তো তোমরা উহার কষ্টের পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ইহা সুবিচার ও ইনসাফকে অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রমাণ করিতেছে এবং অন্যায় অত্যাচারকে অবৈধ করিতেছে وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় উহা ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য কল্যাণকর হইবে। ইহাতে অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি সাবধানতা ও ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর এই উম্মতের প্রতি প্রত্যেক কষ্টদায়ক কর্মকে অবৈধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পসন্দনীয় কল্যাণকর কার্যকে মুবাহ করা হইয়াছে। অবৈধকরণ এই শরীআতের রহমতস্বরূপ। তা না হইলে পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল কারণে শাস্তি দান করিয়াছেন।

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ তিনি তোমাদিগকে বাছিয়া লইয়াছেন, ধর্মের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন প্রকার কঠোরতা রাখেন নাই। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)।

এই উম্মতগণকে লোকদের উপর সাক্ষ্যদাতা বানাইয়াছেন এবং রাসূলগণের স্থানে ইহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। কারণ, উহারা স্ব স্ব উম্মতের প্রতি সাক্ষী হইবে এবং এই উম্মতকে خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ মানুষের মধ্যে যত উম্মত অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে উহাদের সকলের মধ্যে উত্তম বানাইয়াছেন এবং ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব অলৌকিকত্ব এবং স্তর, ও মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। اَللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ। আল্লাহ্ স্বীয় রহমতকে যাহাকে চাহেন তাহাকে বিশেষ রূপে দান করিয়া থাকেন। তিনি সুমহান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, ইহারা সকলে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে সম্মিলিত হইবে না। এই হাদীসটি বহু সূত্রের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার উম্মত যেন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উপর সম্মিলিত না হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রার্থনাকে কবুল করিয়াছেন এবং এই অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই ইজমা দলীল হওয়ার জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং উম্মতদের সম্মিলিত হওয়া দলীলে রূপে পরিণত হইয়াছে। আর তাহাদের মতবিরোধ রহমতে পরিগণিত হইয়াছে। যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য শাস্তি ছিল। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, اِخْتِلَافُ اَصْحَابِىْ لَكُمْ رَحْمَةٌ। আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। ফাতওয়া দানকারী ও ইজতিহাদকারী বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বদা এই মতানৈক্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ

www.pathagar.com

কেহ বৈধ হওয়ার ফাতওয়া দিয়াছেন তো অপর জন্য অবৈধ হওয়ার এবং কেহ কাহারও প্রতি দোষারোপ করিতেন না। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই হাদীস দ্বারা কৃষি ও কারিগরি ক্ষেত্রে উম্মতের মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা কলাকৌশল/শিক্ষার কারণ এবং পার্থিব বিষয়সমূহ এবং কারিগরী কর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সহজতর পথের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অনুরূপ ফিকাহর মাসআলাসমূহে আলিমগণের মতবিরোধ হইতে রুখসাত (অনুমতি) এবং দীনের কর্মসমূহের প্রশস্ততার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও যে, তাউন (প্লেগ) তাহাদের জন্য সাক্ষ্য ও রহমতস্বরূপ অথচ অন্য উম্মতের জন্য উহা আযাবস্বরূপ ছিল। যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে যে, اَلطَّاعُوْنُ رِجْزٌ اُنْزِلَ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ। প্লেগ (তাউন) এক শাস্তি যাহা বনী ইসরাঈলদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপর রিওয়ায়াতে عَلٰى مَنْ قَبْلَكُمْ 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর' আসিয়াছে।

বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ তাউন (প্লেগ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদতস্বরূপ। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِاُمَّتِىْ وَرَحْمَةٌ بِهِمْ وَرِجْزٌ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শাহাদত এবং তাহাদের সহিত অনুগ্রহ এবং কাফিরদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ এবং উহা হইতে পলায়ন করা সৈন্য বাহিনী হইতে পলায়ন করার সমতুল্য। যেমন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) এবং হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসে আছে যে, প্লেগ হইতে পলায়ন করা নিঃসন্দেহে অপরাধ ও কবীরা গোনাহ অন্য স্থানে এই সম্পর্কে আমরা আরও অধিক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণনা দান করিয়াছি।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দুই ব্যক্তি ভাল বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তখন তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতদের যখন একশত ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করিত, তখন তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইত। পবিত্র হাদীসে আছে ঃ

مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ بِشَرٍّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارَ

তোমাদের মধ্য হইতে যদি কেহ কাহারও জন্য উত্তমতার সহিত প্রশংসা করে, তখন তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। আর যদি কেহ কাহারও প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে তো তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া যায়।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও যে, অতীতের উম্মতদের তুলনায় এই উম্মতের আয়ু কম এবং তাহাদের আমলও অল্প, কিন্তু উহার প্রতিদান ও ছওয়াব অনেক অধিক। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের কাহিনী এবং তোমাদের পূর্ববর্তী ঐ লোকদের কাহিনী যাহারা ইয়াহূদী ও নাসারা ছিলেন, ঐ ব্যক্তির কাহিনীর ন্যায় যে, এক ব্যক্তি তিন জন মজুর রাখিল সে একজনকে দিয়া সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অর্থাৎ যুহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত কার্য করাইল, দ্বিতীয় জনকে দিয়া যুহর হইতে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত কার্য করাইল এবং তৃতীয়

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে দিয়া আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কার্য করাইল এবং প্রত্যেকের জন্য এক দিরহাম বেতন ধার্য করিল, যখন মজুরদের বেতন দেওয়ার সময় হইল, তখন তিন মজুরই দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদের কর্মে পার্থক্য আছে এবং বেশ-কম রহিয়াছে, কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা যে, আমাদের সকলের বেতন এক সমান ধার্য করা হইয়াছে! সে ব্যক্তি তখন বলিল যে, আমি যে সকল শর্ত করিয়াছিলাম, উহা তোমাদিগকে দিয়া দিয়াছি। বাকী এখন আমার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিব। প্রথম মজুরের দ্বারা ইয়াহূদীদের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় মজুরের উপমা নাসারাদের সহিত দেওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয় মজুরের দ্বারা এই অনুগৃহীত উম্মতের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আরেকটি হইতেছে হাদীসের সূত্র দান করা। কারণ, ইহা দ্বারা নবী করীম (সা)-এর হাদীসের ধারা স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা প্রবাহ অমনি থাকিবে। ইহা তাহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সীনা-বসীনার সুন্নাত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে এই মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান দান করিয়াছেন। কেননা, পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে কোন উম্মতকেই এই মর্যাদা দান করা হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও যে আম্বিয়া আলায়হিস্ সালামের সহীফা তাহাদের হস্তেই ছিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের ঐ সকল সংবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছিল যাহা তাহারা অনির্ভরযোগ্য লোকদের নিকট হইতে অর্জন করিয়াছিল। আর তাহাদের সম্মুখে তাওরাত, ইনজীল এবং আরও যে সকল সংবাদ ইত্যাদি তাহারা সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিয়াছিল উহার মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় ছিল না। আর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন এই উম্মতগণ নবীর হাদীসসমূহকে ঐ সকল বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য মহান ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্জন করিয়াছেন, যাহারা নিজ নিজ যামানার সত্য ও বিশ্বাসী রূপে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তাঁহারাও এই রূপেই অন্যের নিকট হইতে এমনকি হযরত সায়্যিদে আলম (সা) হইতে অর্জন করিয়াছেন। এবং অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করিতেন যাহাতে কে বেশী স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন ও কে বেশী সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখিতেন উহার পরিচয় জানিতে পারেন এবং পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহাদের স্বীয় শায়খদের সহিত সংসর্গ ও উঠাবসা অধিক কালের ছিল, আর উহাদের যাহাদের সংসর্গ ও উঠাবসা অল্প সময়ের জন্য ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার সনদ (সূত্র) এবং বিভিন্ন পন্থায় হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ হইতে থাকে এবং ভুল-ত্রুটি এবং পদস্খলন ও ধ্বংস হইতে হাদীসসমূহের সকল অক্ষর ও শব্দসমূহকে দৃঢ়তার সহিত সংরক্ষণ করিতে থাকেন। ধারাবাহিকরূপে মার্জিত নির্দোষ ও পরিচ্ছন্ন করিতে থাকেন। বিশেষতঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রণেতাগণ। তন্মধ্যে উত্তম হইলেন বুখারী ও মুসলিম। কেননা, এই পণ্ডিতদ্বয় সুবিশাল আকাশের সুমহান ন্যায়পরায়ণতার সূর্য ছিলেন। جَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ইহা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর এই উম্মতের উপর বিশেষ অনুগ্রহ বটে। نَشْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى هٰذِهِ النِّعْمَةِ وَسَائِرِ نِعَمِهٖ وَنَسْأَلُهُ الْمَزِيْدَ مِنْ فَضْلِهٖ وَكَرَمِهٖ আবূ হাতিম রাযী বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্য হইতে কোন উম্মতের মধ্যে হযরত আদম (আ)-এর জন্ম হইতে লইয়া এমন কোন আলিম ও উম্মত ছিলেন না, যাহারা স্বীয় নবী ও রাসূলগণের আছার ও হাদীসসমূহের সংরক্ষণ করিতেন একমাত্র এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মত ছাড়া।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও বংশ পরিচয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এই উম্মত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আর ইহাও তাহাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। বস্তুতঃ পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন যে, সাহাবীবৃন্দের মধ্যে বংশ পরিচয় বিদ্যায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ছিলেন। বর্ণনা করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সপ্তাহে একদিন কবিতা, ইতিহাস, বংশ-তালিকা এবং আরবের অবস্থাসমূহের বর্ণনা করার মধ্য দিয়া সময় কাটাইতেন। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরবের কবিগণের 'দিওয়ান' এবং আরবের অভিধানকে স্মরণ করার এবং উহার প্রতি গুরুত্ব দানের জন্য নির্দেশ দান করিতেন, যাহাতে কুরআনে কারীমের তাফসীরের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও উহার যের, যবর, ইত্যাদি নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহায্য হইতে পারে।

এই উম্মত দীনের ব্যাপারে কিতাব প্রণয়ন করায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত। আর ইহা এই হাদীসের অনুরূপ ঃ

لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَيُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمُتَمَسِّكِيْنَ بِهٖ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

এই উম্মতের কিছু মহান ব্যক্তি সর্বদা সত্যকে বিকাশ ও সমুন্নতকারী থাকিবেন এমন কি কিয়ামত সমাগত হইবে, তাহারা আল্লাহ্'র পথে জিহাদকারী এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নতকে দৃঢ়তার সহিত ধারণকারী হইবে। করনে আওয়াল এবং করনে ছানী (প্রথম যুগ ও দ্বিতীয় যুগ)-এর শুরুতে কিতাব লেখার ও সংকলনের ধারা শুরু হয় নাই। যদিও শাস্ত্রলিখন এবং হাদীস সংগ্রহ করার ধারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহা প্রণয়ন ও সংকলনের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল না। অনুরূপভাবে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ, গঠন প্রকৃতি ও পরিভাষা, নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু এবং আবশ্যকীয় নিয়মাবলী পর্যন্ত উল্লেখ থাকিত না। কিন্তু উহার পর ইহা এইরূপ ধারণ করে যে, উহা গণনার ও সীমা সংখ্যার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। যাহা একমাত্র আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব ছাড়া অন্য কেহ আয়ত্তে করিতে সক্ষম নহে। 'কুরূন' এর সময় নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে কয়েক প্রকার মত উক্ত হইয়াছে। এক মতানুসারে ত্রিশ বৎসর সময়কালকে 'কুরূন' বলা হইয়াছে। বিশ বৎসর আশী বৎসর ও শত বৎসর কালের মেয়াদকেও "কুরুন" বলা হয়। এবং শেষোক্ত মতই সর্বাধিক শুদ্ধ মত। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন শিশুকে বলিয়াছিলেন যে, عِشْ قَرْنًا "যুগ যুগ বাঁচিয়া থাক।" সেই শিশু শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল।

ওলী আল্লাহ্ ও গাইবী মানুষ

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যেআরেকটি হইতেছে, তাহাদের মধ্যে আকতাব, আওতাদ, নুজাবা এবং আবদালের অস্তিত্ব। হযরত আনাস (রা) কর্তৃক মারফূ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, চল্লিশজন পুরুষ ও মহিলা আবদাল রহিয়াছেন। যখন ঐ সকল পুরুষ ও মহিলার মধ্য হইতে কেহ মারা যান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের স্থলে অপর কোন পুরুষ ও মহিলা সৃষ্টি করেন। ইব্ন খাল্লাফ কিরামাতে আওলিয়ার মধ্যে ইহা তো উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাবারানী 'আওসাত'-এর মধ্যে ইহাকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যমীন এই রকম চল্লিশ

www.pathagar.com

ব্যক্তি হইতে খালি থাকে না, যাহারা খলীলুল্লাহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর ন্যায় হইয়া থাকেন। তাহাদের সহিত পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহাদের বরকতে মানবের কল্যাণে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্য হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ মারা যান না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন ব্যক্তিকে, তদস্থলে তাঁহার বদলে দান করেন। এই কারণেই তাহাদের নাম 'আবদাল' রাখা হইয়াছে। কোন কোন শ্রেষ্ঠ শায়খ বলিয়াছেন যে, তাহাদিগকে আবদাল এই কারণে বলা হয় যে, তাহারা খারাপ গুণসমূহকে প্রশংসিত গুণে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন এবং ইহারা মানবীয় গুণাবলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। আর এই কথা যে বলা হইয়াছে, তাঁহারা করুণাময়ের বন্ধুর ন্যায় (খলীলুর রহমান) হইয়া যান, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল তাহাদের পূর্ণতম গুণসমূহের মধ্য হইতে এক বিশেষ পূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়া। যাহা বিশেষ গুণসমূহের মধ্যকার এক বিশেষ গুণ। ইহার সহিত হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর মিল রহিয়াছে। মাশায়েখ কিরামের এই কথা যে, "প্রত্যেক ওলী নবীর কদমের উপর আছে" ইহাই উহার উদ্দেশ্য। সাবধান! কখনও তাহারা নবীর সকল গুণের সমতুল্য এই উদ্দেশ্য নহে। ইব্ন আদী 'কামিল'-এ বর্ণনা করিতেছেন যে, ঐ চল্লিশ জন আবদালের মধ্য হইতে বাইশ জন সিরিয়া দেশে থাকেন এবং আঠার জন ইরাকে এবং যখন হুকুম হইবে তখন তাহারা সকলে ইন্তিকাল করিবেন এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে। মাস্নাদে আহমদেও এইরূপ আসিয়াছে।

আবূ নুআয়ম 'হুলিয়া'তে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে (সরাসরি) রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন পাঁচশত উত্তম উম্মত আছেন এবং 'চল্লিশ' জন আবদাল আছেন, পাঁচশত জন নয়। এই চল্লিশ হইতে না কম হয়, না বেশী। যখন তন্মধ্য হইতে কেহ মারা যান, তখন অন্য কেহ তাহার বদলে চলিয়া আসেন। ইহারা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান থাকেন। হুলিয়ায় হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের চল্লিশ ব্যক্তি এমন আছেন যাহাদের অন্তর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরের উপর রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বরকতে সৃষ্টজগতকে সমস্ত বিপদ হইতে সংরক্ষণ করেন, ইহাদিগকেই আবদাল বলা হইয়া থাকে। ইঁহারা এই স্তর রোযা, নামায এবং সাদাকার দরুন প্রাপ্ত হন নাই। হযরত ইব্ন মাসঊদ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কোন্ বস্তু হইতে তাঁহারা এই দরজা লাভ করিয়াছেন? তিনি বলেন যে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা এবং বদান্যতা হইতে। ইহার মর্ম এই যে, নামায, রোযা এবং সাদকার ক্ষেত্রে তো ইহারা মুসলমানদের সহিত শরীক আছেনই, কিন্তু যে বিশেষ গুণের জন্য তাহারা এই মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, উহা কেবল উক্ত দুই গুণই বটে।

হযরত মা'রূফ কারখী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই দু'আ করিবে যে, اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ হে আল্লাহ্! উম্মতে মুহাম্মদ-এর উপর রহম কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আবদালের মধ্যে গণ্য করেন— 'হুলিয়া'তে আছে যে, যাহারা প্রত্যহ দশবার এই দু'আ পড়িবে اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ (হে আল্লাহ্! উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর সংশোধন করিয়া দাও, হে আল্লাহ্! উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রশস্ততা দান কর, হে আল্লাহ্! উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর রহম কর)।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে যে, আবদালের আলামত হইল এই যে, তাহাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে না, এবং তাঁহারা কোন কিছুর প্রতিই অভিসম্পাত দান করেন না। যায়দ ইব্ন হারূন হইতে বর্ণিত আছে যে, আবদালগণ বিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, যে, যদি মুহাদ্দেসগণ আবদাল না হইবেন, তবে কে হইবেন ?

'তারীখে বাগদাদ'-এর মধ্যে একটি কিতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'নুকাবা' তিনশত আছেন এবং 'নুজাবা' সত্তরজন 'আবদাল' চল্লিশজন, 'আখইয়ার' সাতজন, 'আমাদ' (সম্ভবতঃ আওতাদ হইবে) চারজন এবং 'গাওছ' একজন আছেন। 'নুকাবা'-এর নিবাস আফ্রিকা এবং 'নুজাবা'র নিবাস মিসর এবং আবদালের নিবাস সিরিয়া এবং আখইয়ারগণ যমীনের মধ্যে ভ্রমণকারীরূপে আছেন। "আমাদ"গণ পৃথিবীর প্রান্তে থাকেন এবং গাওছের বাসস্থান মক্কা মুকাররামা। যখন কোন সাধারণ বিষয় সংঘটিত হয়, তখন 'নুকাবা' গণ দু'আ করেন এবং ঐ আবশ্যক পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহারা বিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাদের পর 'নুজাবা', তাঁহাদের পর 'আবদাল', তাঁহাদের পর 'আখ্ইয়ার', তাহাদের পর 'আমাদ' গণ দু'আ করিয়া থাকেন। যদি তাহাদের দু'আ কবূল হইয়া যায় তো উত্তম, নতুবা গাওছ বিনয়ের সহিত ক্রন্দন করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বেই গাওছের দু'আ কবুল করিয়া লওয়া হয়।

কবরে ও হাশরে উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহা একটি যে, ইহারা কবরে গুনাহ্সহ প্রবেশ করিবে এবং বেগুনাহ্ ও নিষ্পাপ হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। মুসলমানগণের ইস্তিগ্ফার করার কারণে উহাদিগকে গুনাহ্ হইতে পাক ও পবিত্র করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা তাবারানী 'আওসাত'-এর মধ্যে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীস হইতে এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক তাহাদের লাভ হইবে বুঝা যায়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এই বাক্য বিরল যে, "কবরের শাস্তি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য যাহাতে তাহাদিগকে পাক ও পবিত্র করিয়া পরকালে লইয়া যাইতে পারেন এবং তাহাদের উপর অন্য কোন শাস্তি না হয়।"

তাহাদের জন্য সর্বপ্রথম মাটি বিদীর্ণ হইবে, ইহার মর্ম হইল এই যে, সমস্ত উম্মতের পূর্বে ইহারা স্বীয় কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আমিই প্রথম হইব যে, সর্বপ্রথম আমার জন্য এবং আমার উম্মতের জন্য মাটি বিদীর্ণ হইবে।

ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও যে, যখন এই উম্মতগণকে আহবান করা হইবে, তখন তাহাদের অঙ্গসমূহ উযূর দরুন উজ্জ্বল ও আলোকিত হইয়া যাইবে। অশ্বের কপালের শুভ্রতাকে 'গোররা' বলা হয় এবং উহার পদসমূহের শুভ্রতাকে 'মুহাজ্জাল' বলা হইয়া থাকে। মুহাজ্জাল এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, উযূর মধ্যে হস্তদ্বয়কে কনুই পর্যন্ত এবং পদদ্বয়কে গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা হইয়া থাকে। এবং 'গোফরুন' এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উযূর মধ্যে মাথার অগ্রভাগ ঘাড়ের উপর অংশ এবং মুখমণ্ডলকে ধৌত করা হইয়াছে।

হাশরের দিন ময়দানের সর্বোচ্চ স্থানে ইহারা অবস্থান করিবে। হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন , "আমি এবং আমার উম্মত, এমন উঁচু স্থানে

www.pathagar.com

থাকিব। সৃষ্টজীবের মধ্য হইতে আর কাহারও এই সৌভাগ্য লাভ হইবে না। কিন্তু যদি সে আমাদের মধ্যে হইতে পসন্দ করে এবং কোন নবী এমন হইবেন না যে, তাহাদের উম্মত তাহাদিগকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হইবে না। কিন্তু আমরা এই মর্মে সাক্ষ্য দান করিব যে, তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার রিসালতকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অপর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, আমি এবং আমার উম্মত 'রাত্ল' অর্থাৎ উচ্চ স্থানে থাকিব।

রাসূলে কারীম (সা)-এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও একটি যে, তাঁহাদের কপালে এক চিহ্ন থাকিবে, যাহা তাহাদের সিজদার দরুন চিহ্ন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ তাহাদের কপালসমূহে সিজদা দানের চিহ্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই চিহ্ন ইহলোকে হইবে অথবা পরলোকে হইবে এই সম্পর্কে দুইটি উক্তি রহিয়াছে। এক এই যে, এই চিহ্ন দুনিয়ায় হইবে এবং ইহার মর্ম হইল সুন্দর চরিত্র, ইসলামের আলামত ও সকাতর চিহ্ন। কেহ বলেন যে, জাগ্রত থাকার কারণে চেহারার ফ্যাকাসে রংকে বলা হইয়াছে। যার ফলে মানুষ ধারণা করে যে, হয়ত ইহা কোন রোগ হইয়াছে। অথচ সে রোগগ্রস্ত নহে। দ্বিতীয় কথা হইল এই আলামত পরকালে হইবে, কারণ তাহাদের সিজদার স্থানসমূহ আলোকিত হইয়া যাইবে যাহার ফলে তাহারা পরিচিতি লাভ করিবেন যে, ইহারা দুনিয়ায় সিজদাকারী ছিলেন। শাহর ইব্ন হাউশব হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী'র চেহারায় সিজদার স্থানসমূহ চতুর্দশতমা রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় চমকিতে থাকিবে। আতা খোরাসানী বলেন যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যাহারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিয়াছেন এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাও আছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের আমলনামা ডান হস্তে দেওয়া হইবে, ইহা ইমাম আহমদ ও বায্যার (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এইরূপ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াতেও আসিয়াছে। মিশকাতেও ইমাম আহমদ-এর হাদীস আবূ দারদা' কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি স্বীয় উম্মতকে কিয়ামত দিবসে উহা হইতে চিনিতে পারিব যে, তাহাদের উযূর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল হইয়া চমকাইতে থাকিবে এবং তাহাদের আমলনামা তাহাদের ডান হস্তে থাকিবে। আমি ইহা হইতেও চিনিতে পারিব যে, তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের অগ্রে সাঈ করিবে। শায়খ ইব্ন হাজর শরাহ এর মধ্যে লিখিতেছেন যে, ইহার মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের আমলনামা অন্যদের পূর্বে তাহাদের ডান হস্তে দেওয়া হইবে। এখন রহিল সন্তানদের সাঈ করা, সম্ভবতঃ ইহাও বৈশিষ্ট্যের মধ্য হইতে এক বৈশিষ্ট্য হইবে।

এই উম্মতের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং ডানদিকে চলিবে। যেমন কুরআন শরীফ এই মর্মে বর্ণনা দান করিতেছে। ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, ঐ সকল প্রত্যেক বস্তু তাহাদের জন্য বৈশিষ্ট্য হইবে, যাহার জন্য তাহারা স্বয়ং চেষ্টা-তদবীর করিত এবং উহাও, যাহা তাহাদের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের জন্য তদবীর ও কর্ম করিয়া থাকে। (ইসালে সাওয়াব, সাদকায়ে জারিয়া, এবং ইস্তিগ্ফার ইত্যাদি) অথচ তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য শুধু উহাই ছিল যাহা তাহারা স্বয়ং করিত। ইব্ন ইকরামা এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার

www.pathagar.com

ইরশাদ হইতে এক সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। ইরশাদ করা হইয়াছে যে, وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى (নিশ্চয় মানুষ যা কিছু করে উহাই তাহার জন্য হইয়া থাকে) কেননা, এই আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র মানুষ নিজে যাহা আমল করে উহা ব্যতীত আর কোন বস্তু তাহার জন্য উপকারী নয়। আলিমগণ এই প্রশ্নের কয়েক প্রকার জবাব দান করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই যে, এই আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে যে, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে। (সূরা তূর ঃ ২১)।

ইসালে সাওয়াবের প্রমাণ

সন্তানকে মাতা-পিতার পর্যায়ে গণ্য করা হইয়া থাকে এবং উহাদের দরুন তাহারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা মাতা-পিতার শাফাআত সন্তানদের জন্য এবং সন্তানদের শাফাআত মাতা-পিতার জন্য কবূল করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ উহার প্রমাণ ঃ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا "তোমাদের পিতা ও সন্তানদের লাভের দিক হইতে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী তাহা তোমরা অবগত নহ" (সূরা নিসা ঃ ১১)।

করতুবী বলেন যে, বহু হাদীস এই কথা প্রমাণ করে যে, মু'মিনগণ নেক কর্মের সাওয়াব, তাহার অপরের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'সহীহ্'-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যে কেহ এই অবস্থায় মারা যাইবে, উহার যিম্মায় রোযা থাকে তো উহার ওলী (অভিভাবক) তাহার পক্ষ হইতে রোযা রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে কেহ অপরের জন্য হজ্জ করিতে চায়, তাহার প্রতি আবশ্যক হইবে প্রথমে নিজের হজ্জ করা। তারপর উহার পক্ষে বদল হজ্জ করিবে। সায়্যিদা আইশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাহার ভাই আবদুর রহমানের পক্ষ হইতে 'ইতিকাফ' করিয়াছিলেন এবং তাহার পক্ষ হইতে গোলাম আযাদ করিয়াছিলেন। হযরত সাআদ ইব্‌ন উবাদা আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে সাদকা দিয়া দিব ? বলিলেন, হাঁ, আরয করেন কোন সাদকা উত্তম? বলেন, পানি। অতঃপর হযরত সাআদ এক কূপ তৈরী করেন এবং বলেন যে, هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ (ইহা উম্মে সাআদের মাতার কূপ)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বকর (রা)-এর দাদী মানসিক করিয়াছেন যে, পদব্রজে কুবা মসজিদে গমন করিবেন, তারপর তাহার মৃত্যু হইয়া যায় এবং মানসিক পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার উপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফাত্ওয়া দেন যে, তাঁহার পুত্র তাহার পক্ষ হইতে ঐ স্থান পর্যন্ত গমন করিবেন।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, পবিত্র আয়াত لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى -এর মধ্যকার ইনসানের মর্ম হইল আবূ জাহল, কিন্তু কাহারও মতে উক্বা ইব্‌ন আবী মুআয়ত এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা পরিগৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানে ইনসান দ্বারা জীবিত বুঝান উদ্দেশ্য, মৃত নয়। কিন্তু কাহারও মত হইল যে, আমাদের শরীআত প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য নিজ কৃত আমল এবং অপরেরকৃত আমল উভয় আমলই কল্যাণকর।

www.pathagar.com

কাশ্শাফ গ্রন্থ প্রণেতা (যামাখ্শারী, যিনি মু'তাযেলী) বলিয়াছেন যে, নিজ সত্তার জন্য অপরের কর্ম কোন কাজে আসে না, তবে ঐ সকল কাজ যাহার বুনিয়াদ নিজ আত্মার কর্মের উপর প্রতিষ্ঠ হয় এবং মু'মিন ও সত্যবাদী হয়। সুতরাং এই হিসাবে অন্যের বিশেষ আমল, তাহার নিজ আমলের অনুগামী হওয়ার দরুন, নিজকৃত কর্মের ন্যায় উহার হুকুম হইবে এবং উহার স্থলাভিষিক্ত হইবে। অপরের কর্ম লাভজনক হয় না তখন, যখন সে কেবল নিজের জন্যই কর্ম করে। কিন্তু যখন সে অপরের জন্যও নিয়ত করে তখন উহা শরীআতের বিধান মতে উহার প্রতিনিধি ও ভারপ্রাপ্ত হইয়া এবং উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে আলিমদের মতবিরোধ রহিয়াছে যে, কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব মৃতের উপর পৌঁছায় কি পৌঁছায় না। শাফিঈ মাযহাবে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ আলিমের মতে এবং ইমাম মালিক এবং হানাফী মাযহাবের এক ক্ষুদ্র দলের মতানুসারে পৌঁছায় না। কিন্তু শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মাযহাব হইল এই যে, উহা পৌঁছিয়া থাকে। চাই উহা সাদ্কা হউক, অথবা সালাত, হজ্জ, ইতিকাফ, কিরাআত এবং যিকর ইত্যাদি হউক। কিন্তু কবরের উপর কিরাআত পাঠ করাকে বিদআত বলা হইয়াছে। শায়খ শামসুদ্দীন কুসতুলানী বলেন যে, কুরআনুল কারীমের সাওয়াব পৌঁছায়, ইহা শুদ্ধ মত। নিকট ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে হউক অথবা অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে অথবা ওয়ারিশ অথবা বেওয়ারিশ-এর পক্ষ হইতে হউক, যেরূপভাবে সর্বসম্মত মতানুসারীর সাদ্কা, দু'আ এবং ইস্তিগ্ফার লাভজনক হইয়া থাকে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ ইয়াফিঈ (রা) 'রওযুঁর রায়াহীন'-এর পরিশেষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, লোকেরা শায়খ আযীযুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালামকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলিতেছেন, আমি দুনিয়ায় ফাতওয়া দিয়া থাকিতাম যে, মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব পৌঁছে না, এখন জানিতে পারিলাম যে, পৌঁছিয়া থাকে। কুরআন পড় এবং উহার সাওয়াব পৌঁছাইয়া দাও।

ক্বারী হুসায়ন ফত্ওয়া দিয়াছেন যে, কবরের উপর কুরআন তিলাওয়াতের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জাইয আছে, যেরূপ আযান এবং কুরআন শিক্ষার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জাইয আছে। কুরআন তিলাওয়াতের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা উচিত। কারণ, দু'আ উহার সহিত যাইয়া মিলিত হয়। তিলাওয়াতের পর দু'আ করা কবুলিয়াতের দিক হইতে অতি নিকটবর্তী হয় এবং বরকতও বেশী হয়।

শায়খ আবদুল করীম সালুসী বর্ণনা করেন যে, যদি তিলাওয়াতকারী নিজের তিলাওয়াতের মধ্যে নিয়ত করে যে, ইহার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য হইবে, তাহা হইলে পৌঁছিবে না। কারণ, ইহা হইল শারীরিক ইবাদত। সুতরাং অপরের পক্ষ হইতে পৌঁছিবে না। কিন্তু যদি নিয়ত করার পর তিলাওয়াত করে এবং যাহা কিছু অর্জন হয় উহা মৃতের জন্য বখশিশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা দু'আ হইবে এবং ইহা দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপর সাওয়াব লাভজনক হইবে।

আলিমগণ বলেন যে, কুরআনের স্থান বরকত ও রহমত অবতরণের স্থান এবং মৃত, জীবিতের পর্যায়ে বিদ্যমান থাকে, সুতরাং পাঠক যখন তাহাকে সাওয়াব পৌঁছায়, তখন রহমত নাজিল হওয়ার এবং বরকত লাভের আশা রাখা চাই।

www.pathagar.com

'গুন্দা' গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, যদি কেহ ঝরনা যাহির করে, কূপ খনন করে অথবা বৃক্ষ বপন করে অথবা কুরআনকে নিজ জীবদ্দশায় ওয়াক্‌ফ করিয়া দেয় অথবা এই সকল কাজ অপরের মৃত্যুর পর করে, তো ইহার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির উপর পৌঁছিয়া থাকে। যেমন হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। সহীফা এবং কুরআনই কেবল ওয়াকফ করার জন্য খাস এমন নহে, বরং প্রত্যেক ওয়াকফ্ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই কিয়াম হইতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরবানী করা জাইয হওয়া বুঝাইতেছে। এই জন্যে যে, ইহাও এক প্রকার সাদকা বটে। কিন্তু 'তাহযীব'-এ বলা হইয়াছে যে, উহার হুকুম ব্যতীত অপরের জন্য কুরবানী করা জাইয নহে, মৃতের জন্যও এই হুকুমই। কিন্তু মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করিয়া যায়, তবে জাইয হইবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নবী করীম (সা)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁহার পক্ষ হইতে কুরবানী দান করিতেন এবং আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে 'সিরাজ'-এ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে সত্তরটি পশু কুরবানী দিয়াছি।' এখন রহিল রাসূল করীম (সা)-এর প্রতি হাদিয়া করা। তো ইহার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের আমার নিকট কোন প্রকার হাদিস বা আছর নাই। একটি ক্ষুদ্র দল ইহাকে অস্বীকার করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সাহাবা-ই কিরাম ইহা করেন নাই (অথচ উপরে হযরত আলী (রা)-এর আমল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে)। কোন কোন মুতাআখ্‌খিরীন (পরবর্তিগণ) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ ইহাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি ইহাকে বিদআত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন এবং তাহারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা হইতে কিন্তু এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে প্রমাণ আছে যে, مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً (শেষ হাদীস পর্যন্ত) অর্থাৎ যে কেহ তাহার উম্মতের মধ্য হইতে কোন উত্তম কর্ম করিবে, সেই কর্মকর্তার কর্মের সাওয়াবের মধ্যে কোন প্রকার কম-বেশী না করিয়াই তাহার সমান উক্ত ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করিবে। ইমাম শাফিঈ (রা) বলেন যে, এমন কোন বস্তুই নাই যাহা কোন উম্মত আমল করিয়া থাকে কিন্তু উহার মূল ভিত্তি নবী করীম (সা) না হইয়া থাকেন। 'নুসরত' (সাহায্য)-এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ

মুসলমানদের সুন্দর কর্মসমূহ এবং তাহাদের প্রত্যেক সৎকর্মসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহীফাসমূহে অর্থাৎ আমলনামায় উহা হইতে অধিক রহিয়াছে, যাহা আমলকারীর সাওয়াব হিসাবে আছে। এবং এই আধিক্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাত নহে। এই জন্যে যে, মুহতাদী অর্থাৎ হিদায়াত লাভকারীর সাওয়াব এবং আমলকারী কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। এবং ইহার নিত্যনতুন সাওয়াব শায়খ এবং শিক্ষাদাতাদের প্রতি উক্ত সাওয়াবের সমতুল্য সাওয়াব হইয়া থাকে এবং উস্তাদের উস্তাদকে দ্বিগুণ, তৃতীয় উস্তাদকে চতুর্গুণ এবং চতুর্থ উস্তাদকে অষ্টগুণ, এইভাবে অর্জিত সাওয়াব সংখ্যা হিসাবে প্রত্যেক স্তরে পৌঁছিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই সিলসিলা (ধারা) পৌঁছিয়া যায়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তিগণের উপর পূর্ববর্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করা যায়। সুতরাং নবী করীম (সা)-এর পর যদি দশ স্তর ধরিয়া লওয়া যায়, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে এক হাজার চব্বিশ গুণ সাওয়াব লাভ হইবে। তারপর যখন

www.pathagar.com

দশ হইতে একাদশ ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হইবে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আজর ও সাওয়াব দুই হাজার আটচল্লিশ গুণ হইয়া যাইবে। এইভাবে যত বেশী স্তর হইতে থাকিবে, তত বেশী পূর্ববর্তিগণ হইতে দ্বিগুণ সাওয়াব বর্ধিত হইতে থাকিবে এবং এই ধারা সর্বদা জারি থাকিবে। যেমন মুহাক্কিকগণ উত্তর দিয়া থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রকার সম্মানে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু পাঠকের পাঠের সাওয়াব তাহার শিক্ষকের নিকট পৌঁছিবে, তারপর শিক্ষকের নিকট এইভাবে এইধারা উপরের দিকে জাহীর হইতে থাকিবে, এমনকি শরীআত প্রবর্তনকারী (সা) প্রথম শিক্ষা দানকারী হইবেন। তাঁহার নিকট সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব পৌঁছিবে। যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে। এবং খানাই আল্লাহ্র দীদারের সময় যে দু'আ পাঠ করা হয় উহা এই শরীআতসম্মত দু'আর মধ্যে পরিগণিত করা হয়। যিয়ারতকারিগণ বলিয়া থাকেন যে, اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ وَتَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا আয় আল্লাহ্! এই গৃহের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ধিত করিয়া দাও। এই সকল মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা এই কথা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় বাক্যে এই দিকেই ইঙ্গিত বলিয়াছেন যে, مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا যে কেহ কোন উত্তম বস্তু বাহির করে তো তাহার জন্য উহার আমলকারীর সমান সাওয়াব রহিয়াছে। এই সুন্নাতে হাসানার আমল সুন্নাত হওয়ার দ্বারা উম্মতকে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত করা হইয়াছে এবং ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য অসীম সাওয়াবের প্রমাণ এবং তাহার পূর্ণত্বের প্রতি ইশারা রহিয়াছে।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ইহাও যে, এই উম্মত সমস্ত উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাবারানী 'আওসাত'-এর মধ্যে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কর্তৃক রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাতে প্রবেশ করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত নবীদের জন্য জান্নাতকে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে অন্য উম্মতদের উপর জান্নাতকেও যতক্ষণ না আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এই উম্মতের সত্তর সহস্র লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই হাদীস শায়খায়ন বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী ও তাবারানীর মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইহার চেয়ে বেশী করার জন্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তা'আলা উহাও আমাকে দান করেন অর্থাৎ ঐ সত্তর হাজারের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি অতিরিক্ত সত্তর সহস্র ব্যক্তিকে বেহেশতে বিনা হিসাবে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে এমন কিছু দান করিয়াছেন, যাহা কোন দ্বিতীয় উম্মতকে দান করেন নাই। যেমন আল্লাহ্ আমাদের নবী করীম (সা)-কে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহা দ্বিতীয় কোন নবীকে দান করেন নাই।

যখনই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের নবী (সা) আপন বন্দেগীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সমস্ত রাসূলের মধ্যে মর্যাদাবান বানাইয়াছেন এবং

www.pathagar.com

আমাদিগকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে মর্যাদাবান বানাইয়াছেন। সাল্লাল্লাহু আলা খায়রে খালকিহী মুহাম্মাদি ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়া উম্মাতিহী আজমাঈন।

পবিত্র মি'রাজের বর্ণনা

সকল বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, কামালাত ও ফযীলতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামালাত ও ফযীলত মু'জিজা ও কারামতসমূহের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল মু'জিজা ও কারামত হইল মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'ইসরা' ও 'মি'রাজের' সহিত সম্পৃক্ত ও সম্মানিত করা। কারণ, কোন নবী অথবা রাসূলকে ইহা দ্বারা ভূষিত ও সম্মানিত করা হয় নাই এবং যে শ্রেষ্ঠতম মকাম পর্যন্ত তাঁহার গমন হইয়াছিল আর যাহা কিছু তথায় দেখান হইয়াছে, কোন সত্তা না তথায় কোন দিন পৌঁছিয়াছে, না ঐ সকল অবলোকন করিয়াছে। ইরশাদ করা হইয়াছে—

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى
الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

'পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁহার খাস বান্দাকে রাতের অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত লইয়া যান, যাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহকে আমি বরকতময় করিয়া রাখিয়াছি। যাহাতে আমি তাহাকে আমার নিআমতসমূহ দেখাইতে পারি। নিশ্চয় তিনি শ্রবণ করেন ও দেখেন।' ইসরার অর্থ হইল লইয়া যাওয়া। উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পবিত্র মক্কা হইতে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহাকে অস্বীকার করিলে কাফির হইয়া যাইবে। কারণ, ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। তারপর তথা হইতে আকাশ পর্যন্ত গমনকে মি'রাজ বলা হয়, ইহা প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইহাকে যাহারা অস্বীকার করিবে তাহারা বিদআতের অনুসারী, দুষ্কৃতিকারী ও লাঞ্ছিত হইবে। অন্যান্য শাখা-প্রশাখা এবং আশ্চর্য ও অদ্ভুত অবস্থাসমূহের প্রমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। উহার অস্বীকারকারী মূর্খ ও বঞ্চিত হইবে। শুদ্ধ মত ইহাই যে, মি'রাজ এবং ইসরা সকলই জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাবিঈন এবং তাবে-তাবিঈনদের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের পর, হাদীস বিত্তাগণ, ফিকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এবং কালাম শাস্ত্রবিদগণের মাযহাব ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস ও আখবার (সংবাদাদি) সমূহ বহুল প্রচারিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে মি'রাজ স্বপ্নযোগে আধ্যাত্ম এক ঘটনা ছিল। এই মতদ্বয়ের সম্মিলন ও সংযোগ সাধন এইভাবে করা হইয়াছে যে, এই ঘটনা কয়েকবার হইয়াছে। একবার জাগ্রত অবস্থায়, এবং অন্যান্য সময় স্বপ্নে আধ্যাত্মযোগে হইয়াছে। কোন সময় পবিত্র মক্কায় এবং কোন সময় মদীনা তায়্যিবায় হইয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সকলেই এই মতে একমত হইয়াছেন যে, নবীগণের স্বপ্নও ওহীস্বরূপ, যাহা সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ নেই। স্বপ্নে তাহাদের অন্তর জাগ্রত থাকে। যাহাতে দৃশ্য জগতের কোন বস্তু আকৃষ্ট না করিতে পারে।

ক্বাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেন যে, স্বপ্নযোগে ইহা অনুষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য ও অনুধাবনযোগ্য করার জন্য ছিল। যেমন নুবুওয়াতের প্রারম্ভে সত্যস্বপ্নরাজি দর্শন করিতেন,

যদ্দরুন ওহীর ন্যায় বিরাট বস্তুর ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে সহজ ও আসান হইয়াছিল। বস্তুতঃ মানবের উহা সহ্য করার শক্তি দুর্বল ও অক্ষম। তদ্রূপ মি'রাজ প্রথম স্বপ্নে অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে জাগ্রতাবস্থায় উহাকে ধারণ করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হয়। বরং বর্ণনাকারীরা তো এতটুকু পর্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে স্বপ্নযোগে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

কোন কোন আরিফ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসরা ও মি'রাজ বহু ছিল এবং কেহ কেহ চৌত্রিশ পর্যন্ত বলিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে একটি তো জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি স্বপ্নে ছিল। এক সম্প্রদায় এইরূপ বলেন যে, মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত 'আসরা' সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় ছিল এবং তথা হইতে আকাশসমূহ পর্যন্ত মি'রাজ স্বপ্নে আধ্যাত্মাবস্থায় ছিল এবং তাহারা এই পবিত্র আয়াত হইতেই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ, এই আয়াতে মসজিদে আকসাকে ইসরার শেষসীমা নির্ধারিত করা হইয়াছে। যদি শারীরিক 'ইস্‌রা' (ভ্রমণ) মসজিদে আকসার উর্ধ্বে হইত তাহা হইলে উহার উল্লেখ থাকিত। ইহা উল্লেখ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও প্রশংসার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের শ্রেষ্ঠতা ও আশ্চর্য্যতার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনতা ছিল। ইহার উত্তর হইল এই যে, পবিত্র আয়াতে বিশেষরূপে মসজিদে আক্‌সার উল্লেখ, বিরোধিতা ও ঝগড়ার উৎপত্তির দরুন এবং এই বিষয়ে কুরায়শদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অস্বীকারকারী কুরায়শদের উহার নিদর্শন ও পরিচিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরুন ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা পরীক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া মসজিদে আকসার পরিচয় সম্পর্কিত বিষয়াদি জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিশেষরূপে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে যেমন এই সম্পর্কে আলোচনা আগে আসিবে। এই বিষয়ে বহু প্রসিদ্ধ হাদীস এবং বিশুদ্ধ সংবাদ অবতীর্ণ হইয়াছে। বরং কুরআনের আয়াতও এই মর্মে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন সূরা আন-নাজমে উল্লিখিত আছে। যদিও সূরা আন্-নাজমের মধ্যে যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে উহা হইতে জিবরাঈল (আ)-এর দীদার এবং উহার নৈকট্যের প্রতি কোন কোন হযরত মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীকে মি'রাজের কাহিনী হিসাবেই গণ্য করা হইয়াছে।

মিসকীন বান্দা (গ্রন্থকার) বলেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তা'আলার لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا (যাহাতে আমি তাঁহাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাইতে পারি) এই আয়াত দ্বারা মি'রাজের রাতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়, এমনকি তথা হইতে আকাশমণ্ডলে লইয়া যাইয়া নিদর্শনসমূহকে দেখান হয়। কারণ, নিদর্শনসমূহকে প্রদর্শিত করা এবং চূড়ান্ত অলৌকিকত্ব ও কারামতকে প্রকাশিত করা আকাশমণ্ডলে হইয়াছিল এবং মসজিদে আকসায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল উহার উপরই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না। মসজিদে আকসা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া, উহা এই মি'রাজের শুরু স্থান ছিল। সেই হিসাবে মসজিদে আকসাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ঘটনা যদি স্বপ্নযোগে ঘটিত তো কাফিররা ইহাকে অসম্ভব ধারণা করিত না এবং দুর্বলমনা ঈমানদারগণ বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইত না। তদুপরি স্বপ্নের মধ্যে ঘটনারাজি ও নানারূপ বিষয়াদি সংঘটিত হওয়াকে বাহিরে

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত জানা অবাস্তব বটে। তাহাছাড়া ইসরা'র সম্বন্ধ স্বপ্নের উপর করা হয় না। যখন ইসরা জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছে এবং মি'রাজ উহার রাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহাও জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছে এবং ইহার পর স্বপ্নযোগে হওয়া সম্পর্কে কোন দলীল নাই। যাহারা মি'রাজের ঘটনাকে স্বপ্নযোগে হওয়া সম্পর্কে উক্তি করিয়াছেন, কতিপয় বস্তু হইল তাহাদের এই সন্দেহের কারণ। প্রথমতঃ তো আল্লাহ্ তা'আলার এই বাক্য যে, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ। আমি আপনার ঐ স্বপ্নকে যাহা আপনাকে দেখাইয়াছি একমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য বানাইয়াছি। এই পবিত্র আয়াতকে কোন কোন তাফসীরকার মি'রাজের ঘটনার উপর ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ 'রুইয়া' নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখাকে বলা হয়। ইহার উত্তর হইল এই যে, 'রুইয়া' হয় হুদায়বিয়ার ঘটনার স্বপ্নের অথবা বদরের ঘটনার স্বপ্নের প্রতি ধারণ করা হইবে। আর পণ্ডিতগণ চক্ষুর দর্শনকেও 'রুইয়া'-এর অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহারা আরবের বিখ্যাত কবি 'মুতালাববী'র এই বাক্য হইতে প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন যে, وَرُؤْيَاكَ اَحْلاَفِى لِلْعُيُوْنِ مِنَ الْغَمْضِ এবং কোন কোন আলিম বলিয়া থাকেন যে, যেহেতু রাত্রিকালে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এই হিসাবে উহার নাম 'রুইয়া' রাখা হইয়াছে। আর হাদীসে যে বলা হইয়াছে যে, فَاسْتَيْقَظْتُ তারপর আমি জাগ্রত হইয়াছি, ইহাতেও এই প্রমাণ বিদ্যমান যে, ইসরা ও মি'রাজ নিদ্রিতাবস্থায় হয় নাই। এই জন্যে যে, ইহাতে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এই নিদ্রা দ্বারা ফেরেশতার আগমনের পূর্বে জাগ্রতাবস্থাকে বুঝাইয়া থাকিবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমন্ত ছিলেন ফেরেশ্তা আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়াছেন এবং বুরাকে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আর যদি জাগ্রত হওয়ার অর্থ, মি'রাজের ঘটনার পরবর্তী নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া উদ্দেশ্য হয়, যেমন ঘটনা হইয়াছিল যে, ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَاَنَا فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তারপর যখন আমি জাগ্রত হইলাম, তখন আমি মসজিদে হারামে ছিলাম" তো হইতে পারে যে, اِسْتَيْقَظْتُ (জাগিয়া উঠি) এর অর্থ اَصْبَحْتُ। অর্থাৎ আমি ভোর করিয়া ফেলি। অথবা এই জাগ্রত বলিতে ঐ দ্বিতীয় নিদ্রা যাহা বায়তুল হারামে আগমনের পর সংঘটিত হইয়াছিল উহাকে বুঝানো হইয়াছে। আর ইসরা সমস্ত রাত্রব্যাপী ছিল না। বরং রাতের সামান্য অংশের মধ্যে হইয়াছিল। কোন কোন তথ্যান্বেষী বলিয়া থাকেন 'জাগ্রত'-এর উদ্দেশ্য চৈতন্য ও সাবধানতা এবং ঐ অবস্থা হইতে নিজ অবস্থায় আসা। যেহেতু যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসমান ও জমীনের বাদশাহীর আশ্চর্য ও অদ্ভুত বস্তুসমূহ অবলোকন করেন এবং ঊর্ধ্বজগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার যাহা কিছু বিরাট বিরাট নিদর্শন এবং অসংখ্য গোপন তথ্য প্রত্যক্ষ করেন ফলে তাঁহার অবস্থা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার অন্তর নিদ্রিতাবস্থার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ফেরেশতা জগত পরিদর্শন যদিও জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছে কিন্তু উহাতেও এক প্রকার দৃশ্যজগত হইতে অদৃশ্যতা রহিয়াছে উহাকে তাহারা নিদ্রা ও জাগরণের অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থার সহিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আসলে উহাও জাগ্রতাবস্থা কিন্তু অদৃশ্যতার সম্মুখীন হওয়ার দরুন এবং উহা দূরীভূত হওয়ার কারণে কখন কখন উহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এক

www.pathagar.com

রিওয়ায়াতে وَاَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ 'এবং আমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থাদ্বয়ের মাঝখানে ছিলাম'-ও আসিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, নিদ্রার অর্থ হইল শয়নের ন্যায় কাত হইয়া শয়ন করা এবং এক রিওয়ায়াতে ইহাও আসিয়াছে যে, بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ فِى الْحَجَرِ وَ رُبَّمَا قَالَ مُضْطَجِعٌ হাজারে আসওয়াদের সন্নিকটে আমি শয়নের কাছাকাছি ছিলাম, এবং কেহ কেহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আমি পার্শ্ব কাত হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। এতদ্সত্ত্বেও হযরত আনাস (রা) অত্র অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন নাই আর না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। কারণ, মি'রাজের কাহিনী হিজরতের পূর্বকার আর হযরত আনাস (রা) হিজরতের পর নুবুওয়াতের পবিত্র দরবারে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং সেই সময় তিনি সাত-আট বৎসরের বালক ছিলেন। যেরূপ বিদ্বানগণ বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসেরও এই একই অবস্থা। তিনি বলিয়াছেন مَا فَقَدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ নবী (সা)-এর পবিত্র দেহ মুবারক বিছানা হইতে অদৃশ্য হয় নাই। এইগুলি হইল ঐ ব্যক্তিদের যুক্তি-প্রমাণ যাহারা বলেন যে, স্বপ্নে 'ইস্‌রা' হইয়াছে। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) ঐ সময় নবী (সা)-এর নিকট ছিলেন না আর না তাহার সংরক্ষণ ও স্মরণ রাখার বয়স ছিল। বরং সম্ভবত তখন তিনি জন্মগ্রহণও না করিয়া থাকিতে পারেন ঐ কথা অনুসারে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে হিজরতের এক অথবা দেড় বৎসর পরে 'ইস্‌রা' সংঘঠিত হয়। উদ্দেশ্য হইল হযরত আইশা (রা)-এর হাদীস ঐ সকল হাদীসের উপর প্রবল নয় যে সকল হাদীস প্রত্যক্ষ মুশাহেদা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, مَا فَقَدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র দেহ হারাইয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণ আনয়ন করা নিঃসন্দেহে ভুল হইবে। আর উহা যাহাতে আসিয়াছে যে, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَاٰى চক্ষু যাহা দেখিয়াছে অন্তর তাহা মিথ্যা বলে নাই। ইহা স্বপ্ন প্রমাণ করে না, এই জন্য যে, ইহার মর্ম হইল চক্ষুকে অন্তর অপ্রকৃত বস্তুর ধারণায় নিপতিত করে নাই, বরং উহার দর্শনকে সত্যায়িত করিয়াছে এবং চক্ষু যে বস্তু দেখিয়াছে অন্তর উহাকে অস্বীকার করে নাই। প্রমাণ হইল مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى না চক্ষু ম্লান হইয়াছিল আর না পথহারা হইয়াছিল। এখন রহিল দার্শনিকদের অসত্য ও বৃথা বস্তু দ্বারা দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন করা যে, প্রকৃতিগতভাবে দেহ ভারি, উহা উঁচু দিকে যাইতে পারে না এবং আকাশের খণ্ডন ও সংমিশ্রণ শুদ্ধ নহে ইত্যাদি। এই সকল কথা ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী অসত্য ও অনর্থক।

ইশারা ও বিশ্লেষণে পণ্ডিতদের একদল প্রকৃত সুরতকে অর্থের উপর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহারা মি'রাজকে রূহানী কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাদের এই ধারণা যে হাশরকে তাহারা রূহানী বলিয়া থাকেন। আত্মার স্বপ্নের মধ্যে মি'রাজ হইয়াছে এই অর্থে নয়, বরং এই অর্থে যে, মি'রাজ হইল উন্নতির সকল স্তর ও অবস্থাসমূহের চূড়ান্ত উন্নতির প্রতি ইংগিত করা। যেমন তাহারা জিবরাঈল বলিতে রূহে মুহাম্মদী (সা) এবং বুরাক বলিতে তাহার পবিত্রাত্মা যাহা রূহের বাহক যাহা স্বীয় প্রকৃতিতে বক্র এবং অনুগত হয় না কিন্তু রূহানী শক্তি দ্বারা হয়। বুঝাইয়া থাকেন এবং আকাশ-এর দ্বারা নৈকট্যতার স্থান এবং সিদরাতুল মুনতাহা দ্বারা শেষ মকাম অর্থ করা হইয়াছে। তাহাদের এই কল্পনা অনুসারে এই সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ)-এর

www.pathagar.com

ঘটনার—ফিরআওন, যষ্টি, পাদুকা এবং পবিত্র উপত্যকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যদি এই সকল ঘটনাকে প্রমাণিত মানা হয় (অর্থাৎ শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও মর্মকে ঠিক রাখা হয়) তারপর তাহারা ঐ সকল অর্থের প্রতি ইংগিত করেন তাহা হইলে জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বস্তু হইবে এবং ইহার অন্য এক মর্যাদা হইবে, তাঁহাদের কল্পনা অনুযায়ী শারীরিক ও আত্মিক সম্মেলনের নাম হইল হাশর। ইমাম গাযালী (র) এই ধারণার চক্রবালে পতিত হইয়াছেন। যদি শুধু অর্থের উপর বিশ্বাস করা যায় এবং শব্দ ও সূরতকে না মানা হয়, তবে ইহা স্বয়ং এক কুফরী কাজ। আর ইহা বাতেনিয়াদের মাযহাব। এই মিসকীন (অর্থাৎ শায়খ মুহাক্কিক র) বলেন যে, রুচিবান ঈমানদারগণের নিকট এই প্রথম পন্থাও অসম্ভব ও অস্বীকৃতির প্রতি ইঙ্গিতবাহী। যেন তাহারা আকৃতির অস্তিত্বকে যখন স্বাভাবিক প্রকৃতি হইতে দূরে মনে করিয়াছেন তখন ব্যাখ্যা দানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অথচ শ্রবণ করা ও প্রতিপালন করার নামই হইল ঈমান। যেমন অত্র মি'রাজের ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) করিয়াছেন এবং ঐদিন হইতেই তিনি 'সিদ্দীক' নামও খেতাবে ভূষিত হইয়াছেন এবং কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমান ঈমানের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ইলমুল ইয়াকীন আয়নুল আয়ন হইতে উৎপত্তি। অর্থাৎ বিশ্বাস জ্ঞান, জ্ঞানের মূল সত্য হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে, যখন এই সম্পর্কে কথা বলা হয় এবং বিশ্লেষণের ভাষায় উহাকে প্রমাণিত করা, কালাম শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করা এবং বিবেক ও উহার বাহানার শিকার হওয়া, ঈমান ও আনুগত্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার শামিল। আর আমাদের ন্যায় ঈমানদারদের পথে আল্লাহ্ ও রাসূলের বাক্য হইতে বড় কোন দলীল হইতে পারে না। যাহা কিছু আমরা তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিব, উহাই করিব। এই সম্প্রদায় ইহাকে তাকলীদ বলিয়া থাকে। ইহারা এই কথা জানে না যে, এই তাকলীদ কিসের ? এই তাকলীদ উহার, যাহার অস্তিত্ব প্রতাপশালী মু'জিযা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং সপ্রমাণিতের তাকলীদ করা উহাই হইল প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করা, এবং আসলে ইহা অন্ধ অনুকরণও নয়, ইহা সোজা পথের অনুগমন করা। তোমরা হইলে অন্ধ অনুকরণকারী (মুকাল্লিদ)। কারণ, তোমরা বিবেকের অন্ধ অনুকরণ করিয়া থাক এবং উহার কথামত চলিয়া থাক, যাহার তথ্য সপ্রমাণিত নহে। উক্ত পথে কেবল দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব বটে। দার্শনিক মূলগতভাবে স্বয়ং আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদেরকে স্বীকার করে না। আমাদের তাহাদের কি প্রয়োজন ? তাহাদের নবী তো তাহাদের বিবেক আর ঐ সকল উজাড় গৃহবাসী মুতাকাল্লিমীনদের কি হইয়াছে যে, সোজা পথ থাকা সত্ত্বেও তাহারা পথহারা হইয়াছে এবং পথ সম্পর্কে কেবল বাদানুবাদ, সন্দেহ এবং ঝগড়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদিও দার্শনিকদের বিরোধিতা করা ও তাহাদের মতবাদকে রদ করা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু তবু পথ চলার ক্ষেত্রে বিবেক এবং বিবেকের পূজারীদের অনুসরণ করিয়া তাহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে।

পবিত্র মি'রাজের প্রমাণ

জ্ঞাত থাকা উচিত যে, পবিত্র মি'রাজের হাদীসকে অন্তর্নিহিত অর্থে সাহাবীগণের অধিকাংশ দলই একের পর এক রিওয়ায়েতে করিয়াছেন। যদিও কোন বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াতও রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুদীর্ঘ হাদীস হইল, যাহা ইমাম বুখারী ও

www.pathagar.com

ইমাম মুসলিম স্বীয় হাদীস-এর মধ্যে হযরত কাতাদা ও হযরত আনাস (রা) হইতে মালিক ইব্‌ন সা'সা' রাযিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন। আর উক্ত হাদীসে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নূরানী কলবকে বিদীর্ণ করা এবং উহাকে স্বর্ণের তস্তরিতে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা, উহাকে বিজ্ঞান ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করা, তারপর পুনরায় উহাকে পবিত্র বক্ষে স্বস্থানে সংস্থাপন করা এবং উহাকে সমান করার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র বক্ষ চার বার বিদীর্ণ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম শৈশব কালে— যখন তিনি হযরত হালীমা সাদিয়ার নিকট ছিলেন, দ্বিতীয় বার যৌবনের পূর্বাবস্থায় দশ বৎসর বয়সের সময়, তৃতীয়বার নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় এবং চতুর্থবার ঐ সময়ে যখন তাঁহার মি'রাজ হয়, যাহাতে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্রতার সহিত ফেরেশতা জগতে পৌঁছার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেন। এই ধারণার উপর উযূ করা হইয়া থাকে যে, নামাযের পূর্বে পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য যে, নামায হইল মি'রাজ-এর নমুনা। হযরত মূসা (আ)-এর তূর পর্বতে আল্লাহ্ পাকের সহিত কথোপকথনের সময় এই ব্যবস্থা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় নাই। এই জন্যে দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্যও হয় নাই। ইহা উক্ত স্থানের সৌন্দর্য যাহাকে প্রকৃতির পূজারীরা অস্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, বক্ষ বিদীর্ণ করা এবং কলিজাকে বাহির করা মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ইহা জীবনের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। জ্ঞানবানগণ ইহার ব্যাখ্যা দান করিয়া থাকেন যে, ধৌত করা ও অন্তর পবিত্র করার উদ্দেশ্য হইল অপবিত্রতা ও সম্ভাব্য পংকিলতা হইতে নবী (সা)-এর আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করা। বিশ্বাসিগণ কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই শব্দের বাহ্যিক পরিবর্তন ব্যতীতই বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে, ইহা সকলই স্বাভাবিক প্রচলিত কারণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন বস্তু অসম্ভব ও নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু স্বর্ণের তস্তুরি আনয়ন করা এবং উহার উপর ধৌত করা ইহা প্রচলিত নিয়ম ও স্বভাব অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করা মাত্র। ইহা দ্বারা এই দিকেও ইংগিত করা হইয়াছে যে, তিনি সমস্ত বিশ্বের সর্বেসর্বা ও শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু শরীআতে স্বর্ণের তস্তরি ব্যবহার করা অবৈধ করা হইয়াছে। তদুত্তরে বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, এই জগতে স্বর্ণ ব্যবহারকে অবৈধ করা হইয়াছে, কিন্তু পরকালে বিশেষতঃ মুসলমানদের জন্য ইহাই ব্যবহারযোগ্য হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ "হে নবী! বলিয়া দিন ইহলোকে ঈমানদারদের জন্য এই স্বর্ণ (অবৈধ) এবং কিয়ামতের দিন ইহা (তাহাদের জন্য) একমাত্র সম্বল হইবে" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)। আর রাসূলে আকরাম (সা)-এর এই ইরশাদ যে هُوَ لَهُمْ فِى لدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ স্বর্ণ হইল ইহলোকে কাফিরদের জন্য আর আমাদের জন্য পরকালে।

মি'রাজের কাহিনী আদতে পরজগতের পর্যায়ের এক ঘটনা। উপরন্তু উহার ব্যবহার ও তদ্‌কর্তৃক উপকৃত হওয়া রাসূলে আকরাম (সা)-এর পক্ষ হইতে অর্জিত হয় নাই। বরং ফেরেশতাগণ করিয়াছেন, যাহারা এই জন্য আদিষ্ট নহেন। বরং সম্ভবতঃ এই ঘটনা স্বর্ণ অবৈধ হওয়ার পূর্বকার ঘটনা হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও তাই। এই জন্যে যে মদীনা মুনাওয়ারায় মি'রাজের পর ইহা অবৈধ হইয়াছে। কোন কোন মা'রিফাতের পণ্ডিত স্বর্ণ এবং নবীর কলবের

www.pathagar.com

মধ্যে এক সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা এই যে, স্বর্ণ বেহেশতের বস্তুসমূহের এক বস্তু এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে বহু ভারি পদার্থ। উহাকে না মৃত্তিকা খাইতে পারে না উহাতে ঝংকার ধরিতে পারে, তদ্রূপ প্রত্যেক অন্তরের চেয়ে নবীর অন্তর অতীব ভারি, চাকচিক্যময় ও সুসজ্জিত। উহাতে প্রত্যাদেশের ভার বিদ্যমান এবং উহাকে ইহজগতের (আলমে সুফলা) মাটি খাইতে পারে না। এবং জাগতিক পংকিলতার ঝংকার স্পর্শ করিতে পারে না। আর ذَهَبٌ (স্বর্ণ) শব্দের মধ্যে ذَهَابٌ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র দিকে গমন করা) এবং اِذْهَابِ وَتَطْهِيْرٌ رِجْسٍ (অপবিত্রতা দূরীকরণ ও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন)-এর প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। এবং ইহা ঔজ্জ্বল্য, স্থায়িত্ব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর ঈমান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তস্তুরিকে পরিপূর্ণ করার মর্ম হইল, ঐ সকল নূরানী পদার্থ দ্বারা যাহা ঈমান ও জ্ঞানের পূর্ণত্বের মূল উৎস তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ করা। আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, ইহা অতীন্দ্রিয় দেহজাতীয় কিছু হইবে। যেমন সূরা বাকারায় আসিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন ছায়া বিশিষ্ট বস্তু ও মৃত্যু বকরীর আকৃতি ধারণ করাইয়া উপস্থাপিত করা হইবে এবং নেক কর্মসমূহকে সুন্দর আকারে পরিবর্তিত করা হইবে। তারপর ইহাকে সুবিচারের পাল্লায় রাখা হইবে। আরিফগণ বলেন যে, ইহাতে এই প্রমাণ রহিয়াছে যে, ঈমান ও হেকমত ইন্দ্রিয়গত পদাথt— অতীন্দ্রিয় নয় এবং স্বকীয়তাহীন পদার্থও নহে। যেমন ইলমুল কালামের পণ্ডিতগণের অভিমত উক্ত হইয়াছে। আর শরীআত প্রবক্তা (আলায়হিস সালাম) যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হইয়া থাকেন। বিবেকবানদের দৃষ্টি বাহ্যিকের উপর নিবদ্ধ থাকে। কারণ, তাহারা যখন দেখেন যে, কোন পদার্থ হইতে কোন কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। তখন উহার অস্বকীয়তার অর্থাৎ অপরের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নির্দেশ দান করিয়া থাকেন এবং রাসূলে কারীম (সা) কর্তৃক এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করা, ইয়াকীন এবং ঈমানের পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির এবং ধ্বংসাত্মক স্বভাব হইতে নির্ভয় হওয়ার কারণ হইয়া থাকে। রাসূলে আকরাম (সা) প্রত্যেক অবস্থায় ও প্রত্যেক স্তরে সকলের চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সুদৃঢ়পদ এবং শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু পবিত্র কলবকে যমযমের পানি দ্বারা সর্বপ্রথম ধৌত করার বিজ্ঞান বর্ণনায় বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, যমযম পানি আত্মাকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই জন্য পবিত্র কলবকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে যে, ফেরেশতা জগত প্রত্যক্ষ করার পর শক্তিশালী হইয়া যাইবেন। এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ উপস্থাপন করিয়া থাকেন যে, যমযমের পানি কাওছারের পানি হইতে উত্তম। কারণ এই যে, পবিত্র কলবকে উত্তম পানি ব্যতীত ধৌত করা হয় নাই। এই উক্তি যে, যমযম-এর পানি নিকটে ছিল এবং আবে কাওছার দূরে ছিল ইহা বড় দুর্বল উক্তি। এই জন্যে যে, এই স্থানে দূর ও নিকট কল্পনার বিষয়বস্তু নয়। এই স্থান তো সকলই সমান।

বুরাকের বর্ণনা

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) এক সাদা চতুষ্পদ বাহন লইয়া আসেন, যাহাকে বুরাক বলা হয়। উহা খচ্চরের চেয়ে নীচু এবং গর্দভের চেয়ে উঁচু ছিল এবং দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উহার এক কদম হইত। হাদীস শরীফে আছে যে, আমাকে আরোহণ করান হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে আকাশের উপর লইয়া যান। হাদীসের বাহ্যিক দিক হইতে ইহাই

www.pathagar.com

বুঝা যায় যে, আকাশ পর্যন্ত বুরাকে গিয়াছিলেন এবং উহা বায়ুমণ্ডলে এইরূপে চলিতেছিল যেরূপ মাটির উপর চলিয়া থাকে। ইহাও স্বভাব বিরুদ্ধ। কেননা, মানুষ বায়ুমণ্ডলেই চলিতে পারে না। থাকতো চতুষ্পদের উপর আরোহণ করিয়া। এই সকল আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের হস্তের লীলাখেলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, স্বভাব ও প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মের অধীন নহে। কোন কোন বর্ণনায় বুরাকের দুই বাহু ছিল আসিয়াছে। যাহার দ্বারা সে উড্ডয়ন করিত। কেহ কেহ বলেন যে, মাসজিদে আকসা পর্যন্ত বুরাকে আরোহণ করিয়া গমন করা হইয়াছিল, উহার পর এক মি'রাজ অর্থাৎ সিঁড়ি রাখা হয় যাহার মাধ্যমে ঊর্ধ্বে লইয়া যাওয়া হয়, এক রিওয়ায়াতে ইহাও আসিয়াছে। এই উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে এইরূপে সংযোগ স্থাপন করা যায় যে, কোন কোন রাবী তাহাদের বর্ণনায় এইগুলি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করেন নাই, যাহা অন্য রাবীগণ করিয়াছেন। প্রথম রাবী (বর্ণনাকারী) মাসজিদে আকসা পর্যন্ত বুরাকে আরোহণ করিয়া গমনকে বিস্তারিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। এবং ঐ বাহনের সাহায্যে আকাশ পরিমণ্ডলে গমনের কথা উল্লেখ করেন নাই। অন্য রাবী আকাশ পরিমণ্ডলে গমন সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা বাহনবিহীনও হইতে পারে। বুরাক প্রেরণের মধ্যে উদ্দেশ্য হইল বিশ্বনেতা, বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয় বন্ধু রাসূল (সা)-এর প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করা। যেরূপ প্রিয়জনেরা স্বীয় প্রেমাস্পদকে আনয়নের জন্য অশ্ব প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং সর্বাধিক বিশেষ ব্যক্তিকে যিনি দরবারে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহাকে আহ্বান করার জন্য বিশেষ দূত প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং রাতের বিশেষ নির্জন সময়ে অপরের দৃষ্টির অগোচরে ডাকিয়া থাকেন وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَتَعَالٰى وَتَقَدَّسَ –। খচ্চরের চেয়ে খাটো এবং গাধার চেয়ে উঁচু, অশ্বাকৃতিও নয়, এই বুরাক প্রেরণের পিছনে উদ্দেশ্য হইল এই যে, এই ডাকে শান্তি ও নিরাপদের পরিচয় বহন করে ইহাকে যুদ্ধ ও ভয়-ভীতির কোন আশংকা নাই। আর বুরাকের এমন দ্রুতগতি হওয়া যাহার প্রচলিত ও স্বাভাবিক গতির সহিত কোন মিল নাই। উহা কেবল অলৌকিকত্বকে প্রকাশ করার নিমিত্ত ছিল। হযরত শায়খ বলেন যে, ইহার নাম বুরাক— ঘোড়া এবং খচ্চর নয়। বরীক হইতে এই বুরাকের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অর্থ হইল উজ্জ্বল শিখা। এই হিসাবে তাহার গতিও অতি দ্রুত। হযরত কাযী ইয়ায (র) বলেন যে, উহাকে বুরাক এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উহার দুই রং ছিল, যাহাকে "শাতে বরকা" (উজ্জ্বল বকরী) বলা হইয়া থাকে, যাহার চুলে সাদা ও কাল দুই প্রকার রং-এর সংমিশ্রণ থাকে। মাওয়াহিব গ্রন্থকার বলেন যে, সম্ভবতঃ বুরাক বারীক হইতে উদগত নাও হইতে পারে। কোন কোন রাবীর কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, যখন রাসূলে আকরাম (সা) পবিত্র পা রেকাবে রাখিতে লাগিলেন, তখন বুরাক অভিমান করিতে থাকে। ঐ সময় জিবরাঈল (আ) বুরাককে বলেন যে, তোর কি হইয়াছে কেন অভিমান করিতেছিস তোর উপর রাসূলে আকরাম (সা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম সম্মানী আজ পর্যন্ত আর কেহ আরোহণ করে নাই। তখন বুরাক আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মাটিতে বসিয়া যায়, তারপর রাসূলে আকরাম (সা) উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বুরাক নবীগণের বাহন হিসাবে নির্ধারিত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যেক নবীর জন্য তাহাদের গঠন ও মর্যাদা মোতাবিক স্বতন্ত্র বুরাক থাকিত। বস্তুতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে পবিত্র মক্কায় হযরত ইসমাঈল

www.pathagar.com

(আ)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য বুরাকের উপর আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) যেন ইহা দ্বারা বুরাক-এর ধরনের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। আর বুরাক-এর অভিমান এই কারণে ছিল যে, এতদিন পর্যন্ত উহার উপর কেহ আরোহণ করে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, বুরাকের এই অভিমান অহংকারের দরুন ছিল, বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির জন্য ছিল না। যেমন পাহাড় প্রকম্পিত হওয়ার কারণে রাসূল (সা) বলিয়াছেন اُثْبُتْ يَا شَبِرْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ হে শিবর পাহাড়! স্থির থাক, নিঃসন্দেহে তোর উপর নবী, সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ আরোহণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, বুরাকের রিকাব হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাতে এবং লাগাম হযরত মীকাঈল (আ)-এর হাতে ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর পিছনে (রাদীফ) আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথমত রিকাব ধারণ করিয়া থাকিবেন, উহার পর রাসূলে আকরাম (সা) পথের মধ্যে ভালবাসা ও অনুগ্রহের তাকীদে তাঁহাকে পিছনে বসাইয়া লইয়াছেন অথবা ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমতঃ পিছনে বাসিয়াছিলেন তারপর রাসূল (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শনের দরুন অবতরণ করতঃ রিকাব ধারণ করিয়া থাকিবেন। (আল্লাহু সর্বাধিক জ্ঞাত) তারপর যখন রাসূলে আকরাম (সা)-এর বাহন খেজুর স্থানে (খেজুরের ভূমি) আসিয়া পৌঁছে, তখন জিবরাঈল আরয করেন, এই স্থানে দুই রাকআত নামায পড়ুন, ইহা ইয়াছরিবের ভূমি, যাহাকে পরে মদীনা মুনাওয়ারা নামে অবিহিত করা হইবে। ইহার পর যখন মাদায়েন পৌঁছান এবং যে স্থানে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভূমিতে পৌঁছান তখন উভয় স্থানেই হযরত জিবরাঈল (আ) ঐ কথা আরয করেন যে, অবতরণ করতঃ দুই রাকআত নামায আদায় করুন। অতঃপর রাসূল (সা) একদিকে এক বৃদ্ধা মেয়েলোককে দাঁড়ান অবস্থায় দেখিতে পান। রাসূল (সা) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহা কে ? আরয করেন যে, আপনি আগে অগ্রসর হউন। তারপর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, একদিকে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে এবং সে তাঁহাকে ডাকিতেছে, রাসূল জানিতে চাহিলেন যে, এ কে ? আরয করিলেন, রাসূল অগ্রসর হইতে থাকুন। ইহার পর এক জামাতের নিকট দিয়া অতিবাহিত হইতে হয়, যাহারা রাসূল (সা)-কে সালাম পেশ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, আসসালামু আলাইকা ইয়া আওয়ালু, আসসালামু আলাইকা ইয়া আখেরু, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাশিরু, ইহার উপর হযরত জিবরাঈল (আ) আরয করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইহাদের সালামের উত্তর প্রদান করুন। তিনি তাহাদের সালামের উত্তর দান করেন (শেষ হাদীস পর্যন্ত)। সেই সময় হযরত জিবরাঈল (আ) আরয করেন যে, সেই বৃদ্ধা নারী যাহাকে রাসূল (সা) দেখিয়াছিলেন, উহা দুনিয়া ছিল, এখন দুনিয়ার বয়স বেশী বাকী নাই। কিন্তু মাত্র এতটুকুন, যতটুকুন এই বৃদ্ধার অবশিষ্ট আছে। আর রাসূল (সা)-কে যে আহ্বান করিয়াছিল, সে ইবলীস ও শয়তান ছিল, যদি রাসূল (সা) উহার প্রতি লক্ষ্য করিতেন, আর উহার উত্তর দান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উম্মত ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দান করিত এবং শয়তান তাহাদিগকে গোমরাহ করিয়া দিত। আর ঐদিন যাহারা তাঁহার প্রতি সালাম আরয করিতেছিলেন, তাহারা হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলায়হিমুস সালাম

www.pathagar.com

ছিলেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নূরানী কবরের দিক হইতে অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বীয় পবিত্র কবরে নামায পড়িতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রাসূল। যেহেতু নবীগণ যিন্দা হইয়া থাকেন এবং খোদার দরবারে বন্দেগী করিয়া থাকেন। যেমন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে ইবাদত করিবেন অথচ তাঁহারা তজ্জন্য আদিষ্ট থাকিবেন না।

অতঃপর রাসূলে আকরাম (সা) এমন সৎ কর্মশীল ও দুষ্কার্যকারী দল ও সম্প্রদায়সমূহের উপর দিয়া অতিক্রম করেন, যাহারা আলমে বরযখ (কবরের জগত) এবং মেছালী জগতে (প্রতিচ্ছবি জগত) নিজ নিজ অবস্থা ও কর্মের ফল ও পরিণতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। ইহার বর্ণনা বড় লম্বা। অতঃপর রাসূলে (সা) বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছেন এবং বুরাককে মসজিদের দরওয়াযার হালকার (থাম্বা)-র সহিত বাঁধিয়া রাখেন, যাহাকে এখন বাবে মুহাম্মদ (সা) (মুহাম্মদের দ্বারা) বলা হয়। ইহার পর মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করেন। খুব সম্ভব এই দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায ছিল। এই স্থানে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং সমস্ত নবী হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সকল নবীর পবিত্রাত্মার রূপ ধারণ করতঃ উপস্থিত হন। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, গুণ গান বর্ণনা করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত ও সালাম আরয করেন। আর সকলেই রাসূল আকরাম (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দান করেন। তারপর আযান দেওয়া হয় এবং নামাযের ইকামত বলা হয় এবং সকলে রাসূল (সা)-কে ইমামত করার জন্য সম্মুখে আগাইয়া দেন। নবী (সা) ইমামত করেন এবং সকল আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণ ইকতিদা করেন। আলিমদের মধ্যে এই সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, এই নামায নফল ছিল অথবা ফরয। যদি ফরয হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা ইশার নামায ছিল অথবা ফজরের নামায ? হাদীসের পূর্বাপর ধারা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত শুভাগমন করা ঊর্ধ্ব গগনে গমনের পূর্বে ছিল, তাহা হইলে ইহা ইশার নামায হইবে। আর ঐ কথা অনুযায়ী যাহারা এই কথা বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা ঊর্ধ্বজগত হইতে অবতারণের পর ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে ইহা সকালের নামায হইবে। কেহ কেহ এই মতের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। কেননা, রাসূলে আনওয়ার (সা) যখন সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও বরকতসমূহ লইয়া অবতরণ করেন, তখন সমস্ত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের উপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রকাশ করার জন্য এই নামায আদায় করেন।

এই মিসকীন (অর্থাৎ শায়খ মুহাক্কিক র)-এর অন্তরে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, ইহা উভয় অবস্থাতেই কেন হইতে পারিবে না ? অর্থাৎ ঊর্ধ্বাকাশে গমনের পূর্বেও এবং ঊর্ধ্বজগত হইতে অবতরণের পরেও। কিন্তু হাদীসবেত্তাগণ এই সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ না থাকার দরুন উক্ত ধারণাকে লিপিবদ্ধ করার সাহস পান নাই। কিন্তু যখন এই রিওয়ায়াত সমূহকে দেখার সুযোগ হয়, তখন আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ শায়খ ইমাদুদ দীন ইব্‌ন কাছীর যিনি হাদীস ও তাফসীরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার বক্তব্য দেখিতে পাই যে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে আনওয়ার (সা) ঊর্ধ্বকাশে গমনের পূর্বে এবং পরে উভয়

www.pathagar.com

অবস্থায় নবীগণের সহিত নামায আদায় করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসে এই ধরনের ইশারা বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা ইহার প্রতি সাক্ষ্য বহন করে এবং ইহার বিরোধিতাও কেহ করে নাই। আলহামদু লিল্লাহ্, কিন্তু শায়খ ইব্ন কাছীর (র) কি সুন্দর বলিয়াছেন যে, কতিপয় লোক বলিয়া থাকে যে, নবী (সা) আকাশে অবস্থান করিয়াছেন। অথচ প্রকাশ্য ও বহুল প্রচারিত রিওয়ায়াতসমূহে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যাবর্তনের পর এই অবস্থান করিয়াছেন। এই স্থানে শ্রেষ্ঠ শায়খ কেন বলিবেন না যে, উভয় স্থানেই ছিল, অথবা উভয় অবস্থায়ই ছিল। আর কেনই বা তিনি প্রকাশ্য ও বহু প্রচারিত রিওয়ায়াতে ও দেরায়াত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবেন।

যখন রাসূলে আকরাম (সা) মসজিদ হইতে বাহিরে তাশরীফ আনয়ন করেন, তখন জিবরাঈল (আ) শরাবের এক পেয়ালা এবং এক পেয়ালা দুধের হাদিয়া পেশ করেন এবং আরয করেন যে, নবী (সা) যে পিয়ালা ইচ্ছা পান করিতে পারেন। নবী (সা) দুধের পিয়ালাকে পসন্দ করেন। জিবরাঈল বলেন যে, আপনি ফিতরাত (স্বভাব)-কে গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থানে ইসলাম ও উহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে ফিতরাতের মর্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ নবী (সা) ইসলামের নিদর্শন ও দৃঢ় প্রত্যয়কে গ্রহণ করিয়াছেন। দুগ্ধ ইসলামের নিদর্শন এই জন্য হইয়াছে যে, পানকারীর পক্ষে ইহা উপাদেয় পবিত্র এবং সুপরিচিত ও সুখ্যাত এবং এই জগতে দুগ্ধকে দীন এবং জ্ঞানের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। আর যদি কেহ স্বপ্নে দেখে যে, সে দুগ্ধ পান করিতেছে, তাহা হইলে উহার ব্যাখ্যা ইহাই করা হইয়া থাকে যে, সে ইলম এবং দীন দ্বারা লাভবান হইবে। আলহামদু লিল্লাহ্ অক্ষর লেখক (গ্রন্থকার) কোন কোন স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, নতুন পিয়ালা, উহা অতি পরিষ্কার সুমধুর ঠাণ্ডা দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ এবং উহা সম্মুখেই পান করিয়া লইয়াছেন। মদ্য হইল ইহার বিপরীত। কেননা, উহা হইল অপবিত্রতার জননী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে নানা প্রকারের অনিষ্ট ও দুষ্কার্য সৃষ্টির কারণ। কেহ কেহ বলে যে, ফিতরাতের অর্থ হইল প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ভিত্তি হইল দুগ্ধ। মাংস, চামড়া এবং হাড়ের পরিবর্ধনও উহা হইতেই হইয়া থাকে। আর নবপ্রসূত বাচ্চার পেটে সর্বপ্রথম যে বস্তু প্রবেশ করে এবং যাদ্বারা উহার পেটের রগসমূহ প্রশস্ত হইয়া থাকে উহা হইল এই দুগ্ধ। আর ইহাও এক কারণ যে, নবী (সা)-এর নিকট দুগ্ধ বড় পসন্দনীয় বস্তু ছিল। যদিও ঐ সময় মদ্যপান মুবাহ ছিল এই জন্য যে, ইস্রার কাহিনী পবিত্র মক্কায় সংঘটিত হইয়াছে এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে মদীনায়। কিন্তু যেহেতু ইহার শেষ পরিণতি অবৈধতার উপর ছিল, অথবা এই জন্য যে, নবী (সা)-এর উহা হইতে দূরে থাকা সংযম ও তাকওয়ার কারণে ছিল। আর এই কারণেও হইতে পারে যে, আদতে তো ইহা অবৈধই হইয়া যাইবে। আর আসলেও ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্ত সঠিক ছিল। জিবরাঈল (আ) উত্তর দান করেন যে, أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ আপনি ফিতরাতকে লাভ করিয়াছেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, أَصَبْتَ أَصَابَ اللّٰهُ بِكَ আপনি সঠিক পথকে গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি বলা হয় যে, এই শরাব তো জান্নাতের ছিল, এতদ্সত্ত্বেও নবী (সা) পার্থিব দুনিয়ার মদের ন্যায় সমআকৃতির হওয়ার দরুন উহা হইতে পরহেয করিয়াছেন। এক

www.pathagar.com

রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আ) বলেন যে, যদি আপনি মদকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হইয়া যাইত এবং উহা পান করার মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়িত। আর আপনার উম্মত এই মদ্যপানের দরুন পার্থিব দুনিয়ার মদ্যপানে যাহা অনিষ্ট ও অনাচারের মূল উহাতে নিমজ্জিত থাকিত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আছে যে, দুই পিয়ালা আনয়ন করা হয়, একটি দুধের এবং এক পিয়ালা মধুর। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তিন পিয়ালা আনয়ন করা হয়, এক পিয়ালা দুধের, দ্বিতীয় পিয়ালা পানির, তৃতীয় পিয়ালা শরাবের। এই রিওয়ায়াতে মধুর উল্লেখ নাই। যাহা হউক নবী (সা) দুধকে গ্রহণ করাকে পসন্দ করিয়াছেন। সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছার পরই এই সকল পিয়ালা আনয়ন করা হয়। হাফিয ইমাদুদ দীন কাছীর (র) ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, সকল নবী মহিমান্বিত বিশ্ব প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত দাঊদ, হযরত সুলায়মান এবং হযরত ঈসা আলায়হিমুস সালাম প্রমুখও ছিলেন। তাঁহাদের এই প্রশংসাবাদ এবং প্রাঞ্জলতাপূর্ণ ভাষণের মধ্যে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ, কারামত ও অলৌকিকত্বসমূহের উল্লেখ ছিল, যাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সম্পৃক্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাহাদের মুখ খুলিয়া দেন। ইহার পর সাইয়েদে আলম খাতামুন নবীয়্যীনের (সা) পবিত্র মুখ খুলিবেন এবং ইরশাদ করিবেন যে, তোমরা সকলে মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করিয়াছ। এখন আমিও তাঁহার প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করিতেছি এবং বলেন যে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لِلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَاَنْزَلَ عَلَىَّ الْفُرْقَانَ فِيْهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَجَعَلَ اُمَّتِىْ وَسَطًا وَجَعَلَ اُمَّتِىْ هُمُ الْاَوَّلُوْنَ وَهُمُ الْاٰخِرُوْنَ وَشَرَحَ لِىْ صَدْرِىْ وَوَضَعَ عَنِّىْ وِزْرِىْ وَرَفَعَ لِىْ ذِكْرِىْ وَجَعَلَنِىْ فَاتِحًا وَّخَاتِمًا

'সমস্ত প্রশংসা সেই প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত এবং সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার উপর এমন কুরআন অবতারণ করিয়াছেন যাহার মধ্যে সকল বস্তুর বর্ণনা উজ্জ্বল রূপে করা হইয়াছে। আর আমার উম্মতকে মধ্যম উম্মত বানাইয়াছেন। আর আমার উম্মতকে পরিগণিত করিয়াছেন যে, উহারাই প্রথম এবং উহারাই শেষ হইবে এবং আমার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং আমার বোঝাকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য আমার স্মরণকে সমুন্নত করিয়া দিয়াছেন এবং বানাইয়াছেন আমাকে বিজয়ী এবং নুবুওয়াতের ধারার সর্বশেষ নবী।' এই বর্ণনা দানের পর হযরত ইবরাহীম (আ) বলেন, بِهٰذَا اَفْضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ 'হে মুহাম্মদ (সা)! এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করিয়াছেন।'

www.pathagar.com

অতঃপর জান্নাতুল ফিরদাউস হইতে এক সিঁড়ি আনয়ন করা হয়, যাহার ডানে ও বামে ফেরেশতাগণ ছিলেন। তিনি উহা দ্বারা আকাশমণ্ডলে যাইয়া পৌছেন। তথায় তিনি ঐ সকল নবীকে দেখিতে পান যাহাদিগকে তাঁহার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং সাক্ষাৎ করার জন্য নির্দেশ দান করা হইয়াছিল। তাঁহারা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রতিচ্ছবি দেহ ধারণ করিয়া আগমন করার পর আকাশমণ্ডলেও উক্ত প্রতিচ্ছবি আকৃতি ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং হাদীসসমূহে যেরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঐভাবে সালাম আরয করেন। এই ঘটনার মধ্যে যে সকল আশ্চর্য ও বিস্ময়কর অবস্থা ও কাহিনী রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এই যে, যখন নবী (সা) ষষ্ঠ আকাশে পৌছেন, তথায় হযরত মূসা (আ)কে দেখিতে পান, তথা হইতে যখন তিনি উপরে তাশরীফ লইয়া যাইতে থাকেন, তখন হযরত মূসা (আ) ক্রন্দন করিতে থাকেন আর বলিতে থাকেন যে, এক ব্যক্তি যাহাকে আমার পর প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাকে এমন মর্যাদাবান বানান হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মত জান্নাতে আমার উম্মতের পূর্বে গমন করিবে। আলিমগণ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর এই ক্রন্দন (আল্লাহ্ মাফ করুন) হিংসার কারণে ছিল না। কেননা, ঐ জগতে প্রত্যেক মু'মিনের অন্তর হইতে হিংসার অস্তিত্বকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। থাকুক তো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণার উদ্রেক হওয়া, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বাক্যের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন এবং রিসালতের মাধ্যমে মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। বরং ইহা উক্ত বস্তু বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার দরুন যাহা মরতবার উচ্চতার উপর প্রতিফলিত হইয়া থাকে আফসোস প্রকাশ করিয়াছেন। আর উহার কারণ এই যে, তাঁহার উম্মতদের পক্ষ হইতে এত বেশী বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা তাহাদের প্রতিদান ও সাওয়াবের স্বল্পতার কারণ হইয়াছে যদ্দরুন তাঁহারও অল্প প্রতিদান ও ছওয়াব লাভের কারণ হইয়াছে। এই জন্য যে, প্রত্যেক নবীর জন্য উহার সমতুল্য সাওয়াব লাভ হইবে যতটুকু তাহার অনুসরণকারীদের লাভ হইবে। আর যত সংখ্যক লোক হযরত মূসা (আ)-এর অনুসরণ করিয়াছে উহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকারীদের তুলনায় অনেক কম হইবে, শায়খ ইব্ন হাজর এইরূপ ফাতহুল বারীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবী জামরা, যিনি মালিকী মাযহাব অবলম্বী আরিফগণের মধ্য হইতে ছিলেন, বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর অন্তরে স্বীয় উম্মতের জন্য রহমত ও অনুগ্রহ রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ঐ সকল গুণে প্রাকৃতিক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণে কোন কোন কার্যের ক্ষেত্রে আমাদের নবী (সা) ক্রন্দন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ বস্তু আপনাকে কাঁদাইয়াছে ? বলিয়াছেন যে, ক্রন্দন করা দয়া স্বরূপ এবং আল্লাহ্ তা'আলা দয়াবানদের প্রতিই দয়া করিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহে নবীগণ খোদা তা'আলার দয়ার পূর্ণ হিস্সা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অন্তরে অন্যান্য সকল লোক হইতে অধিক পরিমাণে দয়াও রহিয়াছে। এই কারণে হযরত মূসা (আ) নিজ উম্মতের উপর দয়া ও মায়ার খাতিরে ক্রন্দন করিয়াছেন। কারণ, ঐ সময় ছিল ফযীলত, দান ও করুণা লাভের সময় এবং দয়ালু বন্ধুর শুভাগমনের সময় যাহাতে বিস্তর ফযীলত এবং নৈকট্যের খিলাত দ্বারা ভূষিত হইতে পারেন। সুতরাং এই কবুল ও গ্রহণের সময়

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ) আশা করিয়াছেন যে, সময়ের শুভ মুহূর্তের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উম্মতের উপর যেন দয়া করেন।

আর হযরত মূসা (আ) কর্তৃক 'গোলাম' শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ অল্প বয়স্ক করা হইয়াছে। অন্য কোন অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। ইহা এই কারণে যে, অন্যান্য নবীগণের তুলনায় নবী (সা) অল্প বয়সের ছিলেন এবং আরবরা বয়স বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে গোলাম বলিয়া থাকে। যেন (স্বাস্থ্যবান যুবক অর্থে গোলাম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে)।

ফাত্হুল বারীতে বলা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) 'গোলাম' শব্দ বলিয়া এই দিকে ইংগিত করিয়াছেন যে, মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের অনুগহ, সম্মান ও তাঁহার দান স্থায়ী শক্তির সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। শৈশব কাল হইতে বার্ধক্য কালে পদার্পণ করিলে তখনও তাঁহার পবিত্র দেহে বার্ধক্যের দুর্বলতা কার্যকর হইতে পারে নাই এবং রাসূলে আকরাম (সা)-এর শক্তি ও কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার কোন পথই নাই। এমনকি যখন নবী (সা) পবিত্র মদীনায় হিজরত করিয়া চলিয়া আসেন, তখন লোকেরা তাঁহার প্রতি 'শাব্ব' বা 'যুবক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি শায়খ শব্দ অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। যদিও রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র বয়স হযরত আবূ বকর (রা)-এর চেয়ে বেশী ছিল। (মিসকীন বান্দা) শায়খে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন যে, এই কারণে যে, তাঁহার উপর বার্ধকের চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায়নাই। কেবলমাত্র কতিপয় ঐ সাদা চুল ছাড়া যাহা তাহার পবিত্র মাথা ও দাঁড়িতে ছিল, যাহাতে তিনি মানুষের চক্ষে বৃদ্ধ ও দুর্বল বলিয়া মনে না হন।

এই উম্মতে মুহাম্মদিয়া (সা)-এর প্রতি হযরত মূসা (আ)-এর স্নেহ ও অনুগ্রহের প্রমাণ নিঃসন্দেহে নামাযকে হ্রাস করার ব্যাপারে প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায হইতে পাঁচ ওয়াক্ত করা হইয়াছে। আলিমগণ বলেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর এই অনুগৃহীত উম্মতের উপর এত দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন করার এই কারণ ছিল যে, তিনি তাওরাতের মধ্যে এই উম্মতের গুণাবলী এবং বৈশিষ্টসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, উক্ত উম্মতকে তাহার উম্মতে পরিণত করিয়া দেওয়া হউক। ইহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যে উম্মত তো আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মত। এই আশা অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও। তারপর হযরত মূসা (আ) আরয করেন, হে খোদা! তুমি আমাকে সেই আহমদ মুজতবা (সা)-এর উম্মত বানাইয়া দাও।

সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছানো

ইহার পর হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে সৃষ্ট জীবের সকল আমল এবং তাহাদের সকল বিদ্যা শেষ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম নাযিল হয় এবং নির্দেশাবলী অর্জন করা হয়, ফেরেশতারা উক্ত স্থান পর্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে এবং তথা হইতে অতিক্রম করার কাহারও কোন প্রকার ক্ষমতা ও সাধ্য নাই।

www.pathagar.com

এই স্থানেই সকলে আসিয়া থামিয়া যায়। আর ঐ সকল বস্তু যাহা নিম্ন জগত হইতে উর্ধ্বে যায় এবং উর্ধ্ব জগত হইতে আল্লাহ্র যে সমস্ত বিধি-নিষেধ এবং নির্দেশাবলী নাযিল হইয়া থাকে, উহার শেষ সীমাও ইহাই। উহার আগে কোন মাখলুক অতিক্রম করে নাই। একমাত্র সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া। হযরত জিবরাঈল (আ)ও এই স্থানে থামিয়া যান এবং নবী (সা) হইতে বিচ্ছেদ হইয়া যান নবী (সা) জিবরাঈল (আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কোন স্থান এবং বিচ্ছেদ হওয়ার কোন্ মকাম ? এই স্থান তো এমন নহে যে, বন্ধু বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া যায়। জিবরাঈল (আ) আরয করেন যে, অঙ্গুলি পরিমাণও যদি নিকটে যাই, তাহা হইলে আমি জ্বলিয়া যাইব।

بدو گفت سالار بیت الحرام * که اے حامل وحی برتر خرام

بگفتا فراتر مجالم نماند * بماندم که یزدی بالم نماند

اگر یک سر موئے برتر پرم * فروغ تجلی بسوزد پرم

"তাঁহাকে পবিত্র সম্মানিত গৃহের অধিপতি বলিলেন যে, হে ওহী বহনকারী উর্ধ্বে আরোহণ কর। তিনি বলেন যে, আর উর্ধ্বে গমনের অধিকার আমার নাই, আমার সহিত যে খোদা প্রদত্ত পাখাসমূহ আছে উহা থাকিবে না। যদি এক চুলের চেয়ে অধিক আমি উড্ডয়ন করি, তাহা হইলে মহিমামণ্ডিত আল্লাহর তাজাল্লীর জ্যোতিতে আমার সমস্ত পাখা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।"

কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে যে, বিশ্বনবী (সা) হযরত জিবরাঈল-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বল, আমি বারী তা'আলার দরবারে উহা পেশ করিয়া দিব। জিবরাঈল (আ) আরয করেন যে, আমার এই আকাংখা, মহান আল্লাহ্র দরবারে আরয করিবেন যে, কিয়ামতের দিন যেন আমার বাহুসমূহকে আরও বেশী প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে পুলসিরাত হইতে নিজ বাহু দ্বারা আপনার উম্মতগণকে পার করিতে পারি। এই বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, সপ্তম আকাশে অবস্থিত। এই রিওয়ায়াতদ্বয়ের মধ্যে এইরূপে সংযোগ স্থাপন করা যায় যে, সিদরাতুল মুনতাহার মূল ভিত্তি হইল অষ্টম আকাশে এবং উহার ডাল-পালা সপ্তম আকাশে। কুল বৃক্ষকে সিদরা বলা হয়। ইহার সহিত নামকরণের কারণ শরীআতে প্রবর্তকের জ্ঞানের উপর অর্পণ ও ন্যস্ত করা হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, উক্ত বৃক্ষের তিন প্রকারের গুণ রহিয়াছে। এক, উহার ছায়া লম্বা। দ্বিতীয় এই যে, উহার স্বাদ বড় মজার। তৃতীয় এই যে, উহার গন্ধ বড় সুন্দর। আর ইহা ঈমানের পর্যায় হইয়া যায়, যাহা কথা, কর্ম ও নিয়তের সমষ্টিকে বলা হয়। সম্ভবত ইহা আকাশে ঐরূপ লাগিয়া থাকে, যেরূপ মাটিতে বৃক্ষ লাগিয়া থাকে। তদুপরি ইহাও আল্লাহ্র কুদরত হইতে দূরের নয় যে, যেরূপ মাটিতে বৃক্ষরাজি বাড়িতে থাকে তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলেও বর্ধিত হইতে পারে। যেরূপ নবী (সা) বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াছেন। আর ইহারও সম্ভাবনা আছে যে, জান্নাতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেরূপ জান্নাতেরি বৃক্ষরাজির অবস্থা হইবে এবং

www.pathagar.com

ইহাও হইতে পারে উহাকে প্রতিষ্ঠিতই করা হয় নাই। (প্রকৃতাবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন)।

সিদরাতুল মুনতাহা হইতে চারটি নদী বাহির হইয়াছে। দুইটি বাহিরে এবং দুইটি ভিতরে। ভিতরের দুটি জান্নাতে প্রবাহিত হয়। আর বাহিরের দুইটিকে নীল ও ফুরাত নদী বলা হইয়া থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস হইতে জানা যায় যে, এই চারটি নদীই জান্নাত হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে— নীল, ফুরাত, সায়হান ও জায়হান। কেহ কেহ জান্নাত হইতে হওয়ার মর্ম এই বর্ণনা করিয়াছে যে, উহাদের উপকার ও কল্যাণসমূহ স্থায়ী ও অগণিত, কেহ কেহ বলিয়াছে যে, উহা বেহেশতের শ্রেণী হইতে বাহির হইয়াছে। নীল নদের অবস্থা বর্ণনায় বহু আশ্চর্য ও অভিনব বিষয় লেখা হইয়াছে। যদ্শ্রবণে বিবেক হয়রান হইয়া যায়। আর পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নদী স্বতন্ত্র, যাহা জান্নাতে প্রবহমান থাকিবে। যদ্সম্পর্কে কুরআন কারীমে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আবী হাতিম হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসের উদ্ধৃতি আনয়ন করিয়াছেন যে, রাসূলে আনওয়ার (সা) যখন সপ্তম আকাশ হইতে বাহির হইয়া আসেন, তখন এক নদী প্রত্যক্ষ করেন। যাহা ইয়াকুত ও যামাররাদ পাথরের টুকরার উপর প্রবহমান। আর উহার পিয়ালা স্বর্ণ, রৌপ্য, ইয়াকূত, মুক্তা, এবং যবরজাদের প্রস্তুতকৃত। আর উহার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। নবী (সা) বলিলেন হে জিবরাঈল, এইগুলি কি ? জিবরাঈল আরয করিলেন, ইহা হাউযে কাওছার, যাহাকে আল্লাহ্ আপনাকে দান করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, জান্নাতে যে নদী প্রবাহিত হয় এবং যাহাকে সালসাযিল নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে উহা হইতে দুইটি নদী বাহির হইয়াছে। একটির নাম 'কাওছার' দ্বিতীয়টির নাম 'নহরে রহমত'। ইহা সেই রহমতের দরিয়া, যখন পাপী ব্যক্তি (পাপের শাস্তি ভোগ করার পর অথবা শাফাআতের দরুন দোযখে জ্বলিয়া-পুড়িয়া কাল অবস্থায় বাহির হইয়া আসিবে, তখন সে ঐ দরিয়ায় অবগাহন করিবে এবং তৎক্ষণাৎ সজীব হইয়া যাইবে। সিদরাতুল মুনতাহা যাহা নূরের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। স্বর্ণের পাখী ও পতংগের ন্যায় প্রত্যেক পাতায় একটি করিয়া ফেরেশতা রহিয়াছে। উক্ত স্থানের প্রশংসা করা ও গুণাবলী বর্ণনা করা ধারণা ও বিবেক শক্তির বাহিরে। এই স্থানেও এই রিয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, নবী (সা)-কে শরাব, দুধ ও মধুর পেয়ালা পেশ করা হয়। নবী (সা) দুধকে গ্রহণ করেন। অতঃপর বায়তুল মামূর উদভাসিত হইয়া উঠে এবং উহার পর্দা উঠাইয়া লওয়া হয়। হাদীসের শব্দ এইরূপ ঃ ثُمَّ رُفِعَ اِلَى الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ অতঃপর আমাকে বায়তুল মামূরের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। উহার এইরূপ তাফসীর করা হইয়াছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা এবং বায়তুল মা'মূরের মধ্যে বহু জগত ছিল এবং উহা জ্ঞাত হওয়ার শক্তি ছিল না। সুতরাং উহার সকল পর্দাকে উঠাইয়া লওয়া হয় এবং নবী আকরাম (সা)-এর দিব্যজ্ঞান ও চক্ষুর দর্শনের সম্মুখে উহাকে আনয়ন করা হয় আর তিনি অতি উত্তমরূপে দেখেন।

বায়তুল মা'মূরের অবস্থান কা'বাগৃহের একদম সোজা বিপরীত উপরের দিকে। এমনকি যদি পৃথিবীর বুকে উহার পতন হওয়াকে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে কা'বাগৃহের উপর আসিয়া উহা পতিত হইবে। ইহা সেই গৃহ, যাহাকে আদম (আ)-এর জন্য তাঁহার পৃথিবীতে

www.pathagar.com

অবতরণের পর প্রেরণ করা হয়। অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর পর উহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং আকাশমণ্ডলে উহার মর্যাদা ও সম্মান এইরূপ, যেরূপ পৃথিবীতে কা'বাগৃহের সম্মান। ফেরেশতারা উহার তাওয়াফ করিয়া থাকেন। দৈনিক সত্তর সহস্র ফেরেশতা বায়তুল মা'মুরের যিয়ারত উপলক্ষে আগমন ও প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, উহারা দ্বিতীয় বার আর কখনও তাওয়াফের জন্য আগমন করে না। এইভাবে প্রত্যহ আগমন ও প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। যেদিন হইতে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইদিন হইতে এই অবস্থা শুরু হইয়াছে। আর অনন্তকাল পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকিবে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ কুদরতের নিদর্শন। কোন সৃষ্টজীবই ফেরেশতাগণের চাইতে অধিক এবং সুউচ্চ নহে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এমন এক বিঘত পরিমাণ স্থানও নাই যেখানে ফেরেশতাগণ সিজদার জন্য স্বীয় কপাল রাখে নাই। আর নদ-নদী সমূহের এক বিন্দু পানিও এমন নাই, যাহার উপর কোন ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয় নাই। বর্ণিত আছে যে, আকাশে একটি নদী আছে, যাহাকে নহরে হায়াত বলা হইয়া থাকে। জিবরাঈল (আ) প্রত্যেক দিন উহাতে অবগাহন করেন এবং যখন বাহির হইয়া আসেন, তখন তাহার চুল ও পাখাসমূহ ঝাড়িয়া থাকেন। উহা হইতে সত্তর হাজার পানির ফোঁটা ঝরিয়া থাকে এবং প্রত্যেক ফোঁটা হইতে আল্লাহ্ একটি করিয়া ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহারাই সেই ফেরেশতা, যাহারা প্রত্যহ বায়তুল মা'মূরে উপস্থিত হইয়া নামায পড়িয়া থাকেন। ইহার পর পুনরায় তাহাদের ঐদিকে আর আগমন করার সুযোগ হয় না। মাওয়াহিবে লাদুনিয়ায় এই রূপই বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) বারী তা'আলার ইরশাদ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যাহা তোমরা জান না উহা সৃষ্টি করা হয়-এর ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিত বলেন যে, তাফসীর শাস্ত্রবিদ আতা, মুকাতিল এবং যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরশের ডান দিকে নূরের একটি নহর (নদী) রহিয়াছে, যাহা সপ্ত আকাশ, সপ্ত স্তবক যমীন এবং সাত সমুদ্রের সমতুল্য। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে জিরবাঈল (আ) আগমন করেন এবং উহাতে অবগাহন করেন। আর স্বীয় জ্যোতির উপর আরও জ্যোতি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং স্বীয় সৌন্দর্যকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া থাকেন। যখন তিনি তাহার পাখাসমূহ ঝারিয়া থাকেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রত্যেক ফোঁটা হইতে কয়েক সহস্র ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, যত ফেরেশতা তথায় আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিয়া থাকে, উহার প্রত্যেক তাসবীহ হইতে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

মিসকীন বান্দা (গ্রন্থকার) বলেন যে, যদি আকাশমণ্ডলে ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা হইতে ফেরেশতার সৃষ্টি হইতে পারে, তবে পৃথিবীতেও পবিত্র দরবারের একনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং উপযুক্ত উম্মতগণের তাসবীহ ও তাহলীল হইতেও ফেরেশতার সৃষ্টি হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে। আল্লাহ্ তো সর্ববস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, ইহারা ঐ সকল ফেরেশতার গণনার বাহিরে যাহারা সর্বদা ইবাদতে মগ্ন রহিয়াছে এবং ঐ সকল ফেরেশতাও ইহার বাহিরে যাহারা বৃক্ষ, তরু লতা,

www.pathagar.com

রিযিক, সংরক্ষণ কার্য এবং মানুষের গঠনাকৃতি অংকনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর ঐ সকল ফেরেশতাও ইহার বহির্ভূত, যাহারা মেঘমালার সহিত অবতীর্ণ হইয়া থাকে। আর উহারাও যাহারা জুমুআর দিনে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে। বেহেশতের কোষভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, ও উহার সংরক্ষণকারী এবং রাত্র-দিনের পরিবর্তনের সময় বান্দার দিবসের ও রাত্রের আমলকে লিপিবদ্ধ করার জন্য আগমন করিয়া থাকে এবং ঐ সত্তর সহস্র ফেরেশতা যাহারা নবী আকরাম (সা)-এর জ্যোতির্ময় রাওযায় হাযীর হইয়া থাকে এবং ভয় ও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর উহারাও যাহারা নামাযীর কিরাআত-এর উপর আমীন বলিয়া থাকে এবং উহারাও যাহারা রাব্বানা লাকাল হামদ বলিয়া থাকে, আর উহারাও যাহারা নামাযের জন্য অপেক্ষাকারীদের উপর দু'আ করিয়া থাকে—উহারাও যাহারা ঐ সকল মেয়েদের প্রতি যাহারা নিজ স্বামীর শয্যায় শয়ন করা হইতে দূরে সরিয়া থাকে— অভিশম্পাত করার জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

আর প্রত্যেক আকাশে যে সকল ফেরেশতা মোতায়েন রহিয়াছে উহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র তাসবীহ রহিয়াছে। পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, যে সকল ফেরেশতা আরশ বহনকারী, তাহাদের মুখ এবং শরীর পৃথক হইয়া থাকে যা একে অপরের সদৃশ হইয়া থাকে না। তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ফেরেশতা স্বীয় বাহু প্রশস্ত করে, তাহার বাহুর পাখা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিবে। এইরূপ আরশ বহনকারী ফেরেশতা আট জন। এত বিরাটকায় যে, এক কানের লতি হইতে অপর কানের লতি পর্যন্ত দুইশত বৎসরের দূরত্ব হয়। অপর এক রিওয়ায়াতে সাত শত বৎসরের পথ আসিয়াছে।

আবুশ শায়খ তাঁহার কিতাব আলআযমত-এ বহু আশ্চর্য ও বহু অদ্ভুত বস্তু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালনকারী প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের কল্পনা করা উচিত যে, তাহার কুদরত ও মহিমা কত বিরাট! পবিত্র হাদীসে আছে যে, বিশ্বনেতা নবী (সা) বলিয়াছেন, আমি যখন সপ্তম আকাশে পৌঁছি তথায় বায়তুল মা'মূরের সহিত হযরত খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালামকে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট বহু সুন্দর চেহারা বিশিষ্টের দল ছিল। আমি তাহাদের প্রতি সালাম দান করি, তাহারাও আমাকে সালাম জানায় এবং নিজ উম্মতকে দুই ভাগে দেখিতে পাই। এক জামাআত তো কাগজের ন্যায় শুভ্র সফেদ পোশাক পরিহিতাবস্থায় ছিল, এবং দ্বিতীয় দল অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। যে দলটি সাদা পোশাক পরিহিতাবস্থায় ছিল আমার সহিত বায়তুল মা'মূর পর্যন্ত আগমন করে। আর যে সকল লোক অপরিচ্ছন্ন পোশাকে ছিল উহারা পিছনে থাকিয়া যায়। তারপর আমি ঐ সাদা বস্ত্র পরিধানকারীদের সহ বায়তুল মা'মূরে নামায আদায় করি। পোশাকের শুভ্রতা হইতে সুন্দর কর্মের সহিত ইংগিত করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র আয়াতে وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এবং আপন বস্ত্রকে পরিষ্কার রাখুন এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। পবিত্র হাদীসে আছে যে, নবী (সা) বলিয়াছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এমন এক দল লোক দেখিয়াছি যাহাদের চেহারা কাগজের ন্যায় সাদা এবং সুশ্রী ছিল এবং একদল ছিল যাহাদের চেহারা মলিন ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। তারপর এই জামাআত এক নহরের নিকট আগমন করে এবং গোসল করে, তখন

www.pathagar.com

তাহাদের রং কিছুটা পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর দ্বিতীয় নহরের নিকট আগমন করে ও গোসল করে। তখন তাহাদের রং সম্পূর্ণরূপে ঐ দলের ন্যায় হইয়া যায়, যাহাদের চেহারা সাদা সফেদ ও সুশ্রী ছিল। তারপর হযরত সায়্যিদে আলম (সা) ঐ সফেদ সাদা চেহারা সম্পন্নদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহারা কাহারা ? আর ঐ অপরিচ্ছন্ন রং বিশিষ্ট দল কাহারা ? আর হেলান দিয়া যিনি বসিয়াছেন উনি কোন্ ব্যক্তি ? আর এই নদী কি প্রকারের, যাহাতে তাহারা আসিয়া অবগাহন করিয়াছে ? জিবরাঈল (আ) বলেন, যে, ইনি আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং এই সাদা বস্ত্রধারীগণ হইলেন যাহারা স্বীয় ঈমানকে অন্যায়ের সংমিশ্রণ হইতে সংরক্ষিত রাখিয়াছেন, আর এই মলিন অপরিচ্ছন্ন রং ধারীরা হইল যাহারা সৎকর্মকে অসৎকর্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। ইহার পর তাহারা তাওবাহ করিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। এখন রহিল এই নহর সম্পর্কে, তো প্রথম নহর হইল নহরে রহমত। দ্বিতীয় হইল নহরে নিয়ামত এবং তৃতীয় নহর হইল وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا (এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পবিত্র পানি পান করাইয়াছেন)। ইহার পর নবী (সা)-এর বাহন আরও উর্ধ্বে গমন করে এমনকি তিনি ঐ সকেল কলমের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত তাকদীরসমূহকে লিপিবদ্ধ করিত। যদিও আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থা ও তাকদীর চিরপুরাতন কিন্তু উহার লিখন নূতন। আর লাওহে মাহফুযের লিখন, যেখানে সমগ্র সৃষ্ট জগত প্রতিষ্ঠিত, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্ব হইতেই উহা রহিয়াছে। وَجَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ লিখনি ঐ সকল লিখিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবার ছিল ইহার ইংগিত ঐ দিকেই করা হইয়াছে। কিন্তু এই লিখনি যাহার শব্দ নবী (সা) শ্রবণ করিয়াছিলেন উহা ফেরেশতাদের কিতাবে লিখার শব্দ ছিল। যাহা আসল হইতে অন্য স্থানে নকল করিয়া উঠাইবার সময় হইয়া থাকে। যেমন অর্ধ শা'বানের রাত্রি অর্থাৎ শবেবরাত এবং অন্যান্য রাত্রে লেখা হইয়া থাকে। ইহাতে রহিতকরণ ও প্রতিষ্ঠিতকরণের সংকুলান রহিয়াছে يَمْحُوْ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ 'আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিলীন করিয়া দেন আর যাহাকে ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন।' উক্ত লিখনির ব্যাখ্যা হইল, ফেরেশতাদের সহীফাসমূহের লিখনি যেমন এই মর্মে হাদিসে আসিয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার ইব্ন কায়্যিম হইতে উদ্ধৃতি আনয়ন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, কলম ১২টি এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামহিমান্বিত কলম হইল কুদরতের কলম, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টজীবের অদৃষ্টের লিখন লিখিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সুনানে আবূ দাউদ -এ হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ 'আল্লাহ্র সর্বপ্রথম সৃষ্টি হইল কলম'। এবং উহাকে হুকুম দান করিলেন, লিখ! কলম নিবেদন করিল, কি লিখিব? ফরমান জারী হইল যে, কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টজীবের তাকদীরকে লিপিবদ্ধ কর। ইহাই হইল সকল কলমের মধ্যে প্রথম এবং অতি মর্যাদাবান কলম। নিঃসন্দেহে তাফসীরের অধিকাংশ পণ্ডিত এই কলমেরই ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ইহাই সেই প্রথম কলম, আল্লাহ্ তা'আলা যাহার শপথ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কলম হইল ওহী, তৃতীয় কলম স্বাক্ষর যা আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষের নিদর্শন। চতুর্থ কলম

www.pathagar.com

'তিব্বে আবদান' যাহা দ্বারা শরীরের সুস্থতা রক্ষা করা হয় এবং পঞ্চম কলম হইল নওয়াব-বাদশাহদের উপর ঐ শাহী ফরমান, যাহা নিদর্শন হয় এবং যাহা দ্বারা রাজ্যের রাজনীতি সুস্থ ও সংশোধন করা হয়। ষষ্ঠ কলম হিসাব, ইহা দ্বারা ঐ সকল ধন-দৌলতের হিসাব-নিকাশ লিখিত হইয়া থাকে যাহা বাহির করা হয় ও ব্যয় করা হয়। ইহাকে রিযকের কলমও বলা হইয়া থাকে। সপ্তম কলম হইল হুকুম, উহা দ্বারা হুকুম জারী করা হয় এবং সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অষ্টম কলম হইল শাহাদত। যদ্দ্বারা অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়। নবম হইল কলম-ই-তাবীর। ইহা স্বপ্নযোগের ওহী, ইহা উহাকে এবং উহার তাবীরকে (ব্যাখ্যা) কে লিখিয়া থাকে। দশম হইল ইতিহাস ও জগতের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধকারী কলম। একাদশতম হইল গুণাবলী ও উহার বিস্তারিত লিপিবদ্ধকারী কলম। দ্বাদশতম কলম হইল সকল কলমের সমষ্টিসার, যদ্দ্বারা অসত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং বিকৃতকারীদের সন্দেহকে দূরীভূত করা হইয়া থাকে। এই সকল কলম দ্বারা জগতের কল্যাণ ও মঙ্গল-এর সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আর ঐ কলমের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে যাহার দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব লেখা হইয়াছে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলার উহার শপথ করাই যথেষ্ট। প্রকাশ থাকে যে, ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলার ঐ কলম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান এবং উহার প্রকৃত তথ্য একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাত নহে। ইহা হইল দুনিয়ার কলম, যদ্দ্বারা যাবতীয় বিদ্যা লেখা হইয়া থাকে। আর ঐ সকল বস্তু যাহা এই বক্তব্যকারী বর্ণনা করিয়াছে ইহা ঐ বিদ্যার জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি, আর যদি যাহা কিছু এই বক্তব্যকারী বর্ণনা করিয়াছে ঐগুলি উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা হইলে তো ঠিকই আছে, আর নয় তো এইগুলিও ঐ সকল কলমের উদাহরণস্বরূপ হইবে।

অতঃপর নবীয়ে সায়্যিদে আলম (সা)-এর সম্মুখে জান্নাত ও দোযখকে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত গুণে গুণান্বিতাবস্থায় উপস্থাপিত করা হয়। বস্তুত নবী (সা) জান্নাতকে আল্লাহ্‌র রহমতের বিকাশ রূপে দেখিতে পান এবং দোযখকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি ও গযবের স্থান হিসাবে এবং জান্নাতকে উন্মুক্ত ও দোযখকে বন্ধাবস্থায় দেখিতে পান।

নবী আকরাম (সা) সালসাবীলের নদীতে অবগাহন করেন এবং তাঁহার ভিতর ও বাহিরকে প্রকৃতিগত ও নূতন নূতন সকল প্রকার দোষত্রুটি হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-এর মুকুট পরিধান করান হয়। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, হযরতে সায়্যিদে আলমকে জান্নাতের বৃক্ষসমূহের মধ্য হইতে এমন এক বৃক্ষের নিকট দাঁড় করান হয়, যাহা অতীব সুন্দর, অতীব পবিত্র ছিল। অতঃপর তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের ফল খাওয়ান হয়, উহা তাহার পৃষ্ঠদেশে বীর্যে পরিণত হয় এবং পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করার পর যখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর সহিত রাত্রি যাপন করেন, তখন তিনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন।

এই স্থানে একটি প্রকাশ্য ও স্পষ্টতঃ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর জন্ম হইয়াছে নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সাত বৎসরের কিছু পূর্বে এবং মি'রাজের ঘটনা হইল নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর। তবে যদি নবী (সা)-এর জন্য নুবুওয়াতের বিকাশের পূর্বে স্বপ্নযোগের মি'রাজকে অতি আবশ্যক রূপে ধরিয়া লওয়া হয়, তখন এই কাহিনী নবী (সা)-এর স্বপ্নের

ঘটনা হইবে, যাহাতে নুবুওয়াতের বিকাশের পূর্বে তাঁহাকে জান্নাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ইহা এই মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্য ঘটনা হইবে এবং এই ঘটনা ঐ স্থানের ঘটনা হইবে। সুতরাং এই স্থানে উহার বর্ণনা করা ঠিক হইবে না।

আল্লাহ্‌র দীদার

যখন বিশ্বনেতা নবী (সা)-এর আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট বিরাট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা শেষ হইয়া যায়, তখন বিশেষ নৈকট্যতার সহিত করুণা ও সান্নিধ্য লাভের মুহূর্ত ঘনাইয়া আসে এবং তিনি সর্বশেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং সকল বস্তু হইতে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এখন তিনি একা রহিয়া গিয়াছেন। কোন ফেরেশতা ও মানুষও তাঁহার সহিত নাই। এখনও এমন সত্তরটি পর্দা রহিয়া গিয়াছে যে, এক পর্দা দ্বিতীয় পর্দার সমতুল্য নয়। রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, প্রত্যেক পর্দার ঘনত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথ ছিল। এখনও উহা অতিক্রম করা বাকী ছিল। নবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহানুভূতির দ্বারা উক্ত পথ অতিক্রম করেন। ঐ সময় এক বিশেষ ধরনের বিচলতা ও ভয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখীন হন। আহ্বানকারী আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ন্যায় আওয়ায দ্বারা আহ্বান করে যে, قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَانَّ رَبَّكَ يُصَلِّى 'হে মুহাম্মদ! দাঁড়ান। নিশ্চয় আপনার প্রভু সালাত প্রেরণ করিতেছেন।' তিনি চিন্তিত হইলেন যে, আবূ বকরের আওয়ায কোথা হইতে আসিল। নবী আকরাম (সা) উক্ত আওয়ায হইতে কিছুটা আশ্বস্তিবোধ করেন এবং যে ভয়ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল উহা দূরীভূত হইয়া যায়। তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে আহ্বান আসে যে, اُدْنُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اُدْنُ يَا اَحْمَدُ اُدْنُ يَا مُحَمَّدُ 'হে সমস্ত সৃষ্টজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ, নিকটে আসুন, হে আহমদ! নিকটে আসুন, হে মুহাম্মদ, নিকটবর্তী হউন। অতঃপর আসল প্রভু আমাকে তাঁহার এত নৈকট্যতা দান করিয়াছেন, এবং আমি অতি নিকটবর্তী হইয়াছি যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অতঃপর সেই জ্যোতি নিকটবর্তী হয়, তারপর আরও সন্নিকটে নামিয়া আসে। তখন সেই জ্যোতি এবং প্রেমাস্পদের মাঝখানে মাত্র দুই হস্তের ব্যবধান থাকিয়া যায় বরং ইহার চেয়েও কম। ইহার পর আমার প্রভু আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার মধ্যে এতটুকুন শক্তি ছিল না যে, আমি উহার উত্তর দেই। ঐ সময় স্বীয় কুদরতের হস্ত আমার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন অবস্থা ও ধরন ছাড়াই বাড়াইয়া দেন। আমি উহার শীতলতাকে আমার বক্ষপটে অনুধাবন করি। ঐ সময় আমাকে পূর্ববর্তী পরবর্তীর সকল জ্ঞান দান করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বিদ্যার শিক্ষা দান করেন। তন্মধ্য হইতে এক বিদ্যা এমন ছিল যাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করার জন্য আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়া হয়, ইহা ছাড়া, আমি ছাড়া আর কাহারও উহা সহ্য করার ক্ষমতাও নাই। এক বিদ্যা এমন যাহা প্রকাশ করার এবং গোপন রাখার অধিকার আমাকে দেওয়া হয় এবং এক বিদ্যা হইল যাহা আমার উম্মতের বিশেষ ও সাধারণ সকলের মধ্যে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর রাসূলে আকরাম (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করেন যে, হে আমার প্রভু! তোমার খিদমতে হাযির হওয়ার

www.pathagar.com

সময় আমি আতংকিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অকস্মাৎ আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্বরের ন্যায় স্বরে শ্রবণ করিলাম যে, হে মুহাম্মদ! দাঁড়ান নিশ্চয় আপনার প্রভু সালাত প্রেরণ করিতেছেন (قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّى)। আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, এই স্থানে আবূ বকর (রা) কোথা হইতে আগমন করিলেন এবং পরওয়ারদিগার তো নামায আদায় করা হইতে মুক্ত। প্রভুর হুকুম হইল যে, আমি অপরের জন্য নামায আদায় করা হইতে মুক্ত। আর আমি বলিতেছি যে, পবিত্রতা আমার, আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে (سُبْحَانِى سَبَقَتْ رَحْمَتِى عَلَى غَضَبِى) আয় মুহাম্মদ এই আয়াতকে পাঠ করুন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا -

(আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমার উপর সালাত প্রেরণ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও, যাহাতে তোমাকে আঁধার হইতে আলোর দিকে লইয়া আসিতে পারেন এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি বড় দয়ালু) (সূরা আহযাব ঃ ৪৩)। সুতরাং আমার সালাত তোমার উপর এবং তোমার উম্মতের উপর রহমত স্বরূপ। এখন রহিল আমি যে তোমার বন্ধু আবূ বকর (রা)-এর আওয়ায তোমাকে শুনাইয়াছি, উহা তো কেবল অনুরাগ-ভালবাসার জন্য ছিল। যাহাতে তুমি আশ্বস্তি লাভ করতঃ এই ভীতিপূর্ণ স্থানে স্ব-অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হও। হে মুহাম্মদ! যখন আমি তোমার ভাই মূসা (আ)-এর সহিত কথোপকথন করিতে চাহিলাম, তখন তাঁহার উপর এক বিরাট আশ্চর্যজনক আতংক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে মূসা তোমার ডান হাতে উহা কি ?" (وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى) তখন মূসা (আ) যষ্টির বর্ণনার মাধ্যমে আশ্বস্তি লাভ করেন এবং স্ব-অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। তদ্রূপ হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার জন্য চাহিলাম যে অনুরাগ হউক, তো তোমার সাথী আবূ বকর-এর আওয়ায সৃষ্টি করিয়াছি। কেননা, তুমি আর আবূ বকর উভয়কে একই স্বভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সে তোমার ইহলোকের ও পরলোকের সাথী। সুতরাং আমি তাহার আকৃতিতে এক ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছি। যাহাতে সে তাহার স্বরে তোমাকে আহবান করে। ফলে তোমার আতংক দূর হইয়া যাইবে। আতংকের দরুন তোমার উপর যাহাতে ঐ অবস্থার সৃষ্টি না হইতে পারে, যদ্দরুন তোমার বুদ্ধি বিবেককে উহা হইতে বিরত রাখিয়া দিবে যাহা আমি তোমার জন্য চাহিয়াছি। উহার পর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল-এর ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যৎ সম্পর্কে জিবরাঈল তোমার নিকট আরয করিয়াছিল উহা কি? আমি আরয করিলাম, খোদাওয়ান্দ! তুমি উহা ভাল করিয়াই জ্ঞাত আছ। আল্লাহ্'র ফরমান হইল, আমি তাহার আকাঙ্ক্ষা কবূল করিলাম, কিন্তু উহা কেবল ঐ সকল লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যাহারা হে বন্ধু! কেবল তোমাকেই কামনা করিয়া থাকে। তোমাকে ভালবাসে এবং তোমারই সংসর্গে থাকে"। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, ইহার পর আমার জন্য সবুজ রং-এর রফরফ বিছান হয়, যাহার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির চেয়েও প্রখর ছিল। উহা হইতে আমার চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। আমাকে উক্ত রফরফের উপর উপবেশ করান হইল। অতঃপর

www.pathagar.com

সে আমাকে লইয়া রওয়ানা হইয়া আসিল। অবশেষে আরশ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার পর এমন এক বিরাট বস্তু দেখিতে পাইলাম, যাহা বর্ণনা করার শক্তি কোন ভাষার নাই। তারপর আরশ হইতে এক ফোঁটা আমার নিকট আসিয়া আমার জিহ্বার উপর পতিত হইল। আমি উহাকে চাখিলাম, যাহা কোন ব্যক্তি কখনও উহার চেয়ে অধিক সুমধুর চাখিয়া দেখে নাই এবং আমার আওয়াল ও আখির-এর সকল সংবাদ অর্জিত হয় এবং আমার অন্তর জ্যোতির্ময় হইয়া যায়। আর আরশের নূর দ্বারা আমার চক্ষুকে ঢাকিয়া দেওয়া হয়, ঐ সময় আমি সকল বস্তুকে নিজ অন্তর দ্বারা অবলোকন করি। এবং নিজের পশ্চাতেও ঐরূপ দেখিতে থাকি যেরূপ সম্মুখে দেখিতাম"। 'রফরফ' বিছানাকে বলা হইয়া থাকে। আসলে ইহা ঐ বিছানাকে বলা হইয়া থাকে, যাহা নরম হয় এবং অতি মূল্যবান রেশম ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হয়।

সতর্কতা

অবগত থাকা চাই যে, এই কথার্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সুমহান স্থানে বহু পর্দা ছিল, এই পর্দা সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রে জানিতে হইবে, মহিমান্বিত স্রষ্টার ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা হইতে পাক ও পবিত্র। তাঁহাকে কোন বস্তুই আচ্ছাদিত করিতে পারে না। কারণ, পর্দা দৃশ্যমান বস্তু, পরিমিত স্থানকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে। আর খোদার সৃষ্ট জীব, খোদা হইতে এবং নাম ও গুণ ও তাঁহার কর্মসমূহ অন্তর্নিহিত অর্থের ক্ষেত্রে পর্দার মধ্যে আবৃত থাকে এবং সকল সৃষ্ট জীবের মধ্য হইতে আলো ও আধার-এর মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য পরিচিত এক স্থান রহিয়াছে এবং আহরণের ও জ্ঞানেরও এক নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে। আর ঐ সকল নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা যাহারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে এবং পবিত্র দরবারের সান্নিধ্য লাভকারী সকল মর্যাদাবান ফেরেশতা। ইহারা সকলেই চিরপ্রতিষ্ঠ ও চির পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা বড়ত্ব, মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভয়ের নূর দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং সকল সিফাত (গুণাবলী) পর্দা এবং ফেরেশতা পর্দায় আচ্ছাদিত। ইহাদের বিভিন্ন স্তর আছে এবং এই সকল ফেরেশতার জন্য এক নির্দিষ্ট মকাম ও নির্দিষ্ট স্তর রহিয়াছে। সকল সৃষ্টজগত স্রষ্টা হইতে পর্দার অন্তরালে আছে। কোন কোন সৃষ্ট জীবতো দাতার দানের দর্শন ও অবস্থাসমূহের দর্শন হইতে এবং কার্যকারণ সৃষ্টিকর্তার কারণসমূহের দর্শন হইতে পর্দার অন্তরালে রহিয়াছে। আর কোন সৃষ্টজীব জ্ঞান হইতে জ্ঞানে, বিবেক হইতে বিবেকে এবং বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির মধ্যে পর্দায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই সমস্তই দাতার নিয়ামত হইতে এবং দানকারীর দানকৃত বস্তু হইতে এক প্রকার পর্দার মধ্যে রহিয়াছে। আর কোন সৃষ্টজীব নিজ রিপু হইতে এবং কেহ কু-রিপু হইতে এবং কেহ সকল গুনাহ্ ও পাপ কর্ম হইতে পর্দার অন্তরালে রহিয়াছে। আবার কোন সৃষ্টজীব ধন, সন্তানাদি এবং পার্থিব সৌন্দর্য হইতে পর্দার আড়ালে রহিয়াছে। "হে আল্লাহ্! আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে তোমার হইতে পর্দার আড়ালে রাখিও না। (اَللّٰهُمَّ لَا يُحْجِبْنَا عَنْكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) এই কথা কোন কোন আবিদ বর্ণনা করিয়াছেন।

জানিয়া রাখা উচিত যে, এই যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى (অতঃপর সেই জ্যোতি নিকটবর্তী হয়, তারপর আরও সন্নিকটে নামিয়া আসে। ইহার ব্যাখ্যা قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (তখন সেই জ্যোতি আর প্রেমাস্পদের মাঝখানে মাত্র দুই হস্তের ব্যবধান থাকিয়া

www.pathagar.com

যায়, বরং ইহার চেয়েও কম, দ্বারা করা হয়, ইহা মি'রাজের হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা সূরা-ই-আন্নাজমে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী উহার সম্বন্ধ হযরত জিবরাঈল (সা)-এর দীদার ও তাহার সহিত নৈকট্যতার প্রতি করা হইয়াছে। আর পবিত্র আয়াতের পূর্বাপর বাহ্যিক গতিধারাও ইহাই। কোন কোন মুফাস্‌সের আল্লাহ্ তা'আলার দীদার এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের সহিত অর্থ করিয়াছেন, যেমন তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। আর সৃষ্টিকর্তা মহা প্রভুর দরবারের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠত্ব, চরম ভদ্রতা, মহত্ত্ব এবং দাসত্বের গণ্ডির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং কলবের শান্তি, আত্মার প্রশান্তি, অসীম সাহসিকতা, চক্ষুর দর্শনও অন্তর্দর্শনের অনুকূলে হইয়াছে। এত এত অসংখ্য নিদর্শন ও কারামতসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তবু তিনি কাহারও প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, "না চক্ষু বিভ্রম হইয়াছিল আর না চক্ষু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল" (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى)। যেরূপভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণ বাদশাহ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহা এমন পূর্ণত্ব, যাহা পূর্ণতম মানব ও সকল রাসূলের নেতা (সা) ব্যতীত আর কেহই লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। মানুষের সাধারণ স্বভাব হইল এই যে, যখন সে কোন উচ্চস্তরে আরোহণ করে এবং ঐ উচ্চ স্তর সম্পর্কে জ্ঞানাহরণ করিয়া থাকে, তখন আরও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যখন মূসা (আ) মুনাজাত ও কথা বলার স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি বারী তা'আলার দীদারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার এক প্রকার উন্মাদনা ও উল্লাস ছিল। কারণ, নৈকট্যতার স্তরে ভদ্রতার ধারণা বিদূরিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের সর্দার বিশ্ব নেতা (সা) যখন নৈকট্যতার স্তরে পদার্পণ করেন, তখন তাহার সকল প্রাপ্য পূর্ণ করা হয় এবং শুধু ঐ স্থান ছাড়া যে স্থানে তিনি শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, অন্য কোন বস্তুর প্রতি নিজ চক্ষু ও অন্তরচক্ষু দ্বারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। এবং কোন কিছুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং তিনি সকল স্তর ও শ্রেণীর সকল মনযিল অতিক্রম করিয়াছিলেন। তন্মধ্য হইতে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হইল দীদারে ইলাহী। আর উহা সেই স্থান, যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ও আত্মপ্রত্যয় লাভকারীদের স্তরসমূহের মধ্যে এই স্তর সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। বস্তুতঃ এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন "চক্ষু যাহা দর্শন করিয়াছে, অন্তর উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে নাই। (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى)। চক্ষু ও অন্তরচক্ষু উভয়েই একে অপরের সমর্থন ও সত্যবলিয়া স্বীকার করিতেছিল। অন্তর যাহা লাভ করিয়াছিল, চক্ষু উহাকে অনুভব করিয়াছে, আর যা কিছু চক্ষু দেখিয়াছিল অন্তর উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং সকলই সত্য ও শুদ্ধ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রেষ্ঠ পূর্ণত্বে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তিগণের উপর এইরূপ অগ্রগামী হইয়া গিয়াছেন যে, সমস্ত আম্বিয়া ও মুরসালীন (সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন) ঈর্ষা করিয়া থাকেন এবং তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর তাঁহার এই সুদৃঢ়তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কসমের সহিত স্মরণ করিয়াছেন। এই মর্মে ইরশাদ করা হইয়াছে, يٰسٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'হে

www.pathagar.com

বিশ্ব নেতা! শপথ বিজ্ঞানময় কুআনের, নিশ্চয় নিঃসন্দেহে আপনি সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

ইহা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা, দান করেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ করুণার আধার। ইহার পর বলিয়াছেন যে, فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى অতঃপর তাহার খাস বান্দার উপর ওহী অবতারণ করেন। যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাবতীয় বিদ্যা ও জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সুসংবাদ, ইশারা ও সংবাদ, নিদর্শনাবলী ও কারামত এবং ঐ সকল কামালত যাহা অনুল্লেখের পর্যায়ে রহিয়াছে, সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং উহার প্রত্যেক আধিক্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বও ইহার শামিল। কেননা, এই স্থানে নির্দিষ্ট অর্থবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং উক্ত ইশারার ব্যাখ্যা দান করা হয় নাই। এই জন্য যে, একমাত্র আলিমুল গায়িব এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, কেহই ইহাকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ঐটুকু ব্যতীত যতটুকু মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা দান করিয়াছেন এবং ঐ পরিমাণ যতটুকু তাহার পবিত্র রূহের মুখামুখি হওয়ার দরুন হৃদয়ের উপর ইলকা করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন কোন শ্রেষ্ঠ আওলিয়া কিরাম, যাহারা তাঁহার পূর্ণ পায়রবী করিয়া যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল অনুল্লেখ্য বস্তুসমূহের কিছু জ্ঞানার্জনের সম্মান লাভ করিয়াছেন।

বলা হইয়া থাকে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরশের উপর যাইয়া পৌছান, আরশ মহিমা মণ্ডিতের আঁচল ধারণ করতঃ ভাবের ভাষায় বলিতে থাকে এবং আরয করে যে, আপনিই তিনি হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় আহাদিয়তের (অদ্বিতীয়তার) মহত্তের মুশাহিদা করাইয়াছেন, এরং স্বীয় মুখাপেক্ষীহীনতার সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করাইয়াছেন, আর আমি শোকাভিভূতাবস্থায় আফসোস করিয়া যাইতেছি, কোন পথ পাইতেছি না যাহাতে উক্ত পথ ধরিয়া নিজ কর্মের বন্ধনকে মুক্ত করিতে পারি। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টজীব রূপে তৈরী করিয়াছেন এবং আমি প্রকৃতই আতংক, বিস্ময় এবং ভীতির মধ্যে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রহিয়াছি। যখন পরওয়ারদেগার আমাকে সৃষ্টি করেন, আমি তাহার ভয় ও শ্রেষ্ঠত্বের দরুন কাঁপিতে থাকি, তারপর আমার পায়ার উপর লেখা হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তখন ভয়ে আরও কাঁপিতে লাগিলাম, তারপর যখন লিখিলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" তখন আমার কম্পন থামিয়া যায় এবং অস্থিরতা হ্রাস পায়। আপনার পবিত্র নাম আমার অন্তরের শান্তির কারণ হয় এবং আমার মস্তিষ্কের সান্ত্বনার কারণ প্রমাণিত হয়। আমার উপর আপনার পবিত্র নামের এই বরকত প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তো কত প্রকারের কতইনা বরকত অর্জিত হইবে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! কেননা, আপনার পবিত্র দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইয়াছে। اَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ আপনি তো সমগ্র জাহানের জন্য শান্তির দূত, অবশ্যই আপনার সেই রহমতের মধ্যে আমার অংশও রহিয়াছে হে বন্ধু! আপনি আমার ঐ সকল বস্তু হইতে নিরপরাধের সাক্ষ্য দান করিবেন। যাহার সহিত প্রতারণাকারী ও অপবাদ দানকারীরা আমার সম্বন্ধ করিয়া থাকে। অহংকারীরা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দান করিয়া থাকে যে, আমার মধ্যে এত প্রশস্ততা রহিয়াছে যে, যে সত্তার কোন সমকক্ষ নাই তাহাকে আমি ঠাঁই দিতে পারিব এবং যিনি অসীম ও নিরাকার

www.pathagar.com

তাঁহাকে আমি পরিবেষ্টন করিতে পারিব। হে মুহাম্মদ (সা)! যে পবিত্র সত্তার কোন সীমা ও আকার নাই এবং যাহার গুণাবলী অগণিত ও অসংখ্য, সেই সত্তা কি করিয়া আমার মুখাপেক্ষী হইতে পারে। এবং তিনি কি করিয়া আমার উপর আরোহণ করিতে পারেন, যাহার নাম হইল করুণাময় রহমান এবং তাহার গুণ হইল ইস্তিওয়া। এবং যাহার সিফাত তাহার যাতের (সত্তার) সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। তাহা হইলে তিনি কি করিয়া আমার সহিত মিলিত অথবা পৃথক হইতে পারেন। হে মুহাম্মদ (সা)! আমার তাঁহার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের কসম! আমি মিলনের সহিত তাঁহার সন্নিকট রহিয়াছে আর বিচ্ছেদ দ্বারা তাহার নিকট হইতে দূরে নহি। আর না আমি উহাকে ধারণ করিতে সক্ষম আর না আমি তাহাকে আমার মধ্যে ঠাঁই দানকারী হইতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজ করুণা দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি আমাকে স্বীয় বিচার দ্বারা ধ্বংস ও বিলীন করিয়া দেন, তবু আমি তাঁহার কুদরত এবং তাঁহার হেকমতের ধারণকৃত ও কৃতকর্ম হিসাবে থাকিব। সাইয়েদে আলম (সা) স্বীয় ভাবের ভাষায় আরশকে জবার দান করেন যে, আমার নিকট হইতে একদিকে সরিয়া যাও, আমি তোমার মুখাপেক্ষী নহি, আমি তোমার পরওয়া রাখি না। আমার পরিশুদ্ধতার সময়কে কালিমাময় করিওনা এবং আমার একেলা নির্জনবাসকে পংকিলময় করিয়া দিওনা, ইহার পর তিনি আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণরূপে উহার দিকে লক্ষ্য করেন নাই, আর উহার উপর যাহা কিছু লিখিত ছিল উহা পাঠ করেন নাই। এবং وَمَا اَوْحٰى اِلَيْهِ যাহা কিছু তাহার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উক্ত গূঢ় রহস্যের এক ইশারা ইহাও যে, না তাহার চক্ষুর ভ্রম হইয়াছিল না লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল (وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى)

বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) "কাবা কাওসায়ন আও আদ্না"-এর স্তরে পৌছেন, তিনি স্বীয় উম্মতগণের অবস্থাকে উপস্থাপিত করেন এবং আরয করেন, হে প্রভু! তুমি বহু উম্মতের উপর শাস্তি দান করিয়াছ, কাহাকেও পাথর দ্বারা, কাহাকেও মাটি চাপা দিয়া, কাহাকেও আকৃতি বিকৃত করিয়া দিয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, আমি ইহাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করিব এবং ইহাদের অসৎ কর্মকে সৎকর্মে পরিবর্তিত করিয়া দিব। আর যে কেহ আমার নিকট দু'আ করিবে, আমি তাহাকে লাব্বায়কা বলিয়া জবাব দান করিব এবং যাহা কামনা করিবে উহা দান করিব। আর যে আমার উপর তাওয়াক্কুল (পূর্ণ ভরসা) করিবে, আমি তাহাকে যথেষ্ট করিয়া দান করিব এবং ইহলোকে তাহার পাপসমূহকে গোপন করিয়া রাখিব এবং পরকালে তোমাকে উহাদের শাফাআতকারী বানাইব। যদি বন্ধু বন্ধুর রোষের কবলে না থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদের হিসাব লইতাম না।

পবিত্র মি'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই জগতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, পবিত্র দরবারে আরয করেন, হে প্রভু! অতিথির জন্য প্রত্যাবর্তনকালীন উপহার থাকে, আমার উম্মতের জন্য এই ভ্রমণের উপহার কি ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সমগ্র জীবনের তরে আমি তাহাদের জন্য থাকিব। মৃত্যুর পরও আমি তাহাদের থাকিব এবং কবরেও আমি তাহাদের থাকিব এবং হাশরের ময়দানেও আমি তাহাদের জন্য হইব। মোটকথা, সর্বাবস্থায় আমি তাহাদের সাহায্যকারী

www.pathagar.com

থাকিব। "হে উম্মতে মুহাম্মদ! তোমাদের জন্য ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় ও সুসংবাদ, মুবারক হউক তোমাদের" (فَطُوْبٰى لَكُمْ يَا اُمَّتَ مُحَمَّدٍ وَبُشْرٰى لَكُمْ) এবং যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যাবর্তন করেন এবং সকাল হইয়া যায়, তখন তিনি লোকদের নিকট ইহার আলোচনা করেন। ঐ সময় কিছু দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হইয়া যায় এবং কিছুসংখ্যক মুশরিক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল যে, স্বীয় বন্ধু ও সাথীর কোন কিছু খবর রাখ যে, তিনি কি বলিতেছেন ? তিনি বলিতেছেন, "অদ্য রাত্রে আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হয়।" হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি কি তিনি এইরূপ বলিতেছেন ? মুশরিকরা বলিল, হাঁ, ইহাই বলিতেছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, তবে তো তিনি যাহা কিছু বলিতেছেন, ঠিকই বলিতেছেন, আমি উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। মুশরিকরা বলিতে লাগিলেন, তুমি কি এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ যে, রাত্রকালে মুহাম্মদ (সা) বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই এই স্থানে প্রত্যাবর্তনও করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমিতো ইহার চেয়েও দূরতমের সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। তিনি যদি বলেন যে, আমি আকাশমণ্ডলে গমন করিয়াছিলাম এবং পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। আমি ইহাকেও বিশ্বাস করিব, বায়তুল মুকাদ্দাস কোন্ বস্তু! বস্তুতঃ সেই দিন হইতেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর 'সিদ্দীক' উপাধিও প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র খেদমতে আসিয়া আরয করেন যে, হে নবী! আপনি কি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনাবলী ও চিহ্নসমূহ এ সকল লোকদের নিকট বর্ণনা দান করিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাঁ, বর্ণনা দান করিব। আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলুন আমি তথায় গিয়াছি এবং উহা দর্শনও করিয়াছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করিলেন। তৎপ্রতি হযরত সিদ্দীক (রা) বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্'র রাসূল (اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ)। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই দাবী করা সন্দেহ ও দ্বিধার কারণে ছিল না, তিনি কাফিরদের মুখে শোনার সাথে সাথেই তো উহার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে অবগত হওয়ার পূর্বেই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন। এবং এই জিজ্ঞাসাবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতাকে তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ করার নিমিত্ত ছিল। এই জন্য যে, সম্প্রদায়ের লোকদের হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সংবাদের উপর আস্থা ছিল এবং তাঁহার সত্য জানা উহাদের জন্য দলীল ছিল, এতদ্সত্ত্বেও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রকৃত তত্ত্বসমূহের বিকাশের পর্যায়ে ছিল। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত অবস্থা ও গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দান করেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, তিনি বলেন, কোন কোন বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর আমার স্মরণে উপস্থিত ছিল না, তখন আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ি এবং এমন চিন্তিত হইয়া পড়ি যে, পূর্বে কোন এইরূপ হই নাই। এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তারপর যাহা কিছু তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আমি উহার উত্তর দিয়া গিয়াছি। ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। হয় মসজিদকে

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উঠাইয়া লইয়া আসা হইয়াছিল, যেমন রাণী বিলকীসের সিংহাসনকে চক্ষুর পলকের পূর্বেই হযরত সুলায়মান (আ)-এর সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল, অথবা উহার প্রতিকৃতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল। যেমন জান্নাত ও দোযখকে নামাযের মধ্যে সম আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। ওলামা কিরাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর এক সম্ভাবনাও আছে যে, তথা হইতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সকল পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টির সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে রাখিয়া দেওয়া হয়। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আকীলের গৃহের সন্নিকট আমার দৃষ্টির সম্মুখে মসজিদে আকসাকে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি উহা দেখিয়া যাইতাম আর উহারা যে সকল প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল উহার উত্তর দিয়া যাইতেছিলাম। হযরত উম্মু হানী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল বায়তুল মুকাদ্দাসের কতগুলি দরওয়াযা আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি উহার দরওয়াযাকে গণনা করিয়াছিলাম না। যখন আমার সম্মুখে সকল উন্মুক্ত হইল এবং উহাকে উঠাইয়া আমার সম্মুখে আনয়ন করা হয়, আমি গণনা করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি।

বলা হইয়া থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, ঐ সময় কুরায়শদের এক কাফেলা বহু সামগ্রী বোঝাই করিয়া আসিতেছিল। উক্ত কাফেলায় দুইটি খাদ্য সম্ভারও ছিল। একটি কাল একটি সাদা। উহা উঠাইয়া উটের সম্মুখে আনা হইলে উট পলায়ন করে। তন্মধ্য হইতে একটি উটকে ধরিয়া লইয়া আনিতে সমর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আমি উহাদিগকে সালাম দিয়াছি। উহারা বলিতেছিল যে, ইহাতো মুহাম্মদ (সা)-এর শব্দ আসিতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের এই ঘটনার সংবাদ দান করেন এবং যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন বর্ণনা করেন। আরও বলেন যে, উহার নিদর্শন হইল এই যে, আমি তোমাদের উটগুলিকে অমুক স্থানে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তন্মধ্য হইতে একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, যাহাকে অমুক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল এবং কাফেলার অগ্রভাগে সাদা ও কাল রং-এর উট আছে, যাহার উপর কাল রং-এর আচ্ছাদন রহিয়াছে এবং দুইটি খাদ্য সম্ভার। অমুক দিন উহারা আসিয়া পৌছিবে। ঐ দিন যখন আসিয়া পড়িল, অথচ কাফেলা আসিয়া পৌছাইল না, তখন লোকেরা উহার অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং অর্ধ দিবস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলিতে থাকিল। অর্ধদিবস থাকিতেই কাফেলা ঐভাবেই আসিয়া পৌছিল, যে রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন। ফলে শত্রু ও অস্বীকারকারীদের মুখে ছাই পড়িয়া গেল। এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন যে, বুধবারে উক্ত কাফেলা আসিয়া পৌছিবে। কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত যখন তাহারা আসিয়া পৌছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করিলেন এবং সূর্যকে অস্তমিত হইতে বিরত রাখা হয় এবং কাফেলা আসিয়া পৌছায়।

আল্লাহ্র দীদার লাভ সম্পর্কে পূর্ববর্তিগণের মধ্যকার মতদ্বৈধতা

পুরাতন ও নূতন সাহাবা, তাবিঈগণ এবং পরবর্তিগণ মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ হযরত আইশা (রা) এবং সাহাবা ও

www.pathagar.com

পূর্ববর্তিগণের এক জামাআত নিষেধের দিকে গিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) মাসরূক হইতে এই মর্মে এক হাদীস আনয়ন করিয়াছেন যে, তিনি হযরত আইশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আমার মাতা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছেন ? হযরত সিদ্দীকা (রা) বলেন, নিঃসন্দেহে আমার শরীরের পশম তোমার এই প্রশ্নের কারণে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যে তোমাকে এই কথা বলিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, নিশ্চয় সে মিথ্যা বলিয়াছে। ইহার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনান ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

কোন চক্ষু উহার দর্শন করিতে পারে না, তিনি সকল চক্ষুকে দর্শন করিতেছেন এবং তিনিই অনুগ্রহকারী ও সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন। (সূরা আনআম ঃ ১০৩)

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে আছে যে, مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاَ رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ। তোমাকে যে এই কথা বলিবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, সে নিশ্চয় বিরাট খারাব কথা বলিয়াছে। ইমাম নববী এবং ইব্‌ন খুযায়মা বলেন যে, হযরত আইশা (রা) কোন মারফু' হাদীস হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদারকে নিষেধ করেন নাই। যদি মারফু' হাদীস হইত, তবে উহা উল্লেখ করিতেন! আর তিনি এই আয়াতের উপরই নির্ভর করিয়াছেন এবং ইহাকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী তাঁহার এই মতের (ইজতিহাদ) বিরোধিতাও করিয়াছেন। কোন সাহাবী যখন তাহার কথা বলেন এবং অপর কোন সাহাবী উহার বিরোধিতা করেন তখন উক্ত কথা সর্বসম্মতরূপে দলীল হইতে পারে না। পবিত্র আয়াতের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে। 'ইদ্‌রাক' "রইয়াত"-এর চেয়ে অধিক বৈশিষ্টের অধিকারী। এদ্‌রাকের নিষিদ্ধতার দরুন রুইয়াতের নিষিদ্ধতা প্রতীয়মান হয় না। কারণ, প্রকৃত সত্তার জ্ঞানকে 'ইদ্‌রাক' বলা হইয়া থাকে এবং ইহা নিষিদ্ধ বটে। যেরূপ যাহারা চন্দ্রকে দর্শন করিয়া থাকে, তাহারা উহার প্রকৃত সত্তা, উহার প্রকৃতি ও গভীরতাকে দর্শন করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, ইদ্‌রাকের উদ্দেশ্য হইল পরিবেষ্টন করা, ঘিরিয়া ফেলা। পরিবেষ্টন না করিতে পারায় দীদারের নিষিদ্ধতা আবশ্যক হয় না। যেরূপ জ্ঞানের পরিবেষ্টনের নিষিদ্ধতা হইতে জ্ঞানের নিষিদ্ধতা প্রতীয়মান হয় না। সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ 'হে প্রতিপালক! আমার দ্বারা তোমার এরূপ গুণগান করা সম্ভব নয়, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করিয়াছ। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, প্রশংসাই করা হয় নাই।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং তাবিঈনের এক জামাআত আল্লাহ্‌র দীদারকে প্রমাণ করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই কথা জানার জন্য প্রেরণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন ? হযরত ইব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন যে, হাঁ! এবং আরও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খিল্লাত (বন্ধুত্ব) দ্বারা, হযরত মূসা (আ)-কে কালাম (বাক্য) দ্বারা এবং সায়্যিদে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে দীদার দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন এবং হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, "তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন" এবং ইব্ন খুযায়মা হযরত উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র এই দীদারের উপর কা'ব, যুহরী, মা'মার এবং আরও অনেক সাহাবী প্রমাণ এবং দৃঢ়মত পোষণ করিয়াছেন এবং আশআরীরও এই একই কথা। আর ইমাম মুসলিম হযরত আবূ যর (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিশ্ব প্রতিপালকের সহিত দীদার হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, هُوَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ 'তিনি নূর, আমি তাহাকে কিরূপে দেখিতে পারিব।' এই হাদীসটি ঐ হাদীসের বিপরীত যাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। رَأَيْتُ نُورًا 'আমি নূর দেখিয়াছি।' ইমাম আহমদ হইতেও দীদার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর বক্তব্যকে আমরা কি দিয়া উড়াইয়া দিব। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কথা দ্বারা। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, رَأَيْتُ رَبِّى 'আমি স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছি।' এবং নবীর কথা হযরত আইশা (রা)-এর কথার চেয়ে অতি শ্রেষ্ঠ। এবং নাক্কাশ ইমাম আহমদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারাই জবাব দান করিব। তিনি বলিয়াছেন যে, رَآهُ رَآهُ তাহাকে দেখিয়াছেন তাহাকে দেখিয়াছেন তিনি এইভাবে বারবার বলিতে থাকিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শ্বাস বন্ধ হয় নাই। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি স্বীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। এবং পূর্ববর্তীদের একদল এই ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, আমরা প্রমাণ করা ও প্রমাণ না করা কোন দিকেই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিয়া না। আর কুরতুবী এই উক্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কোন পক্ষেরই কোন প্রকার অকাট্য দলীল নাই। খুব বেশী হইলে এইটুকু হইবে যে, উভয় পক্ষই যে সকল রিওয়ায়াত হইতে প্রমাণ আনয়ন করিয়াছেন উহার বাহ্যিক বর্ণনা পরস্পর বিরোধী এবং ব্যাখ্যার অযোগ্য। আর না এইগুলি ব্যবহারিক কর্মের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা অকাট্য দলীল-প্রমাণ না হইলেও উহার উপর নির্ভর করা যায়। বরং এইগুলি ই'তিকাদ ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়। ইহাতে একমাত্র অকাট্য দলীল প্রমাণেরই প্রয়োজন হয়।

এক দলের মাযহাব হইল এই যে, আল্লাহ্'র দীদার অন্তরচক্ষে হইয়াছিল, চর্মচক্ষে নহে। অন্তরচক্ষের উদ্দেশ্য, জ্ঞানও নয়, জানাও নয়। কারণ, ইহা তো পরিপূর্ণরূপে সর্বদা অর্জিত ছিল। বরং ইহার উদ্দেশ্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরে দশটি শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন চক্ষুতে দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং অন্তর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া এক জিনিস এবং অন্তর দ্বারা দর্শন করা অন্য জিনিস। হযরত আইশা (রা) এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উভয় কথায় এইরূপে সংযোগ স্থাপন করা হইয়া থাকে যে, ইহাতে বাহ্যতঃ যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়, উহা চক্ষু দ্বারা দর্শনের ক্ষেত্রে, অন্তর দর্শনের ক্ষেত্রে নহে। এই ক্ষেত্রে সকলে একমত হইয়াছেন।

www.pathagar.com

মিস্‌কীন বান্দা (শায়খ মুহাক্কেক আবদুল হক) বলেন যে, সকল প্রমাণ, সংবাদ ও হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্বানগণের বক্তব্য ইহাই। কিন্তু তবু এই দ্বিধা থাকিয়া যায় যে, যে মি'রাজকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্ণমর্যাদা এবং চরম শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং উহার মধ্যে কোন নবী পর্যন্ত শরীক নহেন এবং না কোন মানুষের, অথবা কোন ফেরেশতার উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা আছে। তো বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহাকে উক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং বিশেষ নির্জন স্থানে উপস্থিত করান হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মাকসূদ আল্লাহ্‌র দীদার, উহা হইতে বঞ্চিত করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দর্শন না করার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। যদিও পূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরাটত্বেরও তাকীদ হইল কোন কিছু না চাওয়া এবং বাক্যোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আনন্দ ও উল্লাসকে প্রকাশ করা এবং দর্শনের আকাঙ্ক্ষা না করা, যেরূপ মূসা (আ) করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ভালবাসা এবং প্রেম, যাহা তাঁহার পবিত্র সত্তার সহিত সম্পৃক্ত ছিল, উহা তাহাকে কি করিয়া বঞ্চিত রাখিবে যে, মধ্যবর্তী স্থানে কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং আকাঙ্ক্ষিত ধন কামনার পরও হস্তগত হইবে না ?

পণ্ডিতগণ বলেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর আকাংখা, প্রশ্ন এবং আনন্দ আল্লাহ্‌র দীদার হইতে দূরে রাখিয়াছিল! কোন সময় না চাহিতে দেওয়া হইয়া থাকে, আবার কোন সময় আশা ও আকাংখার পরও দেওয়া হয় না। ইহা বড় বিরল যে, কোন কোন সম্প্রদায় যে বলিয়া থাকে যে, যখন মূসা (আ) চাওয়ার পর উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন তিনি অজ্ঞান হইয়া যান এবং ঐ সময় ঐ সকল বস্তু দেখিতে পান যাহা কখনও দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন না। ইহা তাহার অস্থিরতা ও তাড়াহুড়ার পরিণতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ)-এর অকৃতকার্যতার কারণ এই ছিল যে, এখন পর্যন্ত সকল প্রিয়তমের শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম মুহাম্মদ (সা)-এর দীদার লাভ হইয়াছিল না এবং যিনি উক্ত দৌলত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন না, অন্যের কি সামর্থ আছে যে, উহার আশা করে এবং দর্শন লাভ হয় এবং স্বয়ং সমস্ত বিদ্বানগণ ইহাতে ঐকমত্য পোষণ করিয়া থাকেন যে, পার্থিব দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার দীদার সম্ভব, ইহার পর এই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আবার কোন্ বস্তু বাধা সৃষ্টিকারী! এবং স্বয়ং এই মি'রাজের মর্যাদা, প্রকৃতপক্ষে পরজগতের মধ্যে গণ্য। আর যাহা কিছু নবজগতে দেখা ও পাওয়া যাইবে উহা এইক্ষণে তিনি দেখিয়া লইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে সৃষ্টি জগতকে দিব্য বিশ্বাস অনুযায়ী দাওয়াত দিতে সক্ষম হন, যেমন বলা হইয়াছে ازدیده بسے فرق بود تا بشنده। —শ্রবণের চেয়ে দর্শনের মধ্যে বহু পার্থক্য রহিয়াছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐ সকল মু'জিযা যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের শুদ্ধতা এবং রিসালতের সত্যতার দলীল ও নিদর্শন

স্বভাব বিরুদ্ধ কার্যকে মু'জিযা বলা হইয়া থাকে, যাহা নুবুওয়াত ও রিসালতের দাবীকারীর হস্তে প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহার উদ্দেশ্য থাকে সমকক্ষতা অর্থাৎ কোন কর্মে সমকক্ষতা ও চ্যালেঞ্জ করা এবং শত্রুকে পরাভূত করতঃ বিজয় লাভ করা। আসল তথ্য ইহাই যে, মু'জিযার মধ্যে সমকক্ষতার শর্ত থাকে না। রাসূলে করীম (সা) হইতে এইরূপ অনেক মু'জিযা প্রকাশ হইয়াছে যাহাতে সমকক্ষতা ছিল না। কিন্তু এই কথা বলা হইয়া থাকে যে, উহা স্বীয় অবস্থায় সমকক্ষ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে নুবুওয়াতের দাবীকারীর পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্তই যথেষ্ট হইবে। আর প্রসিদ্ধ ইহাই যে, যাহা কিছু রিসালতের দাবীকারীর পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উহাকে মু'জিযা বলা হইয়া থাকে এবং যাহা নবী ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষ হইতে প্রকাশ পায়, যদি তৎসহ তাহার পূর্ণ ঈমান, তাকওয়া এবং মাআরিফাত ও দৃঢ়প্রত্যয়, যাহাকে বেলায়েত বলা হয় সম্পৃক্ত থাকে, উহাকে কারামত বলা হয়। আর যদি ইহা কোন সাধারণ মুমেন ও সৎ ব্যক্তি হইতে প্রকাশ পায় তো উহাকে মাউনত বলা হয় এবং ফাসিক ও কাফিরদের হইতে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, উহাকে ইস্তিদরাজ বলা হয়। দর্শণ শাস্ত্রে (ইলমে কালাম) মু'জিযার আওতায় অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই স্থানে এইটুকুর উপরই ক্ষান্ত করিতেছি। যতটুকু এই স্থানে প্রয়োজন ছিল, ঐ পরিমাণ বর্ণনা করাই আমাদের জন্য উত্তম।

সমস্ত আম্বিয়া ও মুরসালীন সালাওয়াতুল্লাহে তা'আলা ও সালামুহু আলায়হিম আজমাঈন মু'জিযার অধিকারী ছিলেন এবং কোন নবীই মু'জিযা ছাড়া হইতেন না এবং আমাদের নবী বিশ্বনেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা ইঁহাদের সকলের চেয়ে বেশী, পরিপূর্ণ, শক্তিশালী, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ ছিল। দর্শন শাস্ত্রে অলৌকিকতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ বহু আলোচনা করা হইয়াছে এবং নবী করীম (সা)-এর নুবুওয়াতের দলীল হিসাবে তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য সকল ঐশী কিতাবে অসংখ্য সংবাদ দান করা হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা এবং পবিত্র মক্কা হইতে হিজরতের বর্ণনা, ইহার কিয়দংশ পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। আর ঐ সকল অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনাবলী যাহা তাঁহার জন্ম ও আবির্ভাবের সময় প্রকাশ হইয়াছিল, যথা কুফরী নিদর্শনাবলীকে ধ্বংস করা, শিরকের আস্তানাসমূহের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া এবং আরবের অধিবাসীদের ফরিয়াদ এবং তাহাদের মন্তব্য ইত্যাদি এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা স্বস্থানে করা হইবে। বস্তুতঃ আসহাবে ফীলের কাহিনী, পারস্যের সহস্র বৎসরের অগ্নি শীতল হইয়া যাওয়া, পারস্য সম্রাট কিসরার বালাখানার পাথর খসিয়া পড়া, সাওয়া নদীর পানি শুষ্ক হইয়া যাওয়া, পূজারীদের স্বপ্ন দেখা, গাইবী নেদা ও

www.pathagar.com

আওয়ায শ্রুত হওয়া ইত্যাদি। ইহা সকলই তাঁহার নুবুওয়াত ও গুণাবলীর পরিচয়। আর প্রসিদ্ধ সংবাদসমূহের মধ্যে পবিত্র জন্মের সময় এবং দুগ্ধপানের সময় হইতে নুবুওয়াত ও আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত এবং নুবুওয়াতের আবির্ভাবের পর বিজয় অভিযানের ক্ষেত্রে যে সকল আশ্চার্য ও বিস্ময়কর বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এত ধনসম্পদ ছিল না যাদ্দারা অন্তরকে আকৃষ্ট করা যাইত এবং মানুষ উহার লোভে তাঁহার প্রতি আশিক হইয়া যাইত এবং না এই পরিমাণ শক্তি ও ক্ষমতা ছিল যে, ঐ সকল লোকের উপর আধিপত্য ও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ছিল এবং যে দীনকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি তিনি লোকদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন, উহাকে সমুন্নত করার জন্য তাহার নিকট না লশকর, তশকর ছিল এবং না ধন ও দৌলত। উহারা সকলেই মূর্তিপূজা এবং অন্ধকার যুগের রুসম ও স্বভাবের উপর সম্মিলিত ও একত্রিত ছিল এবং জাহিলিয়াতের ধর্মের উপর মাত্রাতিরিক্ত স্বজনপ্রীতি ও বিদ্বেষ প্রিয় ছিল এবং দুষ্কার্য, ব্যভিচার এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং মগ্নতা ছিল, এবং উত্তম কর্মে ঐক্য ও সাম্য অনুপস্থিত ছিল। আর তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের পরিণতির প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিত না। তাহাদের না কোন প্রকার শাস্তির ও প্রতিশোধের ভয় ছিল, আর না কোন ভর্ৎসনা ও অপমানের। এই ধরনের লোকদের অবস্থা ও কর্মের রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংশোধন করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতির ঢেউ-এর সঞ্চার করিয়াছেন এবং উহাদের সকলকে এক কালেমার উপর সমবেত করিয়াছেন। এমনকি তাহাদের সকল প্রকার মত, ঐকমত্য এবং তাহাদের অন্তরসমূহ একত্রিত হইয়া যায়। অবশেষে তাহারা সকলে তাঁহার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়া যায়। সাহায্য ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লোক একাত্মায় পরিণত হইয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভুবন উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যাভার প্রেমিকগণ পাগলপারা হইয়া যায় আর তাঁহার ভালবাসায় নিজ শহর, দেশ ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া দেয়, স্বীয় সম্প্রদায় ও স্বীয় বংশধর হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে স্বীয় জান-মালকে বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং তাঁহার সম্মানে নিজ আত্মাকে শাণিত তরবারির সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। অথচ মজার ব্যাপার হইল এই যে, তাহারা ধন ও দৌলতহীন ছিলেন। তাহাদের প্রতি না ধনসম্পদ উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং না তাহাদের ধন ও ঐশ্বর্য ছিল, যদ্দরুন পৃথিবীতে উহার অর্জনের লোভে তাহাদিগকে নিয়োজিত করা হইত, এবং ঐ সকল রাজ্য ও শহর, যেগুলিকে অর্জনের জন্য এই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে উহার মালিক ও বণ্টনকারী বানান হয় নাই। বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। ধনীকে গরীব বানাইতেন এবং মর্যাদাবানকে সমপর্যায় ও বিনয়ী বানাইতেন। এই ধরনের বিষয়সমূহ এবং এই ধরনের যাবতীয় অবস্থা এইরূপ কোন ব্যক্তির মধ্যে সমবেত হইতে পারে কি ? এবং তাহার এই সুযোগ হইতে পারে কি যে, স্বীয় বুদ্ধি, ও চিন্তাশক্তি দ্বারা কষ্ট-সাধ্যের সহিত এই সকল কর্মকে আনজাম দিতেপারে এবং ইহাতে সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং ইয়াতীম, শক্তি ও সম্পদহীন এবং ধন ও দৌলতহীন এবং সাহায্য ও সহানুভূতিহীন এবং একাকী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এমন সম্মান, শক্তি, আত্মপ্রত্যয়, সাহায্য ও সাফল্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করিয়াছিলেন যে, তিনি সকলের উপর

www.pathagar.com

বিজয়ী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শক্ত ও সুদৃঢ়রূপে সকল অধিকার দান করা হয় لا والله, শপথ মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার, ঐ সকলকে তিনি করায়ত্ত ও আসক্ত বানাইয়া লইয়াছেন। এইগুলির সকলই এমন বাক্য যদ্ সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান কখনও সন্দেহ করিতে পারে না এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহা একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ এবং ঐশী করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবীয় শক্তির মাধ্যমে এইটুকু পর্যন্ত পৌঁছা প্রকৃতিগত দিক হইতে অক্ষম ও অপারগ এবং সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া মানবের উহার উপর কোন ক্ষমতা নাই।

উম্মী হওয়া মু'জিযা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের দলীলসমূহের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তিনি উম্মী এবং নিরক্ষর ছিলেন এবং তিনি অংকন ও লিখা একদম জানিতেন না। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রদায়ের সকলেই উম্মী, মূর্খ এবং অশিক্ষিত ছিল, তিনি উম্মী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন শহরে এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রতিপালিত হন, যাহাদের মধ্যে অতীতকালের বিদ্যাসমূহের জ্ঞান কাহারও মধ্যে ছিল না। আর না তিনি এমন কোন শহরে ভ্রমণ করিয়াছেন যেথা কোন বিদ্বান ছিলেন এবং তিনি তাহার নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন এবং তাওরাত, ইনজীল এবং অতীতের উম্মতগণের সংবাদ ও অবস্থাসমূহ অবগত হইতে পারিয়াছেন। নিঃসন্দেহরূপে ঐ সকল কিতাবের এমন বড় বড় বিদ্বান অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিলেন, যাহারা নিজ নিজ স্থানে ঐ সকল কিতাবের বিশেষজ্ঞ ও সুখ্যাত ছিলেন এবং ঐ সকল কিতাবের বিদ্বান ও পণ্ডিতগণের মধ্য হইতে কতিপয় পণ্ডিত ব্যতীত আর কেহ জীবিত ছিলেন না। অতঃপর ঐ সকল ধর্মের সকল দলের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, যদি সমগ্র দুনিয়ার সকল বিদ্বান ও পর্যালোচক সমবেত হইতেন, তবু তাঁহার সমতুল্য কোন প্রমাণ আনয়ন করিতে পারিতেন না। ইহা এই কথার প্রথম প্রমাণ যে, তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল, তিনি উহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন চিন্তা করা এবং জ্ঞাত হওয়া দরকার যে, বিনা শিক্ষায় ও বিনা বিদ্যার্জনে তিনি জ্ঞান ও মা'রিফাতের যত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন সকল আওয়াল ও আখের-এর সকলের বিদ্যা ঐ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। হযরত শেখ সা'দী (রা) কি সুন্দর বলিয়াছেন–

يتيمے كه ناكرده قران درست * كتب خانه چند ملت بشست

যে ইয়াতীম কুরআনকে শুদ্ধ করেন নাই, তিনি বহু ধর্মের কুতুবখানাকে বিধৌত করিয়া দিয়াছেন।

এবং মাওলানা জামী (আলায়হির রাহমাত)ও কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

امی و دقيقه دان عالم * بے سايه وسائبان عالم

উম্মী অথচ জগতের সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ছায়াহীন অথচ সমগ্র জগতের ছায়া দানকারী তিনি।

www.pathagar.com

ইহাও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যে সকল লোক মূর্খতা, অজ্ঞতা, দুষ্কর্ম ও ব্যভিচারিতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, তাহারাই তাঁহার সংসর্গে ও সেবায় এবং তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষায়, বিদ্যায় ও কর্মে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল এবং ইহা সকল কিছুই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে।

যদি তোমরা তাঁহার চরিত্র ও গুণাবলী, কামালত ও আচরণ, ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতি লক্ষ্য কর, তো তোমরা সর্বপ্রথম এই প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে যে, মানবের মধ্য হইতে কোন মানব, যাহারা নুবুওয়াত ও রিসালতের দাবী করিয়াছেন এবং লোকদিগকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার অনুরূপ সৃষ্টি হন্ নাই। তাহা হইলে এখন এমন কোন বস্তু রহিয়াছে যাহার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা বিদ্যমান থাকিতে পারে ?

পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা

তাঁহার সকল মু'জিযার মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অত্যুজ্জ্বল স্থায়ী ও প্রসিদ্ধতম মু'জিযা হইল, কুরআন মাজীদ। যাহার স্থায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পবিত্র কুরআন অসংখ্য মু'জিযার সহিত সম্পৃক্ত এই হিসাবে যে, "ইন্না আ'তায়না কাল কাওছার" কোরআনের সর্ব কনিষ্ঠ সূরা, উহার মধ্যে যত মু'জিযা রহিয়াছে উহা গণনা করিতে কেহই সক্ষম নহে। সুতরাং এই সূরার মু'জিযার সংখ্যা হইতেই সমস্ত কুরআনের মু'জিযাসমূহের অনুমান করিয়া দেখুন যে, প্রত্যেক সূরায় কত মু'জিযা হইতে পারে।

কুরআনের অলৌকিকতার কারণসমূহ

কুরআন কারীমের অলৌকিকতার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। উহার অলৌকিকতার বিশদ জ্ঞান অলৌকিকতার কারণসমূহের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সংক্ষিপ্ত রূপে অলৌকিকতার পরিচয় এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা দ্বারা চ্যালেঞ্জ দান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষকে ইহার মুকাবিলায় ইহার সমতুল্য এক সূরা আনয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ দান করেন। ইরশাদ করা হয় যে, اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه 'যাহা আমি আমার বিশিষ্ট বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি তৎসম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে উহার অনুরূপ এক সূরা-ই লইয়া আস দেখি! (সূরা বাকারা ঃ ২৩)

বস্তুতঃ লোকেরা উহার বিপক্ষে ও মুকাবিলায় কিছু উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়া যায়।

প্রথম আলোচনা তো ইহাই ছিল, যদি উহারা ইহার সমতুল্য আনয়নে সক্ষম হইত, তবে উহারা কখনও এই ধ্বংসের মধ্যে পতিত হইত না। কোন কোন বিদ্বান বলেন যে, বিশ্ব নেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবের অধিবাসীদের উপর যে বাণী পেশ করিয়াছেন উহারা উহার অনুরূপ বাণী আনয়নে অক্ষম ও অপারগ হইয়া যায়। কেননা, এই বাণী পথ-নিদের্শের ক্ষেত্রে মৃতের জীবিত হওয়া, অন্ধ ও বধিরের সুস্থতা অর্জনের চেয়েও বিস্ময়কর ও অতীব উজ্জ্বল ছিল। এই জন্য যে, ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ এবং ভাষার সকল নেতৃবর্গ যে কথা রচনা করিয়া থাকেন, উহা উদ্দেশ্য ও মর্ম এবং শব্দ ও অর্থের ক্ষেত্রে স্বজাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও উহার অনুরূপ বাণী রচনা করিতে তাহারা অক্ষম হইয়াছেন। আর তাঁহার এই

www.pathagar.com

অলৌকিকত্ব উহা হইতে অতি আশ্চর্যজনক যাহারা হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালামকে মৃতকে জীবিত করিতে এবং অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করিতে দেখিয়াছে। এই জন্য যে, দর্শনকারীর জন্য উহার মধ্যে কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না, এবং ঐ পর্যন্ত পৌঁছার মত তাহাদের কোন বিদ্যা ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ বাক্য বাক্যালংকারে বক্তৃতার সহিত তাহাদের যে সম্পর্ক ছিল, ইহা তো তাহাদের কলাকৌশল এবং পেশা ছিল। আর এই ক্ষেত্রে তাহাদের অপারগ হওয়া রিসালতের বিশুদ্ধতার জন্য বড় ফলদায়ক হইয়াছে এবং ইহা অকাট্য দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণও হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।

আবূ সুলায়মান খাত্তাবী যিনি শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা এবং হাদীসের শরাহকারীদের মধ্য হইতে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন— বলেন যে, বিশ্বনেতা নবী (সা) স্বীয় যুগের সকল লোকের মধ্যে অধিক জ্ঞানী এবং বিবেকসম্পন্ন ছিলেন। বরং এক বাক্যে নিশ্চিত ও অকাট্যরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টজীব হইতে অধিক প্রজ্ঞাশীল ছিলেন। ঐ লোকেরা তাঁহার সমতুল্য বাক্য আনয়ন করিতে সক্ষমই ছিল না। সুতরাং যদি এমন হইত যে, তাঁহার এই জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়, তবু তাঁহার সংবাদসমূহে বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী কিছু থাকিত না। ঐ সময়ও মানুষ, তাহার বিবেক পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইত না এবং এই চ্যালেঞ্জ নিশ্চিত ও অকাট্য রূপে থাকিত। যেমন ইরশাদ করা হইয়াছে, কখনও উহারা আনয়ন করিতে পারিবে না (وَلَنْ تَفْعَلُوْا) মোট কথা, নবী (সা) তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দান করিয়াছেন এবং লোকেরা ইহার মোকাবিলায় সম্মুখে আসিতে সক্ষম হয় নাই এবং পরস্পর বাদানুবাদের সময় ভাষার অলংকারে তাহাদের অক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এমনকি তাহাদিগকে তাহাদের সমস্ত সাহায্যকারী সহ একত্রিত হওয়ারও সুযোগ দান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও এমন ছিল না যে, লড়াই-এর ময়দানে অবতীর্ণ হইবে এবং এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ ইরশাদ করা হইয়াছে–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

'যদি সমস্ত মানুষ ও জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ আনয়নের জন্য একত্রিত হয়, তবু ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না— যদিও তাহারা একে অপরকে সাহায্য করুক না কেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

হাদীসে আসিয়াছে যে, একদিন নবী আকরাম (সা) মসজিদে হারামের এক কোণায় একেলা তাশরীফ রাখিতেছিলেন এই সময় কুরায়শের মধ্য হইতে হতভাগ্য উত্‌বা ইব্ন রবী'আ, কুরায়শের মজলিসে বলিতে লাগিল যে, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি ঐ ব্যক্তির (অর্থাৎ নবী সা) নিকট যাইয়া কতিপয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, হইতে পারে তন্মধ্য হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াও লইতে পারেন এবং উক্ত কর্ম হইতে বিরত হইয়া যাইতে পারেন এবং আমাদের পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া দিতে পারেন। কুরায়শরা বলিল, হে আবুল ওয়ালীদ! ঠিক আছে, যাও। উত্‌বা তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া নবী (সা)-এর নিকটে যাইয়া বসিল এবং নবী আকরাম

www.pathagar.com

(সা)-এর সহিত কথা বলিতে লাগিল। সে নবী (সা)-কে ধন ও দৌলতের লোভ দেখাইল। সে বলিল, আপনি যাহা কিছু চাহিবেন হাযির করিয়া দিব। নবী (সা) সকলই শ্রবণ করিতে থাকিলেন, তারপর বলিলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ করিয়াছ ? সে বলিল, হ্যাঁ! বলিলেন, এখন আমার নিকট হইতেও কিছু শ্রবণ কর। সে বলিল, বলুন এবং যা ইচ্ছা হয় তাই বলুন। নবী (সা) পাঠ করিলেন–

حٰمٓ - تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

'ইহা মহান করুণাময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতারিত। এক কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় কুরআন বিবেকবানদের জন্য সুসংবাদ দান করিয়া থাকে এবং ভয় প্রদর্শন করে (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ঃ ১-৪)। উৎবা চুপ করিয়া কান পাতিয়া ইহা শ্রবণ করিতে থাকে এবং তাহার হস্তদ্বয়কে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইয়া উহার উপর হেলান দিয়া বসিয়া যায়। তারপর যখন নবী (সা) তিলাওয়াত করিতে করিতে উক্ত সূরার সিজদার আয়াত পর্যন্ত যাইয়া পৌছেন, নবী (সা) সিজদা করেন, অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! তুমি শ্রবণ করিয়াছ ? সে বলিল, হাঁ আমি উক্ত কালাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি ইহার উপর মগ্ন থাকুন এবং কাহাকেও ভয় করিবেন না। ইহার পর উৎবা স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যায়। যখন উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে দেখিতে পাইল, তখন বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র কসম! উৎবা অবনমিত মুখ লইয়া আসিয়াছে। তারপর উৎবা উপবেশন করতঃ বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অদ্য এমন বাক্য শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐরূপ বাক্য পূর্বে আর কখনও শ্রবণ করি নাই। আল্লাহ্‌র কসম! উহা না কবিতা, না জাদু এবং না কাহিনী। তাঁহাকে হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তাহার কাজে মগ্ন থাকিতে দাও, কেননা, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি উক্ত কালাম সম্পর্কে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, উহার বাহুতে বিরাট মর্যাদার এবং বড় আশ্চর্যজনক বস্তু। তোমরা জানিয়া রাখ, তিনি যাহা কিছু বলেন, উহা মিথ্যা হয় না এবং তিনি যা দু'আ করেন উহা কবূল না হইয়া যায় না। আমার ভয় হয়, কখন জানি শাস্তি নাযিল হইয়া যায়। ইহা বায়হাকী প্রভৃতিগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আসিয়াছে যে, তিনি স্বয়ং হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার ভ্রাতা উনায়সকে নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ যর (রা) বলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার ভাই উনায়স-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ না কোন কবি দেখিয়াছি, না শ্রবণ করিয়াছি। সে জাহিলিয়াতের যুগে বার জন কবিকে পরাজিত করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে আমি স্বয়ং একজন ছিলাম। সে পবিত্র মক্কা গমন করে এবং আমার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দান করে। আমি তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে ? সে বলিল যে, কেহ তাহাকে কবি বলিয়া থাকে, কেহ গণনাকারী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি স্বয়ং একজন কবি এবং

www.pathagar.com

আমি গণনাকারীদের কথাও শ্রবণ করিয়াছি। তিনি কবি নহেন এবং তাঁহার কথাবার্তাও গণনাকারীর ন্যায় নয়। তিনি সত্য, অন্যরা মিথ্যা।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ভাষার শুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার দিক হইতে বড় পটু ছিলেন। তিনি বহুবার কুরআন শরীফ শুনিয়া বলিতেছেন وَاللّٰهِ اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ الطَّلَاوَةً আল্লাহ্‌র কসম! ইহা বড়ই সুমধুর এবং ইহাতে আশ্চর্য স্বাদ রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে এমন উজ্জ্বল্য ও সজীবতা রহিয়াছে, যাহা অন্য কোন বাণীতে নাই। وَاِنَّ اَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَاِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ এবং নিশ্চয় উহার উপরের অংশ ফলবান এবং নিম্নাংশ পরিতৃপ্ত وَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ এবং উহা মানুষের কথা নহে وَاِنَّهُ لَيَعْلُوْا وَلَا يُعْلٰى এবং নিশ্চয়ই উহা সমুন্নত রহিবে, অন্য কোন বস্তু উহার উপর জয়ী হইতে পারিবে না। ইব্‌ন ওলীদ স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়া থাকিত যে, খোদার কসম! তোমাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক তোমাদের কবিতা সম্পর্কে আর কেহ অবগত নহে এবং না জিন্নদের কবিতাও বেশী জ্ঞাত আছে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যাহা কিছু বলেন, তদপেক্ষা উত্তম বাক্য আর কাহারও হয় না।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, হজ্জের কোন এক বৎসরে কুরায়শের সকল গোত্র একত্রিত হয়, ঐ সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা বলে যে, আরবের সকল গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ আগমন করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, সকলেই একমতের উপর সম্মিলিত ও একত্রিত হইয়া যাইবেন এবং একজন অন্যজনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবেন না এবং পরস্পর মতবিরোধ করিবেন না। লোকেরা বলিল যে, আমরা সকলেই একতাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গণনাকারী সাব্যস্ত করিব। ওয়ালীদ বলিল যে, খোদার কসম! তিনি না গণৎকার এবং না তাঁহার মধ্যে গণনাকারীদের গুনগুন আওয়ায ও ছন্দ আছে। তারপর লোকেরা বলিল যে, আমরা তাহাকে পাগল বলিব! সে বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি পাগলও নহেন, উন্মাদও নহেন। তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তারপর তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা তাহাকে কবি বলিব। সে বলিল, তিনি কবিও নহেন, আমরা কবিতা ও উহার প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগত আছি। বীরত্ব গাথা, পয়ার ছন্দ, স্বকীয় ছন্দ, দীর্ঘ ছন্দ ও সংক্ষিপ্ত ছন্দ সম্পর্কে অতি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি। তারপর লোকেরা বলিল, আমরা বলিব যে, তিনি জাদুকর। সে বলিল যে, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি জাদুকরও নহেন এবং তাঁহার মধ্যে ঝাড়ফুঁক এবং তাবীজ-গণ্ডা কিছুই নাই। আরও বলে যে, তোমরা তাঁহার সম্পর্কে যাহা কিছু অপবাদ দান করিবে, উহাকে আমরা অসত্য বলিয়া জানিব। ইব্‌ন ইসহাক এবং বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, এই কুরআন যদি কোন জঙ্গলে ও মরুভূমিতে পুস্তকাকারে লিখিত পাওয়া যাইত এবং যদি কেহ না জানিত যে, কে ইহা রাখিয়া গিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি আনয়ন করিয়াছে, তো শান্ত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সকলেই সাক্ষ্য দান করিত যে, ইহা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে অবতারিত হইয়াছে এবং কোন মানবের উহা রচনা করার শক্তি নাই। আর যদি কোন সত্য বিবেকসম্পন্ন এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকের হস্তে আসিয়া পৌঁছিত তো বলিতেন যে, ইহা আল্লাহ্‌র কালাম এবং ইহাতে লোকদিগকে

www.pathagar.com

সমকক্ষতার চ্যালেঞ্জ দান করা হইয়াছে যে, উহার ন্যায় অন্ততঃ একটি সূরাই তৈরী করিয়া লইয়া আসুক দেখি, তখন সকলেই অক্ষম হইয়া যাইত। তাহা হইলে এখন সন্দেহ ও দ্বিধার আর কি রহিল। কুরআনের অলৌকিকতার পরিচয় সম্পর্কে এইগুলি হইল সংক্ষিপ্ত কারণ এবং সহজ পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে বিদ্বান ও মূর্খ সকলেই শামিল। আর এই গতিধারার প্রেক্ষিতে এই কথা বলা সমীচীন হইবে যে, কুরআন যে ঐশী গ্রন্থ, উহা নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে এবং নবী করীমের নুবুওয়াতের প্রমাণ অন্যান্য মু'জিযা হইতে হইয়াছে।

এখন বিশদ বর্ণনার দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনা রহিয়া গেল, যাহার মধ্যে কুরআনের অলৌকিকত্বকে প্রমাণ করা হইয়াছে। যথা, ভাষার বিশুদ্ধতা ও ভাষার অলংকার আশ্চর্য ও অভিনব বর্ণনা পদ্ধতি এবং গাইবী সংবাদ দান ইত্যাদি। ইহা দ্বিতীয় পদ্ধতির সহিত সম্পৃক্ত হইবে। যাহারা এই কথা বলিয়া থাকে যে, কুরআনের অলৌকিকত্ব এই সকল কারণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এই ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করা ঐ সকল ওলামা কিরামের সহিত সম্পৃক্ত হইবে যাহারা ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলংকার সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত রহিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিকত্বের পরিচয়ের বহু প্রকার রহিয়াছে। প্রথম ঈজায, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং বহু অর্থ। যেমন— আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ যে, وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ 'এবং তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রহিয়াছে।' এই দুই বাক্যের মধ্যে মাত্র দশটি অক্ষর রহিয়াছে অথচ বহু অর্থ একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবূ উবায়দা হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন কাহারও নিকট হইতে এই বাক্য পাঠ করিতে শুনিয়াছিল فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ তখন সে সিজদায় পতিত হইয়া বলিতে থাকে যে, আমি এই বাক্যের বাকপটুতা ও শুদ্ধ দ্যোতনাকে সিজদা করিতেছি। অন্য এক বেদুঈন অপর কোন ব্যক্তি হইতে শ্রবণ করিয়াছিল فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا যখন উহা হইতে উহারা সকলে নিরাশ হইয়া গেল, তখন তাহারা উহাকে কিনারা করিয়া দিল। তখন সে বলিয়া উঠিল যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, কোন মানুষ ইহার অনুরূপ বাক্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে না।

বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একদিন মসজিদে কাত হইয়া শয়ন করিতেছিলেন, অতর্কিতে রোম সম্রাটের পক্ষ হইতে এক দূত তাঁহার শিয়রের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দেখামাত্রই সাক্ষ্য দিতে থাকে। উক্ত দূত আরবী ভাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিল, সে বলিল যে, আমি মুসলমান বন্দীদের মধ্য হইতে এক বন্দীর নিকট হইতে তোমাদের কুরআনের এক আয়াত পাঠ করিতে শুনিয়াছি। অতঃপর আমি তৎসম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, উহার মধ্যে যাহা মারইয়াম পুত্র হযরত ঈসা (আ)-এর উপর এবং ইহজগত ও পরজগতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, উহা সমস্তই অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক আয়াতের মধ্যে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ আয়াতটি হইল এই ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

'এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে, তাহারাই সফলকাম। (সূরা নূর ঃ ৫২)

www.pathagar.com

আসমাঈ হইতে এক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি এক বালিকাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়াছেন। তখন তিনি তাহার শুদ্ধ ভাষার উপর আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ইহার উপর ঐ বালিকা বলিল যে, তুমি আল্লাহ্‌র এই কালামের পরও আমাকে বিশুদ্ধভাষী বলিয়া ধারণা করিয়া থাক ? আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত ইরশাদ হইল এই–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَاتَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِى اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

'এবং আমি মূসার মাতার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহাকে স্তন্য দান কর, অতঃপর যদি তুমি তাহার সম্পর্কে ভয় পাও, তবে তাহাকে (সিন্দুকে বন্ধ করিয়া) দরিয়ায় (নীল নদে) ভাসাইয়া দিও। তুমি ভয় করিও না, চিন্তাও করিও না। আমি উহাকে তোমার প্রতি ফিরাইয়া দিব এবং তাহাকে রাসূলগণের একজন করিব। (সূরা কাসাস ঃ ৭)

এই এক আয়াতের মধ্যে দুইটি আদেশ, দুইটি নিষেধ, দুইটি সংবাদ, দুইটি সুসংবাদ একত্রিত করা হইয়াছে। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ মন্দকে উত্তম দ্বারা বিদূরিত কর। ফলে যদি তোমার ও উহার মাঝে শত্রুতা থাকে, তবে সে হইয়া যাইবে পরম বন্ধু। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৪)। অনুরূপ এই ইরশাদ যে, يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَائَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِىْ "হে মাটি! স্বীয় পানি গিলিয়া ফেল এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও" (সূরা হূদ ঃ ৪৪)। এই ধরনের অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে, যাহা ছোট ও সংক্ষিপ্ত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও অধিক অর্থ, বিরাট মর্ম, সুন্দর শব্দ বিন্যাস এবং বাক্য সংযোজনায় সাহায্য করিয়া থাকে। তদ্রূপ ঐ সকল সুদীর্ঘ কাহিনী এবং কুরআনে পুরাকালের ইতিহাস বর্ণনার অবস্থা, যদ্দরুন ভাষাবিদদের প্রকৃতিতে অলসতার উদ্রেক হইয়া থাকে। যথা, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঐ দীর্ঘ কাহিনী যাহাকে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করিয়াছে। কি অনিন্দ্য ও সুন্দররূপে পরস্পর বাক্যসমূহের মধ্যে সম্মিলন ও সংযোগ স্থাপন এবং ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং যুক্তিধারা এমন প্রবহমান যাহা চিন্তা ও গবেষণাকারীদের এবং বিজ্ঞ ও অধ্যাত্ম পণ্ডিতদের জন্য শিক্ষণীয় ও অভিনব বস্তু বটে। এই প্রকার অলৌকিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া আরবের অধিবাসীদের রীতি এবং তাহাদের রুচির উপর নির্ভর করে এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভাষার পণ্ডিত ও ভাষাবিদ হইতে হইবে। যদিও আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রের উপর বহু বিষয়ের সংযোজন করিয়াছেন এবং বহু কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল সত্ত্বেও আরবের অশিক্ষিত ব্যক্তি, তাহাদের মহিলা ও দাসদের মধ্যে তাহাদের যে নিজস্ব বিশেষ রুচি, আচার ও পদ্ধতি পাওয়া যায় উহা অনারব শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে অপরাপর মানুষের এবং দীনের মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

আর অলৌকিকতার দ্বিতীয় প্রকার যথা, অদ্ভুত শব্দ সংযোজন, অভিনব বর্ণনাভঙ্গি এবং উহার পরিচ্ছেদ ও ছেদ পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ এবং সমগ্র আরব্য ভাষার পরিপন্থী। এবং উহার পদ্য ও গদ্য, বক্তৃতা ও কবিতা, বীরত্বগাথা ও ছন্দের মিলন পদ্ধতি যাহা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের

www.pathagar.com

কর্ম ছিল। এই সকল দৃষ্টিকোণ হইতে পবিত্র কুরআনের এক বিশেষ অতিরিক্ত গুণ রহিয়াছে, যাহা আরবের অধিবাসীদের বাক্য হইতে স্বতন্ত্র এবং এই আরবের অধিবাসীদের বাক্যের সহিত এই কুরআনের না সংমিশ্রণ রহিয়াছে এবং না সাদৃশ্য। যদিও কুরআনের বাক্য ও অক্ষরসমূহ তাহাদের বাক্যেরই স্বজাতীয়, যাহা উহারা স্বীয় পদ্যে ও গদ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং ইহা এমন এক বিষয়, যদ্দরুন তাহাদের বিজ্ঞ পণ্ডিতরা বিস্ময়াভিভূত এবং তাহাদের বাগ্মী প্রবর ও বিশুদ্ধ ভাষাবিদরা হয়রান ও পেরেশান রহিয়াছেন। তাহারা নিজ বাক্যে ইহার ন্যায় অনিন্দ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করার কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিশালী যুক্তি, এবং অত্যুজ্জ্বল প্রমাণসমূহের বিকাশের দরুন উহার বিরোধিতা এবং মোকাবেলা করিবারও শক্তি হয় নাই। সুতরাং যখন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট হইতে কুরআন শ্রবণ করিয়াছে, তখন তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাকে তাহার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইহার পর তাহার নিকট আবূ জাহল আসিয়া তাহাকে গাল-মন্দ করিতে লাগিল, তবুও সে ইহাকে অস্বীকার করিতে নাই। এই একই অবস্থা হতভাগ্য সকল কুরায়শদের ছিল। যদিও তাহারা ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রের দক্ষ, বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিল। তাহারা সকলেই ইহার বাক্য-দ্যোতনা পদ্ধতি ও বর্ণনাভংগি হইতে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল এবং ইহাকে তাহাদের স্বীকার করিয়া লইতেই হইল। কতিপয় অক্ষম ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা ইহার মোকাবিলা করার অপচেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। যথা— ইয়াহ্ইয়া ইব্ন গারায়ী নিঃসন্দেহে সে স্বীয় যুগের অতুলনীয় শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষাবিদ ছিল। সে কুরআনের সহিত মোকাবিলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সূরা-ই-ইখলাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং উহার অনুরূপ কিছু লিখার চেষ্টা করে। বস্তুত সে ইহার উপর বহু কষ্ট-সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু সফলকাম হয় না। ইহার পর তাহার মধ্যে আতংক ও আল্লাহ্ভীতি সঞ্চারিত হয়, এবং উক্ত ইচ্ছা হইতে তাওবা করিয়া লয়, অথচ সে স্বীয় যুগে ছন্দের এবং প্রাঞ্জল বাক্যের রচয়িতা ছিল। আর সে উক্ত বাক্যের নাম কুরআনের পদ্ধতি অনুযায়ী মুফাস্সাল রাখিয়াছিল। একদিন সে শিশুদের পাঠশালার পথ দিয়া কোথাও যাইতেছিল। ঐ সময় শিশু বাচ্চারা এই আয়াত পাঠ করিতেছিল قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ হে মাটি! স্বীয় পানি গলাধঃকরণ করিয়া ফেল। তখন সে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং সে তাহার লিখিত সকলই ধ্বংস করিয়া দিল এবং বলিতে লাগিল যে, আল্লাহ্র কসম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই কথা কেহই মোকাবিলা করিতে পারিবে না, ইহা মানুষের কথা নয়।

কুরআনের অলৌকিকত্বের তৃতীয় প্রকার হইল এই যে, কুরআন ঐ সকল গাইবী সংবাদসমূহে পরিপূর্ণ যাহা না কখনও সংঘটিত হইয়াছিল এবং না প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐ সকল অনুষ্ঠিত হয়, তখন ঠিক অনুরূপ অনুষ্ঠিত হয় যেরূপে উহার সংবাদ দান করা হইয়াছিল। যথা— আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ 'তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় ইনশা আল্লাহ্ মসজিদে হারামে শান্তি ও নিরাপদে প্রবেশ করিবেন। (সূরা ফাত্হ ঃ ২৭)

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ "এবং উহারা উহাদের এই পরাজয়ের পর খুব শীঘ্র বিজয়ী হইবে" (সূরা রূম ঃ ৩)। আর তাঁহার এই ইরশাদ যে, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه যাহাতে তিনি তাঁহাকে সমস্ত দীনের উপর বিজয় দান করেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সৎ কর্মশীলদের সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে তাহাদিগকে প্রতিনিধি বানাইবেন। এবং এই বলিয়াছেন যে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসিবে। এবং তাহার এই ফরমান যে, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ নিশ্চয় কুরআনকে আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণকারী। (সূরা হিজর ঃ ৯)

বস্তুতঃ উহাই হইয়াছে এবং অসংখ্য শত্রুদল, ধর্মদ্রোহী, নিষ্ক্রিয়তাবাদী ও কারামেতার দল (শিয়াদের একটি চরমপন্থী ফেরকা— যারা হযরত আলী (রা)-কে খোদা মান্য করে সম্মিলিতভাবে প্রতারণা, ধোঁকা এবং শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা কুরআনের জ্যোতিকে বিলীন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে পারে নাই এবং কুরআনের বাক্যসমূহের মধ্য হইতে একটি বাক্যেরও পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই এবং মুসলমানদিগকে উহার কোন একটি অক্ষর সম্পর্কেও সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "খুব শীঘ্র ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পলায়ন করিবে" (সূরা কামার ঃ ৪৫)। আর তাঁহার এই ইরশাদ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ "তোমরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের হস্ত দ্বারা উহাদিগকে শাস্তি দান করিবেন" (সূরা তাওবা ঃ ১৪)। এবং তাঁহার ইরশাদ যে, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا উহারা ইহার (মৃত্যুর) কখনও আকাঙ্ক্ষা করিবে না (সূরা জুমুআ ঃ ৭)। আরও বলিয়াছেন যে, وَلَنْ تَفْعَلُوْا উহারা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না (সূরা বাকারা ঃ ২৪)। এই ধরনের অসংখ্য আয়াত ও সংবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুরআনের অলৌকিকতার চতুর্থ প্রকার হইল পুরাকালের লোকদের ঐ সকল ঘটনাবলী ও ইতিহাসকে যৎসম্পর্কে কিছু লোক তো জ্ঞাত ছিল এবং অধিকাংশ লোকই উহা জ্ঞাত ছিল না। যেমন আসহাবে কাহফের কিস্সা, হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির (আ)-এর অবস্থা, হযরত যুলকারনাইন-এর অবস্থা এবং হযরত ইউসুফ (আ) এবং তাহার ভ্রাতৃবৃন্দের কাহিনী, এবং হযরত লোকমান এবং তাহার পুত্রদের কিস্সা এবং অন্যান্য নবীগণের তাঁহাদের উম্মতগণের সহিত কাহিনী এবং এই ধরনের অগণিত সংবাদ যাহা অতীতকালের এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের এবং তাহাদের শরীআতসমূহের এবং পূর্বাপর বিদ্যার সহিত সম্পৃক্ত এই সকল ইতিহাস গ্রন্থধারীদের মধ্য হইতে ঐ সকল ব্যক্তিরাই কেবল জানিত যাহাদের জীবন এই সকল বিষয় অনুসন্ধানে কাটিয়াছে। কুরআন শরীফে এমন পদ্ধতিতে আনয়ন করা হইয়াছে এবং উহাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ঐ সকল ব্যক্তিদের ইহার সত্যতার ও বিশুদ্ধতার

www.pathagar.com

প্রতি স্বীকৃতি দান করিতে হইয়াছে। অথচ উহারা এই কথা খুব ভাল করিয়াই জ্ঞাত ছিল যে, রাসূলে আকরাম (সা) উম্মী ছিলেন—যিনি না লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, আর না কোন পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন আর না তাহাদের মজলিসে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আর না তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে কখনও বাহিরে গমন করিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ঐ সকল সংবাদ দান করিয়াছেন যাহা তাওরাত, ইনজীল এবং ইবরাহীম ও মূসা এবং অন্যান্য নবীগণের সহীফাসমূহে বিদ্যমান ছিল। কুরআনের অলৌকিকতার এই চার প্রকার অতীব সুস্পষ্ট, ইহাতে কোন কিছু গোপনীয়তা নাই এবং সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব-ঝগড়া ও বাদানুবাদেরও অবকাশ নাই। ইহা ব্যতীত আর যে সকল অলৌকিকত্ব রহিয়াছে ঐ সকল কুরআনের গুণাবলী সম্পর্কিত যেগুলি ওলামা কিরাম বর্ণনা করিয়া থাকেন। কারণ, কুরআন হইল স্বতন্ত্র ও একক, উহার সহিত কোন বাণীরই সমকক্ষতা হয় না। তন্মধ্য হইতে উহার একটি গুণ তো হইল এই যে, কুরআন শ্রবণকালে, শ্রোতৃমণ্ডলীর ও শ্রবণ করানেওয়ালার অন্তরে ভয় ও আতংকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এবং তিলাওয়াতের সময় তিলাওয়াতকারীর উপর ভীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই অবস্থা অবিশ্বাসী ও মিথ্যা আরোপকারীদের বেশী করিয়া উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহার পরাক্রমশীলতা ও মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব উহাদের উপর অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে এবং এই অবস্থার তারতম্যের কারণ হইল এই যে, মিথ্যা আপাদনকারী ও অস্বীকারকারীদের উপর উহা শ্রবণ করা কঠিন হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে তাহাদের ঘৃণা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের বক্ষ সংকীর্ণ হইয়া যায়। ফলে উহারা ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা পসন্দ করিয়া থাকে এবং উহাকে শ্রবণ করা অপসন্দ করিয়া থাকে। মু'মিন ও সত্য আপাদনকারীর অন্তরে ইহার ভয় ও মহিমা বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং ইহার স্বাদ ও প্রেরণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার হৃদয় প্রেরণা গোপনতা, শান্তি, প্রশান্তি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। তাহার এই আকর্ষণ ও প্রেরণার অবস্থা, তাহার ঐকান্তিকতা ও আন্তরিক ভালবাসা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ "কুরআন-এর দরুন তাহাদের শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যায়, যাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করিয়া থাকে" (সূরা যুমার ঃ ২৩)। আরও বলিয়াছেন যে, ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অতঃপর তাহাদের দেহ ও অন্তর আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রতি ঝুঁকিয়া যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ "যদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতারণ করিতাম, তাহা হইলে তোমরা উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে নতশীর ও প্রকম্পিতাবস্থায় দেখিতে পাইতে" (সূরা হাশর ঃ ২১)। এই সকল পবিত্র আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, কুরআন কারীমের স্বভাব ও প্রকৃতি সুমহান। যদি শ্রবণকারী বিদ্বান ও জ্ঞানবান না হয় এবং উহার অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে, তবু উক্ত অবস্থা দিব্যজ্ঞান মহিলাবৃন্দ ও সাধারণ মূর্খদের তরফ হইতে সর্বদা হইয়া আসিতেছে। উহারা উহা শ্রবণ মাত্রই যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ও সতর্ক হইয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, এই কালাম অপরাপর কালামের ন্যায় নহে।

এক কাহিনীতে আছে যে, জনৈক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী কুরআন তিলাওয়াতকারীর পাশ দিয়া গমন করিতেছিল। তখন সে তথায় দাঁড়াইয়া যায় এবং ক্রন্দন করিতে থাকে। লোকেরা

www.pathagar.com

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌বস্তু তোমাকে কাঁদাইয়াছে ? অথচ তুমি উহার বিষয়বস্তু পর্যন্ত অবগত নও ? সে বলিল যে, আমি বাক্য বিন্যাসের সূক্ষ্ম পদ্ধতির দরুন কাঁদিতেছিলাম। উহা শ্রবণে অদ্ভুত স্বাদ ও প্রশান্তি অর্জিত হইয়া থাকে।

পবিত্র কুরআন শ্রবণ করার দরুন এই ভয় ও আতংক ইসলাম এবং ঈমান আনয়নের পূর্বে এক দলের উপর জারী হইয়াছিল, যদ্দরুন তাহারা তখন নির্দ্বিধায় ও বিনা কালক্ষেপণে ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। হযরত জুবায়র ইব্‌ন মুতইম হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলিতেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা-ই-তূর তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। অতঃপর যখন রাসূলে আকরাম (সা) এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ হইতে اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ 'উহারা কি কোন বস্তু হইতে সৃষ্ট হয় নাই অথবা উহারাই কি সৃজনকারী! ..... না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা ? (সূরা তূর ঃ ৩৫-৩৭) ইহা শ্রবণ করার পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই বুঝি আমার দিল বাহির হইয়া পড়িবে এবং আত্মা বহিস্কার হইয়া যাইবে। আমার এই অবস্থা ঐ সময় হইয়াছিল, যখন সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমানের দরুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ বিশ্বনেতা নবী (সা) হইতে সূরা-ই-হা-মীম সিজদা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানশূন্য ও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গমন করিয়া বলিয়াছিল যে, আমি (হযরত সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) হইতে এমন বাণী শ্রবণ করিয়াছি, যদ্রূপ আজ পর্যন্ত আমি আর কোন বাণী শ্রবণ করি নাই। কিভাবে যে উহার প্রশংসা বর্ণনা করিব এই শক্তিটুকু আমার মধ্যে নাই। কিন্তু সে কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যায় এবং ঈমান আনয়ন করিতে পারে নাই; বরং তাহার অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান আল্লাহ্ তা'আলার দান, বিদ্যা ও বুদ্ধি তজ্জন্য যথেষ্ট নহে। আর কুরআনের এই আয়াত يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ وَجَحَدُوْابِهَا "উহারা তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের চেয়েও উত্তম রূপে চিনে এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া থাকে" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৬), ইহার প্রমাণ।

কুরআনের অলৌকিকতার প্রকারসমূহের মধ্য হইতে এক প্রকার ইহাও যে, কুরআন পাঠকারী বিতৃষ্ণ হয় না এবং শ্রবণকারী উহাকে অপসন্দ করে না, বরং ইহা মধুরতা, চাশনী, শান্তি, মহব্বত, সজীবতা এবং স্বাদকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং নির্জন সময়ে ইহা হইতে স্বাদ ও উহার তিলাওয়াত হইতে ভালবাসা অনুভব করিয়া থাকে। সকল সময় এই অবস্থা হইয়া থাকে। অন্যান্য বাণী ইহার বিপরীত, যদিও উহা সৌন্দর্যে ও বিশুদ্ধতায় যত উচ্চ স্তরের হউক না কেন। কিন্তু উহা বারবার পাঠ করা অসন্দনীয় মনে হইয়া থাকে, যেমন ব্যবহারিক জীবনে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এইগুলি অবশ্য ঈমান এবং ভালবাসার সহিত সম্পৃক্ত। কিন্তু কাফির, কপট এবং শত্রুর দল। উহাদের তো ধ্বংস ব্যতীত আর কিছু বৃদ্ধি পায় না। (فَلَا يَزِدْهُمْ اِلَّا خَسَارًا)

কুরআনের অলৌকিকতার প্রকারসমূহের মধ্য হইতে এক প্রকার ইহাও যে, উহাতে এমন সব জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করা হইয়াছে যাহা আরবে প্রচলিত ছিল না এবং নুবুওয়াত

www.pathagar.com

প্রাপ্তির পূর্বে নবী আকরাম (সা)-এরও উহা জানা ছিল না। আর পূর্ববর্তী উম্মতের উলামা কিরামের মধ্য হইতে না কেহ উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং না উহা করায়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহাদের একটি কিতাবও এই সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ শরীআতের বিদ্যা, সুন্দর শিষ্টাচার, আদর্শ চরিত্র, উপদেশ ও কৌশল নবী ও উম্মতগণের জীবন আলেখ্য এবং পরকালের সংবাদ ও নিদর্শনাবলী অতীব পূর্ণ ও উত্তমরূপে একত্রিত করতঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ এবং জগত সৃজনকারীর পূর্ণ গুণাবলীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি, অকাট্য প্রমাণ এবং প্রকাশ্য দলীলরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ আমি কুরআনে কোন বস্তুর বর্ণনা বাদ দেই নাই। (সূরা আনআম ঃ ৩৮)।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ এবং আমি আপনার প্রতি কুরআনকে প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রূপে অবতীর্ণ করিয়াছি। (সূরা নাহল ঃ ৮৯)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এই কুরআনের মধ্যে প্রত্যেকের উদাহরণ বর্ণনা দান করিয়াছি। (সূরা যুমার ঃ ২৭)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ বনী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট বিবৃত করে। (সূরা নামল ঃ ৭৬)

আরও বলিয়াছেন যে, هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ইহা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও হিদায়াতস্বরূপ। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

সকলের চেয়ে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার হইল এই যে, পবিত্র কুরআনে প্রমাণ ও প্রমাণীয় বস্তু উভয়কেই একত্রিত করা হইয়াছে।

এই কারণে কুরআনের গ্রহণ এবং উহার সুন্দর গুণ ও বিশুদ্ধতার সহিত চ্যালেঞ্জ ও প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে এবং উহার মধ্যেই আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার ও দুঃসংবাদের বর্ণনা দান করা হইয়াছে। বস্তুত ইহার কোন এক বাক্যের উপর চিন্তা ও গবেষণাকারী যখন তৎসম্পর্কে গবেষণা করে এবং কোন কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তখন সাথে সাথে ঐ একই বাক্য হইতে নির্দেশও জ্ঞাত হইয়া থাকে।

অলৌকিকতার ঐ সকল প্রকারের মধ্যে একটি এই যে, কুরআন কারীমকে আল্লাহ্ তা'আলা পদ্যের রীতিতে উপস্থাপন করিয়াছেন— গদ্যের রীতিতে নয়। কেননা, পদ্য মানুষের কাছে অধিক সহজ, চিত্তাকর্ষক, কর্ণের জন্য সুখকর এবং অনুধাবনের ক্ষেত্রে অধিক প্রাঞ্জল। উহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং কামনা প্রধাবিত হয়।

ঐ সকল অলৌকিকত্বের প্রকারসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, পবিত্র কুরআনকে কুরআন শিক্ষাকারী ও হাফিযদের জন্য উহা মুখস্থ করাকে অতি সহজ ও আসান করিয়া দেওয়া

www.pathagar.com

হইয়াছে। এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আর আমি কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি, (সূরা কামার ঃ ১৭)। অতীতের উম্মতগণ স্বীয় কিতাবসমূহকে দুই একজন ব্যতীত মুখস্থ করিত না। থাকুক তো বহু সংখ্যক লোক মুখস্থ করিবে। যদিও তাহাদের আয়ুকাল সুদীর্ঘ হইত এবং কিশোর ও আলিমদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে উহাকে মুখস্থ করা অতি সহজ ও আসান কর্ম বটে।

ঐ সকল অলৌকিকতার প্রকারসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, পবিত্র কুরআনের সমগ্র অংশ একে অপরের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ রহিয়াছে এবং বিভিন্ন ধরনের ওনানা প্রকারের বিষয়বস্তুর পরস্পর সংযোগ রহিয়াছে এবং অতি নিপুণতার সহিত এক কাহিনী হইতে অন্য কাহিনীর প্রতি, এক বাক্য হইতে অপর বাক্যের প্রতি অর্থের মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং একই সূরায় আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ, দুঃসংবাদ, নুবুওয়াত ও একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা, আশা ও ভয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ পরিচ্ছেদে বিভক্তকরণ ব্যতীত বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি অন্য কোন শুদ্ধ ভাষায় এই ধরনের বিষয়বস্তুর বিরোধ দেখা দিত, তবে ইহা ভাষার শুদ্ধতার ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিকে লইয়া যাইত এবং উহার গতিকে দুর্বল ও শক্তিহীন করিয়া দিত এবং শব্দের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করিয়া দিত এবং ভাষা লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। কিন্তু কুরআন পাকের মধ্যকার এই বর্ণনা পদ্ধতি অপূর্ব সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং উহার মর্যাদাকে আরও উন্নত করিয়া দেয়।

ঐ অলৌকিকতাসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, উহার আয়াতসমূহ স্থায়ী থাকিবে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা উহার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণকারী" (সূরা হিজর ঃ ৯)। অথচ অন্যান্য কিতাবের সংরক্ষণ-ভার ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মযাজকদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তাহারা উহার মধ্যে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। অথচ কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ "কোন অসত্য ইহার মধ্যে না সম্মুখ হইতে না পশ্চাত হইতে আসিতে পারিবে" (সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৪২)। পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের সমস্ত অলৌকিকত্ব স্বীয় যুগ অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর শেষ হইয়া গিয়াছে এবং উহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। কিন্তু কুরআন কারীম রাসূল (সা)-এর এমন মু'জিযা যাহার আয়াতসমূহ অতি উজ্জ্বল, যাহার অলৌকিকত্বসমূহ সুপ্রকাশ্য এবং অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক যুগে বর্ণনাকারী, ভাষার পণ্ডিত, অলংকার শাস্ত্রবিদ, বাগ্মী সম্রাট, বিধর্মী এবং ধর্মের শত্রু পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা কুরআনের সমকক্ষতায় ও মোকাবিলায় কোন বস্তু আনয়ন করিতে পারে নাই এবং না উহার প্রতিবাদে কোন রচনা পেশ করিতে পারিয়াছে আর না সঠিক ভর্ৎসনা এবং প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছে, বরং যে কেহই এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছে, সে অক্ষম ও অপারগ হইয়া গিয়াছে। ময়দান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কাযী ইয়ায (রা) বলেন যে, কুরআনের অলৌকিকতা সম্পর্কে ইমাম (পণ্ডিত)গণ বহু প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ইমাম ভাষার বিশুদ্ধতা

www.pathagar.com

ও প্রাঞ্জলতার দিকেই ধাবিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেকেই ভিন্ন কারণ এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বালাগত (অলংকার) শাস্ত্রের এবং প্রকৃত অলৌকিকতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হইল ঐ চারি প্রকার যাহা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং উহার গুণাবলীও অপূর্ব।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতের অলৌকিকত্ব

তোমরা অবগত হইয়াছ যে, রাসূল সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন (সা)-এর সকল মু'জিযার মধ্যে কুরআন মাজীদই হইল বিরাট ও শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। কিন্তু চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিতকরণ, পানির প্রস্রবণ প্রবাহিতকরণ, খাদ্যসম্ভারকে বর্ধিতকরণ, এবং জড় পদার্থের কথা বলা, প্রভৃতিও বিরাট মু'জিযা ছিল। তন্মধ্য হইতে কতিপয় মু'জিযা তো বারবার রিওয়ায়াতের পর্যায়েও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং কতিপয় মু'জিযার ভিত্তি যদিও একক সংবাদের উপর, তবু বিভিন্ন পন্থা ও সূত্র তাওয়াতুর হাদীসের দিকেই টানিয়া লইয়া যায়। রাসূল (সা)-এর কিছু মু'জিযা তো আবির্ভাবের পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাকে ইরহাস বলা হইয়া থাকে। ইরহাসের অর্থ হইল ভিত্তি স্থাপন, যেন ঐগুলি নুবুওয়াত ও রিসালতের ভিত্তি পত্তনের শামিল ছিল এবং কিছু মু'জিযা নুবুওয়াত বিকাশের সময় প্রকাশ পাইয়াছে। আরও এক প্রকার মু'জিযা রহিয়াছে ইহা তিরোধানের পর হইতে প্রকাশ পাইতে থাকে। যেমন আওলিয়ায়ে কিরামের কিরামতসমূহ ইত্যাদি। কেননা, এই সকল রাসূল (সা)-এরই মু'জিযা এবং তাহারা নবী (সা)-এর নুবুওয়াতের শুদ্ধতা এবং তাঁহার রিসালতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ।

কিন্তু চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা সকল মু'জিযার মধ্যে অতীব উজ্জ্বল। কেননা, ইহা দ্বারা উর্ধ্বজগতের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, যা কোন নবী হইতে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই মু'জিযাকে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ করা হইয়াছে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (কিয়ামত সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে এবং চন্দ্র টুকরা হইয়া গিয়াছে) এই পবিত্র আয়াত দ্বারা পৃথিবীর এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং তাফসীরকারগণ ইহার এই ব্যাখ্যাই দান করিয়াছেন। উহাকে কিয়ামত দিবসে খণ্ডিত হওয়ার উপর ধারণা করা সম্পর্কে বক্তব্য হইল এই যে, উক্ত যুক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই কথা দ্বারাই রদ হইয়া যায় যে, اِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (যদি উহারা কোন নির্শন দেখিতে পায়, তখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে যে, ইহা তো চিরাচরিত জাদু) (সূরা কামার ঃ ২)। এই জন্য যে, কাফিররা কিয়ামত দিবসের ক্ষেত্রে (سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) চিরাচরিত জাদু এই কথা বলিয়া থাকে না।

পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, রাসূলে কারীম (সা)-এর পবিত্র যুগে চাঁদ দুই টুকরা হইয়াছিল। একখণ্ড পাহাড়ের এক পাশে এবং দ্বিতীয় খণ্ড পাহাড়ের নিম্ন ভাগে ছিল। সাহাবা কিরাম এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কুরায়শ কাফিররা রাসূল আকরাম (সা)-এর নিকট হইতে মু'জিযা তথা অলৌকিকতা প্রদর্শনের দাবী করে, এবং বলিতে থাকে যে, যদি সত্য হইয়া থাক, তবে চন্দ্রকে

www.pathagar.com

দুই টুকরা করিয়া দাও। রাসূল (সা) চাঁদের দিকে ইশারা করেন, চাঁদ দুই টুকরা হইয়া যায় এবং লোকেরা হেরা পর্বতকে চাঁদের দুই টুকরার মাঝখানে দেখিতে পায়। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন যে, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন কাফিররা বলিতে থাকে যে, নিশ্চয় আবী কাবশার পুত্র তোমাদের উপর জাদু করিয়াছে। তন্মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠে যে, যদি তিনি জাদু করিয়া থাকেন, তবে তোমাদের উপর করিতে পারেন সমগ্র পৃথিবীবাসীর উপর তো জাদু করিতে পারেন না। যখন দূরদূরান্ত হইতে পথিকরা ঐ স্থানে আগমন করিয়া চন্দ্রের দুই টুকরা হওয়ার সংবাদ প্রদান করিল, তখন আবূ জাহল বলিল যে, ইহা চিরাচরিত জাদু (هٰذَا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ)।

ইব্‌ন আবদুল বার্‌র যিনি শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদগণের একজন ছিলেন, বলেন যে, চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার হাদীসটি মর্যাদাবান সাহাবীবৃন্দের বিরাট দল এবং তদ্রূপ তাবিঈদের এক বিরাট জামাআত রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট হইতে এক বিরাট দল কর্তৃক অনুরূপভাবে আমাদের নিকট পর্যন্ত উক্ত রিওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে এবং পবিত্র আয়াত উহার সমর্থন দান করিতেছে।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণের হাদীসের কিতাবসমূহ বিশুদ্ধরূপে এবং বিভিন্ন সূত্রে পরিপূর্ণ ও ভরপুর রহিয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বর্ণিত আছে যে, আল্লামা ইব্‌ন সায়কী (র) মুখতাসার ইব্‌ন হাজিব-এর শরাহ-এর মধ্যে বলিয়াছেন যে, আমার নিকট শুদ্ধ এই যে, চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সংবাদটি বহুল প্রচারিত সংবাদের পর্যায়ভুক্ত এবং কুরআনে ইহার অকাট্য দলীল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফ প্রভৃতি হাদীসের কিতাবসমূহে বহু শুদ্ধ পন্থায় বর্ণিত হইয়াছে, যাহার রিওয়ায়াত ও শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। অবশ্য এই মু'জিযাকে কোন কোন বিদআতী অস্বীকার করিয়াছে। ইহা সম্প্রদায়ের ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীর অনুকূলে হইয়াছে যাহারা বলিয়া থাকে যে, ঊর্ধ্ব জগতের কোন বস্তু ভাঙ্গা ও জোড়াকে গ্রহণ করে না এবং ধর্ম অনুসরণকারী আলিমগণ এই সম্বন্ধে বলেন যে, বিবেকসম্মত কারণে ইহাতে অসম্ভাব্যের কিছু নাই, এই জন্য যে, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টবস্তু, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। যেমন কিয়ামতের অবস্থাসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন রহিয়া গেল কোন কোন বিধর্মীর এই কথা সম্পর্কে যে, যদি এই মু'জিযার হাদীসটি তাওয়াতুর রিওয়ায়াত হিসাবে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে ইহার পরিচয় ক্ষেত্রে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ ইহাতে শামিল থাকিত এবং ইহা শুধু মক্কাবাসীদের সহিত সম্পৃক্ত থাকিত না। এই জন্য যে, ইহা এমন এক ঘটনা যাহাকে অনুভব ও দর্শন করা যায়। এবং এই ধরনের আশ্চর্য ও অদ্ভুত নিরবচ্ছিন্ন বস্তুকে দেখার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয় এবং অস্বাভাবিক বস্তুর বর্ণনা দানে বিশেষ আবেগ কার্য করিয়া থাকে। যদি ইহার কোন আসল ঘটনা থাকিত, তাহা হইলে উহা সর্বদা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকিত। ইহার আলোচনা না ইতিহাসে, না জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিতাবে পাওয়া যায়। আর ইতিহাসের পাতায় ইহার কোন বর্ণনা ও আলোচনা না করা এবং অকস্মাৎ ভুলক্রমে বাদ পড়িয়া যাওয়া, অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সিদ্ধ হইত না। কেননা, ইহা এক বহুত বিরাট এবং সুস্পষ্ট ঘটনা ছিল।

www.pathagar.com

সম্মানিত ওলামা কিরাম ইহার এই উত্তর দিয়া থাকেন যে, তাহারা যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাকে এই ঘটনা উহা হইতে বহির্ভূত। ইহা ঐ বিষয় যাহাকে এক সম্প্রদায় এবং বিশেষ ব্যক্তিরা দাবী করিয়াছিল এবং এই ঘটনা রাত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাত্রিকালে অধিকাংশ লোক ঘুমাইয়া থাকে। যদি কিছু লোক জাগিয়াও থাকে, তবে তাহারা গৃহে অথবা গৃহ কোণ বিশ্রাম করিয়া থাকে। ময়দানে উপস্থিত থাকা এবং জাগ্রত থাকা ইহা বহুত বিরল। আর ইহাও এক কারণ যে, এই ঘটনা এক মুহূর্তের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল। আর ইহাও হইতে পারে যে, ঐ সময় সকল ব্যক্তির জন্য প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যথা মেঘমালা অথবা পাহাড় অন্তরায় হইতে পারে। অথবা কোন কোন লোক আনন্দ উৎসবমূলক কার্যে মগ্ন থাকিতে পারে। যথা কিস্সা কাহিনী প্রভৃতি শুনিতে ও শোনাইতে পারে। আর উহারা ইহার দর্শন হইতে বাদ থাকিয়া যাইতে পারে। আর ইহাও স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য যে, মানুষ চাঁদের দর্শনের জন্য ওঁৎপাতিয়া বসিয়া থাকিবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফিরাইবে না। এইরূপ অবস্থার কেবল ঐ সময়ই কল্পনা করা যায়, যখন লোকদিগকে পূর্ব হইতে উহাকে দেখা ও প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রাহান্বিত করা হইয়া থাকে এবং দিন তারিখ ও সময় ধার্য করতঃ সমগ্র পৃথিবীতে উহার ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়া থাকে। আর ইহাও হইতে পারে যে, চন্দ্র উহার স্বীয় কক্ষপথে ছিল, যে কক্ষ হইতে উহা পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তো দেখা যাইত এবং কোন অঞ্চলে দেখা যাইত না, যেন এক সম্প্রদায়ের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল এবং অপর সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অগোচরে। যেমন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে যে, কোন শহরে তো দেখা যায়, কোন শহরে দেখা যায় না। কোথাও গ্রহণের একাংশ দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোথাও অন্য অংশ। কোন শহরতো এমনও আছে যে, যাহাদের গ্রহণ সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই। একমাত্র ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা অংক দ্বারা তৎসম্পর্কে জ্ঞানের দাবী করিয়া থাকে। এবং ইহাও যে, সত্যপন্থীদের নিকট উহা দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং দৃষ্টিগোচর না হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির অধীন। যাহাকে ইচ্ছা দেখাইয়া থাকেন, যাহাকে ইচ্ছা দেখাইয়া থাকেন না। কেবলমাত্র ঐ লোকদিগকে দেখান উদ্দেশ্য ছিল যাহাদের নিকট চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল এবং যাহারা রাসূল (সা)-এর নিকট উক্ত মু'জিযার ও নিদর্শনের দাবী করিয়াছিল। তাই তাহারা দেখিয়াছিল তৎসহ অন্যরাও দেখিয়া থাকিবে এই সম্ভাবনাও আছে। অতঃপর পার্শ্ববর্তী পথিকরা আগমন করতঃ এই সংবাদ দান করে। তাহা হইলে সমগ্র দুনিয়ার মানুষের দেখার কি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ?

সাবধানতা

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বলা হইয়াছে যে, কোন কোন কিস্সা বর্ণনাকারীরা এই বলিয়া থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র আঁচলে চন্দ্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার পবিত্র আস্তীন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ইহা ভিত্তিহীন। যেমন শায়খ বদরুদ্দীন যারকাশী স্বীয় শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

সূর্যের প্রত্যাবর্তন

এখন রহিল সূর্যাস্ত হইতে সূর্যকে পুনরায় উদিত করা সম্পর্কে আলোচনা করা। ইহাও রাসূল (সা)-এর একটি মু'জিযা ছিল। হযরত আসমা বিন্‌ত উমায়স হইতে বর্ণিত আছে যে,

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঐ অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহ্ ওয়াজহাহুর উরুর উপর পবিত্র মস্তক রাখিয়াছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহ্ ওয়াজহাহু তখনও আসরের নামায আদায় করেন নাই এমনকি সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল। রাসূল (সা) বলিলেন, হে আলী! তুমি কি আসরের নামায আদায় করিয়াছিলে তিনি বলিলেন না। ঐ সময় রাসূল আকরাম (সা) মুনাজাত করিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! এই (আলী) তোমার এবং তোমার রাসূলের পায়রবীর মধ্যে রত ছিল। তুমি তাহার জন্য সূর্যকে ফিরাইয়া দাও। সেই সময় সূর্য পুনরায় ফিরিয়া আসে। হযরত আসমা (রা) বলেন যে, আমি সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিয়াছি। ইহার পর আমি উহাকে উদিত হইতেও দেখিয়াছি এবং উহার কিরণ পাহাড় ও মাটির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনা 'সাহ্বা' (صَهْبَاء) নামক স্থানে সংঘটিত হয়। এই হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা খায়বার-এর যুদ্ধের বর্ণনায় ইনশা আল্লাহ্ আলোচনা করা হইবে।

পবিত্র অঙ্গুলি হইতে পানির ঝরনা প্রবাহিত করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ মু'জিয়া বা অলৌকিকতাসমূহের মধ্যে পানির অলৌকিকত্বও একটি। যাহা বারবার বিভিন্ন স্থানে বিরাট দলের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা এত অধিক সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা অকাট্যরূপে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত সংবাদের কার্য করিয়া থাকে। বস্তুতঃ রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র অঙ্গুলিসমূহের মধ্য হইতে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে। এইরূপ মু'জিযা কোন নবীর সম্বন্ধে শোনা যায় না। যদিও হযরত মূসা (আ)-এর পবিত্র হস্তের মাধ্যমে পাথরের উপর লাঠির আঘাত হইতে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অঙ্গুলি হইতে পানি প্রবাহিত হওয়া, পাথর হইতে পানি বাহির হওয়ার অলৌকিকত্বের তুলনায় অনেক বিরাট। কেননা, পাথর হইতে স্বভাবতঃ পানি বাহির হইয়াই থাকে। মাংস, চর্ম এবং হাড় হইতে পানি বাহির হওয়া ইহার বিপরীত। নিঃসন্দেহরূপে এই হাদীসটি সম্মানিত সাহাবীগণের এক বিরাট দল বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে হযরত আনাস (রা) হযরত জাবির (রা) এবং হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসও রহিয়াছে। কিন্তু হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিলাম যে, আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া আসিয়াছে এবং চতুর্দিকে লোকেরা পানি তালাশ করিতেছিল, কিন্তু পানি পাইতেছিল না। রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট পানি আনয়ন করা হইল তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত পানির পাত্রের মধ্যে ধারণ করিলেন এবং লোকদিগকে উহা হইতে উযূ করার নির্দেশ দান করিলেন। সেই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র অঙ্গুলির মধ্য হইতে নদীর ন্যায় পানি প্রবাহিত হইতেছিল। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, অঙ্গুলি এবং উহার গিরাসমূহ হইতে পানি বাহির হইতেছিল, দলের সকল ব্যক্তিই উযূ করিয়া লইল। লোকেরা হযরত আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতজন লোক ছিলে তিনি বলেন, আমরা তিনশত ব্যক্তি ছিলাম।

ইব্‌ন শাহীনের হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, আমি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা আরয করিল, হে আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

রাসূল! আমরা এবং আমাদের উট ও পশু পিপাসার্ত হইয়া পড়িয়াছি। রাসূল বলিলেন, অল্প বিস্তর যতটুকু হয় পানি লইয়া আস। তাহারা পানির মশক হইতে জমাকৃত কয়েক ঢোক পানি লইয়া আসিল। তিনি বলিলেন যে, পাত্রে ঢালিয়া দাও। অতঃপর তিনি তাহার পবিত্র হস্ত উক্ত পানির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমি দেখিলাম যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র অঙ্গুলির মধ্য হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে। তারপর আমরা স্বীয় উট ও অশ্বদিগকে পানি পান করাইলাম এবং অবশিষ্ট পানি আমরা সকল মশকে ভরিয়া লইলাম।

বায়হাকী হযরত আনাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, নবী (সা) কুবার দিকে গমন করেন। তথায় জনৈক ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হইতে ছোট পিয়ালা লইয়া আসিল। রাসূল (সা) স্বীয় পবিত্র হস্ত পিয়ালার মধ্যে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হস্ত মুবারক পিয়ালার মধ্যে সংকুলান হয় নাই। তিনি চারটি অঙ্গুলি রাখিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি বাহিরে থাকিয়া গেল। তারপর পবিত্র অঙ্গুলি হইতে পানি প্রবাহিত হইতে থাকিল (শেষ হাদীস পর্যন্ত)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা সকলে পিপাসার্ত ছিলাম এবং রাসূল (সা)-এর সম্মুখে একটি পানির পাত্র ছিল, যাহা দ্বারা রাসূল (সা) উযূ করিতেছিলেন। সম্মানিত সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর পাশে গোলাকার হইয়া দাঁড়াইলেন। রাসূল (সা) বলিলেন, কি ব্যাপার! কেন গোলাকার হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ? আরয করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট উযূ করিবার বা পান করিবার মত পানি নাই, কেবল আপনার সম্মুখের এই পানি ছাড়া। রাসূল (সা) স্বীয় পবিত্র হস্ত উক্ত পানির পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, যদ্দরুন প্রস্রবণের মত পানি জোশ মারিতে লাগিল। তারপর আমরা পানি পান করিলাম, উযূও করিলাম। হযরত জাবির (রা)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা সর্বমোট কতজন লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যদি আমরা এক লক্ষ লোকও হইতাম, তবু সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত। কিন্তু আমরা মাত্র পনের শত লোক ছিলাম। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা বাওয়াতের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের নিকট মশকের মধ্যে কয়েক ফোঁটা পানি ব্যতীত আর কোন পানি ছিল না। উহা পিয়ালার মধ্যে নিংরাইয়া ঢালিয়া আনা হয়। রাসূল (সা) পবিত্র অঙ্গুলিকে উক্ত পিয়ালার মধ্যে প্রসারিত করিয়া দেন। তখন অঙ্গুলির মধ্য হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে থাকে। তারপর লোকদিগকে পানি পান করার হুকুম দান করেন। তখন সকলে খুব তৃপ্ত হইয়া পানি পান করে। অতঃপর রাসূলে আকরাম (সা) তাহার পবিত্র হস্ত বাহির করিয়া লন। তখনও পিয়ালা তদ্রূপ পরিপূর্ণই ছিল। হযরত জাবির (রা) হইতে ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং ইব্ন শাহীনও এই রিওয়ায়াতে বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন রহিয়া গেল হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস! সহীহ্ বুখারী শরীফে আলকামা কর্তৃক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের নিকট পানি ছিল না। রাসূল (সা) আমাদের নিকট বলিলেন যে, তোমরা অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট হইতে সামান্য কিছু পানি লইয়া আস। আমরা

www.pathagar.com

পানি লইয়া রাসূল (সা)-এর নিকট আগমন করিলাম। উহা এক পাত্রে ঢালিলেন এবং রাসূল (সা) পবিত্র হস্তকে পানির মধ্যে রাখিয়া দিলেন (শেষ হাদীস পর্যন্ত)। এই হাদীস যদিও এক এক সাহাবী যথা হযরত আনাস (রা) হইতে অথবা হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা ঐ সময় বর্তমান ছিলেন, যেন তাহারা সকলেই ইহার বর্ণনাকারী এবং রাবী। যদি তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হইত। যেমন মানবের প্রকৃতি এবং সাহাবীদের (রা) পবিত্র স্বভাব ছিল। ইহার গুরুত্ব হইল এই যে, খবরে ওয়াহেদ (একক সংবাদ) যদি সাহাবা-ই-কিরাম দলের সম্মুখে বর্ণনা করা হয়, আর তাঁহারা সকলে নীরব থাকেন, তখন উহার হুকুম হইল যেন তাঁহারা সকলেই ইহার বর্ণনাকারী। (চিন্তু করুন)।

প্রশ্ন ঃ এইভাবে পবিত্র অঙ্গুলিসমূহ হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বিভিন্ন পন্থায় ও সূত্রে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই হাদীসের উপর এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে যে, ইহাতে কি রহস্য রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে তো পিয়ালার মধ্যে পানি ঢালাইয়া লইতেন, উহার পর উহার মধ্যে পবিত্র হস্ত ধারণ করিতেন যদ্দরুন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। প্রথমেই কেন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত না ?

উত্তর ঃ উত্তরে ওলামা কিরাম বলিয়া থাকেন যে, ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কেননা, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই হইল, অমৌল তথা অস্তিত্বহীন পদার্থকে অস্তিত্ব দানকারী ও নূতন করিয়া সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়। আর এখানে পানি মূল ছিল, মু'জিযা এবং রাসূল (সা)-এর দু'আয় উহাতে বরকত লাভ হইয়াছিল।

অল্প পানিকে বর্ধিত করা

উহারই সদৃশ এবং ঐ জাতীয়ই হইল অল্প পানিকে বর্ধিত করা এবং উহাকে প্রবাহিত করার অলৌকিকত্ব। ইহা রাসূল (সা)-এর দু'আ ও তাঁহার বরকতে হইত। বস্তুতঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে তাবূকের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবা-ই-কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নিকট বলেন যে, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ সূর্যোদয়ের সময় তাবূকের পুষ্করিণীর নিকট পৌছিয়া যাইবে। তোমাদের মধ্য হইতে যেই সে স্থানে প্রথমে পৌছুক যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তথায় না আসিয়া পৌছিব পানিতে যেন কেহ হাত না দেয়। হযরত মুআয বলেন যে, আমি যখন উক্ত পুষ্করিণীর নিকট যাইয়া পৌছি আমাদের পূর্বেই তথায় দুই ব্যক্তি যাইয়া পৌছিয়াছিল। উক্ত পুষ্করিণী হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পানি বাহির হইতেছিল। তারপর রাসূল (সা) ঐ দুই ব্যক্তির নিকট জানিতে চাহিলেন যে, তোমরা কি ইহার পানিতে হাত লাগাইয়াছিলে ? তাহারা বলিল, হাঁ! রাসূল (সা) তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, আর বলিলেন যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হইয়া থাকে। সাহাবীগণ স্বহস্তে উক্ত পুষ্করিণী খনন করিলেন, যাহাতে কিছু পানি একত্রিত হয়, তারপর উক্ত পানি হইতে প্রবল তুফানের ন্যায় বস্তু নির্গত হয়। ইহার পর রাসূল পাক (সা) স্বীয় মুবারক চেহারা এবং মুবারক হস্তদ্বয় ধৌত করেন এবং বিধৌত পানি উক্ত পুষ্করিণীর মধ্যে

www.pathagar.com

ফেলিয়া দেন। ফলে পুষ্করিণীতে অনেক পানি হইয়া যায়। লোকেরা পানি পান করে। ইহার পর রাসূল (সা) বলেন যে, হে মুআয (রা)! যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয়, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে বহু প্রাসাদ এবং বহু বাগান দেখিতে পাইবে। বস্তুত এইরূপই হইয়াছিল। এই সংবাদ দান ও রাসূল (সা)-এর মু'জিযাসমূহের এবং গাইবী সংবাদ দানের মধ্যে একটি। এই ধরনের মু'জিযা তো অগণিত এবং অসংখ্য।

হুদায়বিয়ার ঘটনায় আসিয়াছে যে, বিশ্বনেতা রাসূল (সা) চারিশত সাহাবাসহ হুদায়বিয়ার কূপের নিকট আগমন করেন। উক্ত কূপের পানি দ্বারা পঞ্চাশটি বকরীও পানি পান করান যাইত না। সাহাবীগণ উক্ত কূপের সমস্ত পানি টানিয়া নেন এবং এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিল না। ঐ সময় রাসূল (সা) ঐ কূপের এক দিকে শুভাগমন করেন। বালতি হইতে পানি বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহা দ্বারা উযূ করেন এবং তাহার পবিত্র মুখের পানি উহাতে নিক্ষেপ করেন এবং দু'আ করেন। তখনই উহাতে পানি উথলাইয়া উঠিতে থাকে এবং পানির উপরিভাগ উঁচু হইয়া যায়। অতঃপর সকল সাহাবা পরিতৃপ্ত হইয়া পানি পান করেন এবং স্বীয় উটদিগকেও পান করান। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূল (সা) তীরদান হইতে তীর বাহির করেন এবং কূপের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করেন। তখন পানি উথলাইয়া উঠে এবং সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া পান করেন।

জাবির (রা)-এর হাদীসেও এইরূপ আসিয়াছে এবং হুদায়বিয়ায় রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র অঙ্গুলি হইতে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়াতও আসিয়াছে এবং উভয় কিস্সার মধ্যে ভিন্নতা রহিয়াছে। বিদ্বানগণ উভয় কিস্সাকে একই ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসের সময়কাল হইল ঐ সময়, যখন নামাযের সময় হয়। রাসূল (সা) উযূ করেন সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করেন, এবং বালতির অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দেন যদ্দরুন উহার পানি বাড়িয়া যায়। এইভাবে উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া থাকেন।

হযরত আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, বিশ্বনেতা রাসূল (সা) আমাদিগকে কোন এক সফরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, তোমরা সারারাত্রি চলার পর আগামীকল্য সকাল বেলা ইনশা আল্লাহু তা'আলা পানির সন্নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। লোকেরা এইদিক-ঐদিক পানির অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। রাসূল (সা)-এর সাহচর্যের কথাও স্মরণে থাকে না এবং পানির অন্বেষণে আগে অগ্রসর হইয়া যায়। যখন রাত্রির শেষ প্রহর হইয়া আসে, রাসূল (সা) পবিত্র শির রাখিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন এবং সাহাবীগণকে বলেন ফজরের নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। অর্থাৎ জাগ্রত থাকিও এবং ফজরের নামাযের সময়ের অপেক্ষায় থাকিও। যাহাতে ফজরের সময় নষ্ট না হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই ঘুমাইয়া পড়েন। সর্বপ্রথম যিনি জাগ্রত হন, তিনি হইলেন নবী করীম (সা)। তিনি ঐ সময় জাগ্রত হন, যখন তাঁহার পবিত্র পৃষ্ঠদেশের উপর সূর্যের তাপ পতিত হইতেছিল। রাসূল (সা) বলিলেন, তোমরা সকলেই আরোহণ কর, ইহা শয়তানের স্থান। আমরা সকলে আরোহণ করিলাম। ঐ সময় সূর্য খুব উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর ছাউনি করেন এবং পানির পাত্র

www.pathagar.com

আনয়নের জন্য আহবান করেন। উহা আমার নিকট ছিল, উহাতে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল, তিনি উযূ করেন, অবশিষ্ট পানিসহ পাত্রটি আমার নিকট অর্পণ করেন এবং বলেন যে, ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। ইহা হইতে বিরাট অলৌকিক প্রকাশ পাইবে। ইহার পর হযরত বিলাল (রা) নামাযের জন্য আযান দেন। তাহার পর ফজরের নামায আদায় করেন। তারপর তথা হইতে চলিয়া আসেন। যখন সূর্যের তাপ প্রখর হইয়া গেল এবং প্রত্যেক বস্তু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন আমরা আরয করিলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা পিপাসায় মরার উপক্রম হইয়াছি।" তিনি বলেন, তোমরা পিপাসায় ধ্বংস হইবে না। অতঃপর আমার নিকট হইতে উক্ত পানির পাত্রটি তলব করিলেন, উহার মুখের উপর স্বীয় পবিত্র মুখ রাখিলেন। আমাদের জানা নাই যে, তিনি উহাতে তাহার থুথু ফেলিয়াছিলেন অথবা ফুঁক মারিয়াছিলেন। অতঃপর মশক হইতে পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আমাকে পান করাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকেরা ভীড় করিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, ভীড় করিও না নিশ্চিন্ত থাক, সকলেই পানি পাইবে। বস্তুতঃ সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন। ঐ সময় আমরা তিন ব্যক্তি ছিলাম। ইহার পর আমি এবং রাসূল আকরাম (সা) এই দুইজনই কেবল পানি পান করা হইতে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিলাম। রাসূল (সা) আমার দিকে পানি বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন পান কর। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পান না করিবেন। আমি পান করিব না। তিনি বলেন, اِشْرَبْ مَا فِى الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا 'পান কর, সম্প্রদায়ের সকলকে যে পান করায়, সে সর্বশেষে পান করিয়া থাকে।' তারপর আমি পান করিলাম এবং সর্বশেষে রাসূল (সা) পান করেন।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর হাদীস 'জায়শে উসরাত' বা উসরত বাহিনীর আওতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকদিগকে পিপাসা এমন অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয় যে, লোকেরা স্বীয় উট যবাহ করিয়া উহার ভুঁড়ি নিঃসরণ করতঃ পানি পান করিতেছিল। ঐ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র খিদমতে দু'আর দরখাস্ত করেন। রাসূল (সা) দু'আর জন্য তাহার হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন। এখনও তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় অবনমিত করিয়া সারেন নাই এই সময়ের মধ্যেই বর্ষণ শুরু হইয়া যায় এবং যাহার নিকট যে পাত্র ছিল পানি দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিয়া লয়। আর এই বর্ষণের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা সৈন্য বাহিনীর বাহিরে অতিক্রম করে নাই।

বর্ণনা করা হইয়াছে, একদা রাসূলে আকরাম (সা) এবং হযরত আবূ তালিব এক বাহনের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। আবূ তালিব আরয করিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার শক্ত পিপাসা লাগিয়াছে, অথচ আমার নিকট পানি নাই। রাসূলে আকরাম (সা) বাহন হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় পবিত্র পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করিলেন। মাটি হইতে পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে চাচা ! নিন, পানি পান করুন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা পিপাসার অভিযোগ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন এবং দুইজন সাহাবীকে আহ্বান করিলেন।

www.pathagar.com

তন্মধ্যে একজন হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব ছিলেন, তাহাকে বলিলেন, যাও পানির অনুসন্ধান কর। তোমরা একজন মহিলা প্রাপ্ত হইবে, যাহার উটের উপর দুইটি মশক পাইবে। এই দুইজন অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং উক্ত মহিলাকে প্রাপ্ত হইলেন। সে দুইটি মশকসহ ছিল। এই দুইজন উক্ত মহিলাকে পানিসহ রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে লইয়া আসিলেন। তাহার উট হইতে মশকদ্বয় নামান হইল। রাসূলে আকরাম (সা) পানির পাত্র তলব করিলেন এবং উহার মধ্যে পানি ভরিয়া দিলেন। অতঃপর লোকদিগকে বলিলেন যে, আস, পানি পান কর এবং পান করাও। উক্ত মহিলা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল যে, কি হয়। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র কসম! নবী (সা) উক্ত মহিলার পানি ফিরাইয়া দিলেন এবং আমার খেয়াল হইল যে, উহাতে পূর্ব হইতে বেশী পানি রহিয়াছে। ইহার পর রাসূল (সা) উক্ত মহিলার খাবার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকেরা খেজুর, আটা এবং ছাতু জমা করিয়া উহার চাদরের মধ্যে বাঁধিয়া উটের উপর রাখিয়া দিল। অতঃপর রাসূল (সা) উক্ত মহিলাকে বলিলেন, যাও তুমি জানিয়া রাখ আমি তোমার পানি একটুও কমাই নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্বীয় কুদরতে পানি দান করিয়াছেন। যখন মহিলা স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌঁছিল, তখন সে লোকদের নিকট বলিল যে, আমার সহিত এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট লইয়া গিয়াছিল যাহাকে তাঁহারা প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ইহার পর উক্ত মহিলা সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিল এবং বলিল যে, আল্লাহ্র শপথ! হয় তিনি সকল লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর হইবেন, অথবা আল্লাহ্র সত্য রাসূল হইবেন।

অতঃপর সে বলিল যে, তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও কি ইসলাম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা আছে? (শেষ হাদীস পর্যন্ত) এইরূপ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া আসিয়াছে এবং কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, লোকেরা উক্ত মহিলার কথা মানিয়া লয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)। এই সম্পর্কে বহু হাদীস আসিয়াছে। ইস্তিস্কার হাদীসসমূহেরও এই প্রকারের সহিত মিল রহিয়াছে। যাহার বর্ণনা ইনশা আল্লাহ স্ব স্থানে আসিবে।

আহার্য বস্তু প্রভৃতির মধ্যে অলৌকিকতা প্রদর্শন

যেরূপ অল্প পানিকে বর্ধিত করার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ অল্প খাদ্য সামগ্রীকে বর্ধিত করার ব্যাপারেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার মু'জিযা নবী করীম (সা)-এর শিক্ষা এবং যাবতীয় নিআমতের মালিকানার প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করিয়া থাকে। যেরূপ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি দেহ জগতে কলব এবং রূহের প্রশিক্ষণ দান করিয়া থাকেন এবং উহাদিগকে কামিল বানাইয়া থাকেন। তদুপরি তিনিই প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং দেহের খাদ্য ও পানি ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন। شکر فیض توچمن چوں کند اے ابربہار ـ کہ اگر خار دگر کل همه پرو ردہ تست হে বারিধারা, পুষ্প কানন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। কেননা, কাঁটা ও ফুল তোমারই দানের প্রতিফল।

হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস

এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস সুপ্রসিদ্ধ। যাহাকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনার প্রেক্ষিতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা

www.pathagar.com

করেন যে, আমি স্বীয় স্ত্রীর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নিকট কি কিছু খাবার আছে ? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুরানী চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। তখন আমার স্ত্রী একটি থলি বাহির করিল যাহার মধ্যে প্রায় এক সা পরিমাণ যব ছিল এবং মোটা একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি উহাকে যবাহ্ করিয়া দিলাম, স্ত্রী যবের আটা পিসিয়া লইল। গোশত তৈরী করিয়া ডেকচিতে উঠাইয়া দিয়া রাসূল (সা)-এর খেদমতে যাইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি একটি বকরীর বাচ্চা যবাহ্ করিয়াছি এবং আমার স্ত্রী যবের আটা পিসিয়াছে। আপনি কতিপয় সাহাবীদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার গরীব গৃহে তাশরীফ আনয়ন করুন। রাসূলে আকরাম (সা) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, জাবির (রা) খাবার প্রস্তুত করিয়াছে, আস, আমরা তাহার ঐখানে যাই। (এই স্থানে রাসূল ঘোষণা করার সময় সুর (سُوْر) শব্দ ব্যবহার করেন। ইহা ফারসী শব্দ, অর্থ হইল খাদ্য। এই শব্দ অকস্মাৎ তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়) অতঃপর রাসূল (সা) হযরত জাবির (রা)-এর নিকট বলেন যে, আমার পৌছা পর্যন্ত ডেকচিকে চুলা হইতে নামাইও না এবং খামীর করা আটা এমনি রাখিয়া দিও। তারপর রাসূল (সা) এক সহস্র সাহাবা সহ তাশরীফ আনয়ন করেন। আমরা আটা এবং ডেকচিকে রাসূল (সা)-এর সম্মুখে লইয়া আসিলাম, তখন রাসূল (সা) মুবারক মুখের লালা উহার মধ্যে দিয়া দিলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং আমার স্ত্রীকে বলিলেন যে, রুটি পাকাও এবং কোন এক মেয়েলোককে সঙ্গে নিয়া লও আর ডেকচি হইতে গোশত বাহির কর, কিন্তু উহার মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিও না। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র কসম! ঐ সহস্র ব্যক্তি পেট ভরিয়া আহার করেন অথচ ডেকচির মধ্যে যথারীতি গোশত বলকাইতেছিল। এবং আটাও অবশিষ্ট থাকিয়া গেল।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসও বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, হযরত আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-এর নিকট বলেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শব্দের মধ্যে অতি দুর্বলতা বোধ করিয়াছি। ক্ষুধা তাঁহাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। কোন কিছু কি খাবার আছে ? তিনি বলেন যে, উম্মে সুলায়ম যবের কয়েকটি রুটি বাহির করিয়া কাপড়ে পেঁচাইয়া আমাকে আনিয়া দিলেন। আমি ঐগুলি লইয়া রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তিনি মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কি আবূ তালহা প্রেরণ করিয়াছে ? আমি আরয করিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রাসূল স্বীয় সাহাবীগণকে বলিলেন, উঠ চলো, এবং রাসূল (সা) তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রওয়ানা হইলেন। আমি তাহাদের পূর্বেই চলিয়া আসিলাম এবং আবূ তালহাকে সংবাদ প্রদান করিলাম যে, রাসূল (সা) তাশরীফ আনয়ন করিতেছেন। ইহার পর আবূ তালহা উম্মে সুলায়মের নিকট বলেন যে, হে সুলায়মের মাতা! (উম্মে সুলায়ম) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীবৃন্দের দলসহ শুভাগমন করিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট এই কয়েকটি মাত্র রুটি ব্যতীত তাঁহাদের খাবার মত আর কিছুই নাই। আমি ঐ রুটিগুলি রাসূল (সা)-এর খিদমতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উম্মে সুলায়ম বলিলেন

www.pathagar.com

যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল ভাল জানেন, অর্থাৎ আসলে যাহা কিছু মওজুদ আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমাদের অবস্থা সম্পর্ক জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণের দলসহ শুভাগমন করার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে। নিশ্চয় কোন মু'জিযা প্রকাশ হইবে। অতঃপর আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খোশ আমদেদ ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য চলিয়া গেলেন। রাসূলে খোদা (সা) শুভাগমন করতঃ উম্মে সুলায়মের নিকট বলিলেন যে, হে উম্মে সুলায়ম! তোমার নিকট যাহা কিছু আছে লইয়া আস। উম্মে সুলায়ম ঐ প্রেরণকৃত কয়েকটি রুটি খিদমতে পেশ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এইগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া উহাতে সামান্য ঘি মাখাইয়া খামীর বানাইয়া লও, এবং কোন এক পাত্রে রাখিয়া লইয়া আস। তারপর রাসূল (সা) কিছু পড়িয়া উহার উপর ফুঁক দিলেন এবং বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর বলিলেন যে, দশ দশজন করিয়া দল বানাইয়া ভক্ষণ কর, এমনকি দশ দশ জনের এক দলের আগমন হইত এবং খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করতঃ চলিয়া যাইতেন। প্রায় সত্তর অথবা আশি (রাবীর সন্দেহ) মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে রাবীর সন্দেহ ব্যতীত আশি ব্যক্তি আসিয়াছে। সর্বশেষে রাসূল (সা) এবং আবূ তালহা (রা)-এর গৃহের সকলে অবশিষ্ট যাহা ছিল আহার করেন। এক বর্ণনায় আট আট জন ব্যক্তির দলের কথা আসিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা অন্য কোন ঘটনা হইবে, এই জন্য যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে অধিকাংশ রিওয়ায়াতে দশ দশ জনের কথা আসিয়াছে।

এক এক দল করিয়া ডাকা এবং সকলকে একবারে না ডাকার রহস্য বর্ণনার ক্ষেত্রে ওলামা কিরাম এই বলিয়াছেন যে, যদি সকলকে এক সাথে ডাকা হইত, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি আহার্য বস্তুর উপর পতিত হইত এবং উহা সামান্য বলিয়া মনে হইত এবং উহা যথেষ্ট হইবে না ধারণার উদ্রেক হইত। ফলে তাহাদের এই খারাপ ধারণার দরুন বরকত উঠিয়া যাওয়ার কারণ হইত। অথবা এই কারণ হইবে যে, স্থান সংকীর্ণ ছিল, সকলের বসার মত ব্যবস্থা ছিল না, অথবা থালা একটি ছিল , বহু লোকের উহাতে সংকুলান হইত না, বিশৃঙ্খলা হইয়া যাওয়ার এবং ভীড় হওয়ার আশংকা ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাবূকের যুদ্ধে (যাহা রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল) যখন লোকেরা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল, তখন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদিগকে নির্দেশ দান করুন, যাহা কিছু আহার্য বস্তু অবশিষ্ট আছে উহা একত্রিত করিয়া লইয়া আসুক এবং রাসূল (সা) উহার উপর বরকতের দু'আ করিয়া দিন। রাসূল (সা) বলিলেন, হাঁ ঠিক আছে, আমি দু'আ করিব। যখন রাসূল (সা) ঘোষণা করিলেন, তখন লোকেরা অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী যাহা কিছুছিল আনয়ন করিতে লাগিল। কেহ এক মুষ্টি ছাতু আনিল, কেহ রুটির টুকরা লইয়া আসিল। এক ব্যক্তি এক সা' খেজুর (প্রায় সাড়ে চার সের) আনয়ন করিল। যখন দস্তরখানের উপর এই যৎসামান্য বস্তু জমা হইল, তখন রাসূল (সা) বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর নির্দেশ দান করিলেন যে, স্ব স্ব খাদ্যের ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া লও। মুসলিম সৈন্য বাহিনীর মধ্য হইতে এমন কোন ব্যক্তি

www.pathagar.com

ছিল না যাহার খাদ্যের ভাণ্ড পূর্ণ হয় নাই, সকলেই খুব পেট ভরিয়া আহার করিল। তারপরও দস্তরখানের উপর খাবার বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাবূকের এই যুদ্ধে (এক রিওয়ায়াতে অনুযায়ী) সত্তর সহস্র সৈন্য ছিল এবং যখন রাসূলে আকরাম (সা) এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেন, তো রাবী বলেন যে, তিনি বলেন যে, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। তিনি আরও বলেন, যে কেহ এই সাক্ষ্যের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সহিত যাইয়া মিলিত হইবে নিশ্চয় তাহার স্থান জান্নাতে হইবে।

মিসকীন বান্দা (শায়খ মুহাক্কিক আল্লামা আব্দুল হক র) বলেন যে, উম্মতগণ মু'জিযাকে প্রত্যক্ষ করার সময় যখন সাক্ষদান করে, উহা নবীর নুবুওয়াতের দাবীকে সত্য বলিয়া জানা এবং তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হওয়ার কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর এই স্থানে সাক্ষ্য দেওয়া কি কারণে ছিল ? হয় ইহা দৃশ্যত ও অদৃশ্যতঃ অবস্থায় হইবে, যেহেতু এই উভয় অবস্থাই স্বতন্ত্রও পৃথক, এই স্থানে ইয়াকীন এবং ঈমানের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির দরুন হইয়াছে। অথবা উম্মতকে সাবধানতা অবলম্বন ও শিক্ষা দানের দরুন এই সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা যয়নাব (রা)-এর বিবাহের সময় রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে উম্মে সুলায়ম (রা) এক পিয়ালা হায়েছ আমার হস্তে প্রেরণ করেন। এক বিশেষ ধরনের খাদ্যকে হায়ছ বলা হয়। যাহাকে খেজুর, ঘৃত, এবং ছাতু ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। উম্মে সুলায়ম (রা) হযরত আনাস (রা)-এর নিকট বলেন, হে আনাস (রা)! ইহা রাসূল (সা)-এর খেদমতে লইয়া যাও এবং আরয কর যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই খাবার আমার মাতা রাসূল (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সালাম নিবেদন করিয়াছেন এবং অল্প পরিমাণে প্রেরণ করার দরুন ক্ষমা চাহিও। হযরত আনাস (রা) উহা পবিত্র দরবারে লইয়া আসিলেন। রাসূল (সা) বলিলেন, রাখিয়া দাও এবং বলিলেন যে, অমুক অমুক লোককে লইয়া আস এবং নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়া দিলেন। এবং আরও বলিলেন যে, রাস্তায় যে কাহাকেই পাইবে ডাকিয়া লইয়া আসিবে। আমি প্রত্যেক ঐ সকল লোককে রাসূল (সা) যাহাদের নাম বলিয়া দিয়াছিলেন এবং রাস্তায় যাহাদিগকে পাইলাম বলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবশেষে যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন পবিত্র গৃহ লোকে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। সাহাবীগণ হযরত আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন কতজন ব্যক্তি হইবে ? তিনি বলিলেন, প্রায় তিন সহস্র লোক হইবে। ইহার পর আমি দেখিলাম যে, রাসূল (সা) উক্ত হায়ছ-এর পাত্রের উপর স্বীয় পবিত্র হস্ত রাখিয়া কিছু পাঠ করিলেন। তাহার পর দশ দশ জনের দলকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন আর বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলিয়া যার যার সম্মুখ ভাগ হইতে আহার করিয়া যাইতে থাকুক। এইভাবে দলে দলে লোক আগমন করিল এবং আহার করিয়া চলিয়া গেল। এমনকি সকলেই পেট ভরিয়া আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর বলিলেন হে, আনাস (রা)! পাত্র উঠাইয়া লইয়া আস। আমি পাত্র উঠাইয়া লইয়া আসিলাম। আমি

www.pathagar.com

বলিতে পারিব না যে, এই পাত্রে হায়ছ যখন রাখা হইয়াছিল, তখন বেশী ছিল, অথবা এখন যখন উঠাইয়া লইয়া আসিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর হাদীস

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, তিনি বিশ্বনেতা রাসূল (সা) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জন্য অতটুকু পরিমাণ খাবার রান্না করেন যতটুকু দুই হযরতের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর রাসূল (সা) আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-কে বলিলেন যে, আনসারের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে ত্রিশ ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। তাহাদিগকে আহার করান হয় কিন্তু আহার্য তবু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তারপর ষাট ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনা হয়, তাহাদিগকেও আহার করান হয়। আহার্য তখনও অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তারপর সত্তর জন আনসারকে ডাকা হয়, তাহারাও আসিয়া আহার করেন এবং আহার্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই সকল লোকের মধ্যে কেহ এমন'ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ এবং বায়আত না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী বলেন যে, আমার উক্ত আহার্য দ্রব্যকে একশত আশি ব্যক্তি আহার করিয়াছিলেন।

সামুরা ইব্ন জুন্দাব (রা)-এর হাদীস

হযরত সামুরা ইব্নে জুন্দাব (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ছিলাম। আমরা একের পর এক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকদিগকে খাবার খাওয়াইয়াছি। দশ ব্যক্তি উঠিয়া যাইত এবং দশ ব্যক্তি বসিত এবং আহার করিতে থাকিত। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই বরকত কোথা হইতে আসিত। তিনি আকাশের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন যে, ঐখান হইতে আসিয়া থাকে। এই হাদীসটি দারমী, ইব্ন আবী শায়বা, তিরমিযী, হাকিম, বায়হাকী এবং আবূ নুআয়ম রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর হাদীস

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত একশত ত্রিশ ব্যক্তি ছিলাম। সম্ভবতঃ সাড়ে চার সের আটা গোলা হয় এবং একটি বকরীর তরকারি প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর বকরীর, যকৃৎ, গুর্দা ও কলিজা ভুনা হয়। আল্লাহ্র কসম! আমাদের একশত ত্রিশ ব্যক্তির মধ্য হইতে এক ব্যক্তিও এমন ছিলাম না যাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার টুকরা দান না করিয়াছেন। ইহার পর উক্ত বকরীর তরকারিকে বড় দুই পাত্রে রাখা হয় এবং সকলেই খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করে। দুই পাত্রের মধ্যে যাহা রহিয়া গিয়াছিল উহা যার যার পাত্রে ভরিয়া উটের উপর তুলিয়া লইয়া যায়।

আবূ হুরায়রার অন্য এক হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আহলে সুফ্ফাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আসার জন্য আদেশ করিলেন। আমি তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে এক খাবার পিয়ালা রাখা ছিল। উহা হইতে আমরা সকলে খুব পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পরও পিয়ালা

www.pathagar.com

এরূপ পরিপূর্ণ ছিল, যেমন প্রথমে রাখা ছিল, কেবল মাত্র ইহা ছাড়া যে উহাতে অঙ্গুলির দাগ ছিল। হাদীসটিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি দারুণ ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দুধের পিয়ালা রাখা ছিল। তিনি আসহাবে সুফফাদিগকে ডাকিয়া আনার আদেশ করিলেন। ঐ সময় আমি স্বীয় অন্তরকে বলিলাম, এই দুগ্ধতো অতি সামান্য। আফসোস! যদি ইহা আমাকে দান করা হইত, তা হইলে আমি পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিয়া লইতাম, কিন্তু এখন শরীআত প্রবর্তনকারী (সা)-এর ফরমায়েশ এবং তাহার হুকুম প্রতিপালন করা ছাড়া কোন উপায় নাই। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশক্রমে বাহিরে আগমন করিলাম এবং আসহাবে সুফ্ফাগণকে ডাকিয়া লইয়া গেলাম। আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত তাহারা সকলেই পান করিলেন, কেহ অবশিষ্ট রহিল না। অতঃপর আমাকে পিয়ালা দান করিলেন এবং সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পান করিলেন এবং বলিলেন যে, সম্প্রদায়ের সকলকে পান করানেওয়ালা তাহাদের শেষে পান করিয়া থাকে। (سَاقِي الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ)

হযরত আলী মুরতাযা (কা)-এর হাদীস

হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদিগকে একত্রিত করিলেন। বলা হয়, ইহারা চল্লিশ ব্যক্তি ছিল উহাদের মধ্যে কিছু এমন লোক ছিল যে, পূর্ণ এক একটি বকরী চর্বণ করিয়া ফেলিত এবং শোরবা পর্যন্ত পান করিয়া ফেলিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের জন্য শুধু এক পাত্র খাবার তৈরী করাইলেন। তাহারা সকলেই খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিল এবং অতটুকু খাবার অবশিষ্ট রহিয়া গেল যতটুকু প্রথম ছিল। তারপর এক পিয়ালা পানি আনয়ন করিলেন। উহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া উহা হইতে পান করিল। কিন্তু ঐ পিয়ালার মধ্যে পানি যেমনকার তেমন রহিয়া গেল। ইহা আশ্‌শিফাতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীসে জাবির (রা)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে মালিক আনসারীয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে এক চর্ম-শিশি ঘৃত (চামড়ার ছোট মুখবিশিষ্ট পাত্র) প্রেরণ করিতেন এবং তিনি উক্ত শিশিকে সর্বদা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতেন। একবার উম্মে মালিকের সন্তানরা সালুন চাহিয়া পাঠাইল, গৃহে সালুন জাতীয় কোন কিছুই ছিল না, তখন তিনি সেই শিশির দিকে গমন করিলেন যাহাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘৃত প্রেরণ করিয়া থাকিতেন এবং উহাতে সর্বদা ঘৃত পাওয়া যাইত। তিনি উক্ত শিশি হইতে সমস্ত ঘি বাহির করিয়া লইলেন। (ইহার পর উহাতে আর ঘি পাওয়া যায় নাই) অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, "তুমি উক্ত শিশিকে নিংড়াইয়া লইয়াছ, যদি উহাকে না নিংড়াইতে, তাহা হইলে তুমি উহা হইতে সর্বদা ঘি বাহির করিতে পারিতে।"

ফাইদা

মিসকীন বান্দা (অর্থাৎ শায়খ মুহাক্কিক (র) বলিতেছেন যে, এই হাদীস হইতে জানা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে কেহ খিদমত আনজাম দিয়া থাকে এবং তাহার মহব্বতে যাহা কিছুই ব্যয় করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ব্যয়কৃত রিযিকের মধ্যে বরকত দান করিয়া থাকেন।

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা)-এর অন্য এক হাদীস

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু খাবার চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ষাট সা যব দান করিলেন। পরে উক্ত ব্যক্তি সর্বদা স্বীয় স্ত্রী, সন্তান এবং অতিথিবৃন্দসহ উহা হইতে আহার করিয়া থাকিত। অবশেষে একদিন সে উহা মাপিয়া দেখিল (তখন উহা শেষ হইয়া গেল)। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি তুমি উহা না মাপিতে তাহা হইলে উহা সর্বদা তোমাদের জন্য স্থায়ী থাকিত এবং তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ করিতে পারিতে।

ফাইদা

বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, চর্ম-শিশি হইতে ঘৃত নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লওয়া এবং যবকে মাপিয়া দেখার দরুন যে বরকত চলিয়া গিয়াছে, উহার দর্শন হইল এই যে, নিংড়ান এবং ওযন করা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখার পরিপন্থী এবং প্রচেষ্টা, মাধ্যম ও শক্তিকে অবলম্বন করা। বস্তুতঃ এইরূপ কর্ম যাহারা করিয়াছে তাহাদিগকে নিআমত ধ্বংসে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। ইহাকে ইমাম নববী বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ ডেকচি এবং আটার মধ্যে দৃষ্টিপাত করাকে নিষিদ্ধ করণের মধ্যেও ঐ রহস্য রহিয়াছে যাহা খাদ্য বৃদ্ধিকরণের হাদীসে চলিয়া গিয়াছে।

এই ধারাবাহিকতার মধ্যে ঐ হাদীসটিও প্রসিদ্ধ যাহাকে ইমাম বুখারী হযরত জাবির (রা)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ আনসারীর ঋণ পরিশোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঋণ দাতাগণ আসল টাকা পরিশোধ করার দাবী করিয়াছে এবং কোন আপত্তি গ্রহণ করে না। কারণ, তাহাদের খেজুরের বাগানে এই পরিমাণ খেজুর ছিল না যদ্দারা তাহাদের আসল টাকা পরিশোধ হইতে পারে। ঐ সময় হযরত জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি খুব ভাল করিয়াই জ্ঞাত আছেন যে, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছেন এবং তিনি বহুত ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে, খেজুরগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিগোচর করা হউক। কিন্তু উহা এই পরিমাণে নাই যদ্দারা ঋণের বোঝা নামান যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাও খেজুরের স্তূপগুলি পৃথক পৃথকভাবে এক কোণায় একত্রিত করিয়া লও।" বস্তুতঃ যে নির্দেশ ছিল ঐরূপ আমি করিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লইয়া গেলাম। যখন করযদাতারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইল, তখন উহারা আমার পিছন ধরিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি খেজুরের স্তূপগুলির চতুর্দিকে চক্কর লাগাইলেন এবং সকলের চেয়ে বড় স্তূপের নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, "তোমার করযদাতাদেরকে ডাক।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে মাপিয়া মাপিয়া দেওয়া আরম্ভ করিলেন, এমনকি আমার মরহুম পিতার ঋণ শোধ হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হউক। আমার ভগ্নিদের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক। হযরত জাবির (রা)-এর নয় ভগ্নি ছিল, যাহাদিগকে তাহাদের

www.pathagar.com

সম্মানিত পিতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ বড় স্তূপ হইতেই করযদাতাদের দাবী পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট স্তূপগুলি ঐরূপই রহিয়া গেল। এবং আমি যখন ঐ বড় স্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম যাহার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ রাখিতেছিলেন, তো উহাও যেমনকার তেমন মনে হইতেছিল। তন্মধ্য হইতে একটি খেজুরও কম মনে হইতেছিল না। ঐ সময় করয দাতারাও আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অন্য হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এক হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করিতেছেন যে, মানুষ ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আবূ হুরায়রা! তোমার নিকট কিছু আছে কি? আরয করিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খাদ্যের পাত্রে কিছু খেজুর আছে। বলিলেন, উহা আমার নিকট লইয়া আস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক হস্ত খাদ্যের পাত্রে রাখিলেন এবং উহা হইতে এক মুষ্টি খেজুর বাহির করিয়া বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। তারপর দশ দশ জন করিয়া ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন, এমন কি সমস্ত সৈন্যবাহিনী পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট বলিলেন যে, "যাহা কিছু তুমি লইয়া আসিয়াছিলে উহা লইয়া যাও, এবং খুব হিফাযতের সহিত রাখিয়া দিও। যখন তোমার আবশ্যক হইবে, ঐ পাত্রে স্বীয় হস্ত নিক্ষেপ করতঃ বাহির করিয়া লইও। কখনও উহাকে গণনা করিও না এবং কখনও উল্টাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিও।" আমি যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম উহা হইতে বেশী ঐ পাত্রে পাইলাম। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমস্ত যিন্দেগী ভর এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ফারূকে আযম রাযিয়াল্লাহু আনহুমার খিলাফতের যুগ পর্যন্ত আহার করিয়াছি এবং আহার করিয়া যাইতেছিলাম। তারপর যখন হযরত উসমান যুন্নূরাইন (রা)-কে শহীদ করিয়া দেওয়া হয় এবং আমার গৃহকে লুণ্ঠন করা হয়, তখন ঐ ভাণ্ড আমার হস্ত হইতে চলিয়া যায়। অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি বহু ওয়াসাক খেজুর উহা হইতে বাহির করিয়া খোদার রাস্তায় বণ্টন করিয়াছি, অথবা উটের উপর বোঝাই করিয়া দিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়, আর সাড়ে চার সেরে এক সা' হয়। ওলামা কিরাম বর্ণনা করেন যে, খাদ্য পাত্রে সর্বমোট মাত্র দশ দানা খেজুরের বেশী ছিল না। কেহ কেহ বলেন যে, একশত দানার বেশী ছিল না। 'রওযাতুল আহবাবে" এই অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে একটি কবিতাও উল্লেখ করা হইয়াছে উহা এই ঃ

اَلنَّاسُ هُمْ ولى فى اليوم همان * هم الجزاب وهم الشيخ عثمان

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে উটের উপর খেজুরের বোঝা ঠিক করার জন্য হুকুম দেন, এমনকি সামান্য সময়ের মধ্যে খেজুর দ্বারা চারিশত উটকে বোঝাই করিয়া দেওয়া হয়। আর ঐ খেজুর ঐ রকমই রহিয়া যায় যেন উহা হইতে একটি দানাও কম মনে হইতেছিল না।

মোটকথা, খাদ্য বৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে বহু হাদীস রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হইল তাবূকের যুদ্ধের কাহিনী। কেননা উচ্ছিষ্ট থাকিয়া যাওয়া অবশিষ্ট সামান্যতম পাথেয়ে

www.pathagar.com

এমন বরকত দান করা হয় যে, সত্তর সহস্র সৈন্য উহা হইতে না শুধু পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিয়াছিল, বরং স্ব স্ব পাত্রসমূহে সংরক্ষণও করিয়া লইয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে ও সমগ্র বিশ্বের নেতা, সমস্ত সৃষ্টির গৌরব (তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠ দরূদ ও সালাম নাযিল হউক)-এর যাবতীয় বরকত হইতে যেন বঞ্চিত না রাখেন। আর দরিদ্র ক্ষুধার্তকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাহিরী এবং বাতেনী নিআমতের দ্বারা যেন পরিবর্তিত করিয়া দেন (আমীন)। এই সময় আমার ঐ কাহিনী স্মরণ হইয়া গেল, যাহা মক্কা মুকাররমার বাজারে শসা বিক্রেতা স্বীয় শসার উপর পানি ছিটাইয়া যাইতেছিল আর বলিয়া যাইতেছিল ঃ

يَا بَرْكَةَ النَّبِيِّ تَعَالَى وَانْزِلِي ثُمَّ تَرْتَحِلِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

জীবজন্তুর কথা বলা এবং আনুগত্য করা

যেরূপ মানুষের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশাবলী, দীন ও শরীআতের অনুগমন ও অনুসরণ করা এবং নির্দেশসমূহের প্রতিপালন করা ওয়াজিব ও ফরয হইয়া থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা পশুপক্ষিদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত ও ফরমাবরদার বানাইয়াছেন। কেননা, সৌভাগ্যের জয়টীকা মানবকুলের মধ্যে ঈমানদারগণ লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিক উপায়ে প্রকৃতির পরিপন্থী সকল পশুপক্ষীকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত ও বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণ এবং আধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, নবী করীম (সা)-এর রিসালত সকল পশুপক্ষী, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, জড় পদার্থ এবং সমস্ত জীবের প্রতিই। কিন্তু যেহেতু উহারা বিবেকের গণ্ডি এবং আদেশ ও নিষেধের গণ্ডি হইতে বহির্ভূত, এই জন্য উহাদের নিকট হইতে কেবলমাত্র আনুগত্য, বিশ্বাস এবং রিসালতের সত্যতার স্বাক্ষ্যদান করা ছাড়া আর কিছু ধারণা করা যায় না এবং উহারা মানুষের ন্যায় গুনাহর সহিত সম্পৃক্তও নয়।

পশুসমূহের কথা বলা

এখন পশুসমূহের মধ্যে অলৌকিকত্বের বিকাশের আলোচনা রহিয়া গেল। তন্মধ্য হইতে একটি তো হইল উটের সিজদা করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে স্বীয় অভিযোগ পেশ করা। এই মর্মে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণের প্রত্যেকেই উট পালিত। তাঁহাদের মধ্য হইতে জনৈক আনসার বিশ্বনেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া আরয করিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি উট আছে যদ্দারা আমি পানি বহন করিয়া থাকি, এখন সে অবাধ্যতা ও উগ্রতা প্রদর্শন করিতে শুরু করিয়াছে। আর সে স্বীয় পৃষ্ঠের উপর আমাকে বোঝা উঠাইতে নিষেধ করিতেছে। আমাদের খেজুরের বাগান এবং অন্যান্য বাগিচাসমূহ সকলেরই পানির প্রয়োজন। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সাহাবীবৃন্দসহ উঠিয়া উটের দিকে তাশরীফ লইয়া গেলেন। যখন বাগানে পৌঁছিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, ঐ সময় উট উহার এক কোণায় বসা অবস্থায় ছিল। উক্ত আনসার আরয করিতে লাগিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সেই উট যে কুকুরের ন্যায় কামড় দেয়, আমার ভয় হয়

www.pathagar.com

যে, কখন আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসিত সত্তাকেও সে কষ্ট না দিয়া বসে। বলিলেন, আমার জন্য কোন ভয় করিও না। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত উটের সম্মুখে আগমন করিলেন, তখন সে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিল। দেখা মাত্রই মস্তককে তাঁহার সম্মুখে সিজদায় রাখিয়া দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উটের কপালের চুল ধারণ করিলেন এবং উহাকে কার্যে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই নির্বোধ পশু যখন আপনাকে সিজদা করিতে পারে, তো আমাদের বেশী অধিকার রহিয়াছে যে, আমরা আপনাকে সিজদা করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যে, কোন মানুষের না এইরূপ করা উচিত এবং না ইহা তাহার জন্য উপযুক্ত হইবে যে, দ্বিতীয় এক মানুষকে সে সিজদা করিবে। যদি এক মানবের দ্বিতীয় মানবকে সিজদা করা সিদ্ধ হইত, তো আমি স্ত্রীদিগকে নির্দেশ দিতাম যে, তাহারা যেন স্বীয় স্বামীদিগকে বিরাট দায়িত্বের প্রেক্ষিতে সিজদা করে। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ ও নাসাঈ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, উক্ত স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন সৃষ্টজীব এমন নাই যে, এই কথা জানে না যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল, একমাত্র নাফরমান জিন্ন ও ইনসান ছাড়া। অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, ঐ লোক উক্ত উটকে যবাহ করিতে চাহিয়াছিল ঐ সময় উট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঐ সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছিল। অন্য এক হাদীসে আছে যে, উট উপস্থিত হইয়া স্বীয় গর্দানকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে রাখিয়া দেয় এবং স্ব আওয়াযের মাধ্যমে ফরিয়াদ করিতে থাকে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার মাথার চুল ধরিয়া উহাকে উত্তোলন করেন এবং উহার মালিকের নিকট বলেন যে, এই উটকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। সে আরয জানায়, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা আপনার খিদমতে উপস্থিত আছে, কিন্তু এই উট গৃহকর্ত্রীর জন্য। তাহার জন্য ইহা ছাড়া আর কোন উপায়ের পথ নাই। তিনি বলিলেন, এই উট অত্যধিক কার্যের এবং অল্প খোরাকের কথা অভিযোগ করিতেছে। তুমি উহার সহিত নরম ব্যবহার করিও এবং উহার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। এই হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে এবং হাদীসটি শুদ্ধ।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (তাঁহার উপর সকল প্রশংসা ও দরূদ) হযরত আবূ বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সহিত এক আনসারীর বাগিচায় তাশরীফ লইয়া যান। তথায় একটি বকরী ছিল। উক্ত বকরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বেশী উপযুক্ত যে, আমরা আপনাকে সিজদা করিব। তিনি বলিলেন, "কোন মানুষের জন্য শোভা পায় না যে, সে অপর মানুষকে সিজদা করিবে" (শেষ হাদীস পর্যন্ত)

একবার এক উট নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, উহারা ইশার নামায পড়ার পূর্বেই শয়ন করিয়া থাকে। আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের উপর শাস্তি নাযিল করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত কওমকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ইশার নামাযের পূর্বে শয়ন করাকে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন যে, আমাদের ঘরে একটি বকরী ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের এইখানে আরামের নিদ্রা যাইতেন, তখন উক্ত বকরী নিশ্চুপ, শান্ত,

www.pathagar.com

আরামে ও নিশ্চিন্তে থাকিত। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহিরে তাশরীফ লইয়া যাইতেন, তখন উক্ত বকরী পেরেশান, অশান্ত ও উদভ্রান্ত হইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত।

এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উট কুরবানী করিতেন, প্রত্যেক উট একে অপরকে সরাইয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে আসার জন্য চেষ্টা করিত, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাকে প্রথম যবাহ্ করিতে পারেন।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক হস্তকে উম্মে মা'বাদের বকরীর স্তনের উপর বুলাইয়া নেন, যাহার দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। উহার স্তন ঐ সময়ই দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি উহার দুগ্ধ দোহন করিয়া নিজেও পান করেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীককেও পান করান। উম্মে মা'বাদের এই বকরীর প্রসিদ্ধ কাহিনী ইনশা আল্লাহ্ হিজরতের অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবে। এই ধরনের বহু হাদীস আহার্য বস্তু বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। এবং পশুসমূহের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর ক্ষেত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

নেকড়ে বাঘের কথা বলা

এই পরিপ্রেক্ষিতে নেকড়ে বাঘের কথা বলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য দান করার ঘটনাও একটি। নেকড়ে বাঘ কর্তৃক কথা বলার হাদীসকে সাহাবাদের জামাআত বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে হাদীস রিওয়ায়াত করিতেছেন। তিনি বর্ণনা করিতেছেন যে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং বকরীকে স্বীয় পাঞ্জার মধ্যে নিয়া নেয়। কিন্তু রাখাল দৌড়াইয়া আসিয়া বকরীকে উহার পাঞ্জা হইতে ছাড়াইয়া লয়। ইহার পর হিংস্র পশুদের সাধারণ স্বভাব অনুযায়ী নেকড়ে বাঘ নিজ নিঃশ্বাসের উপর ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে, "হে রাখাল! তুই আল্লাহ্কে ভয় করিস না যে, তুই আমার এই রিযিককে ছিনাইয়া লইয়া গেলি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুষ্টির মধ্যে দিয়াছিলেন ?" রাখাল বলিল যে, "সুবহানাল্লাহ্! তাআজ্জুব ব্যাপার! নেকড়ে বাঘ মানুষের মত কথা বলিতেছে"? অতঃপর ব্যাঘ্র বলিল, তোকে ইহার চাইতেও কি অধিক আশ্চর্যজনক কথা শুনাইব না যে, মুহাম্মদ (সা) পবিত্র মদীনায় লোকদিগকে অতীতকালের ঘটনাসমূহ এবং সংবাদসমূহের সংবাদ দান করিতেছেন এবং লোকেরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না!" তারপর রাখাল ঐ বকরীগুলিকে এক কোণায় একত্রিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত সে মদীনা মুনাওয়ারায় নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল লোককে আহ্বান করার জন্য সাধারণ ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করিলেন। যখন সকল লোক একত্রিত হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাখালকে বলিলেন যে, যাহা কিছু তুমি শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ উহা সকলই বর্ণনা কর। অনুরূপভাবে বায়হাকী হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে এবং আবূ নুআয়ম হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতকে শুদ্ধ সূত্রের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্যাঘ্র বলিল যে, ইহার চেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হইল এই যে, এক

www.pathagar.com

ব্যক্তি হারামায়নের মধ্যবর্তী খেজুরের বাগানসমূহের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থাসমূহ বর্ণনা করিতেছে!" এই রাখালটি ইয়াহূদীরা ছিল, সে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ঈমান আনয়ন করিল। কোন কোন সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, ব্যাঘ্র রাখালকে বলিল যে, আমার তুলনায় তোর অবস্থা আরো আশ্চর্যজনক যে, তুই বকরীর পালের সহিত দাঁড়াইয়া আছিস্ এই রকম সম্মানিত নবীকে ত্যাগ করিয়া যাহার চেয়ে সুমহান এবং বিরাট মর্যাদাবান কোন নবী আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেন নাই। নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্য বেহেশতের সকল দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জান্নাতবাসী এবং উহার সকল অধিবাসী সম্মান লাভ করিয়াছেন, এবং এখন বেহেশত তাহার শহীদদের জন্য প্রতীক্ষায় আছে। অর্থাৎ জান্নাতের হূর ও গেলমান এবং ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবে এবং সে অপেক্ষমাণ ও আগ্রাহান্বিত যে, কখন তাহারা নিহত ও শাহাদাত বরণ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহার পর ব্যাঘ্র রাখালকে বলিল যে, তোর আর তাঁহার মাঝখানে একমাত্র এই পাহাড়ের টিলা ছাড়া কোন বস্তু অন্তরায় নাই। তুই পাহাড় হইতে হযরত-এর খিদমতে যা এবং নিজকে আল্লাহ্র সৈন্যের মধ্যে পরিগণিত কর। রাখাল বলিল, তাহা হইলে বকরীগুলিকে কে চরাইবে। ব্যাঘ্র বলিল যে, আমি উহাদের দেখাশুনা করিব। অতঃপর সে দরবারে নববীতে আগমন করিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং ঐ সকল বকরীর মধ্য হইতে সে একটি বকরীকে ব্যাঘ্রের জন্য যবাহ করিয়া দিল।

ইহারই সদৃশ হযরত আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব এবং সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা হইতেও একটি রিওয়ায়াত আছে যে, এক ব্যাঘ্র এক হরিণের পিছনে ধাওয়া করিতেছিল। যখন হরিণ হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ব্যাঘ্র ফিরিয়া চলিয়া গেল। লোকেরা ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিল। ইহার পর ব্যাঘ্র বলিল যে, ইহার চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা হইল এই যে, পবিত্র মদিনায় মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (সা) তোমাদিগকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করিয়া থাকেন, আর তোমরা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাও! ইহার উপর আবূ সুফিয়ান সাফওয়ানকে বলিল যে, লাত ও উযযার শপথ! যদি তোমরা এই আলোচনা পবিত্র মক্কায় কর, তাহা হইলে মক্কার মহিলারা পুরুষ ব্যতিরেকেই জীবন যাপন করিবে এবং আবূ জাহল এবং তাহার সাথীদের সহিতও লোকেরা এইরূপ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে।

এই জাতীয় ঘটনার মধ্য হইতে গুঁইসাপ-এর কথা বলার হাদীসও প্রসিদ্ধ। যাহাকে আল্লামা বায়হাকী বহু হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ক্বাযী ইয়ায (র) কিতাবুশ শিফাতে হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) স্বীয় সাহাবা-ই-কিরামের মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ বনূ সুলায়মের এক বেদুঈন গুঁইসাপ শিকার করিয়া লইয়া আসিল। সে উহাকে তাহার আস্তীনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এইজন্য যে, সে অবস্থানকৃত স্থানে ফিরিয়া যাইয়া উহাকে ভুনিয়া খাইবে। সেই বেদুঈন একদল মানুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল যে, দলের মধ্যে এই ব্যক্তি কে ? সাহাবাগণ বলিলেন যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন সে স্বীয় জামার আস্তীনের মধ্য হইতে গুঁইসাপটি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল যে, লাত ও উযযার শপথ! আমি কখনও ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিব না

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত এই গুঁইসাপটি তাঁহার সাক্ষ্য দান না করিবে। এই বলিয়া সে গুঁইসাপকে নবী (সা)-এর সম্মুখে ছাড়িয়া দিল। নবী (সা) গুঁইসাপকে ডাক দিলেন, হে গুঁইসাপ! গুঁইসাপ পরিশুদ্ধ ভাষায় উত্তর দিল, "লাব্বায়ক, ও সা'দায়ক", উপস্থিত আছি, অনুগত আছি। যাহা সমস্ত দল শ্রবণ করিল। তারপর নবী (সা) বলিলেন, হে গুঁইসাপ! কিয়ামতের দিন কে আসিবে? গুঁইসাপ উত্তর দিল, সমস্ত সৃষ্টজীব আসিবে। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কাহার ইবাদত করিস। গুঁইসাপ জবাব দান করিল, ঐ আল্লাহ্ পাকের, যাহার আরশ হইল আকাশে এবং যাহার বাদশাহী হইল মাটিতে এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর যাহার আধিপত্য এবং জান্নাতে তাহার রহমত এবং জাহান্নামে তাহার শাস্তি রহিয়াছে। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন যে, আমি কে ? সে উত্তর দিল, আপনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র রাসূল এবং আপনি সর্বশেষ নবী। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সে সফলকাম হইয়াছে এবং যে আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, সে অকৃতকার্য হইয়াছে। এতদ্শ্রবণে উক্ত বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে।

হরিণের বাক্যালাপ

হরিণের কথা বলাও এই জাতীয়ের মধ্য হইতে একটি, যাহাকে হাদীসের ইমামগণ বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করতঃ একটিকে অপরটি হইতে শক্তিশালী বানাইয়া থাকেন। কাযী ইয়ায শিফার মধ্যে এবং আবূ নুআয়ম দালায়েলের মধ্যে উম্মে সুলায়ম হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, নবী আকরাম (সা) জঙ্গলের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনবার 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' শব্দ শুনিতে পাইলেন। নবী (সা) উক্ত শব্দের দিকে লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন এক হরিণী বন্ধনাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এক বেদুঈন চাঁদর গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিনি হরিণীকে বলিলেন যে, "বল, তোর কি প্রয়োজন" ? হরিণী বলিল যে, আমাকে এই বেদুঈন শিকার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমার দুই বাচ্চা ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে আছে, আপনি যদি আমাকে মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বাচ্চাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া চলিয়া আসিব। নবী (সা) বলিলেন, তুই কি এইরূপ করিবি ? এবং ফিরিয়া আসিবি? হরিণী বলিল, যদি আমি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে আল্লাহ্ আমাকে ঐ শাস্তি যেন দান করেন যে শাস্তি খাজনা আদায়কারীদের প্রতি করা হইয়া থাকে।" অতঃপর নবী (সা) উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরিয়া আসিল এবং নবী আকরাম (সা) উহাকে বাঁধিয়া দিলেন। যখন বেদুঈন জাগিয়া উঠিল, তখন সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কোন কিছু ইচ্ছা আছে কি? তিনি বলিলেন, এই ইচ্ছা আছে যে, তুমি এই হরিণীটিকে মুক্ত করিয়া দিবে তখন উক্ত বেদুঈন হরিণীটিকে ছাড়িয়া দিল। সে অতি আনন্দের সহিত জঙ্গলের দিকে দ্রুত নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। এবং বলিয়া যাইতেছিল وَ اَشْـهَدُ ان لا اله الا اللّٰه مُحَمَّد رسول اللّٰه (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। বাহিনীর সকল লোক পিপাসার্ত ছিল। তাহারা পানির স্থানে অবতরণ করিল। ঐ সময় এক হরিণী

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে আসিল। তিনি উহার দুগ্ধ দোহন করিলেন এবং সমস্ত লশকরকে পরিতৃপ্ত করিয়া পান করাইলেন। এই বাহিনীতে প্রায় তিনশত সৈন্য ছিল। হযরত রাফে' হইতে যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম ছিলেন— বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, এই হরিণীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। সে উহাকে বাঁধিয়া রাখিল, কিছুক্ষণ পর দেখিল যে, সে পালাইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যিনি উহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই উহাকে লইয়া গিয়াছেন।

গর্দভের কথা বলা

এই সকলের মধ্যে গর্দভের কথা বলাও একটি। ইহাকে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার বিজয় করেন, তখন এক গর্দভ তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, আমার নাম ইয়াযীদ ইব্ন শিহাব, আল্লাহ্ তা'আলা আমার দাদার বংশ হইতে ষাটটি এহরূপ গাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার উপর একমাত্র নবী ব্যতীত অন্য কেহ আরোহণ করে নাই এবং আমি এই আশা রাখি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহনের মর্যাদা লাভ করিব। আমার দাদার বংশের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নাই এবং আপনি ছাড়া আর কোন নবীও আগমনকারী নাই। সে বলিল যে, আমি আপনার পূর্বে এক ইয়াহূদীর অধীনে ছিলাম। যখন সে আমার উপর আরোহণ করার চেষ্টা করিত, তখন আমি ইচ্ছা করিয়াই লম্ফঝম্প করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিতাম এবং তাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে দিতাম না। উক্ত ইয়াহূদী ক্রোধের বশীভূত হইয়া আমাকে ভুখা রাখিত। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাকে বলিলেন যে, ভবিষ্যতে তোর নাম 'ইয়াগফুর' হইবে। এই ইয়াগফুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির থাকিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উহাকে কাহাকেও ডাকিতে পাঠাইতেন, সে উহার দরজায় যাইত এবং নিজ মস্তক দ্বারা দরজায় আঘাত করিত। যখন বাড়ীর মালিক বাহিরে আগমন করিত, তখন সে ইশারা করিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন এবং সে তাহাকে লইয়া আসিত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাত পান, তখন ইয়াগফুর দুঃখে-বেদনায় ও বিচ্ছেদের শোকে আবূ সাহম ইব্ন সাহানের কূপের মধ্যে স্বেচ্ছায় লম্ফ দিয়া পড়িয়া নিজকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

ব্যাঘ্রের বশ্যতা স্বীকার

এই অধ্যায়ে এই জাতীয় বিষয়ের মধ্য হইতে ব্যাঘ্রের বশীভূত হওয়া এবং হযরত সাফীনা (রা)-এর উহাকে খোশামোদ করা। কারণ, যখন হযরত সাফীনা (রা) সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইয়া রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি ব্যাঘ্রকে বলিয়াছিলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাস, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, তখন ব্যাঘ্র তাহাকে সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

ইব্ন ওয়াহ্ব বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কবুতররা পবিত্র মক্কায় ছায়াদান করিয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাদের জন্য বরকতের দু'আ করেন। অনুরূপ হিজরতের সময় গারে ছাওরের মধ্যে মাকড়সার জাল তৈরী করা আর

www.pathagar.com

উহার উপর কবুতরের ডিম দেওয়ার ঘটনাও প্রসিদ্ধ। বলা হইয়া থাকে যে, গারে ছাওরে যে কবুতরগুলি ডিম দিয়াছিল, হারাম শরীফের কবুতরগুলি উহাদেরই বংশধর। এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছোট একটি বৃক্ষকে নির্দেশ দেন যে, তুমি মানুষের গঠনের সমান উঁচু হইয়া গুহাকে ঢাকিয়া ফেল। ইহাকে ক্বাযী ইয়ায (র) 'শিফা'তে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, জীবজন্তু ও পশুর কথা বলা এবং উহাদের আনুগত্য ও পায়রবীর বিষয়ে বহুত হাদীস বর্ণিত আছে উহার মধ্যে যে সকল হাদীস প্রসিদ্ধ এবং ইমামগণ যেগুলি সম্পর্কে তাহাদের কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমিও ঐগুলিই উল্লেখ করিলাম।

বৃক্ষ তরুলতার আনুগত্য

যেরূপভাবে সমস্ত জীবজন্তু ও পশু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত ও বশীভূত ছিল, অনুরূপভাবে বৃক্ষ, তরুলতারাও অনুগত ও ফরমাবরদার ছিল। এই অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বৃক্ষসমূহের কথা বলা, তাঁহার প্রতি সালাম নিবেদন করা, তাঁহার রিসালতের সাক্ষ্য দান করা এবং তাঁহার নির্দেশ প্রতিপালন করা সম্পর্কে বর্ণিত হইবে। উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যখন হইতে আমার প্রতি ওহী অবতারিত হইয়াছে ঐ সময় হইতে প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর আমার প্রতি 'আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' নিবেদন করিয়া থাকে।

হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত পবিত্র মক্কার কোন এক দিকে যাইতেছিলাম। পথের মধ্যে যে সকল গাছপালা অথবা পাহাড় পাওয়া যাইত, উহারা বলিত, "আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্"। ইহাকে ইমাম তিরমিযী রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই সকল রিওয়ায়াত হইল ঐ সময়কার, যখন তাঁহার ওহীর প্রাথমিক যুগ ছিল। যেমন এই মর্মে প্রথম হাদীসে চলিয়া গিয়াছে। অথবা ইহা কোন অন্য সময়ের হাদীস হইবে।

হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদের সহিত হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এক ভ্রমণে ছিলাম। এক বেদুঈন সম্মুখে আসিল। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্নিকট আসিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট যাইতেছি। তিনি বলিলেন, তোমার কি কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা আছে? অর্থাৎ তোমার কি এই ইচ্ছা হয় যে, তোমার নিজের জন্য নেকী ও সৌভাগ্য অর্জন হউক। সে জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি? তিনি বলিলেন যে, এই সাক্ষ্য দান করা যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি অদ্বিতীয় এবং তাহার কোন শরীক নাই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা) তাহার বান্দা ও রাসূল।" বেদুঈন বলিল, ইহার উপর আপনার কি কোন সাক্ষ্য আছে? অর্থাৎ যাহা কিছু বলিলেন, ইহার কোন সাক্ষী আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই গাছ আমার সাক্ষী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ বৃক্ষটিকে আহ্বান করিলেন যাহা ঐ জঙ্গলের কিনারায় ছিল। ঐ বৃক্ষ মাটি চিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর তিনি উহার নিকট

www.pathagar.com

হইতে তিনবার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ঐ বৃক্ষ সাক্ষ্য দান করে, ইহার পর ঐ বৃক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করে। (শেষ হাদীস পর্যন্ত) দারিমীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উহুদের যুদ্ধের মধ্যে অসভ্য কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আঘাত করে। তাঁহার পবিত্র দাঁতের ক্ষতি সাধন হয় এবং পবিত্র শরীর রক্তাক্ত হইয়া যায়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কোণায় অবস্থান করিতেছিলেন। জিবরাঈল (আ) আসিয়া তাঁহার মেযাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে চিন্তিত দেখিতে পাইয়া আরয করিলেন, আপনি কি পসন্দ করিবেন যে, আমি আপনাকে এমন এক নিদর্শন দেখাইব, যাহা হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে! ইহার পর জিবরাঈল (আ) ঐ বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহা জঙ্গলের পিছনে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উক্ত বৃক্ষকে আহবান করার জন্য আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত বৃক্ষটিকে আহবান করিলেন। বৃক্ষটি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর জিবরাঈল আরয করিলেন, এখন আপনি উহাকে স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করার আদেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করিলেন। তখন সে চলিয়া গেল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যে, "হাস্বী, হাস্বী"— আমার যথেষ্ট হইয়াছে, আমার যথেষ্ট হইয়াছে। ইহাকে হযরত আনাস (রা) হইতে আল্লামা দারিমী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত বারীদা আস্লামী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেদুঈনের নিকট বলিলেন যে, ঐ বৃক্ষকে বল যে, আল্লাহ্র রাসূল তোকে ডাকিতেছেন। উক্ত বৃক্ষ এদিক-ওদিক, অগ্র-পশ্চাৎ নড়া-চড়া করিল, এবং মাটি হইতে স্বীয় বিস্তারকৃত শিকড়সমূহকে উত্তোলন করতঃ মাটি চিড়িয়া শিকড় ছেঁচড়াইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল, আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর বেদুঈন বলিল যে, এখন এই বৃক্ষকে স্বস্থানে চলিয়া যাওয়ার হুকুম দান করুন। অতঃপর সে, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং উহার শিরা, উপশিরা, মাটিতে সংস্থাপিত হইয়া গেল এবং মাটিও সমতল হইয়া গেল। ইহার পর বেদুঈন আরয করিল, আমাকে আপনাকে সিজ্দা করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার অনুমতি দিলেন না। তারপর সে আরয করিল, তাহা হইলে আমাকে আপনার পবিত্র হস্ত ও পা মুবারক চুম্বন দান করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার অনুমতি প্রদান করেন।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক সফরের মধ্যে উটের উপর আরোহণ করিয়া অন্ধকার রাত্রে ঘুমন্তাবস্থায় তশরীফ লইয়া যাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় বাহনের সম্মুখে কুলবৃক্ষ পতিত হয়। উহা তৎক্ষণাৎ দুই টুকরা হইয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিরাপদের সহিত চলার পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কুলবৃক্ষের নাম "সেদ্‌রাতুন্নবী" সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রসিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়া যায়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলে যে, আমি কিরূপে জানিতে পারিব যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল ? তিনি বলিলেন যে, এইভাবে যে, আমি খেজুরের ডালকে ডাকিয়া আনিতেছি। সে সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল হই। তারপর সেই ডাল গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ডালকে

www.pathagar.com

বলিলেন যে, "যা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যা।" তখন সেই ডাল স্বীয় স্থানে সংস্থাপিত হইয়া গেল। ইহার পর সেই বেদুঈন ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। এই ঘটনাটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বীয় স্থানে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বৃক্ষের আগমন করা, সালাম নিবেদন করা, তারপর স্বস্থানে প্রস্থান করা সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এক কাসীদায় আছে ঃ

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الاَشْجَارُ سَاجِدَةً * تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلاَقَدَمٍ

كَاَنَّمَا سَطَرَتْ سطرا لما كتب * فروعها من بديع الخط فى اللقم

হযরত জাবির (রা) হইতে সুদীর্ঘ এক হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা উন্মুক্ত ময়দানের মধ্যে তাঁবু করিলাম। নবী আকরাম (সা) পায়খানা করার জন্য তাশরীফ লইয়া যান। আমিও পিছনে পিছনে পানির লোটা লইয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও পর্দা করার স্থান ছিল না। হঠাৎ ময়দানের দূরে এক কিনারায় দুইটি বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ বৃক্ষের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তারপর তিনি গাছের ডালকে ধরিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে আমার পায়রবী কর। তখন সে ডাল তাহার এমন পায়রবী করিতে লাগিল যে, যেমন লাগাম পরিহিত উট অনুগত হইয়া থাকে। তারপর সে অন্য বৃক্ষটির প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি বর্ণনা করেন যে, উহার ডালসমূহ পরস্পর একত্রিত হইয়া আমা হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোপন করিয়া লইল। অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন হে জাবির! ঐ বৃক্ষকে বল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছেন যে, তোর পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের সহিত মিলিয়া যা, যাহাতে আমি তোদের দুইজনের পিছনে বসিতে পারি। আমি যাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই বৃক্ষকে বলিয়া দিলাম। তখন সে অপর বৃক্ষের সহিত মিলিত হইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ বৃক্ষদ্বয়ের পিছনে বসিয়া গেলেন। আমি বাহির হইয়া আসিলাম এবং দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং মনে মনে কথা বলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ লইয়া আসিতেছেন এবং ঐ বৃক্ষ দুইটি পৃথক হইয়া স্ব, স্ব, স্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

অনুরূপভাবে হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট বলিলেন যে, তুমি রাসূলে করীমের পায়খানার জন্য কোন স্থান দেখিয়াছ? আরয করিলাম, এই উপত্যকার মধ্যে লোকশূন্য কোন স্থান দেখি নাই। খেজুর বৃক্ষ, অথবা কোন পাথর দেখিতে পাইয়াছ? আরয করিলেন যে, জী হাঁ, কাছাকাছি খেজুরের বৃক্ষরাজি দেখিয়াছি বলিলেন যাও, ঐ বৃক্ষগুলির নিকট বল যে, রাসূলে খোদা তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের পায়খানার কার্য সমাধা করার জন্য পরস্পর একত্রিত হইয়া যাও এবং পাথরসমূহকেও এই কথাই বলিও। আমি যাইয়া এই কথাই বলিলাম। শপথ সেই সত্তার, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি ঐ বৃক্ষসমূহ একে অপরের নিকটবর্তী হইয়া গেল এবং পাথর টুকরা পরস্পর জোড়া লাগিয়া গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া বলিলেন, যাও

www.pathagar.com

উহাদিগকে পৃথক হইয়া যাইতে বল। এই প্রকার মু'জিযা ও অলৌকিকত্বের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা প্রশ্ন করিল, কোন বস্তু আপনার রিসালাত বা নুবুওয়াতের সাক্ষ্য দান করিবে ? তিনি বলিলেন, এই বৃক্ষ আমার নুবুওয়াতের সাক্ষ্য দান করিবে। বলিলেন হে বৃক্ষ! নিকটে আয়! বৃক্ষটি নিকটে চলিয়া আসিল এবং সাক্ষ্য প্রদান করিল। ক্বাযী ইয়ায (র) বলেন যে, বিরাট ও শ্রেষ্ঠ সম্মানিত সাহাবীদের বহু দল এই কিস্‌সার উপর ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। তাবিঈদের জামাআত ইহার অতিরিক্ত। (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সকলের উপর নাযিল হউক।

জড় পদার্থসমূহের আনুগত্য প্রদর্শন

যেরূপভাবে বৃক্ষ তরুলতারাজিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুমের অনুগত এবং ফরমাবরদার বানান হইয়াছে, তদ্রূপ জড় পদার্থকে তাঁহার হুকুমের অনুগত ও বশীভূত করা হইয়াছে। উহারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র খিদমতে সালাম নিবেদন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিত। যেমন পূর্বে চলিয়া গিয়াছে যে, এমন কোন গাছপালা ও পাথররাজি নাই, কিন্তু যাহারা প্রতি সালাম পেশ এমন এবং তাহারা "আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" বলিয়া থাকে। হযরত আলী মুরতাযা এবং সায়্যিদা আইশা (রা) হইতেও এই মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরত জাবির (রা) হইতেও বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে রাহিবের সেই হাদীস যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবের সাথে নুবুওয়াতের পূর্বে পবিত্র জীবনের প্রথম দিকে সফরে বাহির হইয়াছিলেন, ঐ সময় কোন বৃক্ষ ও পাথর এমন ছিল না যে, উহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা না করিয়াছে। ইনশা আল্লাহ্ এই কাহিনী যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে জাবির ইব্ন সামুরা কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি ঐ পাথরকে চিনিয়া থাকি যে, নুবুওয়াতের পূর্বে পবিত্র মক্কায় আমাকে সালাম করিয়া থাকিত। আমি উহাকে ভাল করিয়া জানি। লোকদের মধ্যে এই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে যে, ঐ পাথর কোন্‌টি। কেহ বলে যে, উহা হাজরে আসওয়াদ হইবে। কেহ বলে উহা ব্যতীত ঐ গলির অন্য কোন পাথর হইবে যাহাকে "যুকাকুল হাজার" বলা হইয়া থাকে, যাহা সায়্যিদা খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর গৃহে যাইবার পথে রাস্তার এক প্রাচীরের গায়ে লাগান আছে। লোকেরা উহাকে স্পর্শ করিয়া বরকত লাভ করিয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, এই পাথরটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চলার সময় সালাম পেশ করিয়া থাকিত।

শায়খ ইব্ন হাজর মক্কী হাশেমী বলেন যে, মক্কাবাসীদের নিকট হইতে একের পর এক বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত পাথর এই যুকাকুল হাজার হইবে এবং এই পাথরই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চলার সময় সালাম করিয়া থাকিত। উহার বিপরীত অপর প্রাচীরের গায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কনুই-এর চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা এক পাথরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত রহিয়াছে। ওলামা কিরাম বলেন যে, আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামদের জন্য পাথর এবং লোহাকে নরম

www.pathagar.com

করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মক্কা মুকাররমার ঐ পাহাড়ে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরী চরাইতেন তাঁহার পবিত্র পদদ্বয়ের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার আবূ হাফ্স মিঁয়াজীর নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, পবিত্র মক্কার অধিবাসীদের মধ্য হইতে যাহার সহিতই আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাহারা এই কথাই বলিয়াছে যে, যে পাথরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করিত উহা এই "যুকাকুল হাজারের" গলির পাথরই ছিল।

এই অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আর সময় গৃহের প্রতিটি প্রাচীর ও খুঁটিসমূহের আমীন বলাও। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস এবং তাহার সন্তানাদির জন্য দু'আ করেন, যাহাকে বায়হাকী 'দালায়েল"-এর মধ্যে এবং ইব্ন মাজা 'মাহযার'-এর মধ্যে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর নিকট বলিলেন, কল্য তুমি এবং তোমার সন্তানাদি ঐ সময় পর্যন্ত গৃহ হইতে বাহির হইও না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না আসিয়া পৌঁছিব এই জন্য যে, তোমাদের কাছে আমার প্রয়োজন আছে, তোমরা সকলে আমার প্রতীক্ষা করিও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাশতের নামাযের সময় তাহার গৃহে তাশরীফ আনয়ন করতঃ বলিলেন, আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে তোমাদের সকাল হইয়াছে। তাহারা আরয করিলেন, আলহামদু লিল্লাহ ভালরূপেই সকাল হইয়াছে। বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিত হইয়া বসিয়া যাও। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের উপর স্বীয় চাঁদর মুবারক নিক্ষেপ করিলেন এবং দু'আ করিলেন, "হে পরওয়ারদিগার! ইনি আমার চাচা এবং আমার পিতার সমআকৃতি বিশিষ্ট এবং ইহারা সকলে আমার বংশধর। তুমি ইহাদিগকে দোযখের অগ্নি হইতে এইরূপ গোপন করিয়া রাখ যেরূপ আমি ইহাদিগকে নিজ চাঁদরের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছি।" ইহার উপর গৃহের প্রতিটি প্রাচীর, দরজা এবং খুঁটিসমূহ আমীন বলিয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেও আমীন আমীন বলিয়াছিলেন।

একবার হযরত আকীল ইব্ন আবী তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এক সফরে পিপাসার্ত হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ঐ পাহাড়ের প্রতি যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ রাখিয়াছিলেন প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ পাহাড়কে বলিও যে, পানি দাও। পাহাড় বাকশীল হইয়া গেল যে, "তুমি রাসূলে করীমের নিকট বলিও যে, যেদিন এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, (وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) "ঐ অগ্নিকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং জিন্ন"—আমি আল্লাহ্র ভয়ে এত ক্রন্দন করিয়াছি যে, আমার দেহে পানিই নাই।

বৃক্ষের কাণ্ডের ক্রন্দনও (হানীনে জিয্আ) এই অধ্যায়েরই শামিল। 'হানীন'-এর অর্থ হইল আকাঙ্ক্ষা করা, ক্রন্দন করা এবং ঐ উটনীর ন্যায় আওয়ায করা যাহার বাচ্চাকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "জিয্আ" জীমের যের এবং কাণ্ডের জযম দিয়া ইহার অর্থ হইল গাছের শাখা। এবং হুনায়নে জিয্আর হাদিস অর্থাৎ বৃক্ষের ডালের ক্রন্দনের হাদীস। সম্মানিত সাহাবীগণের বহু দল রিওয়ায়াত করিয়াছেন, যাহা নিশ্চিত ও ইয়াকীনের পর্যায়ে পৌঁছিয়া

www.pathagar.com

গিয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় শায়খ তাজউদ্দীন সুব্কী হইতে বর্ণিত আছে যে, "শরহে মুখতাসারে ইব্ন হাজিব"-এ বলা হইয়াছে যে, আমার নিকট বিশুদ্ধ এই যে, গাছের কাণ্ডের ক্রন্দনের হাদীসটি হাদীসে মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ভুক্ত এবং এই হাদীসকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ, হাদীসবিদগণের নিকট হইতে বহু পন্থায় বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সীমা-সংখ্যার বাহিরে। সুতরাং ইহা মুতাওয়াতির হাদীস। সম্ভবতঃ অন্য কাহারও নিকট ইহা মুতাওয়াতির নাও হইতে পারে। শয়খ ইব্ন হাজর ফাত্হুল বারীর মধ্যে বলিয়াছেন যে, "হানীনে জিয্আ", শব্দে কমর অর্থাৎ কাণ্ডের ক্রন্দন ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার প্রতিটি উদ্ধৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যাহারা হাদীসের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত রহিয়াছেন তাহাদের জন্য ইহা নিশ্চিতরূপে ফলদায়ক হইবে, উহাদের জন্য নয় যাহাদের হাদীস শাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক নাই।

ইমাম বায়হাকী বলেন যে, উস্তুনায়ে হান্নানার কাহিনী প্রকাশ্য বিষয়সমূহের মধ্য হইতে একটি, যাহাকে পরবর্তী ও পূর্ববর্তীগণের সকলে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিযার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যাহা আমাদের নবী করীম (সা)-এর নুবুওয়াতের প্রতি সাক্ষ্য বহন করিয়া থাকে।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন যে, আমাদের নবী করীম (সা)-কে যতটুকু দান করা হইয়াছিল, অতটুকু কোন নবীকেই আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন নাই। ইহার পর ইমাম শাফিঈ (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করিয়াছিলেন আর আমাদের নবীকে উস্তুনায়ে হান্নানার মু'জিযা দান করিয়াছেন। এমনকি উক্ত খেজুর গাছের কাণ্ডের ক্রন্দনের শব্দ সকলেই শ্রবণ করে, ইহা মৃতকে জীবিত করার মু'জিযার চেয়েও অতীব শ্রেষ্ঠ ও অতীব বিরাট। অতঃপর তিনি সাহাবাগণের হাদীসের ঐ সকল আলিমগণের সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, যাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের সূত্র, পন্থা ও রিওয়ায়াতসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা বহু দীর্ঘ।

উস্তুনায়ে হান্নানার বর্ণনা

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মসজিদ খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর ছাদযুক্ত ছিল। পবিত্র মিম্বর নির্মাণের পূর্বে উহার এক কাণ্ডের সহিত ঠেস দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দান করিতেন। যখন পবিত্র মিম্বর নির্মিত হইয়া যায়, তখন ঐ কাণ্ডটি সরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর উক্ত কাণ্ড হইতে ঐরূপ ক্রন্দনের শব্দ শোনা যাইতে থাকে, যেরূপ ঐ উটনীর যাহার বাচ্চাকে উহার নিকট হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইলে কাঁদিয়া থাকে। হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে যে, উহার ক্রন্দনের শব্দে সমস্ত মসজিদ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এবং উহার অস্থিরতা ও অশান্তি দেখিয়া মানুষেরও চিৎকার বাহির হইয়া পড়িল। এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ কাণ্ডটি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুবারক হস্ত উহার উপর রাখিলেন এবং উহাকে মিলাইয়া লইলেন, তারপর সে নিশ্চুপ হইয়া গেল। নবী (সা) বলেন যে, এই কাণ্ডটি আল্লাহ্র যিকর হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। যদি আমি উহাকে স্পর্শ না করিতাম, তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

(সা)-এর বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশার্থে ঐভাবেই ক্রন্দন করিতে থাকিত। তারপর বলিলেন, উহাকে মসজিদের পবিত্র মিম্বরের নিচে দাফন করিয়া দেওয়া হউক। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের দিকে আহ্বান করেন। তখন সে মাটি বিদীর্ণ করিয়া উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাকে স্পর্শ করেন এবং অবশেষে উহাকে উহার স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত বারীদা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত শাখাকে বলিলেন যে, যদি তুমি চাও তবে তুমি প্রথম যে বাগানে ছিলে ঐখানে তোমাকে রোপন করিয়া দেওয়া হইবে, তোমার শিরা-উপশিরাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তোমার শাখাসমূহকে তরতাজা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমার মধ্য হইতে ফল ধারণ করিবে। আর যদি তুমি চাও তাহা হইলে তোমাকে জান্নাতে বপন করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা তোমার ফল খাইতে পারে। ইহার পর নবী (সা) স্বীয় মুবারক কর্ণ উহার দিকে করিলেন যে, সে কি চায়। তারপর তিনি বলিলেন যে, ও বলিতেছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে জান্নাতের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে আমি আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদিগকে স্বীয় ফল খাওয়াইতে পারি, আর ইহা সেই স্থান যেখানে না আমি পুরাতন হইব এবং না বিলীন হইয়া যাইব। এই সকল কথা বারাকাও উহার সন্নিকটে থাকিয়া শ্রবণ করিয়াছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন আমি উহাই করিতেছি। আর বলিলেন যে, তুমি অস্থায়ী গৃহের উপর চিরস্থায়ী গৃহকে পসন্দ করিয়াছ। হযরত হাসান বস্রী (র) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করিতেন, তখন বলিয়া থাকিতেন যে, হে আল্লাহ্র বান্দা সকল! যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেমে এক লাকড়ী এত ক্রন্দন করিতে পারে, উহাই তোমরা তো উহার চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য যে, রাসূলে করীম (সা)-এর দীদারের জন্য পাগলপারা হইয়া যাইতে পারো।

سنے وگیاہے که درو منفقی هست * به زادمی دان که درو معرفتی نسیت

"পাথর ও তরুলতার মধ্যে বহু উপকারিতা বিদ্যমান আছে। ঐ মানব হইতে উত্তম জানিও যাহার মধ্যে মা'রফতের চেতনা নাই।

এই হাদীসটি বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমেও রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করিয়াছি, উহাই যথেষ্ট।

পাহাড়ের কথা বলা

এই অধ্যায়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পাহাড়ের সহিত কথা বলা এবং উহার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলাও একটি। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)সহ জাবালে উহুদের উপর তাশরীফ লইয়া যান। পবিত্র মদীনার এক পাহাড়ের নাম জাবালে উহুদ এবং উহার সম্পর্কেই বলা হইয়াছে যে, 'اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ' উহুদ পাহাড় আমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে আমরাও উহাকে ভালবাসিয়া থাকি। যখন এই তিন মহামান্য ব্যক্তি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন, তখন পাহাড় কাঁপিতে থাকে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র

www.pathagar.com

পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন যে, হে উহুদ! তুই স্বীয় স্থানে স্থির প্রতিষ্ঠ থাক্, তোর উপর এক নবী, এক সিদ্দীক এবং দুই শহীদ ছাড়া আর কেউ নাই। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী এবং আবূ হাতিম রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীস হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান যুন্নুরায়ন (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) কোহে বাছীর-এর উপর (মিনার এক পাহাড়ের নাম) তাশরীফ রাখিতেছিলেন। তাঁহার সহিত হযরত আবূ বকর, উমর ফারূক এবং আমি ছিলাম। উক্ত পাহাড় কাঁপিতে আরম্ভ করিল, এমনকি উহার পাথরের টুকরাগুলি গর্তের মধ্যে নড়াচড়া করিতেছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র পা মারিয়া বলিলেন যে, হে বাছীর! তুই নিজস্থানে স্থির থাক্, তোর উপর নবী, সিদ্দীক এবং দুই শহীদ ছাড়া আর কেউ নাই। ইহাকে বুখারী, আহমদ, তিরমিযী এবং আবূ হাতিম রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা পর্বতের (মক্কা মুকার্‌রামার এক পাহাড়ের নাম) উপর অবস্থান করিতেছিলেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইবাদতে মশগুল থাকিতেন এবং এইখানেই সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। উক্ত পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী এবং তালহা ও যুবায়র ছিলেন। হেরা পর্বত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন হে হেরা! শান্ত থাক, তোর উপর নবী, অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ ব্যতীত কেহই নাই।

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর হাদীসের মধ্যে হযরত আলীর (রা) কথা উল্লেখ নাই। এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জর্‌রাহ ব্যতীত সকল আশারায়ে মুবাশ্শারা (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ মহাত্মন)-এর নাম উল্লিখিত আছে। অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, যখন কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের কাছে সোপর্দ করার দাবী করিল, তখন বাছীর নামক পাহাড় আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার উপর হইতে নামিয়া যান। কারণ, আমার ভয় হয়, যদি শত্রুরা আপনাকে শহীদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর শাস্তি অবতারণ করিবেন। তখন হেরা পর্বত আরয করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার উপর তাশরীফ লইয়া আসুন। বাছীর এবং হেরা মক্কা মুকার্‌রমার সামনা-সামনি দুইটি পাহাড়।

ওলামা কিরাম বলেন যে, ঐ পাহাড়সমূহের এই কম্পন ঐ ধরনের কম্পন ছিল না, যেমন হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর ঐ সময় সংঘটিত হইয়াছিল, যখন উহারা কালেমা বিকৃত ও পরিবর্তিত করিতেছিল। তখন তাহাদের উপর পাহাড় প্রকম্পিত হওয়া, নড়াচড়া করা আক্রোশ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু এইখানে পাহাড়ের কম্পন, উল্লাস ও আনন্দের দরুন ছিল। এই কারণে নবী করীম (সা) নুবুওয়াত, সিদ্দীকিয়ত এবং শাহাদতের স্তরের বরাত দিয়া বর্ণনা দান করিয়াছেন। কেননা, ইহা আনন্দ এবং পাহাড়ের সুস্থিরতার কারণ ছিল।

কংকরসমূহের তাসবীহ পাঠ করা

এবং এই অধ্যায়ের মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হস্তের মধ্য হইতে কংকররাজির তাসবীহ পাঠ করা অন্যতম। যেমন হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিতেছেন যে,

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুষ্টির মধ্যে পাথরের টুকরা লইলেন, উহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তের মধ্যে তাসবীহ করিতে লাগিল এবং আমরা উহাদের তাসবীহ্ শ্রবণ করিয়াছি। তারপর ঐ পাথর টুকরাগুলিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে দিলেন। উহারা অবিরত তাসবীহ করিতেছিল। ইহার পর যখন ঐ কংকরগুলি আমার হস্তে আসিল, তখন ইহার তাসবীহ পাঠ বন্ধ হইয়া গেল।

ক্বাযী ইয়ায (র) শিফা গ্রন্থে হযরত আবূ যার (রা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাতেও ঐরূপ তাসবীহ পাঠ করিতেছিল। এই সংক্ষিপ্তের বিশদ বর্ণনা হইল এই যে, (যাহা মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বর্ণনা করা হইয়াছে) ওয়ালীদ ইব্ন সুওয়ায়দ বর্ণনা করেন যে, কবীলা বনী-সুলায়মের এক বৃদ্ধ হযরত আবূ যার (রা)-এর গৃহে আগমন করে। তিনি তখন 'রাবযায়' থাকিতেন। তিনি হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বিপ্রহরের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাশরীফ রাখিতে দেখিয়াছি ঐ সময় তাহার নিকট কোন ব্যক্তি ছিল না। তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতারণের অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। আমি সালাম আরয করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালামের উত্তর দান করতঃ বলিলেন যে, " হে আবূ যার তোমাকে কোন্ প্রয়োজনে এইখানে লইয়া আসিয়াছে"? আমি আরয করিলাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল ইহা ভাল জানেন। তারপর আমাকে বলিলেন, "বসিয়া পড়।" আমি তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। আর না আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, আর না রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুক্ষণ নীরব অবস্থা বিরাজ করিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আগমন করিলেন। তিনিও সালাম আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালামের উত্তর দান করতঃ বলিলেন কি জন্যে আসিয়াছ? হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন যে, আমাকে আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রাসূল লইয়া আসিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে হাতের ইশারায় বসিয়া যাওয়ার নির্দেশ করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখামুখি বসিয়া পড়িলেন। ইহার পর হযরত উমর (রা) আগমন করিলেন। তাঁহার সহিতও ঐ একই ব্যবহার করা হইল এবং তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তারপর হযরত উসমান (আ) আগমন করিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর বরাবর বসিয়া গেলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাত অথবা নয় টুকরা কংকর অথবা কিছু কম ও বেশী হইবে পবিত্র হস্তে লইলেন। তখন ঐ কংকরগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তের মধ্যে এত জোরে তসবীহ করিতে লাগিল যে, আমরা সকলেই মৌমাছির গুনগুন শব্দের ন্যায় উহাদের তাসবীহ শ্রবণ করিতে পাইলাম। তারপর ঐ কংকরগুলি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে দিয়া দেওয়া হয় এবং আমাকে বাদ দেওয়া হয়। ঐগুলি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতেও তসবীহ করিতেছিল। তারপর উহাকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হস্ত হইতে লইয়া মাটিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন উহারা নীরব হইয়া যায়। ইহার পর হযরত উমর (রা)-এর হাতে দেওয়া হয়। তাহার হাতেও ঐরূপ তাসবীহ পাঠ করিতে থাকে যেরূপ হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে তাসবীহ করিতেছিল। তারপর হযরত উসমান (রা)-এর হস্তে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

তাহার হস্তেও ঐরূপ তাসবীহ্ পাঠ করিতে থাকে, যেরূপ হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হস্তে করিতেছিল। অতঃপর ঐ কংকরগুলিকে মাটিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন উহারা নীরব হইয়া যায়। এই হাদীসটি আল্লামা বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল্লামা তাবারানী 'আওসাত'-এর মধ্যে এবং আল্লামা বায়হাকী ইমাম যুহরী হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আল্লামা তাবারানীর হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ যার (রা) বলিয়াছেন যে, ঐ কংকররাজি আমাদের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল, তখন তন্মধ্য হইতে কেহই তাসবীহ্ করিতেছিল না। এইরূপ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় আসিয়াছে এবং রাওযাতুল আহ্বাবের মধ্যে আবুশ্ শাকুর সুলামীর ভূমিকা হইতে উদ্ধৃতি আনয়ন করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত আলী মুরতাযা (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)ও উক্ত পবিত্র মজলিসে ছিলেন এবং তাহার হস্তেও উহারা তাসবীহ্ পাঠ করিতেছিল।

আহার্য বস্তুর তাসবীহ্ পাঠ

এই অধ্যায়ের মধ্যে খাদ্য বস্তুর তাসবীহ্ পাঠ করা একটি। এই মর্মে বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বর্ণনা করিতেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত খাবার খাইতেছিলাম, আর আহার্য বস্তুর তাসবীহ্ শ্রবণ করিতেছিলাম। হযরত ইমাম জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ বাকির ইব্ন আলী যায়নুল আবিদীন (সালামুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইলে জিবরাঈল আলায়হিস সালাম এক তস্তুরী আঙ্গুর ও আনার লইয়া আগমন করিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহার করিতে লাগিলেন, তখন উহা তাঁহার পবিত্র হস্তে তাসবীহ্ করিতে লাগিল।

হযরত ইব্ন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করিতেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মিম্বর-এর উপর পবিত্র আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه "উহারা আল্লাহ্র কুদরতকে তাঁহার মর্যাদা অনুযায়ী অবগত নহে" পাঠ করিলেন। উহার পর বলিলেন যে, মহাপরাক্রমশালী স্বীয় পবিত্র সত্তার প্রশংসায় বলিতেছেন যে, اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ "আমি পরাক্রমশালী আমি পরাক্রমশালী, আমি শ্রেষ্ঠ সুমহান।" ইহার পর পবিত্র মিম্বর এইরূপ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল যে, আমার আশংকা হইতে লাগিল যে, কখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর হইতে নিচে নামিয়া আসেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, কা'বাগৃহে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল, যেগুলিকে শিশা দ্বারা পাথরের মধ্যে জমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পবিত্র হস্তে একটি ছড়ি ছিল। তিনি উক্ত ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাইতেছিলেন আর বলিয়া যাইতেছিলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ "সত্যের আগমন হইয়াছে এবং অসত্যের পরাজয় হইয়াছে।" তিনি পূর্ণভাবে ইশারাও করিতে পারিতেন না, মূর্তি নতশিরে মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং উহারা সকলেই তাঁহার পবিত্র হস্তের শক্তি ও আধিপত্যের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

দুগ্ধপায়ী শিশুর কথা বলা ও সাক্ষ্য দান করা

দুগ্ধপায়ী শিশু বাচ্চাদের কথা বলা ও উহাদের নিকট হইতে স্বীয় রিসালতের সাক্ষ্য লওয়াও এই পর্যায়ভুক্ত। হযরত মুআয়কিব (রা) ইয়ামামী হইতে বর্ণিত আছে তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি বিদায় হজ্জে শামিল ছিলাম। আমি নিজ গৃহে যাইয়া তথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরাজমান দেখিতে পাইলাম এবং এক অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম যে, ইয়ামামার এক ব্যক্তি সদ্য প্রসূত এক বাচ্চাকে লইয়া আসিয়াছেন। বাচ্চাটি ঐ সময়ই কেবল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত বাচ্চাকে বলিলেন, আমি কে? সেই বাচ্চা বলিয়া উঠিল, "আপনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্!" ইহার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, صَدَقْتَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ "তুই সত্য বলিয়াছিস, আল্লাহ্ তোর হায়াতে বরকত দান করুন।" ইহার পর সেই বাচ্চাটি যুবক না হওয়া পর্যন্ত আর কথা বলে নাই। আমরা উক্ত বাচ্চার নাম "মুবারাকুল ইয়ামামা" রাখিয়াছিলাম। ফাহদ্ ইব্ন আতিয়্যা হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক দাসকে আনয়ন করা হয়। সেই দাস মোটেই কথা বলিতে পারিত না অর্থাৎ মূক ছিল। উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল হন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। বায়হাকী ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এক মহিলা স্বীয় পুত্রকে লইয়া আসিয়া আরয করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই বাচ্চাটি উন্মাদ, বড় কষ্ট দেয়। যখন সকাল ও সন্ধ্যা হয়, তখন এই বাচ্চা আমার সময় নষ্ট করিয়া দেয়। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত বাচ্চার বুকের উপর স্বীয় পবিত্র হস্ত বুলাইলেন। সে বমি করিল এবং উহার পেট হইতে কাল রং-এর এক পোকা বাহির হইল, যাহা হাঁটিতেছিল। দারিমী এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুসায়রী কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

كما برأت وحيا باللمس راحته * وطلقت ازبا من ربقه اللحم

কবীলা বনী খাছআম-এর এক মহিলা স্বীয় বাচ্চাকে— যাহা সম্পূর্ণরূপে বোবা ছিল— রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি আনিতে বলিলেন এবং উহার মধ্যে কুল্লি করিলেন এবং পবিত্র হস্তদ্বয় ধৌত করিলেন। অতঃপর ঐ পানি উক্ত বাচ্চাকে পান করাইয়া দিলেন। উক্ত বাচ্চা ঐ মুহূর্তেই বাকশক্তিসম্পন্ন এবং বিবেকসম্পন্ন হইয়া গেল এবং সমস্ত লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান হইয়া গেল।

হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান-এর চক্ষুতে উহুদের যুদ্ধের দিন আঘাত লাগিয়াছিল, এমনকি চক্ষুর পুতলি বাহির হইয়া গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। হযরত কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া আরয করিতে লাগিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এক স্ত্রী আছে, সে আমার নিকট বড় প্রিয়তমা। আমি যখম ও বীভৎস চক্ষুসহ তাহার সম্মুখে যাইতে ভয় পাইতেছি। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বারা চক্ষুকে ধরিয়া উহার কোটরের মধ্যে পুরিয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে খোদা! এই চক্ষুকে খুব সুন্দর করিয়া দাও। তাহার এই

www.pathagar.com

চক্ষু দ্বিতীয় চক্ষু হইতে অত্যন্ত সুশ্রী, উত্তম এবং অতি দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া গেল। যখনই কোন সময় দ্বিতীয় চক্ষুতে ব্যথা-বেদনা হইত, এই চক্ষু উহা হইতে নিরাপদ থাকিত। হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা)-এর পুত্র হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা)-এর খিদমতে গমন করিলেন, তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তখন ঐ পুত্র উত্তর দান করিল ঃ

اَبُوْنَا الَّذِىْ سَأَلَتْ عَلَى الْحَدَقِ عَيْنُهٗ * فَرُدَّتْ بِكَفِّ الْمُصْطَفٰى اَيُّمَا رَدِّ

فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِاَوَّلِ اَمْرِهَا * فَيَا حُسْنَ عَيْنٍ وَيَا حُسْنَ مَأْخَذِ

"আমি ঐ পিতার সন্তান যাহার চক্ষু গালের উপর নামিয়া আসিয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্ত দ্বারা উহাকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করা হয়। এবং উহা এইরূপ সংস্থাপিত হইয়া যায় যেমন পূর্বে ছিল। অতঃপর সেই চক্ষু কতইনা সুন্দর হইয়া যায়, সেই সুন্দরতমের স্পর্শে।"।

এতদশ্রবণে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাহাকে বহু ইনআম দান করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে যত্নাদি করিলেন। তাবারানী এবং আবূ নুআয়ম হযরত কাতাদা (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিতেছেন যে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ চক্ষু দ্বারা রাসূল আকরাম (সা)-এর নূরানী চেহারাকে তীরের বর্ষণের মধ্যে রক্ষা করিতেছিলাম। উদ্দেশ্য হইল এই যে, আমি নিজকে রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্য ঢাল বানাইয়া রাখিয়াছিলাম। অবশেষে শত্রুর এক তীর আসিয়া আমার উপর এমনভাবে লাগিল যে, আমার চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আমি নিজ চক্ষুকে স্বহস্তে ধারণ করতঃ রাসূল আকরাম (সা)-এর প্রতি দেখিলাম, যখন নবী আকরাম (সা) আমার চক্ষুকে আমার হাতের মধ্যে দেখিতে পাইলেন, তখন রাসূল (সা)-এর চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করিতে লাগিলেন, হে খোদা! যেমন সে আপন চক্ষু দিয়া তোমার নবীর মুবারক চেহারাকে রক্ষা করিয়াছে, এখন উহার চক্ষে আঘাত লাগিয়াছে, এখন এই চক্ষুকে উহার অপর চক্ষু হইতে উত্তম বানাইয়া দাও।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, জনৈক ইস্তিস্কা রোগী কাহাকেও রাসূলে আকরাম (সা)-এর খেদমতে স্বীয় রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একমুষ্টি মাটি পবিত্র হাতে লইয়া উহার মধ্যে পবিত্র মুখের থুথু নিক্ষেপ করেন এবং ঐ প্রেরিত লোকের নিকট দিয়া দেন। ইহাতে সে আশ্চর্য বোধ করে এবং তাহার ধারণা হয় যে, হয়ত তাহার সহিত উপহাস করা হইয়াছে। কিন্তু সে ঐ মাটি লইয়া রোগীর নিকট পৌঁছিয়া দেখিল সে মৃত্যুর কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ মাটি তাহাকে চাটাইয়া দিল। ইহাতে সে আরোগ্য লাভ করিল।

অন্য এক ব্যক্তি ছিল, যাহার দুই চক্ষুতে ছানি পড়িয়া গিয়াছিল এবং সে কিছুই দেখিতে পাইত না। রাসূলে আকরাম (সা) তাহার চক্ষুর উপর ফুঁক দান করিলেন, যাদ্দরুন তাহার দুই চক্ষুই এমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সে আশি বর্ষ বয়সেও সূচের ছিদ্রের মধ্যে সূতা লাগাইয়া লইতে পারিত। এই ধরনের অসংখ্য মু'জিযা বিদ্যমান আছে।

www.pathagar.com

খায়বারের যুদ্ধের সময় রাসূলে আকরাম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আলী মুরতাযা কোথায় ? সাহাবীগণ আরয করিরেন উপস্থিত নাই, তাঁহার চক্ষু উঠিয়াছে। রাসূল (সা) কাহাকেও প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার পবিত্র শির পবিত্র কোলের মধ্যে লইয়া উভয় চক্ষুর মধ্যে মুখের থুথু দিয়া দিলেন এবং দু'আ করিলেন। ফলে তিনি ঐ সময়ই এমন সুস্থ হইয়া গেলেন, যেন তাঁহার চক্ষে কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তাঁহার দুই চক্ষে কখনও বেদনা দেখা দেয় নাই। খায়বারের যুদ্ধের দিন সালামা ইব্‌ন আকওয়ার পায়ের নলী ভাঙ্গিয়া যায়। উক্ত নলীতে রাসূল (সা) তিনবার ফুঁক দান করেন এবং উহা ঐ সময়ই ঠিক হইয়া যায়। ইহার পর কোনদিন উক্ত নলীতে ব্যথা হয় নাই। যায়দ ইব্‌ন মুআয এর পায়ে ঐ সময় তলওয়ারের আঘাত লাগিয়াছিল, যখন তিনি কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করিয়াছিলেন। রাসূল (সা) তখন থথু দিলেন, যার ফলে ঐ সময়ই পা ঠিক হইয়া গেল।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক (রা) আবূ রাফে ইহুদীকে হত্যা করেন, তখন চাঁদনী রাত ছিল। যখন সিঁড়িতে পা রাখেন, তখন পা ফসকাইয়া যায় এবং মাটিতে পড়িয়া যান, যদ্দরুন তাহার পায়ের নলী ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি রাসূলে আকরাম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূল স্বীয় মুবারক হাত তাহার পায়ের নলীতে বুলাইয়া দিলেন। ফলে তিনি ঐ মুহূর্তেই আরোগ্য লাভ করিলেন। এই প্রকারের বহু ঘটনা ও কাহিনী বহু প্রসিদ্ধ এবং হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লিখিত আছে।

মৃতকে জীবতকরণ

এখন মৃতকে জীবিত করার মু'জিযার আলোচনা রহিয়া গেল। এই সম্পর্কে আল্লামা বায়হাকী 'দালায়েল'-এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল যে, আমি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান আনয়ন করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার ঐ মৃত কন্যাকে জীবিত না করিয়া দিবেন। রাসূল (সা) বলিলেন, আমাকে উহার কবর দেখাইয়া দাও, সে উহার কবর দেখাইয়া দিল। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, উক্ত ব্যক্তি বলিল যে, আমি আমার কন্যাকে উপত্যকার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছি। রাসূল বলিলেন, আমাকে সেই উপত্যকা দেখাইয়া দাও। তখন সে রাসূল (সা)-কে উক্ত উপত্যকা দেখাইয়া দেয়। তারপর রাসূল উক্ত কন্যাকে আহ্বান করেন। কন্যা সাড়া দিল এবং বলিল যে, লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়ক– উপস্থিত আছি এবং অনুগত আছি। অতঃপর রাসূল (সা) উহাকে বলেন যে, তুই পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করা কি পসন্দ করিস ? সে বলিল, না, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আখিরাতকে দুনিয়ার চেয়ে উত্তম পাইয়াছি। এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোর মাতা, পিতা ঈমান আনয়ন করিয়াছে যদি তুই ভাল মনে করিস তাহা হইলে তোকে দুনিয়ায় পুনরায় ফেরত পাঠাইয়া দেই? সে বলিল যে, আমার মাতা, পিতার প্রয়োজন নাই, আমি স্বীয় প্রভুকে তাহাদের চাইতে অতি উত্তম এবং অধিক দয়ালু পাইয়াছি।

এই হাদীসের বর্ণনা এই কথা প্রমাণ করিতেছে যে, মুশরিকদের সন্তানের উপর (যদি উহারা বুদ্ধিমান হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে) শাস্তি হইবে না।

www.pathagar.com

অনুরূপ হযরত জাবির (রা)-এর সন্তানদিগকে জীবিত করার ঘটনা। যখন রাসূলে আকরাম (সা) তাহার গৃহে অতিথি হিসাবে শুভাগমন করেন। হযরত জাবির (রা) এক বকরী যবাহ্ করিয়াছিলেন। তাহার বড় পুত্র পিতা কিরূপে বকরী যবাহ্ করিয়াছেন এই দেখিয়া তাহার ছোট ভাইকে ঐভাবে শোওয়াইয়া গলায় ছুরি চালাইয়া দেয়। যখন তাহার মাতা এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া উহাদের দিকে আসিতে লাগিল, পুত্র যখন দেখিল যে, মা আসিতেছেন, সেও বালাখানা হইতে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর রাসূল (সা) এই পুত্রদ্বয়কে জীবিত করেন। ইহার বর্ণনা শাওয়াহেদুন্ নুবুওয়াতের মধ্যে বিস্তারিতভাবে করা হইয়াছে।

অনুরূপ সম্মানিত মাতা-পিতার জীবিত করার ঘটনা। অর্থাৎ রাসূলে আকরাম (সা) কর্তৃক স্বীয় বুযুর্গ মাতা-পিতাকে জীবিত করা এবং তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা। যেমন হাদীসসমূহে আসিয়াছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এই সকল হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে উক্তি করিয়া থাকেন এবং কোন কোন পরবর্তীগণ ইহাকে প্রমাণিত করিয়া বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছাইয়া থাকেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে– এক যুবক আনসারী মারা যায়, উহার অন্ধ বৃদ্ধা মাতা ছিল। লোকেরা উক্ত যুবকের উপর বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দিল এবং উহার মায়ের নিকট আফসোস করিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পুত্র কি মারা গিয়াছে? লোকের বলিল, হাঁ। সে বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ্! তুই খুব ভাল করিয়া জানিস যে, আমি তোর দিকে এবং তোর নবীর দিকে এই আশায় হিজরত করিয়াছিলাম যে, তুই আমার সাহায্য করবিএবং সকল দুঃখ-কষ্টের সময় তুই আমার ফরিয়াদ শ্রবণ কর। আয় আল্লাহ্! আমাকে এহেন বিপদে নিক্ষেপ করিস না। আমরা এখনও তথা হইতে সরিয়াও সরি নাই, এমন সময় আমরা মৃতের মুখের উপর হইতে চাঁদর উঠাইয়া দেখিলাম, সে জীবিত আছে। তারপর সে আমাদের সাথে আহার করিয়াছে। ইহাকে ইব্‌ন আদী, ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া, বায়হাকী এবং আবূ নুআয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উক্ত মহিলার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আশ্রয় কামনার বরকত ছিল।

অনুরূপ ঐ রিওয়ায়াত যাহা আবী বকর ইব্‌ন যাহহাক হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি মারা যায়। যখন লোকেরা গোসল ও কাফন এর কার্য শেষ করিয়া লাশ উঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে বলিল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (হযরত মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল)।

অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, যায়দ ইব্‌ন খারিজা আনসারী খায্‌রাজী স্বীয় পিতাসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বায়আতে রিযওয়ানেও শরীক ছিলে। তিনি হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের সময় মারা যান। তিনি মৃত্যুর পর কথা বলেন এবং তাহার কথাকে সংরক্ষিত করিয়া লওয়া হয়। তিনি বলেন ঃ

احمد احمد فى الكتب الاول صدق ابو بكر الصديق الضعيف فى نفسه القوى فى امره فى الكتاب الاول صدق صدق عمر بن الخطاب القوى الامين فى الكتاب الاول صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت اربع سنين

www.pathagar.com

وبقيت سنتان انت الفتن واكل الشديد الضعيف وقامت الساعة ـ كذا فى جامع الاصول ـ

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় হযরত নুমান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা আনসার সর্দারগণের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় কোন এক জায়গায় চলার সময় যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় মুখ উল্টাইয়া পড়িয়া যাইয়া মৃত্যুবরণ করেন। আনসার মেয়ে, পুরুষ সকলে আসিয়া কান্না শুরু করিয়া দেয় এবং সে ঐ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অবশেষে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় এক আওয়ায শোনা যায়, যাহাতে বলিতেছিল চুপ থাক। ইহার পর যখন খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখা হইল তো দেখা গেল যে, চাদরের নিচু হইতে আওয়ায আসিতেছিল। তাহারা তাহার মুখ ও বুক হইতে চাদর নামাইয়া দিল, তো দেখিল যে, তিনি বলিতেছিলেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ النَّبِيِّ الأُمِّى خَاتِمُ النَّبِيِّنَ لاَنَبِىَّ بَعْدَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتَابِ الْاَوَّلِ وَصَدَّقَ وَصَدَّقَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

ইহাকে আবী বকর ইব্ন আবিদ্ দুনিয়া 'মান আ-শা- বাদাল মাওত' (من عاش بعد الموت) নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, যাহারা ছাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাসকে দাফন করিয়াছিল আমিও উক্ত দলের সহিত শরীক ছিলাম। তিনি সম্পূর্ণ রূপেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে কবরে নামান হয় ঐ সময় আমি তাহাকে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرَ الصِّدِّيْقُ، عُمَرُ الشَّهِيْدُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَلْبِرُّ الرَّحِيْمِ —মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আবূ বকর সিদ্দীক, উমর শহীদ, উসমান ইব্ন আফ্ফান পুণ্যবান, দয়ালু । তারপর যখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তখন দেখি তিনি মৃত ছিলেন কিতাবে শিফাতে এইরূপ বণিত হইয়াছে।

যদি কেহ সন্দেহ করিয়া বলে যে, সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন এবং কোন পর্দা অন্তরায় হইয়া থাকিবে এবং ইহাও এক কারণ যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তে প্রকাশ পায় নাই। যাহাকে মু'জিযা বলা যাইতে পারে ? তাহা হইলে ইহার উত্তর হইল এই যে, মৃত্যু লোক দেখান বস্তু নয়, যাহাকে গোপন করিয়া রাখা যাইতে পারে। এবং রাসূল আকরাম (সা)-এর কথা স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রশংসা ও গুণগান করার মধ্যে ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, ইহা সকলই রাসূল (সা)-এর বরকত এবং তাঁহার ইয্যতের ফলশ্রুতি, যদি কারামতও হয় তো ইহাও রাসূল (সা)-এরই মু'জিযা।

আবূ নুআয়ম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) এক বকরী যবাহ্ করিয়া উহা সম্পূর্ণই রান্না করেন এবং উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে লইয়া যান, অতঃপর সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

জামাআত উহা হইতে আহার করে। আর রাসূল (সা) বলেন যে, তোমরা সকলে আহার কর কিন্তু উহার হাড্ডি ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। ইহার পর রাসূল (সা) সকল হাড়কে একত্রিত করেন এবং উহার উপর পবিত্র হস্ত রাখিয়া কিছু পাঠ করেন। ইহার পর দেখা গেল যে, বকরী জীবিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কান হেলাইতে শুরু করিয়াছে।

আর কোন কোন এমন পরিপূর্ণতম আল্লাহ্র ওলী রহিয়াছেন, যাহারা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির বিকাশস্থল হইয়া থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের সম্মানে, তাঁহার প্রতিচ্ছায়ায় তাঁহাদের তরফ হইতেও অলৌকিকত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন লোকেরা একটি মোরগ খাইল। এক বুযুর্গ উহার হাড় একত্রিত করিলেন এবং উহার উপর স্বীয় পবিত্র হস্ত রাখিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের নাম লইলেন। মোরগ জীবিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ডাক দিল। ইহাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা সমূহের মধ্যেই পরিগণিত।

জানিয়া রাখা উচিত যে, খায়বারে বিষ মিশ্রিত বকরীর কথা বলাকে কোন কোন আলিম মৃতকে জীবিত করার পর্যায়ে গণ্য করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা এমন বাক্য যে, নিজ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত বকরীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। যেরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বৃক্ষ তরুলতা ও পাথরের মধ্যে অক্ষর ও শব্দকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং ঐ গুলিকে বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্তন ছাড়াই শোনাইয়া থাকেন। শায়খ আবুল হাসান এবং ক্বারী আবূ বকর বাকিল্লানীর মাযহাব ইহাই এবং কেহ কেহ বলেন যে, জীবন সৃষ্টির ন্যায় প্রথমত উহাদিগকে সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর উহাদিগকে বাকশক্তি প্রদান করা হয়। বাহ্যিক কথা ইহাই। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

দু'আ কবূল হওয়া

রাসূলে আকরাম সায়্যিদে আলম (সা)-এর মু'জিযার প্রকারসমূহের মধ্যে দু'আ কবূল হওয়াও একটি। কিতাবে শিফাতে বলা হইয়াছে যে, এই অধ্যায় বড় প্রশস্ত এবং রাসূলে আকরাম (সা)-এর দু'আ কবূল হওয়া সকল দলের জন্যই চাই কল্যাণের ক্ষেত্রে হউক অথবা ক্ষতির ক্ষেত্রে, প্রকাশ্য রূপে ইহা বহুল প্রচারিত।

হযরত হুযায়ফা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কাহারও জন্য দু'আ করিতেন, উহার ক্রিয়া পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত। এই অধ্যায়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হাদীস হইল হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর জন্য রাসূল (সা)-এর দু'আ করা। তিনি সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার খিদমত করিয়াছেন। তিনি যাহিরী ও বাতিনী নানা প্রকার দানে ও সম্মানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতা রাসূল (সা)-এর খিদমতে লইয়া আসেন এবং আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আপনার খাদিম আনাস উপস্থিত আছে উহার পার্থিব সচ্ছলতার জন্য দু'আ করুন, এমনিইতো অপার্থিব দু'আ এই দরবারের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল লোকের উপর বিদ্যমান রহিয়াছে। রাসূল (সা) তাহার জন্য দু'আ করিলেন, এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! উহার ধন ও সন্তানাদির মধ্যে খুব বরকত দান কর এবং যে সকল নিআমত তুমি তাহাকে দিয়াছ, উহার মধ্যেও অধিক বরকত দান কর। হযরত

www.pathagar.com

ইকরিমা (রা) বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র শপথ! আমার ধন অনেক এবং আমার সন্তানাদিও শতজনেরও বেশী। অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার আর কাহারও সম্পর্কে জানা নাই, যাহার জীবনে এত আরাম, আনন্দ লাভ হইয়াছে, যতটুকু আমার অর্জিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি আমার এই স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় সন্তানাদির মধ্য হইতে শত দেহকে দাফন করিয়াছি। এবং গর্ভপাতের ও সন্তানের সন্তানদের তো কোন ধারণাই করা যায় না। এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তাহার বাগানের খেজুর বৃক্ষ বৎসরে দুইবার ফল দিত।

এই অধ্যায়েই হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর জন্য বরকতের দু'আও একটি। হযরত আবদুর রহমান বলিতেন যে, আমি যদি কোন পাথর উঠাইতে ইচ্ছা করিতাম, তবু আমার আশা থাকিত যে, উহার নিচে স্বর্ণ হইবে। তাঁহার উপর রিযকের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অথচ যখন তিনি হিজরত করিয়াছিলেন, তখন গরীব ছিলেন, তাঁহার নিকট কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে স্বর্ণকে কাঁচি দ্বারা কাটা হইয়াছিল। তাহার চার স্ত্রীর মধ্যে এক চতুর্থাংশের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেকের অংশে আশি সহস্র আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) আসিয়াছিল, এক রিওয়ায়াতে এক লক্ষ আসিয়াছে। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তাহার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত আশি সহস্রের কিছু উর্ধ্বে আশরাফীর উপর আপোস করা হইয়াছিল। এবং পঞ্চাশ সহস্র আশরাফীর ওসিয়ত করিয়াছিলেন। এইগুলি তাহার ঐ সকল বড় বড় দান-খয়রাতের বহির্ভূত যাহা তিনি জীবদ্দশায় করিয়া থাকিতেন। বস্তুতঃ তিনি একদিনে ত্রিশটি গোলাম আযাদ করিয়া থাকিতেন। একবার তো তিনি সম্পূর্ণ কাফেলাই দান করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত কাফেলায় সাতশত উট ছিল এবং উহার মধ্যে সর্বপ্রকারের বস্তু ছিল, ঐ সকল উটসহ উহার উপর বোঝাইকৃত সকল মাল ও সাজ-সরঞ্জামাদি দান করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ কাফেলার সকল মালকে দান করিয়া দেওয়ার পিছনে এই কারণ নিহিত ছিল যে, সায়্যিদা আইশা (রা) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমি আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে বেহেশতে এক মহল ক্রয় করিতে দেখিয়াছি। ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি সম্পূর্ণ কাফেলাকেই দান করিয়া দেন।

রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আমীর মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর জন্য রাজত্ব শাসনের দু'আ করিয়াছিলেন। ফলে তাহার বাদশাহী ও শাসন ক্ষমতা লাভ হয়। অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, يَا مُعَاوِيَةُ اِذَا مَلَكْتَ فَاسْتَجِحْ হে মুআবিয়া! যখন তোমাকে বাদশাহী দেওয়া হইবে, তখন স্বভাবকে নম্র করিও। হযরত আমীর মুআবিয়া বলেন যে, আমার সেইদিন হইতে বাদশাহীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল।

রাসূল (সা) হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর জন্য দু'আ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছেন। তিনি যাহার জন্যেই দু'আ করিয়াছেন উহা অবশ্যই কবূল হইয়াছে। এবং দু'আকে তীরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রাসূল (সা) ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য হযরত উমর (রা) অথবা আবূ জাহলের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। এই দু'আ হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ক্ষেত্রে কবূল হইয়াছে। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিতেছেন যে,

www.pathagar.com

যেদিন হইতে হযরত ফারূক (রা) ঈমান আনয়ন করিয়াছেন সর্বদা ইসলামের সম্মান ও বিজয় লাভ হইতে থাকে।

রাসূলে আকরাম (সা) -এর সহিত একযুদ্ধে লোকেরা পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। হযরত উমর (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট দু'আর আবেদন করেন। রাসূল (সা) দু'আ করেন, ফলে মেঘমালা দেখা দেয় এবং সকলে পানিপ্রাপ্ত হয়। এস্তেস্‌কার নামাযের মধ্যে রাসূল (সা) কর্তৃক দু'আ করা এবং বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং উহার উন্মুক্ত হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত।

নাবেগা জু'দীর জন্য দু'আ করেন যে, لَا يَنْفُضُ اللّٰهُ فَاكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মুখের দাঁতকে যেন না ভাঙ্গেন। ফলে তাহার দাঁত কখনও পড়িয়া যায় নাই। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি দাঁতের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ছিলেন। যখন কোন দাঁত পড়িয়া যাইত তদস্থলে দ্বিতীয় দাঁত গজাইয়া যাইত। তিনি একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কেহ ইহার চেয়েও বেশী বয়সের কথা বলিয়াছেন। এই নাবেগা ঐ সকল প্রাচীন কবির একজন ছিলেন যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা কিতাবের শেষের দিকে রাসূল (সা)-এর কবিদের আলোচনায় বর্ণনা করা হইবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর জন্য দু'আ করেন اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ। হে আল্লাহ্! তাহাকে দীনের বিবেক দান কর এবং ব্যাখ্যার জ্ঞান দাও। ফলে তিনি দীনের শ্রেষ্ঠ আলিম ও কুরআনের মুখপাত্র নামে (حِبْرِ اُمَّتْ وَتَرْجَمَانِ قُرَانِ) খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের ব্যবসায় বরকতের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি যাহাই ক্রয় করিতেন উহাতে তাঁহার অনেক লাভ হইত।

হযরত মিকদাদ (রা)-এর জন্য ধন-দৌলতের মধ্যে বরকতের দু'আ করেন, ফলে তাহার নিকট বহু ধন ছিল। অনুরূপভাবে উরওয়া ইব্‌ন আবিল জু'দ-এর জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। উরওয়া বলেন যে, আমি বাজারের এক কোণায় দাঁড়াইতাম এবং একদিনে চল্লিশ সহস্র পর্যন্ত লাভ করিতাম। বুখারী শরীফে ইহার হাদীসে আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি আমি মাটিও ক্রয় করিতাম, তাহা হইলে আমার উহাতেও লাভ অর্জিত হইত। একবার নবী (সা)-এর উটনী পালাইয়া গিয়াছিল। তিনি উহাকে ডাকিলেন এবং আওয়ায দিলেন। কিন্তু আমি উহাকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া রাসূল (সা)কে সোপর্দ করিয়া দেই। ঐ সময় তিনি আমাকে এই দু'আ দিয়াছিলেন।

রাসূল (সা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাতার ইসলাম গ্রহণের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া যান। যদিও তিনি ইতোপূর্বে রাসূলে আকরাম (সা)-এর সম্পর্কে বহু খারাপ কথা বলিতেন।

হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর জন্য দু'আ করেন যে, তিনি ঠাণ্ডা ও গরম হইতে যেন নিরাপদে থাকেন তো তাঁহার এই অবস্থা ছিল যে, যদি গরমের সময় শীতের এবং শীতের সময় গরমের কাপড় পরিধান করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে গরম ও ঠাণ্ডা কিছুই ক্ষতি করিতে পারিত না।

www.pathagar.com

জগতের সকল গোত্রের মহিলার নেত্রী হযরত ফাতিমাতুয যাহ্‌রা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্য দু'আ করেন যে, তিনি যেন কখনও ক্ষুধাতুরা না হন। ইহার পর কখনও তিনি ক্ষুধায় কাতর হন নাই।

তুফায়ল ইব্‌ন আমর (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট স্বীয় কওমের জন্য কোন নিদর্শন ও অলৌকিকত্ব কামনা করিলে রাসূল (সা) তাহার জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! ইহাকে তুমি নূর দান কর, তাই তাঁহার দুই চক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে নূর চমকাইতে থাকে। এতদদর্শনে তিনি আরয করিলেন যে, আমার ভয় হয় লোকেরা ইহাকে কুষ্ঠব্যাধি ধারণা না করিয়া বসে। তখন উহাকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয় এবং উক্ত নূর চাবুকের বাটের মধ্যে চলিয়া যায় এবং রাতের অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার চাবুক আলো চমকাইতে থাকে। এই কারণে তাঁহার নাম যুন্-নূর অর্থাৎ আলোর অধিকারী প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। এবং কবীলা মুযার-এর জন্য দু'আ করার দরুন উহারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। অতঃপর কুরায়শরা রাসূল (সা)-এর নিকট উহাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি দু'আ করেন এবং দুর্ভিক্ষের অবসান হয়।

এবং রাসূল আকরাম (সা) কিস্‌রা'র জন্য দু'আ করিয়াছিলেন (সে রাসূল (সা)-এর পবিত্র পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল) যে, উহার সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাউক। তখন তাহার কোন রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকিল না। পৃথিবীর মানচিত্র হইতে পারস্যের শাসন সর্বকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নামায ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল উহার জন্য বদদু'আ করিয়াছিলেন, আয় আল্লাহ্! তুই উহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দে, তখন সে বসা অবস্থায়ই থাকিয়া যায়।

এক ব্যক্তিকে রাসূল (সা) বাম হাতে আহার করিতে দেখিয়া বলিলেন, ডান হাতে আহার কর, সে বলিল, আমি ডান হাতে খাইতে পারি না। অথচ সে ইহা মিথ্যা বলিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, তুই কখনও ডান হাতে খাইতে পারবি না। ইহার পর হইতে সে আর কখনও ডান হস্তকে উঠাইতে পারিত না।

উত্‌বা ইব্‌ন আবু লাহাব-এর জন্য বলিয়াছিলেন, আয় আল্লাহ্! তোমার কুকুরদের মধ্য হইতে কোন এক কুকুরকে উহার উপর লেলাইয়া দাও, তখন উহাকে এক ব্যাঘ্র আসিয়া ফাড়িয়া ফেলিয়া যায়।

এবং কুরায়শদের ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা নামাযের অবস্থায় রাসূল আকরাম (সা)-এর পবিত্র ঘাড়ের উপর ভুঁড়ি রাখিয়া দিয়াছিল, রাসূল (সা) বদদু'আ করিয়াছিলেন ইহারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়, ইহাই সুখ্যাত। আর হাকাম ইব্‌নুল আস গৌরব, অহংকার ও উপহাস ছলে রাসূলে আকরাম (সা)-কে মুখ ভেংচাইয়াছিল এবং স্বীয় চক্ষুকে বন্ধ করিয়া লইয়াছিল। রাসূল (সা) বলিলেন তুই এইরূপই হইবি, তারপর সে তদ্রূপই হইয়া গেল, এমনকি মৃত্যুবরণ করিল। আর মুহলাম ইব্‌ন জোছামার জন্য বদদু'আ করিলেন যে, উহাকে যেন মাটি গ্রহণ না করে। ইহার পর যখন উহাকে মাটি দেওয়া হয়, তখন মাটি উহাকে বাহিরে ফিকিয়া দেয়। কয়েকবার এইরূপ হয় অবশেষে উহার লাশকে দুই গর্তের মধ্যবর্তী স্থানে রাখিয়া প্রাচীর বানাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেই স্থান হইতেও উহাকে বাহিরে ফিকিয়া দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

পাপী বারা ইব্ন আমির রাহিব-এর প্রতি বদদু'আ করেন যে, সে যেন একেলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। ফলে অনুরূপভাবেই তাহার মৃত্যু হয়। (আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের আক্রোশ ও ক্রোধ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত)।

শিফা গ্রন্থকার ক্বাযী ইয়ায (র) বলিতেছেন যে, ইহার অসংখ্য ও অগণন উদাহরণ রহিয়াছে। এই অধ্যায় সীমা ও পরিবেষ্টনের উর্ধ্বে।

রাসূল (সা)-এর কারামত ও বরকতসমূহ

রাসূল আকরাম (সা) যে সকল বস্তুকে স্পর্শ করিয়াছেন নৈকট্যতার সম্মান দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কারামত ও বরকত অর্জিত হওয়া সম্বন্ধে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সায়্যিদা আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) আত্‌লিসী একটি জুব্বা বাহির করিয়া বলেন যে, এই পবিত্র জুব্বাটি নবী করীম (সা) পরিধান করিয়াছিলেন। আমরা রোগীদিগকে উহার আস্তীন মুবারক ধৌত করিয়া পান করাইয়া থাকি। তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। রাসূলে আকরাম (সা)-এর একটি পিয়ালা ছিল উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া রোগাক্রান্তকে পান করান হইত, তৎক্ষণাৎ উক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিত।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর টুপির মধ্যে রাসূল আকরাম (সা)-এর কতিপয় পবিত্র চুল ছিল, তিনি উহা পরিধান করিয়া যে যুদ্ধেই শরীক হইতেন, যুদ্ধে বিজয় ও সাহায্য লাভ করিতেন। হযরত আনাস (রা)-এর গৃহের কূপের মধ্যে রাসূলের মুখের থুথু দিয়াছিলেন, ফলে পবিত্র মদীনার মধ্যে উহার চেয়ে সুমধুর পানি আর কোন কূপেরই ছিল না।

কেহ রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট যমযম কূপের এক বালতি পানি লইয়া আসিয়াছিল। তিনি উহার মধ্যে পবিত্র মুখের থুথু দিয়া দিলেন, তখন উহা মৃগনাভি হইতেও সুগন্ধযুক্ত হইয়া গেল।

রাসূলে আকরাম (সা) সায়্যিদানা ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মুখের মধ্যে তাঁহার মুবারক জিহ্বা দিয়াছিলেন। তাহারা উহা চুষিয়া চুপ হইয়া গেলেন, অথচ ইহার পূর্বে তাঁহারা উভয়েই পিপাসার দরুন ক্রন্দন করিতেছিলেন।

তিনি যে দুগ্ধ পানকারী শিশু বাচ্চাদের মুখে স্বীয় পবিত্র মুখের থুথু দিতেন, ঐ বাচ্চাদের সারা রাত্রির জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইত। আর উহারা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িত না। ইহার আলোচনা পবিত্র হুলিয়া বর্ণনায় চলিয়া গিয়াছে। উম্মে মালিক (রা)-এর হাদীসে আছে যে, তাহার নিকট ঘি এর চামড়ার একটি কৌটা ছিল, যাহার মধ্যে করিয়া তিনি রাসূল (সা)-এর খিদমতে ঘি প্রেরণ করিয়া থাকিতেন। যতদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত কৌটা হইতে ঘৃত নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লন নাই উহা হইতে সর্বদা ঘৃত বাহির করিয়া থাকিতেন এবং উহাতে হ্রাস পাইত না।

এই মুবারক হস্তের এবং উহার স্পর্শের বরকতসমূহের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, এক ইয়াহূদীর জন্য তিনি খেজুরের বৃক্ষ রোপণ করেন, ঐ বৎসরই ঐ বৃক্ষে ফল ধারণ করে।

হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কিস্সায় আছে যে, ইয়াহূদী প্রভু চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ এবং তিনশত খেজুর গাছ রোপণ করতঃ উহা ফলবান হওয়ার শর্তে তাহাকে

www.pathagar.com

মুকাতাব (শর্ত সাপেক্ষে দাসমুক্ত করাকে মুকাতাবা বলা হয়) করা হয়। উক্ত তিনশত বৃক্ষের মধ্যে একটি বৃক্ষ ছাড়া সকল বৃক্ষই ফল দান করে এবং ঐ বৃক্ষটি রাসূলে আকরাম (সা) ব্যতীত অন্য কেহ রোপণ করিয়াছিল। ইব্ন আবদুল বার্র বর্ণনা করিতেছেন যে, যথাসম্ভব ঐ একটি বৃক্ষ হযরত উমর (রা) রোপণ করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) রোপণ করিয়াছিলেন। হইতে পারে হয়ত উভয়ে মিলিয়াই রোপণ করিয়া থাকিবেন। ইহার পর রাসূলে আকরাম (সা) উহাকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় রোপণ করিয়া দেন। তো ঐ বৎসরই উক্ত বৃক্ষ ফলবান হইয়া যায়। আর একটি মুরগীর ডিমের সমতুল্য স্বর্ণকে পবিত্র জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করতঃ উক্ত ইহুদীকে চল্লিশ উকিয়া দিয়া দেন। ইহার পরও উক্ত স্বর্ণের চাকার মধ্যে চল্লিশ উকিয়া সমতুল্য স্বর্ণ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এইরূপে হযরত সালমান (রা) মুকাতাবাত হইতে আযাদী লাভ করেন।

হানাশ ইব্ন আকীল (রা) [জনৈক সাহাবী] বলেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) আমাকে ছাতুর শরবত পান করান। উহা হইতে সামান্য কিছু রাসূল (সা) পূর্বে পান করিয়াছিলেন এবং শেষটুকু আমাকে দান করিয়াছিলেন, আমি উহা পান করি। ইহার পর সর্বদা যখনই ক্ষুধা লাগিত আমি নিজের মধ্যে পরিতৃপ্তি অনুভব করিতাম এবং যখন গরম মনে হইত এবং তীব্র তৃষ্ণা পাইত, তখন শৈত্য ও ঠাণ্ডা অনুভব করিতাম।

তাঁহার ঐ সকল বরকত-এর মধ্য হইতে বকরীসমূহের দুধের ঘটনাবলীও অন্যতম। যথা উম্মে মা'বাদ এবং হযরত আনাস (রা)-এর বকরীসমূহের কিস্সা এবং ধাত্রী হালীমা সা'দিয়া যিনি রাসূল (সা) দুগ্ধ পানকারিণী ছিলেন, তাঁহার বকরী এবং তাহার উট-এর কিস্সা, অথবা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ঐ বকরীর কিস্সা যাহাকে তখন পর্যন্ত 'পাঁঠা' স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই এবং হযরত মিকদাদ (রা)-এর বকরীর কিস্সা ইত্যাদি।

তাঁহার ঐ বরকতসমূহের মধ্য হইতে ইহাও যে, তিনি সাহাবীগণকে একটি মশক-এর মুখ বন্ধ করিয়া সফরের খোরাকী হিসাবে দিয়া দেন এবং দু'আ করিয়া দেন। যখন নামাযের ওয়াক্ত আসিল, তখন সেই সাহাবীগণ অবতরণ করেন এবং উক্ত মশকটি খুলেন, তো দেখেন যে, উহাতে অতীব সুমধুর দুধ রহিয়াছে এবং উহার ফেনা মশকের মুখের উপর বিদ্যমান রহিয়াছে।

উমর ইব্ন সা'দের মাথার উপর স্বীয় মুবারক হস্ত বুলাইয়া দেন এবং বরকতের দু'আ করেন। ফলে তাহার আশি বৎসর বয়স হইয়া যায় কিন্তু তখনও তিনি যুবক ছিলেন এবং যৌবনাবস্থায়ই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করেন। শিফা গ্রন্থকার বলেন যে, এই ধরনের অসংখ্য কিস্সা ও কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। কায়স ইব্ন যায়দ জুযামীর মাথার উপর হাত রাখিয়া দু'আ করেন। তাই শত বৎসর বয়সের সময় যখন তাহার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল তখনও ঐ অংশ যেখানে রাসূল (সা)-এর মুবারক হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল কাল ছিল। আর আবেদ ইব্ন আমর হুনাইনের যুদ্ধের দিন জখমি হইয়াছিল, তো রাসূল (সা) তাহার মুখকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ দু'আ করেন, ফলে তাহার চেহারা সর্বদা জ্বলজ্বল করিত এবং গোররুন (উজ্জ্বল চেহারা) উহার নাম হইয়া যায়। অন্য এক ব্যক্তির চেহারার উপর রাসূল (সা) তাঁহার মুবারক হস্ত বুলাইয়াছিলেন, ফলে তাহার চেহারা সর্বদা জ্যোতির্ময় থাকিত।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন খাত্তাবের মাথার উপর পবিত্র হস্ত বুলান। তিনি বেঁটে ছিলেন অথচ তাহার পিতা দীর্ঘাকৃতির ছিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তাহার জন্য বরকতের দু'আ করেন। ফলে লোকদের মধ্যে তাহার শির উঁচু, সুশ্রী, সুন্দর হইয়া গিয়াছিল।

যায়নাব বিন্‌ত উম্মে সালামার চেহারার উপর রাসূল (সা) পানির ছিঁটা দিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার চেহারা এত সুন্দর ও সুশ্রী হইয়া গিয়াছিল যে, কোন মেয়েলোক এমন সুন্দরী ও রূপবতী দেখা যায় নাই। বলা হয় যে, এই পানির ছিটা ঠাট্টা ও উপহাস হিসাবে মারিয়াছিলেন। সুবহানাল্লাহ! যখন তাঁহার ঠাট্টা ও উপহাসের এই অবস্থা, তাহা হইলে দৃঢ় ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও আকাংখার কি ক্রিয়া হইবে! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

হযরত হানযালা ইব্‌ন জুযায়ম-এর মাথার উপর রাসূল (সা) হাত রাখিয়া বরকতের দু'আ করিলেন। তাহার এই অবস্থা হইল যে, যে সকল ব্যক্তির চেহারা ফুলিয়া যাইত অথবা যে সকল বকরীর স্তন ফুলিয়া যাইত, তাহাদেরকে আনয়ন করিলে হযরত হানযালা রাসূল (সা) যেখানে তাঁহার মুবারক হস্ত রাখিয়াছিলেন ঐ স্থানকে স্পর্শ করাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ফুলা দূর হইয়া যাইত।

এক অন্য শিশুর মাথার উপর মুবারক হাত বুলাইয়াছিলেন। উহার মাথায় টাক ছিল, উহা ঐ সময়ই ঠিক হইয়া গেল এবং উহার মাথা চুলে ভরিয়া গেল। তাছাড়া যে কোন বাচ্চাই হউক যাহার উন্মাদ ও জিন্নের আছর হইত রাসূল (সা) উহার বুকের উপর মুবারক হস্ত রাখিতেন তখন উন্মাদ ভাব ও জিন্নের আছর দূর হইয়া যাইত।

উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ নামক এক ব্যক্তি ছিল। তাহার কয়েকজন স্ত্রী ছিল। উহারা একে অপরের চাইতে উত্তম সুগন্ধ মাখিত; কিন্তু উতবার (রা) সুগন্ধ তাহাদের সকলের উপর প্রবল থাকিত। উহার কারণ এই ছিল যে, রাসূলে আকরাম (সা) গরমের দরুন ফোস্কা পড়ার রোগ দেখা দেওয়ায় তাহার পেটে ও পিঠে স্বীয় মুবারক হস্ত বুলাইয়া দিয়াছিলেন।

রাসূলে আকরাম (সা)-এর মুবারক হস্তের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযাসমূহের মধ্যে হুনায়নের যুদ্ধের দিন এক মুষ্টি মাটি লইয়া কাফিরদের চেহারার উপর ছুঁড়িয়া মারা এবং ঐ দুষ্টদের চক্ষে নিক্ষেপ করা এবং কাফিররা প্রাধান্য লাভ করার পর এই মু'জেযার কারণে তাহাদের পরাজয়বরণ এবং পলায়ন করা। আর ইহা হইতে ইসলামের বিজয়ের পথ সুগম হয়।

হযরত আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় রাসূল আকরাম (সা)কে আরোহণ করানোর পর হইতে তাঁহার বরকতে উহার চলনে দ্রুততার সৃষ্টি হইয়া যায়, যদিও ইহার পূর্বে উক্ত ঘোড়া অত্যন্ত সংকীর্ণ কদম ও ধীরগতিসম্পন্ন ছিল। তারপর উক্ত ঘোড়া এমন হইয়া যায় যে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন ঘোড়া উহার সমকক্ষ ছিল না।

হযরত জাবির (রা)-এর উটের মধ্যে অলসতা ও ধীরগতির পর চঞ্চলতা ও দ্রুতগতির সৃষ্টি হওয়া। উহার কারণ ছিল এই যে, রাসূলে আকরাম (সা) স্বহস্তে উহাকে সবুজ শাখা খাওয়াইছিলেন। তারপর তো উহার এমন অবস্থা হইয়া যায় যে, লাগাম দিয়াও থামাইয়া রাখা যাইত না।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর ধীরগামী গর্দভের উপর আরোহণ করা। অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালীন তুর্কী ঘোড়ার ন্যায় উহার মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার সৃষ্টি হওয়া এবং কোন পশু উহার চালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারা।

হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিতেন না। যখন রাসূলে আকরাম (সা) তাঁহার বুকের উপর মুবারক হস্ত বুলাইলেন, তখন তিনি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হইয়া যান।

ঐ সকল বরকত-এর মধ্যে ইহাও একটি যে, উক্কাশা (রা)-কে বদরের যুদ্ধে উহার তলওয়ার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর গাছের ডাল দিয়া দেওয়া হয় এবং উক্ত ডাল ধারাল তলওয়ারে পরিণত হইয়া যায়। অতঃপর উক্কাশা উহা দ্বারা সর্বদা প্রত্যেক স্থানে ও প্রদর্শনীতে লড়াই করিতেন। এমনকি ধর্মান্তরকারীদের সহিত জিহাদ করিতে যাইয়া শাহাদত বরণ করেন। তিনি উক্ত তরবারির নাম আউন অর্থাৎ সাহায্য রাখিয়াছিলেন। তদ্রূপ যখন উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ (রা)-কে খেজুরের ডাল দিয়া দেওয়া হয় তখন তিনি উহা দ্বারা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, যাহাদের হাতে তরবারি ছিল।

কাতাদা ইব্ন নু'মানকে অন্ধকার রাত্রে খেজুরের ডাল দিয়া দেওয়া এবং পথের মধ্যে উহা আলোকিত হইয়া যাওয়া এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া দেওয়া যে, যখন তুমি গৃহে যাইয়া পৌছিবে, তখন উহাতে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাইবে। তো ইহা হইতে কৃষ্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিও। কেননা, উহা শয়তান। বস্তুতঃ যখন তিনি গৃহে পৌছান তখন উক্ত কৃষ্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন।

ইহাও একটি অলৌকিক ব্যাপার যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস ভুলিয়া যাওয়ার অভিযোগ করা, এবং তাঁহাকে চাদর বিছাইবার নির্দেশ দান করা, তারপর স্বীয় পবিত্র হস্ত উক্ত চাদরের উপর রাখিয়া উহাকে উঠাইয়া বুকে লাগাইবার হুকুম দান করা এবং তাঁহার মুবারক হস্তের বরকতে বিদ্যা সংরক্ষণ শক্তি লাভ হওয়া সুপ্রসিদ্ধ।

অদৃশ্য জ্ঞানের সংবাদ দান করা

নবী আকরাম (সা)-এর অত্যুজ্জ্বল মু'জিযাসমূহের মধ্যে তাঁহার অদৃশ্য বস্তুর উপর অবহিত থাকা এবং যাহা কিছু ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হইবে ঐ সকল অদৃশ্য জ্ঞানের সংবাদ দান করা অন্যতম। মূলতঃ এবং সত্তাগতভাবে অদৃশ্যের জ্ঞান মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। কেননা, তিনিই হইলেন অদৃশ্যসমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। আর ঐ অদৃশ্য জ্ঞান যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র যবান হইতে এবং তাহার কোন কোন অনুসারীর পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, চাই উহা ওহীর মাধ্যমে হউক অথবা ইলহামের মাধ্যমে, তদ্সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ مَا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ খোদার কসম! আমি নিজ হইতে কোন কিছু জানি না কিন্তু ঐ সকল বিষয় জানি, যাহার সম্পর্কে আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আল্লামা কাযী ইয়ায (রা) শিফার মধ্যে বলিতেছেন যে, এই অধ্যায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এই যে, স্বকীয়ভাবে নবী (সা)-এর এই জ্ঞান অর্জিত ছিল না এবং অকাট্য ও সুনিশ্চিতরূপে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত দান হিসাবে তাঁহার ইলম ছিল এবং এই ইল্ম বহুল প্রচারিত রিওয়ায়াত পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে।

নবী আকরাম (সা) কর্তৃক অদৃশ্যসমূহের সংবাদ দান করা দুই প্রকারের। এক তো হইল এই যে, স্বয়ং কুরআন করীম তৎ সম্পর্কে বক্তব্য রাখিয়াছে ও স্বয়ং দান করিয়াছে।

অর্থাৎ কুরআন করীম অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ দান করিয়াছে এবং অতীত ও বর্তমান উম্মতগণের অবস্থা এবং বর্তমান যুগের কথা বর্ণনা করিয়াছে আর সৃষ্টজীবের শুরু ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে সংবাদ দান করিয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সকল বস্তুর বর্ণনা হাদীসসমূহেও আসিয়াছে।

এখন রহিল, যা কিছু কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করা। তন্মধ্য হইতে একটি হইল নবী আকরাম (সা)-এর সহিত কুরআনের বিরোধিতাকালে কুরআন কর্তৃক এই সংবাদ দান করা যে, কেহই কুরআনের সমতুল্য এক সূরাও আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

অর্থাৎ "যাহা কিছু আমি আমার বান্দার উপর অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তোমাদের উহাতে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তোমরা উহার ন্যায় একটি সূরাই পেশ কর দেখি!" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَنْ تَفْعَلُوْا وَلَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ "উহারা কখনও করিতে পারিবে না এবং উহার সমতুল্য কখনও আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে না।" বস্তুত এ কাফিরদের উপর এই সংবাদের সত্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন ইহার বর্ণনা কুরআনের অলৌকিকতার অধ্যায়ে চলিয়া গিয়াছে। কুরআনের ঐ গাইবী সংবাদসমূহের মধ্য হইতে একটি ইহা, যাহা বদরের কিস্সার পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنَ -

"এবং যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, ঐ দুই দলের মধ্যে একটি তোমাদের জন্যে রহিয়াছে এবং তোমরা এই কামনা করিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের প্রাপ্ত হউক" (সূরা আনফাল ঃ ৭)।

কুরায়শদের দুইটি কাফেলা ছিল। উহাদের মধ্যে একটি দলের গনীমতের মাল ও ধনদৌলত বেশী ছিল এবং অসুবিধাদি কম ছিল। আর দ্বিতীয় কাফেলা ইহার বিপরীত ছিল। মুসলমানরা ঐ কাফেলার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছিল যাহাদের ধন-দৌলত বেশী ছিল এবং অসুবিধাদিও কম ছিল। ইহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা যাহা তাহাদের অন্তরে ছিল সংবাদ দান করিলেন এবং বিজয় ও সাফল্যের এবং স্বীয় মদদ ও সাহায্যের কথা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিলেন। শত্রুদের সহিত মোকাবিলা হওয়ার পূর্বে এই সকল কথা হইয়াছিল। ইহা সকলই অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রকারের মধ্য হইতে ছিল। পূর্ণ ঘটনা বদরের কাহিনীর বর্ণনায় আসিবে।

www.pathagar.com

আর কুরআনের ঐ অদৃশ্য সংবাদসমূহের মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদও একটি যে, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "খুব শীঘ্রই কাফিরের দল পরাজয় বরণ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পলায়ন করিবে।" এই পবিত্র আয়াতটিও কুরায়শ কাফিরদের অবস্থা প্রকাশকল্পে অবতীর্ণ হয় এবং বদরের যুদ্ধের দিন ইহার বিকাশ লাভ হয়। যদিও উহারা সৈন্য সংখ্যায় সহস্রাধিক এবং বিভিন্ন ধরনের সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা তিন শত তের এর বেশী ছিল না। ইহাদের নিকট মাত্র দুইটি অশ্ব ছিল, একটি হযরত যুবায়র (রা)-এর নিকট, দ্বিতীয়টি হযরত মিকদাদ (রা)-এর নিকট ছিল। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং উহাদের বড় বড় কাফির সর্দারকে হত্যা করার শক্তি দান করেন এবং উহাদের সাজ-সরঞ্জামাদিকে গনীমতের ধন বানাইয়া দেন।

আর কুরআনের ঐ গায়েবী সংবাদসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, سَنُلْقِى فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ। খুব শীঘ্র আমি ঐ কাফিরদের অন্তরে আতংকের উৎপত্তি করিয়া দিব (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১)। ইহাতে উহুদের দিনে মক্কার কাফিরদের উপর যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল প্রকাশ করা হইয়াছে। যদিও ঐদিন উহাদের এক প্রকার বিজয় হইতে চলিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের অন্তরে এমন আতংক ও ভয় সৃষ্টি করিয়া দেন যে, ফলে উহারা মক্কার দিকে ফিরিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল এবং প্রত্যাবর্তনকালে আবূ সুফিয়ান, যিনি তখন মক্কার মুশরিকদের দলপতি ছিলেন, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! যদি তুমি চাও তো আগামী বৎসর বদর নামক স্থানে আবার শক্তির পরীক্ষা হইবে। তদুত্তরে নবী (সা) বলিলেন যে, যদি খোদা চাহেন তবে। কাফির ও মুশরিকরা মক্কার পথে ফিরিয়া যাওয়ার পর পথের মধ্যে লজ্জিত হইয়া পড়ে এবং তাহারা উল্টা ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় আক্রমণ করতঃ মুসলমানদের মূলোৎপাটিত এবং নস্যাৎ করিয়া দিতে মনস্থ করিল।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ভীতি ও আতংক বিস্তার করিয়া দিলেন, তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে সাহস পাইল না এবং মক্কা চলিয়া গেল।

আর কুরআনের ঐ গায়েবী সংবাদসমূহের মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ ঃ

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ (الى قوله) لاَ يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ

"উহারা স্বীয় পরাজয় লাভের পর খুব শীঘ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজয়ী হইবে আর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওয়াদার বিপরীত কিছু করেন না।"

এই পবিত্র আয়াতের শানে নুযূল হইল কায়সার ও কিস্রার যুদ্ধ। যখন কিস্রা কায়সার-এর উপর বিজয় লাভ করিল, তখন মক্কার মুশরিকরা কিস্রার ভালবাসায় বড় আনন্দিত হইল। কেননা, কিসরা অগ্নি উপাসক ছিল এবং কোন কিতাব মানিয়া চলিত না এবং কায়সার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল এবং গ্রন্থধারী ছিল। মক্কার মুশরিকরা বলিতে লাগিল যে, আমাদের ভাই অর্থাৎ অগ্নি-উপাসক তোমাদের ভাই অর্থাৎ গ্রন্থধারীদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আমরাও তোমাদের উপর জয়ী হইব। কিন্তু সাত বৎসর পর যে বৎসর

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিসরার উপর কায়সার জয়লাভ করে এবং পারসিক ও অগ্নিপূজকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দেয়।

আর ঐ কুরআনী ভবিষ্যতবাণীসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ ঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

"আর ঐ ইয়াহূদীরা কখনও উহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না, ঐ দুষ্কার্যের দরুন যাহা উহাদের হস্তসমূহ পূর্বে পেশ করিয়াছে।" (সূরা জুমুআ ঃ ৭)

এই আয়াতে পাকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে, ইয়াহূদীরা কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না, অন্তরের দ্বারাও না, মুখেও না। যদিও এই কামনা করার তাহাদের ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং ইহা সকলই এমন গাইবী সংবাদ যে, যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ হইয়া রহিয়াছে। যদি তাহারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকিত, তা হইলে উহা উল্লেখ থাকিত, এবং উহার প্রচারও হইত। এবং এক মারফূ' হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যদি উহারা মৃত্যু কামনা করিত তাহা হইলে ঐ সময়ই মারা যাইত। এবং পৃথিবীর বুকে একটি ইয়াহূদীও অবশিষ্ট থাকিত না। আর ভবিষ্যতেও যদি উহারা এইরূপ কামনা করে, তো ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে ঐ সময়ই মারা যাইবে। যেন উহারা এই কথায় বিশ্বাসী যে, যদি কামনা করি তাহা হইলে মারা যাইব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ। ইয়াহূদীদের উপর অপমান এবং লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহুদীরা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে নিকৃষ্টতম কাফির প্রতীয়মান হইয়াছে যেরূপ হাদীসে খবর দেওয়া হইয়াছে। আর কুরআনের ঐ অদৃশ্য সংবাদসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ যে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

এবং যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তিগণকে প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন। (সূরা নূর ঃ ৫৫)

ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওয়াদা যে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে পৃথিবীতে প্রতিনিধি, মানুষের নেতা এবং নির্দেশ ও কল্যাণের অধিকারী বানান হইবে। উহাদের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করিবে, এবং আল্লাহ্র বান্দা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবে এবং ভয়-ভীতির পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে নিরাপদ ও নির্ভয় বানাইয়া শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তুলিবেন এবং অসহায় অবস্থার পর উহাদিগকে শাসনকর্তা বানাইবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ওয়াদা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্র চাইতে শ্রেষ্ঠ ওয়াদা পূর্ণকারী কে হইতে পারিবে ? (وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ)

www.pathagar.com

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুনিয়া হইতে ঐ সময় পর্যন্ত বিদায় লইয়া যান নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা মুকার্‌রমা, খায়বর, বাহ্‌রায়ন এবং আরব উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশ এবং ইয়ামানের পূর্ণভূমিকে জয় করাইয়া না দিয়াছিলেন এবং জেরুজালেম অঞ্চলের কোন কোন অংশের অগ্নি-উপাসকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন এবং রোম সম্রাট হিরাকল এবং মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মাকুকাস যাহার নাম ছিল, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপঢৌকন ও হাদিয়া প্রেরণ করেন। আর আম্মান ও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ঈমান আনয়ন করেন এবং যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুনিয়া হইতে চলিয়া যান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা পসন্দ করিলেন, যাহা তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য ছিল, তখন তাহার পরে সর্বপ্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) দ্বারা হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অবস্থার সংশোধন করতঃ ঐ সকল লোকদিগকে যাহারা নবী (সা)-এর ওফাতের পরে পেরেশান ও হীনবল হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে একত্রিত করতঃ শক্তিশালী বানাইয়াছিলেন এবং উহাদিগকে কার্য্য ক্ষেত্রে এমন বীররূপে গঠিত করিয়াছিলেন যাহাদের মোকাবেলা করিতে বড় বড় সাহাবীগণের মধ্য হইতে একজনও এই সাহস রাখিতেন না এবং ঐ ফেত্‌না হইতে দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিতেন না। তাহারা সকলে বিরত থাকার পক্ষে রায় দিতেছিলেন কিন্তু তিনি সাহসিকতা ও বীরত্বের সহিত কোমর বাঁধিলেন এবং আরব উপদ্বীপকে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর পারস্য সাম্রাজ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ-এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিলেন। তিনি বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং দ্বিতীয় বাহিনী হযরত উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা)-এর নেতৃত্বে জেরুজালেমের ভূমির দিকে প্রেরণ করেন। আর তৃতীয় লশকর হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নেতৃত্বে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। জেরুজালেমের বাহিনী তাহাদের যুগে বুসরা, দামাশক এবং উহার নিকটবর্তী রাজ্য খুরান ইত্যাদির মধ্যে বিজয় লাভ করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকেও এই দুনিয়া হইতে লইয়া যান। তাহার জন্য উহাকে পসন্দ করেন যাহা স্বীয় রহমত ও করুণায় তাহার নিকট উত্তম ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ইলহামের মাধ্যমে দয়া ও অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাহার পর হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা মনোনীত করেন। তাঁহার পর তিনি চারিত্রিক শক্তি এবং পূর্ণ ন্যায় বিচারের সহিত পূতঃ পূর্ণরূপে রাষ্ট্র পরিচালনকারী হইলেন এবং জেরুজালেমের সকল শহর সম্পূর্ণরূপে এবং মিসর রাজ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হয়। এবং কিস্‌রার আধিপত্য নস্যাত করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে সীমাহীন অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। তাহার সাম্রাজ্যের সকল নিভৃত কোণ পর্যন্ত দখল করিয়া লওয়া হয়। রোম সম্রাট কায়সারকে জেরুজালেম হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডয়ন করা হয়। ঐ দেশসমূহের ধন-সম্পদকে খোদার রাস্তায় মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং ওয়াদা দান করিয়াছিলেন ঐরূপই হইয়াছিল। ইহার পর উসমানী খিলাফতের সময় ইসলামী

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের ধারা পূর্ব ও পশ্চিম-এর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগে স্পেন, কিরওয়ান সাবতা এবং উহার সংলগ্ন মুহিত সাগর জয় করিয়া পূর্বদিকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামী সীমানা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিসরাকে হত্যা করতঃ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে উহার সাম্রাজ্যকে বিলীন করিয়া দেওয়া হয়। মাদায়েন, ইরাক, খুরাসান এবং আহওয়াজকে জয় করে এবং মুসলমানেরা তুর্কীদের সহিত জোরপূর্বক লড়াই করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম হইতে খাজনা আসিতে থাকে। ইহা সকলই কুরআন আযীমের তিলাওয়াত ও উহার বরকতের বদৌলতে লাভ হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) কুরআন কারীমের অত্যধিক এবং নবীর হীন খেদমত করিয়াছেন এবং তাঁহার সময় অধিকাংশ ইসলামী শহর বিজয় লাভ হইয়াছে। তাঁহার পর একমাত্র খলীফা এবং সত্য ইমাম হযরতা আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খিলাফতনশীন হন। কিন্তু লোকেরা তাঁহার সম্মান ও মরতবা জানিতে সক্ষম হয় নাই এবং বিরোধিতা ও ঝগড়ার প্রবাহের দিকে চলিয়া যায় এবং তাঁহার বিরোধিতায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন)।

তূরপশতী— যিনি ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের হানাফী মাযহাবের আলিমদের মধ্য হইতে এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—স্বীয় আকাঈদের কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বিরোধিতাকারীদের তিনটি দল। একদল হইল যাহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই, দ্বিতীয় দল হইল, যাহারা দুনিয়ার ভালবাসার উপর নিমজ্জিত ছিল, তৃতীয় দল হইল, যাহারা ইজতিহাদ করিতে যাইয়া ভুল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হযরত আইশা (রা), হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র প্রমুখের ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাস রাখা অনুচিত।

কুরআনের ঐ অদৃশ্য সংবাদসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ যে,

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

তিনি ঐ সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাতে উহাকে সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করিতে পারেন। (সূরা ফাত্হ ঃ ২৮)

এই ইরশাদ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা ইসলাম হইবে। যেমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহা সকল দীনের উপর তেমনি বিজয়ী রহিয়াছে।

কুরআনের অদৃশ্য সংবাদসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদও রহিয়াছে যে,

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ

"যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও জয় আগমন করিবে এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে দীনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিবে।"

নবী আকরাম (সা) এই পৃথিবী হইতে এমন অবস্থায় বিদায় লইয়া গিয়াছেন যে, আরবের শহরসমূহের মধ্য হইতে কোন স্থান এমন ছিল না যেখানে ইসলামের বিধান প্রবর্তিত না হইয়াছিল। আর অদৃশ্য সংবাদসমূহের দ্বিতীয় প্রকার, যৎসম্পর্কে হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে এক ঐ রিওয়ায়াত হইল যাহা হযরত হুযায়ফা ইয়ামান (রা) বর্ণনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দান করেন এবং উহাতে এমন কোন বস্তুর বর্ণনা বাদ দেওয়া হয় নাই যাহা কিয়ামত পর্যন্ত হইতে থাকিবে তন্মধ্য হইতে কাহারও কিছু স্মরণ আছে এবং কেহ কিছু কিছু ভুলিয়া গিয়াছে। কখনও এমন হইয়া থাকে যে, আমরা বাহ্যতঃ কোন বস্তুকে ভুলিয়া যাই কিন্তু যখন ঐ বস্তু সম্মুখে আসিয়া যায় এবং উহাকে দেখিয়া লই, তখন জ্ঞাত হই এবং উক্ত কথা স্মরণ হইয়া যায়। যেরূপ ঐ ব্যক্তি যাহার চেহারা বহুদিন পর্যন্ত অগোচর থাকায় কেহ ভুলিয়া যায়, কিন্তু যখন সে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে সে চিনিয়া লইতে পারে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি এই ধারণা পোষণ করি না যে, আমার সহচরবৃন্দ ঐ সকল কথাকে জানিয়া-শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন, বরং আল্লাহ্র কসম! তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত যত ফেতনার উদ্ভব হইবে উহার প্রত্যেকটি সম্পর্কে নবী আকরাম (সা) অতীব স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা দান করিয়াছেন। এমনকি দুষ্কৃতিকারীদের নাম, উহাদের পিতার নাম এবং উহাদের কবীলাসমূহের নাম পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। প্রথমত ফেত্না সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত পর্যন্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের অনুসরণকারীদের কোন সীমা-সংখ্যা নাই।

হযরত আবূ যার (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট কোন বস্তুর বর্ণনা দান করা বাকী রাখেন নাই। এমনকি ঐ পাখির বর্ণনা পর্যন্ত দান করিয়াছেন, যে পাখি আকাশে পাখা ছড়াইয়া দিয়া থাকে।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক দাজ্জালের বর্ণনার অধ্যায়ে রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের কাছে দশ অশ্বারোহী আসিয়া পৌঁছিবে। আমি তাহাদের নাম ও উহাদের পিতাদের নামসমূহ জানি, এবং উহাদের অশ্বসমূহের রং সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। উহারা পৃথিবীর বুকে অতি উত্তম অশ্বারোহী হইবে।

নিঃসন্দেহরূপে হাদীসের ইমামগণ সহীহ্ হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিশ্বনেতা নবী (সা) স্বীয় উম্মতদিগকে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের কর্তৃক শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করা, মক্কা মুকাররামা, বায়তুল মুকাদ্দাস, ইয়ামন, শাম এবং ইরাক বিজয় এবং রাস্তার মধ্যে এমন নিরাপত্তা ও শান্তির ওয়াদা করিয়াছেন যে, যদি কোন মহিলা একেলা হার্‌রাহ হইতে মক্কার দিকে ভ্রমণ করে তো তাহার একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় হইবে না, যেমন হাদীসে আসিয়াছে। আর পবিত্র মদীনায় অবস্থান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার উম্মতের পৃথিবীর উপর বিজয় দান করা এবং কায়সার ও কিস্‌রার ধন-ভাণ্ডার উহাদের মধ্যে বন্টন হওয়া এবং কিস্‌রা ও পারস্যের পর না কিসরা থাকিবে না কায়সার, এই সংবাদ দান করা। তো কিসরা এবং উহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যেরূপ সে নবী আকরাম (সা)-এর পবিত্র পত্রকে টুকরা টুকরা করিয়াছিল। আর কায়সার জেরুজালেম হইতে পলায়নের পথ অবলম্বন করে এবং তাহার রাজ্যসমূহ ইসলামী ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং মুসলমানরা তাহার অন্যান্য রাজ্যসমূহকে জয় করিয়া লয়। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের যুগে এই সকল বিজয় লাভ হয়। সম্মুখেও এই সম্পর্কে আলোচনা আসিবে।

www.pathagar.com

আর এই সকল যে, নবী আকরাম (সা)-এর পর ফেতনার উৎপত্তি হওয়া, প্রবৃত্তির পূজারী হওয়া অতীতের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আচরণ গ্রহণ করা এবং উম্মতদের তেহাত্তর দলে বিভক্ত হওয়া, এবং এক দলের নিষ্কৃতি লাভ করা, আরাম ও আয়েশের স্বভাব গড়িয়া তোলা এবং সকাল, সন্ধ্যা পৃথক পৃথক পোশাক পরিধান করা, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা, গৃহে ফরাশ বিছানো, ছাদে ও প্রাচীরে পর্দা লটকানো, যেমন কা'বাগৃহে লটকানো রহিয়াছে, গর্বভরে চলা এবং নানাপ্রকার খাবার রান্না করা, পারস্য ও রোমের কন্যাদের ন্যায় মেয়েদের দ্বারা সেবা গ্রহণ করার সংবাদ দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যখন উহারা এইরূপ করিবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন এবং উহাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়াইয়া পড়িবে। সৎ লোকের স্থান অসৎ লোক দখল করিবে। পুণ্যবান লোকদিগকে তাহাদের সম্মুখ হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে। আরও সংবাদ দিয়াছেন যে, এই সময় ও যুগ খুব দ্রুত অতিবাহিত হইয়া যাইবে। কিয়ামতের পূর্বে বিদ্যা উঠিয়া যাইবে। বিদ্বান ব্যক্তিও পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবেন এবং ফেত্নার যমানা প্রকাশিত হইবে সর্বত্র দুস্কর্ম ও অপকর্ম মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে। যাহার সূচনাকাল হইল হযরত উসমান (রা)-এর ঘটনা হইতে হার্‌রার ঘটনা পর্যন্ত। এবং হাররার অপকর্মসমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্যতম ঘটনা হইল, যাহা ইয়াযীদের যুগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমি মদীনার ইতিহাসে ইহার বর্ণনা দান করিয়াছি।

আর মুসায়লামা কায্যাবের ফেত্না ও ফাসাদের সংবাদ দান করা হইয়াছে, তাহার মুরতাদ হইয়া যাওয়া সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বলিয়াছেন যে, আরবের প্রতি আফসোস যে, সেই সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আরও বলিয়াছেন যে, আমার জন্য যমীনকে লেপটানো হইয়াছে এবং আমাকে উহার পূর্ব ও পশ্চিমকে প্রদর্শন করান হইয়াছে এবং সেই যুগ খুব সন্নিকট যে, যে পর্যন্ত আমাকে যমীন ভাঁজ করিয়া দেখান হইয়াছিল ঐ পর্যন্ত আমার উম্মতের দখলে আসিবে। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষের রাজত্ব সুদীর্ঘ হইবে যাহার পরিধি পূর্ব প্রান্ত হইতে তানজা সমুদ্র পর্যন্ত হইবে, যাহার পর কোন প্রাচীর অথবা বসতি থাকিবে না। আর অতীতের উম্মতগণের মধ্য হইতে কাহারও এর বড় সুদীর্ঘ রাজত্ব হইবে না। না দক্ষিণে, না উত্তরে।

আর বলিয়াছেন যে, আরববাসী সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এমনকি কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে। আরববাসী বলিতে কোন কোন আরববাসী অর্থ লওয়া হইয়া থাকে। কেননা আরব (عرب) শব্দের রা-এ জযম দিয়া পাঠ করিলে উহার অর্থ বালতি হইয়া থাকে। কারণ, আর্‌বরা বালতি দ্বারা পানি দেওয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আবার কেহ কেহ আরববাসী দ্বারা পশ্চিম দেশগুলি অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ, তাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ লোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং কোন কোন রিওয়ায়াতে 'আহলে মাগরিব' আসিয়াছে। এই রিওয়ায়াত অর্থের দিক হইতে কল্যাণ ও মঙ্গলের অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অপর এক হাদীসে আবূ উমামা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দীনের শত্রুদের উপর পরাক্রমশালী ও বিজয়ী থাকিবে। এমনকি কিয়ামত আসিয়া যাইবে, তাহারা সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই সকল লোক কোথায় থাকিবে ? বলিলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে।

www.pathagar.com

আর নবী করীম (সা) বনী উমায়্যার রাজত্বের এবং হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকর্তা হওয়ার সংবাদ দান করেন এবং বলেন যে, "জানিয়া রাখ, শেষ বয়সে তুমি আমার উম্মতের শাসনকর্তা হইবে এবং যখন শাসনকর্তা হইবে, তখন পুণ্যবানদের সংস্রব গ্রহণ করিও এবং অসৎ লোকদের হইতে দূরে থাকিও।" হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন যে, আমার ঐদিন হইতে আশা হইয়া গিয়াছিল যে, আমি রাজত্ব পরিচালনায় নিমজ্জিত হইব। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন, নবী আকরাম (সা) বলিয়াছেন যে, মুবিয়া (রা) কখনও পরাজিত হইবে না। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু সিফফীনের যুদ্ধের দিন বলিতেছিলেন যে, যদি আমি এই হাদীসটি প্রথমে শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আমি কখনও মুআবিয়ার (রা) সহিত যুদ্ধ করিতাম না।

আর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান আছে। জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও। বস্তুতঃ পুত্র সন্তান হওয়ার পর নবী (সা)-এর খিদমতে লইয়া আসিলেন। তখন ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিয়া দিলেন এবং মুবারক থুথু তাহাকে চাটাইয়া দিলেন এবং উহার নাম আবদুল্লাহ্ রাখিলেন এবং বলিলেন যে, এ আবুল খুলাফা হইবে।

আর আরবের উপর তুর্কীদের বিজয়ের সংবাদ দান করিয়াছেন। বনী আব্বাসগণের কাল পতাকাসহ বাহির হওয়া এবং তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করা এবং বৃহৎ এলাকা দখল করিয়া লওয়া এবং রাসূলের বংশের সন্তান দেখিবামাত্র হত্যা করা এবং কঠোর কষ্টদানের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শহীদ হওয়ার সংবাদ দান করেন, এবং বলেন যে, সম্প্রদায়ের সেই ব্যক্তি অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য হইবে, যে তাঁহার মস্তক ও দাড়িকে রক্তাক্ত করিয়া দিবে। আর বলিয়াছেন যে, আলী মুরতাযা (রা) জান্নাত এবং দোযখের বন্টনকারী হইবে, সে স্বীয় বন্ধুদিগকে জান্নাতে এবং স্বীয় শত্রুদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে। আর ঐ সংবাদসমূহ হইল ইহার ভিত্তি, যাহা অন্যান্য হাদীসসমূহে হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর ফাযায়েল সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। কিতাবে শিফাতে বলা হইয়াছে যে, হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শত্রুরা দুই দল। এক খারেজী, দ্বিতীয় নাসিবী। আর রাফিযীদের ঐ দল যাহারা তাঁহার প্রতি সম্বন্ধ করিয়া থাকে। ওলামা কিরাম তাহাদিগকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। (এইরূপ শিফাতে উল্লেখ করা হইয়াছে)

হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু'র ফযীলত বর্ণনায় অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের সহিত তাহার এক প্রকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। কারণ, ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে শত্রু মনে করিয়া থাকে এবং তাহার পবিত্রা সম্মানিতা মাতার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়া থাকে। আর খৃষ্টানরা ভালবাসার দাবী করিয়া থাকে এমনকি তাহারা তাঁহাকে এমন স্তরে লইয়া যায়, যাহা তাঁহার যোগ্যনসে এবং হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন যে, আমার সম্পর্কে দুইটি দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এক মাত্রাতিরিক্ত মহব্বতকারীর দল, যাহারা আমার এমন প্রশংসা করিবে যাহা আমার মধ্যে নাই এবং দ্বিতীয়

www.pathagar.com

দল হইল বিদ্বেষ পোষণকারীর দল, যাহারা আমার উপর শত্রুতা পোষণ করিয়া থাকে এবং আমার প্রতি অপবাদ দান করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসমান যুন্-নূরায়ন (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ দান করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, "এই অবস্থায় শহীদ হইবে যে, তখন সে কুরআন তিলাওয়াত করিতে থাকিবে" এবং বলা হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার রক্ত কুরআনে কারীমের পবিত্র আয়াত, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ -এর উপর পতিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে অন্যায়রূপে শহীদ করা হইবে। আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উছমান (রা)-কে এক জামা পরিধান করাইবেন এবং লোকেরা তাহার পবিত্র দেহ হইতে উক্ত জামাকে নামাইয়া ফেলিতে চাহিবে (জামা পরিধান করাইবেন দ্বারা খিলাফত অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে)। এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট বলিয়াছেন, যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা জামা পরিধান করাইবেন, তখন তোমার উপর আবশ্যক হইবে যে, তুমি উহাকে নিজ দেহ হইতে নামাইবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসমান (রা)-কে বেহেশতের সুসংবাদ দান করিয়াছেন এবং ঐ পরীক্ষার সংবাদ দান করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছ।

আর তিনি বলিয়াছেন, যতদিন হযরত উমর ফারূক (রা) জীবিত থাকিবেন, ফেত্নার উৎপত্তি হইবে না। আর হযরত উমর (রা)-কে শহীদ করা হইবে— এই সংবাদও দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তিনি শহীদ হইবেন। আর হযরত আলী (রা)-এর সহিত হযরত যুবায়র (রা)-এর যুদ্ধ করা এবং উহার পর তাঁহার লজ্জিত হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। আর নবী করীম (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কোন একজনের উপর 'হাওয়াব' নামক স্থানে— যাহা পবিত্র মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী এক স্থান— কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ করা এবং তথায় নিহতদের স্তূপ হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ হযরত আইশা (রা)-এর উপর দিয়া এই অবস্থা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যখন তিনি বসরার দিকে যাইতেছিলেন, যাহাকে জামাল-এর ঘটনা বলা হইয়া থাকে।

হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে সংবাদ দান করেন যে, তাহাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করিবে। তাহাকে হযরত মুআবিয়া (রা) -এর সহচরবৃন্দ হত্যা করে। এই সংবাদ বহুল প্রচারিত সংবাদ পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নিকট বলিয়াছেন, তোমার প্রতি লোকদের আফসোস রহিয়াছে এবং তোমারও লোকদের প্রতি আফসোস রহিয়াছে। বস্তুত হাজ্জাজ-এর আদেশ হইতে তাঁহার ঐরূপই হইয়াছিল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বলিয়াছেন যে, তুমি স্বীয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা উহা পুনরায় তোমাকে ফিরাইয়া দিবেন।

হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা এবং হযরত হযরত জা'ফর ইব্ন আবী তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ দান করেন। এবং মাওতার যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা)-এর বিজয় লাভের সংবাদ দান করেন। অথচ মাওতা একমাস দূরত্বের পথ ছিল।

www.pathagar.com

'কুরনান' নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে আসিল। তিনি তাহাকে জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দান করিলেন। ইহার ঘটনা এই যে, কোন এক যুদ্ধে সে এইরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিল যে, লোকেরা অবাক হইয়া গেল এবং খুব সম্ভব কোন কোন সাহাবীর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাহার সম্পর্কে জাহান্নামী হওয়ার সংবাদের প্রতি সন্দেহ হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত সে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ায় তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, তারপর সে স্বীয় তরবারি দ্বারা নিজ হস্তেই নিজকে হত্যা করিয়া ফেলিল। যখন লোকেরা ইহার এই সংবাদ প্রদান করিল, তখন বলিলেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রাসূল।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দলকে— যাহাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা, সামুরা ইব্ন জুনদুব এবং হুযায়ফা (রা) ছিলেন— বলিয়াছিলেন যে, তাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি সর্বশেষে মারা যাইবে সে দুনিয়ার আগুনে জ্বলিয়া মারা যাইবে। তো তাহাদের মধ্যে সর্বশেষে যিনি মারা যান তিনি হইলেন সামুরা (রা)। ইনি বহু বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শরীর গরম রাখার নিমিত্ত অগ্নি তাপাইতেন। অবশেষে সেই অগ্নিই তাহার জীবন কাড়িয়া লইয়া যায়। আর উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত হানযালা (রা)-এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ফেরেশতা তাহাকে গোসল করাইতেছে। বলিলেন, তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, প্রকৃত ঘটনা কি? হযরত হানযালার স্ত্রী বলিলেন যে, তিনি জুনুবী ছিলেন, তাঁহার গোসলের প্রয়োজন ছিল। হযরত হানযালা (রা) যখন শুনিতে পাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখন তিনি ঐ অবস্থায় উঠিয়া চলিয়া গেলেন, গোসল করার আর সুযোগ হয় নাই এবং শহীদ হইয়া যান। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, আমি তাঁহার মাথা হইতে পানির ফোঁটা পড়িতে দেখিলাম। আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, ছাকীফে মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী হইবে। বস্তুতঃ উপরোক্ত দুই গুণবিশিষ্ট লোক তথায় পাওয়া গিয়াছে। মুখতার ইব্ন উবায়দকে (কায্যাব) মিথ্যাবাদী বলা হইয়া থাকে এবং হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে হত্যাকারী বলা হয়। মুখতার-এর কাহিনী 'আসমাউর রিজাল'-এর কিতাবসমূহে দেখিয়া নিন।

সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা (রা) -এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমার এই সন্তান নেতা হইবে। উহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিবেন। এই কাহিনীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর সহিত সন্ধিবদ্ধ হওয়া। যেমন প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহ্রা (রা সম্পর্কে সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আমার বংশধরগণের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম সে আমার সহিত মিলিত হইবে। তো নবী করীম (সা) এই দুনিয়া হইতে পদার্পণ করিয়া যাওয়ার আট মাস অথবা ছয় মাস পর তিনি ওফাত পান।

আরও বলিয়াছেন যে, আমার স্ত্রীগণের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম আমার সহিত সাক্ষাতকারী ঐ স্ত্রী হইবে, যাহার হস্ত দীর্ঘ হইবে। ইহার অর্থ হইল উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব (রা) কারণ, তাঁহার হস্ত কাজকর্মে এবং দান-খয়রাতে উদার ছিল (শেষ হাদীস পর্যন্ত)

www.pathagar.com

সায়্যিদুনা ইমাম হুসায়ন (রা)-এর ‘তাফ্’ নামক স্থানে শহীদ হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন এবং উহার নিদর্শনও বলিয়া দিয়াছেন যে, তাহাকে কালা বিষাক্ত কুকুর كلب) (فعى। হত্যা করিবে। উহার নাম শিমর ইব্‌ন যিলজওশন ছিল। এবং স্বীয় পবিত্র হস্ত হইতে সামান্য মাটি বাহির করিয়া বলিলেন, ইহা তাহার নিহত স্থানের মাটি।

আর সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আমার পর (একাধারে) ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খিলাফত হইবে। উহার পর রাজতন্ত্র ও বাদশাহী চালু হইবে। অপর এক রিওয়ায়াতে ملك عضوض অত্যাচারী বাদশাহ'র কথা বলা হইয়াছে। ইহার সূচনা নুবুওয়াত ও রহমতের দ্বারা হইয়াছে, ইহার পর খিলাফত ও রহমত, অতঃপর অত্যাচারী বাদশাহী, ইহার পর অত্যাচারী দাস শাসন এবং বিশৃংখলার যুগ হইবে এবং ইহা প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন। ইহার পর এক শিং বাহির হইবে। আর বাদশাহ ও আমীরদের নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে শেষ সময়ের দ্বারা কাজ লইবে, এবংআখিরী ওয়াক্তে নামায আদায় করিবে। রাসূল (সা) আরও বলিয়াছেন যে, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ মিথ্যাবাদী দাজ্জালের জন্ম হইবে। এবং উহাদের মধ্যে চারজন মেয়েলোকও হইবে। আর উহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকেই খোদা এবং তাঁহার রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করিবে। আর উহাদের সমাপ্তি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল দ্বারা হইবে। অর্থাৎ সে শেষ যামানায় আবির্ভূত হইবে। অন্য এক স্থানে আসিয়াছে যে, উহারা সকলেই নবী বলিয়া দাবী করিবে।

আরও বলিয়াছেন যে, খুব শীঘ্র তোমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক অনারব ব্যক্তি এমন হইবে, যাহারা তোমাদিগকে হত্যা করিবে এবং ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাহ্‌তানের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের উপর শাসনকর্তা এবং বাদশাহ না হইবে এবং সে লোকদিগকে স্বীয় লাঠি দ্বারা না মারিবে। আরও বলিয়াছেন যে, خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হইল আমার যুগ, ইহার পর ঐ যুগ যাহা ইহার সংলগ্ন হইবে, তারপর উহা যাহা ইহার সংলগ্ন হইবে, তারপর উহা যাহা উহার সংলগ্ন হইবে। ইহার অর্থ হইল সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে তাবিঈন-এর যুগ। বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে বর্ণনাকারীর সন্দেহের সহিত চারবার আসিয়াছে, ইহার পর মিথ্যা বিস্তার লাভ করিবে।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, লোকেরা নিজ হইতেই আসিয়া সাক্ষ্য দিবে, অথচ সাক্ষ্যদানের জন্য কেহ তাহাকে ডাকিবে না। লোকেরা খিয়ানত করিবে, আমানত পরিশোধ করিবে না এবং ওয়াদা করিয়া উহা পূর্ণ করিবে না।

আরও বলিয়াছেন, কোন যামানা এমন হইবে না যে, উহাতে অন্যায় হস্তক্ষেপ, যুলুম ও অত্যাচার এরপর উহার চাইতে আরও নিকৃষ্ট যুগের আগমন না হইবে। ওলামা-ই-কিরাম হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর যামানা উহার বিপরীত সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহার যামানা মারওয়ানী বংশধরদের যুলুম ও অত্যাচারের যুগের পর আগমন করিয়াছে এবং উত্তর দিয়াছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

আরও বলিয়াছেন, আমার উম্মত কুরায়শ বাচ্চাদের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে (ইহার উদ্দেশ্য হইল ইয়াযীদ প্রভৃতি) এবং এই হাদীসের রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়া থাকিতেন যে, আমি ইচ্ছা করিলে উহাদের নামে নামে বর্ণনা দান করিতে পারি, কিন্তু আমি উহা চাই না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়া থাকিতেন যে, আমি আল্লাহ্'র নিকট ষাট হিজরীর সরকার হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি (যাহা ইয়াযীদের সিংহাসন আরোহণ করার বৎসর ছিল)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই দুনিয়া হইতে ষাট হিজরীর পূর্বেই চলিয়া যান।

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, কাদরিয়া, মরজিয়্যা, রাফিযিয়া এবং খারিজীর দল প্রকাশ হইবে। খারিজীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহারা উত্তম দলের মধ্য হইতে বাহির হইবে। উত্তম দল বলিতে হযরত আলী মুরতাযা এবং তাহার সহচরবৃন্দ উদ্দেশ্য। আর বলিয়াছেন যে, উহাদের নিদর্শন হইল এই যে, উহাদের মধ্যে একটি কাল রং-এর মানুষ হইবে যাহাকে দুই স্তনের অধিকারী (যুছ্ছাদায়হি) বলা হইবে। এবং তাহার এক বাহু মেয়েলোকের স্তনের ন্যায় হইবে। যাহাকে সে নড়াচড়া করিবে এবং ঘুরাইবে, আর উহার মাথা মুণ্ডান থাকিবে। উহার সহিত হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু লড়াই করিবেন। অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, যদি আমি উহাদিগকে পাইতাম, তাহা হইলে আদ ও ছামূদের ন্যায় ধ্বংস করিয়া দিতাম।

আরও বলিয়াছেন যে, আগমনকারী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদিগকে গালমন্দ করিবে এবং গালি-গালাজ করিবে। যেমন রাফেযীরা করিয়া থাকে। আরও বলিয়াছেন যে, দীনের সাহায্যকারী হ্রাস পাইবে, শেষ পর্যন্ত আটার মধ্যে লবণ-এর ন্যায় পরিমাণে থাকিয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে সর্বদা বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন দল থাকিবে। এই উপদলীয় কোন্দল হইতে কোন দল রক্ষা পাইবে না। এবং তাহাদের আমীর ও শাসনকর্তা মানুষের প্রতি বল ও শক্তি প্রয়োগ এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ করিবে এবং বলপূর্বক সরকার এবং শাসন ভার গ্রহণ করিবে। এবং অপরের সহিত এমন ব্যবহার করিবে যাহা আপনজনদের সহিত করিবে না। আর শামনী শরহে শিফার মধ্যে 'ইয়ামারী' হইতে নকল করিয়াছেন যে, এইরূপ আমীর ও শাসনকর্তাদের অত্যাচার হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর যুগে ছিল।

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, শেষ যামানার লোক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও মন্দ স্বভাবের হইবে। বকরী চরাইবে, খালি পা এবং উলঙ্গ শরীরে থাকিবে। স্বীয় ইমারতসমূহকে উঁচু করিয়া বানাইবে এবং উহাতে বহু দরজা-জানালা থাকিবে। ইহা দ্বারা ধন-দৌলতের প্রাচুর্য এবং আরাম ও আয়াশের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আর সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, কুরায়শ এবং উহাদের সৈন্য দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং এই কথা পরিখার যুদ্ধের সময় বলিয়াছিলেন যে, ইহার পর কুরায়শ কাফিররা আমাদের মাথার উপর আর যুদ্ধ লইয়া আসিতে সক্ষম হইবে না। বস্তুতঃ তদ্রূপই হইয়াছিল।

আর বায়তুল মুকাদ্দাস-এর বিজয়ের পর মুতান রোগে (مُوْتَان) আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দান করেন। মীমের পেশ এবং 'ওয়াও'এর জযম দিয়া এবং অভিধানে মীমের যবর দিয়াও

www.pathagar.com

আসিয়াছে। অর্থ হইল কলেরা এবং প্লেগ এবং মুতান সাধারণতঃ গবাদিপশুর মড়ককে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যতঃ ইহা ঐ ব্যাপক প্লেগের আক্রমণকে বলা হইয়া থাকে, যাহা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর যুগে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, মাত্র তিন দিনে সত্তর সহস্র মানুষ প্লেগে মারা গিয়াছিল।

এবং বসরা শহর গড়িয়া উঠার ওয়াদা করিয়াছেন। এক সাহাবীকে এই বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি সমুদ্রের মধ্যে যুদ্ধ করিবেন। যেরূপ বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, যদি দীন ছুরাইয়্যা নক্ষত্রের উপর যাইয়া আটকাইয়া যায়, তবু পারস্যের সন্তানগণ উহা প্রাপ্ত হইবে। কিছু লোক ইহাকে হযরত সালমান ফারসী (রা) প্রমুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। আবার কিছু লোক ইহাকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং তাহার শিষ্যদের ধারণা করিয়া থাকেন। কেননা, তাহাদের মূল পারস্য অধিবাসীদের অন্তর্গত ছিল। এক রিওয়ায়াতে رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ "পারস্যের এক ব্যক্তি" আসিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মদীনার এমন এক আলিমের সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আলিমদের এক দল যাহার অনুসরণ করিবেন। বলা হইয়া থাকে যে, ইহা দ্বারা হযরত ইমাম মালেককে বুঝান হইয়াছে। আর একদল লোক পবিত্র মদীনার আলিমের প্রতি ধাবিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এই সংবাদ স্বীয় সময়কালের জন্য কেবল প্রযোজ্য হইবে, সর্বকালের জন্য নয়। হাদীসের বর্ণনা ধারা হইতে ইহাই বুঝা যায়। অথচ এই সংবাদ পরবর্তীদের জন্য ছিল।

আর কুরায়শদের মধ্য হইতে আলিম জন্মগ্রহণ করার সংবাদ দান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, لَا تَسُبُّوْا قُرَيْشًا فَاِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ طِبَاقَ الْاَرْضِ عِلْمًا কুরায়শকে গালি দিও না। কেননা, উহাদের এক আলিম সমগ্র দুনিয়াকে বিদ্যার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিবে। ইমাম আহমদ প্রভৃতিগণের মাযহাব অনুযায়ী ইহার উদ্দেশ্য হইল ইমাম শাফিঈ। এবং জোয্কানী হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীস আনয়ন করিয়াছেন যে, يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ اُمَّتِىْ আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হইবে যাহাকে আবূ হানীফা বলা হইবে, তিনি আমার উম্মতের সূর্য হইবেন। "তান্যীহিশ্ শারিআত" নামক কিতাবে বলা হইয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)-এর হাদীসের সূত্রের মধ্যে জোইবারী আসিয়াছে এবং ইহার রাবী হইল মামুন সুলামী, এই দুইজনের মধ্যে হইতে কোন একজন এই হাদীসটি বানাইয়াছেন এবং 'সিফরুস্-সাআদত' গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর গুণাবলী এবং তাহাদের দুর্নামের কোন রিওয়ায়াতই বিশুদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছিয়া থাকে না। এই বিষয়ে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে উহা মনগড়া ও প্রত্যাখ্যাত।

www.pathagar.com

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের এক দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এমনকি কিয়ামত আসিয়া যাইবে।

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন মুজাদ্দিদের (সংস্কারকের) জন্ম হইবে যিনি দীনের সংস্কার করিবেন। এবং সমতুল তারপর উহার সমতুল চলিয়া যাওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। এবং হাকিম "আলখায়র ফালখায়র" অর্থাৎ "উত্তম তারপর উত্তম" বর্ণনা করিয়া ইহাকে শুদ্ধ বলিয়াছেন। এবং কোন কোন যুদ্ধে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত্যা ও প্রবল তূফানের সংবাদ দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পবিত্র মদীনায় এক মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এই বাতাস চলিয়াছে। যখন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ঘটনা তদ্রূপই পাইলেন।

আর এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দান করিয়াছেন যে, সে গণিমতের মাল হইতে ইয়াহূদীর এক পুঁতির মালা খিয়ানত করিয়াছে এবং উহা তাহার আরামস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তির চাদর চুরির সংবাদ দান করেন এবং উহা তাহার আসবাবপত্র হইতে বাহির হয়।

আর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উটনী হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ দান করেন এবং বলেন যে, অমুক উপত্যকায় উহার লাগাম বৃক্ষের ডালের সহিত পেঁচাইয়া রহিয়াছে। অতঃপর তদ্রূপই পাওয়া যায়।

এবং সাহাবা-ই-কিরামকে সংবাদ দান করেন যে, মক্কাবাসীদের নিকট লিখিত চিঠি লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং তিনি বলিয়াছেন যে, এই ধরনের এক মেয়েলোক অমুক উপত্যকা যাইতেছে। উহার নিকট হইতে ঐ পত্র বাহির করিয়া লও। বস্তুতঃ আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু দুই-একজন সাথীসহ ঐ মেয়েলোকের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং ঐ স্থানেই পাওয়া যায় যে স্থানের নিদর্শন ও ঠিকানা নবী (সা) বলিয়া দিয়াছিলেন। এই কাহিনী হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লিখিত আছে এবং সূরা-ই-মুমতাহেনা'র শানে নুযূলও এই কাহিনীই।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস (রা)-কে ঐ মালের সংবাদ দান করেন, যাহা তিনি স্বীয় স্ত্রী উম্মুল ফযলের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং এই সংবাদ তিনি এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর কাহারও জানা ছিল না। তারপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যেমন ইনশাআল্লাহ্ বদরের যুদ্ধের বর্ণনায় আসিবে।

আর হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট যখন তাহার মৃত্যু হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াছিলেন যে, হয়ত তুমি ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং বাঁচিয়া যাইবে, এমনকি তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় লাভবান হইবে, অর্থাৎ মুসলমানগণ এবং অপর সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে অর্থাৎ কাফিরগণ। যেন ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভের সুসংবাদ দান করিয়াছেন এবং তিনি সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ব্যক্তির মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী ছিলেন। তিনি হিজরী ৫৫ অথবা ৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ৫৮ হিজরী সনে ওফাত পাইয়াছেন।

www.pathagar.com

আরও সংবাদ দান করিয়াছেন যে, উবাই ইব্ন খাল্ফ আমার হস্তে মারা যাইবে এবং তাহাই হইয়াছে। আর বলিয়াছিলেন যে, উত্‌বা ইব্ন আবী লাহাবকে আল্লাহ্র কোন এক কুকুর আহার করিবে। বস্তুতঃ উহাকে ব্যাঘ্র খাইয়াছিল।

আর বদরের যুদ্ধের দিন কাফিররা নিহত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইবে উক্ত স্থানকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহারা ঠিক ঐ স্থানেই নিহত হইয়া পতিত হইয়াছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আর নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ ঐ দিনই দান করেন, যেদিন তিনি আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন এবং জানাযা পড়ার স্থানে গমন করতঃ চার তাক্‌বীরের সহিত জানাযার নামায আদায় করেন।

আর ফীরোয দায়লামীকে যখন তিনি কিসরার দূতরূপে আগমন করেন, ঐদিন তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কিসরার মৃত্যু সংবাদ দান করেন। ফীরোয ইহার অনুসন্ধান করিয়া সত্য পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

আর আবূ যার গিফারী (রা)-কে সংবাদ দান করেন যে, লোকেরা তাঁহাকে পবিত্র মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। যখন তিনি একদিন মসজিদে নববীতে শয়ন করিতেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আবূ যার (রা)! ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হইবে যখন লোকেরা তোমাকে এই মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিবে। বলিলেন, আমি মসজিদে হারামে ঠাঁই করিয়া লইব। বলিলেন, যখন তোমাকে তথা হইতেও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, তখন ? (শেষ হাদীস পর্যন্ত) এবং তাঁহাকে সংবাদ দান করিলেন যে, তুমি একা, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবে এবং ঐ অবস্থায় মারা যাইবে। আর হযরত আবূ যার (রা)-এর 'রবযা' গমনের ঘটনা, যেথায় তিনি অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করার কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ এবং সীরাতের কিতাবসমূহে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইনশাআল্লাহ্ কিতাবের শেষে হযরত আবূ যার (রা)-এর বর্ণনায় আসিবে।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পাহাড়কে বলা যে, তুই স্থির প্রতিষ্ঠ থাক্। তোর উপর নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ ছাড়া আর কেউ নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত হযরত আবূ বকর, উমর ও হযরত উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন। এই ঘটনাও সুপ্রসিদ্ধ। আর সুরাকাকে এই কথা বলা যে, ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হইবে যখন তুমি তোমার দুই হাতেই কিসরার স্বর্ণের কংকণ পরিধান করিবে। যখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর যামানায় কিসরার ধনসম্পদ আনীত হইল, তন্মধ্যে উহার কংকণও ছিল, তো হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত সুরাকা (রা)-এর হস্তে ঐ দুই কংকণ পরিধান করাইয়া দিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার দরুন। ঐ সময় হযরত ফারূক (রা) বলিলেন যে," প্রশংসা ঐ খোদার যিনি কিসরার হস্ত হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সুরাকার হস্তে কংকণ পরিধান করাইয়া দিয়াছেন।"

আর দজলা ও দাজীলের মধ্যবর্তী স্থানে এক শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল বাগদাদ শহর। আরও বলিয়াছেন যে. এই উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করিবে, যাহাকে মানুষ ওয়ালীদ বলিয়া ডাকিবে। সে এই উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইবে এবং সে স্বীয় সম্প্রদায়ের ফেরাওন হইবে।

আর বলিয়াছেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামতও অনুষ্ঠিত হইবে না, যতক্ষণ না দুইদল পরস্পরে যুদ্ধ করিবে এবং উভয়ের একই দাবী হইবে, অর্থাৎ উভয় দলই মুসলমান হইবে। ওলামাকিরাম বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল সিফফীনের ঘটনা। আর ক্বারী আবূ বকর ইবনুল -আরাবী বলেন যে, ইহা প্রথম ঘটনা যাহা অকস্মাৎ ইস্‌লামে প্রবেশ করিয়াছিল এবং কুরতুবী বলেন যে, উহা হইল প্রথম দুর্ঘটনা, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর ইসলামের উপর উপস্থিত হইয়াছিল। উহা হযরত উমর (রা)-এর শাহাদত বরণ করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর ওহী অবতরণ ধারা বন্ধ হইয়া যায় এবং আরব ও অন্যান্য স্থানে ধর্মান্তরের ফেত্‌না প্রকাশ পায়। এবং হযরত উমর (রা)-এর শাহাদত হইতে ফেত্‌নার তরবারি কোষমুক্ত হইয়া যায় এবং হযরত উসমান (রা) শহীদ হন। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যাহা ঘটিয়াছে উহা সুস্পষ্ট।

আর সুহায়ল ইব্‌ন উমর কুরায়শদের নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সম্মানিত সাহাবীবৃন্দের (রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হি আজমাঈন) প্রতি গালিগালাজ করিত। বদরের যুদ্ধের দিন যখন সে বন্দী হইয়া সম্মুখে আনীত হইল, তখন হযরত ফারূকে আযম (রা) আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি উহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেই। তৎপ্রতি নবী (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন যে, খুব শীঘ্রই ইহারা এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে যে, হে উমর! তোমরা উহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। বস্তুত তদ্রূপই হইয়াছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করতঃ পবিত্র মক্কায় বসবাস করিতে লাগিল। যখন রাসূল আকরাম (সা)-এর ওফাত এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের সংবাদ পৌঁছিল, তখন সে এমন ভাষণ দান করিল যে, মুসলমানদের অন্তরকে দৃঢ় ও শক্তিশালী এবং উহাদের অন্তর দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল।

আর ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাসকে বলিয়াছিলেন যে, কি সুন্দর জীবন যাপন করিয়াছ। এখন শহীদের মৃত্যু লাভ করিবে। ইহার পর তিনি ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাবের সহিত লড়াই করিয়া শাহাদত বরণ করেন।

আর হযরত খালিদ (রা)-কে যখন উকায়দার নামক এক নাসারা অর্থাৎ খৃস্টধর্মাবলম্বীর দিকে প্রেরণ করেন তখন বলেন যে, তোমরা উহাকে নীলগাভী শিকার করা অবস্থায় দেখিতে পাইবে।

মোটকথা, নবী আকরাম (সা) অদৃশ্য তত্ত্ব ও গোপন রহস্যের প্রতিটি দিকের সংবাদ দান করিয়াছেন। আর তাঁহার উপর মুনাফিকদের সমস্ত গোপন তত্ত্ব এবং মুসলমানদের ঐ সকল ঘটনা যাহা তাঁহার পবিত্র জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর সংঘটিত হইয়াছে সকলই উন্মুক্ত ও প্রকাশিত ছিল। এমনকি লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করিত যে, খোদার শপথ! যদি কেহ দ্রুত সংবাদ দান না করিতেন তাহা হইলে বাত্‌হার (মক্কার) পাথরকণাগুলি তাঁহাকে সংবাদ দিত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ জাদুর সংবাদ দান করেন, যাহা ইয়াহূদী লবীদ ইব্‌ন আ'সম ঐ চুলের উপর করিয়াছিল যাহা নবীর চুল আঁচড়াইবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল।

www.pathagar.com

আর নবী (সা) ঐ চুক্তিনামার লেখাকে পোকায় খাইয়া ফেলার সংবাদ দান করিয়াছিলেন যাহাকে কুরায়শরা বনী হাশিমদের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিল। কিন্তু যেখানে খোদার নাম লিখিত ছিল, উহা সংরক্ষিত ছিল। আর নবী (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থাসমূহ ঐ সময় বর্ণনা দান করেন, যখন কুরায়শরা মি'রাজের রাত্রের ব্যাপারে তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল।

আর শেষ যামানায় উম্মতদের মধ্যে মন্দ কার্যসমূহ প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আমানত উঠিয়া যাইতে থাকিবে, শয়তানের শিং বাহির হইবে, খিয়ানত বিস্তার লাভ করিবে, সমসাময়িক যামানার লোকদের সহিত হিংসা করিবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং মেয়েলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং ধনের স্বল্পতা এবং ফেতনার উৎপত্তি হওয়া, আত্মীয়তা উঠিয়া যাওয়া, ভূমিকম্প হওয়া এবং হিজায হইতে অগ্নি প্রকাশ হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা মদীনা মুআযযামার ইতিহাসে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কিয়ামতের আলামত, উত্থান দিবস এবং পরকালের যাবতীয় অবস্থা এবং কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্যসমূহ, ইহা এক বিরাট বিস্তৃত অধ্যায়, যাহা প্রকাশ ও বর্ণনা করার জন্য স্বতন্ত্র এক পুস্তকের প্রয়োজন। এইখানে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা নবী (সা)-এর নুবুওয়াতের সত্যতা এবং মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশের জন্য যথেষ্ট। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

বিশ্বনেতা নবী (সা)-এর হিফাযত ও নিরাপত্তা

নবী আকরাম সায়্যিদে আলম (সা)-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযাসমূহ প্রকাশের বর্ণনা—

একটি হইল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নবী (সা)-কে মানুষের দুষ্কার্য এবং দীনের শত্রুদের প্রতারণা ও দুষ্টামির হাত হইতে রাক্ষা করা ও নিরাপত্তা দান করা। বস্তুত এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ এবং আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)। এবং বলিয়াছেন وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا এবং আপনি স্বীয় প্রভুর হুকুমের জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকুন, কেননা আপনি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছেন' (সূরা তূর ঃ ৪৮)। আরও বলিয়াছেন اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ নিশ্চয় আমিই বিদ্রূপকারীদের মোকাবিলায় আপনার জন্য যথেষ্ট, যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অপর মা'বুদ বানাইয়া রাখিয়াছে-(সূরা হিজর ঃ ৯৫-৯৬)। আরও বলিয়াছেন যে, وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং স্মরণ করুন, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে-(সূরা আনফাল ঃ ৩০)।

আর স্বয়ং রাসূলে কারীম (সা) নিজের হিফাযতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সম্মানিত সাহাবীগণও তাঁহার পাহারাদারী করিতেন। যখন এই আয়াত وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অবতীর্ণ হইল, তখন নবী (সা) তাঁবু হইতে বাহিরে শুভাগমন করিলেন এবং ঐ সকল সাহাবীদিগকে যাহারা তাহার পাহারাদারী করিতেছিল, বলিলেন, হে লোকসকল! এখন পাহারা ছাড়িয়া দাও এবং চলিয়া যাও কারণ আমার মহান প্রভু আমার নিরাপত্তা করিতেছেন। এখন আমাকে তোমাদের পাহারাদানের প্রয়োজন নাই।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম (সা) এক ভ্রমণে কোন বৃক্ষের নিচে অবস্থান করিতেছিলেন। নবী (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস এইরূপ ছিল যে, যখন কোন প্রথম মনযিল আসিত, তখন সম্মানিত সাহাবীগণ তাঁহার জন্য কোন গাছকে পসন্দ করিতেন, যাহাতে নবী (সা) উক্ত বৃক্ষের ছায়াতলে দ্বিপ্রহরের কায়লুলা (বিশ্রাম) করিতে পারেন। এক বেদুঈন আগমন করিল, সে তলোয়ার উত্তোলিত করতঃ বলিল, কে আছে যে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্! ইহার পর উক্ত বেদুঈন কাঁপিতে লাগিল এবং উহার হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া যাইয়া উহার মস্তকের উপর পতিত হইল যদ্দরুন উহার মগজ বাহির হইয়া গেল। ইহার পর অত্র আয়াত নাযিল হয়। আর নিঃসন্দেহে এই ঘটনা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) উক্ত বেদুঈনকে ক্ষমা করিয়া দেন, তারপর সে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাইয়া বলিতে থাকে যে, আমি তোমাদের নিকট অতি উত্তম ব্যক্তির নিকট হইতে আসিতেছি। তদুপরি অন্য এক হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, নবী আকরাম (সা) উক্ত বেদুঈনের হাত হইতে তলওয়ার লইয়া বলিলেন যে, তোকে এখন কে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে ? তখন সে নবী (সা)-এর পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

অনুরূপ বদরের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এক কাহিনী আছে যে, রাসূল আকরাম (সা) প্রস্রাব পায়খানা কার্য সমাধা করিবার জন্য সাহাবীগণ হইতে পৃথক হইয়া দূরে তশরীফ লইয়া যান, তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করতঃ এক মুনাফিকও চলিয়া যায়। সম্মুখের ঘটনা বর্ণিত কাহিনীর অনুরূপ। আর এই রিওয়ায়াতের অনুরূপ গাযওয়া-ই-গাত্‌ফানেও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, উক্ত আক্রমণকারী যুবক মুসলমান হইয়া যায় এবং সে তাহার সম্প্রদায়ের দিকে ফিরিয়া যায়। সে তাহার সম্প্রদায়ের দলপতি এবং বাহাদুর ব্যক্তি ছিল। সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে বলিতে লাগিল যে, তোমার কি হইয়াছে। তুমিতো বলিতে যে, আমি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিব এবং ইহা তোমার ক্ষমতার মধ্যে ছিল। তাহা হইলে তুমি এইরূপ কেন কর নাই ? সে বলিল, আমি এক শুভ্র চেহারা বিশিষ্ট উঁচু ব্যক্তি দেখিতে পাই। সে আমার উপর পাখা মারে যদ্দরুন আমি উল্টাইয়া পড়িয়া যাই এবং তলওয়ার মাটিতে পড়িয়া যায়। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, উহা ফেরেশতা হইবে। তারপর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, সে তলওয়ার উঠাইয়া রাসূল (সা)-এর মাথার উপর আসিয়া দাঁড়ায় তখন রাসূল দু'আ করেন; হে খোদা! আমাকে উহার কষ্ট হইতে নিরাপদে রাখ, যেরূপে তোমার মরযী হয়। তখন সে কোমরের বেদনায় আক্রান্ত হইয়া মুখ উলটাইয়া পড়িয়া যায়, ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র ঐ নিআমতকে স্মরণ কর, যাহা তোমাদের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয়, যখন এক সম্প্রদায় ইচ্ছা করিয়াছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারিত করিবে।

www.pathagar.com

মু'মিনগণকে লক্ষ্য করিয়া এই সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা, রাসূলে আকরাম (সা)-এর লাভ ও লোকসান প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের উপরই বর্তাইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, যখন তাব্বাত ইয়াদা আবূ লাহাব সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন আবূ লাহবের স্ত্রী (তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হউক)— যাহার নাম উম্মে জামিল ছিল এবং হারবের কন্যা ও আবূ সুফিয়ানের বোন ছিল, উহাকে লাকড়ী বহনকারী (হাম্মালাতাল হাতাব) বলা হইয়াছে— সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উম্মে জামীলকে আসিতে দেখিয়া আরয করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মেয়েলোক অত্যন্ত নির্লজ্জ, অসভ্য এবং অশ্লীলভাষী। যদি রাসূল (সা) এই স্থান হইতে উঠিয়া যান, তবে উত্তম হয়। তিনি বলিলেন, সে আমাকে দেখিতে পারিবে না। তারপর উম্মে জামীল আসিল এবং বলিল যে, হে আবূ বকর! তোমাদের প্রভু আমার দুর্নাম গাহিয়াছে। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন যে, আমার প্রভু না কবিতাগাথা গাহিয়া থাকেন, না কাহারও দুর্নাম করিয়া থাকেন। তখন উক্ত মেয়েলোক অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করে এবং রাসূল (সা) উক্ত স্থানেই অবস্থান করিতে থাকেন, অথচ সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। রাসূল (সা) বলিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন এবং সে তাহার পাখার মধ্যে আমাকে গোপন করিয়া রাখে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত মেয়েলোকের হস্তে একটি পাথর ছিল, সে বলিয়াছিল, যদি মুহাম্মদ (সা)-কে দেখিতাম, তাহা হইলে এই পাথর দ্বারা তাহার মুখ....... (নাউযুবিল্লাহ্)।

আশ-শিফা কিতাবে উল্লিখিত আছে যে, বনী মুগীরার এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সা)-কে (নাউযুবিল্লাহ) হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল। তখন তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং সে রাসূল (সা)-কে দেখিতে পায় না, অথচ সে রাসূল (সা)-এর কথা শুনিতে পাইতেছিল। তারপর সে নিজ সম্প্রদায়ের দিকে ফিরিয়া যায়। তখন তাহাদিগকেও সে দেখিতে পায় না। অবশেষে লোকেরা তাহাকে আওয়াজ দেয়।

রাসূল (সা)-কে না দেখা এবং না চিনা হিজরতের শুরুতেও হইয়াছিল। রাসূল স্বীয় পবিত্র গৃহ হইতে বাহিরে তশরীফ লইয়া আসেন। উহাদের সহিত কথা বলেন এবং উহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া আসেন। তখন হয় উহারা দেখিতে পায় নাই, অথবা দেখিয়া থাকিলেও চিনিতে পারে নাই। তাহাদের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করাও এই ধরনের ঘটনা ছিল। যেমন ইনশাআল্লাহ্ স্বস্থানে ইহার বর্ণনা আসিবে। রাসূল (সা)-কে না দেখা এবং চিনিতে না পারা হিজরতকালীন গারে ছাওরের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেছেন যে, আমি একরাত্রে আবূ জাহম ইব্‌ন হুযায়ফা-এর সহিত ওয়াদাবদ্ধ হই এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হত্যার উপর একমত হই। তারপর আমরা গৃহে চলিয়া আসি। তখন আমরা রাসূল (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে শুনি ঃ

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا اَدْرٰكَ مَالْحَاقَّةُ (الى قوله) فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

অবশ্যম্ভাবী সত্য, সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কি ? এবং তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কি? (এই পর্যন্ত) অতঃপর তুমি কি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট দেখিতেছ ? (সূরা হাক্কা ঃ ১-৮)।

www.pathagar.com

ইহার উপর আবূ জাহম হযরত উমর (রা)-এর বাহুর উপর হস্ত মারিয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদের কাটিয়া পড়া উচিত। তারপর উভয়েই তথা হইতে পলায়ন করে এবং স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত থাকে। এই ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ভূমিকাসমূহের মধ্যে ছিল এবং তাহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বড় অদ্ভুত এবং সুন্দর কিস্সাসমূহের মধ্য হইতে একটি। যেমন স্বস্থানে এই ঘটনা উল্লেখ করা হইবে।

আর সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'ছুম এর হিজরতের সময়কার কাহিনী। মক্কাবাসীরা তাহাকে রাসূল (সা)-কে অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া আনার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাওয়া, অশ্বের পা মাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়া এবং রাসূল (সা)-এর দু'আর বরকতে তাহার বাহির হইয়া আসা এবং প্রত্যাবর্তন করার কথা বর্ণিত আছে।

অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে হিজরতের সময় চিনিয়া ফেলিয়াছিল। সে কুরায়শকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়াইয়া গেল। যখন পবিত্র মক্কা পৌঁছিল, তখন অন্তর হইতে উক্ত ধারণা দূর হইয়া গেল এবং ইহা তাহার স্মরণেই আসিল না যে, তাহার কি করিবার ছিল এবং কি জন্য আসিয়াছিল আর কি জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। এমনকি সে স্বীয় গৃহে ফিরিয়া গেল।

ইব্ন ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদায় ছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত আবূ জাহল এক পাথর হাতে চলিয়া আসিল। অন্যান্য অভিশপ্তরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সে রাসূল (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিতে চাহিল। তখন তাহার নিজ হস্তে পাথর লাগিয়া গেল এবং তাহার দুই হাত শুষ্ক হইয়া গেল। সে কিছুই করিতে সক্ষম হয় না। তারপর সে উল্টা পায়ে পিছনের দিকে ঘুরিয়া গেল। ইহার পর সে রাসূল (সা)-এর নিকট ক্ষমার দু'আ প্রার্থনা করিল। যার ফলে তাহার হস্তদ্বয় মুক্ত হইয়া যায়।

অন্য একদিন সে বিরাট এক উট দেখিতে পায়। অতবড় উট সচরাচর দেখা যায় না। তো সে উহাকে ভক্ষণ করার ইচ্ছা করিল। রাসূল (সা) বলিলেন, উহা জিবরাঈল (আ) ছিলেন, যিনি এই আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, যদি কেহ তাহার নিকটবর্তী হইত, তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিতেন।

আর একদা রাসূলে আকরাম (সা) এক প্রাচীরের নিচে অবস্থান করিতেছিলেন। এক হতভাগ্য পাপাত্মা চাক্কির একপাট উঠাইয়া তাহার পবিত্র মাথার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল। রাসূলে আকরাম (সা) তথা হইতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং মদীনার দিকে তাশরীফ লইয়া আসিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল কুরায়শদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-কে নামাযের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা হইলে নামাযরত অবস্থায় আমি তাহার গর্দানকে পদদলিত করিয়া দিব। তারপর যখন রাসূল (সা) নামাযের জন্য বাহির হন, তখন লোকেরা ঐ হতভাগ্যকে সংবাদ দান করে। সে চলিয়া আসে। যখন সে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকটবর্তী হয়, তখন সে নিজকেই দুই হস্ত দ্বারা সংরক্ষণ করতঃ পলায়ন করে। হতভাগ্যের দল যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তখন বলিতে

www.pathagar.com

লাগিল যে, আমি যখন নিকটে পৌঁছিলাম, তখন অগ্নির এক গহ্বর দেখিতে পাইলাম যে, আমি উহার মধ্যে পড়িয়া যাইতেছি। আর আমি ভয়ংকর আওয়াজ এবং পাখার ফরফর শব্দ শুনিতে পাইলাম যাহা সমস্ত যমীনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রাসূল আলায়হিস সালাম বলেন যে, উহা ফেরেশতা ছিল, যদি সে আরও সন্নিকট হইত, তাহা হইলে উহার প্রতিটি জোড়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিত। ঐ সময় এই সূরা অবতীর্ণ হয় ঃ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ কখনও নয়, নিশ্চয় নিঃসন্দেহে মানুষই বিদ্রোহকারী। (শেষ সূরা পর্যন্ত)

বর্ণিত আছে যে, শায়বা ইব্‌ন উছমান জাজবীর সম্প্রদায় পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফের দারওয়ান ছিল এবং কা'বা গৃহের চাবি তাহার হাতে ছিল। মুসলমান হওয়ার পূর্বে শায়বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ করিয়াছিল এবং বলিতেছিল যে, আমার পিতা এবং চাচাকে তাঁহার চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করিয়াছেন। আজ আমি স্বীয় হিংসা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হইতে বাহির করিয়া লইব এবং তাহার চাচা হযরত হামযার পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় পিতা এবং চাচার প্রতিশোধ লইব। যখন সেই অভীষ্ঠ কর্মের মুহূর্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সে রাসূল (সা)-এর উপর আক্রমণ করিবার জন্য তলওয়ার উঠাইল, কিন্তু হঠাৎ সে সজোরে চিৎকার দিতে দিতে পলায়ন করিল। পরে সে বর্ণনা করিয়াছে যে, যখন আমি রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী হই, তখন আগুনের এক বড় স্ফুলিঙ্গ আমার দিকে ঝাপাইয়া আসিতে দেখিতে পাই। আমি উহাকে দেখিয়া ঘাবড়াইয়া পালাইয়া আসিয়াছি। যখন রাসূলে আকরাম (সা) আমাকে দেখিলেন, তখন আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং স্বীয় মুবারক হস্ত আমার বুকের উপর ধারণ করিলেন, অথচ রাসূলে আকরাম (সা) আমার নিকট সমস্ত লোকের মধ্যে বড় শত্রু ছিলেন। আমার বুক হইতে এখনও পর্যন্ত হাত উঠাইয়া লন নাই, রাসূল (সা) আমার নিকট সৃষ্টজীবের মধ্যে সকলের চেয়ে অতীব প্রিয় হইয়া গেলেন। রাসূল (সা) বলিলেন নিকটে আস এবং খোদার রাসূলের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ কর। আমি তলওয়ার উত্তোলিত অবস্থায়ই রাসূল (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। যদি ঐ সময় আমার সম্মুখে আমার পিতাও আসিতেন, তাহা হইলে তাহাকেও রাসূল (সা)-এর খাতিরে তলওয়ার দ্বারা গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

ফুযালা ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের বৎসর যখন রাসূল (সা) তওয়াফে মগ্ন ছিলেন আমি অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম যে, রাসূল (সা)-কে শহীদ করিয়া দিব। যখন আমি রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী হইলাম, তখন তিনি বলিলেন, হে ফুযালা! তুমি মনে মনে কি কথা বলিতেছিলে, তুমি চাহিতেছিলে যে, খোদার রাসূলকে শহীদ করিয়া দিবে। আমি বলিলাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহার পর রাসূল (সা) মুচকি হাসি দিলেন, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় পবিত্র হস্ত আমার বুকের উপর ধারণ করিলেন। তখন আমার অন্তরে সান্ত্বনা অনুভব করিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূল (সা) এখনও পর্যন্ত স্বীয় হাত উঠাইয়া লন নাই এই সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই অবস্থা করিয়া দিলেন যে, কোন বস্তুই আমার নিকট রাসূল (সা)-এর চাইতে প্রিয় মনে হইত না।

এতদ্‌সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইল আমির ইব্‌ন তুফায়ল এবং আরবাদ ইব্‌ন কায়সের ঘটনা। যে সময় এই দুইজনেই রাসূল (সা)-এর খিদমতে আগমন করিল। তো

www.pathagar.com

আমির আরবাদকে বলিল যে, আমি তোমার দিক হইতে রাসূল (সা)-এর দৃষ্টি সরাইয়া দিয়া কথার মধ্যে আমার দিকে মগ্ন রাখিব। তখন তুমি রাসূল (সা)-এর উপর স্বীয় তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিয়া দিবে। আমির (রা) আরবাদ (রা)-কে কিছু করিতে দেখিতে পাইল না। ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আমির তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার কি হইয়া গিয়াছিল, তুমি আক্রমণ করিলে না কেন ? সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি যখনই আক্রমণ করার ইচ্ছা করিয়াছি, তখন আমার এবং রাসূল (সা)-এর মাঝে তোমাকে পাইয়াছি আমি তোমাকে কি হত্যা করিব।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে স্বীয় হাবীব (সা)-এর নিরাপত্তা ও সংরক্ষণতা এই পর্যায়ে ছিল যে, বহুত ইয়াহূদী গননাকারীরা কুরায়শগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে রাসূল (সা)-এর তরফ হইতে নানা প্রকারের ভয় দেখান হইয়াছে এবং রাসূল কর্তৃক তাহাদের উপর বিজয় ও শান-শওকত অর্জন করা হইতে ভয় দেখান হইয়াছে এবং উহাদিগকে নবী (সা)-কে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত এবং আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে সর্বদাই তাহাদের দুষ্টামি হইতে রক্ষা করেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

এই লোকেরা চায়, আল্লাহ্র নূরকে স্বীয় মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করিয়া দিতে। অথচ আল্লাহ্ স্বীয় নূরকে পূর্ণ করিয়া ছাড়িবেন, যদিও কাফিররা ইহাকে অপসন্দ করে। (সূরা সাফ্ফ ঃ ৮)।

হযরত মুস্তাফা (সা)-এর উলূম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর সমস্ত পূর্ণতার সম্মিলনী সত্তার মধ্যে প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ, প্রমাণিত নিদর্শনাবলী এবং সকল জ্ঞানের ভাণ্ডারকে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং পরিপূর্ণ আদর্শ চরিত্রে বৈশিষ্ট্যময় করিয়াছেন যাহা সমস্তই দীন ও দুনিয়ার সংশোধন এবং আল্লাহ্র পরিচয়ের জ্ঞানে পরিপূর্ণ। যাহাকে শরীআতের বিধানাবলী, ধর্মনীতি, পৌরনীতি এবং মানব কল্যাণ নীতি বলা হইয়া থাকে। আর পূর্ববর্তী উম্মত, অতীত কাল, আদম হইতে এই সময়, পর্যন্ত কালের সকল অবস্থা ও ইতিহাস এবং তাহাদের শরীআত, কিতাব, জীবনচরিত এবং ব্যক্তিগত কর্মজীবন এবং তাহাদের মাযহাব ও বিভিন্ন মতামত এবং তাহাদের পরিচিতি এবং দীর্ঘায়ু এবং তাহাদের আবির্ভাবের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং প্রত্যেক উম্মতের কাফিরদের উপর যুক্তি-প্রমাণ এবং গ্রন্থধারীদের প্রত্যেক দলের ঐ সকল ঝগড়া, যাহা উহাদের গ্রন্থে রহিয়াছে এবং উহাদের বিদ্যা গূঢ় তত্ত্ব এবং গোপন রহস্যসমূহ এবং ঐ সকল সংবাদ, যাহা উহারা গোপন করিয়া রাখে এবং উহার পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং আরবের অভিধানসমূহ বিরল শব্দসমূহ এবং ভাষার শুদ্ধতার প্রকারসমূহের পরিবেষ্টন, সময়, উদাহরণ ও গূঢ় তত্ত্বের সংরক্ষণ, শুদ্ধ উদাহরণ উপস্থাপন এবং উহার মর্ম গভীর বিবেকসম্পন্নদের ধারা অনুযায়ী অনুধাবন এবং উহাদের সংকটসমূহের বিশদ বর্ণনা

www.pathagar.com

ইত্যাদি বিদ্যার জ্ঞান দান করিয়াছেন। আর তাঁহার পবিত্র শরীআত ঐ সকল সৌন্দর্য ও চরিত্র, প্রশংসা ও ভদ্রতা, আত্মরক্ষার নীতি ও পদ্ধতি এবং উহার যাবতীয় প্রসঙ্গ ও অবস্থার উপর অন্তর্ভুক্ত, যাহা বিবেকবানদের নিকট বড় সুন্দর এমনকি ঐ সকল কাফির, মূর্খ ও বেদীনদের নিকটও বড় সুন্দর যাহারা সুষ্ঠু বিবেক ও ন্যায়-নীতির অধিকারী। উহারা ইহার বিপরীত, যাহারা নির্লজ্জভাবে ঈর্ষা পোষণ করিয়া থাকে এবং বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। আর রাসূল (সা)-এর কথা ছিল ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ উহা শব্দের দিক হইতে সংক্ষিপ্ত এবং বহু অর্থ বিশিষ্ট হইত। আর উহা পরিচিত সকল বিদ্যা ও শাস্ত্রের সকল প্রকারের উপর পরিবেষ্টনকারী হইত। যথা, চিকিৎসা বিদ্যা, স্বপ্ন ব্যাখ্যা বিদ্যা, ফারায়েয শাস্ত্র, এবং গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি। এইগুলি এমন বিদ্যা যাহা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি অবগত আছে, যাহাদের ব্যবহারিক বিদ্যার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে এবং পুস্তক পাঠের অভ্যাস আছে এবং যাহারা গ্রন্থধারীদের মজলিসে যাতায়াত করিয়া থাকে এবং উহার মধ্যে সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও নবী আকরাম (সা) না লেখাপড়া জানিতেন, না ঐ সকল মজলিসে যাতায়াত করিতেন, যাহা ঐ সকল গুণে গুণান্বিত ছিল। না তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন এবং না উহা অন্বেষণ ও অর্জন করার জন্য কোন সফরে গমন করিয়াছিলেন। আর আরববাসীদের বেশীর ভাগ পরিচয় বংশ বিদ্যা, অতীত কাহিনী এবং তাহাদের কবিতা এবং আলোচনার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা উত্তম রূপে শিক্ষা গ্রহণ করা, তন্মধ্যে নিমজ্জিত থাকা এবং শাস্ত্রজ্ঞদের সহিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর অর্জিত হইয়া থাকে। অথচ এই শাস্ত্র তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা কিতাবের বিদ্যা ও রহস্য সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র।

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ بِالأمى معجزة * فى الجاهلية والتاديب فى اليتم

নবী করীম (সা)-এর নুবুওয়াত ও রিসালতের দলীল ও নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাহিব ও পাদরীদের একই রকম বারবার সংবাদ প্রদান এবং গ্রন্থধারী আলিমগণ কর্তৃক তাঁহার গুণাবলী, তাঁহার উম্মতের গুণাবলী এবং তাহাদের আলামত ও নিদর্শনাবলী বর্ণনা করা, যেমন পবিত্র হুলিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মহরে নুবুওয়াত এবং এই প্রকারের আরও বহু নিদর্শন রহিয়াছে। আর এই ধরনের বহু নিদর্শন তাওহীদবাদী কবিদের কবিতায় ও বিদ্যমান আছে। যেমন কবিদের মধ্যে তুব্বা, কায়স ইব্‌ন সাইদা এবং সায়ফ ইব্‌ন ইয়াযীন প্রমুখ। আর যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল রাসূল (সা)-এর নুবুওয়াতের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাদিগকে জাহিলিয়াতের যুগের একত্ববাদী কবি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। আর ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল তো দীনদারী ও একাকীত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূল (সা)-এর বর্ণনা থাকা এবং ইয়াহূদী আলিম কর্তৃক উহাকে স্বীকৃতি দান করা, এতদ্‌সত্ত্বেও তাহাদের হিংসা ও ঈর্ষার পথ অবলম্বন করা এই সকল আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বিশদভাবে চলিয়া গিয়াছে। আর ঐ সকল কথা যাহা জিন্নদের নিকট হইতে শোনা গিয়াছে, মূর্তিদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে যবাহকৃত পশু এবং পাখীদের পেটের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম দেখা যাওয়া এবং কবর ও পাথরসমূহের মধ্যে পুরাতন লিপির মাধ্যমে তাঁহার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া এবং ঐগুলিকে প্রত্যক্ষ করার পর কাহারও ইসলাম গ্রহণ করা— উহা সকলই নুবুওয়াতের দলীল, প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আলামত ও নিদর্শনসমূহ যাহা পবিত্র জন্মের সময়, পবিত্র ওফাতের সময়, সফরে ও যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হইয়াছে, ঐগুলিকে ইনশা আল্লাহ্ যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে।

আর রাসূলে আকরাম (সা)-এর স্বভাব ও অলৌকিকত্ব এবং নিদর্শনাবলী ও সংবাদসমূহের প্রেক্ষিতে ফেরেশতা, জীন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দান করা এবং জিন্নদের পায়রবী করা এবং বহু সাহাবা কর্তৃক তাহাদিগকে দর্শন করা, যেমন বদরের যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে হইয়াছিল। ইহা সকলই অতি স্পষ্ট ব্যাপার। বস্তুতঃ তন্মধ্য হইতে এক স্থান তো ঐ স্থান যখন জিবরাঈল আলায়হিস সালাম ঈমান এবং ইহসানের অর্থ শিক্ষাদানের জন্য আকৃতি পরিবর্তন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং সাহাবীগণ তাহাকে দেখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুম জিবরাঈল (আ)-কে নবী (সা)-এর নিকট দাহিয়া কালবীর আকৃতিতে দেখিয়াছেন। যাহার বস্ত্র সাদা ছিল। কতিপয় সম্মানিত সাহাবা ফেরেশতাকে অশ্ব হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়াছেন এবং কোন কোন সাহাবা-ই-কিরাম দেখিয়াছেন যে কাফিরদের মস্তক তো উড়িয়া যাইতেছে কিন্তু হত্যাকারী দেখা যাইতেছে না। আর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ এই রকম বহু ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যাহাদের পোশাক সাদা ছিল এবং তাহাদিগকে সাদা-কালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া আকাশ ও মাটির মাঝখানে ভাসমান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। আর ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) যিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের একজন ছিলেন, তাহার সহিত ফেরেশতারা করমর্দন (মুসাফাহা) করিয়াছেন আর রাসূলে আকরাম (সা)- হযরত হামযা (রা)সহ কা'বাগৃহের মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন, তারপর হযরত হামযা (রা) বেহুশ হইয়া পড়িয়া যান।

আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এক জিন্নকে জিন্নের রাত্রিতে (লায়লুতুল জীন) দেখিয়াছেন, এবং জিন্নদের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়াছেন। ইহা সকলই রাসূলে আকরাম (সা)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) উহুদের দিন শহীদ হন, তখন এক ফেরেশতা তাহার সূরত গ্রহণ করতঃ পতাকা ধারণ করেন। অতঃপর যখন রাসূল (সা) আওয়াজ দিলেন, হে মুসআব (রা)! আগে অগ্রসর হও, তখন ফেরেশতা বলিল যে, আমি মুসআব নই, ঐ সময় তিনি জানিতে পারিলেন যে, উহা কোন ফেরেশতা হইবে।

হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করিতেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি লাকড়ী হস্তে লইয়া আসিতেছিল। সে রাসূল (সা)-কে সালাম করিল। রাসূল (সা) সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন ইহা জিন্নের আওয়াজ। বলিলেন তুমি কে ? সে বলিল, আমি হামা ইব্ন ইয়াম ইব্ন আকইয়াস ইব্ন ইবলীস বলি। আমি হযরত নূহ (আ)-এর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং তাহার পর প্রত্যেক নবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। উহাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) শয়তানকে দেখিয়াছেন। কারণ, সে একাধারে তিন দিন পর্যন্ত সাদ্‌কায়ে ফিত্‌রের ঐ মালের কাছে আসিত, যাহা তাহার নিকট গচ্ছিত ছিল এবং উহা হইতে

www.pathagar.com

সে চুরি করিতেছিল এবং সে হযরত আবূ হুরায়রাকে আয়াতুল কুরসী শিক্ষা দেয়। ওয়াকেদী বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) উয্যা মূর্তিকে ধ্বংস করার সময় কাল রং-এর এক মেয়েলোককে উহার মধ্য হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন এবং সে উলঙ্গ ও বিক্ষিপ্তা চুল বিশিষ্ট ছিল। তিনি স্বীয় তরবারি দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন উয্যা ছিল।

আর হাদীসে রাসূল (সা)-এর নামাযকে ভঙ্গ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত শয়তানের নর্তন কুর্দন করা এবং রাসূলে আকরাম (সা) উহাকে মসজিদের খাম্বার সহিত বাঁধিয়া রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করার কথাও আসিয়াছে। আর জিন্নকে বশীভূত করার জন্য হযরত সুলায়মান (আ) এর দু'আ স্মরণ করা এবং পরে উক্ত শয়তানকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা সুপ্রসিদ্ধ।

মু'জিযা বর্ণনার উপসংহার

রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্ম, তাঁহার দুগ্ধপান ও শৈশবকাল হইতে নুবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনে যে সমস্ত মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড এবং বিচিত্র নিদর্শনাবলীর প্রকাশ ঘটিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা ইতোপূর্বেই করা হইয়াছে। তবে তাঁহার ওফাত পর্যন্ত যে অগণিত অসংখ্য মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে উহার বিশদ বর্ণনা দান মানবীয় শক্তির আওতা-বহির্ভূত। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করেন, তবে এই সম্বন্ধে যথাস্থানে বেশ কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের আছে।

কাযী আবুল ফযল ইয়ায মালিকী (র) বলেন, এখন আমরা এই অধ্যায়ে এমন কিছু মু'জিযার কথা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি, যাহা নবী (সা)-এর উজ্জ্বল মু'জিযাসমূহের উপসংহার হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। আর আমাদের এতটুকু আলোচনাই পাঠকের আকুতি পূরণে যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন যুগে যুগে এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই প্রচুর মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। তবে সেই নবী ও রাসূলগণকে যেসব মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল, উহার তুলনায় নবী (সা)-কে দেয় মু'জিযা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং গুণগত মর্যাদায় এইগুলি অনেক উজ্জ্বল, অনেক স্পষ্ট। এমনকি নবী (সা)-কে এমন অনেক মু'জিযা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবী বা রাসূলকেই দেওয়া হয় নাই। যে পরিমাণ মু'জিযা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে দান করা হইয়াছিল, সেই পরিমাণ বা উহার চাইতেও অধিক এবং গুণগত মর্যাদায় অনেক উচ্চ মু'জিযা নবী (সা)-কে দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বিচিত্রধর্মী মু'জিযার মধ্যে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা অন্যতম। ইহার আগাগোড়া সম্পূর্ণটাই মু'জিযা আর মু'জিযা। আর পবিত্র কুরআনের মু'জিযার বিচিত্রতার মধ্যে রহিয়াছে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাসমূহ। কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মনীষীর বিবেচনায় সূরায়ে انا اعطينك الكوثر বা ইহার সমতুল্য আয়াতসমূহ এই মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। যাহা হউক, পবিত্র কুরআনের মু'জিযা প্রসঙ্গে যেমন পূর্বে আলোকপাত করা হইয়াছে, দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল উহার বাচন-পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হইল উহার বিন্যাস-পদ্ধতি।

www.pathagar.com

এই হিসাবে পবিত্র কুরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহের প্রত্যেকটিতে দুইটি মু'জিযা বিদ্যমান। অতঃপর এই হিসাবের উপর মু'জিযার অন্যান্য দিকসমূহ যোগ করুন, যেমন অদৃশ্যের জ্ঞানের খবর ইত্যাদি। সম্ভবত এইভাবে পরিসংখ্যান করিলে একটি সূরাই বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইবে এবং প্রত্যেকটি অংশই যদি একটি মু'জিযা হয়, তবে ইহার সংখ্যা আরো সম্প্রসারিত হইবে এবং ইহা এক বিপুল সংখ্যায় পরিণত হইবে। তদুপরি মু'জিযার অন্যান্য দিকগুলিও যদি গণ্য করা হয় যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে এই মু'জিযার সংখ্যার কোন সীমা থাকিবে না। এইতো মাত্র পবিত্র মহান কুরআনের অবস্থা। তারপর তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস, তাঁহার বর্ণিত ইতিহাস প্রতিটি স্ব স্ব অবস্থায় মু'জিযা হিসাবে গণ্য।

নবী আকরাম (সা)-কে যে সমস্ত নবী-রাসূলের চাইতেও অধিক ও উজ্জ্বল মু'জিযা দান করা হইয়াছিল, এখন আমরা সেই সম্পর্কে আলোচনা করিব। সে যুগে যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান শীর্ষস্থান দখল করিয়াছে, সেই যুগে সেই জ্ঞানের সমতুল্য মু'জিযা সমসাময়িক যুগের নবী রাসূলকে দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আ)-এর যুগের সম-সাময়িক যুগের লোক চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল যাদু বিদ্যার। অতএব হযরত মূসা (আ)-কেও উহার সাদৃশ্য মু'জিযাসহ প্রেরণ করা হয়। সেই যুগের মানুষ যে সব কাজের যোগ্যতার দাবী করিত, তিনি তাহাদের সম্মুখে এমন সব কাজ পেশ করিলেন যাহা ছিল তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের বাহিরে। তিনি ইহা দ্বারা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত তাহাদের জাদু বাতিল করিয়াছিলেন।

অনুরূপ হযরত ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক যুগে চিকিৎসাবিদ্যার অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। চিকিৎসাবিদগণ চিকিৎসা বিদ্যায় গর্ববোধ করিত ও অহমিকা প্রদর্শন করিত। তখন হযরত ঈসা (আ) এমন মু'জিযাসহ আবির্ভূত হইলেন, যাহা তাহাদের সকল অহংকার-অহমিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। তিনি এমন অদ্ভুদ ও বিস্ময়কর মু'জিযা প্রদর্শন করিলেন, যাহা কেবল তাহাদের সাধ্যের বাহিরেই নহে, তাহাদের চিন্তা-ভাবনারও বাহিরে। যেমন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, অন্ধজনকে দৃষ্টিশক্তি দান এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান ইত্যাদি। অথচ এই সমস্ত ব্যাধির উপশম ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রে অসম্ভব। এইরূপই ছিল সমস্ত নবী-রাসূলের মু'জিযার অবস্থা। অবশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সমসাময়িক আরববাসীদের জ্ঞান-গরিমার বিষয় ছিল চারিটি ঃ ১. বাকপটুতা ও ভাষার অলংকার, ২. কবিতা, ৩. সংবাদ ও ইতিহাস, ৪. ভবিষ্যত কথন ও জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শিতা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, যিনি এই চারিটি বিষয়েরই স্রষ্টা। আর যাহার ভাষার উৎকর্ষতাও বলিষ্ঠ পদ্ধতির বাচনভঙ্গি, কবিতার চরম উৎকর্ষতা এবং জ্যোতির্বিদ্যা এই চারিটি বিষয়েই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক এবং যাহা দ্বারা তাহাদের সকল অহংকার ও অহমিকা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাহারা শত চেষ্টা-সাধনা করিয়াও পবিত্র কুরআনের বাচনভঙ্গি, উহার সাহিত্যিক গুণের ধারে- কাছেও পৌঁছাইতে পারে নাই। কবিতার ছন্দ মিলনের বিষয়টিও শুধু তাহাদের বোধগম্যতার অতীতই ছিল না, বরং ইহা

www.pathagar.com

তাহাদের চিন্তা-ভাবনারও অতীত ছিল। অনুরূপ পবিত্র কুরআনের ছন্দমিল, উহার বিন্যাস পদ্ধতি যে উন্নত স্তরের, সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছা তাহাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল। তদ্রূপ ভবিষ্যতে যে সমস্ত বিষয়ের বিকাশ হইবে তৎসম্পর্কিত খবর, বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে এবং যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদ্রূপই সংঘটিত হইয়াছে। এই স্তরে পৌঁছা তাহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে সকলকেই পবিত্র কুরআনের সত্যতার স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। পবিত্র কুরআন ভবিষ্যত গণনাবিদ্যাকে বাতিল ঘোষণা করিয়াছে। কারণ, গণকদের এক-আধ কথা ঠিক হইলেও উহার দশটি মিথ্যা হয়। আর গণকদের কানে কানে যেসব শয়তান এক-আধটি কথা নিক্ষেপ করিত তাহাদিগকে উল্কাপাত দ্বারা বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঊর্ধ্বাকাশে তাহাদের যাতায়াত বন্ধ। পবিত্র কুরআনে অতীত যুগের ঘটনাবলী, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাহাদের উম্মতের অবস্থা, তাহাদের ধ্বংসের কারণ, অতীতকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যেভাবে সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছে কোন বিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে তদ্রূপ করা সম্ভবপর নয়। মনে হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কিস্‌সাসমূহ একটির সহিত অপরটির সংযোগ এত গভীর যে, এইগুলির একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সর্বোপরি পবিত্র কুরআন ইহার বিভিন্ন মু'জিযা এবং মু'জিযার বিচিত্রতাসহ কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও বিদ্যমান, যাহাতে পরবর্তী যুগের মানুষও ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে সুযোগ পায়। এমন কোন যুগ অতীত হয় নাই যে যুগে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সংবাদের সত্যতার বিকাশ ঘটে নাই। বরং যুগে যুগেই পবিত্র কুরআনে ঘোষিত সংবাদের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলে ঈমানে পরিপক্কতা আসে এবং পবিত্র কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের প্রাধান্য লাভ হয়। لَيْسَ الْخَبَرُ كَالمعائنة খবর কখনও প্রত্যক্ষ দর্শনের মত হয় না। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় প্রত্যক্ষ দর্শনের একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া থাকে। তবে ইলমে ইয়াকীন নিশ্চিত বিশ্বাসের পরিবর্তে আইনুল ইয়াকীন বা বাস্তব বিশ্বাস অধিকতর সান্তনাদায়ক। যদিও প্রত্যেক অবস্থাতেই যথার্থতা ও নিশ্চয়তা বিদ্যমান। তদুপরি সমস্ত নবী-রাসূলের সমস্ত মু'জিযাই তাহাদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটিয়াছে এবং তাহাদের যুগের পর আর তাহা অবশিষ্ট থাকে নাই। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযাসমূহ স্থায়ী। এইগুলি কখনও বিলীন হইবে না। সর্বক্ষণই তাঁহার নিদর্শনসমূহ নূতন, চির নূতন। এই জন্য ইমাম বুছাইরী বলিয়াছেন ঃ دامت لدينا فقالت كل معجزة من النبين انجائت ولم تدم 'আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর মু'জিযাসমূহ স্থায়ী কিন্তু অন্যান্য নবীগণের মু'জিযার কোনটাই টিকিয়া নাই।'

আমাদের প্রিয়নবী মহানবী (সা)-এর মু'জিযাসমূহ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। উহার আরেকটি কারণ হইল এই যে, তাঁহার মু'জিযাগুলি তাঁহার ওহী বা আল্লাহ্‌র বাণীর কারণ। ইহাতে কোন প্রকার মনগড়া ধ্যান-ধারণা সংযোগ করা; কোন কৌশল বা সাদৃশ্য প্রদান করা সম্ভবপর নয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ প্রকাশ হইয়াছে শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং তাহাদের এই সমস্ত দাবী ছিল তাহাদের মনগড়া ও দুর্বল বুদ্ধিপ্রসূত আশা-আকাঙ্ক্ষার নমুনার প্রতীক। যেমন ফিরআওনের জাদুকরদের রজ্জু এবং লাঠি নিক্ষেপ

www.pathagar.com

এবং আরও বিভিন্ন প্রকার জাদুবিদ্যার কলা-কৌশল প্রদর্শন করা এবং তাহাদের মুকাবিলায় চলমান অজগর হাযির করা। সম্ভবত কোন নাদান অজ্ঞ লোকও বলিবে না যে, ইহা সেই জাতীয়ই। অথচ পবিত্র কুরআন এমন বাণী যাহাতে কোন কলা-কৌশল, জাদুবিদ্যা ও মনগড়া ধ্যান-ধারণা বা কোন সাদৃশ্য দান করা সম্ভবপর নয়। যেমন যে ব্যক্তি কবি নয় বা যে ব্যক্তি বাগ্মিতায় অভ্যস্ত নয় তাহার পক্ষে কোন প্রকার কৌশলে বা টাল-বাহানা করিয়া কবিতা রচনা করা অথবা বক্তৃতা করা সম্ভবপর নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আহলে সুন্নাতপন্থী সমস্ত আলিমের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, পবিত্র কুরআনের বাণীর সাদৃশ্য কোন কিছু রচনা করা যাবতীয় শক্তি-সামর্থের বাহিরে। যদি সামর্থের মধ্যে থাকিত, তবে নিশ্চয়ই অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিত। কিন্তু মুতাযিলাসহ আমাদের কিছু কিছু আলিমের মতে শক্তি-সামর্থ্য ঠিক ছিল, কিন্তু কোন মানুষ যখন অনুরূপ করিতে প্রয়াস পান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শক্তি ও তাহার প্রয়াস কার্যকরী করিতে বাধা দেন। তাহাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেন না যে, সে কুরআনের সাদৃশ্য কোন বিষয় রচনা করিবে। যদিও এই মাযহাবের ভাষ্য অনুযায়ীও কুরআন যে সুস্পষ্ট মু'জিযা তাহা ব্যাহত হয় নাই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহাকে এই কাজ করিতে ক্ষমতা দেন নাই, ইহা মু'জিযার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাহাদের এই কথাটি যেন এই, যেমন কোন নবী বলিলেন, আমার প্রমাণ এই, অর্থাৎ যাহাতে মানুষ পূর্ণ সক্ষম, তথাপি তাহাদিগকে অনুরূপ করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে। ইহা কেবল ধারণা মাত্র যে, কুরআন যেহেতু তাহাদেরই রচনা জাতীয়, তবে মানুষ সক্ষম হইবে না কেন ! তবে এই দুইটি কথার মধ্যে প্রথম কথাটিই অধিকতর শক্তিশালী।

রোগী দর্শন

এখানে উল্লেখ্য যে, মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদের পর (অর্থাৎ নবী (সা)-এর প্রতি ভালবাসা, তাঁহার সুন্নাতের অনুসরণ, আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত এবং নবী (সা)-এর সাহাবীগণ, তাঁহার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসা, নবী (সা)-এর প্রতি সালাম পেশ করা অপরিহার্য)। অষ্টম পরিচ্ছেদ বিন্যাস করা হইয়াছে চিকিৎসা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও অদৃশ্যের খবরের জন্য। কিন্তু এই গ্রন্থের গ্রন্থকার শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবীর মতে এই বিন্যাস পদ্ধতি যথাযথ হয় নাই। কারণ, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বেই তিনি অদৃশ্যের খবরাখবর মু'জিযা অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার জন্য কোন স্থান রাখা হয় নাই, বরং তিনি ইহাকেও মু'জিযা পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক এমনকি দেহতত্ত্ববিদদের মতেও মু'জিযা যেমন নবী (সা)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তেমনি তাঁহার স্বপ্নও মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত এবং মানবীয় স্বভাবের ঊর্ধ্বে। বাস্তবিক পক্ষে, নবী (সা)-এর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী, তাঁহার অভিনব নির্দেশসমূহ, তাহার বাণী, বিশ্ব মানবতার জন্য তাহার সকল প্রচেষ্টা, সর্বপ্রকার আইন-কানুন, যাবতীয় বিধি-বিধান সকল কিছুই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

www.pathagar.com

ভূমিকা

নবী আকরাম (সা) রোগী দেখার জন্য যাইতেন এবং রোগীর মাথার নিকট বসিতেন, তাঁহার পবিত্র হস্ত রোগীর কপালে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কখনও বা ব্যথার স্থানে তাঁহার পবিত্র হস্ত রাখিয়া তাহার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তোমার কি অবস্থা ? এবং তিনি বলিতেন بسم الله। রোগীর অন্তরে আনন্দ-স্ফূর্তি সৃষ্টি করাও এক প্রকার চিকিৎসা। কারণ, ইহাতে তাহার অভ্যন্তরেও এই আনন্দ-স্ফূর্তির প্রতিক্রিয়ার সূচিত হয়। ফলে তাহার রোগের উপশম হয়।

রোগীর রোগ আরোগ্য লাভ বা রোগ উপশমের পক্ষে অন্তরের আনন্দ-স্ফূর্তির একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। কারণ, জীবনীশক্তি ইহাতে শক্তিশালী হয় এবং তাহা দ্বারা অনিষ্টকর শক্তি দমনে সাহায্য পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয় এবং মনীষীগণের সাক্ষাৎ দ্বারা এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জন্যই বলা হয় لقاء الخليل شفاء العليل। বন্ধুর সাক্ষাতে রোগীর রোগের উপশম হয়।

এক ইয়াহূদীর একটি ছেলে নবী (সা)-এর সেবা করিত। অকস্মাৎ সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। নবী (সা) তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে সালাম করিলেন, ইহাতে সেই ইয়াহূদী মুসলমান হইয়া গেল। নবী (সা) বলিলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ 'সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।'

হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, এমন কি আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। তখন নবী (সা) শুভাগমন করিলেন, তিনি উযূকরিয়া ব্যবহৃত পানি আমার দেহে ছিটাইয়া দিলেন। আমি তখনই হুশ ফিরিয়া পাইলাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি আমার মুখে ফুঁক দিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলাম। নবী (সা) বলিলেন, عَوِّدُوْا الْمَرْضٰى। 'তোমরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।' ইহা একটি মুস্তাহাব বিধান। ইহা ব্যাপক। অবশ্য কেহ কেহ চক্ষুরোগ, গলাফোলা এবং দাঁত ব্যথা ইত্যাদিকে এই বিধানের আওতা-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনা বায়হাকীর বর্ণনার অনুকূল, তবে ইহার বিপরীত বর্ণনাই বিশুদ্ধ।

অনুরূপ শনিবার দিন রোগী দর্শন নিষেধ বিশুদ্ধ মতের বিপরীত। এই ধারণা সুন্নাত বিরোধী। ইহার মূল হইল এক ইয়াহূদী চিকিৎসকের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। অর্থাৎ একদা এক বাদশাহ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং চিকিৎসককে শনিবার দিন তাহার নিকট হাযির হইতে নির্দেশ দিল। সে এই নির্দেশ হইতে এড়াইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিয়া দিল যে, শনিবার দিন রোগীর নিকট যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার পর এই কথা সর্বসাধারণ্যে প্রচার হইয়া গেল।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শীতের দিন রাত্রিবেলা এবং গ্রীষ্মের সময় দিনের বেলায় রোগী দর্শন করা মুস্তাহাব। কারণ, যাহাতে রোগীর কোন কষ্ট বা অনিষ্ট না হয়। কেননা, শীতের রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং গ্রীষ্মের দিন দীর্ঘ হয়। তবে দীনের দুশমন এবং চরিত্রহীন দুষ্ট

www.pathagar.com

লোকদিগকে দেখা মাকরূহ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্তের কথা ভিন্ন। রোগী দেখা যে মুস্তাহাব, এই ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্টাচার ও মাসআলার কিতাবে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, রোগ দুই প্রকার। অন্তরের রোগ ও দৈহিক রোগ। কিন্তু অন্তরের রোগ সংক্রান্ত চিকিৎসাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া এই ব্যাধি দূর করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসা অন্য লোক দ্বারাও সম্ভবপর হয়। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই চিকিৎসা গৌণ প্রকৃতির। কারণ, তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং উহার সংস্কার সাধন, তদুপরি পাপাচারের দরুন মানব হৃদয়ে রোগ-ব্যাধি ও যে ক্ষতি হয় এই পদ্ধতি অনুসরণেই তাহা দূর করিয়া হৃদয়কে ব্যাধিমুক্ত করা যায়। যেমন, দেহে বিষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির হয় এবং উহার চিকিৎসাও বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ হইল পাপাচার এবং আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্যতা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে এই পাপাচার হইতে মুক্তি দিন। পাপাচারের অনিষ্টকারিতা দেহ ও অন্তর উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। ইহার অপর একটি কারণ হইল জ্ঞানের আলোর অভাব। কারণ, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো পাপাচারের অন্ধকারের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন –

شكوت الى وكيع سوء خفظى + فارشدنى الى ترك المعاصى

وقال اعلم بان العلم نور + ونور الله لايوتى لعاصى

'আমি ওয়াকীর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে পাপাচার ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন।

এবং তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহ্‌র নূর বিশেষ এবং পাপীকে আল্লাহ্‌র নূর দেওয়া হয় না।'

ইহার দ্বিতীয় কারণ হইল, জীবিকার বঞ্চনা। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে যে, পাপাচারের দরুন মানুষকে জীবিকা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং পুণ্য দ্বারা অধিক জীবিকা অর্জিত হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ ان اهل القرى امنوا واتقوالفتحنا عليهم بركات من السماء والارض -

'গ্রামবাসীগণ যদি ঈমান আনিয়া তাকওয়া অবলম্বন করিত, তবে আমি তাহাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দ্বার খুলিয়া দিতাম।' (সূরা আরাফ ঃ ৯৬)

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অনেক পাপীও প্রত্যুষে ভিক্ষাকারীকে দেখা যায় যে, তাহারা অন্যদের তুলনায় অধিকতর নিআমত ও জীবিকা লাভ করিয়া থাকে। ইহার জবাবে বলা যাইতে পারে যে, এই প্রতিশ্রুতি, এই ভীতি প্রদর্শন কেবল ইসলাম গ্রহণকারী ও আল্লাহ্‌র নিকট আত্মনিবেদনকারীদের জন্য। অবশ্য এখানে এই আশংকাও বিদ্যমান যে, ঈমানের বীজ উহার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্রও ছিটকাইয়া পড়ার সম্ভাবনাও

বিদ্যমান। অথবা ইহা ধোকাবাজি এবং অলীক সুন্দর ক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। কারণ পাপাচারের সময় মানব হৃদয়ে এক প্রকার বিশেষ অন্ধকার এবং বন্যপনা অনুভূত হয়। আর এই অনুভূতি খুবই বাস্তব এবং অকাট্য। কখনও কখনও এই দুর্ভগ্যের কলংক-কালিমা মানুষের চোখে-মুখেও ফুটিয়া উঠে। ইহাও ঈমানের একটি শাখা। মানবদেহ ও হৃদয়ের আলস্যও পাপাচারের পরিচায়ক। পাপাচার দ্বারা মানুষের জীবন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যেমন পুণ্যের কাজ জীবন দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ পাপাচারকে কল্যাণ ও বরকত উঠিয়া যাওয়ার অর্থেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, পাপীদের অপমান, নির্বুদ্ধিতা, জীবিকার অপহরণ এবং দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে। যেমনিভাবে দৈহিক সুস্থতা ও শক্তি সংরক্ষণের জন্য সংযম এবং অপুষ্টিকর উপাদান ও অনিষ্টকর পদার্থ নির্গমন দ্বারাই সম্ভব হয়, অন্তরের অবস্থাও ঠিক তাহাই। তাওবা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার মাধ্যমেই অন্তরের পরিচ্ছন্নতা লাভ করা সম্ভবপর।

হযরত আনাস (রা)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং উহার চিকিৎসার কথা বলিয়া দিব না ? তারপর তিনি বলিলেন, তোমাদের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ তোমাদের গুনাহ্ এবং উহার চিকিৎসা হইল ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। ইহা দ্বারা বোধগম্য হইল যে, অন্তরের রোগ-ব্যাধির পরিচয় এবং চিকিৎসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। তবে অন্তরের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা তিনি কখনও অভিজ্ঞতা দ্বারা আবার কখনওবা ওহীর মাধ্যমে দিয়াছেন। যেমন তিনি সফর ও অসুস্থতার সময় রোযা ভঙ্গের অনুমতি দিয়াছেন এবং ভয়-ভীতি, অসুস্থতা এবং পানীর অভাবের সময় তায়াম্মুমের বিধান দিয়াছেন। অবশ্য নবী (সা) যে সমস্ত চিকিৎসার বিধান দিয়াছেন, তাহা হয়ত ওহীর ভিত্তিতে দিয়াছেন, আর যদি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দিয়া থাকেন, তবে তাহাও কোন অযৌক্তিক বিষয় নয়। কারণ, চিকিৎসা দ্বারা রোগ ও উহার উপসর্গ নির্ণয় করা এবং সেই সমস্ত উপসর্গ চিকিৎসার মাধ্যমে দূর করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন পানাহারের দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়। চিকিৎসা যে বৈধ, স্বয়ং নবী (সা)-এর অবস্থাই ইহার পক্ষে উত্তম প্রমাণ। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন তাওয়াক্কুলের চরম ও পরম পরিচায়ক। অথচ তিনিও চিকিৎসা করিয়াছেন এবং রোগ-ব্যাধির কারণ ও উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। সুতরাং নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেন নাই, যাহার চিকিৎসা নাই। অপর এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগ ও ব্যাধিরই চিকিৎসা বিদ্যমান। অর্থাৎ যে রোগ, যে ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে, কেবল উহারই কোন চিকিৎসা নাই। কোন কোন হাদীসে আছে, চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই ইঙ্গিতই প্রদান করা হইয়াছে যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র নির্দেশ এবং তাকদীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসাকেই আরোগ্য লাভের কারণ হিসাবে বিশ্বাস করিবে না। ইহাতে সকল মত ও পথের ইমামগণ একমত যে, এই বিধান অপরিহার্য নয় (বরং সুন্নাত ও মুস্তাহাব) এবং আল্লাহ্র নির্ধারণের প্রতি নির্ভর করিয়া সুদৃঢ় থাকা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। অবশ্য কখনও কখনও পরিস্থিতির অনুসন্ধান

www.pathagar.com

এবং তাওয়াক্কুলের মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে উপায়-উপকরণ ত্যাগও করিয়াছেন। আর ইহার ইঙ্গিত নবী (সা)-এর এই নির্দেশে বিদ্যমান ঃ

يدخل الجنة من امتى سبعون الفا من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون -

আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে স্থান লাভ করিবে–যাহারা রোগের চিকিৎসা করায় না এবং কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, বরং আল্লাহ্র উপর তাহারা তাওয়াক্কুল করে। অপর এক বর্ণনায় ولا يكسون শব্দটি রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা কাপড় পরিধান করে না।

আলিম সমাজ বলেন–এই হাদীসের তাৎপর্য হইল, এই সমস্ত কাজকেই রোগারোগ্যের একমাত্র উপায় হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় আছে هل يتداوى المتوكل 'আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি কি চিকিৎসা করাইতে পারে ?' এই প্রসঙ্গে হারিছ মুহাসেবীর ভাষ্য এই–চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কারণ, নবী (সা) হইতে চিকিৎসার কথা প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হাদীসে আছে, নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ من استرقى واكتوى برى من التوكل 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা করিল এবং দাগ লাগাইল সে তাওয়াক্কুলহীন।' তিনি ইহার জবাবে বলিলেন, পূর্বে বর্ণিত يدخل الجنة من امتى এই হাদীসে যে তাওয়াক্কুলের কথা বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা সেই তাওয়াক্কুল উদ্দেশ্য। অধিকন্তু তিনি আরও বলিলেন, তাওয়াক্কুলের বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। একটি স্তর অপরটির চাইতে উন্নত। তামহীদের গ্রন্থকার বলেন – তাওয়াক্কুল বিরোধী হইল শরীআত বিরোধী উপায়ে চিকিৎসা করান এবং চিকিৎসা ও দাগ লাগানকেই একমাত্র রোগারোগ্যের উপায় হিসাবে স্থির বিশ্বাস করা এবং ইহাতে আল্লাহ্র ক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা পোষণ করা। অন্যথায় যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আরোগ্য দান করা একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ, তবে তাহার পক্ষে চিকিৎসার বৈধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা চিকিৎসার কথা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং এই সম্পর্কে সম্মুখে আলোকপাত করা হইবে।

এই অধ্যায়ের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, রোগ-ব্যাধির কারণসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত এবং এই সব কারণের মধ্যে কতগুলি কারণ নিশ্চিত ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়াজিব। যেমন, খাওয়ার সময় খাদ্যের গ্রাস উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া, পান করার সময় পানপাত্র মুখের সহিত লাগাইয়া ঢোক ঢোক পানি পান করা। এইসব ত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং গুনাহর কারণ। দ্বিতীয় প্রকার কারণসমূহ ধারণাভিত্তিক। অভিজ্ঞতার আলোকে এইসবকে সঠিক বিবেচনা করা হয়। এই সবও তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন গ্রীষ্মের সময় ঠাণ্ডা ঔষধ এবং শীতের দিনে গরম ঔষধ ইত্যাদি সেবন করার অভ্যাও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে

www.pathagar.com

হাঁ, তাওয়াক্কুলের মাকাম লাভের সময় যদি অবস্থা যাচাই করার জন্য হয়, তখন ভিন্ন কথা। কারণ, কোন কোন তাওয়াক্কুলকারী এইরূপ করিয়াছেন বটে, তবে তিনি শরীআতের বিধানে তিরস্কৃত হইয়াছেন। তৃতীয় প্রকার কারণসমূহ সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত। এইগুলি নিশ্চিতও নয় বা ধারণাভিত্তিকও নয়। শুধু কল্পনা মাত্র। এই সব কারণ বাস্তবায়িত করা সর্বসম্মতভাবেই তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

নবী (সা)-এর দৈহিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল তিন প্রকারের। প্রথম প্রাকৃতিক ঔষধ দ্বারা, অর্থাৎ যে সমস্ত ঔষধকে জড় পদার্থের, উদ্ভিদের এবং জীব-জন্তুর অংশ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার চিকিৎসা ছিল রূহানী বা আধ্যাত্মিক এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ঔষধ দু'আ দ্বারা, আর এইসব হইল বিভিন্ন দু'আ, যিকির এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত। তৃতীয় প্রকার হইল এই দুই প্রকারের সংমিশ্রণে গঠিত যৌগিক ঔষধ। অর্থাৎ দু'আ এবং দাওয়া উভয়টি দ্বারা চিকিৎসা করা।

পবিত্র কুরআনের চাইতে ব্যাপকতর ও অধিকতর উপকারী এবং অধিকতর আরোগ্যদানকারী আর কোন বস্তু বা বিষয় অবতীর্ণ হয় নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন –

ونـنـزل مـن الـقـرأن مـاهـو شـفـاء ورحـمـة لـلـمـؤمـنـيـن

'আমরা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য আরোগ্য দানকারী এবং করুণা নাযিল করিয়াছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধির জন্য পূর্ণ কুরআন আরোগ্য দানকারী, সেই আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি অসৎ বিশ্বাস হউক বা নৈতিক অশালীনতা হউক অথবা মন্দ কর্ম হউক। পবিত্র কুরআন সুষ্ঠু আকীদা বিশ্বাস স্থাপন, সুন্দর চরিত্র গঠন এবং প্রশংসনীয় কার্যাবলীর বর্ণনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ পেশ করিয়াছে।

এখন রহিল দৈহিক রোগ ও ব্যাধি সংক্রান্ত চিকিৎসার বিষয়। ইহার কারণ হইল এই, পবিত্র কুরআন পাঠ দ্বারা অপরিসীম বরকত ও কল্যাণ লাভ হয় আর ইহাই বিভিন্ন রোগ ও ব্যাধির উপশমে অধিকতর কার্যকর এবং আরোগ্যদানকারী। কেননা, কোন কোন অজ্ঞাত মন্ত্র-তন্ত্র যাহার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না, তদুপরি এই মন্ত্র-তন্ত্র এমনসব চরিত্রহীন দুষ্ট লোক হইতে বর্ণিত হয় যে, আমরা তাহাদিগকে বাহ্য চক্ষে কতই না অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন দেখি, তথাপি সেই সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অনিষ্ট দূর করিতে ইহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাজেই পবিত্র কুরআন যে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁহার গুণাবলীর আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং ইহা এমন লোক হইতেই প্রকাশিত হয় যাহার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, যাহার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সর্বজনবিদিত, তদুপরি পবিত্র কুরআনের ন্যায় অলৌকিক বিষয়ের ধারক ও বাহক, সেই পবিত্র কুরআন দ্বারা রোগ-ব্যাধিতে আরোগ্য লাভ করা বিচিত্র হইবে কেন ? এই জন্যই নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শেফার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়াও আরোগ্য লাভ করে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আর আরোগ্য দান করিবেন না। হাদীস শরীফে আছে যে,

www.pathagar.com

ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরায়ে ফাতিহা সর্বরোগের চিকিৎসা। বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ও পাগলের জন্য সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা চিকিৎসার কথা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাযা (রা) হইতে ইব্ন মাজায় বর্ণিত আছে যে, خير الدواء القرآن। 'পবিত্র কুরআন সর্বোত্তম প্রতিষেধক।'

বায়জাবির গ্রন্থকার তাঁহার তাফসীরে পবিত্র কুরআনের আয়াত وننزل من القرآن ما هو شفاء -এর আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য আয়াতে শিফার আলোচনাও করিয়াছেন এবং চালপি এই সমস্ত আয়াত নির্ধারণ করিয়াছেন। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াসহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আয়াতে শিফার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ইমামুত তরীকত আবুল কাসিম কুশায়রী (র)-এর বর্ণিত ঘটনাটি বিধৃত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার একটি বালক অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহার অসুখ বৃদ্ধি পাইয়া সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইল। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার খিদমতে বালকের অবস্থা বর্ণনা করিলাম। নবী (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি আয়াতে শিফা হইতে দূরে থাক কেন। ইহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া শিফা চাও না কেন ? অতঃপর আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি এই ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং আল্লাহ্র কালামের ছয়টি শিফার আয়াত পাইলাম।

১। وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ

২। وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُدُوْرِ

৩। يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

৪। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

৫। وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

৬। قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ

আমি এই সমস্ত আয়াত লেখিয়া পানিতে গুলিয়া বালককে পান করাইয়া দিলাম। আর বালক সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য লাভ করিল। মনে হইল যেন, তাহার পায়ের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শাফিঈ মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম শায়খ তাজুদ্দীন সুব্কী (র) বলেন, আমি অনেক বিশিষ্ট শায়খকে রোগীদের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত আয়াতে শিফা লিখিয়া দিতে দেখিয়াছি এবং এই গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন যে, আমি হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তকীকে রোগীদের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। তবে এখানে একটা বিষয় জানার ও বুঝার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, যে সমস্ত আয়াত, যিকির ও দু'আ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নিশ্চিতই সেইগুলি শিফা এবং উপকারিতার পক্ষে কার্যকর। তবে স্থান ও পাত্রের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং চিকিৎসকের শক্তি, তাহার হিম্মত এবং তাহার প্রভাবশালিতাও শর্ত। কোন স্থানে আরোগ্য লাভে যদি বিঘ্ন দেখা দেয়, তবে মনে করিতে হইবে

www.pathagar.com

যে, হয়ত চিকিৎসকের দুর্বলতা এবং তাহার প্রভাবহীনতাই ইহার জন্য দায়ী, অথবা পাত্রের অযোগ্যতার দরুন এই সমস্ত আয়াতে কারীমার ফল পাওয়া যাইতেছে না, অথবা এই স্থানে এমন কঠিন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান যে, চিকিৎসকের পর্যাপ্ত শক্তি এবং পাত্রের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার পরও এইসবের যথাযথ ফল এবং ইহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশে চিকিৎসক অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই অবস্থা কেবল এইসব দু'আ বা যিকিরের ক্ষেত্রেই নহে, বরং বস্তুগত চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা বিদ্যমান। কেননা, কোন কোন সময় দেখা যায় যে, রোগীর স্বভাবে ঔষধের প্রভাব গ্রহণের ধারণের যোগ্যতার অভাবেই চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়াছে। আবার কখনও কখনও কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার দরুন ঔষধের প্রভাব সেই পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না। কেননা, রোগীর স্বভাব যখন ঔষধের ক্রিয়া ধারণ করার পরিপূর্ণ যোগ্য নহ, তখনই সেই ঔষধ দ্বারা পুরাপুরি ফল পাওয়া যায়। অনুরূপ রোগীর অন্তর যখন শিফার দু'আ ও তাবীয পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া লয় এবং চিকিৎসক বা দু'আকারীর হিম্মতও পাওয়া যায়, তখনই দু'আ ও তাবিজ রোগ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অনুরূপভাবে দু'আ রোগ-ব্যাধি নিরাময়, বিপদাপদ দূর করিতে এবং উদ্দেশ্য পূরণে অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী উপকরণ বটে, তবে কখনও কখনও ইহার প্রতিক্রিয়া বিপরীত হইয়া থাকে। আর এইরূপ হওয়ার কারণ হইল, প্রকৃতই তাহার মধ্যে এমন কোন দুর্বলতা বিদ্যমান, যাহার ফলে দু'আ কার্যকর হয় নাই। যেমন কেহ দু'আ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেই দু'আ বান্দার পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন না, কারণ, এই দু'আ কবূল করিলে সত্য ও ন্যায়ের সীমা লংঘিত হয়। অথচ ইহা আল্লাহ্র মহান সত্তার নিকট হইতে আশা করা যায় না। অথবা দু'আকারীর অন্তরের দুর্বলতার দরুন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন, দু'আকারীর দু'আ করার সময় পূর্ণ নিষ্ঠা, পরম বিনয় ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হয় নাই, অথবা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ এই যে, দু'আ দ্বারা বর্ধিত ফল লাভের পরিপন্থী কোন বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। যেমন হারাম খাদ্য আহার করা, অথবা দীন সম্পর্কে অন্তরে অজ্ঞতার অন্ধকার বিরাজমান থাকা বা অন্তরে অমনোযোগিতা বা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকা ইত্যাদি। হাদীস শরীফে আছে, যে অন্তর খেলাধুলায় লিপ্ত এবং আল্লাহ্র স্মরণ সম্পর্কে উদাসীন, সেই অন্তরের দু'আ আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয় না। মূলতঃ দু'আ বালা-মুসীবতের দুশমন, দু'আ বালা-মুসীবত দূরীভূত করে এবং দু'আ বালা-মুসীবতে বাধা সৃষ্টি করে বা বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার পর উহাকে দূর করিয়া দেয় বা উহাকে দুর্বল ও হালকা করিয়া দেয়। দু'আ মু'মিনের প্রধান হাতিয়ার।

হুযূরে কালব, পূর্ণ একাগ্রতা, বিনয়-নম্রতা, পবিত্র অবস্থায় তাওবা ও ইস্তিগফার করিবার পর দু'আ কবূলের সময়, দু'আ কবূলের অন্যান্য শর্ত অনুযায়ী দুই হাত উঠাইয়া সত্য অন্তরে আল্লাহ্র গুণাবলী ও প্রশংসাসহ নবী (সা)-এর প্রতি মনোনিবেশসহ দু'আ করিলে সেই দু'আ এমন তীর নিক্ষেপের ন্যায় কার্যকারী হয়, যেমন কোন দক্ষ তীরন্দাযের তীর-ধনুক যদি সম্পূর্ণ ঠিক থাকে, দিনের উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ শক্তিতে লক্ষ্যবস্তু সামনে রাখিয়া ঐ তীর নিক্ষেপ করিলে তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থাকে না।

www.pathagar.com

এখন কথা রহিল معوذات এবং আল্লাহ্র পবিত্র নাম ও অন্যান্য দ্বারা রোগারোগ্য কামনা করার কথা। মূলতঃ ইহাও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। যদি এই সমস্ত বিষয় কোন আল্লাহ্ভীরু, সৎ, নিষ্ঠাবান লোকের মুখে হয়, পূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সঙ্গে হয়, তখন ইহা দ্বারাও বিস্ময়কর ফল লাভ হয়। তবে এই ধরনের লোকের অস্তিত্ব খুবই বিরল বিধায় সমস্ত লোক ইহার প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব না দিয়া বরং উদাসীন হইয়া দৈহিক চিকিৎসার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হয়। معوزات দ্বারা উহাই উদ্দেশ্য যাহা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী আকরাম (সা) قل اعوذ برب الفلق ও قل اعوذ برب الناس–এই দুইটি সূরা পাঠ করিয়া ফুঁক দিতেন। অবশ্য কেহ কেহ قل هو الله احد এবং قل يا ايها الكافرون-এর কথা বলিয়াছেন। অথবা পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে استعاذه বা আশ্রয় প্রার্থনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে معوذات দ্বারা সেই সবই উদ্দেশ্য। যেমন رب اعوذبك من همزات الشياطين , اعوذبك رب ان يحضرون ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আমরা যেসব বিষয়ের আলোচনা করিতেছি ইহা আরও ব্যাপক এবং দু'আ এবং ওযীফাও অনেক বর্ণিত হইয়াছে।

আলিম সমাজ অবশ্যই তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকিলে শিফার দু'আা এবং করার বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। প্রথম শর্ত এই যে, এই সমস্ত দু'আ আল্লাহ্র কালাম এবং আল্লাহ্র পবিত্র নাম, তাহার গুণাবলী সম্বলিত হইবে, তাহা আরবী ভাষায় হউক বা অন্য যে কোন ভাষায় হউক। দ্বিতীয় সেই সব দু'আর অর্থ জানা থাকিতে হইবে। তৃতীয় এই বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, দু'আয় প্রকৃত ক্রিয়াকারী শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এবং এই দু'আ ও মন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপেই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁহার তাকদীরের উপর নির্ভরশীল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেহ নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই সমস্ত দু'আ, দরূদ এবং ওযীফা বা অন্যান্য যে সমস্ত উপায়-উপকরণ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে নবী (সা)-এর মতামত কি ? এইগুলি কি আল্লাহ্র তাকদীরকে পরিবর্তন করিয়া দেয় ? নবী (সা) বলিলেন, ইহাও তাকদীরে ইলাহীর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা অজ্ঞতার যুগে বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিতাম। একদিন নবী (সা)-এর নিকট আরয করিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দেন ? নবী (সা) বলিলেন, সেইসব মন্ত্র-তন্ত্র আমার সামনে পেশ কর দেখি, যদি উহাতে কোন শিরকের কথা না থাকে, তবে তোমরা তাহা পাঠ করিতে পার। তাহাতে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

বিচ্ছুর বিষ

হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী (সা) মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁহার খিদমতে গিয়া আরয করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিচ্ছু দংশন করিলে আমরা এই মন্ত্র পাঠ করি। তারপর তাহারা তাহা পাঠ করিয়া নবী (সা)-কে শুনাইলেন। তখন নবী (সা) বলিলেন, "এই মন্ত্রে কোন ক্ষতির কারণ দেখি না, তোমরা ইহা পাঠ করিতে পার। তিনি আরও বলিলেন, যাহার দ্বারা যতটুকু সম্ভবপর হয় স্বীয় ভাইয়ের

www.pathagar.com

উপকার করিবে।" হাদীসের এই ব্যাপকতা দ্বারা একদল দলীল গ্রহণ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক পরীক্ষিত এবং উপকারী মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ, যদিও উহার অর্থ জানা না থাকে। তবে সতর্কতা স্বরূপ যে মন্ত্রের অর্থ জানা নাই তাহা পাঠ করা উচিত নয়। কারণ, হয়ত তাহাতে শিরকের কোন কথা থাকিতে পারে। এই বিধান কেবল সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য যাহা নবী (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত নয়। অবশ্য বর্ণিত মন্ত্র বা দু'আ দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন বিচ্ছুর দংশন সম্পর্কে বর্ণিত মন্ত্র– بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مِلْحَةُ بَحْرٍ। ইহার বৈধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক (রা)-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই জানা গিয়াছে যে, শিরক সম্বলিত কোন মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করা বৈধ নয়। অনুরূপ সুরিয়ানী বা হিব্রু ভাষায় বর্ণিত দু'আ-কালাম এবং নামসমূহ–যাহার অর্থ জানা নাই তাহাও পাঠ করা উচিত নয়।

হিকায়াতে মাশায়েখ-এ বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একটি দু'আ পাঠ করিতেছিল। তথায় অপর একটি লোকও উপস্থিত ছিল। সে বলিল, এই লোকটির কি হইল যে, সে আল্লাহ্ এবং রাসূল (সা)-কে গালি দিতেছে ? এই দু'আর সারমর্মই ছিল আল্লাহ্ ও রাসূলের গালিতে পূর্ণ। কিন্তু সেই লোক তো না জানিয়া তাহাই পাঠ করিতেছিল। আমরা অনুরূপ কাজের জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অবশ্য কোন কোন নির্ভরযোগ্য লোক হইতেও এমন কিছু কথা বা মন্ত্রতন্ত্র বর্ণিত আছে, যেগুলির অর্থ জানা নাই। তবে এইগুলি বিশিষ্ট মনীষিগণ পাঠ করিত বলিয়া নিশ্চতরূপেই জানা গিয়াছে। যেমন হিরযে ইয়ামানী যাহাকে সায়ফীও বলা হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য দু'আও তিনি পাঠ করিতেন।

ইব্‌ন মাজাহ ও আবূ দাউদের হাদীসে বর্ণিত আছে এবং হাকিম হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সূত্র দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নবী (সা) বলিয়াছেন, রুকিয়া, তামীমা ও তাওলা শিরকপূর্ণ। রুকিয়া বলা হয় অজ্ঞতাপূর্ণ মন্ত্রকে। তামীমা বলা হয় বালা মুসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে শিশুদের গলায় যে সমস্ত কাল দানা লটকাইয়া দেওয়া হয় এবং তাওলা বলা হয় সেই সমস্ত জাদু-মন্ত্রকে স্ত্রীলোকেরা যাহা দ্বারা স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার জাদু। হেযবের দু'আ ও মন্ত্র-তন্ত্র যাহা কাগজে লিখা হয় উহাকে 'তাবীয' বলা হয়। ইহা বাজুতে বা গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন আলিম এই সমস্তকে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, নবী (সা) ভয়-ভীতি ও অনিদ্রা দূর করিবার জন্য তাহাকে এই কয়টি কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন ঃ

اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده من همزات الشياطين ان يحضرون -

আর হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বুদ্ধিমান বালকগণকে এই কথা কয়টি শিক্ষা দিয়া দিতেন আর যে সমস্ত বালক বুদ্ধিমান নয় তাহাদের জন্য কাগজের টুকরায় লিখিয়া তাহাদের গলায়

www.pathagar.com

লটকাইয়া দিতেন। তাহাদের মতে উহা বৈধ। تعويذ শব্দটি হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন تعويذات النبى এবং تعويذ الطفل بكمات الله التامه الحديث ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সম্মুখে আলোচনা করা হইবে। تعويذ শব্দের অর্থ ভয়-ভীতি ও অনিষ্টকর বিষয় বা বস্তু হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) আমার গলায় একটি সুতার ডোরা বাঁধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যায়নাব! তোমার গলায় ইহা কি ? আমি বলিলাম, ইহা একটি সুতা, ইহাতে মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুঁক দেওয়া হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ্ ইহা ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র ঘর শিরকের মুখাপেক্ষী নয়। ইহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, মন্ত্র-তন্ত্র, সুতা, দানাপড়া ও টোটকা-ফোটকা সব কিছুই শিরক। যায়নাব বলিলেন, আপনি এইসব কি বলেন, বাস্তব কথা এই, আমার চোখে ব্যথা হইয়াছিল, আর ব্যথার তীব্রতায় আমার চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িবে আর কি। সর্বদাই কেতুর ও অশ্রু পূর্ণ থাকিত। তখন আমি অমুক ইয়াহূদীর নিকট গেলাম, সে কিছু পাঠ করিয়া আমার চোখে ফুঁক দিয়া দিলেন। ফলে আমার চক্ষু সেই সময়ই ভাল হইয়া গেল। আর আমি শান্তি লাভ করিলাম। আবদুল্লাহ্ বলিলেন, তোমার চক্ষের এই ব্যথা ছিল শয়তানের কাজ। সে তোমার চক্ষে খোঁচা দিয়াছিল। সে যখন মন্ত্র পাঠ করিল, তখন শয়তান খোঁচা দিতে বিরত রহিল। অথচ তোমার উচিত ছিল যে, নবী (সা) যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পাঠ করা। আর তাহা হইল এই ঃ

اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافى لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما -

অর্থাৎ 'হে মানুষের প্রভু! এই বিপদ দূর করিয়া দাও, আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তুমি ছাড়া আর কোন আরোগ্যদানকারী নাই আর তোমার আরোগ্যদান কোন রোগ- ব্যাধিকেই ত্যাগ করে না।'

এই সমস্ত বিষয়কে শিরকের মত গণ্য করা হয় কেন ? ইহার কারণ হইল এই যে, অজ্ঞতার যুগের মানুষ প্রকৃতই এইসব বিষয়গুলির মধ্যেই কার্যকর শক্তি রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে এইসব তাবীয, সুতা পড়া, টোটকা-ফোটকা করিত। অবশ্য আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ্র কালাম দ্বারা যে সব তাবীয বা সুতা পড়া ও টোটকা-ফোটকা করা হয়, তাহা এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এইগুলিতে শির্ক হইবেই বা কিরূপে। যেহেতু এইসব ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি-মিনতি করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করার বৈধতার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই, তাহা যেভাবেই হউক আর যে স্থানেই হউক না কেন।

কেহ কেহ বলেন, জিন্ন বশীভূত করার দাবীদারগণ যে সব মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করে তাহা নিষিদ্ধ। কারণ, এইসব মন্ত্র-তন্ত্রে তাহারা সন্দেহযুক্ত কথাবার্তা এবং হক ও বাতিল সমন্বয়ে

www.pathagar.com

গঠিত বাক্য ব্যবহার করে। ইহাতে আল্লাহ্র আলোচনা ও আল্লাহ্র মহান নামসমূহের সহিত শয়তানের নাম ও আলোচনা শামিল করিয়া তাহা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাহারা বলে যে, স্বভাবতঃই জিন্ন মানুষের শত্রু এবং শয়তানের বন্ধু। যখন তাহারা শয়তানের নাম সম্বলিত মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করে, তখন জিন্নগণ তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে। জীব-জন্তুর কাটার অবস্থাও অনুরূপ। কারণ, ইহাও জিন্নের কাজ। জিন্ন সাপ ও বিচ্ছুর রূপ ধারণ করিয়া কাটিয়া থাকে। অতএব, যখন শয়তানের নাম সম্বলিত মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করা হয়, তখন উহার বিষ তাহার দেহেই সংক্রমিত হয় এবং এই জন্যই তাহারা মন্ত্র পাঠ করিলে ভাগিয়া যায়।

সারকথা এই, এই উম্মতের আলিম সমাজ একমত যে, আল্লাহ্র নাম ও তাঁহার গুণবাচক নাম ব্যতীত যে সকল মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহা মাকরূহ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফিকাহ ও হাদীসের বিশিষ্ট পণ্ডিত আল্লামা কুরতুবী বলেন যে, رقيه বা আরোগ্য লাভের দু'আ তথা মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম– অজ্ঞতার যুগের মানুষ যেসব মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিত এবং যাহার অর্থ জানা নাই, তাহা হইতে বিরত থাকাই ওয়াজিব। কারণ, হয়ত তাহাতে শির্ক অথবা শিরকে পৌঁছাইয়া দিবে–এমন কোন কথা রহিয়াছে। অথচ সে তাহা জানে না। দ্বিতীয় আল্লাহ্র নাম ও তাঁহার গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা দু'আ করা–ইহা বৈধ। আর যদি কোন দু'আা বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠ করা মুস্তাহাব। তৃতীয় আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যান্য নাম সম্বলিত দু'আ বা মন্ত্র–যেমন, ফেরেশতাদের নাম বা কোন নেক বান্দা অথবা কোন মহান সৃষ্ট বস্তুর নাম, যেমন আরশ-কুরসী ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয় হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয় বটে, তবে এই সমস্ত ত্যাগ করাই শ্রেয়। কেননা, ইহাতে গায়রুল্লাহ্র মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। অবশ্য যে নাম দ্বারা মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহার প্রতি যদি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তবে ইহাও গায়রুল্লাহ্র ন্যায় ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

এই অধম দাস (শায়খ দেহলভী) বলেন, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা এবং আল্লাহ্র মহান নামসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করা এই জন্যই বৈধ যে, আল্লাহ্র দরবারে এবং আল্লাহ্র রাসূলের দরবারে তাহাদের নৈকট্য ও স্থান রহিয়াছে। আমরা যদি তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি, তবে শুধু এই জন্যই করি যে, তাঁহারা উত্তমরূপে আল্লাহ্র বন্দেগী করিয়াছেন, আল্লাহ্র রাসূলের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য নহে। কাজেই ইহাকে গায়রুল্লাহ্র সহিত তুলনা করা ঠিক হইবে না। বরং ইহা কেবল মাধ্যম গ্রহণ করার জন্য, জাহল ও অজ্ঞ লোকদের ন্যায় অংশীদার হিসাবে নহে।

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم

হযরত রবী' (র) বলেন যে, একদা আমি রোগীর আরোগ্য লাভের দু'আ সম্বন্ধে ইমাম শাফিঈ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, কোন দোষ নাই, যদি আল্লাহ্র কিতাব এবং জানাশুনা আল্লাহ্র নাম দ্বারা হয়। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মুসলমানগণ আহলে কিতাব দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করাইতেন, ইহা কি ঠিক ? তিনি বলিলেন, হাঁ। যদি

www.pathagar.com

জানাশুনা আল্লাহ্র নাম এবং আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা হয়, তবে ঠিক। এখানে হযরত শাফিঈ যে কিতাবের কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা পবিত্র কুরআনই উদ্দেশ্য। কারণ, ইয়াহূদী ও নাসারা তাওরাত ও ইনজীলে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া আল্লাহ্র কিতাবের মর্যাদা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। কাজেই উহাতে এখন আর নির্ভর করা যায় না।

ইমাম মালিক (র) তাঁহার মুওয়াত্তায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এক ইয়াহূদী রমণীকে বলিলেন যে, আইশার জন্য আল্লাহ্র কিতাব হইতে কোন দু'আ কর। আল্লামা নববী বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারা দ্বারা মুসলমানদের দোয়া-তাবীজ সম্পর্কিত ইমাম মালেকের কথায় আলিমদের মতভেদ আছে। তবে ইমাম শাফিঈর মতে জাইয বা বৈধ। ইব্ন ওয়াহব ইমাম মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লৌহজাত কোন বস্তু দ্বারা, লবণ দ্বারা এবং সুতায় গিরা লাগানো দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্র করা মাকরূহ। তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটি সম্পর্কে বলেন যে, প্রাচীনকালের লোকজন এইরূপ ব্যবহার করিত না। অর্থাৎ ইহা এক প্রকার বিদআত এবং মাকরূহ।

সতর্কতা ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিকাংশ লোকের বিভ্রান্তির কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগের এই সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া যায়। তাহা মনে করে, শরীআতসম্মত দু'আ-কালাম দ্বারা কখন এই জাতীয় ফল পাওয়া যায় না। কাজেই এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার অস্বীকৃতির ভাব প্রকাশ পায় এবং তাহারা বিস্ময়ের ধাঁধায় পতিত হয়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী হইতে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনিও বলিয়াছিলেন যে, কি করিব। যখন আমি চক্ষের ব্যথায় অস্থির, তখন আমি অমুক ইয়াহূদী দ্বারা মন্ত্র পাঠ করাইয়াছি এবং আমার চক্ষু তখনই ঠিক হইয়া গিয়াছে। অথচ সাধারণ মানুষ জানে না যে, এই কাজ করিতে শরীআতের প্রবর্তক নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, এই নিষেধের গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য হইল মানুষকে শির্ক ও কুফরের গভীর গহ্বর হইতে রক্ষা করা। কাজেই যাহাদের ঈমান-আকীদা মযবুত, যাহাদের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়, তাহারা কোন অবস্থাতেই এই জাতীয় কাজ করে না, ইহাতে যদি তাহার জীবনের অবসানও ঘটে, যদি কঠিন বিপদের আশংকাও তাহার থাকে। কেননা, সে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, পরম সৌভাগ্যের জীবন, পরম আনন্দের জীবন লাভ করা সম্ভবপর হইবে কেবল শরীআত প্রবর্তকের নির্দেশ পালন করিলেই। পার্থিব জীবনই যাহাদের কাম্য তাহাদের পদস্খলন ঘটিয়াই থাকে এবং তাহারা শির্ক ও কুফরের বেড়াজালে আটকাইয়া পড়ে। আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি দিন।

আমাদের এই শহরেও একটি মন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরীর কুদ্দিসা সিররুহুর) নিকট হইত ইহা শ্রুত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। মানুষ তাঁহার প্রতি আসক্ত। যখন তাঁহার প্রতি ইহাকে সম্বন্ধযুক্ত দেখে তখন তাহারা আরও তাঁহার প্রতি এমনিতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। অথচ এই মন্ত্রে এমন কিছু নাম আছে যাহা হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, এই মন্ত্র হইতে আমাদের অবশ্যই বিরত থাকা উচিত।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ

প্রত্যেক বিষয়েই নবী (সা)-এর নিকট হইতে আরোগ্য লাভের দু'আ বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ চক্ষু এবং বিষাক্ত প্রাণীর কাটার ব্যাপারে দু'আ বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি হাদীসে আছে যে, বদনযর, বিষাক্ত প্রাণীর কাটা এবং ফোঁড়ার ব্যাপারে মন্ত্র পাঠ করাইবার জন্য জোর তাকীদ করা হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, لا رقية الا فى نفس او حمة মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করার কোন অনুমতি নাই, তবে বদনযর এবং কোন বিষাক্ত প্রাণীর কাটার ব্যাপারে মন্ত্র করানো যাইতে পারে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারসমূহের সহিত মন্ত্র পাঠ করার অনুমতি নির্দিষ্ট। মূলতঃ তাহা নয়, বরং সর্বপ্রকার রোগ-শোকেই মন্ত্র পাঠ করার অনুমতি রহিয়াছে। এমনকি জ্বর, কম্প, মাথা ব্যথা ও দাঁত ব্যথা ইত্যাদি রোগেও মন্ত্র পাঠ করার অনুমতি রহিয়াছে।

বদনযর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন العين حق। বদনযরের কুফল বাস্তব সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন লোকের মধ্যে এই বিশেষত্ব দিয়াছেন যে, সে যখন কোন বস্তুর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে, তখন সেই বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন জাদুর ক্রিয়া। নবী (সা) আরও বলিয়াছেন— لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ যদি কোন বস্তু তাকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইত, তবে বদনযরই সমর্থ হইত। অধিকাংশ আলিমের মতে বদনযর সত্য। তবে বিদআতীদের মধ্যে একদল যেমন, মু'তাযিলা এবং তাহাদের সমর্থকগণ ইহাতে শোবা-সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। অথচ সত্য খবরদাতা অর্থাৎ নবী (সা) যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন ইহাতে শোবা-সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? বরং ইহা বিশ্বাস করাই কর্তব্য এবং ইহা অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

যদি কেহ বলে যে, সকল বস্তুই যেহেতু আল্লাহ্র নির্ধারিত বা তাকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে, তবে বদনযরের কি মূল্য থাকিতে পারে ? ইহার জবাবে বলা যায় যে, বদনযরও আল্লাহ্র সৃষ্ট তাকদীর। কেননা, চক্ষের ক্রিয়াশক্তি মৌলিক নয়। অবশ্য সুন্নাত জামাআতের যে কোন লোক ইহা বলিবে যে, ইহার কারণ স্বাভাবিক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হইল এই, যখন কোন মানুষের সামনে অপর কোন মানুষ আসে এবং একজন অপরজনের প্রতি উত্তমরূপে দৃষ্টিপাত করে, তখন দৃষ্টিপাতকারীর চক্ষু হইতে এক প্রকার বিশেষ বস্তু নির্গত হয় এবং আল্লাহ্র কুদরতে উহাতে ক্ষতিকর ক্রিয়াশক্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে ও তাহার সম্মুখস্থ বস্তুর ক্ষতি সাধন হয়। অবশ্য কোন কোন প্রকৃতিবিদের মতে দৃষ্টিপাতকারীর চক্ষু হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুতে মিশিয়া যায় এবং বাহিরের পদার্থ লোমকূপের মাধ্যমে তাহার চক্ষে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাতে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া দেন, যেমন কেহ বিষ পান করার সময় ধ্বংস সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই কথা সম্ভাব্য, কেননা, ইহাই সঠিক এইরূপ দাবী করা ভুল। তবে যে সমস্ত লোকের বদনযর লাগে, তাহাদের কেহ বলে যে, আমরা যখন কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করি এবং সেই বস্তু যদি আমাদের নিকট ভাল

www.pathagar.com

লাগে, তখন আমাদের চক্ষু হইতে এক প্রকার বিশেষ উত্তপ্ত পদার্থ নির্গত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অপর কেহ কেহ বলেন–দৃষ্টিকারীর চক্ষু হইতে এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, যাহা দৃষ্টবস্তুর কলেবরে মিশিয়া গিয়া উহার ক্ষতি সাধন করে। যেমন সাপের বিষ, আঘাত করিলেই তাহা দেহে প্রবেশ করে। কোন কোন সাপ এমনও আছে যে, তীক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমেই বিষ সংক্রমণ করিয়া থাকে।

সারকথা এই, দৃষ্টিকারীর চক্ষু হইতে এমন কোন পদার্থ দৃষ্ট বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় যে, উহার প্রতিক্রিয়া হইতে প্রতিরক্ষা করার কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেই পদার্থ দৃষ্ট বস্তুতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। আর যদি উহার সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে, যেমন রোগ নিরাময়ের দু'আ, তাআব্বুয বা অন্যান্য দু'আ তবে এই সমস্ত ঢালের ন্যায় উহার প্রতিরোধ করিয়া থাকে। আর উক্ত ঢাল যদি দৃঢ় ও মযবূত হয়, তবে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, উহাকে তীরের ন্যায় ফিরাইয়া দিবে।

এই বদনযরের চিকিৎসা ছিল নবী (সা)-এর নিকট معوذات বা যে সমস্ত অনিষ্টকর বস্তু বা বিষয় হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ রহিয়াছে। যেমন معوذتين অর্থাৎ قل اعوذ برب الفلق ও قل اعوذ برب الناس এই দুইটি সূরা, সূরায়ে ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য। আলিম সমাজের মতে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দু'আ হইল সূরায়ে ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস এবং অন্যান্য যে সমস্ত আয়াত ও সূরা দ্বারা তাবীয এবং দু'আর প্রসঙ্গ বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এই ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُ مِنْ بِرٍّ وَّ لاَ فَاجِرٍ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمَا بَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلاَّ طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ـ

'আমি আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ বাণী দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি, যাহা সৎ-অসৎ কাহাকেও ত্যাগ করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দরতম ও আমার জ্ঞাত-অজ্ঞাত নামসমূহ দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা হইতে এবং আসমান হইতে তিনি যাহা অবতীর্ণ করেন এবং আসমানে যাহা উড্ডীন হয়, তাহার অনিষ্টকারিতা হইতে এবং তিনি মাটিতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহার অনিষ্টকারিতা হইতে এবং দিবারাত্রির বিপর্যয় হইতে এবং দিবারাত্রির আগন্তুকের অনিষ্টকারিতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থন করি। তবে হে রহমান! যাহা কল্যাণবহ (তাহা হইতে নহে)।'

বদনযরের অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর করিবার জন্য এই দু'আ পাঠ করা উচিত مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (আল্লাহ্ যাহা চান তাহাই হয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি নাই।) যদি

www.pathagar.com

দৃষ্টিপাতকারী ভীত থাকে যে, তাহার নযরের অশুভ প্রতিক্রিয়া যেন দৃষ্ট বস্তুতে না পৌঁছে, তখন ইহা পাঠ করিবে –.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ আয় আল্লাহ্! ইহাতে বরকত দান কর। তবে বদনযরের অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সাহল ইব্ন হুনায়ফ খুবই সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন। তিনি একদিন গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় আমির ইব্ন রাবিআ তাহাকে দেখিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো এমন সুন্দর পুরুষ কেন, কোন পর্দানশীন মহিলাকেও দেখি নাই। ফলে সাহল ইব্ন হুনায়ফ সেই সময়ই বেহুশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তারপর নবী (সা)-এর নিকট এই খবর আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে কি তোমরা কাহাকেও অভিযুক্ত কর ? লোকজন বলিল, আমির তাহাকে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্যের খুব প্রশংসা করিয়াছিল। তারপর তিনি আমিরকে ডাকাইয়া তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যখন তোমার ভাইয়ের কোন বিষয় ভাল মনে হইল, যখন তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর মনে হইল তখন اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ (হে আল্লাহ্! তুমি ইহাতে বরকত দান কর।) কেন বলিলেন, না ? তারপর বলিলেন, তুমি তোমার ভাই সাহল ইব্ন হুনায়ফকে তোমার ব্যবহৃত পানি দান কর। অতএ,ব তিনি তাহার হাত-পা-মুখ ও গুপ্তস্থানসহ দুই উরু ধৌত করিয়া সেই ব্যবহৃত পানি দিলেন। তারপর সেই পানি সাহল ইব্ন হুনায়ফের মাথায় ঢালা হইল আর তিনি তখনই সুস্থ হইয়া লোকের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় ইব্ন কাছীরের মাধ্যমে নিহায়া হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা এবং উহার বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আরববাসীদের অভ্যাস ছিল, যখন কাহারও উপর বদনযরের অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত, তখন দৃষ্টিপাতকারীর সামনে এক বরতন পানি আনিয়া দেওয়া হইত, সে তাহার ডান হাত দ্বারা সেই বরতন হইতে পানি উঠাইয়া তাহার শরীরে ঢালিত এবং কুলি করিত এবং কুলির পানিও বরতনে ফেলিত। তারপর সেই বরতনে তাহার মুখমণ্ডল ধৌত করিত, তারপর বাম হাতে সেই বরতন হইতে পানি লইয়া শরীরে ও ডান হাতে ঢালিত। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবাইয়া বাম হাতে এবং বাম পানিতে ডুবাইয়া ডান কুনুইতে এবং ডান হাত পানিতে ডুবাইয়া বাম কুনুইতে তারপর ডান হাত পানিতে ডুবাইয়া বাম পায়ে এবং বাম হাত পানিতে ডুবাইয়া ডান পায়ে পানি ঢালিত। তারপর গুপ্তস্থান ধৌত করিত, পা মাটিতে রাখিত না। অর্থাৎ এইরূপে সর্বশরীর ধৌত করিয়া সেই ব্যবহৃত পানি রোগীর পিছন দিক হইতে তাহার মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং সে আল্লাহ্‌র মর্জিতে সুস্থ হইয়া যাইত। উল্লেখযোগ্য যে, ইব্ন কাছীর আরববাসীদের যে অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনেও এইরূপই করা হইয়াছিল। যাহা হউক ইহার গূঢ় রহস্য বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেন– যদি শরীআত অনুযায়ী কোন লোক কোন প্রকার ইতস্তত করে তবে তাহাকে এই কথা বলা যায় যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ইহা ভাল

www.pathagar.com

জানেন, অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ইহার সত্যায়িত করা হইয়াছে। আর যদি কোন দার্শনিক ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয় প্রকাশ করে, তবে তাহাকে উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। কারণ, তাহাদের মতে কোন কোন ওষুধের মধ্যে মৌলিক ক্রিয়াশক্তি আছে এবং নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন, বিদ্যুৎ এবং চুম্বক লৌহ ইত্যাদি, এই সমস্তও এই জাতীয়। এখন কথা হইল যে, গুপ্তস্থান দ্বারা উদ্দেশ্য কি? কেহ বলেন– ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল লিঙ্গ। তবে ইহার ডান পার্শ্বে পানি ঢালা হইয়াছিল। কাযী ইয়ায (র) বলেন, ইজারের সহিত সংশ্লিষ্ট শরীরের অংশই ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য। অথবা ইজার পরিমিত শরীর ইহার উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহার উদ্দেশ্য হইল গুহ্যদ্বার। সলফে সালেহীনের মতে বদনজরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত লোককে পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখিয়া তাহা পানিতে ধৌত করিয়া পান করানো দুরস্ত। মুজাহিদ বলেন– কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে কুরআনের আয়াত লিখিযা এবং উহা ধৌত করিয়া পান করানো দুরস্ত। পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াত অথবা আয়াতে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্বলিত আয়াত লিখিয়া পান করানোই উত্তম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– এক মহিলা প্রসব বেদনায় অস্থির ছিল। তিনি পবিত্র কুরআনের ১টি বা দুইটি আয়াত বলিয়া বলিলেন, ইহা লিখিয়া ধৌত করিয়া সেই পানি পান করাইয়া দাও। ইতোপূর্বেও শায়খ ইমাম আবুল কাসিম কুশায়রীর ঘটনা আয়াতে শিফা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। আর তাহা দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

একটি ঘটনা

আবূ আবদুল্লাহ্ নাবাহী বলেন যে, একদা আমি উটে চড়িয়া সফর করিতেছিলাম। আমাদের কাফেলায় একটি লোকের বদনযর লাগিত। সে যখন কোন জিনিসের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিত, তখন সেই জিনিস নষ্ট হইয়া যাইত। কেহ কেহ আমাকে বলিল যে, এই লোকের অনিষ্ট হইতে আপনার উটটিকে আপনি বাঁচাইবার ব্যবস্থা করুন। তখন আমি বলিলাম, আমার উটের কোন অনিষ্ট করার শক্তি তাহার নাই। তারপর যখন সেই অশুভদৃষ্টি সম্পন্ন লোকটি আমার এই কথা শুনিল, তখন হইতে সে এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যে, আমি যখন এইদিক-সেইদিক কোথাও থাকিব, তখন সে আবার উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। একদিন যখন আমি কোথাও ছিলাম আমার আস্তানায় আসিয়া আমার উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। আর উটটি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। যেমন, সমূলে উৎপাটিত কোন বৃক্ষ ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। অতঃপর আমাকে খবর দেওয়া হইল যে, সেই বদনযর বিশিষ্ট লোকটি আপনার উটের প্রতি বদনযর লাগাইয়াছে। অতঃপর তিনি আসিয়া সেই লোকটিকে দেখিয়া এই দু'আটি পাঠ করিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ حَبْسَ حَابِسٍ وَشَجَرَ يَابِسٍ وَ سَهَابَ قَابِسٍ رُدَّتْ عَيْنُ الْعَائِنِ وَعَلى أَحَبِّ النَّاسِ اِلَيْهِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ـ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ـ

www.pathagar.com

আর সেই বদনযর বিশিষ্ট লোকের চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়া গেল এবং উটটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় ইব্‌ন কায়্যিম (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদনযরের অশুভ প্রতিক্রিয়া হইতে নিরাপদ থাকার জন্য এবং কোন উত্তম বস্তুকে অশুভ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের অনিষ্ট হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা যায় যাহাতে তাহার দৃষ্টি সেই বস্তু হইতে ফিরিয়া যায়। এই ধরনের বস্তু ব্যবহার করা বৈধ। যেমন আল্লামা বাগবী শরহে সুন্নাহয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) খুবই সুন্দর একটি বালককে দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালকের চিবুকে কাল ফোঁটা দিয়া দাও যাহাতে কোন বদ নযর তাহার অনিষ্ট করিতে না পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বালকের মুখে কাল ফোঁটা দেওয়ার অর্থ তাহার সৌন্দর্য বিকৃতি করা নয়। বরং ইহা এমন একটা গূঢ় রহস্য যে, ইহা দ্বারা বদনযরের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ইহাও এক প্রকার মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালামার ঘরে একটি বালিকাকে দেখিলেন যে, তাহার জিন্নের দৃষ্টি রহিয়াছে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যও এইরূপ যে, তিনি একটি বালিকাকে দেখিলেন যে, তাহার মুখমণ্ডল পিতবর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই বালিকার প্রতি জিন্নের দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাকে মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুঁক দাও না কেন ? ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের যেরূপ অশুভ দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া হয়, ঠিক জিন্নেরও তেমনি বদ নজরের প্রতিক্রিয়া হয়। কথিত আছে যে, জিন্নের দৃষ্টি মানুষের দৃষ্টির চাইতেও অধিকতর তীব্র হইয়া থাকে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হযরত উম্মে সালামার ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, একটি বালিকা তাহার মুখমণ্ডল পীতবর্ণ। উপস্থিত লোকজন নিবেদন করিল যে, হুযুর! এই বালিকাটির প্রতি কাহারও বদ নজর লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন, বদনযরের মন্ত্র পাঠ কর না কেন ? কথিত আছে যে, কোন শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষ না থাকিলেও উত্তম মনে হইলেই বদনযর লাগিয়া যায়। কোন কোন সজ্জন হইতেও স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার ভিত্তিতে ইহা হইয়া থাকে। যেমন, সাহল ইব্‌ন হুনায়ফের প্রতি আমির ইব্‌ন রাবিআর কুনযর লাগিয়াছিল। তবে যাহার বদনযর লাগে তাহার করণীয় হইল, যখন কোন জিনিস তাহার নিকট উত্তম মনে হইবে তখন সে যেন তাহার জন্য বরকতের দু'আ করে। ইহাই মন্ত্রবৎ কাজ করিবে। স্থানীয় শাসকের কর্তব্য হইল, যে ব্যক্তি বদনযরওয়ালা হিসাবে পরিচিত তাহাকে লোকজনের সহিত মিলা-মিশা করিতে না দেওয়া এবং তাহাকে ঘরের বাহিরে আসিতে বিরত রাখা। যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাহার জীবনযাত্রা পরিচালনা করার মত প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করা। কারণ, এই ব্যক্তি কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির চাইতেও মারাত্মক। যেহেতু হযরত উমর (রা) এই জাতীয় লোককে লোকালয়ে মিলামিশা করিতে দিতেন না এবং লোকজনের সহিত পানাহার করিতে এমন কি জামাআতে নামায পড়িতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইল, যদি কোন লোক বদনযরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় মারা যায়, তবে ইহার জন্য তাহার উপর দিয়াত বা মুক্তিপণ ওয়াজিব হইবে কিনা, এই ব্যাপারে আলিম সমাজে মতবিরোধ রহিয়াছে। ফিকাহ্ ও হাদীসের বিশিষ্ট আলিম আল্লামা কুরতুবী বলেন– যদি বদনযর

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার বদনযর দ্বারা কোন বস্তু ধ্বংস করিয়া দেয়, তবে ইহার জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর যদি কাহাকেও বদনযর দ্বারা হত্যা করিয়া দেয়, তবে তাহার উপর কিসাস প্রয়োগ করিতে হইবে— দিয়াত নয় বা মুক্তিপণ নয়। অবশ্য যদি এই ব্যক্তি দ্বারা পুনঃ এইরূপ কাজ হয়, তবে ইহা অভ্যস্ত কাজ হিসাবে গণ্য। তাহার বিধান জাদুকরের বিধানেরই মত। আল্লামা নববী বলিয়াছেন এবং তাহার ভাষ্য রাওযাতুল আহবারে উধৃত করা হইয়াছে যে, এই ব্যক্তির কিসাস বা দিয়াত কোন কিছুই প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই কাজ নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয় এবং ব্যাপকও নয়, বরং সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এই বিশেষণ পাওয়া যায় এবং কোন কোন সময় এই সমস্ত লোকের বদনযরও ক্রিয়াশীল হয় না। বরং ইহা একটা বিশেষণ সমতুল্য। আর যেহেতু কাহাকেও হত্যা বা কাহারও জীবন নাশ করার জন্য তাহার কাজ নির্ধারিত নয় এমনকি অনেক সময় তাহার ইচ্ছা ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। তবে এই ব্যাপারে হানাফী মযহাবের বিশিষ্ট ইমামগণের মতামত পাওয়া যায় নাই। যদি কাহারও জানা থাকে, তবে এখানে লিখিয়া দিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রকার দৈহিক রোগের জন্য দু'আ করিতেন। যেমন, জ্বর, কম্প, মৃগী, ব্যথা, ভয়-ভীতি, অনিদ্রা, বিষ, চিন্তাভাবনা, ব্যথা-বেদনা, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধার কষ্ট, ঋণ, জ্বলন, দাঁতব্যথা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, নাকসীর (নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া) প্রসব কষ্টসহ যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদের দু'আ ও তাবীযের কথা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। সেখানে এই সমস্ত অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ দৈহিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা প্রসঙ্গে বস্তুগত চিকিৎসার কথাও বর্ণিত আছে। তবে আমরা এখানে কেবল আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জাদু এবং উহার বিধান বর্ণনা করিয়াই এই আলোচনা শেষ করিতেছি। কেননা, ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে জাদু করিয়াছিল, এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পেশ করা হইয়াছে।

জাদুর কথা

আরবী ভাষায় জাদুকে বলা হয় سحر আর ইহা হারাম। সর্বসম্মতভাবে কবীরা গুনাহ্। জাদু নিজে শিক্ষা করাও যেমন হারাম, অপরকে শিক্ষা দেওয়াও তেমনি হারাম। এমনকি উহাতে কুফরীপূর্ণ কোন কথা বা কাজ যদি থাকে, তবে ইহা কুফর। আলিম সমাজের মতে নিজের উপর হইতে জাদুর ক্রিয়া দূর করার উদ্দেশ্যে জাদু শিক্ষা করা হারাম নয়। কোন জাদুকরের জাদুমন্ত্রে যদি কুফরীর কোন কথা বা কাজ না থাকে, তবে সে শাস্তির যোগ্য। আর যদি কুফরী থাকে, তবে সে হত্যাযোগ্য। এমনকি তাহার তাওবার ব্যাপারে আলিম সমাজে মতবিরোধ রহিয়াছে। যেমন, যিন্দীকের তাওবার ব্যাপারে মতবিরোধ বিদ্যমান। যিন্দীক বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে নবী, দীন, হাশর, কিয়ামত ইত্যাদি অস্বীকার করে।

জাদুর প্রকৃতিতেও মতবিরোধ বিদ্যমান। কেহ কেহ বলে প্রকৃতপক্ষে জাদু বলিতে কিছুই নাই, ইহা একটা মনের ধারণা মাত্র। অর্থাৎ যাহার উপর জাদু ক্রিয়াশীল, তাহার মধ্যে যে অবস্থার বিকাশ ঘটে, ইহা কেবল তাহার অন্তরের ধারণা বা খিয়াল মাত্র। বাস্তবে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা শাফিঈ মাযহাবের আবূ বকর আস্তরাবাদী এবং হানাফী মাযহাবের আবূ বকর

www.pathagar.com

রাযীসহ কিছু লোকের মত। কিন্তু আল্লামা নববী বলেন– বিশুদ্ধ মতে, জাদুর মৌলিকত্ব স্বীকৃত সত্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম সমাজের মতও ইহাই এবং পবিত্র কুরআন ও প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারাও ইহার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। তবে শায়খ ইব্ন হাজর আসকালানী বলেন, মতবিরোধের বিষয়টি হইল এই যে, জাদু দ্বারা প্রকৃত বস্তুসত্তার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। যে সমস্ত লোক ইহাকে শুধু ধারণা মাত্র বলিয়া থাকেন, তাহারা ইহার কোন প্রতিক্রিয়া আছে বলিয়াই স্বীকার করেন না, পরিবর্তন তো দূরের কথা। আর যাহারা ইহার বাস্তবতা স্বীকার করেন, তাহারা ইহার ক্রিয়ায় বিভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন, ইহা কি কোন বাস্তব ক্রিয়া, যেমন কোন বিশেষ রোগ-ব্যাধিতে মেযাজ বা রুচিবোধের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। না, ইহা একটা অবস্থায় পৌঁছিবার পর ইহার কোন ক্রিয়া-ক্ষমতা থাকে না। যেমন পাথর প্রাণী হইয়া গেল বা প্রাণী পাথর হইয়া গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম সমাজ প্রথম মতের পক্ষপাতী। তবে কেহ কেহ বলেন যে, জাদুর কোন অস্তিত্ব নাই। বাস্তবতা নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপেই বড়াই ও অলীক কথা। কারণ, কুরআন ও হাদীস দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণিত হয়। আর কোন কোন লোক বলেন– পবিত্র কুরআনে জাদুর যতটুকু প্রভাব স্বীকৃত ইহার অধিক কিছুই নাই। অর্থাৎ يفرقون بين المرء وزوجه। তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি ইহার চাইতে বেশী প্রভাব থাকিত, তবে অবশ্যই পবিত্র কুরআনে উহার আলোচনা করা হইত।

তবে বিবেক-বুদ্ধি ও বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এতটুকুই বুঝা যায় যে, যদি জাদুর প্রকৃতই কোন প্রভাব থাকিয়া থাকে, তবে ততটুকুই যতটুকু পবিত্র কুরআনে হারূত-মারূতের ঘটনায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার চাইতে অধিক প্রভাব যদি হয়ও, তবু ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ইহার আলোচনা অবান্তর। জাদু এক প্রকার কৃত্রিম রজ্জুর ন্যায়, যাহা বিভিন্ন কাজ ও উপাদানের দ্বারা চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তৈয়ার করা হয়। বাহ্যিক দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে ইহাকে অস্বাভাবিক কাজ বলিয়াই গণ্য করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুষ্ট প্রকৃতির ও পাপী লোকদের মাধ্যমে ইহা হইয়া থাকে। তবে শর্ত হইল এই যে, তাহার অপবিত্র হইতে হইবে। অবশ্য যদি অবৈধ উপায়ে অপবিত্র হইয়া থাকে, তবে তাহা অধিকতর কার্যকর হয়।

কথিত আছে যে, ফিরআওনের জাদুকরগণ যে সমস্ত রজ্জু ও লাঠিসোটা ব্যবহার করিয়াছিল এবং হযরত মূসা (আ) যে সবকে চলমান দেখিয়াছিলেন, তাহা জাদু ছিল না, বরং সেইগুলি ছিল খোক্লা কাষ্ঠ এবং রজ্জুগুলি ছিল চামড়ার শূন্য থলি। এই থলিগুলি পারদপূর্ণ ছিল এবং এইগুলির নীচে আগুন রাখা হইয়াছিল। অথবা রৌদ্রতাপে রাখা হইয়াছিল। অতএব, পারদ যখন গরম হইল, তখন সেই থলিগুলি স্পন্দন করিতে লাগিল। তবে এই কথাটি অদ্ভুত ও অভিনব। যেহেতু পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জাদুর আলোচনা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে মহা জাদুও বলা হইয়াছে। আর যাহারা এইগুলির চর্চা করে তাহাদিগকে জাদুকর বলা হইয়াছে। কাজেই ইহাকে শুধুমাত্র কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কিন্তু যদি কুরআনে ব্যবহৃত سحر (বা জাদু) শব্দটি দ্বারা উহার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হইবে। অথচ প্রকৃত জাদু অর্থের ব্যবহার হযরত মূসা (আ)-এর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি আভিধানিক অর্থে ব্যবহারের কথা বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তবে বলার কিছুই নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জাদু করিয়াছিল এবং উহার অশুভ প্রতিক্রিয়া তাঁহার পবিত্র দেহেও প্রকাশ পাইয়াছিল। যেমন, ইহার ফলেই তাঁহার মধ্যে ভ্রান্তি, কল্পনা এবং যৌনশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। আর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ষষ্ঠ হিজরীতে তাঁহার হুদায়বিয়া হইতে ফিরিবার পর যিলহাজ্জ মাসে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার দেহে এই জাদুর অশুভ প্রতিক্রিয়া সুদীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ৬ মাস, এক বর্ণনা অনুযায়ী দীর্ঘ এক বৎসর। হাফিয ইব্ন হাজর বলেন– এই বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। কারণ, এই জাদুর প্রবল প্রতিক্রিয়া ৪০ দিন পর্যন্তই ছিল কিন্তু ইহা অবশিষ্ট ছিল প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বহু দিন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাত্রিতে হযরত আইশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রাণ খুলিয়া দু'আ করিলেন। অবশেষে বলিলেন, হে আইশা! তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার দু'আ মঞ্জুর করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি তিনি আমাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন, দুই ফেরেশতা আসিয়া একজন আমার মাথার নিকট এবং অপরজন আমার পায়ের নিকট বসিল। তাহাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকের কি হইয়াছে? তাহার ব্যথা কি? অপরজন বলিল, এই ব্যক্তিকে জাদু করা হইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, কে তাহাকে জাদু করিয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়াহূদী লবীদ ইব্ন আসাম তাঁহাকে জাদু করিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, কি দ্বারা জাদু করিয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, মাথার চুল ও দাড়ি চিরুনি করার সময় যাহা পতিত হয়, তাহা দ্বারা। অধিকন্তু "দু'আয়ে শিগুফায়ে নখল" বা খেজুরের মুকুল ফোটার দু'আ নামক গ্রন্থে আছে, প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এইসব সে কোথায় রাখিয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে বলিল, দুযদানের কূপে এইগুলি সে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এক বর্ণনায় আছে যে, আযদান কূপে এইগুলি রাখিয়াছে। আর ইহাই বিশুদ্ধ। আলিমগণ বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন সাহাবীকে লইয়া সেই কূপের ধারে গমন করিলেন এবং বলিলেন যে, আমাকে এই কূপ দেখানো হইয়াছে। ইহার পানি ছিল লাল বর্ণের। দেখিতে মনে হইয়াছিল মেন্দি মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানকার খেজুর বৃক্ষগুলি মাথা যেন শয়তানের মাথার ন্যায়। তারপর সেই কূপ হইতে জাদুর বস্তুসমূহ উঠানো হইল। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, হযরত আইশা (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে নরাধম এই অপকীর্তির নায়ক তাহার নাম প্রকাশ করেন না কেন? তাহাকে জনগণের সামনে আনিয়া লাঞ্ছিত করেন না কেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কোন মানুষের অনিষ্টের কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে আমি ভালবাসি না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। অতএব, কোন উদ্দেশ্যে কাহার নিকট প্রকাশ করিয়া মন্দ বিস্তার করিব?

আল্লামা বায়হাকী তাঁহার দালায়েলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীস দুর্বল সূত্র দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোকেরা তাহাতে একটি ধনুকের তার পাইল, তাহাতে এগারটি গিরা ছিল। তখন সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস নাযিল হইল। এই দুইটি সূরার একটি একটি আয়াত পাঠ করা হইত আর একটি গিরা খুলিয়া যাইত। অপর এক

www.pathagar.com

বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) এবং হযরত আম্মার (রা)-কে পাঠাইলেন। তাঁহারা দুইজন সেখানে খেজুরের কুঁড়ি পাইলেন, যাহাতে এগারটি গিরা ছিল। ফতহুল বারীর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কূপে অবতরণ করিয়া তাহাতে কিছু খেজুরের কুঁড়ি পাইল, যাহাতে মোম দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকৃতি তৈয়ার করিয়া উহাতে অসংখ্য সূঁই বিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং এগারটি গিঁট বিশিষ্ট একটি ডোর দ্বারা তাহা বাঁধা ছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাসসহ আসিলেন। এই দুইটি সূরার একেকটি আয়াত পাঠ করা হইতেছিল এবং একটি করিয়া গিরা খুলিয়া একটি সূই খোলা হইতেছিল। অতঃপর যখন সমস্ত সূঁই খোলা হইল, তখন তাঁহার ব্যথার উপশম হইল। তিনি পরম শান্তি ও আরাম লাভ করিলেন। এই দুইটি সূরার আয়াত সংখ্যা এগার। প্রত্যেক আয়াত দ্বারা একটি গিরা খোলা হইতেছিল। কোন কোন সূফী-সাধক বলেন– এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া এই বিপদে পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। যখন ইহার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিল এবং তিনিও আল্লাহ্র ইবাদতে বিঘ্ন এবং দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যাহত হওয়ার আশংকাবোধ করিলেন, তখনই তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। অতএব, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার প্রতি ইংগিত করা হইল এবং তাঁহার রূহানী চিকিৎসার জন্যই এই দুইটি সূরা অবতীর্ণ হয়। আর দৈহিক চিকিৎসা ছিল এই যে, তিনি মস্তকে রক্তমোক্ষণ করিয়াছিলেন।

সিফরুস সাআদাতের গ্রন্থকার বলেন, যে হতভাগার দীন-ঈমানের নূরে তাহার অন্তর আলোকিত নয়, সেই কেবল এই জাতীয় চিকিৎসার সুফল অস্বীকার করিতে পারে। সুতরাং সে বলিতে পারে যে, রক্তমোক্ষণ দ্বারা দেহের কোন অনিষ্টকর অংশ শূন্য করা হয়। ইহার সঙ্গে জাদুর চিকিৎসার কি সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে ? ইহা দ্বারা জাদুর ক্রিয়াই বা দূর হইবে কিরূপে? ইহার জবাবে তিনি বলেন যে, যদি কোন কাফির চিকিৎসক যেমন, জালিয়ুনুস ও এ্যারিস্টটল বা অন্যরা ইহা বর্ণনা করিয়া এই চিকিৎসার পরামর্শ দিত, তবে সে তাহার পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিত। অর্থাৎ তখন সে বলিত যে, তাহারা যেহেতু এই বিধান দিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ এবং কোন গূঢ় রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ আল্লাহ্র নবী (সা) রক্তমোক্ষণের উপকারিতা এবং জাদুর প্রতিক্রিয়া দূরকরণে ইহার যৌক্তিকতাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেহেতু যাদুর প্রতিক্রিয়া মস্তক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ মস্তিষ্কেও আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং কোন কাজ না করিয়াও মনে করিতেন যে, তিনি ইহা করিয়াছেন। এই প্রতিক্রিয়া জাদুকরের প্রভাবেই তাঁহার স্বভাবে এবং রক্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এমনকি এই পদার্থ তাঁহার ভিতর মস্তকের অগ্রভাগেও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ফলে তাঁহার মূল স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কারণ, জাদু দুষ্ট আত্মা, জিন্ন-শয়তান এবং দুষ্ট প্রকৃতির মানবীয় শক্তির প্রভাব দ্বারা ঘটিত হয়। কাজেই ইহার প্রভাবও প্রতিফলিত হয় দেহ ও জীবাত্মায়। অতঃপর ইহার প্রভাব পরিপাক হইয়া অন্তরের তাপে শুষ্ক হইয়া তাহা হইতে একটি সূক্ষ্ম বাষ্প মস্তিষ্কের প্রতি ধাবিত হয় এবং ইহার ফলে মস্তিষ্ক শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে জাদুর স্বভাব ও প্রভাব তাহাতে ক্ষতি করিয়া থাকে এবং তাহাকে মূল স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, জাদুকৃত ব্যক্তি মস্তিষ্কের রক্তমোক্ষণের **যৌক্তিকতা অত্যন্ত তত্ত্বপূর্ণ এবং ইহা একটি উত্তম চিকিৎসা।**

www.pathagar.com

অবশ্য কোন কোন বিদআতী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান ও পবিত্র দেহে জাদু-টোনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কথা অস্বীকার করিয়া বলে যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চ ও মহান মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর এবং তাঁহার নুবুওয়াতের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদ্ভাবক। অতএব, এই জাতীয় বিষয় স্বীকার্য নহে। কারণ, ইহা তাঁহার প্রবর্তিত শরীআতের প্রতি নির্ভরশীলতার পরিপন্থী। যেহেতু ইহা স্বীকার করিলে এই সম্ভাবনার কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, হয়ত তিনি ধারণা করিয়াছেন জিবরাঈল (আ) আসিয়াছেন অথচ তিনি আসেন নাই এবং তিনি হয়ত ধারণা করিয়াছেন যে, ওহী আসিয়াছে অথচ ওহী আসে নাই। আর জাদুর প্রভাবেই তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। আর জাদুর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় অসম্পূর্ণ লোকদের উপর—পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে নহে।

বিদআতীদের এই সমস্ত যুক্তি-তর্ক সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের দাবী বিভিন্নভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে যে সমস্ত বিষয়ের প্রচার ও প্রসার করিতেন উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। বিভিন্ন উজ্জ্বল মু'জিযাই ইহার প্রমাণ। তবে যে সমস্ত বিষয় পার্থিব এবং নুবুওয়াতের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে সমস্ত বিষয় বা বস্তু প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন, বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সম্ভবতঃ এই সমস্ত বিষয়েই তাঁহার মধ্যে ধারণায় উলট-পালট হইত। কারণ, এইসব বিষয় নুবুওয়াতের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এইগুলি সংরক্ষণ পদ্ধতিরও আওতাভুক্ত নয়। কাজেই ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় না যে, তিনি কোন কাজ না করিয়াও করার ধারণা করিয়াছেন এবং স্থির বিশ্বাস করিয়াছেন অথচ এইরূপ হয় নাই। কারণ, রোগ-ব্যাধির কারণে অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত, তবে তাহা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইত না। কাজেই বিদআতীদের কোন যুক্তি-ই গ্রহণযোগ্য নয়। সারকথা এই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে হাদীস ও ইতিহাসে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই যে, কোন বিষয়ে তিনি বাস্তব বিরোধী কিছু বলিয়াছেন বা কোন কিছু করিয়াছেন যাহা বাস্তব পরিপন্থী।

এখন কথা রহিল যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদাহানিকরের কথা, মূলতঃ এইরূপ নহে। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বাস্থ্যের বিকাশ নুবুওয়াতের একটি প্রমাণ এবং রিসালতের সত্যতার নিদর্শন। এই জন্যই কাফিরগণ তাঁহাকে জাদুকর বলিত। এই কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জাদুকরের মধ্যে জাদুর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এই গূঢ় রহস্যের জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে জাদুর অশুভ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হইয়াছিল।

তাহাদের বক্তব্য যে, জাদুর অশুভ প্রতিক্রিয়া অপূর্ণ মানবদেহেই প্রতিফলিত হয়- ইহা কোন সাধারণ নিয়ম নয়। কোন গূঢ় রহস্যের বিকাশ করণার্থে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে জাদুর প্রতিক্রিয়া বিকাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। এই সম্বন্ধে বহু বিস্তর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

জানিয়া রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেওয়া চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং দু'আ-তাবীয অগণিত। এই অধমের পক্ষে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য সূচনাতেই মোটামুটি রোগের বর্ণনা দেওয়া হইল। তবে কল্যাণকামী মানবহৃদয় ইহা দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না। কাজেই যে সমস্ত রোগ ব্যাধি প্রায় সব সময়ই হইয়া থাকে বরকত লাভের আশায় তাহা হইতে কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

www.pathagar.com

বদনযর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধির দু'আ

ইহার মধ্যে বদনযরের দু'আটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং বদনযরের দু'আও অনেক। তবে এই সমস্ত দু'আর মধ্যে বদনযর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধির জন্য সূরায়ে ফাতিহা, সূরায়ে ফালাক ও নাস, আয়াতুল কুরসী এবং নিম্ন দু'আটি সর্বোত্তম।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقْمًا ـ

'হে বিশ্ব মানবের প্রতিপালক! এই বিপদ দূর করিয়া দাও এবং রোগে আরোগ্য দাও। তুমিই যে মহান আরোগ্যদাতা, তুমি ছাড়া রোগারোগ্যের কোন উপায় নাই। তোমার আরোগ্যদানের বাহিরে কোন রোগ-ব্যাধি নাই।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, সকল ব্যথা-বেদনায় সাধারণতঃ এই দু'আ পড়িতেন।

ইহার মধ্যে একটি দু'আ হইল এই ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنِ ـ

'আমি মহান আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ বাণী দ্বারা তাঁহার উষ্মা ও শাস্তি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের অনিষ্টকারিতা হইতে এবং শয়তানের আক্রমণ হইতে।'

অপর একটি দু'আ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْاِثْمَ وَالْعَزْمَ اَللّٰهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ـ

অপর একটি দু'আ ঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَىْءٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ وَ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ لاَ اُطِيْقُ شَرَّهٗ وَمِنْ كُلِّ ذِىْ شَرِّ لِىْ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অন্য একটি দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ ـ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

www.pathagar.com

قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْشَرِ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ـ

আরও একটি দু'আ ঃ

تَحَصَّنْتُ بِالَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلٰهِيْ وَ اِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِهٖ وَهُوَ رَبِّيْ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّزَّاقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ حَسْبِيَ الَّذِيْ هُوَ حَسْبِيْ حَسْبِيَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِخَيْرٍ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مَرْمِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

এইসব দু'আর মধ্যে একটি জিবরাঈল (আ)-এর দু'আ। ইহা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠ করিয়াছিলেন এবং সহীহ্ মুসলিমে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ رُقْيَةَ وَجْعِ جَسَدٍ ـ

সহীহ্ মুসলিমে হযরত উসমান ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দেহের ব্যথার অভিযোগ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শরীরের ব্যথার অংশ হাতে ধরিয়া এই দু'আ পাঠ করিয়া ফুঁক দাও– তিনবার بِسْمِ اللّٰهِ এবং সাতবার اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

ভয়-ভীতি ও অনিদ্রার দু'আ

একদা হযরত খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ভয়-ভীতি এবং অনিদ্রার কথা জানাইয়া বলিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সারা রাত্রি আমার ঘুম হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শয্যা গ্রহণের সময় এই দু'আ পাঠ কর।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يُفْرِطَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْ يَنْبَغِيْ عَلٰى عِزِّ جَائِكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশার দু'আ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশায় এই দু'আ পাঠ করিতে বলিয়াছেন–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

আবূ দাঊদ হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিপদে এই দু'আ পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ اَصْلِحْ شَانِىْ كُلَّه لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

মুসনাদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, এই দু'আ কেহ পাঠ করিলে তাহার কোন চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট হইবে না। আর বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া তাহাকে আনন্দ ও প্রশস্ততা দান করিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ مَا ضِيْقَ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِى قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنَوِّرْ صَدْرِىْ وَحُزْنِىْ وَذِهَابَ هَمِّىْ ـ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সদা সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করিতে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া তাহাকে সুখ ও আনন্দ দান করেন, তাহার অভাব-অনটন দূর করিয়া দেন এবং সে এমনভাবে জীবিকা লাভ করে যাহার সম্পর্কে সে ধারণাও করিতে পারে না।

لا حول ولا قوة -এর আমল

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনায় অস্থির তাহার পক্ষে لا حول ولا قوة বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেও এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা জান্নাতের একটি ভাণ্ডার। তিরমিযীতে আছে যে, ইহা জান্নাতের একটি দরজা। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, لا حول ولا قوة পাঠ করিলে প্রত্যেকবার একজন ফেরেশতা সুস্থতা লইয়া আসেন। আর বিশিষ্ট মনীষিগণ বলেন যে, এই আমলের চাইতে অধিকতর সাহায্যকারী কোন আমল আর নাই।

www.pathagar.com

اية الكرسى وخواتيم سورة بقرة -এর আমল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও সংকটের সময় আয়াতুল কুরসী ও সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বিপদ ও সংকট দূর করিয়া দিবেন।

جامع বা ব্যাপক দু'আ

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আমি অবশ্যই এমন একটি কালেমার কথা জানি, যাহা কোন বিপদগ্রস্ত লোক পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা এই কালেমার কল্যাণে তাহাকে বিপদমুক্ত করিয়া দেন। ইহা আমার ভাই হযরত ইউনুস (আ)-এর কালেমা। তিনি গভীর অন্ধকারে থাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে, কোন মু'মিন বান্দা যখন কোন প্রয়োজনে এই দু'আ পাঠ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই দু'আ কবূল করেন। অপর এক বর্ণনায় এই নিম্নের দু'আর কথা বলা হইয়াছে ঃ

اَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَ اَسْئَلُكَ دَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ
وَاَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

দারিদ্র্য মোচনের দু'আ

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়া আমার প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, صلوة ملائكة বা ফেরেশতাদের দু'আ এবং تسبيح خلائق বা সৃষ্ট জীবের তাসবীহ পাঠ কর না কেন? ইহার কল্যাণেই তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান করা হয়। তারপর বলিলেন, ফজর উদয়ের সময় একশত বার পাঠ করিবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُهُ

দেখিবে যে, দুনিয়া তোমার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া আসিবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে আর আসিল না। তারপর একদিন আসিল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়া আমার কাছে এতই প্রাচুর্যের সহিত আসিয়াছে যে, এখন কোথায় স্থান দিব, তাহা তালাশ করিয়া পাই না। গাবরুবিয়া তরীকায় এই দু'আ ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যে পাঠ করা হয় এবং ইহার সঙ্গে যদি একবার لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ পাঠ করা যায়, যেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তবে ইহা জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফের উপায় হইবে। আর ইহা জীবিকা প্রশস্তেরও উপকরণ। কারণ, استغفار গুনাহ্ মাফের কারণ। যেহেতু গুনাহ ও পাপাচার জীবিকার অনটন ও সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের কারণ। যেমন পূর্বেই ইহার আলোচনা হইয়াছে।

www.pathagar.com

কিমিয়ায়ে মাশায়েখ

এই ব্যাপারে একটি ওযীফা আছে। ইহাকে কিমিয়ায়ে মাশায়েখ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং পরীক্ষিত দু'আ। ইহার পদ্ধতি এই ঃ জুমুআর নামাযের সালাম ফিরাইবার পর তাশাহহুদে যে অবস্থায় পা থাকে তাহা পরিবর্তন না করিয়া সাতবার সূরায়ে ফাতিহা, সাতবার কুলহু আল্লাহ্, সাতবার সূরায়ে ফালাক এবং সাতবার সূরায়ে নাস পাঠ করিবে। ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। মাশায়েখে কিরাম ইহার পর হাদীসে বর্ণিত এই দু'আ সাতবার পাঠ করিয়া থাকেন।

اَللّٰهُمَّ يَاغَنِىُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ ـ

অগ্নি নির্বাণের দু'আ

তাবারানী ও ইব্ন আসাকিরে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা যখন কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দেখ, তখন তাকবীর ধ্বনি কর! অর্থাৎ আযান দাও। যেহেতু অগ্নি শয়তান সৃষ্টির মূল উপকরণ। ইহা দ্বারাই শয়তানের সৃষ্টি এবং ইহা দ্বারা সাধারণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। কারণ, ইহার সহিত শয়তানের ক্রিয়াকাণ্ডের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর অগ্নির মূল প্রকৃতিতেও বিপর্যয়ের কামনা বিদ্যমান। শয়তানও এই বিপর্যয়েরই দাবী করিয়াছিল এবং তাহার বাসনা ছিল মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করা। কাজেই শয়তান ও অগ্নি উভয়ই দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী। তবে মহান আল্লাহ্র মহত্ত্বের সম্মুখে সকল বস্তুই অতি তুচ্ছ। অতএব, যখন কোন মুসলমান তাকবীর ধ্বনি করে, তখন মহান আল্লাহ্ অগ্নি নির্বাপণ করিয়া দেন। ইহা একটি পরীক্ষিত আমল।

মৃগী রোগের দু'আ

মৃগী রোগ দুই প্রকার। এক প্রকার মৃগী রোগ পাপাত্মার হস্তক্ষেপের দরুন সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার মৃগী রোগের কারণ হইল মানবদেহের দূষিত পদার্থ। এই দ্বিতীয় প্রকার মৃগী রোগই চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পাপাত্মার হস্তক্ষেপজনিত মৃগী রোগের চিকিৎসা একমাত্র দু'আ দ্বারাই হইয়া থাকে। আর ইহা যেন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা। কাজেই যোদ্ধার হাতিয়ার হওয়া চাই উত্তম এবং দেহের শক্তি চাই প্রচুর। অতএব, কোন কোন চিকিৎসক এতটুকু বলিয়াই চিকিৎসা করিয়া থাকেন– اُخْرُجْ مِنْهُ 'এই দেহ হইতে বাহির হইয়া যাও'। তিনি بسم الله -ও বলেন না, لا حول -বলেন না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু এই বলিতেন– اُخْرُجْ عَدُوَّا اللّٰهِ انا رسول اللّٰه

কোন কোন চিকিৎসক اية الكرسى। পাঠ করিয়া চিকিৎসা করেন এবং রোগীকেও বেশী বেশী اية الكرسى এবং সূরায়ে নাস ও ফালাফ পড়িতে বলেন। আবার কেহ কেহ পাঠ করেন– محمد رسول اللّٰه والذين معه اشداء على الكفار অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কসম দু'আও একটি পরীক্ষিত আমল।

www.pathagar.com

মাথা ব্যথার দু'আ

হামিদী 'তিব' গ্রন্থে ইউনুস ইব্ন ইয়া'কুব আবদুল্লাহ্ হইতে মাথা ব্যথার দু'আ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা ব্যথায় এই দু'আ পাঠ করিতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ۔

দাঁত ব্যথার দু'আ

বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দাঁত ব্যথার অভিযোগ করিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার হস্ত মুবারক ব্যথাগ্রস্ত দাঁতে রাখিয়া সাতবার বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اذْهِبْ عَنْهُ مَا يَجِدُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الْمَكِيْنِ الْمُبَارَكِ عِنْدَكَ ۔

তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক উঠাইবার পূর্বেই তাহার ব্যথার উপশম হইল। হুমায়দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত ফাতিমাতুয যাহ্রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া তাঁহার দাঁত ব্যথার অভিযোগ পেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি ব্যথাগ্রস্ত দাঁতে স্থাপন করিয়া পাঠ করিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَسْئَلُكَ بِعِزِّكَ وَجَلَالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيْسٰى مِنْ رُّوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ اَنْ تَكْشِفَ مَا تَلْقِىْ فَاطِمَةَ بِنْتَ خَدِيْجَةَ مِنَ الضَّرِّمَكَةِ ۔

আর তখনই হযরত ফাতিমা (রা)-এর ব্যথার উপশম হইয়া গেল।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় সুবিখ্যাত ইমাম খলীল মক্কী সম্পর্কে একটি কথা খুবই খ্যাত বলিয়া বর্ণিত আছে এবং আমিও বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কোন লোকের দাঁতে যখন ব্যথা হইত, তখন তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার মাতা-পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কত দিনের জন্য ব্যথা বন্ধ করিতে চায়। অর্থাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কয় বৎসরের জন্য ব্যথা বন্ধ করিতে চাও। তখন সেই ব্যক্তি ৫ বা ৭ অথবা ৯ বৎসরের কথা বলিত। তখন তিনি তাহার মাথা হইতে হাত উঠাইতে না উঠাইতেই তাহার দাঁতের ব্যথার উপশম হইয়া যাইত। আর উল্লিখিত সময় পর্যন্ত দাঁতে ব্যথা হইত না। এই কথা তাঁহার সম্পর্কে খুবই প্রসিদ্ধ। তবে কোন বিশেষ দু'আর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই বুঝা যায় এই সমস্ত দোয়া মাছূরা বা তাঁহার বিশেষ তাওয়াজ্জুহ বা মনোনিবেশের ফলেই এইরূপ হইত।

মাওয়াহিবের গ্রন্থকার বলেন, একটি পরীক্ষিত দু'আ এই ঃ ব্যথার দিকের গণ্ডদেশে হাতে লিখিবে بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذى اَنْشَاَكُمْ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون অথবা লিখিবে– وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

পেশাব বন্ধ বা পাথরী রোগের দু'আ

নাসাঈ আবুদ দারদা' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল যে, তাহার পিতার পেশাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনি পাথরী রোগে আক্রান্ত। তখন আবুদ দারদা' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যে দু'আ শুনিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিলেন–

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الْمُتَطَيِّبِيْنَ اَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرِئُ -

এবং তাহাকে এই দু'আ পড়িতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করিয়া সুস্থ হইয়া গেল। এই দু'আ আবূ দাউদেও সর্বরোগের চিকিৎসা হিসাবে বর্ণিত আছে।

জ্বরের দু'আ

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি জ্বরে আক্রান্ত এবং তিনি জ্বরে গালি-গালাজ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জ্বরকে গালি দিও না। জ্বরতো আল্লাহ্র নির্দেশের অনুগত। তবে তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিতে পারি। তুমি যখন তাহা পাঠ করিবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমা হইতে তাহা দূর করিয়া দিবেন। হযরত আইশা (রা) বলিলেন, আমাকে শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, পাঠ কর–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِيِ الرَّقِيْقَ وَعَظْمِيَ الدَّقِيْقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ فَلاَ تَصْدَعِي الرَّأْسَ وَلاَ تُنْتِنِي الْفَمَّ وَلاَ تَأْكُلِى اللَّحْمَ وَلاَ تَشْرَبِيْ الدَّمَ وَتَحَوَّلِيَ عَنِّى اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَهُ -

হযরত আইশা (রা) বলেন যে, আমি এই কালেমাগুলি পাঠ করা মাত্রই আমার জ্বর চলিয়া গেল।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেন যে, ইহা খুবই পরীক্ষিত দু'আ। আমার শায়খের হাতের লেখা এই দু'আটি দেখিয়াছি।

উহার ভাষা এই ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَظْمِيَ الدَّقِيْقَ وَجِلْدِيْ الرَّقِيْقَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فَوْرَةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخرِ فَلاَ تَأْكُلِى اللَّحْمَ وَلاَ تَشْرَبِيْ الدَّمَ وَلاَ تَفُوْرِي عِلْمَ الْغَمِّ وَانْقَلِى اِلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

www.pathagar.com

সাহিবুল হুদা বলেন যে, পালা জ্বরে তিনটি পাতলা কাগজে লিখিবে بِسْمِ اللّٰهِ فَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ مَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ قَلَّتْ এবং প্রত্যেকদিন একেকটি কাগজ পানিতে গিলিয়া খাইবে। 'কিরান' গ্রন্থে রহিয়াছে যে, রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তিগণ এইরূপ করিতেন। তদুপরি মাদখালে ইবনুল হাজ্জ হইতে বর্ণিত আছে যে, শায়খ আবূ মুহাম্মদ মারজানী সর্বদা জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধির উদ্দেশ্যে কাগজের টুকরায় নিম্ন দু'আটি লিখিয়া অলিন্দে রাখিয়া দিতেন। অতএব, তাঁহার নিকট যখনই জ্বর বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত কোন লোক আসিত, তখন তিনি অলিন্দ হইতে খাওয়াইয়া দিতেন। আর আল্লাহ্‌র হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করিত। দু'আটি লিখিতেন ঃ

اَزَلِيٌّ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يُزِيْلُ الزَّوَالَ وَهُوَ لَا يَزَالُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

খুজলি ও পাঁচড়ার দু'আ

যাদুল মাআদের গ্রন্থকার বলেন– খুজলি-পাঁচড়া হইলে শরীরে লেখিবে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا ـ

ইহা খুবই পরীক্ষিত।

প্রসব কষ্ট দূর করার দু'আ

প্রসব কষ্ট দূর করার জন্য অনেক দু'আই রহিয়াছে। তবে একটি পরীক্ষিত দু'আ এই, যাহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখিয়াছি যে, কোন মহিলার যখন সন্তান প্রসবে কষ্ট হইত, তখন তিনি কোন সাদা পিয়ালা বা কোন পবিত্র বস্তুতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি লিখিয়া দিতেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ـ

খাল্লাল বলেন, আমাকে আবূ বকর মারূযী বলিয়াছেন যে, একদিন আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! এক মহিলা সন্তান প্রসবে দুই দিন পর্যন্ত খুবই কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার জন্য কিছু লিখিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তাহাকে বল, একটি বড় বাটি এবং জাফরান লইয়া আসুক। মাদখানে আছে, তিনি পিয়ালায় লিখিলেন ঃ

www.pathagar.com

أُخْرُجْ اَيُّهَا الْوَلَدُ مِنْ بَطْنٍ ضَيِّقٍ اِلٰى سِعَةِ هٰذِهِ الدُّنْيَا اُخْرُجْ بِقُدْرَتِ الَّذِىْ جَعَلَكَ فِى قَرَارٍ مَكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَعْلُوْمٍ ـ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَ الخ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

এবং এই বাটি ধৌত করিয়া প্রসূতিকে কিছু পানি পান করাইতে এবং কিছু তাহার মুখে ছিটাইয়া দিতে বলিলেন। খাল্লাল বলেন, আমি তাহাকে অনেকের জন্যই ইহা লিখিতে দেখিয়াছি।

শায়খ মারজানী বলেন, আমি কয়েকজন বুযুর্গকে এই দু'আ লেখিতে দেখিয়াছি এবং আমিও যাহাকে এই দু'আ লিখিয়া দিয়াছি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সন্তান প্রসবের কষ্ট হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– হযরত ঈসা (আ)- এক মহিলার নিকট দিয়া পথ চলিতেছিলেন– তাহার গর্ভের সন্তান মারা গিয়াছিল। সেই মহিলা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট নিবেদন করিল যে, ইয়া কালেমাতুল্লাহ্! আমার জন্য দু'আ করুন যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দেন। তখন হযরত ঈসা (আ) দু'আ করিলেন ঃ

يَا خَالِقَ النَّفْسِ وَ يَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا ـ

অতএব, সেই সময়ই তাহার মরা সন্তান প্রসব হইল এবং সে বিপদমুক্ত হইল। শায়খ মারজানী বলেন– যদি কোন মহিলা প্রসব কষ্টে থাকে, তবে তাহার জন্য ইহা লিখিয়া দিবে।

নাকসীরের (নাক দিয়া রক্ত বাহির হওয়ার) দু'আ

নাকসীরের জন্য অনেক দু'আ আছে। তবে পরীক্ষিত একটি দু'আ হইল এই যে, নাকসীরের রোগীর ললাটে লিখিয়া দিবে–

وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِى مَائَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِىَ وَ غِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الاَمْرُ ـ

অজ্ঞ লোকেরা রোগীর নাকের রক্ত দ্বারাই এই দু'আ লিখিয়া থাকে। ইহা জাইয নহে। কারণ, রক্ত অপবিত্র এবং কোন অপবিত্র বস্তু দ্বারা আল্লাহ্র কালাম লিখা বৈধ নহে।

সকল ব্যথা-বেদনা ও বিপদাপদের দু'আ

হযরত আবান ইব্ন উসমান (রা) বলেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে কেহ সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

www.pathagar.com

—সকাল পর্যন্ত সর্ব প্রকার অতর্কিত বালা-মুসীবত হইতে সে নিরাপদে থাকিবে। আর সকাল বেলায় যে কেহ ইহা তিনবার পাঠ করিবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সকল অতর্কিত বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদ থাকিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবান ইব্ন উসমান (রা) অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপরোক্ত হাদীস শুনিয়াছিল, সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া অস্বীকার করিবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করিতে লাগিল। আবান জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দিকে তাকাইয়া কি চিন্তা করিতেছ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার পিতা উসমান-এর প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করি নাই এবং আমার পিতা উসমানও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন নাই। কিন্তু যেদিন আমি অর্ধাঙ্গে আক্রান্ত হই সেইদিন আমি নাফরমানী করিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমি এই দু'আ পড়িতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই হাদীসটি আবূ দাউদ ও তিরমিযীও বর্ণনা করিয়া ইহাকে উত্তম বিশুদ্ধ হাদীস বলিয়াছেন।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -এর যিকির

যে দু'আ দ্বারা সত্তরটি বালা-মুসীবত হইতে নিরাপত্তা পাওয়া যায়, তাহা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশবার পাঠ করিবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ তাহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং সে হইবে সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ। তদুপরি সে দুনিয়ার সত্তর প্রকার বালা-মুসীবত যথা, উন্মাদ, বসন্ত, কুষ্ঠ, বায়ু ইত্যাদি রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিবে। তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ বেশী বেশী পাঠ কর। যেহেতু ইহাই বেহেশতের ভাণ্ডার। হযরত মাকহুল বলেন— যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ পাঠ করিবে তাহার জন্য অনিষ্টের সাতটি দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং এই সাতটির মধ্যে অভাব-অনটন দূর হওয়া অন্যতম।

তাবারানী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করিবে, ইহা তাহার জন্য ৯৯টি রোগের চিকিৎসা হইয়া যাইবে। এই সমস্ত রোগের মধ্যে দুঃখ-বেদনা দূর হওয়া হইল নিম্নতম। হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ দৈনিক একশত বার পাঠ করিবে, সে কখনও অভাবগ্রস্ত হইবে না। তদুপরি আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির জীবিকার কষ্ট হয় তাহার উচিত বেশী বেশী لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ-এর যিকির করা।

ইমাম জাফর সাদিক ইব্ন মুহাম্মদ বাকের (রা) সূত্রে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক দিবারাত্রিতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ পাঠ করিবে, সে দারিদ্র্য, ভুল-ভ্রান্তি এবং কবরের অশান্তি হইতে নিরাপদে থাকিবে। তাহার প্রশস্ত জীবিকার দ্বার খুলিয়া যাইবে। তদুপরি জান্নাতের দ্বারও তাহার জন্য খুলিয়া যাইবে। এই বর্ণনার কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, যদি এই দু'আ লাভ করার উদ্দেশ্যে সুদূর চীন ও খাতান ভ্রমণ করারও প্রয়োজন তবু ইহা নগণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আবদুল হক তিবেব নুবুবী গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

খাওয়ার সময়ের দু'আ

ইমাম বুখারী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) করিয়াছেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার সামগ্রী সামনে আসার পর পাঠ করিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْهِ رَحْمَةً وَّشِفَاءً -

কোন কিছুতেই তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।

উম্মুস্ সিবয়ানের দু'আ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত বলিবে। তাহা হইলে শিশুর উম্মু সিবয়ান রোগ হইবে না। উন্দুলুসী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবদুল হকও তিবেব নুবুবী গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। উম্মুস সিবিয়ান এক প্রকার বায়ু রোগ। সাধারণতঃ শিশুগণই এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় বায়ু ঊর্ধ্ব দিকে উঠিয়া মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয় ফেলে। ফলে শিশু খেঁচিতে থাকে।

কানে আযান ও ইকামত দেওয়ার তাৎপর্য এই– যাহাতে শিশুর কানে সর্ব প্রথম কালেমায়ে শাহাদত এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের ধ্বনি পতিত হয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় পদার্পণের লগ্নেই যেন তাহাকে ইসলামের রীতিনীতির শিক্ষা দেওয়া হইল। যেমন, মৃত্যুর সময় কালেমায়ে তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তদুপরি আযানের ধ্বনিতে শয়তান পলায়ন করে।

হাফীযে রমযানের দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الاذَنَ بِاللّٰهِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ بِاللّٰهِ مُحِيْطٌ بِهِ عِلْمُكَ لَيَعْلَمُوْنَ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ الخ -

মাওয়াহিবের গ্রন্থকার বলেন যে, আমাদের শায়খ বলিয়াছেন, এই দু'আটি ইয়ামানের বিভিন্ন শহর, মক্কা, মিসর ও আফ্রিকার্য় শহরগুলিতে খুবই প্রসিদ্ধ। ইহাকে হাফীযের রমাযান বলা হয়। ইহার প্রভাব সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহা নৌকাডুবি, অগ্নিকাণ্ড, চুরি ইত্যাদি বিপদ দূর করিয়া থাকে। ইহা রমযান মাসের শেষ শুক্রবার দিন লিখা হয়। তবে জুমুআর দিন খতীব যখন মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুত্‌বা দেন, তখন সাধারণ মানুষ ইহা লিখে। আবার কেহ কেহ আসরের নামাযের পরও লিখে। তবে তিনি বলেন যে, ইহা বিদআত। ইহার কোন মূল ভিত্তি নাই। অবশ্য অনেক বিশিষ্ট বুযুর্গের কথায়ই ইহার আলোচনা পাওয়া যায়। এমনকি কোন কোন বুযুর্গ নিয়মিত ইহার আমল করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইহা একটি দুর্বল হাদীস। ইব্‌ন হাজর এই হাদীসকে অত্যন্ত মুনকার বলিয়াছেন। বিশেষতঃ জুমুআর নামাযের খুত্‌বা দেওয়ার সময় যদি তিনি কাহাকেও লিখিতে দেখিতেন তখন বলিতেন, قَبَّحَكَ اللّٰهُ مَا هٰذِهِ الْبِدْعَةُ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমার **মুখমণ্ডল কুশ্রী করুন। ইহা কেমন বিদআত!**

www.pathagar.com

ঔষধ দ্বারা নবী করীম (সা)-এর চিকিৎসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ঔষধ দ্বারাও অনেক সময় বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করিতেন। তবে এই কথা সুস্পষ্ট যে, এই চিকিৎসাবিদ্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকেও চিকিৎসা করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করার কারণ হইল এই যে, তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোচ্চ মানুষ। যেমন, মধু দ্বারা দাস্ত বা পেটের পীড়ায় চিকিৎসার কথা বর্ণিত আছে এবং এ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনাও রহিয়াছে। নিম্নে আমরা তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম।

বুখারী ও মুসলিম উভয়েই হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, আমার ভাই পেটের পীড়ায় ভুগিতেছে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তাহার পেট নামিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে মধু খাওয়াইয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। অতএব, তাহাকে মধু খাওয়ান হইল। ফলে তাহার দাস্ত আরও বৃদ্ধি পাইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলিয়াছেন। তবে তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলিতেছে। মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, তৃতীয় বারও তাহাকে মধু খাওয়াইতেই নির্দেশ দিলেন। সে চতুর্থবার আসিল। এইবারও তাহাকে এই একই কথা বলিলেন যে, তাহাকে মধু খাওয়াও। তাহার দাস্ত আরও বাড়িয়া গেল। ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে যে, তাহাকে চতুর্থবারও মধু খাওয়াইতেই নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাহাকে মধু খাওয়ানো হইলে এইবার সে ভাল হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কথা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলিয়াছে। হিজাযবাসিগণ মিথ্যাকে ভুল অর্থেও ব্যবহার করিতেন। যেমন كَذَبَ سَمْعُكَ তোমার কান মিথ্যা শুনিয়াছে অর্থাৎ ভুল শুনিয়াছে। আর পেট মিথ্যা বলিয়াছে ইহার অর্থ এই নহে যে, তোমার পেট আরোগ্য লাভের উপযোগী নয়। বরং এ ব্যাপারে উহা হইতে ভূল হইতেছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে জানিয়াছিলেন যে, মধু দ্বারাই তাহার রোগের উপশম হইবে। সুতরাং যখন তাৎক্ষণিক উপকার পাওয়া যায় নাই তখন ইহাকেই মিথ্যারূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

কোন কোন মুলহিদ এখানে প্রশ্ন উঠাইয়াছে যে, মধু মূলতঃ বিরেচক ঔষধ। কাজেই অতীসারে আক্রান্ত রোগীর জন্য এইরূপ বিরেচক ঔষধ নির্বাচন করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ? ইহার জবাবে বলা যায় যে, এইরূপ প্রশ্ন করা প্রশ্নকারীর অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের যথার্থতা প্রমাণকারী بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِ (বরং তাহারা সেই সম্পর্কেও মিথ্যা অভিযোগ করে, যে সম্পর্কে তাহাদের মোটেই কোন জ্ঞান নাই। (সূরা ইউনুস ঃ ৩৯)।

কারণ, চিকিৎসাবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, একটি রোগের চিকিৎসা বয়সের তারতম্য, স্বভাবের বিচিত্রতা, সময়, খাদ্য, তদবীর এবং প্রকৃতিগত শক্তির বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অতীসার কোন সময় অপসন্দনীয় আহার্য আহারের ফলে হয় **যাহাতে বদহজমী সৃষ্টি করে। এইরূপ অতীসারে চিকিৎসকদের ঐকমত্য যে, বদহজমীর প্রভাব**

www.pathagar.com

দূর করিয়াই ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। কাজেই যদি জুল্লাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তাহা দ্বারাই ইহার চিকিৎসা করা হয়– যতক্ষণ রোগীর শক্তি-সামর্থ্য থাকে। অতএব, মনে করিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি বদহজমীর দরুন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ছিল। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পেটে জমা বদহজমীর উপকরণসমূহ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই মধুর ন্যায় বিরেচক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা বিধান করিয়াছিলেন। আর ইহা দ্বারা তাহার পাকস্থলী হইতে শ্লেষ্মা জাতীয় উপকরণ বাহির করিয়া উহাকে আহার্য বস্তু পরিপাক করার উপযোগী করাই ছিল এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কারণ, পাকস্থলীতে সূক্ষ্ম ক্ষত এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র রহিয়াছে। যখন পাকস্থলীতে চটচটে কাল পদার্থ লাগিয়া যায়, তখন ইহা দ্বারা পাকস্থলী দূষিত হইয়া যায় এবং উহাতে যে খাদ্যই থাকে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। কাজেই এই রোগীর জন্য এমন ঔষধ ব্যবহার করা জরুরী যাহাতে তাহার পাকস্থলী পাক-সাফ হইয়া যায়। অতএব, এই গুণাগুণের বিচারে মধুই সবচাইতে উপকারী ঔষধ। বিশেষতঃ মধুর সঙ্গে যখন গরম পানি মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাকে বারবার মধু পান করানোর তাৎপর্য এই ঃ রোগের তীব্রতা অনুযায়ী ঔষধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কারণ, রোগের তীব্রতা অনুযায়ী পরিমিত ঔষধ না হইলে পূর্ণরূপে রোগ নিবারণ সম্ভবপর নয়। অনুরূপ ঔষধের মাত্রা অধিক হইলে রোগীর শক্তি নষ্ট করিবে এবং রোগ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাহার মধ্যে অন্যান্য উপসর্গের সূচনা হইবে। কাজেই বুঝা গেল যে, রোগের তীব্রতা অনুযায়ী রোগীকে মধু খাওয়ান হয় নাই এবং এই জন্যই তাহাকে বারবার মধু খাওয়াতেই নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন রোগের তীব্রতা অনুযায়ী ঔষধ দেওয়া হইল, তখন সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিলেন, صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ আল্লাহ্ সত্যই বলিয়াছেন আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন যে, মধু অতি দ্রুতগতিতে শিরা-উপশিরায় পৌঁছিয়া উহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া দেয় এবং প্রস্রাব পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি হয়। আর কখনও ইহাতে পাকস্থলীতে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সর্বপ্রকার জঞ্জাল বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য অতীসারের সূচনা করে। কাজেই অতীসারে মধু দ্বারা চিকিৎসা করার কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা অস্বীকারকারীর জ্ঞানের দৈন্যই প্রমাণ করে।

কেহ কেহ বলেন যে, অতীসারে আক্রান্ত রোগীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৪টি কারণে মধু খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রথম আয়াতে কারীমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাপক শেফার অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ইরশাদ দ্বারা বোধগম্য হয়–

صَدَقَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন) অর্থাৎ পবিত্র আয়াতে فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (মধুতে মানুষের শিফা রহিয়াছে।) যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্ব রোগের শিফা রহিয়াছে বলিয়াছেন, উহা সব রোগের জন্য। সুতরাং তিনি যখন তাহাকে সতর্ক করিলেন এবং তাঁহার কথা দ্বারা এই তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলেন, তখন সে আল্লাহ্র নির্দেশে রোগমুক্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয়, যেহেতু তিনি সর্বরোগের চিকিৎসার জন্য মধু ব্যবহার করিতেন, অতএব, তিনি তাঁহার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী মধু ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিলেন। তৃতীয়, তাহার অতীসার ছিল কলেরার কারণে।

www.pathagar.com

যেমন পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ, সম্ভবতঃ মধু পাকাইয়া দিতে তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন। কারণ, পাকান মধু শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থকে রোধ করিয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য সৃষ্টি করে। কাজেই এই সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, হয়ত প্রথমে তাহাকে পাক ছাড়াই কাচা মধু সেবন করান হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও চতুর্থ কথা অত্যন্ত দুর্বল। আর প্রথম কথার সমর্থনে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস উল্লেখযোগ্য ঃ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ اَلْعَسَلُ وَالْقُرْاٰنُ তোমরা মধু ও পবিত্র কুরআনকে শেফার জন্য অবশ্য ব্যবহার করিবে। এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও হাকিম বিশুদ্ধ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবী শায়বা ও হাকিম উত্তম হাদীস হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যখন প্রকাশ হইয়া যায়, অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন তোমাদের কেহ শিফা কামনা করে, তখন তাহার কর্তব্য হইল, সে তাহার স্ত্রীর মাহরের কিছু অর্থ চাহিয়া লইবে এবং তাহা দ্বারা মধু ক্রয় করিবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন শিফার আয়াতকে একটি বাটিতে লিখিবে, অতঃপর উহাকে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রোগে আরোগ্য দান করিবেন। কোন কোন আলিমের মতে এই হাদীসের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলার এই কথা وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ (আমি পবিত্র কুরআনে যাহা নাযিল করিয়াছি তাহা শিফা)। তিনি আরও বলিয়াছেন, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا (আমি আকাশ হইতে কল্যাণময় পানি অবতরণ করিয়াছি)। অপর এক স্থানে বলিয়াছেন। مَاءً طَهُوْرًا (পবিত্রকারী পাখি)। তারপর বলিয়াছেন فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا (যদি তোমাদের স্ত্রীগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের মাহর হইতে কিছু প্রদান করে তবে তাহা খাও। (সূরা নিসা ঃ ৪)। আর মধু সম্পর্কে বলিয়াছেন فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ মধুতে মানুষের জন্য শিফা নিহিত। অতএব যখন শিফার এই সমস্ত উপকরণ একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তাহার শিফা অবশ্যই লাভ হইবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র শিফা দানকারী।

اَللّٰهُمَّ اَشْفِنَا شِفَاءً عَاجِلاً بِحَقِّ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِبَرْكَةِ نَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ ـ

স্বপ্ন ব্যাখ্যা

দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমীদের চিন্তাধারার আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে করা হইয়াছে। এখানে কেবল হাদীসবেত্তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, আমরা সেই সম্পর্কেই আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মালিকী মযহাবের বিশিষ্ট আলিম কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবীর মতে, স্বপ্ন একটা অনুভূতি, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা বা শয়তানের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে উহার তাৎপর্য বা উহার বিশ্লেষণসহ জাগাইয়া দেন।

www.pathagar.com

হাকিম ও উকায়লী বলেন– একদা হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবুল হাসান! কোন লোক স্বপ্ন দেখে, তাহার স্বপ্নের কোন কোন অংশ সত্য হয়, আবার কোন কোন অংশ অসত্যও হয়। ইহার তাৎপর্য কি? হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার আত্মা আরশের দিকে উড়িয়া যায়। তখন আরশ হইতে উক্ত স্বপ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। আর যে আত্মা আরশের নিচে থাকিয়া যায় উহার স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া থাকে। আল্লামা যাহ্বী এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন নাই।

ইব্ন কায়্যিম একটি হাদীস আনয়ন করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে যাহা বলিয়া থাকেন, স্বপ্ন হইল উহারই অংশ। আর হাকীম তিরমিযী বলিয়াছেন যে, কোন কোন তাফসীরবিদ এই পবিত্র আয়াত مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ (কোন মানুষের জন্যই ইহা শোভনীয় নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সহিত কথা বলিবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে।)-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "পর্দার অন্তরাল হইতে"-এর উদ্দেশ্য হইল নিদ্রা ও স্বপ্ন। আর নবীগণের স্বপ্ন অন্যদের তুলনায় ওহী হইয়া থাকে এবং ওহী সর্বদা বিনা বাধায় ও বিনা অন্তরালে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্যে যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে ও নিরাপত্তায় অবতীর্ণ হয়। নবীগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরা ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। কারণ, কোন কোন সময় উহা অন্য লোকদিগকে শয়তানে পরিণত করিয়া থাকে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে পুণ্যবানদের সুন্দর স্বপ্নকে নুবুওয়াতের ছয়চল্লিশতম অংশ বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইহা হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রের মর্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। নতুবা সৎ ব্যক্তিরাও তো অনেক সময় বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা খুবই বিরল। কারণ, সৎ লোকদের উপর শয়তানের প্রাধান্য অতি সামান্যই হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইল অসৎ প্রকৃতির লোকদের অবস্থা। উহাদের মধ্যে সত্য বিরল হইয়া থাকে। কারণ, উহাদের উপর শয়তানের প্রাধান্য অত্যধিক প্রবল হইয়া থাকে।

এই স্থানে এই শক্ত উক্তি করা হইয়া থাকে যে, স্বপ্নকে (রুইয়া) নুবুওয়াতের অংশ বলা হয়, উহার অর্থ কি ? অথচ রাসূলে কারীম (সা)-এর উপর নুবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ? ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, যদি নবী করীম (সা) স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তো উহা প্রকৃতই নুবুওয়াতের অংশ হইবে। আর যদি নবী করীম ছাড়া অন্য কেহ দেখিয়া থাকে, তখন অপ্রকৃতার্থে নবীর স্বপ্নের সদৃশ হওয়ায় উহাকে জ্ঞানের কল্যাণের ক্ষেত্রে নুবুওয়াতের অংশ বলা হয় এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অংশ বলিতে নুবুওয়াতের জ্ঞানের অংশ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কেননা, যদিও নুবুওয়াতের ধারা কর্তিত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার জ্ঞানের ফল্গুধারা বলবৎ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সকল ব্যক্তিই কি স্বপ্নের তা'বীর দান করিতে পারে ? তিনি বলিলেন, নবুওয়াত লইয়া কি খেলা করা চলে ? ইহার পর বলেন যে, স্বপ্ন হইল নুবুওয়াতের অংশ। ইহা দ্বারা ঐ সাদৃশ্যক বুঝান উদ্দেশ্য, যাহা কোন

www.pathagar.com

কোন অদৃশ্য বস্তুর সংবাদের মূল ভিত্তির সহিত নবীর স্বপ্নের মিল রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর বিশেষ অংশ দ্বারা পরিপূর্ণ বস্তুকে বুঝান অবশ্যম্ভাবী নহে। যথা কোন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিলেই উহাকে মুয়ায্যিন বলা হয় নাই। হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমার পর সুসংবাদ দানের ধারা স্থায়ী থাকিবে না কিন্ত রুইয়া অর্থাৎ স্বপ্ন অটুট থাকিবে।

মুসলিম ও আবূ দাঊদ শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অসুখে এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, ঐ সময় স্বীয় পবিত্র কুটীরের পর্দা উঠাইয়া পবিত্র শির উত্তোলন করেন। ঐ সময় তাহার মুবারক শিরে পট্টি বাঁধা ছিল, লোকেরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে কাতারবন্দি হইয়া নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন যে, হে লোক সকল! নুবুওয়াতের সুসংবাদসমূহ স্থায়ী থাকিবে না, অবশ্য সুস্বপ্নসমূহ অবশিষ্ট থাকিবে। যাহা মুসলমানগণ দেখিতে পাইবে অথবা দেখান হইবে এবং সুসংবাদের ব্যাখ্যা অধিকাংশের পরিপ্রেক্ষিতে করা হইয়াছে নতুবা কোন কোন স্বপ্ন তো ভীতিপ্রদও হইয়া থাকে এবং সত্যও হইয়া থাকে। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহপূর্বক প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে পূর্ব হইতে ঐ বস্তু সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন, যাহা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হইবে।

কাযী আবূ বকর ইব্নুল আরাবী বলেন যে, ইহাকে কেহই নুবুওয়াতের অংশ হিসাবে মনে করিয়া থাকে না। কিন্তু ফেরেশতা অথবা নবী এবং রাসূল করীম (সা) উহা হইতে যাহা কিছু মর্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন উহা হইল ইহাই যে, উহা স্বপ্ন মাত্র। মোটকথা, স্বপ্ন নুবুওয়াতের অংশসমূহের মধ্য হইতে এক অংশ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই জন্য যে, ইহাতে এক প্রকার অদৃশ্যসমূহের মধ্য হইতে কোন এক অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত করান হইয়া থাকে। কিন্তু বিশদ সম্বন্ধ নুবুওয়াতের স্তর এবং উহার জ্ঞানের সহিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ইমাম রাযী (র) বলেন যে, বিদ্বানদের জন্য আবশ্যক হইল, তাহাদের প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ও বিশদরূপে জ্ঞান রাখা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিদ্বানের জন্য তাহাদের জ্ঞানের একটি সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তন্মধ্য হইতে কিছু লোককে তো পূর্ণ ও বিশদ রূপে জ্ঞান করান হইয়া থাকে এবং কিছু লোককে সংক্ষিপ্ত রূপে (পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত রূপে নয়) এবং স্বপ্ন ও (রুইয়াও) ঐ জাতীয় একটি। এবং হাদীসেও এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের রিওয়ায়াত আসিয়াছে। কোনটায় পঁয়তাল্লিশতম অংশ আসিয়াছে, কোনটায় সত্তরতম অংশ এবং কোনটায় ছিয়াত্তরতম অংশ। কোন হাদীসে ছাব্বিশতম এবং কোন হাদীসে চব্বিশতম অংশ আসিয়াছে। এই হিসাবে এই সকল হাদীসের শুদ্ধতার উপর দৃঢ় মত পোষণ করা যায় না। কিন্তু ছেচল্লিশতম হাদীস হইল প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ আবার এই প্রসিদ্ধতম সংখ্যা ছেচল্লিশতম হাদীসের এক বিশেষ সম্বন্ধও বাহির করিয়া থাকেন।

তাহারা বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর প্রতি ছয় মাস পর্যন্ত স্বপ্নযোগে ওহী অবতারণ করেন, এবং পরবর্তী সময় সমগ্র জীবনভর জাগ্রতাবস্থায় ওহী অবতীর্ণ করেন। পূর্ণ তেইশ বৎসর নুবুওয়াতের যুগ ছিল এবং এই ছয় মাসের তেইশ বৎসরের সহিত সম্পর্ক

www.pathagar.com

ছেচল্লিশতম অংশ হয়। এই ব্যাখ্যা যথার্থ এবং বিবেকসম্মত মনে হয়। যদি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, ওহীর প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নযোগের ওহীর সময়কাল ছয় মাস ছিল।

খাত্তাবী বলেন যে, বিদ্বানগণ এই সংখ্যার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কতিপয় উক্তি করিয়াছেন, যাহার কোনটাই প্রামাণ্য পর্যায়ে পৌঁছে নাই। আর না আমরা এই সম্বন্ধে কোন হাদীস বা সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। আর না দাবীকারীরা কেহ এই অধ্যায়ে কোন কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা শুধু ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়াছেন এবং ধারণা সত্য হইতে একটুকুও মুখাপেক্ষীহীন করিতে সক্ষম হয় না এবং আমাদের ইহার কোন প্রয়োজনীয়তাও নাই যে, যাহার ইলমকে গোপন রাখা হইয়াছে, উহাকে আমরা রাকাআতের সংখ্যা, রোযার দিন এবং রমিউল জিমার (ইষ্টক নিক্ষেপ) ইত্যাদির ন্যায় জানিব। তদুপরি সংখ্যা নির্ণয় করার মধ্যে যে সম্বন্ধ অন্যান্য হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা কার্যকর নয়। সুতরাং উত্তম বরং অত্যাবশ্যক হইবে, উক্ত ইলমকে শরীআত প্রবক্তার উপর ন্যস্ত করিয়া দেওয়া।

সত্য স্বপ্নের সময়

আরও একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, হাদীস শরীফে আসিয়াছে, সকলের চাইতে সত্য স্বপ্ন হইল সুব্হি সাদেকের সময়কার দর্শন (اَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْاَسْحَارِ)। এই হাদীসটি তিরমিযী ও দারিমী রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আর মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যখন সময় নিকটবর্তী হইয়া আসে, তখন মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সত্যবাদী, তাহার স্বপ্ন সকলের চেয়ে সত্য। সময় নিকটবর্তী হইয়া আসা সম্পর্কে দুই প্রকার উক্তি আসিয়াছে। উহার এক অর্থ হইল এই যে, রাত্র এবং দিন যখন নিকটবর্তী হইয়া আসে; বসন্তকালে এই সময় সমান হইয়া থাকে। কেননা, এই সময় দিন ও রাত এক সমান হয়। এবং এই সময় প্রকৃতি চতুষ্টয়েরও সমতার সময়। তাহাদের মর্ম ইহাই। প্রকাশ্যতঃ হেমন্তকালকেও বলা হইয়া থাকে। কেননা, এই সময় পাল্লা পরিবর্তনের সময় এবং রাত্র ও দিন সমান হওয়ার সময়। এই স্থানে এই উক্তি করা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করায় কি লাভ হইয়াছে ? কেননা, এই সময় হইল প্রকৃতি চতুষ্টয়ের সমতার সময়। ইহা কেবল মুসলমানদের সহিত সম্পৃক্ত নয়। ইহার উত্তর হইল এই যে, কাফিরের অবস্থাকে ধর্তব্যের বাহিরে গণ্য করা হইয়া থাকে এবং উহাদের স্বপ্নের উপর সত্যারোপ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় উক্তি হইল এই যে, সময় নিকটবর্তী হওয়ার মর্ম হইল কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহার শেষ সময় এবং তিরমিযী শরীফের এই হাদীসটি উহাকে সমর্থন দান করে যে, يَلْفَظُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ 'শেষ যামানায় মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না।'

এই মিসকীন (এই গ্রন্থকার) তাহার কোন মাশায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছে যে, সময় নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হইল মৃত্যু এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত সময়ের উদ্দেশ্য হইল ইমাম মাহদী (আ)-এর যামানা। কেননা, তাহার যামানায় সুবিচার ও ন্যায়নীতি, শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ ও রিযক ব্যাপক হইবে, এই জন্যে যে, ঐ যামানা স্বাদ ও আনন্দের দিক দিয়া সংক্ষিপ্ত হইবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঐ যামানার লোক বলার উদ্দেশ্য হইল,

www.pathagar.com

যাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত দাজ্জালকে ধ্বংস করার পর অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। আব তাহারা স্বীয় অবস্থায় এই উম্মতের সকল লোকের মধ্যে প্রথম যুগের পর অতি উত্তম এব সর্বাধিক সত্যবাদী হইবেন। এই কারণে উক্ত হাদীসের শেষে বলা হইয়াছে যে, وَاَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا اَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا 'উহার স্বপ্ন অধিক সত্য, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী।' সত্য স্বপ্নের মধ্যে সত্যবাদিতার শর্তারোপ করার কারণ সুস্পষ্ট। এই জন্য যে, ব্যক্তি সত্য বলিয়া থাকে, তাহার অন্তর উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং উহার গ্রহণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং সঠিকরূপে উহার ধারণা ও মর্ম চিত্রিত হইয়া থাকে। আর জাগ্রতাবস্থায় যে ব্যক্তি সুস্থ ও সঠিক থাকে, তাহার স্বপ্নও এইরূপ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইল যাহারা মিথ্যা অথবা সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত কথাবার্তা বলিয়া থাকে তাহারা। কারণ, তাহাদের হৃদয় অন্ধকার ও মলিন, সুতরাং তাহাদের স্বপ্ন সর্বদা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর হইয়া থাকে। অবশ্য কখনও কখনও সত্যবাদী অশুদ্ধ স্বপ্ন এবং মিথ্যাবাদী শুদ্ধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহাই হইয়া থাকে যাহা বলা হইয়াছে।

উপরন্তু হাদীস শরীফে আছে যে, তোমাদের মধ্য হইতে যদি কেহ স্বপ্নে এমন বস্তু দেখিতে পায়, যাহা তাহার নিকট প্রিয় ও পসন্দনীয় হয়, তাহা হইলে উহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে দেখান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৎপ্রতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। উহাকে ব্যক্ত করিবে, অর্থাৎ লোকদিগকে বলিবে। আর যদি স্বপ্নে এমন বস্তু দেখিয়া থাে, যাহা তাহার নিকট পসন্দনীয় ও মন:পূত নহে, তাহা হইলে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহার অমঙ্গল ও অনিষ্ট হইতে আশ্রয় কামনা করিবে। আর কাহারও সহিত উহার আলোচনা করিবে না এবং কাহাকেও কষ্ট দিবে না। (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে আছে যে, খারাপ স্বপ্ন শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে, উহা কাহাকেও না বলা এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা এবং উহা হইতে আশ্রয় কামনা করা উচিত। আর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বের দিকে পরিবর্তিত হওয়া। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, নামায পড়া চাই এবং কাহাকেও না বলা উচিত। তবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট বলিতে পারিবে এবং অন্য রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, উপদেশ দানকারী আলিমের নিকট ব্যক্ত করিবে এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে। অন্য এক রিওয়ায়াতে ইহাও আসিয়াছে যে, স্বপ্ন অস্থিরমতিতা হইতে উদ্ভূত। ইহার মর্ম হইল, উহা কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং যতক্ষণ ব্যাখ্যা না লওয়া হয়, ততক্ষণ উহা অনুষ্ঠিত হয় না এবং যখন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তখন উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। এবং ইহাও রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে সর্বপ্রথম স্বপ্নের যে ব্যাখ্য দেওয়া হয় উহাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই হাদীসটি দুর্বল, যদিও লোকের স্বভাব হইল যে, তা'বীরদাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। যদি শুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তবে তো ভালই, নতুবা কখনও অপর কাহারও নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, যেমন বলা হইয়াছে। আর ব্যাখ্যাদাতার উচিত উত্তম ব্যাখ্যা দান করা এবং যতটুকু সম্ভব উত্তমের উপর থাকা।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাদাতাগণের প্রতি নবী করীম (সা)-এর উপদেশ

হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল যে, আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং আমি গর্ভবতী। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, গৃহের খাম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমি চক্ষু মুদিত বাচ্চা জন্ম দিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাখ্যাদান করিলেন যে, ইনশা আল্লাহ তোমার স্বামী সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে এবং তুমি সুন্দর ও উত্তম স্বভাবের বাচ্চা জন্ম দিবে। উক্ত মহিলা দ্বিতীয়বার আসিল ঐ সময় নবী আকরাম (সা) গৃহে ছিলেন না। আমি তাহার নিকট স্বপ্নের ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে তাহার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিল। আমি তাহার স্বপ্নের ব্যাখা এই দিলাম যে, যদি তোমার এই স্বপ্ন ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার স্বামী মারা যাইবে এবং তুমি দুশ্চরিত্র বাচ্চা জন্ম দিবে। তখন সে মেয়েলোকটি বসিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুভাগমন করিলেন এবং বলিলেন, হে আইশা! এইরূপ করিও না। যখন তুমি কোন মুসলমানকে উহার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করিবে, উহাকে মঙ্গলের উপর ধারণ করিও এবং উত্তম ব্যাখ্যা দান করিও। এই কারণে যে, যেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, তদ্রূপই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ইহাও হাদীসে আসিয়াছে যে, ব্যাখ্যা দানকারীদের উচিত ব্যাখ্যা দানের পূর্বে এই কথা বলা যে, خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِأَعْدَائِنَا আমাদের জন্য মঙ্গল হউক এবং আমাদের শত্রুদের জন্য অমঙ্গল হউক। ইহার পর ব্যাখ্যা দান করিবে। নবী আকরাম (সা)ও এইরূপ করিতেন।

ব্যাখ্যাদাতাদের নিয়ম-পদ্ধতি

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ব্যাখ্যা দানকারীদের নিয়ম-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে হইতে হইল যে, তাহারা না সূর্যোদয়ের সময় ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, না সূর্যের অধঃগতি ও সূর্যাস্তের সময়, না রাত্রিকালে ব্যাখ্যা দান করিয়া থাকেন। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে না কোন কারণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং না এই প্রেক্ষিতে কোন হাদীস বিবৃত করিয়াছেন। যদি বলা হয় যে, ইহা ঐ সময় যে সময়ে নামায পড়াকে মকরূহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে সূর্যের সোজা হওয়া অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালেরও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু সূর্যের অধঃগতি দ্বারা ঐদিকে ইংগিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাত্রি কালে ব্যাখ্যা দান করাকে নিষেধ করার কারণ কি ? অথচ ইহা শুদ্ধ হাদীস হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ফজরের নামায আদায় করিতেন তখন সাহাবীগণের প্রতি জ্যোতির্ময় চেহারা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কি অদ্য রাত্র স্বপ্ন দেখিয়াছ ? অতঃপর যাহারা স্বপ্ন দেখিতেন তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উহা আরয করিতেন এবং নবী করীম (সা) তাহাদিগকে উহার ব্যাখ্যা দান করিতেন। ইমাম বুখারী তাঁহার কিতাবের মধ্যে সকালের নামাযের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান এই শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় বাঁধিয়াছেন। কিন্তু ইহা সূর্যোদয়ের পূর্বে হইত। আর সূর্যোদয়ের সময় ব্যাখ্যা দানের নিষিদ্ধতা যুক্তি-প্রমাণ সাপেক্ষ। আর এই যুক্তি যে, যে সকল সময়ে নামায মাকরূহ হয় ঐ সকল সময় ব্যাখ্যা দান নিষিদ্ধ ইহাও স্পষ্ট নয় এবং মাওয়াহিব-এর ভাষায় এই

দিকে ইশারাও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যাহারা এই কথা বলিয়া থাকে যে, যখন সূর্য খুব উঁচু হইয়া যায় ঐ সময় এবং আসরের পূর্ব হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যাখ্যা দান করা মুস্তাহাব। উপরোল্লিখিত হাদীস এই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া থাকে। নবী আকরাম (সা)-এর জ্যোতির্ময় চেহারা ফিরাইয়া সাহাবাগণের নিকট স্বপ্ন দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, এই সম্পর্কে বিদ্বানগণ বলেন যে, নবী আকরাম (সা) মক্কা বিজয়ের সুসংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল কোন স্থান হইতে উহার নিদর্শন প্রকাশিত হউক। আমাদের জানা নাই ইহারা কোথা হইতে এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এই প্রশ্নবাদের বাহ্যিক মর্ম ও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সাহাবা কিরামের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যে, প্রত্যেকের পারস্পরিক অবস্থা কিরূপ আছে, এবং উহার কি ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সম্মানিত মাশায়খের এই অভ্যাস দেখা যায় যে, তাহারা স্বীয় মুরীদ ও শিষ্যগণের নিকট হইতে ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন এবং উহাদের সমাধান করিয়া থাকেন, ইহাও এই সুন্নাতেরই অনুসরণ মাত্র।

কোন কোন বিদ্বান বলিয়া থাকেন যে, সকালের নামাযের সময় স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা উত্তম ও নিকটতম। অন্যান্য সময়ের তুলনায় স্বপ্নকে স্মরণ রাখার দিক হইতে অথবা এই কারণে যে, স্বপ্ন দেখার সময়ের হইতে ইহা নিকটতম সময়। কেননা, অনেক সময় মানুষ স্বপ্ন ভুলিয়া হইয়া যায়। আর ইহাও কারণ যে, ব্যাখ্যাকারীর স্মৃতিশক্তি ঐ সময় সবল থাকে। কেননা, এই সময় বায়ুর পবিত্রতা এবং কলবের জ্যোতির্ময়তার সময় এবং এই সময় দুনিয়ার ব্যবহারিক কর্ম-ব্যস্ততা কম থাকে।

স্বপ্ন দর্শকের নিয়মাবলী

স্বপ্ন দর্শনকারীর নিয়মাবলীর মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তাহাকে সত্যবাদী হইতে হইবে এবং উযূসহকারে ডান পার্শ্বে শয়ন করিতে হইবে, যেমন শয়নের সুন্নাত আছে। আর শয়ন করার পূর্বে সূরা ওয়াশশামস, ওয়াল লায়ল, ওয়াত্ত্বীন এবং সূরা ইখলাস ও কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পাঠ করিবে এবং এই দু'আ করিবে 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শায়ইল আহলামে ওয়া আস্তাখীরু বিকা মিন ফালাতিকাশ্ শায়তানে ফিল ইয়াক্যাতে ওয়াল মানামে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রুইয়া সালিহাতান, সাদিকাতান নাফিআতান, হাফিযাতান, গায়রা সাম্মাইতুহু আল্লাহুম্মা আরেনী ফী মানামী মা উহিব্বু। আর স্বপ্ন শত্রু ও মূর্খ ব্যক্তিদের নিকট বর্ণনা করিতে নাই। কেননা, উহারা মূর্খতা অথবা শত্রুতার কারণে অন্য রূপ ব্যাখ্যা করিতে পারে।

যাবতীয় স্বপ্ন দুই প্রকারে বিভক্ত। এক আযগাছে আহলাম অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন। জাগ্রতাবস্থায় যেরূপ বিশৃংখল ও উদভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ অবস্থা স্বপ্নেরও। 'যিগছুন' (ضغث)-এর আভিধানিক অর্থ হইল আবর্জনা ও মলিনতা এবং সুরাহ-এর মধ্যে এক মুষ্টি ঘাস যাহার মধ্যে শুকনা ও তাজা ঘাস মিশ্রিত থাকে উহাকে যিগছুন বলা হইয়াছে। আর আহ্লাম-এর অর্থ বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন আসিয়াছে। আর যিগছুল হাদীস-এর অর্থ 'কথার সংমিশ্রণ' করা হইয়াছে। আর হুলম (حلم)-এর বহুবচন হইল আহলাম (احلام)। প্রাপ্তবয়স্কের স্বপ্নকে আহলাম বলা হইয়া থাকে। রুইয়া-এর এই প্রকার গণনার যোগ্য নয়, ইহা কোন প্রকার

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার যোগ্য নয় এবং অধিকাংশ সময় এই ধরনের স্বপ্ন শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহাতে সে মুসলমানদের স্বপ্নকে বেদনাময় করিয়া তাহাকে চিন্তাযুক্ত করিয়া তোলে। যথা, কেহ দেখিতে পায় যে, তাহার শীর কর্তিতাবস্থায় আছে অথবা কেহ তাহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পিছনে লাগিয়া আছে, অথবা মৃত বস্তু দেখিতে পায়, অথবা কোন ভয়ংকর স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, যে স্থান হইতে তাহার নিষ্কৃতির উপায় নাই ইত্যাদি।

মুসলিম (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক বেদুঈন আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি স্বপ্নে আমার শির কর্তিত অবস্থায় দেখিয়াছি এবং আমি উহার পিছনে পিছনে যাইতেছি। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, স্বপ্নের মধ্যে শয়তান তোমার সহিত যে ঠাট্টা করিয়াছে উহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। এই স্বপ্ন এইরূপ যেমন কেহ দেখিতে পায় যে, ফেরেশতা তাহাকে কোন হারাম কার্য করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে, অথবা উহার ন্যায় এমন কথা বলিতেছে, যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে অথবা জাগ্রতাবস্থায় মনে যে ধারণার উদয় হইয়াছিল এবং উহাকে অসম্ভব মনে করিয়াছিল ঐ বস্তুকেই সে স্বপ্নে দেখিয়া থাকে। অথবা স্বভাবের উপর চারি মিশ্র বস্তুর মধ্য হইতে যাহার প্রাধান্য হয় তদনুযায়ী স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। যথা– কফ, পিত্ত, রক্ত ও কৃষ্ণ-কে সে স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন কফীয় ধাতের মানুষ স্বপ্নে পানি দেখিয়া থাকে, পিত্ত ধাতের লোক অগ্নি অথবা হলুদ রং-এর স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, রক্তিম ধাতের লোক লাল রংকে দেখিয়া থাকে এবং কৃষ্ণ ধাতের মানুষ কালোবস্তু দেখিয়া থাকে ইত্যাদি। এই সকল স্বপ্ন গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হইল সত্য স্বপ্ন (রুইয়া সাদিকা)। যথা নবীগণের স্বপ্ন, অথবা পুণ্যবান ব্যক্তিগণের স্বপ্ন (রুইয়া সালিহা) আবার কখনও বিরল হিসাবে তাহাদের পরিপন্থী লোকদেরও এইরূপ দেখার সুযোগ হইয়া থাকে। এই স্থানে দুইটি উক্তি করা হইয়াছে। এক রুইয়া সাদকা স্বত্য স্বপ্ন, দ্বিতীয় রুইয়া সালিহা ও হাসান, সৎ ও সুন্দর স্বপ্ন। প্রকাশ ইহা সুস্পষ্ট যে, উভয়েরই অর্থ এক। কিন্তু কেহ ইহার মধ্যে ব্যবধান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাদকা উহা, যাহা সত্য হইয়া থাকে এবং সালিহা উহা যাহা উদ্দেশ্য মুতাবিক ও মনঃপূত হইয়া থাকে। ইহা আম্বিয়া ও সৎ লোকদের স্বপ্নসমূহের মধ্য হইতে পরকালের কর্মের ক্ষেত্রে এক অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু পার্থিব দুনিয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যত আশ্চর্যজনক রূপে উহা মনপূত হইবে না। যেমন নবী করীম (সা) উহুদের দিন স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, গাভী যবাহ্ করিতেছেন এবং যখন নিজ তরবারির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, তরবারি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নবী করীম (সা) গরু যবাহ-এর ঐ ব্যাখ্যা দান করিলেন যাহা উক্ত দিবস সাহাবীগণের উপর পতিত হইয়াছিল এবং ভাংগা তরবারির ব্যাখ্যায় বলিলেন যে, তাহার বংশধর-এর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছেন, অর্থাৎ হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। অতঃপর শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য এবং বিজয় ও সাফল্য সম্পূর্ণ মাখলুকের উপর।

সকল মানুষ তিন প্রকারের। এক, পর্দায় আচ্ছাদিত অবস্থা বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহার উপর সত্য ও মিথ্যা সকলই এক সমান। দ্বিতীয় দুষ্কৃতিকারী ও ব্যভিচারী। তাহাদের উপর উদভ্রান্ত ও

www.pathagar.com

মিথ্যা স্বপ্নের আধিক্য হইয়া থাকে এবং উহাদের সত্যস্বপ্ন খুবই বিরল। আর তৃতীয় কাফির, উহাদের উপর সত্য তো একান্তই বিরল। আর যদিও কোন কোন কাফিরের নিকট হইতেও সত্যস্বপ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত জেলখানার দুই কয়েদী সহচর-এর স্বপ্ন এবং উহাদের বাদশাহ-এর স্বপ্ন ইত্যাদি।

হাদীসে আসিয়াছে যে, اَلصِّدْقُ الرُّؤْيَا بِالْاَسْحَارِ। সর্বাধিক সত্য স্বপ্ন হইল প্রত্যুষ কালের স্বপ্ন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, রাত্রের প্রথম প্রহরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিলম্বিত হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়ার্ধের স্বপ্ন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। স্বপ্নের মধ্যে সকলের চেয়ে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত ফলদানকারী স্বপ্ন হইল অতি প্রত্যুষকালের স্বপ্ন, বিশেষতঃ ফজরের উদয়ের সময়কার স্বপ্ন। ইমাম জা'ফর সাদিক (র) বলেন যে, দ্রুত ফলদানকারী স্বপ্ন হইল কায়লুলার স্বপ্ন (দ্বিপ্রহরে আহারের পর বিশ্রাম কালের স্বপ্ন) এবং মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বর্ণনা দান করিয়াছেন যে, দিবসের স্বপ্ন রাত্রের স্বপ্নের ন্যায় এবং মেয়েলোকের স্বপ্ন পুরুষের স্বপ্নের ন্যায় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, মেয়েলোক যখন এইরূপ স্বপ্নে দেখিতে পায় যাহার সে যোগ্য নয়, তাহা হইলে উহা তাহার স্বামীর স্বপ্ন হইবে। দাসদেরও এই একই অবস্থা যে, উহা তাহাদের প্রভুর স্বপ্ন হইবে। অনুরূপভাবে বাচ্চাদের স্বপ্নও মাতা-পিতার স্বপ্ন হইয়া থাকে।

নবী করীম (সা)-এর স্বপ্ন এবং তাঁহার বাখ্যাদান

নবী করীম (সা) কর্তৃক বহু স্বপ্ন ও উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে একটি হইল দুগ্ধদর্শন করা এবং পার্থিব জ্ঞানের সহিত উহার ব্যাখ্যা দান করা। বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) ইতে রিওয়ায়াত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, আমার নিকট দুধের পিয়ালা উপস্থিত করা হয়। আমি উহা হইতে এইরূপ পান করি যে, আমার নখ হইতে উহার পরিতৃপ্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আমি এত বেশী পান করি যে, আমি উহাকে আমার দেহের শিরা-উপশিরায় ঘুরপাক খাইতে দেখিতেছিলাম। তারপর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, উহা আমি উমর (রা)-কে দিয়া দিয়াছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ইহার কি তা'বীর ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন ? বলিলেন, আমি জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

শায়খ ইব্ন আবী জামরা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক দুধের এই ব্যাখ্যাদান করা এই হিসাবে হইবে যে, মি'রাজের প্রথম পর্যায়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, যে সময় নবী করীম (সা)-এর খিদমতে মদের পিয়ালা এবং দুধের পিয়ালা উপস্থিত করা হইয়াছিল, যেন তিনি যাহা পসন্দ করেন তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি দুধকে পসন্দ করেন। এই দেখিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন যে, আপনি ফিতরাত (স্বভাব)-কে গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ দীনকে। কোন কোন মারফূ' হাদীসে দুধের তা'বীর ফিতরাত দ্বারা আসিয়াছে এবং কোন কোন রিওয়ায়াতে জ্ঞান দ্বারা আসিয়াছে। দুধকে জ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ উহার অধিক উপকারিতা। তাহা ছাড়া ইহা দেহ সংগঠনের উপকরণ। জ্ঞান সমস্ত রূহের খোরাক, শরীরের খোরাক এবং উহার সংগঠনের ক্ষেত্রে ইহা দুধের ন্যায়। বলা হইয়া থাকে যে, এই পৃথিবীতে জ্ঞানের তুলনা হইল দুধ। আলহামদু লিল্লাহ্ এই মিসকীন (মাদারিজুন্ নুবুওয়াত গ্রন্থকার) নবী

www.pathagar.com

করীম (সা)-এর সাদকা হিসাবে কোন কোন স্বপ্নের ক্ষেত্রে উক্ত সৌভাগ্য ও সুসংবাদ হইতে কিছুটা অংশ লাভ করিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যে, আমি দুধের চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম ও নিকট মিষ্ট তাজা দুগ্ধ পান করিয়াছি এবং আমি উহা সকলই পান করিয়া লইয়াছি। আশা করা যায় যে, ইহা দ্বারা দীনের ইলমের অংশ হইতে সম্মানিত করা হইবে এবং অংশ দান করা হইবে। একবার দেখিয়াছি যে, কাঁসার বড় এক পাত্রে অনেক সাদা ও সুমিষ্ট পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ রহিয়াছে। আমি উহা পান করিয়া লইয়াছি। (আলহামদু লিল্লাহ্)

তন্মধ্য হইতে নবী করীম (সা)-এর জামা দেখা ও উহার তা'বীর দীন দ্বারা করাও একটি। ইমাম বুখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি শয়ন করিতেছিলাম, আমি দেখিলাম যে, আমার সম্মুখে লোক উপস্থিত হইয়াছে যাহাদের শরীরে এমন জামা ছিল যে, কাহারও বুক পর্যন্ত ছিল, কাহারও উহা হইতে ওয়ান এবং আমার সম্মুখ দিয়া হযরত উমর (রা) অতিক্রম করেন। তাহার জামা হেঁচড়াইতেছিল, অর্থাৎ এত লম্বা ছিল যে মাটি পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ওয়ান শব্দের দুইটি সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। এক, উহা এত ছোট ছিল যে, উহা গলার সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়, তদপেক্ষা নিম্নে হইবে। বস্তুতঃ উহা নাভি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং পূর্বের চাইতে লম্বা। এই সম্ভাবনা ঐ রিওয়ায়াত কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, যাহা হাকীম তিরমিযী নাওয়াদিরুল উসূল-এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ব্যক্তির জামা নাভি পর্যন্ত ছিল এবং কিছু লোকের অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত ছিল। জামা দ্বারা দীনের সহিত তা'বীর করা এই হিসাবে হইবে যে, জামা পৃথিবীতে আবরুকে ঢাকিয়া রাখে এবং দীন পরকালে পর্দার কাজ করিবে এবং ইহলোকে প্রত্যেক নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ হইল ইহার ভিত্তি। لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ 'তাকওয়ার পোশাক হইল উত্তম পোশাক।' কেহ কেহ বলেন যে, ইহার কারণ হইল এই যে, দীন মূর্খতার লজ্জাকে ঢাকিয়া রাখে, যেরূপ জামা শরীরের গোপন স্থানকে ঢাকিয়া রাখে। যাহার বুক পর্যন্ত জামা আছে, সে কুফর হইতে অন্তরকে ঢাকিয়া লইয়াছে। যদিও সে গুনাহ্র কর্মও করিয়া থাকে। আর যাহার জামা উহার চেয়ে কিছু নিচে, তাহার লজ্জার স্থান উলঙ্গ এবং তাহার পা উন্মুক্ত। সে পাপের পথে পা বাড়াইয়া থাকে। আর যাহার পা পর্যন্ত জামা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাকওয়ার সর্বদিক হইতে পর্দার মধ্যে আচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং যাহার জামা হেঁচড়াইতেছিল, উহা তাহার দেহের চেয়েও বেশী ছিল, তিনি সৎ কর্মে পুণ্যতম ব্যক্তি। আর মানুষের মর্ম হইল হয়ত সমস্ত মুসলমান হইবে অথবা অনুগৃহীত উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তি হইবে, বরং তাহাদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক হইবে না। দীনের উদ্দেশ্য হইল, কর্ম এবং উহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনসমূহ। অর্থাৎ আদেশ প্রতিপালন করা ও নিষেধ হইতে বিরত থাকার ইচ্ছা রাখা। এই ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর স্তর অনেক উন্নত ও সুউচ্চ। এই হাদীস হইতে জানা গেল যে, দীনদারগণ শ্রেষ্ঠত্বের দিক হইতে অল্প ও বিস্তর এবং শক্তিশালী ও দুর্বল হইয়া থাকেন। এইগুলি এমন বিষয় যাহা স্বপ্নে দর্শন করাও প্রশংসনীয়। এইগুলি জাগ্রতাবস্থায়ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। হাদীসে যে বলা হইয়াছে যে, জামা হেঁচড়াইতেছিল, ইহা শরীআত অনুসারে নিন্দনীয়। কারণ,

www.pathagar.com

লম্বা জামা (গিঁরার নীচে) পরিধানের ক্ষেত্রে ধমক আসিয়াছে। আর নিদ্রিতাবস্থা শরীআতের শাসন বহির্ভূত। ইহা ঐ হুকুমের অনুরূপ হইবে যাহা মে'রাজের আওতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, পবিত্র কালবকে স্বর্ণের তশ্‌তরীতে রাখিয়া ধৌত করা হইয়াছে।

তন্মধ্য হইতে নবী করীম (সা) কর্তৃক স্বপ্নে স্বীয় মুবারক হস্তদ্বয়ে কংকণ পরিধান করিতে দেখা এবং দুই মিথ্যুকের দ্বারা উহার ব্যাখ্যাদান করা একটি। বস্তুতঃ আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিতেছেন যে, রাসূলে কারীম (সা) বলিয়াছেন যে, আমি ঘুমন্তাবস্থায় ছিলাম এমন সময় আমাকে পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য দান করা হয়। ইহা দ্বারা কায়সার ও কিস্‌রা (পারস্য ও রূম সাম্রাজ্যের) প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। যাহার উপর নবী করীম (সা)-এর উম্মতগণকে বিজয় দান করা হইয়াছিল। আর স্বর্ণ, রৌপ্যের খনির প্রতিও ইংগিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, ইহার পর যখন আমার দুই হস্তে স্বর্ণের দুই কাঁকন পরিধান করান হয়, তখন উহা আমার নিকট ভারি এবং অপসন্দনীয় মনে হয় এবং উহা আমাকে চিন্তায়িত করিয়া তুলে তারপর আমার প্রতি ওহী অবতারণ করা হয় যে, আমি যেন উক্ত কংকণের উপর ফুৎকার দেই। বস্তুতঃ যখন আমি উহার উপর ফুৎকার দিলাম, তখন উহা চলিয়া গেল। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, উহা উড়িয়া গিয়াছে। আমি ঐ কাঁকন-এর তা'বীর এই করিয়াছি যে, আমি দুই মিথ্যুকের মাঝখানে আছি, এক মিথ্যুক সাফা পর্বতের মধ্যে আছে, দ্বিতীয় মিথ্যুক ইয়ামামার সন্নিকট রহিয়াছে, যাহারা নুবুওয়াতের দাবী করিতেছে। উহাদের মধ্যে একজন আসওয়াদ আনসী ছিল, যে ইয়ামানে নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছে এবং নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পূর্বেই সে ফীরোয দায়লামীর হস্তে নিহত হয় এবং নবী করীম (সা)-এর এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া যাওয়ার পূর্বে মৃত্যুরোগের সময় এই সম্পর্কে তাহার নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়। নবী করীম (সা) উহার হত্যার সংবাদ দান করেন এবং বলেন, قَتَلَهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ فَيْرُ وزَدَيْلَمِىْ অর্থাৎ ফীরোযদায়লামী নামক এক পুণ্যবান ব্যক্তি হত্যা করিয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, فَازَ فَيْرُزُ ফীরোয সাফল্য লাভ করিয়াছে। আর দ্বিতীয় মিথ্যুক হইল, মুসায়লামা কায্‌যাব। সে ইয়ামামা হইতে নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছিল। হিজাযের এক শহরের নাম ইয়ামামা। এই মিথ্যুক হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যামানায় নিহত হয়।

দুই মিথ্যুক ও দুই কংকণ সম্পর্কে বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন বস্তুকে উহার বিপরীত স্থানে রাখাকে মিথ্যা বলা হয়। নবী করীম (সা) তাহার স্বীয় দুই বাযূতে স্বর্ণের দুই কংকণ দেখিতে পান, যাহা নবী করীম (সা)-এর স্বাভাবিক পরিধেয়ের মধ্য হইতে ছিল না। কারণ, উহা মেয়েলোকদের গহনা ছিল। এবং ইহাও একটি কারণ যাহা উহাদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এমন বস্তুর দাবী করিয়াছিল উহারা যাহার উপযুক্ত তাহারা ছিল না। আর ইহাও একটি কারণ যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, এবং উহা পরিধান করা অসত্যের প্রমাণ। তদুপরি 'যাহাব' (স্বর্ণ) 'যিহাব' হইতে উৎপন্নি হইয়াছে। যাহার অর্থ 'যাওয়া' হইয়া থাকে। ইহা হইতে জানা গেল যে, ইহা ঐ বস্তু, যাহা চলিয়া যাইবে এবং বিদূরিত হইবে। আর ইহা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে আরও সুদৃঢ় ও মযবূত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে উহার প্রতি ফুৎকার দিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। ফলে

www.pathagar.com

উহা চলিয়া গিয়াছে অথবা উড়িয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল যে, উহা স্থায়ী থাকার মত বস্তু নয়। আর নবী করীম (সা) কর্তৃক ওহীর কথা বলা যে, উহা আগমন করিয়াছে উহাকে স্বীয় স্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়।

কুরতুবী বলেন যে, এই স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা হইল এই যে, সাফা এবং ইয়ামামার অধিবাসীরা ইসলাম কবূল করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহারা ইসলামের সাহায্যকারী হইয়াছিলেন। তারপর যখন তাহাদের মধ্যে দুই মিথ্যুকের আবির্ভাব হয় এবং তাহারা উভয়েই ঐ শহরদ্বয়ের বাসিন্দাদিগকে স্বীয় সুনিপুণ বাক্য এবং অসত্য দাবীর মাধ্যমে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলে, তখন তথাকার শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা প্রতারণার আবর্তে পতিত হয়। তাই দীনের ক্ষেত্রে উহারা দুই শহরের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং দুই কংকণ দুই মিথ্যুকের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর উক্ত কংকণদ্বয় স্বর্ণের হওয়ার মধ্যে এই ইশারা রহিয়াছে যে, তাহারা স্বীয় বাক্যকে সুসজ্জিত করিয়াছে, যেমন স্বর্ণের নাম হইল যুখরুফ অর্থাৎ সুসজ্জিত ও সুন্দর।

কোন কোন বিদ্বান দুই কংকণ এবং দুই মিথ্যাবাদীর ব্যাখ্যায় বলিয়া থাকেন যে, হস্তে কংকণ থাকা হস্তকে বাঁধিয়া রাখার সমতুল্য, যেমন পায়ের অবস্থা হইয়া থাকে। বন্ধন, হস্তকে কর্ম ও সঞ্চালনের উপকারিতা হইতে বিরত রাখে। যেন দুই মিথ্যাবাদী নবী করীম (সা)-এর মুবারক হস্তদ্বয়কে নিজ বন্ধনে লইয়া গিয়াছে এবং উভয় হস্তকে কর্ম ও সঞ্চালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয় নাই। (ত্বীবী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন)

তন্মধ্য হইতে কাল রং-এর এক মেয়েলোককে বিক্ষিপ্ত চুলের সহিত পবিত্র মদীনা হইতে বাহির হইতে দেখা একটি। পবিত্র মদীনা হইতে জুহায়ফার দিকে মহামারী চলিয়া যাওয়া ইহার ব্যাখ্যা দান করা হয়। বুখারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি কাল রং-এর বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এক মেয়েলোককে পবিত্র মদীনা হইতে বাহির হইয়া মুহতাগায় অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। জুহ্ফার অপর নাম মুহতাগা। ইহা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানের নাম, যেখানে ইয়াহূদীরা বসবাস করিত। আমি উহার এই তা'বীর করিয়াছি যে, পবিত্র মদীনা হইতে মহামারীকে জোহফার দিকে প্রেরণ করা হইয়াছে। কারণ, পবিত্র মদীনায় নবী করীম (সা)-এর শুভাগমনের পূর্বে মহামারী ও জ্বরের আধিক্য ছিল। নবী করীম (সা) উহা বহিষ্কার করতঃ কাফিরদের বস্তির দিকে প্রেরণ করেন।

মহামারীকে কাল রং-এর স্ত্রীলোকের সহিত উপমা প্রদান ও ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে বিদ্বানগণ এই বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) 'সাওদাউন' سَوْدَاء (অর্থ কাল) হইতে سُوْ (সু) অর্থাৎ মন্দ অর্থ বাহির করিয়াছেন এবং دَاءٌ (দাউন) হইতে রোগ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন যে, আমি ঐ বস্তুকে বাহির করিয়া দিয়াছি। যাহার নামের সহিত এই দুই শব্দ একত্রিত ছিল অর্থাৎ سَوْدَاء (সাওদাউন) হইতে سُوْء دَاء (সুয়েদা) সংযুক্ত শব্দ গঠিত হইয়াছে। যাহার অর্থ হইল খারাব রোগ।

আর ثوران (ছাওরান) সাওদাউনের প্রথম অক্ষর হইতে তা'বীর করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ "সু" যাহার অর্থ হইল অসৎ কর্ম, যাহা মন্দ ও দুষ্কার্যকে ছড়াইয়া থাকে। নবী করীম

www.pathagar.com

(সা) উহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কীরওয়ানী বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তু যাহার মুখ কাল হয়, সে উহার মুখকে বিশ্রী ও নিন্দনীয় বানাইয়া দেয়। বলা হয় যে, ছাওরান হইতে খারাপ রোগের সহিত ব্যাখ্যাদান করা হইয়াছে। এই জন্য যে, উক্ত রোগ শরীরে কম্পনের সৃষ্টি করিয়া থাকে ও দেহে তোলপাড় সৃষ্টি করিয়া দেয়। বিশেষ করিয়া কালাজ্বর। কারণ, উহা অতীব ভয়ংকর রোগ।

আর তন্মধ্য হইতে তরবারি দর্শন করাও একটি। নবী করীম (সা) দেখিতে পাইয়াছেন যে, উহাকে ঘুরাইতেছেন এবং উহা কখনও ভোতা ও ধারশূন্য হইয়া যাইতেছে এবং পুনরায় স্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছি যে, তরবারি ঘুরাইতেছি, উহা ধারশূন্য হইয়া যাইতেছে। তারপর আমি ঘুরাইতাম তো দ্বিতীয়বার পূর্বের চাইতে উত্তম অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। তিনি ইহার এই ব্যাখ্যা দান করিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় এবং মুসলমানদের একত্রিতকরণ দান করিয়াছেন।

পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) তরবারিকে সাহাবাগণের সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই জন্য যে, নবী করীম (সা)-এর সকল শক্তি ও সাফল্য তাঁহাদের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। তরবারি ঘুরান দ্বারা তাহাদিগকে জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম দানের সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তরবারি ধারশূন্য হইয়া যাওয়ার সহিত পরাজয় বরণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার তরবারি ঘুরান ও উহা পুনরায় পূর্বাবস্থা হইতে উত্তম হইয়া যাওয়াকে তাহাদের সম্মিলিত হওয়া, বিজয় লাভ করা এবং তাহাদের সম্মিলিত শক্তি অর্জিত হওয়ার প্রতি ধারণা করা হইয়াছে। এই স্বপ্ন উহুদের যুদ্ধের সময় সংঘটিত হইয়াছিল।

মাওয়াহিবের মধ্যে অন্য একটি পরিষ্কার বিষয়ের হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি পবিত্র মক্কা হইতে এমন ভূমির দিকে হিজরত করিতেছি, যে স্থানে খেজুরের বাগান রহিয়াছে। তখন আমি ধারণা করিলাম যে, ইহা হয় ইয়ামামা হইবে, অথবা বানজার হইবে। কেননা, এই বস্তিসমূহের মধ্যে বহু খেজুরের বাগান বিদ্যমান রহিযাছে। ইহার পর বলিলেন যে, উহা ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারা হইবে। ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে, যাহা তাঁহাকে ছাড়া হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতেও এইরূপ আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি দেখিলাম যে, বুলেটপ্রুফ বর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি এবং গরু যবাহ্ করা হইতেছে। ইহাকে ঐ সকল ব্যক্তির সহিত তা'বীর করা হইয়াছে, যাহারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বিজয় ও ছাওয়াব দান করা এবং বিশ্বাস স্থাপন করাকে বদরের দিবস হইতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত জিহাদ ও যুদ্ধের উপর ধৈর্যধারণ করার সহিত তা'বীর করা হইয়াছে।

মিশকাত শরীফে হিজরতের বর্ণনা এবং হিজরতের স্থানকে গোপন রাখার কথা এবং ইয়াছরিব শহর স্থিরীকৃত হওয়া এবং তরবারি ঘুরান, উহা ধারশূন্য হওয়া, পুনরায় আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসা এই সকলকে হাদীসের মধ্যে একত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু গরু যবাহ্ করার কথা উক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয় নাই।

www.pathagar.com

তন্মধ্য হইতে একটি হইল, নবী করীম (সা) কর্তৃক স্বপ্নে কূপ দর্শন এবং উহা হইতে পানি উত্তোলন করা। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি এক কূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছি, উক্ত কূপের উপর একটি বালতি ছিল, আমি উহা দ্বারা এত পানি বাহির করিলাম, যতটুকু আল্লাহ্ চাহিয়াছেন, উহার পর ইব্ন আবী কুহাফা (রা) আগমন করেন। তিনিও উক্ত কূপ হইতে দুই-এক বালতি পানি উত্তোলন করেন। এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, আবূ বকর আগমন করেন তিনি আমার হাত হইতে বালতি লইয়া যান, যাহাতে আমি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারি। ইহার পর আমি ইহার চাইতে আশ্চর্য আর দেখি নাই যে, তিনি এইরূপ কাজ করিতে পারেন যে, এত বড় বিরাট বালতি পানি ভরিয়া উঠাইতে পারেন। তাহার পানি উত্তোলন করার মধ্যে বিশেষ ধরনের দুর্বলতাও ছিল। আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করুন, ইহার পর উমর (রা) আগমন করেন। আমি তাঁহার ন্যায় বীর, শক্তিশালী, কর্মঠ লোক আর কাহাকেও দেখি নাই যে, তাহার মত পানি উঠাইতে পারে। ইব্ন খাত্তাব এত পানি বাহির করিলেন যে, সকল মানুষ পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

এই হাদীসে হযরত উমর (রা)-এর প্রশংসায় নবী করীম (সা) 'আবকারী' (عبقرى) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি দলপতি, সম্মানিত এবং শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হন, তাহাকে 'আবকারী' বলা হইয়া থাকে। আসলে পরীস্থানকে 'আবকার' বলা হইয়া থাকে। আরববাসীরা প্রত্যেক ঐ বস্তুকে, চাই উহা মানুষ হউক অথবা বস্ত্র, ফরশ হউক অথবা আর অন্য কিছু , যখন উহা অত্যন্ত মযবূত ও সৌন্দর্যে ও পরিচ্ছন্নতায় উৎকৃষ্ট হয় তখন উহাকে আবকারী বলিয়া সম্বোধন করিযা থাকে।(সুরাহ্) এবং কামূসে আছে যে, আবকার ঐ স্থানকে বলা হয় যেখানে খুব বেশী জিন্ন বাস করে এবং উহাকে আবকারী বলা হয়, যাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং সর্দারকে এবং সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ও কঠোরকেও আবকারী বলা হয়।

এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, তাঁহারা বালতি উঠাইয়াছেন, এমনকি সমস্ত মানুষ পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। হাওয ভরিয়া গেল এবং পানি প্রবাহিত হইতে থাকে।

মাওয়াহিবের মধ্যে মাওয়াহিব রচয়িতা বলিয়াছেন যে, ইমাম নববী বলিয়াছেন যে, ইহা তাহাদের উদাহরণ মাত্র, যাহা কিছু ঐ দুই খলীফা হইতে দীনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সৎ নিদর্শনসমূহ বিকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদের তরফ হইতে মানবের যে কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমুদয়ই সায়্যিদে আলম (সা) হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য যে, নবী করীম (সা) হইলেন আদেশকর্তা। সুতরাং দীনের প্রতিষ্ঠা শেষে তিনি সর্বোপরি পরিপূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি সাব্যস্ত হইলেন এবং তিনিই দীনের নিয়ম কানুনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মিল্লাতের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় ও মযবূত বানাইয়াছেন। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন। এবং তিনি মুরতাদদের সহিত জিহাদ করেন এবং উহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন। উহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তিকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই। তাঁহার পর হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব ফারূকে আযম (রা) খলীফা হন। তখন তাহার বরকতময় মহান যুগে ইসলামের গণ্ডি সুপ্রশস্ত হয়। এই হিসাবে দীনে ইসলামের কর্মকে ঐ কূপের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে

www.pathagar.com

যাহার মধ্যে পানি বিদ্যমান ছিল। কেননা, তাহার জীবন এবং তাহার কর্মের শুদ্ধতা উহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আর নবী করীম (সা) কর্তৃক স্বীয় ইরশাদে এই কথা বলা যে, "আবূ বকর (রা) আমার নিকট হইতে বালতি লইয়া যায়। যাহাতে তিনি আমাকে আরাম দান করিতে পারেন।" ইহার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে, যাহা তাঁহার অন্তর্ধানের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য যে, পৃথিবীর কায়ক্লেশ হইতে মৃত্যু আরামদায়ক।

উম্মতের তদবীর এবং উহাদের সংশোধনের মাধ্যমে তিনি কর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার পানি উত্তোলনের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে, এই কথা বলার মধ্যে তাহার শাসনকালের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ, তিনি নবী করীম (সা)-এর পর মাত্র দুই বৎসর কয়েক মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ইহার পর হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাসন কাল আরম্ভ হয়। যেহেতু তাহার খিলাফত দীর্ঘকাল বলবৎ থাকে এই জন্য লোকদের তাহার নিকট হইতে উপকৃত হইবার অত্যন্ত সুযোগ হয় এবং ইসলামী সীমানার বিরাট প্রশস্ততা লাভ হয়, বহু রাজ্য ও শহর বিজিত হয়। তিনি সরকারী কর্ম পরিচালনায় দফতরী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁহার বেলায় নবী করীম (সা)-এর ইরশাদের মধ্যে দুর্বলতার আভাস নাই। বরং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই সকল ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে এক বর্ণনা আছে, যাহাকে ইমাম মুসলিম (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, অদ্য রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, উকবা ইব্ন রাফি' (রা)-এর গৃহ হইতে ইব্ন তাব খেজুরের একটি তশ্‌তরী সাহাবীগণের সম্মুখে আনিয়া রাখা হইয়াছে। হযরত উকবা ইব্ন রাফে' (রা) একজন সাহাবী ছিলেন, ইনি হযরত উমর ইব্ন আস (রা)-এর খালাত ভাই হইতেন। তরতাজা সজীব খেজুরের এক প্রকারকে 'ইব্ন তাব' বলা হয়। ইব্ন তাব নামক এক ব্যক্তি ছিল। ইহাতে তাহার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হয় সে বপন করিয়াছিল, অথবা সে ইহাকে পসন্দ করিত। এই হিসাবে ইহাকে ইব্ন তাব খেজুর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত। প্রত্যুষে নবী করীম (সা) ইহার ব্যাখ্যা দান করেন যে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহার মঙ্গল হইবে। এই অর্থের হিসাবে তাহার নাম উক্‌বা (পরকাল) শব্দ হইতে লওয়া হইয়াছে। জামিউল উসূল" নামক কিতাবে মুসলিম-এর হাদীস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার উন্নতি ও সুস্থতা সঠিক ছিল এবং রিফআত (رفعت)-এর অর্থ উন্নতি রাফে' (رافع) শব্দ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর যে দীন তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার তাহার পক্ষ হইতে মধুর ও পসন্দনীয় হইয়াছিল এবং এই মর্মার্থই ইব্ন তাবের তরতাজা খেজুর হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

এই সমুদয় স্বপ্নই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং দেখিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা গোপন না থাকা উচিত যে, নবী করীম (সা)-এর ব্যাখ্যা শুধু গবেষণা এবং সম্বন্ধমূলক নয়। যেমন বর্ণিত হইয়াছে। আর না ব্যাখ্যাদাতাদের মত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত, যেরূপ তাহাদের অভ্যাস হইয়া থাকে। বরং ইহা সকলই ওহী এবং ইলহামের মাধ্যমে

www.pathagar.com

হইত। তবে যদি ইহার মধ্যে কোন সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, উহা অসম্ভব কিছু নয়।

যেমন ইব্‌ন তাবের তরতাজা খেজুরের (رطب ابن طاب) এই হাদীসে উহার নামের অর্থ বাহির করিয়া উহার ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, নাম হইতে অর্থ গ্রহণ করতঃ ফল বাহির করিতেন। যেমন হযরত বারীদা আসলামী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, তিনি হিজরতের সময় মদীনার রাস্তায় নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আসিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি বলিলেন, 'বরীদা'। তিনি বলিলেন بَرَدَ اَمْرُنَا আমাদের অবস্থা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার প্রতি তোমার সম্বন্ধ ? তিনি বলিলেন, اَسْلَمِىْ আসলামীর সহিত। তিনি বলিলেন سَلِمَ اَمْرُنَا আমাদের কর্ম সঠিক ও নিরাপদ হইয়াছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আস্‌লামী ? তিনি বলিলেন, বনী সাহম হইতে, অর্থাৎ সাহমের সন্তানগণের মধ্য হইতে (সাহমের অর্থ তীর)। বলিলেন اَصَبْتَ سَهْمَكَ। তোমার তীর ঠিক স্থানেই পৌঁছিয়াছে, ইত্যাদি।

অনুরূপ তরবারির ব্যাখ্যা মু'মিন-এর সহিত করিয়াছেন। অথচ ব্যাখ্যাদানকারীদের নিকট শামশীরের আরও ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যথা সন্তান, ভাই, বিবি, ভাষা, এবং জন্ম ইত্যাদি। যেমন কুরতুবী এই সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহাবীগণের স্বপ্ন এবং নবী করীম (সা) কর্তৃক উহার ব্যাখ্যাদান

প্রথমতঃ যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং যে সকল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ঐ সকল স্বপ্নের বর্ণনা ছিল। কিন্তু যে সকল স্বপ্ন সাহাবা-ই কিরাম দেখিয়াছেন এবং নবী আকরাম (সা) উহার ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। উহা বহু ছিল। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, ফজরের নামাযের পর সাহাবা-ই-কিরামের প্রতি পবিত্র নূরানী চেহারা ফিরাইয়া বলিতেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অদ্য রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ উহা আমার সম্মুখে বর্ণনা করা হউক, যাহাতে তাহাকে আমি উহার ব্যাখ্যা দান করিতে পারি। যদি কেহ কিছু বর্ণনা না করিতেন, তো স্বয়ং নবী করীম (সা) যাহা কিছু দেখিতেন উহা বর্ণনা করিতেন। বস্তুতঃ অভ্যাস অনুযায়ী এক সকালে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ ? সকলেই বলিলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে কেহই কোন স্বপ্ন দেখে নাই। বলিলেন কিন্তু আমি অদ্য রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করিয়াছে এবং উভয়ে আমার হস্ত ধারণ করতঃ আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে লইয়া চলিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। উক্ত ব্যক্তি বসা অবস্থায় ছিল এবং অপর এক ব্যক্তি দাঁড়ান অবস্থায় ছিল এবং তাহার হস্তে লৌহগদা ছিল। উক্ত ব্যক্তি লৌহগদা বগলের তলদেশ হইতে বাহির করিতেছিল এবং বসিয়া থাকা ব্যক্তির মুখের উপর উহা মারিতেছিল এবং উক্ত লৌহগদা উহার মাথার পিছনের হাড় পর্যন্ত যাইয়া লাগিত। কিন্তু যখন লৌহগদা উঠাইয়া লইত, তখন উক্ত মুখ পুনরায় সঠিক ও সুস্থ হইয়া যাইত। তারপর সে পুনরায় লৌহগদা মারিত, প্রত্যেক বারই এইরূপ করা হইত। আমি আমার সাথীদ্বয়কে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহা কি ? তাহারা বলিলেন, চলুন, অর্থাৎ এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আরও জিনিস দেখিবার রহিয়া গিয়াছে। তারপর আমরা চলিতে থাকিলাম। ইহার পর আমরা এক ব্যক্তির পাশ দিয়া অতিক্রম করিলাম। সে ব্যক্তি পার্শ্বের উপর কাত হইয়া শায়িত ছিল এবং আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার হাতে পাথর ছিল, যাহা দ্বারা সে উহার মাথা পিষ্ট করিতেছিল। যখন সে পাথর মারিত, তখন উহা মাথার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত, যখন সে পাথর উঠাইয়া লইত, তখন উহার মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হইয়া যাইত এবং স্ব-অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। তারপর সে পুনরায় মাথায় পাথর নিক্ষেপ করিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। তখন আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। যাইতে যাইতে তনুরের চুলার ন্যায় একটি গর্তের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম যাহার মুখ ছোট, পেট প্রশস্ত। উহার মধ্যে বহু উলঙ্গ পুরুষ ও নারী বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের নিচে আগুন জ্বলিতেছিল। যখন আগুন উৎক্ষিপ্ত হইত, তখন ঐ পুরুষ ও নারীগুলি আগুনের উপর উঠিয়া আসিত। এমনকি বাহির হইয়া আসার উপক্রম হইত এবং যখন আগুন ঠাণ্ডা হওয়ার উপক্রম হইত তখন উহাকে আবার উত্তপ্ত করা হইত। আমি বলিলাম, ইহা কি ? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে থাকিলাম, এমনকি এক রক্তের নদীর নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। উহার মধ্যভাগে কিছু লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং উক্ত নদীর তীরে কিছু লোক রহিয়াছে এবং তাহাদের সম্মুখে পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেহ নদীর মধ্য হইতে স্বীয় মুখ উঠায়া তথা হইতে তীরের দিকে বাহির হইয়া আসিতে চায় তীরবর্তী দাঁড়ান লোকেরা উহাদের মুখের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। তখন উহারা ঐ স্থানে ফিরিয়া যায়। যে কেহ এইরূপ বাহির হইয়া আসার চেষ্টা করে, উহার মুখের উপর পাথর মারা হয় এবং ঐ স্থানেই ফিরিয়া যায়, যেখানে সে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে থাকিলাম, এমনকি আমরা এক সবুজ চারণভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম– যেখানে এক বিরাট বৃক্ষ রহিয়াছে এবং উহার গোড়ায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার সন্নিকট কতিপয় শিশু রহিয়াছে। আর তথায় বৃক্ষের নিকট এক ব্যক্তি রহিয়াছে, সে তাহার অগ্রে আগুন জ্বালাইতেছিল। তারপর তাহারা উভয়েই আমাকে উক্ত বৃক্ষের উপরে লইয়া গেলেন এবং এক গৃহে প্রবেশ করাইলেন। উহা উক্ত বৃক্ষের মধ্যেই ছিল। আমি ইহার চেয়ে উত্তম ঘর কখনও দেখি নাই। উহার মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, নারী এবং বহু শিশু রহিয়াছে। তারপর আমাকে তথা হইতে উহার উপরের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। উক্ত গৃহ প্রথম গৃহের চাইতে বিশাল, উত্তম এবং সুন্দর ছিল। উহার মধ্যেও বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল। তারপর আমি ঐ সাথীদ্বয়কে বলিলাম, অদ্য রাত্রে আমাকে তোমরা বহু স্থানে ভ্রমণ করাইলে। এখন আমাকে যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি উহার বর্ণনা দান কর। তাহারা বলিলেন যে, হাঁ আমরা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহারা বর্ণনা আরম্ভ করিলেন যে, ঐ ব্যক্তি যাহার মুখকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হইতেছিল, সে মিথ্যাবাদী ছিল, মিথ্যা কথা বানাইত এবং উহার নিকট হইতে বিবৃত হইয়া উহা সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িত। উহার সহিত যাহা কিছু ব্যবহার করা হইতেছে উহা আপনি দেখিয়াছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি এইরূপই হইতে থাকিবে এবং ঐ ব্যক্তি যাহার মস্তক চুরমার করিতে দেখিয়াছেন, সে ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলেন

www.pathagar.com

এবং সে রাত্রিকালে কুরআন হইতে গাফেল হইয়া শয়ন করিয়াছে এবং কুরআনকে পাঠ করে নাই এবং রাত্রের নামাযের জন্য উঠে নাই এবং সে দিনে কুরআন পাঠ করিত, কিন্তু তদনুরূপ কার্য করিত না। তাই যাহা কিছু আপনি দেখিয়াছেন উহা কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ হইতে থাকিবে। এবং যে সকল লোককে আপনি তনুর (চুলা)-এর মধ্যে পতিত অবস্থায় দেখিয়াছেন, উহারা ব্যভিচারী এবং যে সকল ব্যক্তিকে আপনি রক্তের নদীর মধ্যে হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াছেন, উহারা সুদখোর ছিল।

আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে আপনি এক বিরাট বৃক্ষের নিচে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনি হইলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ। আর যে সকল শিশু তাহার পাশে ছিল, উহারা তাঁহার সন্তান এবং যাহাকে আপনি অগ্নি উত্তপ্ত করিতে দেখিয়াছেন উনি হইলেন মালিক এবং জাহান্নামের দারোগা এবং যে গৃহ আপনি প্রথম দেখিয়াছেন উহা সাধারণ মুসলমানের স্থান। আর যে গৃহ উহার উপর দেখিয়াছেন উহা শহীদদের স্থান এবং আমরা হইলাম জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)। ইহার পর তাহারা বলিলেন যে, আপনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করুন। আমি স্বীয় শির উত্তোলন করিলাম তো মেঘমালার মত এক বস্তু দেখিতে পাইলাম। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, বাদলের ন্যায় শুভ্র বস্তু হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইতেছিল। তাহারা বলিলেন, ইহা আপনার গৃহ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি স্বীয় গৃহে চলিয়া যাই। তাহারা বলিলেন, এখনও আপনার পার্থিব জীবন বাকী রহিয়াছে, উহা শেষ হয় নাই। যখন আপনার বয়স পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আপনি আপনার মনযিলে তাশরীফ লইয়া আসিবেন। ইহাকে ইমাম বুখারী রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এবং বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে কিছু অতিরিক্ত রহিয়াছে। এই উভয় রিওয়ায়াতেই মিশকাত শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বপ্নের তা'বীর ও ব্যাখ্যার ধারবাহিকতার ক্ষেত্রে বড় আশ্চর্য অভিনব রিওয়ায়াত হইল এই যে, যুরারা ইব্ন উমর ইব্ন নখঈ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নাখা'-এর প্রতিনিধি দলের সহিত আগমন করেন। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আসার সময় পথের মধ্যে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, আমার গর্ভবতী যাহাকে আমি আমার গোত্রের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি, কাল ও সাদা রং বিশিষ্ট একটি বকরীর বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) ফরমাইলেন তোমার কি কোন দাসি আছে যাহাকে তুমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছ এবং সে গর্ভবতী হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, জী হাঁ ! গৃহে এক দাসী আছে, তাহার সম্পর্কে আমার ধারণা, হয়ত সে গর্ভধারণ করিয়াছে। নবী করীম (সা) ফরমাইলেন নিশ্চয় সেই দাসি সন্তান প্রসব করিবে, এবং উহা তোমার পুত্র হইবে যাররা বলিলেন তাহা হইল কালা ও সাদা রং-এর সন্তান প্রসাব করার কি অর্থ ? নবী করীম (সা) বলিলেন, আমার নিকটবর্তী হও। আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম। বলিলেন, তোমার শরীরে কি শ্বেতীর দাগ আছে ? যাহা তুমি লোকচক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখ। আমি বলিলাম, জি হা! সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, উক্ত শ্বেতীর দাগ আমি ব্যতীত আর কেহ দেখে নাই এবং আর না অন্য কেহ তৎসম্পর্কে জ্ঞাত আছে। বলিলেন, এই বাচ্চার শরীরে কাল ও সাদা রং তোমার শ্বেতীর কারণে দেখা দিয়াছে।

www.pathagar.com

ইহার পর যুরারা (রা) বলেন যে, আমি নু'মান ইব্ন মুনযিরকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। এই নু'মান ইব্ন মুনযির কিসরার (পারস্য সম্রাট নওশেরওয়া) সময় আরবের বাদশাহদের মধ্য হইতে এক বাদশাহ ছিলেন। আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাহার দুই কর্ণে দুল, দুই বাযুতে বাযুবন্ধ এবং কংকণ রহিয়াছে। অথচ এইগুলি হইল নারীদের গহনা। বলিলেন, ইহা আরব দেশ, যাহা একদিন সাজসজ্জায়, সৌন্দর্যে ও চাকচিক্যে স্বীয় পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। ইহার পর যুরারা (রা) বলিলেন যে, আমি আরও এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। উহা এই যে, এক বৃদ্ধ যাহার চুল সাদা ও কাল মিশ্রিত এবং সে মাটি হইতে বাহির হইতেছে। বলিলেন, ইহা দুনিয়ার উপমা। ইহার পর আরও একটি স্বপ্ন তিনি পেশ করিলেন। তাহা এই যে, আমি মাটি হইতে একটি আগুন বাহির হইতে দেখিয়াছি এবং উক্ত আগুন আমার ও আমার পুত্রের যাহার নাম আমর মাঝখানে আড়াল হইয়া গেল এবং দেখিলাম যে, উক্ত আগুন লাযা, লাযা বলিতেছিল। লাযা আগুনের আবর্তকে বলা হয় এবং দোযখের নামও লাযা। উক্ত অগ্নি বলিতেছিল যে, আমি চক্ষুষ্মান ও অন্ধ সকলকেই ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি তোমাকে, তোমার সহিত যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহাদিগকে এবং তোমার ধনসম্পদকে ভক্ষণ করিব। বলিলেন, উক্ত আগুন এক ফেতনা হইবে যাহা শেষ যমানায় প্রকাশ পাইবে। যুরারা (রা) বলিলেন, সেই ফেত্না কি এবং উহারা কাহারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন, উহারা অকস্মাৎ তাহাদের ইমাম (নেতা)-কে ধ্বংস করিবে। উহার পর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে এবং উহারা মাথার হাড়ের জোড়ার ন্যায় সম্মিলিতাবস্থায় বাহির হইবে। ইহা দ্বারা পরস্পরে হাতে হাত মিলাইয়া ফসাদ করিবে, তৎপ্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। তারপর নবী করীম (সা) পবিত্র হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলির ফাঁকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরস্পরে মিলিত করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, ঐ সময় ফেত্না-ফাসাদকারী লোকেরা এই ধারণা করিবে যে, উহারা নেকীর কর্ম করিতেছে। উদ্দেশ্য হইল এই যে, বদী সংমিশ্রিত হইয়া যাইবে এব উহারা উহাকে নেকী মনে করিবে। ঐ সময় মুসলমানদের রক্ত মুসলমানদের জন্য মিঠা পানির চেয়েও সুস্বাদু হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইল হত্যা ও লুটতরাজের বাজার গরম হইয়া যাইবে।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, হযরত যুরারা (রা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা নুবুওয়াতের দীপ শিখা হইতে দেওয়া হইয়াছে। তৎপ্রতি চিন্তা করা উচিত যে, ইহা কিরূপ সত্যের অনুপম মধুরতায় পরিপূর্ণ এবং সত্যের চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ওহীর জ্যোতির দ্বারা সুসজ্জিত। এই ব্যাখ্যা হইতে প্রকাশ হইয়া যায় যে, নবী করীম (সা)-এর ব্যাখ্যা শুধু সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য ধরিয়া এবং অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হয় নাই। যদি ঐভাবেও হইত, তবু উহা ঘটনার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কংকণের ব্যাখ্যায় নবী (সা) বলিয়াছিলেন যে, আরব দেশ স্বীয় সাজসজ্জার দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবে। আর এই কথা পূর্বে চলিয়া গিয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ নিজ হস্তে কংকণ পরিহিতাবস্থায় দেখিয়াছেন তখন তিনি উহাকে অপসন্দ ও ঘৃণা করিয়াছেন। উহার উত্তর এই যে, নুমান ইব্ন মুনযির পারস্য সম্রাট কিসরার পক্ষ হইতে আরবের বাদশাহ ছিল, সে কিসরার বাদশাহগণকে এবং দেশের শাসনকর্তাগণকে কংকণ পরিধান করাইত এবং গহনা দিয়া

www.pathagar.com

সুসজ্জিত করিত এবং কংকণ নুমানের পোশাক ছিল এইজন্য যে, উহা বিশ্রী ও নিন্দনীয় ছিল না এবং না উহাকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অস্থানে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু নবী করীম (সা) তাহার প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বর্ণের পোশাককে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা তো এমন স্থান ছিল। যাহা নবী করীম (সা)-কে চিন্তাযুক্ত করিয়া দেয়। কেননা, ইহা তাহার পোশাকের মধ্য হইতে ছিল না। এই হিসাবে ইহা হইতে কোন বস্তুকে অস্থানে রাখা-এর সহিত দলীল আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে উহা চলিয়া যাওয়া এবং উড়িয়া যাওয়াকে পসন্দ করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম (সহীহায়ন) শরীফে হযরত কায়স ইব্‌ন আব্বাদ হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনার মসজিদে নববীর এক হলকার মধ্যে বসিয়াছিলাম, তথায় হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম অতিক্রম করেন এবং এক রিওয়ায়াতে আছে যে, এক ব্যক্তি প্রবেশ করে, যাহার চেহারায় খোদাভীতির নিদর্শন বিরাজ করিতেছিল। তখন যে দল বসিয়াছিলেন তাহারা বলিলেন যে, এই ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মধ্য হইতে হইবে। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) দুই রাকাআত নামায আদায় করতঃ খুব তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া আসেন। আমি তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে বলিলাম যে, যখন আপনি মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন ঐ দলের লোকেরা বলিতেছিল যে, এই ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মধ্য হইতে একজন হইবেন। তিনি বলিলেন যে, কাহারও এইরূপ কথা বলা শোভা পায় না। যৎসম্পর্কে তাহার কোন কিছু জানা নাই। অপর এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, বলিয়াছেন যে, কাহারও এই রূপ কথা বলা উচিত নয় যৎসম্পর্কে তাহার নিকট কোন কিছু জানা নাই। তাহাদের এই কথা বলা বিনয় প্রদর্শন এবং আত্মপ্রশংসা ও অহংকার-এর ভয়ের দরুন ছিল এবং এই ভয়ের দরুণও যে অঙ্গুলি দ্বারা কেহ তাহার প্রতি ইশারা না করিয়া বসে। উদ্দেশ্য হইল এই যে, আমি অবগত নই যে, তাহাদের ঐ কথার জ্ঞান কোথা হইতে হইয়াছে, যাহা ঐ মর্ম ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে এক বস্তু, উহা হইল এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক যামানায় এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, এক সবুজ ও প্রশস্ত ও বিশাল চারণভূমি উহার মধ্যে লৌহ খাম্বা রহিয়াছে। যাহার নিম্নাংশ মাটির মধ্যে এবং উপরিভাগ আকাশে এবং উহার উপর একটি উরওয়া' রহিয়াছে। উরওয়া ঐ শক্ত রশিকে বলা হয়, যাহা দ্বারা বড় বড় বালতি দিয়া পানি উঠান হইয়া থাকে এবং কোন কিছুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকাকেও উরওয়া বলা হইয়া থাকে। তারপর আমাকে বলা হয় উপরে আরোহণ কর। আমি বলিলাম, আমার মধ্যে এই শক্তি নাই যে, আরোহণ করিতে পারিব। তারপর আমার জন্য এক সাহায্যকারী প্রকাশিত হইল। সে পিছন হইতে আমার কাপড় ধারণ করিল এবং আমি খাম্বার উপরিভাগে পৌঁছিয়া গেলাম এবং উরওয়া (রশি)-কে ধারণ করিলাম। তখন আমাকে বলা হইল যে, ওরওয়া (রশি)-কে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিও। তারপর আমি জাগিয়া উঠিলাম অথচ উরওয়া আমার হস্তে ছিল। ইহার পর আমি আমার স্বপ্নকে রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, উক্ত সবুজ চারণভূমি হইল ইসলাম এবং ঐ খাম্বা হইল ইসলামের রুকন, আর ঐ উরওয়া হইল, ওরওয়া উছকা অর্থাৎ মজবুত রশী। এবং তুমি এই অবস্থার মধ্য দিয়া অর্ন্তধান করিবে যে,

www.pathagar.com

মযবূত রশিকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকিবে। নবী করীম (সা)-এর এই ইরশাদে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ বাক্যের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে- فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى অতঃপর যে কেহ শয়তানকে অস্বীকার করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে, সে উরওয়া উছকা অর্থাৎ মযবূত রশিকে শক্ত হস্তে ধারণ করিয়াছে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল, উঠ এবং আমার হস্ত ধারণ কর। তারপর আমি তাহার সহিত চলিয়া আসিলাম। উত্তর দিকে এক রাস্তা সম্মুখে পড়িল। আমি উক্ত রাস্তার দিকে যাইতে চাহিলাম। সে আমাকে বলিল, ঐদিকে যাইও না। এই রাস্তা বামপন্থীদের রাস্তা এবং তুমি উহাদের মধ্য হইতে নও। সম্মুখে তারপর এক রাস্তা দক্ষিণ দিকে দেখিতে পাইলাম। ঐ সময়ে সে বলিল, এই রাস্তাকে ধারণ কর। তারপর আমি একটি পাহাড় দেখিতে পাইলাম। সে বলে যে, ইহার উপর আরোহণ কর। আমি উহার উপর আরোহণ করিতে চাহিলাম, কিন্তু যখনই আরোহণ করার চেষ্ট করিতাম নিচে পড়িয়া যাইতাম। আমি চড়িতে পারিলাম না। যখন আমি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে, উক্ত সময় হাশরের সময় এবং ঐ পাহাড় শাহাদতের স্তর, তুমি শাহাদতের স্তর প্রাপ্ত হইবে না।

উলামাকিরাম বলেন যে, নবী করীম (সা)-এর নুবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের এবং গাইবী সংবাদসমূহের মধ্য হইতে ইহা এক নিদর্শন। এই জন্য যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) শহীদ হইয়া ইন্তিকাল করেন নাই। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর বাদশাহীর প্রথম যুগে পবিত্র মদীনায় স্বগৃহে ইন্তিকাল করেন।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, নবী করীম (সা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য হইতে এই এক অংশ নমুনা হিসাবে দেওয়া হইল। নতুবা তাঁহার যে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিশ্লেষণ বর্ণিত আছে, উহা তো কয়েক খণ্ডেও সংকুলান হইবে না। আর যখন তুমি চিন্তা ও গবেষণা করিবে, তখন জানিতে পারিবে প্রত্যেক ঐ কারামত যাহা তাহার উম্মত কাহাকেও দান করা হইয়াছে, চাই উহা বিদ্যা হউক অথবা কর্ম, উহা সকলই নবী করীম (সা)-এরই মু'জিযার নিদর্শন এবং বিশ্বাসের বরকতের মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং তাঁহার হিদায়াতের পন্থ অনুযায়ী হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার ফলশ্রুতির মধ্যে গণ্য হইবে এবং সত্য ও সঠিক রূপে এবং আশ্চর্য, অলৌকিক সমুদ্রের বুদবুদের ন্যায় পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যদি তুমি শুধু ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের ঘটনাগুলিই একত্রিত কর তো যাহা কিছু তাহাকে দান করা হইয়াছে এবং তিনি যে সকল সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন এবং যেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুখ্যাত এবং উহা দ্বারা লোকের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ঐ গুলিকে নিজের সম্মুখে রাখ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, রাসূলে আকরাম (সা)-কে যাহা কিছু জ্ঞান ও বিজ্ঞান দান করা হইয়াছিল, তাহাকে না ভাষা, পরিবেষ্টন করা সম্ভব। আর না ঐ সকল সূক্ষ্ম ইশারার ভেদ-রহস্য ও মূল তত্ত্বের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। অথচ ইব্ন সীরীন একজন উম্মতমাত্র ছিলেন এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র যাহা কিছু তাহার নিকট হইতে বর্ণিত আছে। উহাও সীমা ও সংখ্যার বাহিরে। তাহা হইলে রাসূলে আকরাম (সা)-এর যে কত বড় উচ্চস্থান, উহা কেহ কি অনুমান করিতে পারিবে ?

www.pathagar.com

স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করার কারণ

বুখারী এবং তিরমিযী হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সামুরা বলেন, রাসূলে করীম (সা) তাঁহার সাহাবাদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বপ্ন দেখিয়াছ ? সাহাবাদের মধ্যে যাঁহারা স্বপ্ন দেখিতেন তাঁহাকে তাহা ব্যক্ত করিতেন। তখন নবী (সা) সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা অর্থাৎ তা'বীর বলিয়া দিতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবী (সা) স্বপ্নের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করার ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তিরমিযী ও আবূ দাঊদ উল্লিখিত হযরত আবূ বাকর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসই এর কারণ। হাদীসটি এই যে, মহানবী (সা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বপ্ন দেখিয়াছ ? একজন আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি দেখিয়াছি যে, আকাশ হইতে একটি দাঁড়িপাল্লা অবতরণ করিল, তাহাতে আপনাকে ও হযরত আবূ বকর (রা)-কে ওযন করা হইলে আপনি বেশী ভারী প্রমাণিত হইলেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমরকে (রা) ওযন করা হইলে হযরত আবূ বাকর (রা) বেশী ভারী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) এবং উসমানকে (রা) ওযন করা হইলে হযরত উমর (রা) বেশী ভারী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। অতঃপর দাঁড়িপাল্লা উপরের দিকে তুলিয়া লওয়া হইল। এই স্বপ্নের বিবরণে নবী (সা) অপ্রস্তুত বোধ করিলেন। তাহার অনিন্দ্য চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটিয়া উঠিল। তারপর হইতে নবী (সা) আর কাহাকেও স্বপ্ন সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই।

উলামায়ে কিরামের মতে নবী (সা)-এর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ ছিল এই যে, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের গোপনীয় বিষয়গুলো নবী (সা) অবহিত ছিলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে সেই গোপনীয়তা প্রকাশ হইয়া পড়িলে একের উপর অন্যের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল অথচ ইহা প্রকাশ পাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিশেষ রহস্য লুক্কায়িত ছিল। আল-মাওয়াহিবে এইরূপই উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে স্বপ্ন যদিও সত্য, তবু তাহা প্রকাশ পাওয়া সমীচীন নয়। কারণ, প্রকাশ পাইলে সবকিছু জানাজানি হইয়া যায়। নবী করীম (সা) যদিও কোন কোন সাহাবীকে কোন কোন সাহাবীর উপর প্রাধান্য দিতেন বিশেষতঃ আবূ বকর (রা) এবং উমরকে (রা) বিশেষ প্রাধান্য দিতেন, তবু উল্লিখিত স্বপ্ন বর্ণনা তাঁদের খেলাফতে হস্তক্ষেপ এবং তাঁদের প্রাধান্য ও হেয় করারই শামিল ছিল। এই কারণে মিশকাত শরীফে উল্লিখিত আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে সংযোজন করা হইয়াছে যে, خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اَحَدُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ। অর্থাৎ ইহা নুবুওয়াতের খিলাফত ও প্রতিনিধিত্ব, ইহার পর কোন বাদশাহ আসিবেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন। 'শারহুস্-সুন্নাহ-তে' লেখা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) দাঁড়িপাল্লা তুলিয়া নেওয়া দ্বারা খিলাফত হইতে রাজতন্ত্র প্রবর্তনের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়াছেন। উল্লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্তে হযরত উমর (রা) হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের সময়ে গোলযোগ ও অশান্তির আভাস রহিয়াছে। হযরত আলী (রা)-এর পর খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। মাজমাউল বিহার-এ এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। (আসল ব্যাপার আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত।)

www.pathagar.com

কাহারও কাহারও মতে উল্লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্তে নবী (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল এই যে, মীযান বা দাঁড়িপাল্লা উঠিয়া যাওয়া মানে হযরত উমরের (রা) খেলাফতের পর দীন বিষয়ক কার্যক্রমের মর্যাদা কমিয়া যাওয়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেননা, কাছাকাছি ওযনের দুইটি জিনিসের মধ্যেই দাঁড়িপাল্লার ওযনে তুলনা নির্ণয় করা যায়। যদি পার্থক্য খুব বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে তুলনা করা সম্ভব হয় না। হাদীসের ব্যাখ্যায় এইরূপই বলা হইয়াছে। (আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত)

ইব্ন কুতায়বা বর্ণনা করেন যে, নবী করীমের (সা) স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করার কারণ ইব্ন রামালের বর্ণিত একটি হাদীস। ইব্ন রামাল বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) ফজরের নামাযের পর হাঁটু মুড়িয়া থাকিতেন এবং সত্তর বার এই তাসবীহ পাঠ করিতেন এবং বলিতেন যে, "ইহাতে সাতশতবার পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়। তাসবীহটি এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন নিজের অজ্ঞাতে সাত শতাধিক পাপ করে। উপরোক্ত তসবীহ্ পাঠ করার পর নবী (সা) সমবেত মুসল্লীদের প্রতি ফিরিয়া বলিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ্ কি স্বপ্ন দেখিয়াছ ? ইব্ন রামাল বলেন যে, "আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, একদিন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।" নবী (সা) বলিলেন, خَيْرٌ تَلَقَّاهُ وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِاَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। অতঃপর বলিলেন, "এবার তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর।"

ইব্ন রামাল বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, সকল মানুষ প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে তাহারা এক বিরাট চারণভূমিতে গিয়া পৌঁছিল। সেই চারণভূমির মতো চারণভূমি কেহ কখনও দেখে নাই। চারণভূমি হইতে এমন সজীবতা ও সতেজতা ঝরিয়া পড়িতেছিল যেন বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে। সেই চারণভূমিতে নানা রকম ফুল ফুটিয়া আছে। আমি তাহা দেখিয়া পুলকিতবোধ করিলাম, জনগণও খুশী হইল। তাহারা আগেই সেখানে পৌঁছিয়াছিল। চারণভূমির সৌন্দর্যে প্রভাবিত হইয়া সবাই আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি প্রদান করিল এবং বিস্ময় প্রকাশ করিল। অতঃপর আগে আগমনকারী লোকেরা মনজিলের পথে রওয়ানা হইল। তাহারা ডাইনে-বামের পথে না গিয়ে সোজা রাজপথ ধরিয়া চলিল। তারপর দ্বিতীয় কাফেলা আসিল। এই কাফেলায় লোকসংখ্যা ছিল পূর্বের চাইতে বেশী। ইহারাও চারণভূমির সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল, আল্লাহু আকবার ধ্বনি প্রদান করিল এবং শেষে আপন মনযিল অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু এই কাফেলার কিছু লোক নিজেদের ঘোড়া চারণভূমিতে চরাইল এবং যাওয়ার পথে বেশ কিছু ঘাস-পাতা বোঝা বাঁধিয়া লইল এবং চারণভূমিকে বিধ্বস্ত অবস্থায় রাখিয়া গেল। অতঃপর ইহার চাইতেও বড় একটি কাফেলা আসিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল পূর্বোক্তদের চাইতেও অধিক। ইহারা চারণভূমির সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং উচ্চস্বরে তাকবীরধ্বনি করিয়া বলিল, ইহাতো বড় চমৎকার মনযিল! অর্থাৎ এখানে অবস্থান করা এবং ইহাকে মনযিল নির্ধারণ করা খুবই উত্তম হইবে। অতঃপর তাহারা মুগ্ধ বিভোর হইয়া চারণভূমির চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার পর আমি আর সেখানে থাকিলাম না, নিজের পথে অগ্রসর হইলাম। চারণভূমির শেষ প্রান্তে গিয়া অকস্মাৎ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি সাত সোপান বিশিষ্ট একটি মিম্বরের সর্বোচ্চ সোপানে রহিয়াছেন। আপনার ডানপাশে গমের রং বিশিষ্ট খাঁড়া নাসিকার একজন লোক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কথা বলিবার সময় উঁচু হইয়া

www.pathagar.com

যান, অন্য সবার চাইতে তাঁহার উচ্চতা পরিদৃষ্ট হয়। আপনার বাম পাশে একজন মাঝারি গড়নের বা আকৃতির লোক রহিয়াছেন। তাঁহার চেহারায় একটি লাল তিল দেখিলাম। তিনি কথা বলিবার সময়ে আপনি সসম্মানে মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করেন। আপনার মিম্বরের সামনে একজন বৃদ্ধ লোক রহিয়াছেন, আপনি যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতেছেন। তাহার সামনে একটি বয়স্ক দুর্বল উষ্ট্র রহিয়াছে, মনে হইল আপনি যেন সেই উষ্ট্রকে চালাইতেছেন এবং হাঁকাইয়া নিতেছেন।

ইব্‌ন রামালের বর্ণিত এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করার পর নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক কিছুক্ষণের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় বাহিরে আসিলেন যেন তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইয়াছে। কিছুক্ষণ পর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে শুরু করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যেই সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ দেখিয়াছ তাহা হইল সিরাতুল্ মুস্তাকীম। অর্থাৎ সরল সত্য পথ। যেই পথ ধরিয়া তুমি চলিয়াছ। তুমি যেই চারণভূমি দেখিয়াছ তাহা হইল পৃথিবী, সজীবতা ও সতেজতা হইল সেই পৃথিবীর আরাম-আয়েশ, সুখ-সম্পদ। পৃথিবীর সহিত যাহা আমাদের প্রদান করা হইয়াছে অথচ আমরা তাহা চাহিনা এবং সেও আমাদের চাহে না। অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাফেলার কথা শোন। এই সময় মহানবী (সা) বলিলেন, اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ইহা আমরা বিপদের সময় পাঠ করিয়া থাকি। সেই দ্বিতীয় কাফেলা পৃথিবীর শান-শওকত এবং সুখ-সম্পদে বিভোর হইয়া নানা বিশৃঙ্খলায় জড়াইয়া পড়িয়াছে। বাদশাহ ও আমীর-উমারা যাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু হে ইব্‌ন রামাল! তুমি সরল সত্য সুন্দর কল্যাণের পথে রহিয়াছ। সব সময় থাকিবে এবং এই অবস্থায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করিবে, যেই সম্পর্কে তুমি বলিয়াছ যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি আপনার সহিত রহিয়াছি।

এইবার শোন সাত সোপান বিশিষ্ট মিম্বরের কথা। উহা হইল পৃথিবী। পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর, আমি সর্বশেষ হাজারে আসিয়াছি, যাহার সোপান সবচেয়ে উচ্চ। লম্বাটে গড়নের আকৃতির যে গমের রং বিশিষ্ট যাহাকে তুমি দেখিয়াছ তিনি মূসা আলায়হিস্ সালাম। আমি যে তাঁহাকে এতো সম্মান করিতেছিলাম তাহার কারণ হইল, মহান আল্লাহ্‌র সহিত তাহার বাক-বিনিময়ের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। মাঝারি গড়নের মোটা আকৃতির চেহারায় তিলবিশিষ্ট যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন ঈসা আলায়হিস্ সালাম। আমি যে তাঁহাকে এতো সম্মান করিতেছিলাম তাহার কারণ হইল, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। যেই বৃদ্ধকে দেখিয়াছ যে, আমি যেন তাঁহাকে আনুগত্য করিতেছি তিনি হইলেন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম। আর আমাকে যেই দুর্বল বৃদ্ধ উষ্ট্র চালনা করার মতো অবস্থায় দেখিয়াছ সেই উষ্ট্র হইল কিয়ামত, যাহা আমার এবং আমার উম্মতের উপর কায়েম হইবে। আমার পরে আর কোন উম্মতও হইবে না, নবীও হইবে না।"

ইব্‌ন রামাল বলেন, এই স্বপ্ন শ্রবণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের পরে নবী (সা) আর কাহাকেও স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তবে যে কেহ তাঁহার সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করিত তিনি তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। ইব্‌ন কুতায়বা, তাবারানী এবং বায়হাকী এই হাদীস 'আদ্-দালাইল-এ' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ দুর্বল। (আল্লাহ্ ভালো জানেন।)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/ ২০০৭—২০০৮ / অঃ সঃ/ ২১১০—৩২৫০
www.pathagar.com

মাদারিজুন নুবুওয়াত

[নুবুওয়াতের মর্যাদা]

প্রথম খণ্ড

আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র)

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ